পরিচয়
৩৯ বর্ষ। সংখ্যা ১
শ্রাবণ ১৩৭৬

সূচিপত্র

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার।
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে।
চিন্মোহন সেহানবীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ১
শ্রাবণ ১৩৭৬

'শব্দের খাঁচায়' ঃ একটি নতুন উপন্যাস

গোপাল হালদার

কিছুদিন আগে পড়েছিলাম—"বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাস নেই।... সাহসী কিন্তু পর্যুদস্ত মানবাত্মার স্বরূপটি এই সব উপন্যাসে একবারেই নেই।" লেখক কবিবন্ধু জগন্নাথ চক্রবর্তী হয়তো আধমরাদের ঘা দিয়ে বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই অত্যুক্তির অস্ত্রাঘাত করেছেন। উদ্দেশ্য তাই হলে আপত্তির কারণ নেই। স্বীকার করতেই হয় যে, কবিতা ও ছোটগল্পে সাধারণভাবে যে-উৎকর্ষ বাঙলা সাহিত্যে আয়ত্ত হয়েছে, বাঙলা উপন্যাসে তা হয়নি। তবু বাঙলা উপন্যাস অবজ্ঞেয় নয়—এমনকি বাঙলায় 'আধুনিক' উপন্যাসও আছে। 'বেস্ট সেলার' জাতীয় বাঙলা উপন্যাসও এখন ও-জাতীয় ইংরেজি উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। তাছাড়া হালে পর্যুদস্ত মানবাত্মার নামে যে-আধুনিক বাঙলা উপন্যাস আসর জমাচ্ছে, তাকেও অবজ্ঞা করা চলে না। অবশ্য তার অনেকটাই নকল—সবটা নয়—তার মৌলিকতার দাবি অল্প, সাহিত্য-পরিচয়ও সন্দেহাতীত নয়। এসবের বাইরেও আধুনিক উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে লেখা হচ্ছে। সে-লেখকরা সংখ্যায় অল্প, সব দেশেই কি তা নয়? হয়তো এক আঙুলেই গোনা যায়। বাঙলাদেশের এবং আধুনিক কালের বাঙলাদেশের জীবন-যন্ত্রণা যে দু-চারজন অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন, মন দিয়ে অনুধাবন করেছেন, যথোচিত দায়িত্ব নিয়ে শিল্পান্বিত করতেও যত্নপর—অসীম রায় তাঁদেরই একজন, 'শব্দের খাঁচায়' এমনি এক উপন্যাস। হেমিঙোয়ে, ফকনার, সার্ত্র, কামু-র সঙ্গে তুলনা নিষ্প্রয়োজন। অসীম রায়

শব্দের খাঁচায়। অসীম রায়। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ছয় টাকা

তাঁদের ছায়া হতে যাবেন কেন? অসীম রায় হিসাবেই তিনি সার্থক হবেন। তাঁর উপন্যাস-ভাবনা জেমস জয়েস প্রভৃতির অনুরূপ নয়, নিজস্ব উপন্যাস-ভাবনাও তাঁর আছে; তা স্বীকার্য এবং আশান্বিত হবার মতোও।

উপন্যাস-ভাবনায় এ-বইতে অসীম রায় ভাবিত হয়েছেন শব্দের বোঝা নিয়ে, শব্দের অর্থহীন বা মিথ্যা অর্থে প্রয়োগ নিয়ে, শব্দের মিথ্যার ছাল নিয়ে—যাতে জেনে না-জেনে আমরা নিজেরা প্রবঞ্চিত হই, অপরকে প্রবঞ্চনা করি, নিজেকেও প্রবঞ্চনা করি। ভাষা-ভাবনার এই দিক অসীম রায় তাঁর গ্রন্থেও লিখেছেন—পরিমিত আকারে, সার্থক শব্দবিন্যাসে। কিন্তু এ-হচ্ছে তাঁর উপন্যাস-ভাবনার একদিক—অবশ্য এ-গ্রন্থের আলোচনায় তা প্রধান দিক। কিন্তু এর পূর্বে প্রকাশিত 'দেশদ্রোহী' উপন্যাস (কাব্যাখ্যান) পড়লে কি কারও বুঝতে দেরি হয়—অসীম রায়ের উপন্যাস-ভাবনার মূল শুধু শব্দ-বিচারে প্রোথিত নয়? সে-মূল আরও গভীরে—অনেক গভীরে—আধুনিক বাঙালি মানসের গভীরতম তলায়! আর সেই অতলস্পর্শী ভাবনার দায়েই সমুত্থিত তাঁর এই প্রকাশ-রীতির ভাবনা। আসলে ভাবনা একই, উপলব্ধি ও প্রকাশ অঙ্গাঙ্গী জড়িত এবং সার্থক শিল্পে অবিচ্ছেদ্য। এ-তত্ত্বের বিচার আপাতত স্থগিত থাক। দেখা যাক 'শব্দের খাঁচা'য় অসীম রায়ের উপন্যাস-ভাবনা কী বিশেষ রূপ লাভ করেছে।

'কুঠিঘাটা', 'লক্ষ্মীপুর', 'শেয়ালদা', 'পার্ক স্ট্রীট'—এই চারটি অধ্যায়ে শব্দের খাঁচায় বন্দী নানা মানুষ উপস্থিত। প্রধান যাঁরা, তাঁরা হচ্ছেন—একজন আত্মসচেতন অধ্যাপক (নির্মল); তাঁর জ্যেঠতুতো ভাই, বিচার-বিক্ষুব্ধ এক কমিউনিস্ট (সুব্রত, অধ্যাপক সেও); তাঁর কৃতকর্মা পুরুষ মিনিস্টার জ্যেঠা (প্রবোধবাবু); অকৃতী ডাক্তার আদর্শবাদী বাবা (সুবোধ ডাক্তার); আবাল্য অনুরাগিণী একটি শিক্ষিতা পাকিস্তানী মেয়ে (রাজু)। সম্পর্ক-সূত্রে আরও অনেকে তাঁদের পার্শ্বে উপস্থিত—সমাজের নানা বিভাগের নানা মানুষ, বিশেষ করে 'কুঠিঘাটা'র একালের ভবিষ্যদ্বক্তা তান্ত্রিক সাধক (হর ঠাকুর); 'লক্ষ্মীপুর'-এর গ্রামোন্নয়নের নেহরুযুগের সর্বভারতীয় প্রবক্তা (মিঃ দে) ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ; 'শিয়ালদা', 'পার্ক স্ট্রীট'-এ সাম্যবাদের উগ্র-ঠিকাদার অধ্যাপক গৌতম প্রভৃতি। পিছনে আরও কিছু পুরুষ, কিছু

মেয়ে—বৈশিষ্ট্যহীনতাতেই যারা পরিচিত, অল্প দেখলেও যাদের মনে রাখা যায়। দেখা যাচ্ছে—শব্দের খাঁচায় কে কিভাবে কী বুলি কপচাচ্ছেন লেখক নিজে তা দেখিয়ে দিতে ছাড়েন না। হর ঠাকুর যখন বলেন—"তোর সামনে এখন নতুন পৃথিবী, নতুন জীবন, নতুন ভবিষ্যৎ"—তখন বিশ্বাস করে না-করেও বুদ্ধিমান অধ্যাপকের তা শুনতে ভালো লাগে। মিস্টার দে-র নাজা ইংরেজিতে গ্রামোন্নয়নের সভায় কথা বলার উৎসাহ, সংবাদপত্রের রিপোর্টারের গ্রামসমীক্ষা—যা 'কপি' সংগ্রহেই সীমাবদ্ধ, বিক্ষুব্ধ সুবোধ ডাক্তারের দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে করুণ-তিক্ত কাৎরানি ও একক বিদ্রোহও ভূতে পাওয়া মানুষের কথার বেড়িতে পরিণত। "সাম্যবাদী" গৌতমদের তো কথাই নেই—(কথাই তার কাজ আর তার কাজও কথার মতো লক্ষ্যভ্রষ্ট)। এমন কি, 'শিয়ালদা'র সেই কথাহীন সন্ধ্যাটির শেষেও এক আকৈশোর আবেগের যোগাযোগকে রাজুর শেষ বিচারে মনে হয় "আসলে হয়তো সমস্তটাই ছিল শব্দের খাঁচা।" এই 'শব্দের খাঁচা'র মধ্যে পা না-দিয়ে আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবী অধ্যাপনা ছিঁড়ে ঢোকে বিলিতি বিজ্ঞাপনী আপিশে, পা বাড়ায় পার্ক স্ট্রীটের ক্যাবারের মুক্তিশালায়।

"কথা, কথা, কথা"—জীবনকে অঙ্গীকার করবার পথে সকল দিকেই এই বাধা; আর তাতে জীবন পঙ্গু, মানুষ ফাঁকা ফাঁপা—এই নাতি-অজ্ঞাত সমস্যাটিকে লেখক বুদ্ধির শাণিত বিশ্লেষণে বাক্যের তীব্র উজ্জ্বল ছটায় প্রকট করে তুলেছেন। অতি ব্যবহৃত শব্দগুলি কিন্তু তাঁর ব্যবহারে কোথাও মনে হয় না ক্ষয়-পাওয়া ভোঁতা কথা মাত্র। শব্দের এই অন্তর্নিহিত আত্মাকে তিনি প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন, এবং প্রকট করবার জন্য কাহিনীর শিল্পস্বীকৃত আড়াল মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে ফেলে নিজে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছেন— হতে কুণ্ঠিত বোধ করেননি।

অবশ্য কাহিনীর অবয়বটাও উপন্যাসের পক্ষে নিশ্চয়ই শুধুমাত্র আবরণ নয়। অন্তত উপন্যাসের পাঠকের তা মনে করা চলে না। কারণ, ভাবনা তো কাহিনীর মধ্যে অনুস্যূত; অবয়বহীন ভাবনা তো তত্ত্বকথা অথবা কথার কঙ্কাল। তাই প্রধান কথা এটিও—তত্ত্বকথার দায়ে দেহ-প্রাণ স্বচ্ছ সতেজ যে-কাহিনীটি উপন্যাসে উপস্থিত, তা স্বাগত। আধুনিক বাঙলার সমস্ত জীবনখণ্ডই তাতে অত্যন্ত গভীর সততার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে—যা প্রায় অবিস্মরণীয় এবং উজ্জ্বল। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, ভাবনায় উজ্জ্বল,

জীবনের সৌন্দর্যাভাসে উজ্জ্বল, বাক্যরচনার অপরাজেয় শক্তিতে উজ্জ্বল। কিন্তু তদপেক্ষাও বেশি তা রক্তাপ্লুত। অন্তরের বেদনায় রক্তাপ্লুত, কঠিন অভিজ্ঞতায় রক্তাপ্লুত, ন্যায়সঙ্গত তির্যক বিদ্রূপে আহত-আন্তরিকতায় ও আত্মসমালোচনায় রক্তাপ্লুত। আর অসামান্য সার্থক। সার্থক সুতীক্ষ্ণ বীক্ষণ-শক্তিতে, সুনিপুণ বর্ণনকৌশলে, বিচিত্র চরিত্রচিত্রণে, অব্যর্থ সন্ধানী ভাষা-শিল্পে। প্রথম থেকেই নির্মল আত্মসচেতন এবং সংসারী মন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কীর্তিমান ভি-আই-পি জ্যেঠামশায় তাঁর পুত্র সুব্রতের চেয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র নির্মলের বুদ্ধিতে ও শক্তিতে নিছক অকারণে আস্থাবান নন। 'কুঠিঘাটা'-র নানা চরিত্রের ও দৃশ্যের পটভূমিকায়, বুলবুলির অগভীর কথার স্রোতে ভাসতে ভাসতেও নির্মল মনে মনে বেশ বোঝে, সে তার বাবা সুবোধ ডাক্তারের বা জ্যেঠতুত ভাই বিপ্লবীযন্ত্রণায় বিদিগ্ধ সুব্রতের সগোত্র নয়—বরং সে প্রবোধচন্দ্রেরই ভাবী সংস্করণ। নির্মলের সঙ্কট ঠিক বুদ্ধিজীবীর সঙ্কটও না। সে-সঙ্কট বরং সুব্রতের। সুব্রতই বরং দুই জগতের মধ্যখানের মানুষ—জীবনকে গ্রহণ করেছে, আবার জিজ্ঞাসাকেও বর্জন করতে চায় না। গৌতমের মতো সে পাখির বুলি কপচাতে অপারগ! নির্মল শুধু গৌতমের প্রতিচরিত্র নয় বরং তার পাল্টা ঘর। দুজনাই জীবনের কাণ্ডারী। গৌতম "বিপ্লব"-এর দামই দেখে, জীবনের নয়। নির্মল যতটা জীবনের দাম আদায় করতে উৎসুক, ততটা জীবনের মূল্য স্বীকারে উন্মুখ নয়। সম্ভবত তাই রাজুর সঙ্গে তার সম্বন্ধটাও শেষ পর্যন্ত মূল্যবান হয়ে ওঠে না। না রাজু, না নির্মল—কেউ তাদের সম্বন্ধটার দাম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নয় বলেই কি? ১৯৪৭-এর ভেদরেখাটাও কি তাদের পক্ষে খাঁচা? না, বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীটারই আজ এই অপঘাত—হয় নির্মল-রাজুর মতো আত্ম-প্রবঞ্চনায় সার্থক, নয় গৌতমের মতো প্রবঞ্চনায় নিরঙ্কুশ, আর নয় সুব্রত-সুবোধ ডাক্তারের মতো বিক্ষোভে ও যন্ত্রণায় খণ্ডিতপ্রায় জীবন!

'লক্ষ্মীপুর'-এর ছাটাইকরা ছবিটা যদি ছিটকে এসে না-পড়ত, তাহলে কিন্তু মানতে হত—শব্দের খাঁচার চিত্রটা শুধু শহুরে এবং মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর চিত্র। বাঙলার চিত্ররূপ নয়। এখন অবশ্য তা বলবার উপায় নেই। তবু সে-সংশয় এই সার্থক উপন্যাসের আড়ালেও থেকে গেছে—তা বলা যায়। অন্য লেখককে নয়, এ-সংশয় অসীম রায়কেই জানানো সম্ভব। প্রধানত

একটা মনন-প্রধান তত্ত্বের দিক থেকেই তাঁর কাহিনী পরিকল্পিত। তাই সংশয় থাকে—জীবন থেকে নয়, মনন থেকেই তাঁর ভাবনা-প্রেরণার জন্ম। এ-কারণেই, দ্বিতীয় সংশয়—তাঁর কাহিনী-অংশ আপন দাবি-মতো ব্যাপ্তি আদায় করতে পারেনি—মনন-জাত শিল্প-নিয়ম তাকে ছেঁটে একটা সীমার মধ্যে রূপ দিয়েছে। মনে হয়, জীবন যেন এখানে ছাঁটকাট করা। 'এ-কারণে না হলেও, তৃতীয় একটা সংশয়—রাজু-প্রসঙ্গ যেন প্রয়োজনীয় পূর্ণতা দেয়নি, বাইরের প্রসঙ্গ থেকে গিয়েছে। তাছাড়া, মূল সমস্যা কি শব্দের প্রবঞ্চনা নয়? এই অংশটা তাই কিছু পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে।

শেষ সংশয় : Words, words, words—শব্দের চিরদিনের এই অনর্থপাত দিয়ে 'সেমান্টিক গবেষণা' বা 'লজিকাল পজিটিভিজম'-এর তর্ক না তুললেও চলে। জীবন চিরদিনই ইতিহাসের নিয়মে পর্বে পর্বে তার মীমাংসা করে দিচ্ছে। এ-যুগে শব্দের খাঁচায় আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিতশ্রেণী যে প্রবঞ্চনায় ও আত্মপ্রবঞ্চনায় মেতেছেন—তার কারণটা কি? শব্দ সত্যই হাতিয়ার, কিন্তু হাতটা কার? কোন হাতের কোন হাতিয়ার না-হলেই চলে না? আরেকটা শব্দের ভাঁওতা সৃষ্টি না-করেও বলা যেতে পারে—এ-প্রবঞ্চনা ও আত্মপ্রবঞ্চনা আপনা থেকেই প্রয়োজন হয়ে পড়ছে বিশেষ করে এ-মুহূর্তে, যখন ইতিহাসের তাড়নায় বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের জীবন থেকে পলায়নের পথ নেই; অথচ জীবনকে প্রত্যক্ষ করাও হয়ে পড়েছে যন্ত্রণাদায়ক। তাকে কি ভাবে গ্রহণ করা—সুব্রতের সঙ্কট—কোথায় জীবন, কোথায় মানুষ? এ-জীবনজিজ্ঞাসা থেকে আত্মরক্ষার উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে গৌতমের উগ্র অন্ধতা-মন্ত্রই যথেষ্ট এবং নির্মলের মোহহীন সিদ্ধির বুদ্ধি—'পার্ক স্ট্রীট' পর্বে নকশালবাজি পার্ক স্ট্রীট সমান দূর!

কিন্তু আজকের দিনের "পর্যুদস্ত মানবাত্মার স্বরূপ" এবং বিরূপ উদ্ঘাটনে অন্তত 'শব্দের খাঁচা'য় অসীম রায় বিশেষ রকমেই সার্থক হয়েছেন। এই প্রথম কথাটা আরেকবার বলেই তাঁকে সাদরে অভিনন্দন জানাই।

রবীন্দ্রমানস ও দার্শনিক প্রত্যয়

অরবিন্দ পোদ্দার

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রত্যয়গুলোর ন্যায়বিন্যাস কি প্রকারের, এর মৌল প্রতিজ্ঞাই বা কি, তাঁর দার্শনিক অভিমত বলে কথিত উক্তিগুলো প্রকৃত নৈয়ায়িক বিচারে আদতেই 'দার্শনিক' কিনা, হয়ে থাকলে এর প্রায়োগিক যাথার্থ্য কতটুকু, তাঁর শ্রেয়োদর্শনে আধুনিক কালের মানুষ কিভাবে ও কতখানি আশ্রিত, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় অতিশয় প্রাসঙ্গিক। আমাদের বোধ-বুদ্ধি-মননের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একটি অস্বাভাবিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল প্রভাব ও বিস্ময়। সেই বিস্ময় প্রায়শই স্বচ্ছ আলোচনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেই বিস্ময়ে স্থিত থেকেও যাঁরা তাঁকে দার্শনিক পর্যায়ভুক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন, তাঁরা বোধ করি এই যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হন—যে-অর্থে কণাদ দার্শনিক অথবা প্লেটো, সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক নন; কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞান বা তত্ত্ববিদ্যা বা বিশ্বরহস্যের অন্বেষণকে যদি আমরা ব্যাপকার্থে দর্শন বলে গ্রহণ করি, তবে রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক বলে গ্রহণ করার কুণ্ঠা অকারণ। সেক্ষেত্রে সংশয়বাদীদের সংশয়ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হবে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটি সুদীর্ঘ[১] নিবন্ধে পূর্বোক্ত সংশয় খণ্ডন করেছেন এবং পাঁচটি অধ্যায়ে—'দার্শনিকতার স্বরূপ ও রবীন্দ্রনাথ', 'সত্তাদর্শন', 'আমি আছি', 'বিশ্ব', 'বুদ্ধি ও বোধি'—বিভক্ত করে রবীন্দ্রদর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। একটি সামান্য বিবরণের ভিত্তিতে যার নামকরণ করা হয়েছে সত্তাদর্শন, এই আলোচনায় তারই যুক্তিধারা বিন্যস্ত হয়েছে। "আমি আছি" এই সামান্য বাক্যটির নিগূঢ়ার্থ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সত্তাদর্শন পরিস্ফুট করা হয়েছে।

ঐ নিবন্ধ পাঠে বর্তমান আলোচকের মনে যেসব জিজ্ঞাসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলিত হয়েছে তা নিবেদন করার মধ্যেই গ্রন্থের আলোচনা সীমাবদ্ধ

---

[১] রবীন্দ্রদর্শন: শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী। পনেরো টাকা

রাখতে চাই। রবীন্দ্রদর্শন-চিন্তায় 'পূর্বস্বীকৃত বিশ্বাস' স্বরূপ দুটি মৌল প্রত্যয়ের উল্লেখ করা হয়েছে—(ক) নাস্তিত্ব বা মৃত্যু, এবং (খ) মানবকেন্দ্রিকতা। নাস্তিত্বের বোধ বা মৃত্যুচেতনা যে-কোনো সংবেদনশীল মানুষের জীবনবোধকে ঐশ্বর্যশীল করে সত্য এবং রবীন্দ্রনাথকেও নিঃসন্দেহে গরীয়ান চিন্তায় ভাবিত করেছে, কিন্তু তথাপি আমার ধারণা নাস্তিত্ব নয় অস্তিজ্ঞাপক একটি পূর্বস্বীকৃত বিশ্বাসকেই রবীন্দ্রদর্শনের মৌল এবং প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা রূপে গ্রহণ করা উচিত। সেরূপ বিশ্বাস যে অস্তিত্বহীন, তাও তো নয়। কারণ, স্থূল বিশ্ব ও দেশকালের সীমা পার হয়ে এবং তাকে পরিব্যাপ্ত করে এক পরম সত্তা বা ব্রহ্ম বা প্রথমজাত অমৃতের অবস্থিতি এই বিশ্বাস, এবং সেই অমৃতে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সর্বস্তরের রবীন্দ্রমানসেরই একটি আত্যন্তিক চেতনা। তাছাড়া, নাস্তিত্বের বোধ প্রথম পর্বে যতটা ক্রিয়াশীল পরবর্তীকালে ততটা নয়; কিন্তু অমৃতে স্থিত হবার আকুতি তাঁর চিরন্তন। প্রথম আমলের "জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদের টানিতেছেন—আর কাহারো টানিবার ক্ষমতাই নাই"—এই উক্তির ক্ষেত্রে তা যেমন সত্য, পরবর্তীকালের "সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম ক'রে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে ব'লেই মানুষের বাস দেশে।"—এই উক্তির ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য।

সেই অসীম এক-এ বিশ্বাস তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রথম প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞার আলোকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুপৃথিবী ও মানববিশ্ব এক অভিনব ও বিশিষ্ট অর্থে উদ্‌ভাসিত। সেজন্য, "আমি আছি" এই বাক্যটির তাৎপর্যও রবীন্দ্রদর্শনের আলোকে বিশিষ্ট অর্থবহ। রবীন্দ্রনাথ বারংবার জোর দিয়ে বলেছেন, "যা কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিলছে, আবার ফিরেও আসছে প্রতিধ্বনিরূপে নানা রসে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে।···এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেই জন্যই আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি, উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়···স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।" বর্তমান আলোচক রবীন্দ্রমানসের বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের অনুভবের যে-বিশ্ব—তা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ স্থূল পৃথিবী নয়। কারণ, যা রূপান্তরশীল, ক্ষয়ক্ষতিবিনাশ ও

কালের প্রহরাধীন, ঔপনিষদিক তত্ত্বে আশ্রিত—রবীন্দ্রনাথ তাকে সত্য বলে গ্রহণে কুণ্ঠিত। তা মিথ্যা, বড় জোর 'প্রতিধ্বনি'। ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনির যে-পার্থক্য, সত্যের সঙ্গে আমাদের বস্তু-পৃথিবীর পার্থক্যও তাই। [দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রমানস, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ]

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রথমে সমস্ত জীবের সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বসবাস করে, পরে জ্ঞান এসে তাকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র করে, তারও পরে অনন্তে সে পুনরায় সকলের সঙ্গে মিলিত হয়। অনন্তে পৌঁছনো "তরী থেকে তীরে ওঠা।" রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের তরী থেকে অমৃতের তীরে উপনীত হওয়া। পূর্বোক্ত উক্তির আলোকে তাঁর সত্তাদর্শন ভিন্নতর অর্থে প্রতিভাত হয়। সেজন্য, শচীন্দ্রবাবু আরিস্টটলের Substance, হোয়াইট-হেডের fact, সার্ত্রের সত্তাবাদ ইত্যাদির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী 'আমি আছি'।"—এই উক্তির সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেলেও তা যুক্তিযুক্ত বা প্রমাণগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথের 'আমি আছি' প্রত্যয় অনাদি অমৃত অথবা বিশ্বজাগতিক আত্মার অভিব্যক্তি রূপেই স্বীকৃত। বিশ্লেষণে দেখা যাবে, বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ অর্থাৎ তার মূর্ত জাগতিক সম্পর্কগুলোকে হৃদয়গ্রাহ্য বলে গ্রহণ করতে রবীন্দ্রমানস কুণ্ঠিত। বস্তুজগৎ বা মানবিক সংসার এর প্রকাশ ও অভিব্যক্তি, গতি ও চঞ্চলতার মধ্যে তিনি এমন কিছুর সন্ধান লাভ করেন যার অস্তিত্ব বস্তুতপক্ষে সেখানে নেই; কোনোদিন ছিল না। তাঁর অপরীক্ষিত ও অপ্রমাণিত প্রত্যয় 'আত্মা'র অভিব্যক্তির নিরিখে সমস্ত সামাজিক মানবিক জাগতিক সম্পর্ক উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করা রবীন্দ্রমানসের ঐকান্তিক গরজ। কোনো কিছুই তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় যাকে ঐ সত্য বা আত্মিক সম্পর্কে সম্পর্কিত করা ও সেভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

এই আলোকে রবীন্দ্রনাথের মানবকেন্দ্রিকতাও অনিবার্যরূপে অতীন্দ্রিয় তাৎপর্যমণ্ডিত হয় "আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।" এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে ভাবের ক্ষেত্র। আরও বলেছিলেন যে, তাঁর ভালোবাসার ভারতবর্ষ একটা 'আইডিয়া' মাত্র,

ভৌগোলিক সংজ্ঞা নয়। এসব উক্তির পুনরুল্লেখ করলাম এই সত্য কথাটি পুনরায় স্মরণ করার জন্য যে, মানুষ অর্থে তাত্ত্বিকক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই মানবসত্তা বুঝেছেন। ফলে, তাঁর মানবধর্মও এক স্ববিরোধে খণ্ডিত হয়। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক তত্ত্ব—যার অন্তর্নিহিত সম্পদ হলো সামঞ্জস্য এবং ব্যক্তিমানবকে উত্তীর্ণ হয়ে বৃহৎ মানবমনের সঙ্গে ঐক্যস্থাপন—মানবিক গুণে ও ঔদার্যে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক জীবনবিন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন, এ সম্পর্কের জটিলতাগুলো তাঁর নির্বস্তুক মানবপ্রেম দ্বারা অভিব্যক্ত বা ব্যাখ্যাত হয় না। সেজন্য লেখকের এই সিদ্ধান্ত "বস্তুত রবীন্দ্রদর্শন মাত্র সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রকৃত ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে দিয়েছে এক মহৎ জীবনদর্শন যা দিয়ে মাত্র তত্ত্বের জগৎ ব্যাখ্যা করা নয়, জীবন-জগৎও···উদ্ভাসিত হয়" গ্রহণে কুণ্ঠা জাগে। উপনিষদের আমলে উচ্চারিত তত্ত্ব দিয়ে সত্য সত্যই আমাদের আধুনিক জীবন-জগৎ উদ্ভাসিত হয় কি? অথবা, আমাদের প্রত্যক্ষ প্রবহমান জীবনকে রূপান্তরিত করার শক্তি সে ধারণ করে কি? লেখক স্বয়ং বলেছেন, "এই দ্রুত স্পন্দনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার জগতে রবীন্দ্রনাথ সত্য অণ্বেষণ তাই নিষ্ফল মনে করলেন" (পৃ. ২৩)। তাই যদি হয়ে থাকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীতে যদি সত্যের সন্ধান না-মেলে, তবে রবীন্দ্রদর্শন এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীকে উদ্ভাসিত বা রূপান্তরিত করবে কিরূপে? রবীন্দ্রদর্শনের প্রায়োগিক মূল্যই বা কতটুকু?

এই প্রশ্নটি অন্য এক দিক থেকেও উত্থাপন করা যেতে পারে। লেখকের একটি মন্তব্য: "সত্য যদি মাত্র তাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় না হয়, তা যদি দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হয়—হয় অর্থক্রিয়ার জনক—জীবনদর্শনের অনুপ্রেরণা—তা হ'লে সত্য কদাপি মানবিক যোগছিন্ন হতে পারে না বা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়" (পৃ. ১২)। মানবকেন্দ্রিকতা যদি দর্শনচিন্তা থেকে বর্জিত না হয়, যদি বিশেষকালের মানুষকে তা অবলম্বন করে জীবনসাধনায় অগ্রসর হতে হয়, তবে এর প্রায়োগিক দিকটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে-মানবসংযোগ, তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রে তা তো সীমাবদ্ধ কাল ও মানুষকে অতিক্রম করে 'নরদেবতা' অর্থাৎ এক অস্তিত্বহীন সত্তার সংযোগ। আমার জিজ্ঞাস্য, অস্তিত্বহীন এক সত্তার অন্বেষণ কি বাস্তব সম্পর্কগুলোর রূপান্তর বা উন্নয়নে সক্ষম? সত্তাদর্শনের লেখক এ-জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর দেননি।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তা বিস্তারিত করার জন্য নিবন্ধে বহু ইওরোপীয় দার্শনিকের চিন্তাধারার সাদৃশ্য অন্বেষণ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ভিটগেনস্টাইনও আছেন। দর্শনের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এর যথাযোগ্যতা বিচার করবেন। সাধারণবুদ্ধি আমাকে এই বিশ্বাসে স্থিত হতে সাহায্য করে যে, দু-চারটে শব্দের অথবা দু-একটি বাক্যের সাদৃশ্য মৌল প্রেক্ষিতের ঐক্য সূচনা করে না। যেমন ধরা যাক সার্ত্রের সত্তাবাদী দর্শনচিন্তার কথা, যার সঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শনচিন্তার ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিশদ চেষ্টা আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষ লক্ষণীয়। সার্ত্রের মানবভাবনার মূলে রয়েছে একটা তীব্র পাতিত্যের বোধ (feeling of being condemned)। এই বোধের তীব্রতাই মানুষের বুদ্ধিগত নির্বাচন ও মুক্তিভাবনার উৎস। রবীন্দ্রমানস এই বোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং বাহ্য সাদৃশ্যের উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিকর।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীপবিত্রকুমার রায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শন বিস্তারিত করেছেন। চারটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে—'অবতারণা', 'সৌন্দর্য', 'মঙ্গল', 'ঈশ্বর'—বিভক্ত এই অংশে রবীন্দ্রনাথের মূল্যের বোধ, কল্যাণভাবনা, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি শ্রেয়সাধনার অভিব্যক্তিগুলিকে একটি দার্শনিক কাঠামোয় বিন্যস্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যুক্তির যে-বিন্যাস ও সত্তাদর্শনের যে-স্বরূপ নির্ধারিত, আলোচ্য খণ্ডেও মুখ্যত তা-ই অনুসৃত হয়েছে। কবির শ্রেয়বোধ ও কল্যাণভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রই অবহিত, তার পুনরুল্লেখ বর্তমানে তাই নিষ্প্রয়োজন। লেখকের বিশ্লেষণের মধ্যেই যুক্তিপরম্পরায় মাঝে মাঝে যে-ফাঁক ও অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়েছে—তার দু-চারটির সঙ্কেত দেওয়া হবে মাত্র।

অবতারণা অংশে লেখক শ্রেয়বস্তু ও শ্রেয়সাধনার আলোচনায় বলেছেন, "শ্রেয় পার্থিব কোন বস্তু নয়" (পৃ. ৭৭)। আরও বলেছেন, "শ্রেয় সাধনার ব্যাপ্তি দ্বারাই শ্রেয়বস্তুর আনন্ত্য এবং ঐক্য প্রমাণিত হয়"। কিন্তু কিভাবে তা প্রমাণিত হলো তার সাক্ষ্য কিন্তু আলোচনায় অনুপস্থিত। সেজন্য এই জিজ্ঞাসা অনিবার্য হয়ে পড়ে, শ্রেয়বস্তু পার্থিব বস্তু নয় কেন? কোন অর্থ বা উপলব্ধিতে তা "অনন্ত ও এক?" লেখকের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ-যুক্তি উপস্থাপিত করা যেতে পারে, শ্রেয়ের বোধ ও বিচারের মানদণ্ড নিঃসন্দেহে নৈতিক। পরানৈতিক তত্ত্বের তথা শ্রেয়ের যখন কোনো স্বীকৃতি নেই, তখন একথাও স্বীকার্য যে, মানবিক বিশ্বের পার্থিব সম্পর্কগুলোর মধ্যেই

নৈতিক মূল্যমানগুলো অনুসৃত ও অর্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু লেখক শ্রেয়-বস্তুকে অনন্তের ব্যাপ্তি দান করে একে একদিকে অতীন্দ্রিয়ের কোঠায় নিক্ষেপ করছেন, অন্যদিকে বেশ কিছুটা অনির্দিষ্টতা এবং অনির্দেশ্যতাও দান করেছেন। তৎসত্ত্বেও কিন্তু শ্রেয়ের দার্শনিক ভাবনা অস্পষ্ট থেকে গেছে এবং লেখকও পরবর্তীকালে তাঁর প্রাথমিক ঘোষণাকে খণ্ডন করেছেন। ১২৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখছেন, "শ্রেয় সাধনা মানবিক সাধনা।" এই উক্তিতে পূর্বতন উক্তি—"শ্রেয় পার্থিব বস্তু নয়"—বহুলাংশেই খণ্ডিত। একারণে যে, মানবিক অর্থে আমরা বস্তুর ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ধৃত মানুষের প্রচেষ্টাকে বুঝি। সেজন্য, মানবিক শ্রেয়-সাধনা একান্তই পার্থিব সাধনা।

"আমি আছি" এই বাক্যটির বিশ্লেষণে অন্য একটি বাক্যের সহায়তায় এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, "আমি আছি" বা "গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি" ইত্যাদি বাক্য শ্রেয়বিচার-মূলক বাক্য বা Value judgment (পৃ. ৭৯)। কিন্তু কিভাবে প্রথম বাক্যটি শ্রেয়বিচারমূলক বাক্য, তা আদৌ পরিস্ফুট নয়। কারণ নিছক থাকা বা অস্তিত্ব কিভাবে শ্রেয়সকে অভিব্যক্ত করছে তা বিশ্লেষণ করা হয়নি। তেমনি "সত্তাই চরমতম শ্রেয়" (পৃ. ৬৯)—কোন যুক্তিপরম্পরায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল তা বিশদ করা হয়নি, যদিও এই বাক্যটিকে অন্য বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণে হাজির করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড অনভ্যস্ত দার্শনিক পরিভাষার ভারে পীড়িত। দ্বিতীয় খণ্ড ততটা পীড়িত না-হলেও এই খণ্ডের যুক্তিবিন্যাস সমগ্রভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়।

লেখকের একটি মন্তব্য: "রবীন্দ্রনাথ যে মানুষের কথা বলেছেন সে দেশ-কালে ও কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় বদ্ধ ও নির্ধারিত মানুষ নয়। সে মানুষ 'Universal man' সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমরা স্বীকার করতে ইচ্ছুক যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সত্তা, তার প্রকাশধর্মিতা ও শ্রেয়বোধ-জাত সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের প্রস্তাবে আকুতিবাক্য-সমূহের সমবায়ে যে দার্শনিক যথাক্রম উপস্থাপিত করছেন তা বিন্যাসে সুসমঞ্জস ও আবেদনে তৃপ্তিকর" (পৃ. ৮১)। সেই পুরাতন প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপন করা যেতে পারে: রবীন্দ্রনাথের মানুষ যদি দেশকালে বদ্ধ ও নির্ধারিত মানুষ না-হয়ে থাকে, তবে দেশকালের সীমাবিধৃত মানুষের নিকট রবীন্দ্রনাথের মানবকেন্দ্রি-

কর্তা ও মানবধর্ম কোন অর্থে মূল্যবান? যুক্তিবিচারে তা তৃপ্তিকর হলেও আমাদের বিপর্যস্ত অস্তিত্বের ততোধিক বিপর্যস্ত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ও পথনির্দেশ কি তথায় লভ্য? পুনশ্চ, এর প্রায়োগিক যথাযথতা কতখানি? গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত নানা মন্তব্য সম্পর্কেই এ-ধরনের বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়।

গ্রন্থের তৃতীয় বা সংযোজন অংশে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই অংশটি পূর্বগামী দুটি খণ্ডের পরিপূরক রূপেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু দার্শনিক কাঠামোর দৃঢ়সংবদ্ধতা এক্ষেত্রে রক্ষিত হয়নি বলে আলোচ্য অংশটি নিঃসন্দেহে দুর্বল। দুর্বল আরও এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সমাজদর্শনের পরিচয় গ্রহণ করা হয়নি। তাই আলোচনায় তাত্ত্বিক গাম্ভীর্য অনুপস্থিত। অথচ, স্বপ্ন কল্পনা অধ্যাসের সংমিশ্রণে তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে যেসব নিবন্ধ রচনা করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রমানসের অনায়াস ঐশ্বর্য অভিব্যক্ত। 'কালান্তর' গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধগুলো এবং ন্যাশনেলিজম বিতর্কের সময় রচিত নিবন্ধগুলোর সাহায্যে কবির ভারতচিন্তার ঐশ্বর্য অতিশয় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করা যেত।

আলোচ্য অংশটিতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়কার সমাজ-বিষয়ক রচনা থেকে ব্যক্তি ও সমাজ, ভারত-ইতিহাসের বিচার, দারিদ্র্যের মূল ও তার সমাধান, রায়তের সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে কবির মতামত উদ্ধৃত হয়েছে; এবং উদ্ধৃতি শেষে তাত্ত্বিক সূত্রাকারে কতকগুলো সিদ্ধান্তও টানা হয়েছে। সরলীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিদ্ধান্তগুলোর উপযোগিতা স্বীকৃত হতে পারে, সমাজদর্শনের কোনো সামগ্রিক প্রেক্ষাপট অনুপস্থিত থাকায় ঐসব সিদ্ধান্ত থেকে রবীন্দ্রনাথের কাম্য সমাজের কোনো সার্বিক চিত্রও পরিস্ফুট হয়নি। তাছাড়া, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামতের কোনো মূল্যায়নও করা হয়নি, যা গবেষণা ও গবেষক উভয়ের পক্ষেই দুঃখজনক। কারণ, মূল্যায়ন ব্যতিরেকে পরিবর্তিত সমাজ-পরিবেশে কোনো মতামতের গ্রহণযোগ্য তাৎপর্যটুকু প্রতিভাত হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতামতের মূল্যায়নও সে অর্থেই কাম্য।

দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তি:

"সেইজন্য আমাদের অতীতকেই নূতন বল দিতে হইবে, নূতন প্রাণ দিতে হইবে।" পরপৃষ্ঠায় লেখকের সিদ্ধান্তের একাংশ: "অতীতকে অস্বীকার করতে গেলে সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল নকলিয়ানায় পর্যবসিত হবে।" প্রশ্ন, এ-অতীত, কোন অতীত? অতীত কি শুধুই একটা নির্বস্তুক ভাব বা আইডিয়া, না সামাজিক সম্পর্ক, নির্দিষ্ট মূল্যবোধ, বিশেষ শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদ সম্বলিত সমাজ-সংগঠনের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি? সেই অন্যায় অসাম্যের ভিত্তিতে গড়া অচলায়তনের পুনরুজ্জীবনই কি রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল? তাঁর পুনরুজ্জীবন বা নবায়ন কোন দিক থেকে আমাদের পক্ষে হিতকর? কোন কার্যক্রমের অনুসরণেই বা সম্ভব?

১৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তি: [একদা] "পরস্পর মিলনের কোন বাধা ছিল না, শিক্ষা আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।" কবির এই বিশ্বাস কি ঐতিহাসিক সত্যতার শক্তিতে বলীয়ান বা নির্ভরযোগ্য? ভারত-ইতিহাসের কোন স্তরের সমাজসংগঠন সম্পর্কে একথা সত্য? অন্য দিকে—ধরা যাক ঐরূপ সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা—সমাজ-সংগঠনের কিরূপ পরিবর্তন বা রূপান্তর সাধনের পথে ঐ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে পারে লেখকের সিদ্ধান্তে তার কোনো ইঙ্গিত নেই। ফলে, বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তগুলো রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার একটি সার্বিক কাঠামো নির্মাণে সহায়তা করে না।

পরিশেষে বক্তব্য, কোনো দর্শনচিন্তার সজীব সকর্মক ভাবাদর্শ বা ইডিওলজিতে রূপান্তর অভিপ্রেত না হতে পারে; কিন্তু দার্শনিক সত্যকে যদিই জীবনচর্চার অনুপ্রেরণা বলে গণ্য করতে হয়, তাহলে শুধু গবেষণা-সুলভ বিবৃতি নয়—সেই সত্যের নব মূল্যায়নও কাম্য। এবং ঐ সত্য পরিবর্তিত সমাজপরিস্থিতিতে মানবসম্পর্কগুলিকে পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ করতে ও মানবসমস্যা সমাধানের ব্যবহারিক কার্যক্রম নির্দেশে সমর্থ কিনা তাও বিচার্য। সে-পথেই একান্ত বুদ্ধিমার্গীয় গবেষণা জীবনসাধনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। মূল্যায়নের এই বাঞ্ছিত দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ।
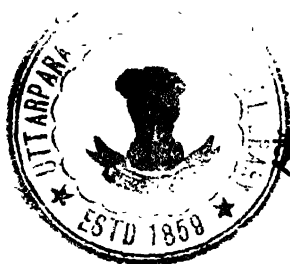
ইতিহাসে বিজ্ঞান

দিলীপ বসু

বৈজ্ঞানিক জগতে প্রফেসার বার্নালের স্থান প্রথম সারিতে। একদিকে তিনি ব্রিটেনের রয়াল সোসাইটির সভ্য (এফ. আর. এস.), অন্যদিকে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গারি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানি ও নরওয়ের বিজ্ঞান একাদেমির সভ্য এবং স্বদেশ ব্রিটেন ছাড়া আরও বহু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা নানাবিধ সম্মানে ভূষিত।

এই বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী, বিশ্ব শান্তি কাউনসিলের অন্যতম চেয়ারম্যান, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র 'মার্কসিজম টুডে' সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পশ্চিম ইউরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলবার যতো কিছু সামরিক নীতি ও কৌশলের (ষ্ট্রাটাজি ও ট্যাকটিকস) পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণে তাঁর অবদানই ছিল সব থেকে বেশি; ইংরাজী বাক্যের অনুকরণে বলতে হয়, তিনিই ছিলেন 'প্রধান মস্তিষ্ক' (The best brain)।

ব্রিটিশ সরকারের তখনকার গুপ্তচর বিভাগ অবশ্য আপত্তি তুলে বলেছিল তিনি কমিউনিস্ট, অতএব এতো বড়ো ব্যাপারে, যাতে যুদ্ধে ব্রিটেনের জয়পরাজয়ের ভাগ্যই নির্ভর করছিল, তাঁকে প্রধান দায়িত্ব দেওয়া নিরাপদ কি-না! কিন্তু স্বয়ং চার্চিলের হস্তক্ষেপে সে-আপত্তি অবিলম্বে তুলে নিতে তারা বাধ্য হয়।

মানুষের সমাজবিকাশের ইতিহাসের স্তরে স্তরে বিজ্ঞানের যে বিশিষ্ট ভূমিকা ও অবদান রয়েছে, সেটা অবশ্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। আবার প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যেও মানুষের কেবল চিন্তাজগতে নয়, তার সামাজিক থেকে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও যে-যুগবদলের পালা শুরু হয়েছে, তার বিস্তৃত কাহিনী এ-পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি।

Science in History— Prof. G. D. Bernal : pelican : 4 Parts : Each part Rs. 18/-

আলোচ্য পুস্তকে (এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে, চার খণ্ডে আয়তন মোট ১৩০০ পৃষ্ঠার কিছু অধিক, তাছাড়া বহু ছবি, ম্যাপ, চার্ট দিয়ে পেলিক্যানের এই সংস্করণটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ) প্রফেসার বার্নাল সেটাই করেছেন। এর পূর্বে অবশ্য ১৯৩৯ সালে তিনি 'Social Function of Science' গ্রন্থে বিজ্ঞানের সামাজিক দিকটির কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কোনো সামাজিক তাৎপর্য আছে, নাকি বিজ্ঞান সে-ব্যাপারে উদাসীন; বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা কি করে সংগঠিত করতে হবে; যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বিজ্ঞানের কি কোনো বক্তব্য নেই ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার যে-উত্তর প্রফেসার বার্নাল তখন দিয়েছিলেন—তারই পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৬৪ সালে ব্রিটেনের কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ: প্রফেসার ব্ল্যাকেট, হলডেন, নীডহ্যাম, পাওয়েল, পিরি, সিঞ্জ প্রভৃতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পিটার ক্যাপিটসা প্রমুখ বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 'The Science of Science' পুস্তকে সেই সমস্যাগুলির নতুন এক আলোচনা উপস্থিত করেন। অধুনা প্রযুক্তিবিদ্যার (টেকনোলজি) অভূতপূর্ব উন্নতি, বিশেষ করে শিল্প-জগতে নানারকমের উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বহুল প্রচারের ফলে (যেমন স্বয়ংক্রিয় কমপিউটার যন্ত্রের ব্যবহারে মানুষের কায়িক ও একঘেয়ে শ্রমের প্রয়োজন ক্রমশই কমে যাচ্ছে) আমরা যখন দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের যুগে বাস করছি এবং যখন ক্রমশই বিজ্ঞান চিন্তাজগতের অধীত বস্তু থেকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন সামাজিক অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের প্রভাব ও অবদান সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞানীই উদাসীন থাকতে পারেন না।

আলোচ্য পুস্তকের প্রথম সংস্করণ থেকে এই তৃতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণে প্রফেসার বার্নাল এই বিরাট কাজটি যেভাবে সুসম্পন্ন করেছেন, তার সম্যক আলোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে করা সম্ভব নয়। আমরা গোড়াতেই বলেছি যে, এটি একটি এনসাইক্লোপিডিয়া, কোনো বিশেষ বই নয়। ভূমিকাতে প্রফেসার বার্নালও লিখছেন: "I must write a book, not an encyclopedia, and I must bring it to an end in a finite number of years"। আসলে এনসাইক্লোপিডিয়ার সমতুল্য কাজই তাঁকে করতে হয়েছে। বিস্মিত হতে হয় যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা শিল্পকলা সাহিত্য প্রভৃতি বহু বিভাগে তাঁর কি স্বচ্ছন্দ অনায়াসহীন

বিচরণ। এর ফলে মানুষের বিজ্ঞান, শিল্প, চারুকলার অন্তর্নিহিত যে-যোগসূত্র আমরা পাই, আলোচ্য পুস্তকটিতে আমাদের জীবনসত্তার যে-সামগ্রিক রূপটি ফুটে ওঠে, সেটি অনবদ্য সুসংবদ্ধ; আর এটিকে যতই আমরা বুঝতে ও ধরতে পারব, ততই আমরা পুরো মানুষ হয়ে উঠতে পারব। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যে-চেহারা আমরা পাচ্ছি, আজকে এই দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের যুগে তাকে আরো বিকশিত রূপে গড়তে হবে। প্রফেসার বার্নাল নিজে সেই পুরো মানুষ যাঁর মধ্যেও বৈজ্ঞানিক ও মানবিক-দার্শনিক (হিউম্যানিটিস) সংস্কৃতির (যাকে আজকাল সি.পি. স্নোর ভাষায় অভিহিত করছি 'two cultures' বলে) সমন্বয় ঘটেছে। আর এনসাইক্লোপিডিয়ার ব্যাপ্তি নিয়ে তাঁর এই পুস্তকপাঠে আমরা মানবসভ্যতার সামগ্রিক রূপটি ধরতে পেরে অপূর্ব রসানুভূতিতে আপ্লুত হই।

এবারে আমরা এই বিরাট পুস্তকের বিশেষ কয়েকটি দিক মাত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, তথা অনুসন্ধিৎসার মূল সমস্যাটা কি? মানুষ তার জীবনধারণের প্রয়োজনে ও তাকে উন্নত করার প্রচেষ্টাতে একদিকে যেমন ক্রমাগতই কাজ করে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি এই প্র্যাকটিস বা কাজ থেকে উদ্ভূত যে-সমস্ত নতুন ঔপপত্তিক সমস্যার (থিওরি) উদ্ভব হচ্ছে, তাকে অথবা পুরনো থিওরিকে নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাই করে দেখারও প্রয়োজন হচ্ছে; এই দুয়ের সার্থক সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথ নির্দিষ্ট হয়। কাজেই "Science, in one aspect, is ordered technique; in another, it is rationalized mythology." অর্থাৎ, সমাজের এক বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগবিদ্যা ও কারুশিল্পকে যেমন সুষ্ঠুভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে নিতে হবে, তেমনি আজকে যেটা অজ্ঞেয় পুরাতত্ত্ব বলে মনে হবে, আগামী দিনে যুক্তির আলোকে বুঝে নিতে হবে তার অন্তর্নিহিত কার্যকারণ সম্পর্ককে। কাজেই আমরা যাদের আজ বিজ্ঞানী বলে অভিহিত করে থাকি, মানবেতিহাসের মাত্র তিন শতাব্দী পূর্বে সেরকম কোনো পদের বা পেশার সৃষ্টি হয়নি। এতদিন বিজ্ঞানের কাজ করত হয় কারিগররা, নয় পুরোহিত বা বিশেষ শ্রেণীর আলোকপ্রাপ্ত কিছু লোক; যাদের চালচলনের মধ্যে স্বভাবতই খানিকটা রহস্য জড়িয়ে থাকত।

প্রাচীন বিজ্ঞানের পীঠস্থান গ্রীস থেকে ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যাবিলোনিয়া, ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষে। রোমক সাম্রাজ্যে আইনের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হলেও নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আমরা দেখতে পাই না।

রোমের পতনের পরে ৫০০ বছর ধরে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কেন্দ্রস্থল হয়ে দাড়াল ইউফ্রেটিসের পূর্বে—পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে—পারস্য, সিরিয়া ও ভারতবর্ষে। একদিকে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের কালে আবার যখন নতুন করে বৌদ্ধধর্মের বদলে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন হলো, এলিফ্যান্টা ও ইলোরার স্থাপত্য গড়ে উঠল; অন্যদিকে তেমনি করে পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যভট্ট ও বরাহমিহির এবং সপ্তম শতকে ব্রহ্মগুপ্তের নেতৃত্বে অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার নিদর্শন আমরা দেখতে পেলাম। বিশেষ করে সিরিয়া ও ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের দ্বারা সংখ্যাতত্ত্বের শূন্যের আবিষ্কার—একদিকে দশ, শত, সহস্র, অন্যদিকে দশমিকের লেখন-প্রণালী আবিষ্কারের ফলে পাটিগণিত ও পরে আরবদেশে বীজগণিতের প্রভূত উন্নতি হলো। সংখ্যার লিখন-প্রণালী আমাদের কাছে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ মনে হতে পারে, কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে, পূর্বের প্রণালীতে (লিপির সাহায্যে সংখ্যাকে প্রকাশ করা) এমন কি যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগও এত সহজসাধ্য ছিল না।

সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামে বিজ্ঞানের বিশেষ অগ্রগতির মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয় এই, ইসলামের বৈজ্ঞানিক বা চিন্তানায়করা গ্রীক পুরাতত্ত্বের কাহিনী বা তার ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে গ্রীক চিন্তার ব্যবহারিক ও বস্তুবাদী দিকটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অবশ্যই প্লেটো এবং বিশেষ করে নিওপ্লেটোনিস্টরা, তাঁদের সংখ্যা-রহস্য নিয়ে মাতামাতির দ্বারা (যার কোনো বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নিশ্চয়ই নেই) ইসলামীয় বৈজ্ঞানিকদের কয়েকজনকে প্রভাবান্বিত করলেও, ইসলামিয় বৈজ্ঞানিকদের সর্বাধিনায়ক আল-কিন্‌ডি, রাজেস্‌শ এবং আভিসেনা প্রমুখ রাশিচক্রের দ্বারা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ (astrology) এবং কিমিয়াবিদ্যা (alchemy) পরিত্যাগ করেছিলেন। সালাদীন, গজনীর মামুদ এবং সমরখন্দের উলুবেগ বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকেও এগিয়ে নিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাছাড়া ভূগোল (যেমন আল-বিরুনীর লেখা 'ভারতবর্ষ'—যাতে কেবলমাত্র ভৌগোলিক বর্ণনা ছাড়াও

সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস ও হিন্দু বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক খবর পাওয়া যায়) চিকিৎসা বিজ্ঞান, চক্ষুরোগের চিকিৎসা, খানিকটা রসায়নশাস্ত্র—সব দিকেই ইসলামিয় বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি আমরা দেখতে পাচ্ছি।

দ্বাদশ শতাব্দীতে এভেরাস, চতুর্দশে ইবন-খালদুনের মতো দু-একজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎ পেলেও সাধারণভাবে একাদশ শতাব্দী থেকেই ইসলামিয় বিজ্ঞানের পতনের কাল বলে আমরা ধরে নিতে পারি। বাইজানটাইন ও ইসলামিয় সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য যে-বিরাট সংগঠনের দরকার ছিল, সেটা রাখা যেমন সম্ভব হচ্ছিল না, ক্রুসেডের সময় সাম্রাজ্য ভেঙে অনেকগুলি ছোট ছোট সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো (এরা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদে ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের থেকে দুর্বল ছিল) তার ওপর তুর্ক ও মোঙ্গলদের আক্রমণ শুরু হলো। অবশ্যই আমরা এখানে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অবনতির দিকটাই দেখব।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ইয়োরোপ

ওদিকে প্রাচ্যে, ভারতে ও আরব দেশগুলিতে যখন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগ চলছে, ইয়োরোপে চলছে তখন অন্ধকার যুগ। রোমক সাম্রাজ্যের পরে, পঞ্চম শতাব্দী থেকে সামন্ততন্ত্র কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জগতে স্থিতাবস্থা দেখা দিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে জমি-নির্ভর, আর তার সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনের কঠিন নিগড়ে সব কিছু আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। বার্নাল বলছেন :

"The professed attitude at the medieval church to human affairs had been... that life in this world was a mere preparation for an eternal life in hell or heaven, an attitude which only gradually weakend with the undeniable improvement of human conditions, but was not to be blown away till the Renaissance. In practice, however, the church took a shrewd interest in the affairs of this world, and was deeply involved in the maintenance of the feudal order." [পৃ. ২৯৩-৯৪]

আরব ও প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞান এই খানিকটা অনড় সামন্ততান্ত্রিক জগতে আলোড়ন আনবার চেষ্টা করেছে। একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দীতেই প্রধান প্রধান আরব ও গ্রীক বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলিকে লাতিনে তর্জমা করা হয়েছে। তখনও ছাপাখানার সৃষ্টি হয়নি বলে হাতে-লেখা এই পুস্তকগুলির প্রচার অবশ্যই

খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। আর আরিস্টটল-প্লেটো অধ্যুষিত গ্রীক দর্শনের রক্ষণশীল ভাবধারাটি এবং স্থিতাবস্থাকে নিয়ম হিসাবে মেনে নিয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছিল।

মধ্যযুগের বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে চার্চ ও মধ্যযুগীয় খৃষ্টানী চিন্তাধারার নিশ্চয়ই অবদান আছে। তাহলেও দ্বাদশ, বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এমনই একটা বহুলাংশে অবাস্তব এবং কেবলই পুঁথিগত বিদ্যার তর্কজালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে যে, রেনেসাঁসের যুগে যখন এ-থেকে মানুষের খানিকটা মোহমুক্তি হলো, তখন রেনেসাঁসের চিন্তাবিদরা একে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কেবল 'Gothic barbarism' হিসাবেই দেখেছেন। ইতিহাসের বহু দূরের ব্যবধানে আজ আমাদের পক্ষে এর যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব। বার্নাল বলছেন :

"Medieval science as a whole must be treated as the end rather than the beginning of an intellectual movement. It was the final phase of a Byzantine-Syriac-Islamic adaptation of Hellenistic science to the conditions of a feudal society. It arose as a consequence of the breakdown of the old classical economy and was in turn to decay and vanish with that of the feudal economy that succeeded it." [পৃ. ৩০৫]

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শহর, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প (শিল্পবিপ্লব অবশ্য ঘটেছে অনেক পরে) গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং বিশেষ করে ঠিক এই সময়েই (১৪৫০—১৬৯০ খৃষ্টাব্দ) ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদন-ব্যবস্থার তাগিদে বিজ্ঞানের জগতে ক্রমশই পরীক্ষানিরীক্ষার ও নতুনভাবে সবকিছু হিসাব করে যাচিয়ে নেবার প্রয়োজন দেখা দিল। ব্যবহারিক ও প্রয়োগপদ্ধতি, তথা প্রয়োগবিদ্যাগত সমস্যা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ঔপপত্তিক প্রশ্নাবলী, আবার ঠিক ঠিক ঔপপত্তিক বিচারের সঠিক সমাধান থেকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রয়োগবিদ্যাশিল্প ও প্রয়োগপদ্ধতি। বার্নাল বলছেন : "The transformation was a complex one; changes in techniques led to science and science in turn was to lead to new and more rapid changes in technique. This combined technical, economic, and scientific revolution is a unique

social phenomenon. Its ultimate importance is even greater than that of the discovery of agriculture, which had made civilization itself possible, because through science it contained the possibilities of indefinite advance." [পৃ. ৩১৩]

মানুষ আর এখন থেকে প্রকৃতির হাতে অন্ধ ক্রীড়নক হয়ে থাকতে রাজি নয়। সে প্রকৃতির শক্তিকে অনুধাবন করে তাকে নিজের কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিকে বশে আনতে চায়। চিন্তাজগতে এই বৈপ্লবিক মনোভাব, বার্নালের ভাষায় 'বৈজ্ঞানিক' বিপ্লবের গুরুত্ব, কৃষিকর্ম আবিষ্কারের থেকেও অধিক। মোটামুটি এর তিনটি স্তর, যদিও একই প্রক্রিয়া রূপায়িত হচ্ছে তিনটি স্তরে। প্রথম রেনেসাঁস, ১৪৪৬-১৫৪০ ; দ্বিতীয় ধর্মীয় যুদ্ধ (Wars of Religion), ১৫৪০-১৬৫০, তৃতীয় পুনরুদ্ধার (Restoration), ১৬৫০-৯০।

রেনেসাঁসের সময়ে বিরাট দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযান, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার, প্রভৃতি; দ্বিতীয় স্তরে আমেরিকান মহাদেশে ও প্রাচ্যদেশে বসতি ও বাণিজ্যবিস্তার, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ বুর্জোয়া বিপ্লব ; তৃতীয়ত খানিকটা রাজতন্ত্র ফিরে এলেও ওলন্দাজ ও ইংরাজ বুর্জোয়ার নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন—অবশ্য ভের্সাইতে তখনও চলছে ফরাসী সামন্ততন্ত্র, আরো একশ বছর পরে সেখানেও ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) দ্বারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হলো।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরই পাল্টাপাল্টি আমরা দেখছি, প্রথম স্তরে কোপারনিকাসের দ্বারা সূর্য-কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণাতে গত দু-হাজার বছরের আরিস্টটল অধ্যুষিত চিন্তার পরাজয়। দ্বিতীয় স্তরে কেপলার, গ্যালিলিওতে তার আরো পূর্ণতর রূপ, গ্রহাদির উপবৃত্তাকারে সূর্য প্রদক্ষিণের নিয়ম আবিষ্কার প্রভৃতি এবং হারভে আবিষ্কার করলেন মানবদেহে রক্ত চলাচলের নিয়মকানুন। তৃতীয় স্তরে বৈজ্ঞানিক সভাসমিতি, রয়্যাল সোসাইটি প্রভৃতি গঠিত হয়ে বিজ্ঞান জগতে নতুন সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল, সর্বোপরি কোপারনিকাস থেকে কেপলার-গ্যালিলিওর নতুন সমন্বয় পাওয়া গেল নিউটনে, তাঁর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারে, গতিবিদ্যার তিনটি নিয়মকানুনে, আলোর চরিত্রের নতুন অনুধাবনে। বলা যেতে পারে আরিস্টটলের স্থৈতিক ধারণার যুগ শেষ হয়ে নিউটনীয় গতিবিদ্যার যুগ শুরু হলো; গতিই যে বস্তুর অস্তিত্বের একমাত্র প্রকাশ (motion is the mode of existence of

matter), যেটা এঙ্গেলস আরো দুশ বছর পরে দেখিয়েছেন, সেই বস্তুবাদী দর্শনের গোড়াপত্তন হলো এই যুগে। এর পর থেকে প্রকৃতির রাজ্যে জয় ঘোষিত হলো বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সম্পর্কের। সবই যদি কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা চালিত হয় তো ভগবান বা অজ্ঞেয় ঈশ্বরিক শক্তির স্থান কোথায়? নিউটন ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, রফা করলেন—আদিতে ঈশ্বর একবার ঘড়িতে দম দেওয়ার মতো চালিয়ে দিয়েছেন, তারপর থেকে বরাবর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারণ সম্পর্কে বাঁধা।

নিউটনের প্রায় একশ বছর পূর্বেই ভেসালিয়াস (১৫১৪-৬৪) শরীরদেহে হাড়ের সংস্থান প্রভৃতি, এক কথায় এনাটমি, আবিষ্কার করেছিলেন। তারো কিছু পূর্বে রেনেসাঁসের বিরাট পুরুষ লিওনার্দো দা ভিন্সির মধ্যে আমরা পাচ্ছি একাধারে চিত্রকর, স্থাপত্যবিশারদ ও এনজিনিয়ার। দা ভিন্সির মধ্যে রেনেসাঁসের বিরাট আশা ও ব্যর্থতা, দুই-ই আমরা পাই। তিনি ইতালির অন্যতম বড চিত্রকর—অনুশীলন করেছেন আলোকবিদ্যা, এনাটমি, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং পৃথিবীর জমি। তাঁর অধুনা আবিষ্কৃত নোটবুকে আমরা পাচ্ছি গতিবিদ্যা ও জল উচ্চে পাম্প করার নানারকম ব্যবস্থা। এমন কি তিনি আকাশে উডবার যন্ত্রেরও রেখাচিত্র রেখে গেছেন। ব্যর্থতা—কারণ তখনকার বিজ্ঞান এমন কোনো শক্তি তখনো আয়ত্ত করতে পারেনি (বাষ্প-শক্তি বা তৈলজাত শক্তি), যাতে কেবলমাত্র মানুষের মাংসপেশীর শক্তি ছাডা এই সমস্ত উদ্ভাবনকে কাজে লাগানো যায়।

যাই হোক, এরিস্টটল-অধ্যুষিত স্থৈতিক ধারণা ও চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হলো। সমুদ্রযাত্রার পথ খুলে গেল, কম্পাস ও চৌম্বকশক্তির বহুল ব্যবহার হতে লাগল। কাঠের বদলে কয়লা থেকে জ্বালানীর ব্যবহার শুরু হয়ে গেল। ব্লাস্ট ফার্নেস, লোহা থেকে স্টীলের উৎপাদন, এককথায় কারুশিল্পের উন্নতি হতে লাগল দ্রুতবেগে। টেলিসকোপ, গতিবিদ্যা, অনুবীক্ষণ যন্ত্র এবং বীজগণিত ও নিউটনের আবিষ্কৃত ক্যালকুলাসের বহুল ব্যবহারে গ্রীক জ্যামিতির প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকলেও তার ব্যবহার কমে গেল। এই সময়েই বয়েল প্রভৃতির দ্বারা পূর্বেকার কিমিয়াবিদ্যা-অধ্যুষিত রসায়ন শাস্ত্রকে উদ্ধার করে তাকে আধুনিক রূপ দেওয়া সম্ভব হলো।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। মোদ্দা এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ফলে পরের দুই শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের পথ খুলে গেল।

বিংশ শতাব্দী

আলোচ্য তৃতীয় সংস্করণের (১৯৬৫) জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত ভূমিকায় প্রফেসার বার্নাল গোড়াতেই বলেছেন, পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ লেখার সময়েই (পুস্তকটি প্রথম লেখা হয় ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে) তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়েছিল যে, বিংশ শতাব্দীকে গোটা একক ভাবে উপস্থিত করা চলে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন, ১৯৪০ সাল থেকেই, এর চরিত্র পূর্বের চল্লিশ বছর থেকে পাল্টে গেছে। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি এলো পারমাণবিক বোমা, পরমাণুর বিভাজন (nuclear fission) ; পঞ্চাশ দশকের শুরুতেই পারমাণবিক সঙ্গমের দ্বারা (nuclear fusion) হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করা সম্ভব হলো। প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া হলো তাপ-পারমাণবিক (thermo-nuclear) ; অর্থাৎ একটি এ্যাটম বা পারমাণবিক বোমাকে বিস্ফোরণ করে তৎসঞ্জাত তাপ থেকে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গম সাধন করে একটি হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত করে দারুণ, প্রায় অমোঘ, শক্তি নিয়ে ধ্বংসকারী হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হলো। হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসশক্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, সত্যই মানব সভ্যতাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত করে দেবার বিধ্বংসী ক্ষমতা আজ মানুষের করায়ত্ত। প্রসঙ্গত, সূর্যের প্রচণ্ড তেজঃশক্তির রহস্যের পেছনেও রয়েছে হাইড্রোজেন পরমাণুর হিলিয়ামে রূপান্তরণ। সমগ্র মানব সমাজের সামনে কাজেই আজ প্রশ্ন—সূর্যশক্তিবলে বলীয়ান মানুষ তার বিজ্ঞানকে কি ভাবে প্রয়োগ করবে—ধ্বংসের না কল্যাণের, মৃত্যুর না জীবনের জন্য।

বিজ্ঞানী আজ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। মানুষের ঐতিহাসিক অগ্রগমনে বিজ্ঞানের প্রভাব আজ সরাসরি প্রত্যক্ষ ভাবে পড়ছে। সেজন্যই যেমন বিজ্ঞানশিক্ষার সংগঠন করতে হবে পরিকল্পিত ভাবে, তেমনি বিজ্ঞানীকে কেবলমাত্র তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার নিভৃত গজদন্তমিনারে বাস করলেই চলবে না—তাঁকে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের সঙ্গে রোজানা জীবনের সংগ্রামের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সামিল হতে হবে। প্রফেসার বার্নাল, লোকান্তরিত জোলিও-আইরীন কুরী, লোকান্তরিত হলডেন, লোকান্তরিত মেঘনাদ সাহা, আজকের অধিকাংশ নমস্য বিজ্ঞানী পুগওয়াস কনফারেন্সে মিলিত হয়ে রায় দিয়েছেন শান্তির সপক্ষে। তৃতীয় পুগওয়াস কনফারেন্স-এ (১৯৫৮) তাঁরা বলেছেন :

"We believe it to be a responsibility of scientists in all countries to contribute to the education of the peoples by spreading among them a wide understanding of the dangers and potentialities offered by the unprecedented growth of science. We appeal to our colleagues everywhere to contribute to this effort, both through enlightenment of adult population, and through education of the coming generations. In particular, education should stress improvement of all forms of human relations and should eliminate any glorification of war and violence.

"...The increasing material support which science now enjoys in many countries is mainly due to its importance, direct or indirect to the military strength of the nation and to its degree of success in the arms race. This diverts science from its true purpose, which is to increase human knowledge, and to promote man's mastery over the forces of nature for the benefit of all.

"We deplore the conditions which lead to this situation, and appeal to all peoples and their governments to establish conditions of lasting and stable peace." [পৃ. ১১৬৩-৬৫]।

একদিকে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম চলবে, যার ক্ষেত্র খানিকটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, অন্যদিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও রিসার্চের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। বার্নালের মতে আমাদের এখনও কোনো Science of Science নেই—বৈজ্ঞানিক রিসার্চের পরিকল্পনা কোনো নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে এবং রিসার্চ চালাবার কোনো পূর্বপরিকল্পিত কাঠামো তৈরি করা হয় না। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক রিসার্চের পথে প্রায়শই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুরনো বস্তাপচা মতাদর্শের প্রভাব, যেমন ধরা যাক, অনুন্নত দেশগুলিকে যখন সাহায্য দেওয়া হয় তখন আমরা কেবল নতুন টেকনিকের বা প্রয়োগপদ্ধতির কথাই বলি, কিন্তু যে পুরনো অকেজো সামাজিক ব্যবস্থা ও তৎসঞ্জাত অভ্যাস থেকে অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে কখনও কিছু বলা হয় না। একথা আমাদের পাণ্ডা-পুরুত, হাঁচি-টিকটিকির ঠিকুজি-কুষ্ঠির দেশে যে কত সত্য সে তো আমরা প্রত্যহই দেখে থাকি। খবরের কাগজে পড়ি যে, গুরুতর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পেছনে

গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব, জ্যোতিষীদের মারফৎ, কাজ করছে। এজন্যই চাই কেবল বিজ্ঞানশিক্ষা নয়, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সৃষ্টি, অর্থাৎ, শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী মনোবৃত্তি তৈরি করার উপযোগী করে।

একেবারে পরিশেষে বার্নাল তাই তাঁর পরিচ্ছেদের শিরোনামা দিয়েছেন : 'The World's Need of Science'। তিনি বলছেন :

"The major conclusion that arises from a study of the place and growth of science in our society is that it has become too important to be left to scientists or politicians, and that the whole people must take a hand in it if it is to be a blessing and not a curse....The world is threatened as never before with the twin dangers of war and famine." [পৃ. ১২৯৯-১৩০০]

বিজ্ঞান আজ একদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর অভ্যন্তরে, অন্যদিকে বিশাল মহাকাশের বিরাট পরিধিতে দুর্দমনীয় বেগে অগ্রসর। পরমাণুর ক্ষুদ্র আর মহাকাশের বিস্তীর্ণ জগৎ—যেন গ্যালিভারের লিলিপুট আর ব্রবডিগন্যাগের দুই দেশ—দুই দেশেই নব নব বিস্ময় বিজ্ঞানীর জন্য অপেক্ষা করছে। এরই সঙ্গে ইলেকট্রনিক কমপিউটার যন্ত্রের উৎকর্ষের ফলে মানুষের একঘেয়ে শ্রমসাধ্য কাজ করার প্রয়োজন হবে না, যদিও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা-প্রথা তুলে দিয়ে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই এর সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব। আর তারই ফলে অপর্যাপ্ত উৎপাদনের পথ খুলে গেলে একদিন কেবল সমাজতন্ত্র নয়, পুরো সাম্যবাদী সমাজের অনাবিল প্রাচুর্যে উত্তরণ সম্ভব, যেখানে মানুষ কাজ করবে তার নিজের তাগিদে, গ্রহণ করবে তার প্রয়োজনমতো। প্রয়োজন থেকে মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির (from the realm of necessity to the realm of freedom—এঙ্গেলস) সুপ্রভাতের অরুণরাগ তো আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। দেখছি প্রাক-ইতিহাসের কাল শেষ হয়ে মানুষের আসল ইতিহাসের সূচনা।

গান্ধী-পরিক্রমা

নারায়ণ চৌধুরী

মহাত্মা গান্ধী-জন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে প্রকাশিত 'গান্ধী-পরিক্রমা' বাঙলা সঙ্কলন গ্রন্থখানি নানা কারণে একটি উল্লেখ্য সঙ্কলন। প্রথমত, যে-মহৎ মানুষের নামাঙ্কিত হয়ে এই সঙ্কলনগ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তির বৎসরে এইরূপ একখানি স্মারক-সঙ্কলনের খুবই প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, বাঙলাদেশ ও বাঙলাদেশের বাইরে গান্ধীতত্ত্ববিদ্‌রূপে সচরাচর যাঁরা পরিচিত—তাঁদের প্রায় সকলেরই রচনা এতে সন্নিবিষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। (বাঙালি লেখকদের হিন্দী ও ইংরেজি রচনা বাঙলায় তর্জমা করে দেওয়া হয়েছে)। তৃতীয়ত, এক আধারে গান্ধীচিন্তার বহু বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এতো অধিক সংখ্যক রচনার প্রকাশ (সঙ্কলনে সর্বশুদ্ধ রচনার সংখ্যা পঞ্চাশ এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৭৪) এর আগে আর বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি।

বিষয়ের বৈচিত্র্য স্বতই পাঠককে আকৃষ্ট করবে। গান্ধীজীর ধর্মচিন্তা, মানবপ্রেম, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, সত্যাগ্রহ, শিক্ষাদর্শ, অর্থনৈতিক দর্শন, সমাজবাদ, গঠনকর্ম, হরিজন-উন্নয়ন, সাম্প্রদায়িক-মৈত্রী-প্রয়াস, নারীকল্যাণ প্রভৃতি বহু বিষয় লেখকদের আলোচনার অন্তর্গত হয়ে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বলাই বাহুল্য, বিষয় নির্বাচনে লেখকগণ নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী চালিত হয়েছেন। কিন্তু সব জড়িয়ে তাঁদের প্রচেষ্টার মিলিত ফল হয়েছে উপাদেয়। আমরা বাঙলায় গান্ধী-ভাবধারা সম্পর্কে একখানি সুন্দর আলোচনামূলক গ্রন্থ উপহার পেয়েছি।

এই গ্রন্থের যিনি সম্পাদনা করেছেন—শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনি গান্ধী-গঠনকর্মীমহলে সুপরিচিত। তদুপরি সুলেখকও বটেন। বাঙলায় গান্ধীজীর অনেকগুলি গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন, এ ভিন্ন গান্ধীবাদের

গান্ধী পরিক্রমা। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পনেরো টাকা

একাধিক দিক নিয়ে লিখিত স্বাধীন আলোচনাগ্রন্থও তাঁর আছে। তাঁর সম্পর্কে আরও একটি কথা এই যে, গান্ধী-ভাবাদর্শের অবলম্বনে দুখানি উপন্যাসেরও তিনি স্রষ্টা। মোট কথা, গান্ধীসংক্রান্ত সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশের নিঃসংশয় যোগ্যতা তাঁর আছে, এবং সে যোগ্যতার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন এই সঙ্কলনে।

সঙ্কলিত রচনাসমূহের রচয়িতার মধ্যে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, জাকির হোসেন, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, জে. বি. কৃপালনী, বিনোবা ভাবে, আর. আর. দিবাকর, জয়প্রকাশ নারায়ণ, কাকাসাহেব কালেলকর, শঙ্কররাও দেও, দাদা ধর্মাধিকার, ইউ. এন. ঢেবর, মনমোহন চৌধুরী প্রমুখ অবাঙালি লেখক থেকে শুরু করে বাঙলার খ্যাতনামা গান্ধীতাত্ত্বিকগণ—যথা, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, রেজাউল করীম, ধীরেন্দ্র মজুমদার প্রমুখ অনেকেই আছেন। গান্ধী-গঠনকর্মের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট অথচ গান্ধী-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিছু সংখ্যক মূলত সাহিত্যসাধক কিংবা সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীও আছেন—যথা অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রমথনাথ বিশী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কানাই সামন্ত, অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত প্রভৃতি। এককালীন বিপ্লবী অথবা ইদানীংকার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে আছেন—নলিনীকিশোর গুহ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, হুমায়ুন কবীর, অরুণচন্দ্র গুহ, হরিদাস মিত্র, কমলা দাশগুপ্ত প্রভৃতি। এঁরা ছাড়া আরও লেখক-লেখিকা আছেন যাঁরা অপেক্ষাকৃত অপ্রবীণ-বয়সী ও স্বল্পখ্যাত। খুব সম্ভব গান্ধী-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার জন্যই সম্পাদক মহাশয় এঁদের রচনা-সম্ভার দ্বারা সঙ্কলনের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন।

উপরে যে-নামতালিকা পেশ করা হয়েছে, তা একটু দীর্ঘ হলেও নিছক সংবাদ হিসাবে পেশ করা হয়নি। তার একটি উদ্দেশ্য আছে। সে-উদ্দেশ্য হলো এটা প্রতিপাদন করা যে, এই সঙ্কলনের একটি বিশেষ শ্রেণীগত চরিত্র আছে এবং সে-শ্রেণীগত চরিত্র হলো মূলত রক্ষণশীল। অর্থাৎ সম্পাদক এখানে যেসব মনীষী-লেখকদের একত্র সমাবেশ করেছেন, তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতবিদ্য এবং গান্ধী-চিন্তাচর্চায় বিশেষ পারঙ্গম হলেও, আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল

গণতান্ত্রিক চিন্তার যে উদ্বেল আলোড়ন চলছে, তার সঙ্গে তাঁদের তেমন যোগ নেই। গান্ধী-অনুশীলনের যে-একটি স্তুতিবিবর্জিত বিচারপরায়ণ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার ঐতিহ্য মূলত যুক্তিবাদী লেখকদের মধ্যে ইদানীং সৃষ্টি হয়েছে, সে-ঐতিহ্যের বা প্রভাবের কোনো ছাপ পড়েনি এই সঙ্কলনের রচনাবলীর মধ্যে। অধিকাংশ রচনাই ভক্তিবাদচর্চিত ও পুনরাবৃত্তিমূলক। একই কথা একাধিক প্রবন্ধে প্রায় একই ছাঁচে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হয়েছে। রচনাগুলি পড়তে পড়তে কখনও কখনও এমন পর্যন্ত মনে হয়েছে, গান্ধী-আলোচনার একটা বিশেষ পরিভাষারই বুঝি সৃষ্টি হয়েছে বাঙলা সাহিত্যে, আর বিভিন্ন লেখক সেই পরিভাষা, এঁর থেকে তিনি তাঁর থেকে ইনি, ধার করে ব্যবহার করছেন। এক সত্যাগ্রহের উপরে পাঁচটি কি ছটি লেখা আছে, অহিংসার উপরেও প্রায় সমসংখ্যক রচনার সমাবেশ করা হয়েছে। রচনাশৈলীর ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে এই দুই বিষয় সম্পর্কিত রচনাসমূহের বক্তব্য প্রায় এক। বিষয় দুটির উপর নতুন আলোকপাতের চেষ্টা দেখা যায় না। যে-বিচারনিষ্ঠ মন ও বৈজ্ঞানিক মেজাজ থাকলে অভ্যস্ত বিষয়েরও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন সম্ভব হয়, তেমন মনন ও মেজাজের পরিচয় এ-বইয়ের রচনাক্রমের ভিতর আশানুরূপ মাত্রায় পাওয়া যায় না। এই বই সম্পর্কে এটা একটা লক্ষ্য করবার ব্যাপার। অবশ্য এ-কথার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়—রাধাকৃষ্ণণ, বিনোবা ভাবে, নির্মলকুমার বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, মনমোহন চৌধুরী প্রমুখের রচনাকে ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এ-বাদে অধিকাংশ রচনারই গোত্রলক্ষণ এক, দেখবার ভঙ্গি এক, লিপিরীতিও বুঝি, যে কথা একটু আগেই বলেছি, কম-বেশি এক। "জাতীয়তা"র একচেটিয়া কারবারি, কথায় কথায় "দেশপ্রেম"-এর বুলি আওড়ানো আত্মগর্বী অসহিষ্ণু ভাবুক, কংগ্রেসের খোঁটায় বাঁধা সাম্যবাদ-বিদ্বেষী যত, সব এক গোয়ালের গোরুকে সম্পাদক মশাই পুণ্য গান্ধী-স্মরণের এই শ্রীক্ষেত্রে এনে একত্র হাজির করেছেন। সম্পাদকের গান্ধীনিষ্ঠায় ও যোগ্যতায় সন্দেহ করি না, কিন্তু তাঁর শ্রেণীস্বরূপ কী—এই লেখক-সমাবেশের ধারা-ধরন থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

তবে যে গোড়ায় সঙ্কলনটিকে "উপাদেয়" বলেছি, "সুন্দর" বলেছি, সেগুলি কি কথার কথা? না, তা নয়। লেখক রক্ষণশীলই হোন আর যা-ই হোন, তিনি যদি কৃতবিদ্য আর জনজীবনের সঙ্গে দীর্ঘকাল

সংযুক্ত থাকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন—তাহলে তাঁর লেখায় এক ধরনের শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটে, যাকে প্রগতিবাদীর পক্ষেও অস্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। পাঠকের মনের উপর কেটে বসবার পক্ষে লেখকের ব্যক্তিত্বের ভার একটা মস্ত উপযোগী বস্তু। একথা মানতেই হবে যে, সে-রকম ব্যক্তিত্বের ভার ও শক্তিমত্তার ধার এই সঙ্কলনের একাধিক বর্ষীয়ান লেখকের লেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁদের অভ্যস্ত পরিচিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে গতানুগতিক মানসিক গঠনের সীমার মধ্যে থেকেই তাঁরা অনেক সারগর্ভ কথা উচ্চারণ করেছেন। তাঁদের কথার সারগর্ভতা আরও প্রত্যয়যোগ্য হয়েছে এ-কারণে যে, এই সঙ্কলনের সাধারণ মিলনভূমিতে তাঁরা বিতর্কিত দলীয় রাজনীতির ডালি নিয়ে উপস্থিত হননি, এসেছেন মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ সাজিয়ে। পুণ্যনাম কীর্তনের একটা আশ্চর্য জাদুপ্রভাব আছে। সঙ্কীর্ণচিত্ততার শ্রদ্ধার তুল্য প্রতিষেধক আর-কিছু নেই। এখানে সেই ব্যাপারটিই ঘটেছে। গান্ধীজীর সুমহান ব্যক্তিত্বের অমোঘ প্রভাব এইসব প্রতিক্রিয়াশীল কিন্তু শক্তিমান চিন্তাচর্চাকারীদের ক্ষতিকর ভূমিকাকে সাময়িকভাবে হলেও সুনিশ্চিতভাবে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কৃপালনী, প্রফুল্ল ঘোষ, ইউ. এন. ঢেবর, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ ভারতীয় রাজনীতির কট্টর সাম্যবাদবিদ্বেষী নেতাদের নাম করতে পারি। এঁদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা সুবিদিত, কিন্তু এই গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধে গান্ধীজীর প্রতি তাঁদের অন্তরের অকপট শ্রদ্ধাই নিবেদন করেছেন; সেই গান্ধীজী—যিনি অহিংসার মূর্ত প্রতীক, অহিংস সমাজবাদের ধারক ও বাহক, সাম্প্রদায়িক মিলনের শ্রেষ্ঠ অগ্রদূত, সর্বোপরি মানবমুক্তির সাধক। কৃপালনীজী তাঁর প্রবন্ধে ('অহিংসা ও গান্ধী') গান্ধীজীর কর্মপ্রণালীর এতাবৎ অনালোচিত একটি নবতম বৈশিষ্ট্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—sense of urgency—সম্পাদক যার তর্জমা করেছেন "ত্বরিৎ-মানসিকতা"। গান্ধীজী কোনো একটা কাজের সন্দেহাতীত সময়োপ-যোগিতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আশু তাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। এ-কথার প্রমাণ হিসাবে লেখক ১৯৪২ সালের আগস্টে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের দ্বিধাগ্রস্ততা অগ্রাহ্য করে "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাবকে তখন-তখুনি কার্যকর করবার জন্য গান্ধীজীর ব্যাকুলতার উল্লেখ

করেছেন। ওই ব্যাকুলতারই সোচ্চার বাণীরূপ হলো : "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"। লেখকের ভাষায় : "ঝটিকা বেগে তিনি (গান্ধীজী) স্বরাজের রাজ্য অধিগত করতে চেয়েছিলেন।"

'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের অরুণচন্দ্র গুহ তাঁর 'গান্ধীজী ও ভারতবিভাগ' প্রবন্ধে নানাবিধ তথ্যপ্রমাণের সহযোগে ভারতবিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হবার সময়কার কংগ্রেসের মানসিকতার বিশ্লেষণ করেছেন এবং সুস্পষ্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কী অবস্থায় পড়ে গান্ধীজীকে কংগ্রেস নেতৃবর্গের ভারত-বিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হয়েছিল তার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। দলিল-মূল্যের দিক দিয়ে প্রবন্ধটির গুরুত্ব অসাধারণ। অনুরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভারসমৃদ্ধ রচনা হলো অরুণচন্দ্রেরই সহকর্মী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত-লিখিত 'বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন' নামক সুবিস্তৃত প্রবন্ধটি। এই প্রসঙ্গে সুযোগ্য লেখক গান্ধীজীব সঙ্গে বাঙলার বিপ্লববাদীদের মত-সংঘাত ও পরিণামে সংস্পর্শের ও সহযোগিতার কাহিনীটি সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। দুজন এককালীন বিপ্লবীব লিখিত এই দুই তথ্যাশ্রয়ী রচনা আলোচ্য সঙ্কলনের দুটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যায়।

গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব থেকে যে-কটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, তাদের ভিতর প্রখ্যাত দার্শনিক লেখক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের 'শতবার্ষিকীর অনুচিন্তন' প্রবন্ধটিকে নিঃসংশয়ে প্রথমের মর্যাদা দেওয়া যায়। তিনি বিশ্ব-ইতিহাসের পটভূমিকায় মহাত্মাজীর গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের শেষ দুটি ছত্র এইরূপ "ঘৃণা বিদ্বেষে উন্মাদ ও ভুল বোঝাবুঝির কারণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিশ্বে গান্ধী প্রেম ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার অমর প্রতীক। তিনি যুগ যুগের। তিনি ইতিহাসের।" সশ্রদ্ধ অনুরাগের অকপট নিদর্শনের নমুনা রূপে তারপরই নাম করতে হয় সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের 'শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে'। রচনাটির ছত্রে ছত্রে জয়প্রকাশজীর গান্ধীনিষ্ঠা ভাস্বর হয়ে উঠেছে, তবে গান্ধীর মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করার জন্য বামপন্থী চিন্তাদর্শে বিশ্বাসী বিপ্লবী দলগুলির প্রতি তির্যক খোঁচা তিনি তাঁর প্রবন্ধে না-দিলেও পারতেন। একেকে উচ্চে তুলে ধরতে হলে অপরকে টেনে নামাবার প্রয়োজন হয় না। বিশেষত গান্ধীজীর মতো ভারতের জনজীবনের এক সর্বাতিশায়ী ব্যক্তিত্বের আলোচনার বেলায় এই পরোক্ষ আক্রমণ-চেষ্টা তো আরও বিসদৃশ।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ব্যক্তিগতভাবে সৎ মানুষ, কিন্তু তাঁর মানসিকতায় সাম্যবাদ-বিরোধিতা একটা ব্যাধির মতো, যার আবেশ তিনি আজও কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। শ্রদ্ধান্বিত মনোভাবের আর একটি সুন্দর নিদর্শন পরলোক-গত রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের 'ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা গান্ধী' প্রবন্ধটি। তাঁর প্রবন্ধের একাংশ এইরূপ "অতীব নম্রতা ও আন্তরিকতা সহকারে আমি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। আমাদের এই যুগ কি এই জাতীয় এক মৌলিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নেতার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পাবে, যার ভিতর উচ্চতম মনীষার সঙ্গে বিশালতম হৃদয়ের সমন্বয় ঘটেছিল, যিনি ছিলেন একাধারে অত্যুচ্চ আদর্শবাদ ও মাটির পৃথিবীর বাস্তববাদী যোগ্যতার প্রতীক এবং যাঁর ভিতর অহিংসার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী কার্যক্রম মূর্ত হয়েছিল তাঁর গভীরতম সত্য ও করুণানিষ্ঠার মাধ্যমে?" এই প্রশ্ন আমাদেরও।

কাকাসাহেব কালেলকর ও শঙ্কররাও দেও এই সঙ্কলনের জন্য দুটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু ছোট হলেও দুটি প্রবন্ধই মূল্যবান। জাতীয় অনৈক্য তথা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধকরূপে কালেলকর ভারতের স্থানে স্থানে গান্ধীজীর আদর্শে আশ্রম খোলার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি কী বলছেন: "তবে কেবল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আশ্রমের অনুকরণ করলে লাভ হবে না। সর্বধর্ম ও সব প্রদেশের লোক একত্র থাকতে পারেন—তার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। **কেবল হিন্দু পরিবেশে কাজ হবে না।** যেমন যেমন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাবে তেমনি আশ্রম-প্রবৃত্তির প্রসার ঘটাতে হবে; গান্ধীশতবার্ষিকীতে এইটাই যেন প্রধান কর্মসূচী হয়।" (বড় হরফ এই আলোচকের)। কাকা কালেলকরজীর মতের বৈপ্লবিকতা লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে ক্ষমতার মোহ থেকে সতত-দূরে-অবস্থানকারী সত্যিকারের গান্ধী-গঠনকর্মের সাধক শ্রদ্ধেয় শঙ্কররাও দেওজীর প্রবন্ধের এই দুটি অংশ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য: ১। "গান্ধীজীর কাছে অহিংসা ছিল একটি সাধ্য বা লক্ষ্য (end), সাধন বা উপায় (means) নয়। তাঁর অন্তিম লক্ষ্য ছিল সত্য।" ২। "গান্ধীজীর মতে অহিংসার আচরণ ব্যতিরেকে আর কোন প্রকারে মানবীয় পটভূমিকায় সত্যের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং মানবীয় পটভূমিকায় না হলে যদিও তা সম্ভবপর হয় তবু গান্ধী সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি কাম্য মনে করতেন না।"

এ-বইয়ের একটি অনন্য রচনা আচার্য বিনোবা ভাবেজীর 'সত্যের সন্ধানে' প্রবন্ধটি। নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে যেমন সারবান, তেমনি রসরসিকতায় পরমস্বাদু। বোধহয় এই রচনাটিই একমাত্র ব্যত্যয়ী উদাহরণ যার ভিতর বক্তব্যের গাম্ভীর্যের সঙ্গে সাহিত্যের অন্যতম মনোজ্ঞ উপাদান পরিহাসের অনুপান মিশিয়ে বক্তব্যকে সুপথ্য করে তোলা হয়েছে। গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার ভিতর গোপনতার কোনো স্থান নেই—এই ভাবটিকে বিশদ করতে গিয়ে ভাবেজী তাঁর রচনার উপসংহারে পরিহাসতরল কণ্ঠে যে-কথা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না: "কিন্তু সত্যকে রক্ষা করবার জন্য ষড়যন্ত্রের আদৌ প্রয়োজন ঘটে না। যেমন দেখছি তেমনি বলতে হবে, যেমন আছে তেমনি করতে হবে। বড় বেশি হলে এই পন্থাশ্রয়ী মানুষকে এই পৃথিবীতে মার খেতে হবে। প্রহার যদি পড়েই তবে নিজ শরীরকে কিছুটা মজবুত করতে হবে—আর কি? প্রহার খেলে মনে করতে হবে নিজের ব্যায়াম হচ্ছে।"

এই বইয়ের সব রচনাই নিজ নিজ সীমার ভিতর অবশ্যপাঠ্য, পাঠ্য অথবা সাধারণ পাঠ্য; কিন্তু এই পাঠ্য-পরিকল্পনার কাঠামোর ভিতর চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর দুই পৃষ্ঠার রচনাটিকে ('গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের বনিয়াদ') কি না-ধরালেই চলত না? 'স্বতন্ত্রদল'-এর নায়ক-শিরোমণি ভারতীয় রাজনীতির 'আধুনিক চাণক্য' কুশাগ্রবুদ্ধি এই নবতিপর বৃদ্ধ চতুর মানুষটির সঙ্গে গান্ধী-ব্যক্তিত্বের কোথায় মিল আছে যে গান্ধীস্মৃতির অ্যালবামে তাঁর বাণীটিকেও গ্রথিত করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল? কথাটা হয়তো শুনতে খুব স্থূল শোনাবে, কিন্তু তাহলেও না-বলে পারছি না যে, গান্ধীজীর সঙ্গে রাজাগোপালাচারীর নৈকট্য শুধু তাঁদের দুজনার বৈবাহিক সম্পর্কে, অন্য কোনো যোগসূত্র নেই। রাজাগোপাল এমন এক "গান্ধীবাদী" যিনি গান্ধীজীর "অহিংসা-ভিত্তিক নবীন পদ্ধতি" সত্যাগ্রহের সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েতনামকে আণবিক বোমার দ্বারা বিধ্বস্ত করবার জন্য আমেরিকার কর্তাদের কাছে ধর্ণা দেন। ভিয়েতনামের অধিবাসীদের একটা অংশ কমিউনিস্ট—এই সে-দেশের অপরাধ। কূটনীতিজ্ঞ-চূড়ামণি তাঁর প্রবন্ধের একাংশে লিখছেন"বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপার অত সহজ নয়। যিনি আপনার মনে এত বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ হয়েছেন তাঁকে ভালবাসবেন কি করে? নিগ্রোরা

কিভাবে শ্বেতাঙ্গদের ভালবাসবেন? কোন স্বদেশপ্রেমী পাকিস্তানী কিভাবে ভারতবাসীদের ভালবাসবেন অথবা কোন ভারতীয় স্বদেশপ্রেমীই বা কি করে পাকিস্তানীদের ভালবাসতে পারেন?" সেই সঙ্গে তিনি আরও একটি প্রশ্ন যোগ করতে পারতেন: "একজন কমিউনিস্টবিদ্বেষী কি করে একজন কমিউনিস্টকে ভালবাসতে পারেন?" মোটেই পারেন না, কেননা রাজাগোপালাচারী বা তাঁর মতো মানুষদের দর্শন অনুযায়ী বিদ্বেষ যে মানবপ্রকৃতিতে সহজাত! রাজাগোপালদের গান্ধীবাদকে মানবিক না বলে দানবিক বলাই সঙ্গত। গান্ধীবাদের ছাপমারা এরকম লোক দেশে অনেক আছেন, সেইটে একটা কারণ যার জন্য ভারতে গান্ধীবাদের অগ্রগতি হচ্ছে না।

গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখিত কয়েকটি বিশেষজ্ঞোচিত প্রবন্ধের মধ্যে এই কয়টি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য: অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের গান্ধীজির ধর্মচিন্তা', রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের 'গান্ধীজির গঠনকর্ম', 'নয়ি তালিম'এর অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের 'গান্ধীজির শিক্ষাব্যবস্থা' এবং রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'গান্ধীজির অর্থনৈতিক দর্শনের গোড়ার কথা'। 'গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ' এই বিষয়টির উপর অন্যূন চারটি প্রবন্ধ আছে: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ', ক্ষিতীশ রায়ের 'দরশনে ভেল অনুরাগ', কানাই সামন্তের 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' ও সর্বশেষে প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস'। এর মধ্যে প্রথম রচনাটি অযত্ন-লিখিত; তৃতীয় রচনাটি অপটু; চতুর্থ রচনাটি আগাগোড়া অনুমাননির্ভর, আপ্তবাক্য-সংবলিত। দ্বিতীয় রচনাটিই যা কেবল সুপাঠ্য। সেটি নতুন তথ্যের যোগে কৌতূহলোদ্দীপকও বটে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙলা সাহিত্যে গান্ধীজী' বাংলা গদ্য-পদ্য রচনার উপর গান্ধীচিন্তার প্রভাবের বিষয়ে গবেষকের দৃষ্টিকোণপ্রসূত একটি তথ্যভারসমৃদ্ধ রচনা। দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'আমেরিকায় গান্ধীবাদ' একটি সুলিখিত নিবন্ধ—আমেরিকার নাগরিক সমানাধিকার আন্দোলনকারী নিগ্রো নেতাদের ভিতর গান্ধীভাবের প্রভাব সম্বন্ধে এতে অনেক জ্ঞাতব্য কথা পাওয়া যাবে।

বইয়ের ছাপা-বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদটি খুব সুন্দর। গেরুয়া রঙের পৃষ্ঠভূমির উপর কালো ও হলদের ছোপ দেওয়া আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা গান্ধীজীর মুখাবয়ব চমৎকার শিল্পকর্মের নমুনা।

'সংবাদ মূলত কাব্য'

অসীম রায়

একদা বিষ্ণু দে-ভক্তের খেদোক্তি—"যখন উনি কবিতা লিখতেন, এখনকার মতো রাজনীতি করতেন না"—শুনবার অব্যবহিত পরেই হাতে আসে 'সংবাদ মূলত কাব্য', কবির ষাট বছর বয়সের উপহার। যদিও এ-বইয়ের শুরু উনিশশো সাতচল্লিশের কবিতা দিয়ে এবং শেষ উনিশশো ছেষট্টিতে এসে এবং বরাবর তাঁর একপর্বের সঙ্গে অন্যপর্বের অচ্ছেদ্য বন্ধন লক্ষণীয়—তবু তাঁর ষাট বছরের জন্মদিনের পিঠে পিঠেই এ-গ্রন্থপ্রকাশের প্রতীকতা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না।

কারণ "আজো চেনা হল না নিজেকে"—বারে বারে মনে হলেও নতুন কালে নতুন করে নিজের মানসিকতার অভিক্ষেপ বুঝবার একাগ্রতা ও সজীবতায় 'সংবাদ মূলত কাব্য'র অনেক কবিতাই এক কোমল 'ধূসর আভায়' পরিব্যাপ্ত। 'ক্রেসিডা' কিংবা 'জন্মাষ্টমী'র রাজকীয় ঐশ্বর্যের পুনরাবৃত্তি নেই, নেই পরবর্তী সময়ের নদী-পাহাড়-আকাশ ব্যাপ্ত প্রকাণ্ড নিসর্গ; বেশির ভাগ কবিতাই পরিসরে ছোট এবং প্রায় সর্বত্র পাঠকের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা স্থাপনের ঔৎসুক্যে সরল। এ-সারল্য বহুদিনের চেষ্টা-অর্জিত।

প্রত্যেক কবির বিশ্বেই নিশ্চিত সাফল্যের জগত যখন কিছু নেই, যখন নিজের সাজানো বাগান উপড়ে ফেলে আবার বাগান নিড়োতে হয়, এমনকি চারপাশের ধাক্কায় ও নিজের তাগিদে চেনা জগত থেকে বেরিয়ে লেখক যখন আর-এক নতুন জগতে পা ফেলেন—তখন তাঁর আশেপাশের লোকজনের, তাঁর ভক্তদের, আশ্চর্য লাগে বৈকি। শুনেছি গয়টে বারেবারেই চমকে দিতেন তাঁর ভক্তদের। আমরা এই চমকানি বড় লেখকদের কাছ থেকে আশা করি। বিষ্ণু দে-র নতুন কাব্যগ্রন্থে যদি 'পদধ্বনি' ধ্বনিত না-হয়ে থাকে, তাহলে আমরা বরং খুশীই।

সঙ্গে সঙ্গে একথা বলারও প্রয়োজন যে রাজনীতি বনাম কবিতা অর্থে যে-

---

সংবাদ মূলত কাব্য। বিষ্ণু দে। সাহিত্যপত্রগ্রন্থ। ৯ কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। চার টাকা

অসহ্য যান্ত্রিক বালকোচিত বিতণ্ডা অনেক সময় মাথা চাড়া দেয়—তা বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কারণ গত চল্লিশ বছরব্যাপী সাধনায় তিনি বাঙলা কবিতার প্রকাশভঙ্গিতে যেমন এনেছেন এক পরিব্যাপ্ত সজীবতা, তেমনি আমাদের কাল এবং সে-কালের পটে ব্যক্তিমানসের সম্পর্ক স্থাপনেও তিনি নিয়ত-প্রয়াসী। প্রয়াসের কত রূপ, কত বৈচিত্র্য! কখনও যুক্তিবাহুল্যের গাম্ভীর্যে উদ্ভাসিত:

"যখন পাণ্ডব আর কৌরবকে চেনা হয় ভার,
যখন আশঙ্কা আশা সদসতে প্রায় বিশ্বরূপ,
তখন সে বলে নিজ হৃদয়কে: জ্বেলে ধরো ধূপ
দুর্বিষহ যন্ত্রণাকে, অন্ধকারে গোপন রাত্রিতে,
এবং পারো তো, দিনে, সূর্যালোকে গন্ধের সম্ভার—
নিঃসঙ্গ আরক্ত ভোরে, হয়তো বা একার সন্ধ্যার
গোধূলি বিষাদে কিংবা বর্ণাঢ্য মেঘলা মহাকাশে।"

কখনও অশ্বত্থ ও বটের রূপকে খুঁজে পান নিজের বয়স্ক মানসিকতার চেহারা:

"নিজের শতাব্দী বট জানে
সে মরে না পঞ্চাশে বা ষাটে।
যতই না পাতা পুড়ে খাক্‌
ডালপালা গলে' কুম্ভীপাক,
শিকড়ের অভিযান ইঁটে—
জীবনের আত্মবহা দায়ে—
মাথা কুটে পাঁচিলে পাঁচিলে,
কপালে হাজার কালশিটে,—
যদি কোনও সহায় শৈবালে
উদ্ভিদে মানুষ হওয়া যায়॥"

বিষ্ণু দে-র এই রাজনীতি তাঁর 'পদধ্বনি' কবিতার যুগ থেকেই আমাদের মন টানে। কারণ লেখক ও শিল্পীর কাছে রাজনীতি যে কতকগুলো বিপ্লবী নেতার নামের মিছিলে পর্যবসিত কয়েক পংক্তি হরিনাম নয়, তা আমাদের ভিতর ও বাহিরের সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য—একথা বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যার ফলে খারিজ

হয়। লেখক যদি "দৈনিকে বা সাপ্তাহিকে উৎকর্ষের গরিমা" না-খুঁজে "রচনাবলীর সমগ্রতা" খোঁজেন, তাহলে তাঁর এই রাজনীতি অপরিহার্য। কারণ এক প্রবল তন্ময়তার সঙ্গে সঙ্গে সদাজাগ্রত চোখ-কান খোলা রাখবার চেষ্টায় যে-অপরিহার্য সমন্বয়—তা যদি বাদ পড়ে, তাহলে তো শিল্পসাহিত্যের পাট উঠে যাওয়াই ভালো। এই অন্তর-বাহিরের সমৃদ্ধ সমন্বয়ের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলেই লেখক অর্জন করেন সেই দুর্লভ নৈর্ব্যক্তিকতা, যা শিল্পসাহিত্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

বেশ কিছুদিন থেকেই যৌবনের অস্তাচল পার হয়ে কবি এমন এক জায়গায় এসেছেন, যখন :

"তবু রক্তে হিম হাওয়া ঝরে, বালি ওড়ে, ওঠে চর,
বর্তমান চতুর্দিকে পেশীতে গ্রন্থিতে শিথিলতা,—
শিশুর কৌতুক-সঙ্গী, যৌবনের করুণার পাত্র,
যদিচ বিশুদ্ধ তীব্র জিজ্ঞাসায় মগ্ন আবিলতা
নেই, নেই আত্মময় লোভ আর ক্লান্তি। একমাত্র
বলা যায়, নিজেই নিজের কাছে প্রায় হাস্যকর।
অথচ এও তো সত্য বৃদ্ধ রক্তে হৃদয় স্বাধীন।" [রক্তে মাঘ]

প্রৌঢ়ত্বের এমন সত্যনিষ্ঠ চেহারা বাঙলা কবিতায় বিরল। যৌবনের জন্যে যেমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া নেই, তেমনি নেই কোনো ঔপনিষদিক প্রশান্তি খুঁজবার প্রয়াস। একই সঙ্গে নিজের কাছে হাস্যকর এবং আত্মময় লোভমুক্ত ক্লান্তিহীন স্বাধীন হৃদয়ের খোঁজ দেন কবি। 'বহুসূর্য অস্তগত', 'আজকে জানি আনাড়ি যৌবন' এবং আরও কয়েকটি কবিতায় এ-সুর ধ্বনিত।

বোধহয় 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' গ্রন্থের সমসাময়িক কাল থেকেই কবির আর-এক দিকে দৃষ্টি আমাদের চোখে পড়ে। চারপাশের ছোটখাটো ঘটনা এবং দৃশ্যের ছবি এবং তার সঙ্গে কবির আত্মীয়তা এই সব কবিতার এক বিশেষ আকর্ষণ। 'পোলিং স্টেশনে', 'দুই কর্মীর এক দাদার জন্যে তর্ক' এমন সব ব্যাপার নিয়ে লেখা যা কবিতায় বহুদিন ছিল ব্রাত্য। সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ধরনের স্বদেশী কবিতার আমদানি হয়েছে—যে-স্বদেশ ধনধান্যে পুষ্পে ভরা নয় কিংবা যেখানে ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় নেই ; আছে :

"দৃষ্টিহীন লক্ষজোড়া চোখের ফোকরে শত শত

অভিযোগ, অতল, অপার নিনিমেষ ॥"

এবং

"অন্তত এখনও আছে কলকাতায় মৃত্যুঞ্জয় শ্রাবণ আকাশ,
এখনও চৈতন্যে আছে আবিশ্ব আকাশে ঘনঘটা."

শুনেছি বহু বছর আগে কবি জসিমুদ্দিন সহৃদয় উপদেশ দিয়েছিলেন বিষ্ণু দে-কে গ্রামে ফিরে যেতে কবিতা লিখবার জন্যে। আমাদের অভিমত—কবি সে-উপদেশে কান না-দিয়ে ভালোই করেছেন। কারণ এ-গ্রাম তো সে-গ্রাম নয়। নক্সী কাঁথা মাঠের গ্রাম যেমন আর বাঙলাদেশে নেই, তেমনি পুরনো কলকাতা এমন কি প্রাক্‌যুদ্ধের কলকাতাও এখনকার কলকাতা নয়। আর কবিদের কাজ যেহেতু মাত্র স্মৃতিচারণে নয়, বাস্তবের দিকে চোখ-কান খুলে এবং বাস্তব-কল্পনার সংঘাতে মিলনে—তাই পাঠকের পক্ষে আধুনিক নগরবাসীর চোখে নিসর্গের শোভা আবার খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ঢের বেশি অর্থপূর্ণ ঠেকে। এ-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে বস্তি-ফুটপাথের অধিবাসীদের "বিশ্বের পাণ্ডব" রূপে এবং গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়

"আবার দক্ষিণ থেকে
সামুদ্রিক হাওয়া হু-হু আসে,
বীজময় বাংলার সমুদ্রের হাওয়া!
ঘন বসতিতে থাকে, যদিও দোতলা,
কাঠফাটা দুপুর বিকাল প্রতিদিন
ছাপিয়ে গলির ময়লা সন্ধ্যা উতলা!"

এ-আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য যদি ভাষা ও ছন্দের ব্যবহারে কবির যত্নসিদ্ধ দক্ষতার প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত থাকে। কখনও কখনও ছন্দের প্রথাভ্যস্ত কানে খটকা লাগে যদি আমরা তাঁর কবিতাপাঠ কথার স্বাভাবিক স্বরের উত্থানপতন থেকে আলাদা ভাবি। পুরনো শব্দের পরিমার্জিত রূপের সঙ্গে সঙ্গে কথার নতুন ব্যবহারে অনেক কবিতাই আমাদের মন কাড়ে।

অনেক দিন ধরে বিষ্ণু দে-র কবিতার একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে আমাদের কারুর কারুর কৌতূহল জাগে কবিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধোত্তীর্ণ গদ্যে, কোনো কাহিনীপ্রকাশে, তাঁর লেখনীর সম্ভাবনায়। যেমন ক্ষুদ্রপরিসর ফরাসী গল্প ভেরকরের 'সমুদ্রের মৌন' অনুবাদে তাঁর আশ্চর্য ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা আমাদের এ-সম্ভাবনার কথা আগেও ভাবিয়েছিল। প্রকাশের এক রূপ থেকে আর-এক রূপে যাওয়াও কবিদের দিক থেকে তাৎপর্যময়। বেশির ভাগ বাঙলা গদ্যে কানের অভাব এত বেশি যে এ-অনুরোধ বোধ করি ঠিক নিরুদ্দেশ যাত্রার আহ্বান নয়।

নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিত

সুনীল সেন

উনিশ শতকের নবজাগরণ যে আধুনিক গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা কিছু দৈবাৎ ঘটনা নয়। উনিশ শতকেই বাঙলাদেশে আধুনিকতার হাওয়া প্রবেশ করে, আধুনিক বাঙলার রূপরেখা এই যুগেই ফুটে ওঠে। সনাতন বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন, নতুনকে জানবার ও বোঝাবার আগ্রহ, ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে চেতনা, এই মহান দেশের বিস্মৃত গরিমার পুনরুদ্ধার, স্বাদেশিকতা....উনিশ শতকের নবজাগরণের কয়েকটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা চলে; কিন্তু পেছনের দিকে ফিরে তাকালে জাতির জীবনে এই আন্দোলনের স্থায়ী ছাপ উপেক্ষা করা অসম্ভব।

ডঃ অমিতাভ মুখার্জি নবজাগরণের উৎসসন্ধান করেছেন। স্বভাবতই তাঁর দৃষ্টি পড়ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের উপর। বিষণ্ণ যুগ বলে অষ্টাদশ শতাব্দী চিহ্নিত। দেশের প্রাচীন শিল্প ভেঙে পড়েছে; উদীয়মান বণিক-পুঁজি কোম্পানির নীতির ফলে দ্রুত বিলীয়মান; দেশের সম্পদ বাইরে চলে যাচ্ছে, বার্ক তাঁর প্রসিদ্ধ 'নির্গম তত্ত্ব'-এ যার বর্ণনা দিয়েছেন। আবার এই যুগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছায়ায় এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম। নবজাগরণের নায়ক এই শ্রেণী। ১৭৭৪ সনে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা। ইংরাজদের সওদাগরী অফিস গড়ে উঠছে। ইংরাজী-শিক্ষিত কেরানী-কর্মচারীর চাহিদা দেখা দিয়েছে। তখন কলকাতায় বসাক ও শেঠরা ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসা করবার সময় ইশারায় কাজ সারতেন। এই অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষার প্রতি কর্মপ্রার্থীদের আগ্রহ স্বাভাবিক। বাঙলাদেশে কেন ইংরাজী শিক্ষা প্রথম প্রবেশ করেছিল তা বোঝা যায়।

ডঃ মুখার্জি বাঙলাদেশে নতুন শিক্ষার বিস্তারের বিবরণ দিয়েছেন দুটি অধ্যায়ে। সঙ্গতভাবেই খৃষ্টান পাদ্রীদের ভূমিকা গুরুত্ব পেয়েছে। সরকারী

Reform And Regeneration In Bengal, 1774-1823. অমিতাভ মুখার্জি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। যোল টাকা পঞ্চাশ পয়সা

প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আর মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা টিঁকে ছিল এটাই আশ্চর্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন নয়, প্রাচ্য ব্যবস্থা চালু রাখাই ছিল সরকারী নীতি। এই প্রসঙ্গে লেখক আমহার্স্টের কাছে লিখিত রামমোহনের প্রসিদ্ধ প্রতিবাদ-পত্র (১১ই ডিসেম্বর ১৮২৩) উদ্ধৃত করেছেন। বে-সরকারী প্রচেষ্টার সবচেয়ে স্মরণীয় অবদান হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭)। লেখক বলেছেন এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের বিশেষ ভূমিকা ছিল না; হেয়ার সাহেব ছাড়া এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, রামদুলাল দে, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি। পাদ্রীদের প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ কীর্তি শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮)। বেণ্টিঙ্কের সময় সরকারী নীতির পরিবর্তনের সূচনা; মেকলের 'পরিশোধন তত্ত্ব' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

এই নতুন শিক্ষা প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকে অবস্থাপন্ন শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে, যে-শ্রেণী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী! দেশের সাধারণ মানুষ ভয়াবহ নিরক্ষরতার মধ্যে ডুবে থাকে। নতুন শিক্ষার আলোর ঝলকানির পাশাপাশি থাকে গ্রামদেশে নিরক্ষরতার অন্ধকার। উনিশ শতকের এই বৈশিষ্ট্য পরিচিত হলেও দেশের অগ্রগতির পথে এই বাধা যে কত বড় ছিল তা অনেক সময় খেয়াল করা হয় না। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন হবার ফল কি দাঁড়াল তার হিসাব নেয়া দরকার। লেখক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে মুসলমান সমাজ নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, বাঙলার কৃষকশ্রেণীর একটি বড় অংশ ছিল দরিদ্র মুসলমান।

সমাজসংস্কার আন্দোলনের পটভূমি হিসাবে ডঃ মুখার্জি পুরনো সমাজের ছবি দিয়েছেন, যে-সমাজের বৈশিষ্ট্য সাগরে সন্তান-বিসর্জন, ক্রীতদাসের ব্যবসা, সতীদাহ, কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ। মনে হয় ব্যক্তির বিকাশের সমস্ত পথ তখন অবরুদ্ধ। নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যাঁরা অত্যন্ত সচেতন, সমাজজীবনের আসল রূপ তাঁদের মনে রাখা ভালো। ১৮১৫ থেকে ১৮২৪ সালের মধ্যে বাঙলাদেশে সতীদাহের সংখ্যা ছিল প্রায় ছ হাজার; সতীর মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এই প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন কি বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়েছিল তা সুবিদিত। মজার ব্যাপার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতা রাধাকান্ত দেবের নিজের পরিবারে ১৮২৯ সনের অনেক আগে থেকেই

সতীদাহ বন্ধ হয়েছিল। তবু তিনি সতী-প্রথার পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন। দেশের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় যে সেদিন রামমোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা সফল হয়নি। একটি অংশের হিংস্র মনোভাব সত্যিই চরমে উঠেছিল।

ডঃ মুখার্জির বই-এর প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে আছে রামমোহনের বহুমুখী কার্যকলাপ। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, ব্রাহ্ম-আন্দোলন এবং সংস্কার-আন্দোলনের ক্ষেত্রে রামমোহনের ভূমিকা বড় স্থান পেয়েছে। তবু মনে হয় তাঁর দৃষ্টি কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন। তিনি বলেছেন রামমোহনের ব্রাহ্ম-আন্দোলনের স্থায়ী প্রভাব সামান্য; তাঁর মৃত্যুর পরে এই আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই আন্দোলন নবজীবন লাভ করে। কিন্তু কেন এটা ঘটল? আন্দোলন সাময়িকভাবে ঝিমিয়ে পড়লেও, যে-বীজ রামমোহন বপন করেছিলেন—তা কি অঙ্কুরে বিকশিত হয়নি? যে-কোনো সামাজিক আন্দোলনের জোয়ার-ভাটা থাকে; দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা থাকে। ইউরোপের প্রটেস্টাণ্ট বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা ছিল না? রামমোহনের অসাধারণ কৃতিত্ব এই যে তিনি সে-যুগে এই আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, যে-আন্দোলন প্রাচীন চিন্তাকে প্রবল আঘাত করেছিল; শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে এনেছিল নতুন জিজ্ঞাসা।

১৮২৩ সনে এসে ডঃ মুখার্জি থেমে গেছেন, অথচ তাঁকে বারবার পরবর্তী পর্বের কথায় আসতে হয়েছে। সময়কাল কি রামমোহনের মৃত্যু অর্থাৎ ১৮৩৩ সন পর্যন্ত টানা যেত না!

ডঃ মুখার্জি বহু নতুন তথ্য হাজির করেছেন। তথ্যের আলোকে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের পটভূমি বুঝতে এই বই অবশ্যপাঠ্য। পরিশিষ্টে আছে গ্রন্থপঞ্জী, যা উৎসাহী গবেষকদের কাজে লাগবে। ছাপার কাজ সুন্দর। ঐতিহাসিক গবেষণা যে নতুন পথ ধরে এগিয়ে চলেছে—এই বই পড়ে তা বোঝা যায়।

ভারতীয় বিকাশের ধারা

ভবানী সেন

ফ্রান্সের খ্যাতনামা প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদ চার্লস বেটেলহাইম এই বইখানি ফরাসী ভাষায় লিখেছিলেন এবং তা প্রথম প্রকাশিত হয় প্যারিসে ১৯৬২ সালে। ফরাসী ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন ডবলিউ. এ. ক্যাসওয়েল এবং তা ১৯৬৬ সালে নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয়। মূল ফরাসী গ্রন্থখানি ইংরাজীতে অনুবাদের সময় অনেক সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের মারফত ইংরাজী ভাষায় স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ও পরিণতি সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যগুলি ১৯৫০ ৫১ সালে সীমাবদ্ধ, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফলও পাওয়া যায়। ক্ষেত্রবিশেষে ১৯৬৬ সালের তথ্যও সংযোজিত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে ইংরাজী অনুবাদের সময় বহু আধুনিকতম তথ্যের পরিবেশনে ও সমাবেশে মূলগ্রন্থের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

৩৫৭ পৃষ্ঠাব্যাপী বিশ্লেষণের পর ৩৫৮ পৃষ্ঠা থেকে ৩৭১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তসমূহ টানা হয়েছে—তা অত্যাশ্চর্যরূপে আধুনিক। ১৯৬৬ সালে ইংরাজী অনুবাদের সময় সর্ববিষয়ে আধুনিক তথ্য সংযোজন করতে না-পারলেও ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর সর্বশেষ পরিচয় গ্রন্থকারের জানা ছিল এবং অসাধারণ প্রতিভার জোরে তিনি তথ্যক্ষেত্রের অনেক সঙ্কেত সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। ইংরাজী সংস্করণের মুখবন্ধে ১৯৬৫-৬৬ সালের খরা ও কৃষি-সঙ্কটেরও উল্লেখ আছে।

যেহেতু ইংরাজী সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে, সুতরাং ঐ বৎসর থেকে ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যে-যুগান্তকারী বিকাশ ঘনায়মান হয়েছে—তার ছবি এ-গ্রন্থে আশা করা যায় না, কিন্তু তবু তার আভাষ বেশ স্পষ্টভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। লেখকের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এমনই

INDIA INDEPENDENT : CHARLES BETTELHEIM : Translated from the French by W. A. Caswell : M. R. Press, New York. Price-81.50

বৈজ্ঞানিক যে তা থেকে ঐ আভাষ সহজেই ফুটে বেরোয়। গ্রন্থের উপসংহার থেকে কয়েকটি নিদর্শন তুলে ধরলেই এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করা যাবে।

শিল্পক্ষেত্রে চমৎকার বিকাশ ঘটেছে, বিশেষত ভারী-শিল্পের ক্ষেত্রে। এ-কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই লেখক এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন যে মূল শিল্পের (বিদ্যুৎ, কাঁচামাল, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও যন্ত্রপাতির অংশের) আশানুরূপ বিকাশ না-ঘটায় বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে গেছে। "পরিণাম হয়েছে এই যে ভারতীয় মূলধন বিদেশী মূলধনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে পড়ছে, তার স্বাধীনতা যাচ্ছে নষ্ট হয়ে।" যে রাষ্ট্রীয় ধনবাদের বিকাশ এই অবস্থার প্রতিকার করতে পারে, তার বিকাশও "সম্পূর্ণ আশানুরূপ নয়।" অবশ্য, এই বিশ্লেষণের মধ্যে একটি অত্যুক্তি আছে। ভারতীয় মূলধনের স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এ-কথা ঠিক নয়। বিদেশী মূলধনের সঙ্গে ভারতীয় মূলধনের সহযোগিতা ও সংঘাত দুইই বাড়ছে।

"শিল্পের চেয়ে কৃষির বিকাশ অধিকতর মন্থর।" ভূমিসংস্কারের ফলে গ্রামের দিকে এমনকি কৃষির ক্ষেত্রেও ধনবাদের বিকাশ ঘটেছে। গ্রামাঞ্চলের নতুন ধনিক হলো জোতদার এবং ধনী কৃষক। কৃষি-ক্ষেত্রে ধনবাদের এই বিকাশ খুব সীমাবদ্ধ, কারণ ধনবাদী চাষের উপযুক্ত জোতের সংখ্যা কম এবং গ্রামাঞ্চলে বাজারও সামন্তবাদী উৎপাদনী সম্পর্কের অস্তিত্ব দ্বারা ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ।

পুস্তকের প্রথম অধ্যায়েই গ্রন্থকার ভারতের অর্থনীতিতে ধনবাদী প্রথার একটি স্থান নির্দিষ্টভাবে ধরেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি সমস্ত মিলিয়ে ধনবাদী প্রথার পরিমাণ জাতীয় অর্থনীতির শত-করা ৩০ ভাগ মাত্র। ধনবাদী উৎপাদনের এই স্বল্পতা সত্ত্বেও সমগ্র অর্থ-নীতির ওপর তার প্রতিপত্তি কম নয়। কিন্তু ঐ স্বল্পতা থেকে এ-কথাও প্রমাণিত হয় যে ভারতের অর্থনীতিতে প্রাক্-ধনবাদী প্রথার অবশিষ্টাংশ রয়েছে প্রচুর।

অগ্রগামী ধনবাদী প্রথার গতিবেগ এবং প্রাক্-ধনবাদী প্রথার প্রতিবন্ধক—এই উভয়ের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে ভারতের সামাজিক পরিস্থিতির উপাদান-সমূহ সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও বিদেশী মূলধনের ভূমিকা একটি প্রধান নেতিবাচক উপাদান।

ভারতে ধনবাদী প্রথার অনুন্নত অবস্থা সত্ত্বেও একচেটিয়া পুঁজির অসামান্য প্রতিপত্তি কেমন করে সৃষ্ট হলো গ্রন্থকার তার ঐতিহাসিক আকর তুলে ধরেছেন ৬২ এবং ৬৩ পৃষ্ঠায়। কিন্তু ভারতের একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে জাতীয় মূলধনের অপরাংশের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে লেখক কোনো ছবি তুলে ধরেননি। তিনি দেখিয়েছেন যে বিদেশী মূলধন এদেশে এত প্রতিপত্তিশালী ছিল যে শুধু তারাই তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পেরেছে যাদের হাতে ছিল প্রচুর মূলধন এবং ব্যাঙ্ক। তাই জাতীয় ধনবাদের অনুন্নত অবস্থাতেই বৃহৎ 'ফিনান্স-ক্যাপিটাল' ধরনের মূলধন এদেশে সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী এবং খুব তাড়াতাড়ি তাদের হাতে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অথচ শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক কর্তৃক সৃষ্ট উদ্বৃত্তমূল্য শিল্পের মূলধন বৃদ্ধির চেয়েও বেশি করে শিল্পের বাইরে অনুৎপাদক অর্থসঞ্চয়ের কলেবর বৃদ্ধি (৭৩ পৃষ্ঠা)। তার ফলে ভারতের অর্থনীতিতে উৎপাদক মূলধনের চেয়ে অনুৎ-পাদক অর্থ-সমষ্টির ভিড় অনেক বেশি।

গ্রন্থকারের এই বিশ্লেষণ থেকেই কৃষির অধোগতি বা অনুন্নতি, চোরা-বাজারের প্রতিপত্তি এবং সুদখোরী মহাজনবৃত্তির প্রাধান্য প্রভৃতি বহু অভিজ্ঞতার আকর খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে সুদখোরী মহাজনীবৃত্তির সঙ্গে বৃহৎ ব্যাঙ্কের মূলধন কেমন ভাবে জড়িত তার বিবরণ তুলে ধরে গ্রন্থকার তার রাজনৈতিক এবং সামাজিক ফলাফলের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এই বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় যে কেন ভারতে বিকাশজনক সম্পদের এত অভাব। শিল্পের ক্ষেত্রে সৃষ্ট নতুন মূলধন চলে যাচ্ছে শিল্পের বাইরে (৭৯ পৃষ্ঠা)। গ্রামাঞ্চলে এই মূলধন সুদখোরী মহাজনীর প্রশ্রয়দাতা। পরিকল্পনামূলক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ধনবাদ এর কথঞ্চিৎ প্রতিকার সাধন করেছে; কিন্তু খুব বেশি নয়।

১৭৬ থেকে ২৩৩ পৃষ্ঠার মধ্যে কৃষি ও ভূমিনীতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। তার সামাজিক ফলাফলও বেশ মূর্তভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের তথ্যাবলীও সর্বাধুনিক। কৃষির উন্নতি খুব মন্থর, এই কথা বলে তিনি দেখিয়েছেন ভারত কিভাবে খাদ্যের জন্য বিদেশের ওপর ক্রমাগত অধিকতর নির্ভর হয়ে পড়ছে। খাদ্যশস্যের আমদানি ছিল ১৯৫৬ সালে ১৪ লক্ষ টন, ১৯৫৮ সালে ৩২ লক্ষ টন, ১৯৬৪ সালে ৬২.৭ লক্ষ টন এবং ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে ১ কোটি টনেরও বেশি। এর কারণ-

স্বরূপ দেখানো হয়েছে যে উৎপাদনের অগ্রগতি জনসংখ্যার অগ্রগতি ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে পারেনি।

সরকারী ভূমিনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে গ্রন্থকার ঘোষণা করেছেন যে খেতমজুর এবং ভাগচাষীদের কোনো উপকার হয়নি। একমাত্র উচ্চ-শ্রেণীর রায়ত চাষীরাই ভূমিনীতির ফলে লাভবান হয়েছে। এরাই হলো গ্রামের ধনিক। তাদের উপরে যে জমিদারশ্রেণী ছিল—তাদের শোষণ থেকে তারা মুক্ত হয়েছে এবং অধীনস্থ চাষীদের উচ্ছেদ করে জমি খাস করেও তারা আর-একদফা সুবিধে অর্জন করেছে। জমিদারশ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, ধনী কৃষকের সম্পদ বেড়েছে, কিন্তু তবু ধনবাদের দিকে কৃষির অগ্রগতি খুবই সামান্য। কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে তার মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

কৃষির জন্য চাষের উন্নতিকল্পে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে—তার বিস্তৃত বিবরণ দেবার পর লেখকের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত হলো এই :

"পরিকল্পনা সমূহের মারফত চাষের জন্য অবলম্বিত কারিগরী ব্যবস্থা খুবই সামান্য এবং সেচ ও সারের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র তার ফলাফলও নগণ্য। তার জন্য যে-অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তা 'কৃষি ও সেচ' এই খাতে ব্যয়িত অর্থের তুলনায় খুবই কম, এবং 'শিক্ষা ও পুনর্গঠন'-এর নামে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা কৃষির মধ্যে ধরলে কৃষির জন্য টেকনিক্যাল উন্নতির ব্যয়-বরাদ্দ হয়ে দাঁড়ায় আরও কম।" (২০৫ পৃষ্ঠা)

কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি এত কম যে তার চারটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত যে-ধরনের সম্পত্তি ও সামাজিক সম্পর্ক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক—তার আমূল পরিবর্তন হয়নি। দ্বিতীয়ত, গ্রামের ঋণদান ব্যবস্থা মহাজনদের হাতে, তাদের সুদের হার অত্যন্ত চড়া। তৃতীয়ত, দামের অস্থিরতা উৎপাদনের উৎসাহ জোগায় না। চতুর্থত, কমিউনিটি প্রজেক্ট প্রভৃতির জন্য ব্যয় অত্যন্ত বেশি তথা কৃষির জন্য কারিগরী ব্যবস্থা ও শিক্ষা অত্যন্ত কম।

"এই হলো কয়েকটি কারণ যার জন্য কৃষিতে বিস্তর টাকা ঢালা সত্ত্বেও কৃষির উন্নতি অতি সামান্য।" (পৃ. ২১৯)

জনগণের জীবনধারণের মান সম্পর্কে গ্রন্থকার প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক বিবরণ দিয়েছেন। আরম্ভ করেছেন ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার বিবরণ

দিয়ে। চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ বেকারসহ এবং এই পরিকল্পনায় বেকারের সংখ্যা আরও বাড়বে। এছাড়া আংশিক বেকারের সংখ্যা রয়েছে প্রচুর।

তিনটি পরিকল্পনায় শ্রমিকদের মজুরির সঙ্গে মালিকদের মুনাফার তুলনা করে লেখক দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত আর্থিক মজুরি বেড়েছে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ এবং কর্মচারীদের বেতন শতকরা ১০ ভাগ; কিন্তু মালিকদের মুনাফা হয়েছে অধিকাংশক্ষেত্রে ৩ গুণ। মোটের ওপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধনীশ্রেণীই লাভ করেছে, বেড়ে গেছে সামাজিক বৈষম্য।

গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শিরোনামা হলো 'রাষ্ট্রনীতি এবং সামাজিক আলোড়ন'। অধ্যায়টি সমগ্র গ্রন্থের মূল্যবান উপসংহার। ট্রেড ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান শক্তি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিতরকার ভেদ-বিভেদ, ধর্মঘটের বিস্তার, সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল, কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি-বৃদ্ধি এবং কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলি প্রভৃতির বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কেও কিছু কিছু বিবরণ আছে এবং এই পার্টির দ্বিধা বিভক্তির বিবরণও স্পষ্ট করা হয়েছে।

শেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কংগ্রেসের অবনতি ঘটছে, তার স্থানে ক্রমশ এগোচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, 'স্প্লিট' সত্ত্বেও। কিন্তু স্বতন্ত্র পার্টি এবং জনসংঘেরও শক্তি বাড়ছে। সমাজের ভিতরকার শ্রেণীদ্বন্দ্ব হচ্ছে তীব্রতর। কিন্তু কংগ্রেসের ভিতরকার ভেদ সম্পর্কে গ্রন্থকারের সঠিক ধারণা নেই, কারণ ভারতের একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে অন্য পুঁজির সংঘাত তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

সর্বশেষে, গ্রন্থকার ভারতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে অন্যান্য অনুন্নত দেশ সম্পর্কে কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন। প্রথম শিক্ষা হলো—স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এই পরিবর্তনই দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির একমাত্র উপায়। কেন-না, সামাজিক সম্পদ তাহলে সমগ্র জনতার স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ, পরিবর্তনটা হওয়া দরকার সমাজতন্ত্রের দিকে। ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে এরূপ পরিবর্তন না-করা হলে অগ্রগতি হবে খুবই মন্থর, অর্থনৈতিক বৈষম্য যাবে বেড়ে আর সামাজিক দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠবে। তাই মুনাফা অর্জন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেন সামাজিক সম্পদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ না করতে পারে।

৩৫১ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের দুর্বলতম অংশ হলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কিত আলোচনা। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী এবং মার্কসবাদী পার্টি'র ভূমিকা সম্পর্কে গ্রন্থকার অসত্য ও বিকৃত ধারণা পোষণ করেন। এই দুই পার্টি'কে তিনি "দক্ষিণপন্থী" এবং "বামপন্থী" পার্টি বলে বর্ণনা করেছেন, "বামপন্থী" পার্টি'কেই কংগ্রেসের প্রকৃত বিরোধী দল আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে এবং কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মসূচী সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে ওটা "কংগ্রেসী কর্মসূচীর বামপন্থী ভাষ্যের মতো।" সেই একই সঙ্গে ঠিক তার বিপরীত বিবরণ পাওয়া যায় উক্ত কর্মসূচীর কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দানের মধ্যে। অথচ মার্কসবাদী পার্টি'র কর্মসূচীর সঙ্গে তার কোনো তুলনামূলক বিশ্লেষণ না দিয়েই তিনি যে একদেশদর্শী বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছেন তাতে অতিবাম ঝোঁকের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আরও স্তম্ভিত হতে হয় তাঁর এই অজ্ঞতা দেখে যে ভারত সরকার নাকি "দক্ষিণপন্থীদের কমিউনিস্ট পার্টি'র অফিস এবং পত্রিকা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন আর তাই 'বামপন্থী' কমিউনিস্ট পার্টি'কে নতুন দপ্তর স্থাপন এবং নতুন পত্রিকা প্রকাশ করতে হয়।" 'মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি'র সভ্যরাই যে পার্টি থেকেই বেরিয়ে গিয়ে পৃথক পার্টি গঠন করেছিলেন সে-কথার উল্লেখ সত্ত্বেও গ্রন্থকার এমন একটা ভাব দেখিয়েছেন যেন "দক্ষিণপন্থী"রাই "এখন একটি স্বতন্ত্র পার্টি'তে পরিণত হয়েছে।" ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে গ্রন্থকারের এই অজ্ঞতা ও একদেশদর্শিতা গ্রন্থখানির একটি কলঙ্কজনক অংশ।

গ্রন্থকার যদি তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচির যে-অংশকে কংগ্রেসী কর্মসূচীর বামপন্থী ভাষ্য বলে বর্ণনা করেছেন, মার্কসবাদী পার্টি'র কর্মসূচীর সংশ্লিষ্ট অংশের সঙ্গে তার কোনো আকাশ-পাতাল পার্থক্য নেই, পার্থক্য রয়েছে জনগণতন্ত্র এবং জাতীয় গণতন্ত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে। এ-বিষয়ে কোনো আলোচনা না-করেই তিনি বলেছেন যে "বাম" কমিউনিস্টদের অভিযোগ এই যে "দক্ষিণ" কমিউনিস্টরা "শ্রমিকরাষ্ট্র এবং শ্রমিক সরকার মানে না" যেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এখন শ্রমিক রাষ্ট্র ও শ্রমিক সরকার স্থাপন করতে চায় আর কমিউনিস্ট পার্টি তা চায় না। গ্রন্থকারের এই অজ্ঞতা নিতান্তই হাস্যকর। দুই পার্টি'র কোনো পার্টি'ই এখন শ্রমিক রাষ্ট্র ও শ্রমিক

সরকার স্থাপন করতে চায়নি। আসলে মতভেদ এই নিয়ে যে কংগ্রেসের তথা ধনিকশ্রেণীর একাংশ বামপন্থী শক্তিসমূহের সঙ্গে এক যুক্তফ্রণ্টে সমবেত হবে কিনা এবং সেই ফ্রন্টটি শ্রমিকসহ একাধিক শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্ব দিয়ে আরম্ভ হবে কিনা তার পূর্বশর্ত হবে শ্রমিকশ্রেণীর একক নেতৃত্ব।

গ্রন্থকার যদি এই আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া দেশী পুঁজি এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের মধ্যে কংগ্রেসের একাংশের স্থান এবং তাতে শ্রমিকসহ একাধিক শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্ব ঐতিহাসিক কারণেই স্বাভাবিক। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনা মার্কসবাদী পার্টিকেও কংগ্রেসের ভিতরকার একাংশের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্কের ভিতর এনে ফেলেছে। কমিউনিস্ট পার্টি যে-সিদ্ধান্তে ১৯৬৪ সালে পৌঁচেছিল, মার্কসবাদী পার্টি কার্যত ১৯৬৯ সালে সেখানে হাজির হয়েছে। সুতরাং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বের সঙ্গে কর্মের মিল আছে, কিন্তু মার্কসবাদী পার্টির তত্ত্বের সঙ্গে কর্মের দ্বন্দ্ব এখন পরিস্ফুট।

গ্রন্থকার এসব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি, কারণ তাঁর 'রাজনৈতিক অধ্যায়'টি গ্রন্থের অন্যান্য অংশের মতো তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক নয়, সমগ্র গ্রন্থের সঙ্গে এই অংশের কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক দেখাবার চেষ্টাও হয়নি।

সময় ও সংগ্রামের হাতিয়ার

জগদীশ দাশগুপ্ত

মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক বৈঠকের প্রস্তাব, আবেদন ও বিবৃতিগুলির বাঙলা অনুবাদ এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মূল দলিল ছাড়া লেনিনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আহ্বান; ভিয়েতনামের জন্য স্বাধীনতা, মুক্তি ও শান্তি; ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্টদের প্রতি আবেদন; শান্তির সপক্ষে আবেদন ইত্যাদি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত-এই সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট নির্বিশেষে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করেছে।

এবারকার সম্মেলনের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনায় কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রস্তুতিপর্বে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে খোলাখুলি আলোচনা এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সংহতির আবহাওয়ায় সম্মেলনের কাজ চলে। উপস্থিত প্রতিনিধিদের বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত সিদ্ধান্তকেও সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, সম্মেলন চলাকালীন প্রতিদিনের আলোচনার রিপোর্ট ও প্রস্তাবগুলি আন্তর্জাতিক প্রেস-এজেন্সি মারফৎ বিস্তৃত প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তৃতীয়ত, যে-সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই সম্মেলনে যোগদানে বিরত ছিলেন, তাঁদের কাছেও সমস্ত আলোচনার বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে গণতন্ত্র প্রসারের এই প্রচেষ্টাগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথের প্রধান প্রতিবন্ধক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির ঐক্য স্থাপন এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে সম্মেলন আহ্বান জানিয়েছে:

'কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক বৈঠক' (মস্কো: ৫—১৭ জুন ১৯৬৯) সোভিয়েত সমীক্ষা (৩১ জুন ১৯৬৯)। ১/১ উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। দশ পয়সা

"সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহের জনগণ, শ্রমিক, পুঁজিবাদী দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ, সদ্য স্বাধীন জাতিসমূহ, এবং যারা নির্যাতিত তারা সকলে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে—শান্তি, জাতীয় মুক্তি, সামাজিক প্রগতি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হোন।"

সম্মেলনে বর্তমান যুগের চরিত্র, এই যুগের মৌল বিরোধ, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন পরিকল্পনা ও তাকে কার্যকরী করার ক্ষমতার মধ্যে সংঘাত, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের স্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক-শ্রেণীর ভূমিকা, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের বাস্তব কর্ম-সূচি ইত্যাদি যাবতীয় সমকালীন সমস্যার মার্কসীয় তত্ত্ব ও বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা হয় এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম রচনা করা হয়।

স্বভাবতই প্রত্যেক গণতান্ত্রিক মানুষের পক্ষে এই মূল্যবান দলিল অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদের কথা সকলেই জানেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীতে সমাজবাদী আন্দোলনের সপক্ষে যে বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, এই বিভেদ তাকে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সেই সঙ্গে সম্প্রতিকালে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতৃবর্গের মতপার্থক্য এবং গত বছরের চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনাবলী গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী মানুষের মধ্যে কিছুটা সংশয় ও হতাশার সৃষ্টি করেছে। এই সুযোগে একদিকে বুর্জোয়ারা এবং অন্যদিকে উগ্র-বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদীরা আবার মার্কসবাদের মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে পুরনো বস্তাপচা সমালোচনাগুলির ব্যাপক প্রচার শুরু করেছে। সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি এই সংশয় ও হতাশাকে দূর করে মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আস্থা ও আত্মপ্রত্যয়ের সৃষ্টি করবে। যদিও এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ বিরোধের চূড়ান্ত সমাধান হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আদর্শগত ঐক্যের সৃষ্টির পথে এই সম্মেলনের বিশেষ অবদান অনস্বীকার্য।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে সম্মেলন ঘোষণা করেছে যে "কোন

কোন বাহিনীর বিঘ্ন-বিপদ ও বিপর্যয় সত্ত্বেও বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলন তার আক্রমণ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি-আক্রমণ শুরু করা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বপক্ষে শক্তিসমূহের বিন্যাস পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে।" ১৯৬০ সালের মস্কো সম্মেলনের সময় থেকে গত ন-বছরের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করে এবং বিশ্বের শক্তি-সমাবেশের ভারসাম্যের বাস্তব মূল্যায়নের ভিত্তিতে সম্মেলন সিদ্ধান্ত করে যে বর্তমান যুগের বিশ্ব-পরিসরে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মৌল অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির বর্শাফলক প্রথমত ও সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে উদ্যত রয়েছে। এই সময়ে লক্ষ্য করা যায়: পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের অপেক্ষাকৃত উচ্চহার, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সামরিক ক্ষমতা এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র-পারমাণবিক ক্ষমতার যথেষ্ট বৃদ্ধি, পশ্চিম জার্মানি ও জাপানের বিরাট শক্তিবৃদ্ধি। এই অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে যে বর্তমান ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান প্রবর্ণতাটি বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় বলে ১৯৬০ সালের সভার যে-বক্তব্য—তা কি এখনও কার্যকরী আছে? এর উত্তরে সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে "সাম্রাজ্যবাদ তার হৃত ঐতিহাসিক উদ্যোগ আবার ফিরে পেতে পারে না। মানবজাতির বিকাশের প্রধান গতিমুখ নির্ধারিত হয় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত বিপ্লবী শক্তিগুলির দ্বারা।" এই বক্তব্যের সপক্ষে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে: ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়; ইজরায়েলি আগ্রাসন মারফৎ আরবদেশগুলিতে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রবেশের চেষ্টার ব্যর্থতা; কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ও অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা; চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে নাটো আগ্রাসী পরিকল্পনার বিপর্যয়; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং অনেক সাম্রাজ্যবাদী দেশের আর্থিক সঙ্কট; ইত্যাদি। এবং অপর পক্ষে গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি, সমাজ-তন্ত্র ও শান্তি-আন্দোলনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি।

কিছুদিন আগে বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র সঙ্কোচন ও যান্ত্রিকতার প্রবর্তনের অভিযোগে মুখর হয়ে

উঠেছিলেন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের প্রস্তাব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তাদের অপবাদ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক।

"শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সুস্থির বৃদ্ধির দ্বারা তাদের সামাজিক সংগঠনগুলির বৃহত্তর কর্মতৎপরতার দ্বারা, ব্যক্তির অধিকারের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে, আমলাতান্ত্রিক প্রকাশের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশের মধ্যে দিয়েই সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলি পরাক্রমশালী হয় এবং জনগণের ইচ্ছা এবং কর্মের ঐক্য গড়ে ওঠে।"

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগ, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রস্তাবটিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের বিস্তারিত কর্মসূচী লেখা আছে। শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, মহিলা ইত্যাদি বিভিন্ন ফ্রন্টের কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া আছে।

ভারতের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিপ্রগতির সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ১৯৬০ সালের মস্কো সম্মেলন, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের যে স্লোগান দিয়েছিল—সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তার যথার্থতাকে প্রমাণ করেছে। আজকে আমাদের দেশের প্রত্যেক গণতান্ত্রিক মানুষ ও রাজনৈতিক পার্টিকে স্বীকার করতে হয়েছে যে এই বিশ্লেষণ এবং এই লক্ষ্য কার্যকরী ও সঠিক। এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রসারিত করে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের যে আহ্বান সম্মেলন প্রস্তাব করেছে, সমস্ত শান্তিকামী গণতান্ত্রিক মানুষকে সেই উদ্যোগে সামিল করা প্রত্যেক মার্কসবাদীর অবশ্য কর্তব্য।

এই দলিলটি সমাজতন্ত্র ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অত্যন্ত মূল্যবান হাতিয়ার।

পার্থিব পদার্থের রূপ ও স্বরূপ

অমল দাশগুপ্ত

বইয়ের নাম দেখে একটু খটকা লেগেছিল। শুধু পদার্থ নয়, পার্থিব পদার্থ, শুধু রূপ নয়, স্বরূপও। বইটি পড়ে দেখা গেল, নাম অসার্থক নয়, মহাজাগতিক থেকে পার্থক্য টানার জন্য পার্থিব, রূপ বা বস্তুত্ব তো বটেই, সেই সঙ্গে স্বরূপ বা গুণও। সঙ্গত কারণেই পার্থিব পদার্থের রূপ ও স্বরূপ তিনি অনুসন্ধান করেছেন পরমাণুর জগতে। মানুষের ইতিহাসে পরমাণু সম্পর্কিত সমস্ত ভাবনাচিন্তাকে তিনি যে শুধু একসূত্রে গ্রথিত করেছেন তাই নয়, সেই ভাবনাচিন্তার দার্শনিক বিচারও করেছেন। ডঃ মাইতি বাঙলাসাহিত্যের অধ্যাপক, ইতিপূর্বে গ্রন্থ রচনা করেছেন 'চৈতন্যপরিকর', 'হরিচরণ দাসের অদ্বৈত মঙ্গল', 'রবীন্দ্রনাথের কালান্তর' ইত্যাদি। আমাদের দেশের যা নজির, এমন একজন ব্যক্তি বিজ্ঞানের চর্চা করবেন, উপরন্তু এমন দুরূহ একটি বিষয়ে বিজ্ঞানের বই রচনা করার দুঃসাহস দেখাবেন, ভাবা যায় না। এদিক থেকে ডঃ মাইতি বাঙলাদেশে সম্ভবত বিরল দৃষ্টান্ত। জে. বি. এস. হলডেনের কথা মনে পড়ে। ছাত্রজীবনে তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল ক্লাসিকস, কিন্তু পরবর্তী জীবনে গবেষণার বিষয় বায়োকেমিস্ট্রি, বৈজ্ঞানিক রচনায় অবাধ বিচরণ বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে। এই প্রাসঙ্গিক উল্লেখটি তুলনা নয়, ডঃ মাইতির প্রচেষ্টাকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়েও কথাটা জানিয়ে রাখছি।

'অ্যাটম' (অর্থাৎ শব্দটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে, যাকে ভাঙা যায় না)। ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় পরমাণু। ডঃ মাইতি আলোচনা শুরু করেছেন আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার গ্রীক দার্শনিকদের সময় থেকে। পরমাণুতত্ত্বের প্রবর্তক হিসেবে যদি বিশেষ করে কারও নাম উল্লেখ করতে হয় তবে তিনি হচ্ছেন ডিমক্রিটাস (আনু. ৪৬০–৩৭০

পার্থিব পদার্থের রূপ ও স্বরূপ। ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি। প্রাপ্তিস্থান: তপতী পাবলিশার্স। ৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। পনেরো টাকা

খ্রীঃ পূঃ)। "ডিমক্রিটাস মনে করতেন, প্রাকৃতিক জগতের যেকোনো প্রকার বস্তুকে ক্রমাগত ভেঙে ভেঙে চললে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় পৌঁছান যাবে, যখন তাকে আর কিছুতেই ভাঙা চলে না। অর্থাৎ জগতের প্রতি বস্তুই অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে তৈরী। সে সব কণিকাকে আর ভাঙা বা ভেদ করা যায় না।" এই কণিকাগুলোই অ্যাটম। আকারে এত ছোট যে চোখে দেখা সম্ভব নয়।

বিশ্বের গড়ন সম্পর্কে এই বস্তুবাদী দার্শনিকের ধারণা ছিল এই রকম: পরমাণু অবিনাশী। তাদের আকার আয়তন ও ওজন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু গুণের দিক থেকে অভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন আকারের পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় একত্রিত হবার ফলে বস্তুর সৃষ্টি। সদা-বিচরণশীল পরমাণু ও মধ্যবর্তী শূন্যস্থান—এই নিয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

কিন্তু এই বস্তুবাদী ধারণা সে-যুগে প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। অন্য শিবিরের কণ্ঠস্বর ছিল আরো অনেক প্রবল, যাঁরা বলতেন, "সমগ্র বিশ্ব এক বিরাট মানসশক্তির বলেই চলছে", যাঁদের মতে, বস্তুর গতিশক্তি বহিরাগত, তার নাম মন। সক্রেটিস বললেন প্রজ্ঞার কথা, প্লেটো উপস্থিত করলেন প্রত্যয়বাদ ("প্রত্যয়ও একটি মানসক্রিয়া মাত্র"), আর অ্যারিস্টটল সেই "প্রত্যয় বা তত্ত্বকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিলেন।" এই তত্ত্ব অনুসারে জগৎসৃষ্টির মূল কারণ চারটি: উপাদানগত, গুণগত, সৃষ্টিশক্তিমূলক ও সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিকল্পনা-বিষয়ক। পরবর্তী দু-হাজার বছর ধরে অ্যারিস্টটলের এই তত্ত্বই ছিল ইউরোপের ভাবনা-জগতের নিয়ামক। সেখানে অ্যালকেমিস্ট্রি ছাড়া অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া সহজ ছিল না।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, "বাইরে থেকে পাওয়া শক্তির উপরই বস্তুর গতিবেগ নির্ভরশীল।" গ্যালিলিও প্রথম বললেন, "বস্তুর গতিবেগের জন্য বহিঃশক্তির কল্পনাটি ভাববিলাস মাত্র।" গ্যালিলিওর পরে নিউটন, যিনি রীতিমতো পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তকে গতিবেগের সূত্রের আকারে উপস্থিত করেছিলেন। নিউটন থেকে ড্যালটনে পৌঁছতে একশো বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে বস্তু-সম্পর্কিত ধারণায় বিরাট একটা ভূমিকম্পের মতো ওলোটপালোট হয়ে গেল। নামও অনেক: দেকার্ত, বয়্যাল, স্টাল্, লোমোনোসফ, শেলে,

প্রীস্টলে, লাভইসিয়ে, চ্যাপ্‌টাল প্রভৃতি। বয়্যাল বললেন, চাপ আর আয়তনের গুণফল সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট গুণফল। স্টাল্ বললেন, দহনক্রিয়ার মূলে রয়েছে জগৎব্যাপী একটি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, যার নাম ফ্লোজিস্টন। লোমোনোসফ বললেন, "রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত বস্তুর মোট ভর প্রতিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন নূতন বস্তু বা বস্তুসমূহের ভরের সঙ্গে হুবহু এক থাকে।" লাভইসিয়ে প্রমাণ করলেন, দহনক্রিয়ার সময়ে বাতাসের যে-অংশটি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয় তা হচ্ছে অক্সিজেন। ফলে ফ্লোজিস্টনবাদের মৃত্যু হলো, "ধাতুগুলি তাহলে আর ধাতুভস্ম এবং ফ্লোজিষ্টনের সমবায়ে গঠিত কোনো বস্তু নয়, সেগুলি অবিমিশ্র বিশুদ্ধ ধাতুই"। ড্যালটনের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন গে লুসাক ও অ্যাভোগার্দো। তবুও পরমাণুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো সাতচল্লিশ বছর, কানিজারোর (১৮২৬-১৯১০) সময় পর্যন্ত। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বরে কার্লস্রু-তে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীদের এক মহাসভায় অণু-পরমাণুবাদ স্বীকৃতি লাভ করল।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পরে পরমাণুর জয়যাত্রা দুই পর্বে। প্রথম পর্বে পারমাণবিক ভর, দ্বিতীয় পর্বে উপাদানমালার শ্রেণীবিন্যাস। দুই পর্বের সমগ্র আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম মেন্দেলিয়েফ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যায়িক ছক। মেন্দেলিয়েফই "সর্বপ্রথম নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করলেন যে উপাদানগুলির মধ্যেই পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।" মেন্দেলিয়েফ উপাদানমালার শ্রেণীবিন্যাস সম্পন্ন করেছিলেন মাত্র ভরের ওপরে নির্ভর করে "১৮৭১ খ্রীঃ-এ মেন্দেলিয়েফের যে পর্যায়িক ছক প্রকাশিত হল, তাতে তিনি বিস্তৃতভাবেই জানিয়ে দিলেন, কেমন করে ঐ ছকের অন্তর্গত স্থান-মাহাত্ম্য দেখেই একটি উপাদানের ভৌত বা রাসায়নিক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যাবে।...এ কেবল তৎকালে আবিষ্কৃত উপাদানগুলি সম্বন্ধেই নয়। অনাবিষ্কৃত উপাদানের জন্য রক্ষিত শূন্যস্থান দেখেও সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়।" সে-সময়ে স্ক্যাণ্ডিয়াম, থ্যালিয়াম, জার্মানিয়াম প্রভৃতি অনেক উপাদানই আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু মেন্দেলিয়েফের ছকে তাদের জন্যে জায়গা ছিল। মেন্দেলিয়েফ লিখেছিলেন, "ভরই উপাদানের একমাত্র নিশ্চিত ধর্ম, যাকে অবলম্বন করেই তার অন্য ধর্মগুলির বিকাশ ঘটছে।" ভর-ই কি তাহলে বস্তুর মূল প্রকৃতি?

শুধু ভর নয়, তেজও। মেন্দেলিয়েফ যে-বছরে পর্যায়িক ছক প্রকাশ করলেন, সেই একই বছরে আরো একটি আশ্চর্য ঘটনা জানা গিয়েছিল: ক্যাথোড-রশ্মি রশ্মি বটে, কিন্তু আসলে বিদ্যুৎ দ্বারা উৎক্ষিপ্ত পদার্থকণা—নেগেটিভ কণিকা। ১৮৯১ সালে স্টোনি এই কণিকার নাম দিলেন—ইলেক্‌ট্রন। অতঃপর ১৮৯৫ সালে রঞ্জন রশ্মি। ইতিপূর্বে ১৮৮৭ সালে আলোর গতিবেগ সম্পর্কিত মাইকেলসন-মর্লির বিখ্যাত পরীক্ষাকার্য। ঈথরকে বুঝি আর টিকিয়ে রাখা গেল না। ১৮৯৬ সালে গ্লেজব্রুক মন্তব্য করলেন, "বিদ্যুৎ, চুম্বক, ঔজ্জ্বল্যময় বিকিরণ এবং মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে বিজড়িত ঈথরতত্ত্বের সমস্যা সমাধানের জন্যে আর একজন দ্বিতীয় নিউটনের প্রয়োজন ঐকান্তিক হয়ে উঠেছে"।

এই দ্বিতীয় নিউটন হচ্ছেন আইনস্টাইন। পরমাণুতত্ত্বের এই পর্বটি শুরু হয়েছে বেকেরেল থেকে। তারপরে অবশ্যই কুরী দম্পতি, প্লাঙ্ক, রাদারফোর্ড ও নীল্‌স বোর প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পরমাণুর আশ্চর্য অন্তঃপুরটি ক্রমে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হলো।

"যত সব বস্তু মানুষের ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা পড়ে, তাদের সকলেরই মূলে আছে কয়েক প্রকার পরমাণু। আবার ঐ কয়েক প্রকার পরমাণুর মধ্যেও দেখা গেল, ঋণাত্মক ইলেকট্রন আর ধনাত্মক কেন্দ্রক—এই দুই ধরনের বিদ্যুদাধান মাত্র। এদের মধ্যে আবার ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রকের দ্বারা শাসিত। কেন্দ্রকের আধানের উপরে নির্ভর করেই ওদের সংখ্যা-সন্নিবেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা যখন পৃথক অস্তিত্ব নিয়েই বিরাজমান, তখন ওদেরকে হয়ত পৃথক দুটি উপাদান বলা যায়। কিন্তু যখন ওদেরও মূলে রয়েছে ওদের ঐ তেজটুকুই, তখন ওদের গুণ যাই হোক না কেন, ওদের উভয়কেই তেজসত্তা বলা ছাড়া উপায় নাই। তাহলে কি পার্থিব মূল পদার্থ ঐ তেজটুকুই? যেহেতু কেন্দ্রকীয় তেজের আধান-পার্থক্যের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর সৃষ্টি? বিচিত্র পরিস্থিতি! কোনো বস্তুর উপাদান বলতে আমরা বুঝি, বস্তুটি যা দিয়ে তৈরী তাই। শব্দ, তাপ, আলো আর বিদ্যুতের মত অত্যল্প কয়েকটি জিনিস ছাড়া আর যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা পড়ে, তাদের সকলেই গুরুভার না হলেও তাদের প্রত্যেকেরই যে ভর আছে, এ আমরা সুদীর্ঘকাল যাবৎ জেনে এসেছি। সুতরাং বস্তুর উপাদান যে ভরমূলক, এইটিই আমাদের দৃঢ় প্রতীতি। কিন্তু পার্থিব পদার্থের উপাদান অনুসন্ধান করতে গিয়ে তেজটিই

কোথা থেকে বিপুল তেজে ধেয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। যত ক্ষুদ্রই হোক, ওকে তো চিনি। সুতরাং ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ওকেও স্বীকার করে নিতে হল উপাদান বলেই। ভরের সঙ্গে সমান আসনে ঠাঁই পেল ও। দুজনকে পাশাপাশি রেখেই কাজ চালিয়ে যেতে হল। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই দেখা যাচ্ছে যে, সন্ধান-পথের সামনে এসে ও দাঁড়াতে চায় সম্পূর্ণ পথ-রোধ করে। যাকে চিরকাল বিদেশী বলে মেনে এসেছি, আলাদিনের দৈত্যের মত বিপুলায়তন হয়ে গেল সে! আমাদের বোধের জগতে যে ছিল যৎসামান্য, বস্তুর জগতে সেই কিনা আজ হয়ে উঠল অসামান্য! তাহলে লক্ষ লক্ষ বছরের মনুষ্যজীবন এতকাল ধরে শিখেছে কী!" (পৃ: ২৬৩-৬৪)

ডঃ মাইতি পরমাণুর অন্তঃপুরের বিবরণ দিয়েছেন চারটি পর্বে। তারপরে এসেছেন পরমাণুর পারে—মহাজাগতিক রশ্মি, বিপরীত কণিকা, মেসনের জগতে। অতঃপর দুই পর্বে পরমাণুর পরিণাম (মানুষের আয়ত্তাধীন পরমাণু-শক্তি)। উপসংহারে ভর-তেজের দ্বন্দ্বমিলন—পদার্থগতি।

পরমাণুতত্ত্ব-সম্পর্কিত লোকায়ত বিজ্ঞানের বই বাঙলাভাষায় একটি-দুটির বেশি নেই। ডঃ মাইতির এই বইটি আরো একটি নয়, বিশিষ্ট একটি। দুই মলাটের মধ্যে পরমাণু-সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য নাগালের মধ্যে পাওয়া বাঙালি পাঠকের অতি বড় সৌভাগ্য। এই বইটির জন্যে বাঙালি পাঠক ডঃ মাইতির কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

তবে অত্যন্ত সুখের বিষয় হতো যদি নিপুণ তথ্যসংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হতো সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। ভূমিকা থেকে জানা যায়, এই বইটি লেখার আগে ডঃ মাইতি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ পড়েছেন। কিন্তু প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার এই বইয়ে তার বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। বরং এমন সব মন্তব্য আছে যা বিপরীত অর্থ-সূচক। যেমন, "এ পৃথিবীতে এই মন বস্তুটি প্রকৃতির এক আধুনিক সৃষ্টি, অভিনব সৃষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে নিয়ে প্রকৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এখন।" (পৃ: ৭) তার সূত্রটি কি? "কিন্তু প্রকৃতি যে মানসপদ্ধতিটি সৃষ্টি করে চলেছে, সেইটিই ত ঐ সূত্র। পৃথিবীর উপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা ভরতেজোময় মনঃপদার্থগুলি উপযুক্তভাবে সন্নিবিষ্ট বা সংস্থিত হলে ভর-তেজের স্বরূপ তো আর গোপন থাকতে পারেনা।" (পৃ: ১৬) এই উদ্ঘাটনের কৃতিত্ব কার? অবশ্যই বিজ্ঞানীর। "বাহাদুর বিজ্ঞানী বটে! আর তাঁর পরিকল্পনা। কত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।...বিজ্ঞানের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে শুধু জাতিধর্মনির্বিশেষে ব্যক্তি-মানুষ নয়, দেশকাল নির্বিশেষে

সবাই এসে যেন একাকার হয়ে গেল।…সকলেই মিলিত হয়ে গিয়ে যেন এক মহামানব-সত্তার অভ্যুদয় ঘটিয়ে দিলেন। জাতি ও দেশ-ভেদ লুপ্ত হয়ে গেল।…বিশ্ব-প্রকৃতির মহাযজ্ঞ-শালায় এসব জাতি-ধর্ম-দেশ-কাল-ভেদের কতটুকু মূল্য! কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকেই অবলম্বন করে মাতা বসুন্ধরার বক্ষস্তন্য দিয়েই যে স্বয়ং প্রকৃতি সেই বিরাট মনঃ-পদার্থটিকে সমগ্র বৈজ্ঞানিক তথা সমগ্র মানবসমাজের ক্রমসংহত বস্তুদর্শন-ভাবনার মধ্য দিয়ে ক্রমোদ্ভূত করে চলেছেন…" (পৃঃ ৩৩) ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞান-ভাবনার সঙ্গে সমাজের কোনো প্রকার সম্পর্ক আছে, কিংবা একক বিজ্ঞানীর সিদ্ধিও সামাজিক ভূমিকারহিত নয়, এ-ধরনের কোনো কথা যে ডঃ মাইতির পক্ষে লেখা সম্ভব নয়, তা এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে।

স্বভাবতই তাঁর ভাষায় ও বর্ণনাতেও ফিউডাল রোমান্টিকতা। একটি দৃষ্টান্ত দিই। "সেই কোন্ আদিম কাল থেকে প্রকৃতিকে নিয়ে মানুষ কত কল্পনার জাল বুনে এসেছে। কত অন্তরে কত আশার আলো জ্বলে উঠেছে, কত সৌরভে মনপ্রাণ ভরে গিয়েছে। কত লাবণ্যে কতনা নয়ন সার্থক হয়েছে, হৃদয় মন সব জুড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেই নয়নাভিরাম প্রকৃতিকে নিয়ে বিজ্ঞানীর আজ এ কী বিশ্লেষণ, চুলচেরা বিচার? অরুণের রথে আরোহন করে সূর্যদেবতা ছুটে চলেছেন আকাশে। জ্যোতির্ময় তাঁর রূপ। উদয়াচল থেকে তাঁর যাত্রা শুরু, অস্তাচলে গিয়ে তাঁর বিরতি। নরলোকেও অমনি নেমে আসে নিদ্রার আমেজ। অসীম সন্তোষে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। শান্তি, শান্তি, সুমধুর শান্তি। শ্রান্ত চেতনার কি মধুর মুক্তি। কিন্তু আবার কখন সে জেগে ওঠে। চেতনার কলরব পড়ে যায় তার সারা দেহে মনে, আর বহির্জগতের অরণ্যে কাননে বৃক্ষ-পল্লবে, সমুদ্র কল্লোলে। আবার সে 'রাঙাবাস-পরা' যোগিনীপারা ঊষার দিকে নয়ন উন্মীলন করে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, তপনোন্মুখ হয়। ক্রমেই সূর্যদেব এসে পৌঁছান তাঁর রথাশ্ব নিয়ে"…(পৃঃ ১৬৫-৬৬) ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমনি বর্ণনা এই বইয়ে একটি-দুটি নয়, অজস্র। প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার এই বইয়ের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি অংশ জুড়ে এমনি ধরনের প্রক্ষিপ্ত মন্তব্য ও উচ্ছ্বাস। এই অংশকে দার্শনিক আলোচনা ভাবতে পারলে খুশি হবার কারণ ঘটত। ডঃ মাইতির ভূমিকা পড়ে মনে হয়, দার্শনিকের চোখ দিয়ে বিজ্ঞানকে বিচার করে মূল্যসত্যে তিনি পৌঁছতে চান। সত্য কথা বলতে কি, পরমাণুর উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের জগতে যত তোলপাড় ও আলোড়ন ঘটেছে, এমনটি আর কোনো ব্যাপারে নয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বিজ্ঞানের দর্শনের আভাসটুকুও এই বইয়ে নেই। বরং বইয়ের যে অংশে (বিশেষ করে কোয়ানটাম পদার্থবিদ্যার অংশে) তিনি প্রায় পাঠ্যপুস্তকের ভঙ্গিতে সরাসরি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তথ্য উপস্থিত করেছেন, সেখানে তাঁর নৈপুণ্য অসাধারণ। এতখানি নৈপুণ্য সচরাচর চোখে পড়ে না। শুধু এই কারণে ডঃ মাইতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের পাত্র।

উত্তর বঙ্গের গ্রাম-সমীক্ষা

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাঙলার সমাজ-জীবনের রূপ সাম্প্রতিক কালে এত দ্রুত পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে যে, অল্পদিনের মধ্যেই ইহার প্রাচীনতর এবং মৌলিক রূপটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়া তাহার পরিবর্তে একটি নূতন রূপ আত্মপ্রকাশ করিবে। সমাজ-জীবনের ইহাই ধর্ম হইলেও সব সময়ই যে এই পরিবর্তন এত দ্রুত সাধিত হয়, তাহা নহে। নানা কারণেই কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে ইহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। বাঙলার গ্রাম্য জীবন বহুকাল পর্যন্তই অপরিবর্তিত ছিল; এ-দেশের রাজসিংহাসনের অধিকার লইয়া এতকাল রাজায় রাজায় সংগ্রাম হইলেও তাহার কোনো বিশেষ প্রভাব ইহার সমাজ-জীবনের উপর বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, এখানে সমাজ-জীবনের আর-একটি যে বন্ধন আছে—তাহা সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধর্ম। ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ-জীবনের সংহতি গড়িয়াছিল বলিয়াই, যখনই ধর্মের ধারার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসিয়াছে—কেবল মাত্র সেই সময় ব্যতীত বৃহত্তর সমাজ-জীবনে আর কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নাই। ধর্মেরও আর-একটি প্রধান গুণ এ-দেশে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা ইহার সমন্বয় সাধনের গুণ। ধর্মের ভিতর দিয়া প্রাথমিক বিরোধ যখন সৃষ্টি হইয়াছে, তখনই তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়া সেই বিরোধ দূর করিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছে। সেই প্রয়াস কোনোদিন ব্যর্থ হয় নাই। প্রথমত সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক বাঙলার সমাজের উপর যখন হিন্দুধর্মের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল, তখন ইহাদের মধ্যে প্রথম যে-বিরোধই সৃষ্টি হোক না কেন, কালক্রমে বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে এক সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া সমাজ-জীবন একটি বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়া স্থির হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বেই কবি জয়দেব যখন তাঁহার গীতগোবিন্দের মধ্যে

পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (প্রথম খণ্ড)। সম্পাদনা—অশোক মিত্র। সেনসাস অব ইণ্ডিয়া, ১৯৬৯। নয় টাকা পঞ্চাশ

বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হইতেই এই সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস আরম্ভ হয়। তারপর তুর্কী আক্রমণ প্রথম অবস্থায় সমাজের মধ্যে যে-অবস্থারই সৃষ্টি করুক না কেন, তাহার মধ্য দিয়াও তুইটি প্রধান সমাজের চিন্তাধারার মধ্যে ক্রমে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, ইহার প্রধান নিদর্শনই চৈতন্যধর্ম। শুধু তাহাই নয়, বাঙলাদেশের বিভিন্ন পল্লীতে যে পীরের দরগা এবং নানা লৌকিক ধর্মমত বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এই সমন্বয় সাধনের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ধারাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রধানত অগ্রসর হইয়া আসিলেও উনবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হইয়াছে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দী হইতেই এই ধারার পরিবর্তন দেখা দিয়াছে এবং ক্রমে সেই পরিবর্তন এত দ্রুতগতি লাভ করিয়াছে যে এক হাজার বছরেও ইহার যে পরিবর্তন হয় নাই, পঞ্চাশ ষাট বছরেই তাহা হইয়াছে। ইহার কারণ, যে-ধর্মকে এ-দেশের সমাজ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়া ইহার সংহতিকে এতদিন রক্ষা করিয়াছে; সেই ধর্ম এখন আর সমাজকে ধরিয়া চলিতে পারিতেছে না; সুতরাং সমাজের এতদিনের লক্ষ্য বিচ্যুত হইবার ফলে ইহা উল্কার মতো ছুটিয়া চলিয়াছে। এই দ্রুত পরিবর্তনের মুখে প্রাচীন ধারার আর কোনো চিহ্ন বর্তমান থাকিবে, এমন মনে করা কঠিন হইয়াছে।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাঙলার পল্লীজীবন জাতীয় সংস্কৃতির ধারকরূপে বর্তমান ছিল; এমন কি, কলিকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার পরও শতাধিক বৎসর পর্যন্ত পল্লীজীবনের সনাতন জীবনধারার কোনো ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে প্রধানত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পল্লীর কৃষিজীবন ইহার জনসংখ্যাকে পূর্বের মতো প্রতিপালন করিতে পারিতেছে না। সেই জন্য পল্লীবাসীও আজ যে-নূতন জীবনে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে পল্লীর সংস্কার রক্ষা এবং পালন করিবার কোনো উপায় নাই। সে-জীবন শিল্প-জীবন।

কিন্তু বাঙলার যে-জীবন বাঙালি সংস্কৃতির উৎস ছিল, তাহাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলেই কি আমাদের চলিবে? হয়তো ব্যবহারিক জীবনে তাহাতে কোনো অসুবিধা হইবে না, তথাপি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্যসন্ধানে যাহারা আগ্রহশীল, তাহাদের পক্ষে কিছুতেই তাহা ব্যতীত চলিতে পারে না। আর জাতির সাংস্কৃতিক ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ প্রত্যেক, প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই স্বাভাবিক।

সম্প্রতি 'পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা দপ্তর' বাঙলার গ্রামীণ জীবনের অবশেষটুকুর পরিচয় রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এক অতি দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। এখন পর্যন্তও বাঙলার গ্রাম্য জীবনের যে সাংস্কৃতিক উপকরণগুলি কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আছে, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা কয়েক খণ্ড গ্রন্থের আকারে তাহা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের নামকরণ করা হইয়াছে 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা।' ইহার প্রথম খণ্ডে উত্তর বাঙলার কয়েকটি জিলা, যথা মালদহ জিলা, পশ্চিম দিনাজপুর জিলা, কুচবিহার জিলা, জলপাইগুড়ি জিলা, দার্জিলিঙ জিলার মোট ৪১৮টি গ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মালদহ জিলার ১২৮টি গ্রামের, কুচবিহার জিলার ১০২টি গ্রামের, জলপাইগুড়ি জিলার ৮৪টি গ্রামের, পশ্চিম দিনাজ-পুর জিলার ৬৫টি গ্রামের এবং দার্জিলিঙ জিলার ৩৯টি গ্রামের তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

তথ্যগুলি যে-পদ্ধতিতে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা কতদূর যথাযথ অথবা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, সেই বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে। কারণ যাঁহারা এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে গিয়া প্রকৃত অবস্থা লক্ষ্য করেন নাই। কতকগুলি মুদ্রিত প্রশ্ন গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকের নিকট পাঠাইয়া তাহাতে তাহাদের উত্তর সংগ্রহ করা হইয়াছে। সেই উত্তরগুলিই যথাযথ মুদ্রিত করিয়া দিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। উত্তরগুলির ভিত্তিতেই ইহার বিভিন্ন পরিসংখ্যান, তালিকা রচনা এবং মানচিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং গ্রামের বিভিন্ন স্তরের অধিবাসীদিগের প্রদত্ত উত্তরগুলি যতদূর সত্য, এই বিবরণীও ততদূরই নির্ভরযোগ্য।

গ্রামের বিভিন্ন স্তরের অধিবাসী বুঝাইতে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্তরই মনে করা হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইতে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত ইহার উত্তরদাতা রূপে গৃহীত হইয়াছেন। অথচ প্রবেশিকা অনুত্তীর্ণ এবং এম-এ উত্তীর্ণ ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে, তাহা সত্য। তথাপি হিন্দু এবং মুসলমান উত্তরদাতার মধ্যেও পার্থক্য আছে। হিন্দু উত্তরদাতার নিকট যে-বিষয়ে গুরুত্ব আছে, মুসলমান উত্তরদাতার তাহা নাই এবং তাহার নিকট যে-বিষয়ে গুরুত্ব আছে হিন্দুর তাহা

নাই। সুতরাং তথ্য সংগ্রহের আদর্শ পদ্ধতি বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই সকল ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ (trained) ব্যক্তির প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। যেখানে পর্যবেক্ষণ দ্বারা সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় না, সেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রশ্ন দ্বারা (direct interrogation) তথ্যের উদ্‌ঘাটনের উপরও নির্ভর করা যাইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে observation এবং interrogation এই দুইটি পদ্ধতিই সাম্প্রতিক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ও ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্নোত্তর যত ফলপ্রসূ, চিঠিপত্র দ্বারা তত ফলপ্রসূ হইতে পারে না। পত্রদ্বারা এই প্রশ্নোত্তর পাইতে হইলে একই গ্রামের বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে উত্তর পাইলে বিভিন্ন দিক হইতে যেমন গ্রামের চিত্রটি প্রকাশ পাইতে পারে, তেমনই তাহাদের ভিতর দিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পায়। একই গ্রামে যদি বর্ণ হিন্দু, তপশিলী হিন্দু, আদিবাসী এবং মুসলমান বাস করে তবে তাহাদের এক-একজন প্রতিনিধির নিকট হইতে উত্তর পাইলে যেমন গ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রকাশ পায়, কেবলমাত্র একজন ঐরূপ গ্রামের শিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত হিন্দুর নিকট হইতে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং যখন পূর্ণাঙ্গ গ্রাম-বিবরণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা হইবে, তখন বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যতীত কিংবা উক্ত উপায় অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকিবে না। কিন্তু সহজভাবে একটি সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উক্ত গ্রন্থে যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আর কোনো পথ নাই। ইহাতে সাম্প্রতিক বাঙলার গ্রাম-জীবন সম্পর্কে যে সাধারণ জ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহার মূল্যও নিতান্ত অল্প নয়; কারণ এই দিকে ইতিপূর্বে আর কোনো প্রয়াস দেখা যায় নাই। 'জেলা গেজেটিয়র'গুলির ভিতর দিয়া সাধারণভাবে জেলার বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে, প্রত্যেকটি গ্রাম সম্পর্কে এই শ্রেণীর নিরীক্ষা তাহাতে দেখা যায় নাই। সুতরাং এই দিককার প্রয়াসের মধ্যে প্রাথমিক যে ত্রুটিই থাকুক, তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, ইহা একটি বিপুল প্রয়াস, মহৎ একটি উদ্দেশ্য সাধন করিবার যে সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ইহা অনেকখানি সহায়ক যে হইবে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রাম্য সমাজ-জীবন নিরীক্ষার প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন গ্রাম-দেবতা। কারণ, একদিন

যখন এক-একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ একই গ্রামে বাস করিত, তখন গ্রাম-দেবতাই গোষ্ঠীর সংহতি রক্ষা করিত। সেইজন্য গ্রাম্য সমাজ-জীবন নিরীক্ষার প্রধান লক্ষ্য রূপে গ্রাম-দেবতার ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করিবার প্রয়োজন হয়। বিশেষত পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে এমন গ্রাম এখনও আছে, তাহাদের ভিত্তি যে প্রাচীন গ্রাম-সংগঠনের উপর স্থাপিত হইয়াছিল—তাহা বুঝিতে পারা যায়। পল্লীর সমাজ-জীবনে গ্রাম-দেবতার স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকিলে তাহার বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিবার প্রেরণাও থাকিতে পারে না। বর্তমান সঙ্কলনে প্রায় প্রতি গ্রাম সম্পর্কেই উল্লেখিত হইয়াছে যে "গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে।" এই কালী গ্রাম-দেবতার স্তর হইতে কালীদেবীতে উন্নীত হইয়াছে কিনা, তাহা ইহার পূজাচার এবং গ্রামবাসীর সঙ্গে ইহার বর্তমান সম্পর্ক বিস্তৃতভাবে না জানিতে পারিলে বুঝিবার কোনো উপায় থাকে না। তথাপি এ-কথা অস্বীকার করিবার কোনো উপায় নাই যে গ্রামের অনেক কালী এবং শিবমন্দিরেই একদিন লৌকিক গ্রাম-দেবতার থান (স্থান নহে) ছিল। ক্রমে হিন্দুপ্রভাব বিস্তৃত হইবার পর হইতেই ইহারা শিব কিংবা কালীস্থানে পরিবর্তিত হইয়াছে। কোনো কোনো স্থানে ইহাদের উপর 'মন্দির' স্থাপিত হইয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক পূজিত হইবার ফলে ইহাদের মৌলিক পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণীর অনুসন্ধান বর্তমান সঙ্কলনের উদ্দেশ্য নহে; কি ছিল তাহা জানিবার পরিবর্তে কি আছে তাহাই জানাইবার উদ্দেশ্যে এই বিরাট গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা অবলম্বন করিয়াই সুক্ষ্ম-দৃষ্টি গবেষকগণ ইহার সম্পর্কে পুরাতত্ত্বের সন্ধান করিবেন। ভবিষ্যৎ গবেষণার উপকরণ সংগ্রহই ইহার উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে ইহা যতখানি সহায়তা করিতে পারিবে ততখানিতেই ইহার সার্থকতা। সেই বিষয়েই এখানে দুই-একটি বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

প্রথমত দেখা যায় বাঙলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই উত্তর বঙ্গেও বিভিন্ন কয়েকটি বিপরীতধর্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হইয়াছে; যেমন তাহাদের মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায় কিভাবে যে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেছে, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, "মালদহ জিলার হবিবপুরে সত্যম্ শিবম্ সম্প্রদায়ভুক্ত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিবপূজা, পশ্চিম দিনাজপুর জিলায় বালুরঘাট থানার অন্তর্গত বর্ষাপাড়ায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বারোয়ারী

কালীপূজা, এবং সরতলীগ্রামে তুরী ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বারোয়ারী কালীপূজা।” (গ্রন্থের ভূমিকাংশ, কোনো পৃষ্ঠাচিহ্ন নাই)। সংহত সমাজজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে উত্তর বাঙলার সাঁওতালগণ কিভাবে যে এক স্বতন্ত্র বৃহত্তর সমাজের কবলভুক্ত হইবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহা এই গ্রাম-বিবরণী হইতেই জানিতে পারা যাইতেছে। এইভাবে বাঙলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর ভিত্তি একদিন স্থাপিত হইয়াছিল।

উত্তর বাঙলা যে একটি অখণ্ড সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, অথচ ক্রমে তাহাতে আজ তাহাই সম্ভব হইয়া উঠিতেছে, তাহাও এই বিবরণী হইতেই জানিতে পারা যায়। পল্লীগ্রামের লোক যে যে-সম্প্রদায়ভুক্তই হোক, অর্থনৈতিক কারণেই পরস্পর পরস্পরের সহজেই নিকটবর্তী হইয়া বাস করে; সেইজন্য সেখানে যত সহজে সামাজিক সংহতি স্থাপিত হয়—অন্যত্র তাহা তত সহজে হইতে পারে না। যদিও গ্রাম-বিবরণীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী এবং জাতির লোকের উল্লেখ আছে, তথাপি ইহারা যে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে—গ্রামের বারোয়ারী পূজা, গ্রাম-দেবতার থান তাহারই জীবন্ত নিদর্শন। বিভিন্ন গ্রামের বিবরণী হইতেও এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইতে পারে।

পীরের দরগাও বাঙলার পল্লীর ধর্ম সমন্বয়ের একটি আদর্শ কেন্দ্রস্থল। মালদহ জিলার একটি গ্রামের বিবরণীতে পাওয়া যায়, “পীরের দরগায় মাসের এক বৃহস্পতিবার মানত শোধ দেওয়া হয়। প্রধানতঃ মুসলমানরা খাসী ও মোরগ মানত এবং হিন্দুরা মিষ্টান্ন মানত করেন। সেবায়েত জনৈক মুসলমান (পৃ. ৪)।”

পল্লীর সমাজ-জীবনের নিজস্ব একটি ধর্ম আছে, সেই ধর্মের নিকট হিন্দু ধর্মও যেমন স্বীকৃতি পায় না, মুসলমান ধর্মও তাহা পায় না। উদ্ধৃত বিবরণীটি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। পীরের দরগায় মানত দিবার দিনটি এখানে লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে বৃহস্পতিবার শিরনি দিবার দিন; যদি এই দরগায় ইসলাম ধর্মের শাসন সক্রিয় থাকিত তবে বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে শুক্রবার মানত শোধ করিবার দিন ধার্য থাকিত। কিন্তু পীরের দরগায় বৃহস্পতিবার পবিত্রতম দিন বলিয়া গণ্য হইবার ধর্ম-বহির্ভূত নানা কারণ থাকিতে পারে। এমন কি, হিন্দুর সাধারণ ধারণায় বৃহস্পতিবার যে লক্ষ্মীবার বলিয়া পবিত্র বিবেচিত হয়, তাহার প্রভাব ইহার উপর থাকা কিছু বিচিত্র নহে। ধর্ম-সমন্বয়ের ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যাইতে পারে?

মালদহ জিলার কোতয়ালী গ্রামের জহরা কালীর বিবরণটি (পৃ. ৭) আর-একদিক হইতে ধর্মসমন্বয়ের নিদর্শন দিয়াছে। সাঁওতাল পল্লীর বহির্ভাগে সাধারণত ঝোপেঝাড়ে আচ্ছন্ন একটি স্থান থাকে, তাহা পূজাস্থান বলিয়া গণ্য করা হয়, স্থানটির নাম জহর বলিয়া উল্লিখিত হয়. কোতয়ালী গ্রামে ইহা মূলত তাহাই ছিল। ক্রমে এই অঞ্চলে হিন্দুপ্রভাব বিস্তার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালী পূজাস্থান জহর শব্দটির সঙ্গে কালী শব্দটি যুক্ত হইয়া ইহা গ্রামের জনসাধারণের পূজাস্থানরূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং ইহার সঙ্গে আজ সাঁওতাল সম্পর্ক গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। জহরা কালীর নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে প্রকৃত হিন্দু তান্ত্রিক দেবী কালীর সঙ্গে তাহার যে কোনো সম্পর্ক নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বিবরণীতে পাওয়া যাইতেছে, জহরা কালীর কোনো প্রতিমা নাই, গোলাকার একটি মৃত্তিকাস্তূপকেই জহরা-মা জ্ঞানে পূজা করা হয় (পৃ. ৭)। বলাই বাহুল্য, ইহা প্রাচীন গ্রাম-দেবতারই পরিচয়। সুতরাং একদিনকার সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম আজ কিভাবে যে অন্য সম্প্রদায়ের প্রভাবের বশবর্তী হইয়াছে, তাহা ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' প্রথম খণ্ডের উত্তর বঙ্গের গ্রাম-বিবরণী সঙ্কলনের মধ্য হইতে বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের এই সকল মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে!

এই গ্রামেরই প্রথম রবিবার যে সূর্যব্রতের অনুষ্ঠান হয়, তাহাও তাৎপর্য-মূলক। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, মকর সংক্রান্তির পরই সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, সেই উপলক্ষে বাঙলার প্রায় সর্বত্রই একভাবে না একভাবে সূর্যের ব্রত উদ্‌যাপিত হয়, পূর্ব বঙ্গের মাঘমণ্ডল ইহারই এক আঞ্চলিক সংস্করণ। সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের অখণ্ডতার যে পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা বাঙালির ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। তথাপি বিবরণগুলি এত সংক্ষিপ্ত যে ইহাদের মধ্য হইতে উৎসবগুলির প্রকৃত চিত্র কিংবা রস কিছুই সংগ্রহ করা যায় না। যেমন কোচবিহার জিলার কার্তিকপূজার বর্ণনায় কেবলমাত্র পূজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু তাহাতে গ্রামের মহিলারা যে "মিলিতভাবে নাচ গান করেন" (পৃ. ৭৫১) তাহাদের কোনো পরিচয় নাই। এখানে গানের নিদর্শন এবং নাচের বর্ণনা দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না দেওয়াতে ইহাদের প্রকৃত চিত্রটি প্রকাশ পায় নাই।

বিক্ষিপ্তভাবে হইলেও এই মূল্যবান সঙ্কলনের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে; সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্বের আলোচনায় তথ্যগুলি অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হইবে। যদিও যাঁহারা এই তথ্যগুলি পরিবেশন করিয়াছেন, এই সকল তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো জ্ঞান কিংবা চেতনা হইতে তাঁহারা ইহা সঙ্কলন করেন নাই, তথাপি ইহাদের এই মূল্য যে প্রকাশ

পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইজন্যও এই গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

গ্রন্থটির দুইটি ভূমিকা আছে। একটি 'কথাপ্রসঙ্গে' শিরোনামায়' লিখিয়াছেন শ্রীসুকুমার সিংহ। দ্বিতীয়টি 'সংকলন ও গ্রন্থনা প্রসঙ্গে', লিখিয়াছেন শ্রীঅরুণকুমার রায়। বিচ্ছিন্ন উপকরণগুলির ভিত্তিতে উত্তর বাঙলার জন-জীবনের একটি সামগ্রিক পরিচয় ইহাদের মধ্য দিয়া কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর বাঙলার বিশেষ কতকগুলি অনুষ্ঠান যেমন গম্ভীরা প্রভৃতি সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র এবং সামগ্রিক আলোচনা ইহাতে থাকিলে ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইত। প্রসঙ্গত হরিদাস পালিতের অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'আদ্যের গম্ভীরা' বইটি ইহাতে আদ্যোপান্ত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে সত্য, তথাপি সাম্প্রতিককালের গম্ভীরা অনুষ্ঠানের একটি বিবরণের প্রয়োজন ছিল, পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল পূর্বে রচিত 'আদ্যের গম্ভীরা'য় উল্লিখিত বহু অনুষ্ঠানই আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূজাপার্বণ এবং মেলার বিবরণীর মধ্যে প্রাচীন গৌড়ের মসজিদগুলির চিত্র দিবার কোনো সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হইবে না।

যদিও গ্রন্থের নামকরণে 'পূজাপার্বণ এবং মেলা'র কথাই বলা হইয়াছে, তথাপি গ্রামের ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের কিছু কিছু পরিচয়ও ইহাতে আছে। তাহাতে পূজাপার্বণের কিংবা মেলার বিবরণী সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। মেলার বিবরণী বিস্তৃতভাবে সংগ্রহ করিবার নির্দেশ থাকিলেও উত্তরদাতাগণ প্রকৃতপক্ষে তাহার নিতান্ত মামুলি উত্তর দিয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রেই কেবল মাত্র মেলার সময় এবং নামটি উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু মেলার উদ্ভব কিভাবে যে হইয়াছিল, সে-গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন। বাহির হইতে দেখিলে পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, উত্তর বিহার, দক্ষিণ বঙ্গ ইত্যাদি সব অঞ্চলের মেলাই এক। একই দোকানপাট ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল মেলাতেই যায়, সুতরাং সাহুল্লাপুরের মেলাও যাহা (পৃ.৭-৮), কুম্ভিরা গ্রামের মেলাও তাহা। মেলার পার্থক্য কেবলমাত্র ইহাদের প্রত্যেকের উৎপত্তির ইতিহাসে। সুতরাং সেটির সন্ধান করিতে না-পারিলে কেবল মাত্র তাহার বহুমুখী পরিচয় দিয়া গ্রামের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে পারা যাইবে না। প্লাস্টিকের যুগে আজ সর্ব মেলাই একাকার হইয়া গিয়াছে, পূর্বে মৃৎশিল্পে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। আজ এ্যালুমিনিয়ামের যুগে তাহাও লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন স্থানের মেলারই এক এবং অভিন্ন রূপ। কিন্তু প্রত্যেকটি মেলারই উৎপত্তির ইতিহাস স্বতন্ত্র। সুতরাং তাহাই অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ গ্রাম্য উত্তরদাতাদিগের নিকট হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না।

তথাপি এই বিপুল শ্রমসাধ্য কার্য, যাঁহারা যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করিতে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙলাদেশের সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন।
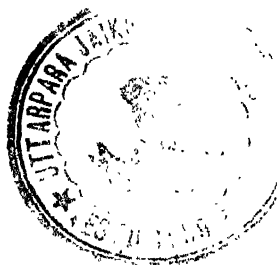
তুলনা যার নাই

চিন্মোহন সেহানবীশ

..."আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি, এই লেখাগুলি নিতান্তই আমার জীবনের স্মৃতিচয়ন"—গোড়াতেই পাঠকদের এ-কথা মনে রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন লেখক তাঁর 'কৈফিয়ত'-এ। বইয়ের নামকরণ থেকেও নামপত্রে শিরোনামার ঠিক নিচেই 'স্মৃতিচয়ন' কথাটি ফের জুড়ে দেওয়ার দরুনও সেই প্রত্যাশাই আরো স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় আমাদের তরফে।

ডিমাই সাইজের ৪৪৩ পৃষ্ঠার এই বিশাল প্রথম খণ্ডটি পড়তে পড়তে কিন্তু আমার বারবার মনে পড়ছে প্রভাতকুমারের লেখা জীবনীর প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সেই সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্যের কথা—এতো দেখি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের জীবনী! সুধীরঞ্জনের এই বইয়েরও ১৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম পর্বের বিষয়-'আদি নিবাস ও বংশ পরিচয়'; ঠিক তারপরেই নবম অধ্যায়ের নাম—'পিতামাতার বিবাহ' (বইয়ের নাম কিন্তু 'যা দেখেছি যা পেয়েছি') আর দশম অধ্যায়—'পশ্চিম-বাড়ির নূতন সোনা বৌ' হলো লেখকের মা যখন দশ বছর বয়সে প্রথম শ্বশুরবাড়ি এলেন, তারই বৃত্তান্ত! আরো এক অধ্যায়ের পর ১৫৫ পৃষ্ঠায় আমরা অবশেষে পৌঁছই 'আমার জন্ম'-এ। অর্থাৎ বইখানির প্রথম দুই পর্ব জুড়ে রয়েছে এমন সব ব্যাপার যা স্মৃতিচয়ন নয় কোনো মতেই।

বলা যেতে পারে, তা নয় হলো, স্মৃতিচয়ন কথাটা না হয় কিছুটা আলগা ভাবেই বলা হয়েছে—কি এমন এসে যায় তাতে! আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি আর গোপীমোহন দাশের নাতি যেহেতু ব্যক্তিত্বের দিক থেকে ঠিক এক পদার্থ নন, তাই প্রথমের বেলায় যা অচল দ্বিতীয়ের ক্ষেত্রেও তা বাতিল করতে হবে কেন সরাসরি? সে-জীবনবৃত্তান্তে কিছুটা আটপৌরে খুঁটিনাটি ঢুকে পড়লে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়?

ব্যাপারটা আসলে নিছক খুঁটিনাটি নয়। সবাই বোঝেন, এটা বেমালুম

যা দেখেছি যা পেয়েছি। প্রথম খণ্ড। সুধীরঞ্জন দাশ। বিশ্বভারতী। চোদ্দ টাকা।

বাদ দিয়ে কি 'স্মৃতিচয়ন', কি 'জীবনী', কোনোটাই সম্ভব নয়। আসল কথা খুঁটিনাটিগুলি লেখার গুণে মূল বক্তব্যের অঙ্গ হিসেবে এক নিটোল ব্যক্তিত্বের অথবা গোটা সমকালের আবশ্যিক উপাদান হয়ে উঠেছে; না খোঁচাখোঁচা বেরিয়ে থেকে পাঠককে অবিশ্রাম বিঁধছে ও তাই ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে রচনার। সুধীরঞ্জনের এই জীবনী সার্থক হতে পারেনি কারণ তুচ্ছকেও অসামান্য করার যাদু তাঁর আয়ত্তে নেই। আর নেই যখন, তখন কথাটা সবিনয়ে স্বীকার করে তাঁর পক্ষে সমীচীন হতো ঐসব খুঁটিনাটিতে রচনা ভারাক্রান্ত না করে বরং সোজা-সুজি সত্যকার স্মৃতিচয়ন লেখারই চেষ্টা করা। কারণ মুস্কিল এই যে ভাগ্যের এমনি ফের যে যার বেলায় খুঁটিনাটি অচল বলা হয়েছে সেই দ্বারকানাথের পৌত্রের ক্ষেত্রেই বরং পাঠক এমন সব জিনিস নিজের গরজেই বরদাস্ত করতে রাজি থাকবেন, অন্যের বেলায় যাতে লাঠি বাজবার সমূহ আশঙ্কা। পাঠকের তরফে এটা হয়তো অবিচার, কিন্তু একথা ভুললে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হবে না লেখকের পক্ষে।

কি দেখব, কি পাব—তাতো অনেকটাই নির্ভর করে আমারই দেখার ও পাওয়ার শক্তির উপরেই। সুধীরঞ্জনের দৃষ্টিভঙ্গির বা গ্রহণক্ষমতার কি পরিচয় মেলে এই স্মৃতিচয়নে? বইটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে দুটি মজ্জাগত অভিমানে—বংশগরিমায় ও আত্মগরিমায় লেখকের সমাজ-মানসিকতা এতো আচ্ছন্ন যে তার বাইরে অন্য কিছু দেখার ও তাই পাওয়ারও তাঁর তেমন ফুরসৎ নেই। যেখানে তিনি ঐ অভিমান কিছুটা সংযত করতে পেরেছেন, সেখানে তাঁর লেখা অনেক সময়ে কিছুটা উতরেছে; যেমন তেলিরবাগের বা মামার বাড়ি হাসাড়ার বাল্যস্মৃতি (১৭-৯৩ পৃষ্ঠা), শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কৈশোর যাপনের কাহিনী (২১৬-৫০ পৃষ্ঠা), মানুষ ও আত্মীয় চিত্তরঞ্জনের নানা ঘরোয়া কথাবার্তা, চিত্তরঞ্জন ও সতীশরঞ্জনের বিপরীত ব্যক্তিত্বের কথা (৭৮-৮০ পৃষ্ঠা), প্রথম বিলেত যাওয়ার গল্প ইত্যাদি।

আপসোসের কথা, এমনটি ঘটেছে কদাচিৎই। সেই যে উৎসর্গপত্রেই শুরু হয়েছে "তেলিরবাগ গ্রামের অভিজাত দাশগোষ্ঠির এক অকিঞ্চন সন্তানের" প্রসঙ্গ, তারপর সারা বই জুড়ে থেকে থেকে অনবরত শোনা গেছে "অভিজাত বংশ" বা "উঁচু বংশ"র মহিমাকীর্তন (৭, ৫২, ৫৩, ১১৮, ১৩৯ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) সত্যই...."তাঁরা যে বিক্রমপুরস্থ তেলিরবাগ গ্রামের যদুনন্দন বংশজাত খ্যাতনামা দাশগোষ্টির সন্তান এ আভিজাত্যাভিমান তাঁরা কখনই বিস্মৃতিহন নি" (২৮ পৃষ্ঠা)—অন্তত এ-ক্ষেত্রে হননি, আমাদেরও হতে দেননি!

আর কিসের এ-আভিজাত্যগৌরব, সে-কথাও বেশ বিশদ করে লেখা রয়েছে ১১৭ পৃষ্ঠায়ঃ "....আমাদের দাশগোষ্ঠী থেকে তিন পুরুষের মধ্যে কত মোক্তার, এ্যাটর্নি, উকিল, ব্যারিস্টার, সব-জজ ছোটো আদালতের ও ট্রাইবুনালের জজ, হাইকোর্টের জজ, অধ্যাপক, উপাচার্য, ইঞ্জিনীয়ার ও বড়ো চাকুরে প্রস্তুত হয়েছে।" তারপর আপনাদের অবগতির জন্য আরো খোলসা করে জানানো হয়েছে কে কি ছিলেন,—কে ব্যারিস্টার, কে হাইকোর্টের জজ, কে উপাচার্য, কেই বা ছিলেন 'সর্বভারতীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ'।

হিসেব নির্ভুল, তবু কি আশ্চর্য পাকা ও নিরেট এর পিছনকার মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের বনিয়াদ আর অদ্ভুত বেমানান তেলিরবাগের যদুনন্দন বংশের এই aristocratic tribalism, এই 'ভেদচিহ্নের তিলক পরা সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য' বিশেষ করেই আজকালকার এই ব্রাত্য আর অন্ত্যজ—'সর্বব্যাপী সামান্যের', 'সমস্তের ঘোলা গঙ্গাজলে' নামবার দিনে!

আর 'অভিজাত দাশগোষ্ঠীর...অকিঞ্চন সন্তান'টি যে শেষ দুটি শব্দ নেহাৎ বিনয়বশতঃই লিখেছেন তার ভূরিভূরি প্রমাণও এ বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়ানো (৭, ৫৩, ৮৯, ১৪৬, ১৬০, ১৬২, ১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারেঃ "....বড়ো হয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'দিদিমাগো, তোমার কর্তা তো বড়োলোক আছিলেন। তোমরা কি দেইখ্যা পনেরো বছরের বয়স থার্ড ক্লাসের পড়ুয়া পোলা যার বাপ অন্ধ তার লগে তোমাগো একমাত্র মাইয়ার বিয়া দিছিলা।' দিদিমা হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'আরে সেই আমলে মাইনসে মাইয়া বিয়া দিত বংশ দেইখ্যা। তেলিরবাগের যদুনন্দন বংশের দাশগুষ্ঠীর খুব নামডাক আছিল। ফলটা তো কিছু খারাপ হয় নাই! কি কস্'? বলেই আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন" (১৩৯ পৃষ্ঠা)।

দিদিমার প্রশ্নের জবাব নাতি সেদিন মুখে কি দিয়েছিলেন ইতিহাসে বা স্মৃতিচয়নে তা লেখা নেই বটে, তবে মনে মনে তিনি কি জবাব আজো দিচ্ছেন, তা আঁচ করা চলে এ-সবের পর।

মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের নানা বৈপরীত্যের নমুনাও যথেষ্ট এই বইতে। যেমন, একদিকে তেলিরবাগের "যদুনন্দন বংশের" সরলা রায়, লেডী বসু, অমলা, ঊর্মিলা" দাশের মতো শিক্ষিতাদের জন্য আত্মশ্লাঘা (১১৭ পৃষ্ঠা), আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে "...মা কোনোমতে বাংলা ছাপা বই একটু একটু পড়তে পারতেন এবং খুব সামান্যই বাংলা লিখতে পারতেন নানারকম বানান ভুল করে। কিন্তু

সেকালের মেয়েদের মনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ির মানুষদের আপন করে নেওয়া এবং তাঁদের সুখী করা যে মেয়েদের একটা অবশ্যকর্তব্য এই বোধটি তাঁদের মা জ্যেঠি খুড়ির ব্যবহার দেখে এবং নানা ব্রতাদির কথা শুনে তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকত। অনেক লেখাপড়ার চেয়ে এই শিক্ষাটুকুর দাম ছিল ঢের বেশি" (১৭২ পৃষ্ঠা)।

অর্থাৎ গাছেরও খাব, তলারও কুড়ব।

ছাত্রাবস্থায় লেখক যখন অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে ছিলেন, তখন সেখানকার এক ছাত্র আফিং খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে লেখক দেখলেন "তার জিভটা ফুটো করে একটা তার দিয়ে সেই জিভটাকে বাইরের দিকে একটা সাঁড়াশির মতন জিনিস দিয়ে টেনে রেখেছে...। এরকম দৃশ্য আমি জীবনে আগে কখনো দেখিনি বলে ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। সেই জন্যে মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার ও পড়ুয়াদের 'প্রেমের ব্যাপার আছে নাকি মশায়'—এই ধরনের পরিহাসটা সেই পরিবেশে ভালো ঠেকেনি"।—এ-অবধি বেশ বোঝা যায়। কিন্তু ঠিক তার পরের লাইনেই যখন পড়ি "বস্তুত ছেলেটি খুবই সচ্চরিত্র ও পড়াশুনায় ভালো ছেলে ছিল" (৩৩০পৃষ্ঠা) তখন অবাক লাগে। যেন প্রেমে পড়া আর সচ্চরিত্র ও পড়াশুনায় ভলো ছেলে হওয়া কিছুতেই যুগপৎ চলতে পারে না! আরো অবাক লাগে এই জন্যে যে নিজে সচ্চরিত্র ও পড়াশুনায় মোটের উপর ভালো ছেলে হওয়া সত্ত্বেও লেখকের নিজের রোমান্সের কাহিনী শুরু হয়েছে এর ঠিক পাঁচ পৃষ্ঠা পরেই—কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে তখনো তিনি ঐ অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলেরই বাসিন্দা—আর চলেছে একেবারে শেষ পৃষ্ঠা অবধি।

বিলেতের একটা ঘটনা থেকে লেখকের মন বেশ বোঝা যায়। লেখক যখন প্রথম বিলেত যান তখন যুদ্ধ (১৯১৪-১৮ সনের) চলছে। ইংরেজ ছাত্রেরা প্রায় সবাই যুদ্ধে চলে গেছে—পড়ুয়াদের মধ্যে আছেন ভারতীয় ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ছেলেরা: গ্রেজ ইনের ছাত্র হিসেবে লেখক সেখানকার লাইব্রেরির গরম ঘরটিতে পড়তে যেতেন। দারুণ শীতের মধ্যে বাড়ি না ফিরে বা রাস্তায় বেরিয়ে দোকানে চা খেতে যেয়ে ছাত্ররা অনেকেই কমনরুমে বসেই চা, কফি এবং টোস্ট, ডিম, জ্যাম ইত্যাদি খেতে পেতেন—পরিচারক চার্লসের কল্যাণে। একদিন তারও ডাক এলো যুদ্ধে যাওয়ার। ফলে ছাত্ররা কিছুটা অসুবিধায়

পড়লেন। তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন জানালেন এর প্রতিবিধানের জন্যে। তাতে অনেকেই সই দিলেন—লেখক দিলেন না, কারণ এতে এমন কিছু অসুবিধা হবে না যার জন্যে এরকম আবেদন করা যায়।" আবেদনের উত্তরে জবাব এল যে এ-ব্যাপারে গ্রেট্ ইনের ট্রেজারার আবেদনকারীদের সঙ্গে দেখা করবেন। লেখকের মতো যারা সই করেননি তাঁরা বলেছিলেন কর্তৃপক্ষ না পড়েই আবেদন ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দিবেন। কাজেই ট্রেজারার দেখা করবেন বলায় তাঁরা ম্রিয়মাণ ও আবেদনকারীরা উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

এ পর্যন্ত বুঝতে অসুবিধা হয় না। এমন কি তারপর আবেদনকারীরা ট্রেজারার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে যখন সুবিধা করতে পারলেন না তখন লেখকের মতো যাঁরা গোড়াতেই সই দেন নি এবং মনে করেছিলে কর্তৃপক্ষ আবেদন কানেও তুলবেন না, তাঁরা যে এবার উল্লসিত হয়ে উঠবেন—তাও স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি কোন যুক্তিতে আবেদন অগ্রাহ্য করলেন তা বিবেচনা করলে লেখকের পাল্টা উল্লাস কি রকম যেন অদ্ভুত ঠেকে আমাদের কাছে। কারণ ট্রেজারার ছিলেন সার ফ্রেডারিক স্মিথ (উত্তরকালে যিনি লর্ড বার্কেনহেড) আইরিশ হোমরুল বিরোধী আলস্টারের অন্যতম নেতা যার ডাক নাম হয়ে গিয়েছিল গ্যালপিং স্মিথ। তিনি ছিলেন সার এডওয়ার্ড কার্জনের ডান হাত এবং অতি দুর্মুখ বলে ছিল তাঁর অখ্যাতি।

এ হেন ব্যক্তি আবেদনকারীদের বললেন, 'gentlemen, আপনারা দূর দেশ-দেশান্তর থেকে আমাদের দেশে পড়াশুনা করতে এসে আমাদের দেশের আতিথ্য লাভ করেছেন। পৃথিবী জুড়ে একটা জীবনমরণ যুদ্ধ চলেছে। আমাদের ছেলেরা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়ে যুদ্ধে গেছে তাদের রাজা, তাদের দেশ এবং সাম্রাজ্য, যেখানকার লোক আপনারা তা বাঁচাবার জন্যে। এই দারুণ শীতে সে-সব ছেলেরা ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে লড়ছে। মাথায় তাদের পড়ছে বরফ এবং সেই বরফগলা জলের কাদায় গোড়ালি পর্যন্ত ডুবিয়ে যুদ্ধ করছে আপনাদের কল্যাণের জন্যেও। আপনাদের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগছে না' (৪২৪ পৃষ্ঠা)।

আশ্চর্যের ব্যাপার সাম্রাজ্যরক্ষার এই ওজস্বিনী বক্তৃতা সম্পর্কে লেখকের তখন না হয় কিছু বলার ছিল না, এখনো কিন্তু নেই!

দৃষ্টিভঙ্গীর এই সব গোড়ায় গলদ ছাড়া দুটি তথ্যের ভুল নজরে এল। "আলিপুরের সরকারী উকিল....যিনি নর্টন সাহেবকে মামলায়" (আলিপুর বোমার মামলায়) "সাহায্য করেছিলেন"-ও যাঁকে "দিনে দুপুরে গুলি করে হত্যা করা" হয় (২৭৭ পৃষ্ঠা) তাঁর নাম সুরেশ বিশ্বাস নয়, আশুতোষ বিশ্বাস। আর ৩৩২ পৃষ্ঠায় যাঁর কথা লেখক বলেছেন তাঁর নাম 'রডিন' নয় রথীন হালদার।

কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারও কানে ঠেকল: "গলা খেঙ্কুর" দেওয়া (৩৪২

পৃষ্ঠা—'খাঁকার' বা 'খাঁকারি' দেওয়া অর্থে), "চোখের জিলিক মারা" (৩১৪ পৃষ্ঠা—ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না), "মায়াবী মেয়েমানুষ" (২৫৯ পৃষ্ঠা—'মায়াবিনী' অর্থে নয়, বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়েছে 'মমতাময়ী' অর্থে), "হাপুস চোখে চাওয়া" বা "দেখা" (১০২ পৃষ্ঠা ও অন্যত্র—আমরা সচরাচর "হাপুস নয়নে কাঁদি") ইত্যাদি।

আরো কোনো কোনো শব্দ ব্যবহার বা বানান দেখে সন্দেহ হলো শান্তি-নিকেতনে বছরের পর বছর অবস্থান এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য সত্ত্বেও তেলিরবাগের সুদূরপ্রসারী ঐতিহ্য বোধহয় এখনো অম্লান। যেমন সম্ভবত 'জ্বালানো' বা 'ক্ষেপানো' অর্থে অনবরত 'টাগানো' শব্দের প্রয়োগ (১৬১,৩১২, ৩২২, ৪১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। 'কুঁইপিঠে' (২৬৭ পৃষ্ঠা) শব্দটার অর্থবোধই হলো না। তারপর 'র-ড়' বিভ্রাটের নজিরও কম নয়: "ঢাকঢাক গুরগুর" (৯৪ পৃষ্ঠা), "কোঁচরে থাকত...মুনের পোটলা" (১৮৫ পৃষ্ঠা ও পরে ১৯৭ পৃষ্ঠা), "ঝড়ে মেড়াপ উড়ে যায় আর কি" (২৬৭ পৃষ্ঠা) এবং সব থেকে মারাত্মক "যেমন অন্যান্য ইংরেজ মহিলারা স্কার্ট ও ব্লাউজ পড়ে থাকেন ইনিও সেই রকমই পড়েছিলেন" (৪০১ পৃষ্ঠা—একটি বাক্যের মধ্যেই দু-দুবার)।

একটা কথামনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত। সুধীরঞ্জন তাঁর এই স্মৃতিচয়নে জগদানন্দ, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন প্রভৃতি তাঁর গুরুদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন—উল্লেখ করেছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী ঐকান্তিক সাধনা ও নিষ্ঠার। অথচ আশ্চর্য ঠেকে যখন দেখি বিশ্বভারতী থেকে ঐ সব আচার্যদের রচনা প্রকাশের ধারাবাহিক ও যথাযথ ব্যবস্থা এখনো করা গেল না—হরিচরণের সাধনা ও নিষ্ঠার ফলও আমাদের গোচরে এলো সাহিত্য অকাদেমীর কল্যাণে, বিশ্বভারতীর নয়। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও বহু বই বহুদিন যাবৎ বাজারে অনুপস্থিত। তাঁর 'চিঠিপত্র' তো দশম খণ্ডের পর আর প্রকাশিত হয়নি, সেও তো কয়েক বছর হয়ে গেল। অথচ তাব বদলে প্রকাশিত হলো এই বিশাল স্মৃতিচয়ন—আসলে তারও প্রথম খণ্ডটি মাত্র। আর দ্বিতীয় খণ্ড যেহেতু শুরু হবে লেখকের কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাই তাতে তিনি 'যা পেয়েছেন' তার কাহিনী কি আর অল্পের মধ্যে সারা যাবে ?

আরো একটা কথা। কেন হঠাৎ জীবন কাহিনী লিখছেন তার কারণ হিসাবে লেখক 'কৈফিয়ত' দিয়েছেন এই..."আমার নাতিনাতনীদের কাছে আমি একটি আদর্শপুরুষ, 'হিরো' বললেও চলে। তাঁরা অনেক সময় আমার জীবনকাহিনী শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন" (৭ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি। এ-আগ্রহ একান্ত স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক আদর্শ পুরুষের পক্ষে তাঁর আদর্শের কথা নাতিনাতনীদের জানানোর ইচ্ছা। এতে আমাদের কিছুই বলার নেই শুধু একটি কথা ছাড়া—সেই আগ্রহ পূরণের ব্যবস্থা কেন সরকারের খরচে হবে ?

উজান থেকে ভাঁটিতে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কোনো গল্প যখন অস্তিত্বের মূল ধরে টান দেয়, তখন আশ্চর্যজনক ভাবে জ্যাক লণ্ডনের সেই প্রৌঢ় বক্সারের গল্পটি মনে পড়ে যায়। যার চামড়া শিথিল হয়ে গেছে, লড়াকু মেজাজে ও সাহসে ভাটা পড়েছে, বয়স যার চোখের সামনে অনিবার্য পতনের ছায়া নিয়ে আসছে, যাকে লড়ে যেতে হচ্ছে একগাদা মুখে রুটি জোগানোর ও ক্রমে বেড়ে-ওঠা দেনা শুধবার জন্য। অসহায় হাতে গ্লাভস আঁটতে আঁটতে যার মনে পড়ে—পৃথিবী একদিন তার পায়ের সামনে রাজার মুকুট নামিয়ে রেখেছিল, তার সতেজ পেশিতে একদিন চিতাবাঘ খেলে ফিরত।

আর মনে পড়ে গোর্কি-কে। কোনো সরলীকরণের গোঁজামিল দিয়ে নয়; কষ্টকর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের জটিলতার মধ্য থেকে যিনি মানুষের উন্মেষ ঘটিয়েছেন। এই দুই মহান লেখকের শিল্প ও জীবনকে সমীকরণ করার সংগ্রাম হয়তো অজান্তেই গনগনে আঁচ ও প্রেরণা দিয়েছিল বাঙলাদেশের একজন এককালীন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী-লেখককে। তিনি সমরেশ বসু। যাঁর সমস্ত প্রশ্ন, অনুসন্ধান ও তৃষ্ণা এসে নাগরিক ব্যক্তিত্বের টুকরো হয়ে ভেঙে-পড়া অন্ধকারে ছড়িয়ে গেছে, সেই সাম্প্রতিক সমরেশ বসু নন। আগেকার সমরেশ বসু।

প্রলেতারীয় লেখকের মেজাজ ও মর্জি নিয়ে সমরেশ বসু বাঙলা গল্পের একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ যুগে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই মর্জি আকাশ থেকে পড়ে-পাওয়া বিষয় নয় বা তথাকথিত বিশেষজ্ঞতার ব্যাপারও নয়। পুঁজিবাদী সমাজ, ভূস্বামী ও আমলাকেন্দ্রিক পরিবেশের জোয়ালে বাঁধা অবস্থায় মানবতার যে বিদীর্ণরূপ—তার প্রকাশকেই প্রলেতারীয় সংস্কৃতির পূর্বশর্ত বলা যেতে পারে। প্রাক্তন যুগের সবচেয়ে মূল্যবান ঐতিহ্যকে বর্জন না-করে বাঙলা গল্পের বিকাশের ধারাকে সমরেশ বসু শুধু ধরতে

সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প। সম্পাদনা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। আট টাকা

চেষ্টা করেননি, বাস্তব অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে অবলম্বন করে অগ্রগতির পথে সামিল হয়েছেন। ১৯০৮ সালে ম্যাক্সিম গোর্কি-কে লেখা একটি চিঠিতে লেনিন বলেছিলেন যে, প্রলেতারীয় শিল্পী সর্বস্তরীয় দর্শন থেকে নিজের সৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান খুঁজে নিতে পারেন। এই চিঠিতেই তিনি লেখেন, "আপনার (গোর্কির) মতামত, শিল্প-অভিজ্ঞতা ও দর্শন ভাববাদী দর্শন থেকে উপাদান সংগ্রহ করেও এমন পরিণতি পেতে পারে, যা শ্রমিকজীবনের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হয়ে ওঠা সম্ভব।"

বাঙলা ছোটগল্পের শক্তিমান ধারার একটি স্বাভাবিক অধ্যায়রূপেই সমরেশ বসুর সেই গল্পগুলি রচিত হয়েছিল। জীবনের বহুমুখী প্রেরণার তাপে তিনি যা লিখেছিলেন—তার উৎস ছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কথঞ্চিৎ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায়। বলা বাহুল্য, নিজস্ব ক্ষমতায় সেই অর্জিত সম্পদকে তিনি অনেকখানি বাড়িয়েছিলেন ও শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের আদর্শে খাটিয়েছিলেন। একদিকে ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলের লৌহময় অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে আবহমানের বাঙলার নদী-গ্রাম-ভিত্তিক জীবনের স্মৃতিচারণ ও সর্বোপরি পার্টিজান শিল্পীর সঠিক নির্বাচন ও প্রয়োগপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পগুলিতে এক হৃদয়বান, ঐক্যময় শিল্পরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

'আদাব', 'জলসা' ও 'প্রতিরোধ'—এই গল্প তিনটি যখন প্রকাশিত হয়েছে, সমরেশ বসু তখন ব্যারাকপুরের অগ্নিগর্ভ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী। মার্কসবাদ থেকে তিনি মুনাফা ও শ্রমের সম্পর্ক, দাঙ্গা ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে প্ররোচনাদাতা ধর্মীয় সামন্তবাদ, মহাজন বনাম ভূমিহীন কৃষকের লড়াই-এর চরিত্র সঠিকভাবে কেবল অনুধাবন করেননি, সেই অভিজ্ঞতার ফলিতরূপ ঐ গল্পগুলিতে নির্ভরযোগ্য করে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। গৌরবময় তেভাগা আন্দোলনের রক্তেরাঙা ছবি যেমন নির্ভুলভাবে ফুটে ওঠে 'প্রতিরোধ' গল্পে, তেমনই একচেটিয়া পুঁজিপতি ও শাসকের সংহতির বিরুদ্ধে শ্রমিকের ঘৃণা ও মোহভঙ্গের একটি দলিলচিত্র পাওয়া যায় 'জলসা' গল্পে। অথচ লেখকের অখণ্ড জীবনবোধ কখনোই রচনা দুটিকে কোনো সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্যের নিছক গদ্যরূপ করে তোলেনি, সক্ষম শিল্পচর্চা হিসেবেই পরিণত হয়েছে। শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন, "সমরেশ বসুর লেখায় পার্টির

তখনকার আন্দোলন-নীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু গল্পগুলির কোনটিই পার্টির দলীয় প্রচারের বাহন হয়ে ওঠে নি। 'জলসা' গল্পে ধর্মের জিগির 'জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করে রাখার অহিফেনতুল্য বস্তু'—লেনিনের এই উক্তির ছায়া পাওয়া যাবে 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' গানটির ব্যবহারে। কিন্তু তাই বলে গল্পটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের গাল্পিক রূপায়ন নয়। আবার 'প্রতিরোধ' তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত গল্প বটে, কিন্তু সেটাই গল্পটির সম্পর্কে শেষ কথা নয়। দুটি গল্পেই প্রাধান্য লাভ করে দুঃখ, বীরত্ব সংকল্পের দর্পণে প্রতিবিম্বিত মানুষের চিরকালের চেহারা।"

ঠিক একই জাতীয় উক্তি করা চলে লেখকের বহু-আলোচিত 'আদাব' গল্পটি সম্পর্কে। পূর্ব বাঙলার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা এই গল্পে কারফিউ-এর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এক মুসলমান মাঝি ও এক হিন্দু শ্রমিক। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দুজনে দুজনকে লক্ষ্য করার পর "একজন শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করে ফেলে—হিন্দু না মুসলমান ?

—আগে তুমি কও। অপর লোকটি জবাব দেয়।....প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞাসা করে,—বাড়ি কোনখানে ?

—বুড়িগঙ্গার হেই পাড়ে—সুবইডায়। তোমার ?

—চাষাড়া—নারাইনগঞ্জের কাছে।....কি কাম কর ?

—নাও আছে আমার, না'য়ের মাঝি।—তুমি ?

—নারাইনগঞ্জে সুতাকলে কাম করি।"

মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো সময় যায়। দুজনেরই মনে ঘর-টান। উভয়ের জীবনে হানাদারের পায়ে নেমে এসেছে দাঙ্গা। "মানুষ না, আমরা যেন কুত্তারবাচ্চা হইয়া গেছি ; নাইলে এমুন কামড়াকামড়িটা লাগে কেম্‌বায় ?—নিস্ফল ক্রোধে মাঝি দু'হাত দিয়ে হাঁটু দু'টোকে জড়িয়ে ধরে।" গতকাল ঈদ গেছে। বিবির, বাচ্চাদের জন্য কেনা নতুন জামাকাপড়ের পুঁটলি বুকে অধীর হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে রাজপথ দিয়ে দৌড় লাগায় সুভড্যার মাঝিটি। তারপর "সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ-অফিসার রিভলভার হাতে রাস্তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ-নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।... সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলা-মাইয়ার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না

ভাই, আমার ছাওয়ালেরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুষমনেরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।" সাম্প্রদায়িকতার পাপ সম্পর্কে ভাবাদর্শগত বড় বড় বুলি নয়, একটি ব্যক্তিগত ট্রাজেডির বিন্দুতে লেখক আমাদের একটি মৌলিক জাতীয় সমস্যার চেহারাকে পরম দক্ষতায় এই গল্পে পীনদ্ধ করে তুলেছেন। এখানেই সমরেশ বসুর জাতশিল্পীর আদর্শটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরবর্তী পর্যায়ের গল্পগুলিতে ক্রমশ বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও নতুন ব্যঞ্জনা ফুটে উঠতে লাগল। এককেন্দ্রিকতার জায়গায় সর্বস্তরীয় জীবনবোধের ক্রম-ব্যাপকতা, সামাজিক বোধের পাশাপাশি আত্মানুসন্ধানের গভীরতা দেখা দিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আগত এই বিষয়গুলি কোনো অবস্থাতেই পূর্বতন গুণগুলিকে লঙ্ঘন বা অস্বীকার করে উদ্ভূত হয়নি। যে-কোনো জটিল পরিবেশের ক্লীন্নতা ও দীনতার ভিতর থেকে আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ইতিবাচক দিকগুলিকেই অধিকতর জটিল দ্বন্দ্বময়তার মাধ্যমে লেখক পরিণত করে তুলতে চাইলেন। এই পটভূমিতে মানুষ মার খায়, লড়াই করে, নিজের দুর্বলতা ও সমাজের শাসনের কাছে কখনো পরাজিত হয় বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পতাকা ছাড়ে না। সমস্ত ব্যর্থতার পরও যে পাপঘ্ন-শক্তি মানুষের উত্তরণের আসন ও আত্মা, তাকে নানা জটিল প্রক্রিয়ার পথ দিয়ে উন্মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন লেখক তাঁর এ-পর্যায়ের 'অকালবৃষ্টি' (ডোম, শ্মশানের রেজিস্ট্রবাবু, তাদের জীবনে আগন্তুক একটি যাযাবরী—এদের নিয়ে লেখা), 'জোয়ার-ভাঁটা' (নৌকা থেকে লরিতে মালটানা-দের গল্প), 'পশারিণী' (একটি তরুণী এবং কয়েকটি পুরুষ—ট্রেন-ক্যানভাসারদের নিগৃহীত জীবন—নিষ্ঠুরতা ও গভীর সমবেদনায় বর্ণিল কাহিনী), ও 'অকাল বসন্ত' (একটি পোড়োবাড়ির তিনটি আইবুড়ো মেয়ে ও একজন মোটর-মেকানিকের আশা-নিরাশার আলেখ্য) ইত্যাদি গল্পগুলিতে। এ-ক্ষেত্রে লেখকের প্রাক্তন আবেগতপ্ত মানসিকতার স্থান দখল করেছে চিন্তার নিবিষ্টতা, সমাজের প্রবল চাপে নানামাপের বক্রতা পাওয়া মানুষদের সমস্যাগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করার চেষ্টা এবং ধনবাদী পরিবেশে অসহায় ব্যক্তিমানুষের ভেসে যাওয়ার নির্মম সত্যবোধ। নানাজাতীয় ফর্মাল-নিরীক্ষার তাগিদও সমরেশ বসুর গল্পে এই সময় থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে, যার চূড়ান্ত বিকাশ তাঁর 'গাণা বাউড়ীর কথকতা',

'পাপপুণ্য' ও 'পাড়ি'—এই তিনটি গল্পে। লৌকিক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান, ছড়া, গাথা, পাঁচালী, বিভিন্ন উপকথা ও কথক-আঙ্গিকের নিপুণ ব্যবহার এবং তারই পাশাপাশি মজ্জমান পরিস্থিতির সঙ্গে লেখকের আত্মী-করণ বা আইডেন্টিফিকেশনের প্রশ্ন তিনি যেন নিজের আত্মরক্ষার তাগিদেই তুলে ধরতে লাগলেন।

মনে হয়, সমরেশ বসু উপলব্ধি করছিলেন, নিছক রাজনীতিক মুক্তি মানবতার মুক্তি নয়। তাঁর দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলিতে এ-বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য আমাদের বোঝা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে মার্কস-এর On the Jewish Question (১৮৪৪) প্রবন্ধে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"The limit of political emancipation is immediately apparent in the fact that the state may well free itself from some constraint, without man himself being really freed from it, and the state may be a free state, without man being free." কখনো কখনো অভিভূত হয়ে পড়লেও সঙ্কীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রয়াস কমবেশি উপরোক্ত গল্পগুলিতে দেখা যায়। স্খলন যে নেই, তা নয়। কোনো মুহূর্তে অন্ধকারই বুঝি একমাত্র ধ্রুব, ফলত লেখক অভিমন্যুর মতো সে-হতাশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েন। 'ধূলিমুঠি কাপড়', 'তৃষ্ণা' প্রমুখ গল্পে এ-জাতীয় দিগ্‌ভ্রষ্টতা আছে। তবে, এহেন টানা-পোড়েনের ভিতর থেকেই শিল্পীকে তাঁর অভিষ্ট বুঝে নিতে হয়। গোর্কি-কেও হয়।

এ-প্রসঙ্গে বারবার 'শাণা বাউড়ীর কথকতা' ও 'পাড়ি' গল্প দুটির কথা মনে পড়ে যায়। সমরেশ বসু এখানে তাঁর সাফল্যের শীর্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন। এক গোপন অন্যায়ের অন্ধকারের মুখ খুলে দেওয়ার জন্য গল্পদুটির চাল এখানে রোখা, তেরিয়া, যাত্রাপথের দুধারে তুহিন শৈত্য, অশেষ দারিদ্র্য, বর্ণশ্রেষ্ঠ জাতির পাপ অজ্ঞানতা ও অর্থনৈতিক অসমতার উষর-ভূমি। কোনো দিক থেকে কোনো অগ্রগতির চিহ্নমাত্র নেই, আছে পীড়িত মানুষের আত্মার ও স্বভাবের মর্মান্তিক বিনষ্টি।

তবু, তারই পাশাপাশি, লেখক পিষ্ট মানুষের হাতেই বিজয়-কেতন তুলে দেন। কিম্বিক্ষু, দেউলে সামন্ততন্ত্রের শোষণ ও নারীমেধযজ্ঞের ঐতিহ্যের

সমান্তরাল রেখায় ফুঁসে ওঠে বাবুদের লালসায় প্রিয় রমণীকে বার বার হারানো ক্ষোভে উন্মাদ বাউড়ী শাণা। তার গলায় মন্ত্রের মতো শোনা যায় "জমিদারিটো উঠে গেলছে, ব্যাগার নাই, কিন্তু পাপটো যেছেনা।" না পড়লে বোঝা যায় না, মানুষের এই উপলব্ধির ছবিকে পৌরাণিক কথকতার মন্থর বাঁধুনিতে লেখক কি আশ্চর্য দক্ষতায় স্থাপন করেছেন এবং আমাদের সংস্কারের সঙ্গে গল্পের শিকড় আমূল গেঁথে দিয়েছেন। পাঠকের হৃৎপিণ্ডের উপর প্রথম থেকেই লোহার বর্মের মতো এঁটে বসে গল্পটি, চারপাশের অদৃশ্য চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। শাণার এক একটি মন্তব্য ছুরির তীক্ষ্ণতায় আমাদের মধ্যবিত্ত, অসাড় রক্তের অন্তর্মূলে বিঁধে যায়।

ঠিক এভাবেই স্মরণীয় হয়ে ওঠে 'পাড়ি' গল্পের একদিকে সোনার মাকড়ি পরা শুয়োর ব্যবসায়ীর ক্ষমাহীন লোভ ও অন্যদিকে এক শুয়োর-তাড়ুয়া-দম্পতির অপরাহত সংগ্রামের রক্তবর্ণ চালচিত্র। অম্বুবাচির পর বক্তের ঢলনামা আষাঢ়ের গঙ্গার উপর দিয়ে উপোষী, পোড়া পেটের জ্বালায় একপাল শুয়োর-ছানাকে ওপারে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে একটি শ্রমজীবী পুরুষ ও তার সঙ্গিনী।

"পুরুষটা পুরুষমানুষ। গোঁফ মুচড়ে তীক্ষ্ণ চোখে মাপে দরিয়া। তারপর বলে থালি, হ্যাঁ বহুৎ বড়!

কথাটার মানে হল, বড় কিন্তু পার হতে হবে।

মেয়েটি আবার বলল, উনতিশ আনা কত? পুরা রূপয়ার বেশি না কম? বউটা ছোট তবে মেয়েমানুষ। হিসাব না খতালে মন সাফ হয় না।

মরদটা পুরুষ। সব মেনে গেলে বেহিসাবী হয়ে পড়ে। বলে, তিন আনা কম পুরা দু রূপইয়া।

আচ্ছা। নতুন ক্ষুধার একটা অদ্ভুত মিষ্টিস্বাদ লাগছে যেন।"

তারপর বহু অসহনীয় সঙ্কটের ভিতর দিয়ে বহু মৃত্যুর দরজা ঘেঁষে শূকরযুথ সমেত তারা একসময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হলো। নিকষ কালো অন্ধকারে শুয়োরের খাঁচার পাশে বসে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও খাওয়ার পর মেয়েটিকে বুকে নিয়ে পুরুষের সোহাগের সংহত বর্ণনা সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ছিঁড়ে ফেলে বিশাল জীবনের বেগবান তরঙ্গকে দিগন্ত বিস্তৃত করে তোলে। এমন বলিষ্ঠ, ছিলাটান গল্প খুব বেশি পড়ার সুযোগ হয় না।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে আপাত-বিপরীত কিন্তু বস্তুত এক চরিত্রের এবং আলোচিত অন্য গল্পগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের দুটি গল্পের কথা বলা প্রয়োজন। বর্ণবিরল, সংক্ষিপ্ত, ছোট ছোট বাক্যবন্ধে লেখা গল্পদুটির নাম 'স্বীকারোক্তি' ও 'ক্রীতদাস'। দুটি গল্পেরই বিষয় ছিন্নমূল, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধহীন, সংশয়বাদী এবং ফলত অস্তিত্বের অর্থ সম্পর্কে আকুল প্রশ্নাতুর, প্রখর আত্মজিজ্ঞাসায় পিষ্ট দুজন মানুষ। নগ্ন, মূল সত্যের সন্ধানে তাঁদের পদযাত্রা। সংস্কার, ধর্ম, সঙ্ঘ, বিচারহীন বশ্যতা, অন্ধনিষ্ঠা, কায়েমি-চক্র তাদের নির্ভীক দেহমনের উপর প্রাণপণে আঘাত হানছে ; তাদের নিজস্ব, স্বতন্ত্র পথ-পরিক্রমাকে বন্ধ করে দিতে চাইছে। চারপাশ থেকে মার খেতে খেতে তাদের পায়ের তলার মাটি রক্তে থরসান, তবু জন্মের রহস্য তারা বুঝে নিতে চায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিখু ও পাঁচীর মতো যে অন্ধকারকে তারা নিজেদের শরীরে বহন করে নিয়ে চলেছে, তার স্বরূপ—তা যত নিষ্ঠুর, এমনকি পরিণতিতে শূন্যময় হোক না কেন—তাকে জানতে চায়।

ইতিহাসের আলো-অন্ধকার থেকে ছিটকে আসা 'ক্রীতদাস' গল্পের নায়ক নটপুত্ত ও 'স্বীকারোক্তি' গল্পে ১৯৪৮-৪৯এ কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধ্যা সশস্ত্র বিপ্লবের সমকালীন কর্মী ও কারাগারে বন্দী অনল দুটি স্বতন্ত্র যুগের অধিবাসী সেই একই মানুষ, যারা নাকি আত্মাকে প্রতিষ্ঠানের প্রথাবদ্ধতার কাছে নিলামে তোলেনি। সোক্রাতেসের আদলে গড়া নটপুত্ত চরিত্রটির মধ্যে তবু কিছু কিছু পৌরাণিক রোমান্টিকতার ধূসরতা আছে, কাহিনীতে ইতিহাসসম্মত পরিবেশ রচনার প্রয়াস আছে। কিন্তু 'স্বীকারোক্তি'র নায়কের আত্মবিবরণে প্রাথমিক কুয়াশাটুকুও অপসৃত।

গল্পটির বাচনভঙ্গি শীতল, কঠিন ও অনলঙ্কৃত। গল্পের পরিণতিকে গুটিয়ে তোলা হয়েছে বন্দী ও নির্যাতিত অনলের অসংখ্য স্মৃতিচারণের মুহূর্তগুলি পরম্পরা গেঁথে, তার ব্যক্তিত্ব পার্টি নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছে, যাকে পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা পর্যন্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত অন্যায়বোধকে সে পার্টির উপরে স্থাপন করেছে। একই সঙ্গে পার্টির শত্রুদের বিরুদ্ধে সে অটল হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী বর্তমানে সে অন্য একটি নারীকে ভালোবাসে। এ-ঘটনা খুব স্বাভাবিক ভাবে ঘটেছে এবং এর জন্য কোনো পাপ-বোধ তার মনে নেই। পার্টির সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে পার্টি থেকে বিতাড়িত একজন বিপ্লবী কর্মীকে সে আশ্রয় দিয়েছে; কারণ তার ধারণা, পার্টির নেতৃত্বের

একচেটিয়া স্বার্থ তাকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করেছে। শেষ পর্যন্ত অনলের স্ত্রী ও প্রেমিকা, উভয়েই পার্টির প্রতি তাদের আনুগত্য স্বরূপ তার পার্টির সিদ্ধান্ত-বিরোধী কর্মকাণ্ডের কথা যথাস্থানে জানিয়ে দিয়েছে এবং তার ফলে তাকেও বহিষ্কার করা হয়েছে। ঠিক এই সময়ই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ও হাজতে অশেষ নির্যাতনের ভিতর দিয়ে তাকে একা অসম্ভব মানসিক শক্তিতে আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীদের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হয়। কিন্তু এই একক ও অসম সংগ্রামের পরিণতি কি, পাঠকের তা অজানা নয়।

সমরেশ বসু হয়তো নিজস্ব অভিজ্ঞতার কঠোর নিরিখেই গল্পটি রচনা করেছেন। নিঃসন্দেহে তবু তা কমিউনিস্ট রাজনীতির সাধারণ সত্য নয়। তথাপি 'স্বীকারোক্তি'-তে ব্যক্তিত্বকে যে অসহায় অবস্থায় এনে লেখক দাঁড় করিয়েছেন, তা আমাদের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মতো। সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা উত্তরকালে স্বয়ং সমরেশ বসু করতে পারেননি। নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও সমাধাহীন প্রশ্নের অন্ধকার প্রাসাদ কখন 'একুশ' হেঁকে তার এককালীন অপরাজেয় জীবনবোধ ও অসামান্য জিজীবিষাকে নিলামে কিনে নিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, সমরেশ বসু এখনও লেখক। কিন্তু এককালীন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী-লেখকের সততা কি বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের এই জয়যাত্রার দিনে শুধুমাত্র জীবনের ধারাবাহিক লাঞ্ছনার বিকৃত বিশ্লেষণের ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঁকেই আমাদের তলিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে?

চলচ্চিত্রকথা

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

গত কয়েক বছরের মধ্যে ফিলম সোসাইটি আন্দোলনের প্রসাদে বাঙলাদেশে চলচ্চিত্রের শিল্পস্বরূপ সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই সঙ্কলন গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচ্য। এক সময়ে 'পরিচয়' ও অন্যান্য পত্রিকায় চলচ্চিত্র সমালোচক রূপে শ্রীঅসীম সোম সম্মানের পাত্র ছিলেন। এই জাতীয় সঙ্কলনের সম্পাদনায় তাঁর কাছে চলচ্চিত্রানুরাগীদের অনেকটা প্রত্যাশা থাকাই স্বাভাবিক। একথা বোধহয় বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে গত দশ বছরে বাঙলাভাষায় চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রায় সবকটাই এই সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত। চলচ্চিত্রবিষয়ক মননশীল পত্রিকা বলতে আমাদের এখানে যে কটি প্রকাশিত হয়েছে, সবগুলিই অনিয়মিত প্রকাশের কারণে লেখক সমালোচক বা পাঠকদের কাছ থেকে যথোচিত সমাদরলাভে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে—এইসব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ লেখা অনেক সময়েই পাঠকদের চোখ এড়িয়ে গেছে। এই লেখাগুলিকে একত্র করে অসীমবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সম্পাদনাকালে অসীমবাবু দুদিকে দৃষ্টি রেখেছেন। একদিকে তিনি বাঙলাদেশের চিত্রপরিচালক ও চিত্রসমালোচকদের চলচ্চিত্রভাবনার আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে তিনি সাধারণ চিত্রদর্শকদের চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ ও তার বিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। একদিকে তাত্ত্বিক ভাবনার সংগ্রহ, অন্যদিকে নিতান্তই হ্যানডবুক। বলা বাহুল্য, উভয় ভূমিকারই প্রয়োজন ছিল। এই উভয় দায়িত্ব পালনেই সার্থকতা লাভ করেছেন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের দুচারজন একনিষ্ঠ কর্মী। প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে একটা কথাই মনে হয়: চলচ্চিত্র ব্যাপারটায় প্রয়োগাভিজ্ঞতার গুরুত্ব এতই যে

চলচ্চিত্র কথা। অসীম সোম সম্পাদিত। রূপরেখা। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। পনেরো টাকা

চিত্রপরিচালকেরাই চলচ্চিত্রের কথা সবচেয়ে ঋজুতার সঙ্গে বলতে পারেন। অন্যদের প্রায়ই ধোঁয়াটে এক ধরনের চালাকির মধ্যে আশ্রয় নিতে হয়। এই সঙ্কলনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লেখারই এই হাল। অথচ তারই পাশে সত্যজিৎ রায়ের 'চলচ্চিত্ররচনা : আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গি' বা 'আবহসংগীত প্রসঙ্গে', মৃণাল সেনের 'সিনেমায় পরিবেশরচনা' বা ঋত্বিক ঘটকের 'ছবিতে শব্দ' ('পরিচয়' থেকে সঙ্কলিত) পড়তে গেলেই চলচ্চিত্রসৃষ্টির সামগ্রিক প্রক্রিয়া ও কল্পনার মধ্যে যেন প্রবেশ করা যায়। চিদানন্দ দাশগুপ্ত, অসীম সোম নিজে, ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়, এই তিনজন চিত্রসমালোচকের লেখাও বস্তুগতভাবে চলচ্চিত্রের রূপ ও ধর্ম অনুধাবন করেছে। অসীমবাবুর নিজের লেখায় তথ্য পরিবেশনের মধ্যেও এমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে যা সাধারণ আগ্রহী পাঠককে অনেকটা এগিয়ে দিতে পারে। চিদানন্দ দাশগুপ্ত ('চলচ্চিত্রের শিল্পপ্রকৃতি' ও 'চলচ্চিত্র ও সংগীত') এবং দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের ('মণ্টাজ : চিত্রভাষা') লেখায় যে-দৃষ্টি সক্রিয়, সে-দৃষ্টি অবশ্য অপেক্ষাকৃত জটিল। ছবি দেখার চোখ যাদের কিছুটা তৈরি হয়ে গেছে, তাদেরই জন্য এঁদের লেখা। চলচ্চিত্র ও তার স্বরূপগত মৌল প্রশ্নগুলির বাইরে সমকালীন সমস্যা ও প্রবণতা নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন কিরণময় রাহা ('বাংলা ছবির বিগত অধ্যায় : শিল্পের নিরিখে'), আশীষ বর্মণ ('একালের বাংলা ছবি ও তার বিচার'), প্রবোধকুমার মৈত্র ('হিন্দী ছবি প্রসঙ্গে'), মৃগাঙ্কশেখর রায় ('ডকুমেনটারি ছবির গতিপ্রকৃতি') এবং রঘুনাথ গোস্বামী ('অ্যানিমেটেড ফিলম')। ফিলম সোসাইটি আন্দোলন সম্পর্কে ধ্রুব গুপ্তের লেখাটি পুরনো লাগে। অথচ এই আন্দোলন নিয়ে অনেক নতুন ভাবনাই আজ আমাদের ভাবতে হচ্ছে। শ্রীগুপ্ত বেশ কয়েক বছর বিদেশে রয়েছেন। তাঁর এই লেখাটি প্রকাশ করে তাঁর প্রতিই অবিচার করা হয়েছে। সঙ্কলনে আরো কয়েকটি ফাঁক রয়ে গেছে। চলচ্চিত্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অবহেলিত হয়েছে। অভিনয় ও ক্যামেরার কাজ সম্পর্কে দুটি অত্যন্ত মামুলি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পনির্দেশনার দিকটি একেবারেই উপেক্ষিত। চলচ্চিত্রে অভিনয় কতটা গুরুত্ব দাবি করতে পারে, এই বিতর্কিত প্রশ্নটি তত্ত্বগতভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের মুষ্টিমেয় ভালো পরিচালকের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজের অভিজ্ঞতা ও সম্পর্কের একটা 'কেস-স্টাডি' রচনা করা গেলে ভালো হতো। বোম্বাইয়ের আনন্দম ফিলম সোসাইটি তাঁদের

পত্রিকার সত্যজিৎ রায় সংখ্যার জন্য সত্যজিৎবাবুর ছবির শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে এই দিকটি উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতায় কিছুকাল আগে ফিলম সোসাইটি সদস্যদের এক সভায় একদা ব্রেসঁর সহযোগী (সে ব্রেসঁ, যিনি তাঁর নিজের ছবিতে 'তারকা' বর্জনের নীতিকে এতদূর নিয়ে গেছেন যে এক ছবির জন্য বাছাই করা আনকোরা অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দ্বিতীয় ছবিতে আর ব্যবহার করেন না) বিখ্যাত ফরাসী চিত্রপরিচালক লুই মাল এই প্রশ্নটি আলোচনা করতে গিয়ে মারিয়া শেল, ব্রিজিৎ বার্দো, মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ানি, জঁ পল বেলমোন্দো, জান মোরো প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ থেকে পরিচালক ও শিল্পীর এই সৃষ্টিশীল সম্পর্কের মধ্যে খানিকটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা গেছল। অথচ এক্ষেত্রে সেদিক থেকে আমরা অপরিতৃপ্তই রয়ে গেলাম। বাঙলা ছবিতে শিল্পনির্দেশকের অসাবধানতার শোচনীয় পরিণাম এবং শিল্পনির্দেশকের কল্পনার সার্থক পরিপূরকতা (সত্যজিৎ রায়ের সবকটি ছবিতেই), দুইই আমরা যথেষ্ট দেখেছি। অন্তত বাঙলা ছবির পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনির্দেশনার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত কি অপরিহার্য ছিল না?

অসীমবাবু মুখবন্ধে স্বীকার করেছেন, "এমন অনেক মতামত বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত যা তর্কসাপেক্ষ। বিরোধীয় বা বিপ্রতীপ মন্তব্যও স্বাভাবিক ভাবে এখানে ওখানে পরিব্যাপ্ত।" সম্পাদকীয় এই নীতি মেনে নিয়েও জায়গায় জায়গায় খানিকটা অস্বস্তি না বোধ করে পারিনি। 'স্বদেশ বীক্ষণ' বিভাগে কিরণময় রাহা, আশীষ বর্মণ ও প্রবোধকুমার মৈত্রের লেখায় যে বুদ্ধিদীপ্ত বিচারশক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়, তারই পাশাপাশি তপন সিংহ যখন অদ্ভুত অজ্ঞ উক্তি করেন (তপনবাবুর মতে, যুদ্ধোত্তর জীবন নাকি "এক সর্বব্যাপী চরিতার্থতায় উদ্‌বেজিত"। চরিতার্থতা? কোন অর্থে? যুদ্ধের দায়ভারে ও স্মৃতির যন্ত্রণায়, দ্রুত পরিবর্তমান বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে গিয়ে সঙ্কটের আবর্তে পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ যখন হাঁপিয়ে উঠছে, তখনও তপনবাবু যদি চরিতার্থতাই দেখতে পান, তিনি ঈর্ষণীয় ভাগ্যবান পুরুষ! সমাজসংস্কারের গরজ নামক অতিদূষণীয় ব্যাপারটি চলচ্চিত্রের বিষয়ক্ষেত্রে অবসিত ঘোষণা করতে গিয়ে তপনবাবু যে কার্যত পৃথিবীর তাবৎ কমিউনিস্ট চিত্রপরিচালককে কলমের আঁচড়ে খারিজ করে দেন, তা বোধহয় তিনি

খেয়ালই করেন না!) তখনই মনে হয় সাধারণভাবে আমাদের চলচ্চিত্র-চিন্তার বিকাশের সম্ভাবনাই যাতে ব্যাহত হয়, এমন লেখা সঙ্কলনে কোন বিচারে ঢুকে পড়ল? তপনবাবুর বাকি লেখাটায় একটা দামি কথা, একটা গভীরভাবে ভেবে বলা কথা কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? তবে কেন?

পুরনো বাঙলা ছবির কথা লিখতে গিয়ে পশুপতি চট্টোপাধ্যায় যে অসমালোচকী এবং অসম্পূর্ণ বিবরণটি দাখিল করেছেন, সেটি প্রকাশ না করে পরিশিষ্টে বাঙলা ছবির একটি কালানুক্রমিক সঠিক তালিকা প্রকাশ করলে আমরা বেশি উপকৃত হতাম। কিরণবাবুর লেখায় ঐ পর্বের ছবির মূল্যায়ন, বিশেষত প্রমথেশ বড়ুয়া প্রসঙ্গে সংযত স্পষ্ট ভাষণ উল্লেখযোগ্য। কিরণবাবু লক্ষ্য করেছেন, প্রমথেশ "কিছুটা উন্নত বহিরঙ্গের আড়ালে.... সেই ভাবালুতা ও তরলীকৃত চরিত্রই পরিবেশন করেছিলেন যা বিগত যুগের বাংলা চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।....বড়ুয়ার ছবি এই ভাবালুতা অতিক্রম করে মানবিক সম্পর্কের গভীরতর কোন সত্য বা অভিজ্ঞতার শিল্পসম্মত প্রকাশ করতে পারেনি।" অন্যত্র এক প্রবন্ধে মৃণাল সেন বড়ুয়ার ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'মুক্তি' ও 'দেবদাস' ছবির সময়েই বিভূতিভূষণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও তারাশঙ্করের আবির্ভাব: "তাঁদের রচনায়, বক্তব্যে, আঙ্গিকে যে ধার ছিল, যে স্পষ্টতা ছিল, যে উত্তাপ ছিল, অত্যন্ত সঙ্গত ও শিল্পগত কারণেই তা বাঙলাদেশের পাঠক-সমাজকে মাতিয়ে তুললো। কিন্তু চলচ্চিত্রের শিল্পীরা হয়তো সেদিন কানে তুলো এঁটে বসেছিলেন, মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন হয়তো, হয়তো উত্তুরে হাওয়ার ভয়ে জানালা খোলা নিষেধ ছিল তাঁদের, হয়তো বা যে বোধ যে বিচার, যে বিশ্লেষণ, যে অনুভূতি দিয়ে সেই নব্য রীতির সাহিত্যকে অনুধাবন করা প্রয়োজন তা তাঁদের ছিল না।" [চিত্রভাষ, বর্ষ ২, সংখ্যা ১]। মৃণালবাবুর এই কথাটি যুক্ত হলে কিরণবাবুর সমালোচনা তীব্রতর হয়ে ওঠে বাঙলাদেশের আজকের অধিকাংশ চিত্রপরিচালকের দৌর্বল্যের উৎসও যেন খুঁজে পাওয়া যায়।

অসীমবাবুর এই সঙ্কলনের গুরুত্ব বিবেচনা করেই কয়েকটি ত্রুটির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত, প্রত্যেকটি লেখার সঙ্গেই তার প্রথম প্রকাশের তারিখ, লেখাটি পরে সংশোধিত হয়েছে কিনা, প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়েছি, তার উল্লেখ থাকা এ-ধরনের সঙ্কলনের সম্পাদকীয় নীতির

একেবারেই প্রাথমিক দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থপঞ্জিতে বিষয় ও দুরূহতা বিচারে বইগুলিকে কয়েকটি বিভাগে সাজাবার চেষ্টা করলে সাধারণ পাঠকদের সুবিধা হতো; বইগুলির প্রকাশের তারিখ থাকাও বাঞ্ছনীয় ছিল; বইগুলির উপযোগিতা বিষয়ে কিছু মন্তব্য সংযোজনেরও সুযোগ ছিল। তৃতীয়ত, এ-দেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার নীতি বিষয়ে আলোচনাকালে আন্তর্জাতিক পরিভাষা ব্যবহারের নীতি যখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত, তখন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে "পরীক্ষামূলক প্রতিশব্দ" প্রস্তাবের চেষ্টা একেবারেই আবশ্যক বোধ হয়নি।

আরো দু-একটি বিষয়ে হয়তো লেখা থাকতে পারত। সেনসরশিপের প্রশ্নটি (শুধু নগ্ন দৃশ্য বা চুম্বন প্রসঙ্গে নয়, রাজনৈতিক সেনসরশিপের আরো বাস্তব সমস্যা নিয়ে; গত ফেবরুয়ারি মাসে আকাশবাণীর এক সমীক্ষায় চিদানন্দ দাশগুপ্ত রাজনৈতিক সেনসরশিপের প্রশ্নে অত্যন্ত সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন, মনে আছে) আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। চলচ্চিত্রের সঙ্গে দর্শক ও সমালোচকের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনায় আরো বস্তুনিষ্ঠ এবং খানিকটা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশিত ছিল। অন্তত এক-তৃতীয়াংশ লেখা বাদ দেওয়া গেলে সঙ্কলনগ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। নির্বাচিত রচনাগুলির কালের অনিশ্চয়তা কিছুটা পীড়াদায়ক।

তবু এই গ্রন্থে যা পাওয়া গেল, তার মূল্যও অনস্বীকার্য। আমাদের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের একটি মুখ্য লক্ষ্য সাধনের কাজে শ্রীঅসীম সোমের অবদান আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করব। নতুন চিত্রদর্শকেরা অসীমবাবুর সঙ্কলনগ্রন্থ থেকে ছবি দেখার দৃষ্টি আয়ত্ত করার পথে যথেষ্ট পাথেয় পাবেন।

সুন্দরবনের উঁরাও আদিবাসী

চিন্ময় ঘোষ

ভারতের বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উঁরাও অন্যতম। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে সারা ভারতে মোট আদিবাসীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪ শ ৭০ জন। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬'৮ ভাগ। ঐ হিসাব অনুসারে সারা ভারতে উঁরাও আদিবাসীর সংখ্যা হবে প্রায় ১৫ লক্ষ। সঠিক হিসাব জানা যায়নি, তবে ১৯৫১ সালের জনগণনায় যেখানে সংখ্যাটা ছিল ১০ লক্ষ ৩০ হাজার, সেখানে ১০ বছর পরে ৫ লক্ষ নিশ্চয়ই বেড়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

উঁরাওরা ছড়িয়ে আছে প্রধানত চারটি রাজ্যে। বিহারে এঁদের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩ শ ৭৪, মধ্যপ্রদেশে ৪০ হাজার ৭ শ ৫, ওড়িষায় ৯৭ হাজার ৭ শ ১ এবং পশ্চিম বাঙলায় ২ লক্ষ ৬ হাজার ২ শ ৯৬ জন। এই হিসাবের ভিত্তি হচ্ছে ১৯৫১ সালের জনগণনা। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় বিগত ১৮ বছরে নিঃসন্দেহে এই জনসংখ্যা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ হিসাব অনুসারে (১৯৬১ সালের জনগণনা) পশ্চিম বঙ্গে উঁরাওদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩ শ ৯৪ অর্থাৎ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪'৫ ভাগ।

যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে, পশ্চিম বঙ্গ তো বটেই, এমন কি গোটা ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উঁরাও বেশ একটা ভালো সংখ্যায় রয়েছেন।

পশ্চিম বঙ্গের ১৩টি জেলাতেই কম বেশি উঁরাও নরনারীদের পাওয়া যাবে। জলপাইগুড়ি জেলায় এঁদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (১ লক্ষ ৮১ হাজার ৭ শ ৪১), আর বীরভূম জেলায় সবচেয়ে কম (২৬৯ জন)। একমাত্র সাঁওতাল ছাড়া অন্য কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ উঁরাওদের মতো সারা পশ্চিম বঙ্গে ছড়িয়ে নেই।

THE ORAONS OF SUNDARBAN. Sree Amal Kumar Das, Sree Manis Kumar Raha. Special series No-3: Bullettin of the cultural research institute, Tribal welfare department, Government of West Bengal, Calcutta.

প্রায় ১ শতাব্দী পূর্বে অত্যন্ত দরিদ্র ঋণভারগ্রস্ত এবং নির্যাতিত এই আদিবাসীরা নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করে নিতান্তই কর্ম এবং অন্নের সন্ধানে বাঙলাদেশে এসে বসবাস করতে বাধ্য হন। বৃটিশ রাজত্বের তখন পুরো যৌবন কাল। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের টাটকা গরম হাওয়া তখনো ভারতের বিভিন্ন জনপদে। দেশীয় সামন্ততন্ত্র এবং উঠতি ধনিকশ্রেণী বৃটিশ সহযোগিতায় নব উদ্যমে মাথা তোলার চেষ্টা করছে। দিকে দিকে নতুন নতুন কলকারখানা, খনি, চা বাগান, কফি-বাগান, পতিত জমি উদ্ধারের কাজ চলছে। ঠিক এই রকম একটা সমাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সবচেয়ে শস্তা শ্রমিক হিসাবে যাঁদের আমদানি করা হয়, তাঁরাই হলেন আদিবাসী মানুষ। দেশের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যায় এই মানুষগুলি স্থানচ্যুত হলেন। ১৮৫৩ সালের ৮ অগাস্টের 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' পত্রিকায় কার্ল মার্কস একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন : "বৃটিশরা ভারতীয় গ্রাম্য সমাজের ভিত ভেঙে দিয়েছে—শিল্প বাণিজ্য উচ্ছেদ করেছে।" কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলাদেশের চা-বাগান, কয়লাখনি, নীলের চাষ এবং সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অনাবাদী জঙ্গলাকীর্ণ কুমারীমাটি উদ্ধারের কাজে যে হাজার হাজার আদিবাসী উঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল ভূমিজরা এলেন সেটা কি খুব মামুলি ব্যাপার? মোটেই নয়। কার্ল মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে ভারতীয় তথা এশিয়াটিক সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন : "একই ধরনের সহজ-সরল অর্থনৈতিক উৎপাদনপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি এই আত্মনির্ভর গ্রাম্য সমাজের বৈশিষ্ট্য ...মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশের ঝড়ঝঞ্ঝার নিচে এশিয়াটিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো অসাড় অচেতন হয়ে থাকে।" [Vol. I, page 358]

এই অসাড় অচেতন অর্থনৈতিক কাঠামোটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। এককথায় বলা যায়, ভারতীয় আদিবাসী সমাজের উপর এর প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি। তাই আদিবাসী অঞ্চল থেকে দলে দলে স্থানচ্যুতির বিষয়টি সেই দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। বৃটিশরাই যে প্রত্যক্ষভাবে আদিবাসীদের ঘরছাড়া করেছে—সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই। অবশ্য এর সঙ্গে বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠীর ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়গুলিও নিশ্চয়ই জড়িত আছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে ঐ মার্কস যা

বলেছেন—"গ্রাম্য সমাজের ভিত বৃটিশরা ভেঙে দিয়েছে।" এই ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় আদিবাসীদের ছন্নছাড়া জীবনের সূত্র বের করতে হবে। এই পদ্ধতি ধরে এগোলেই তবে আমরা দেখতে পাব আদিবাসী এলাকার পরিবেশ জলবায়ু আকাশ মাটি উদ্ভিদ এবং প্রাণী ও এই সবকিছুকে ঘিরে আদিবাসীদের যে একটা নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, লোকাচার গড়ে উঠেছিল—তা ক্রমশ কেমন বদলাতে বদলাতে চলেছে।

প্রতিদিন প্রতিক্ষণে গোটা ভারত বদলাচ্ছে। বিভিন্ন জাতি-উপজাতি বদলাচ্ছে। সেই অর্থে দেশকালপাত্র বদলাচ্ছে। স্বভাবতই এই সতত পরিবর্তনশীল ভারতভূমিতে আদিবাসী সমাজ নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাদেরও ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ সবকিছু বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কায়দায় বদলে যাচ্ছে। পরিবর্তনের এই অপ্রতিরোধ্য নিয়মের একটা বিশেষ পর্যায়ে পশ্চিম বঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক উঁরাও আদিবাসীর জীবন, জীবিকা, আচার-আচরণ, ভাষা-সংস্কৃতির যে বিরাট রূপান্তর সাধিত হয়েছে—তাকেই অক্লান্ত পরিশ্রমে তুলে ধরেছেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের দুজন কর্মী শ্রীঅমলকুমার দাস ও শ্রী মণীষকুমার রাহা।

দুই

২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালি থানার ১২খানা গ্রামে যে সমস্ত উঁরাও নরনারী বাস করেন, বর্তমান গবেষণা গ্রন্থখানি তাঁদের উপর ভিত্তি করে লেখা। ১৯৬২-৬৩ সালে এই গবেষণার কাজ চালানো হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য গ্রন্থের ভূমিকায় পরিষ্কার করে বলা আছে "The present study...among the Oraons of the Sundarban area, was mainly undertaken to find out the pattern of their life and activities in this region and to throw some light on the changes that have been brought about by migration, contact, new environment etc. as compared to their congeners in Bihar."

বইখানি পড়ে বোঝা গেল গবেষণার উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফল হয়েছে। মোট ১৩টি অধ্যায়ে উঁরাও নরনারীদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। সুন্দরবনের উঁরাওদের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক

অবস্থান থেকে শুরু করে তাদের অর্থনীতি, ভাষা, সামাজিক কাঠামো, গ্রাম-সংগঠন, যাদু ও ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় এ-আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আদিবাসীদের সম্পর্কে একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষও এ-বই পড়ে যথেষ্ট আনন্দ এবং উৎসাহ বোধ করবেন।

এ-প্রসঙ্গে একটি কথা আগেই বলে নেওয়া দরকার। ভারতবর্ষের উরাওদের সম্পর্কে আজকের দিনে কোনোরকমের আলোচনা করতে গেলেই শুরু করতে হয় রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়ের অতি বিখ্যাত এবং কঠিন পরিশ্রম-লব্ধ গ্রন্থ 'The Oraons of Chotonagpur' থেকে। বইখানি ১৯১৫ সালে প্রকাশিত। এর আগে এবং পরে (আলোচ্য গ্রন্থখানি ছাড়া) উরাও-দের নিয়ে আর কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং উরাও-দের সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে তার সুবিধে এবং অসুবিধে দুটোই আছে।

অসুবিধে হচ্ছে বইটি প্রকাশিত ১৯১৫ সাল। লিখতে আরও প্রায় ১০ বছর সময় লেগেছে। অর্থাৎ, ষাট-পঁয়ষট্টি বছর পূর্বে গৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আজো এগোতে হচ্ছে। কারণ কোনো উপায় নেই। অথচ আমরা জানি এই ষাট-পঁয়ষট্টি বছরে সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চলে কি দারুণ সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ বছরগুলি এই সময়কালেই অতিবাহিত হয়েছে, এই সময়ের মধ্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের ভারত-শাসননীতির কত রকম অদল-বদল ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যেই স্বাধীনতা ও তার পরবর্তী কাল!

অতএব এইটাই অসুবিধার প্রধান দিক যে অতি প্রাচীন অবস্থার নিরিখ ধরে বর্তমানের গবেষণার কাজ চালাতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সুবিধার দিকটা হচ্ছে এই কারণেই আজও এ-ব্যাপারে নিতান্ত গোড়ার কাজটুকুও করার অবকাশ ছিল। তাই অনেক দেরিতে হলেও অবশেষে উরাওদের নিয়ে এমন একখানি বই প্রকাশিত হতে পারল এবং সুখের বিষয় সেটা হলো বাঙলাদেশ থেকে।

বাঙলাদেশ কথাটা উল্লেখ করছি এই কারণে যে, আসলে কাজটা যাঁরা করলে সবচেয়ে ভালো হত এবং সকলের উপকার হতো সেই বিহার সরকারের আদিবাসী গবেষণা দফতর এ-ব্যাপারে বিশেষ কিছু করলেন না। রায়-বাহাদুরের বইকে ধরে স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের ছোটনাগপুর অঞ্চলের

উঁরাও জীবন নিয়ে একটি সুন্দর তুলনামূলক গ্রন্থ লেখা যেত। দুঃখের বিষয় তা হয়নি। কিন্তু হয়নি বলেই বাঙলাদেশের আদিবাসী গবেষণা দফতর যে বসে থাকেন নি—ছোট হলেও নিজেরা যে একটি কাজ করেছেন—তার জন্যে তাঁরা সকলের কাছে ধন্যবাদার্হ। উপরন্তু রায়বাহাদুরের পুরনো বইটির পর আলোচ্য গ্রন্থখানিই হচ্ছে উঁরাওদের সম্পর্কে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। অতএব এর মূল্য সেদিক দিয়ে অনেক বেশি।

তিন

উঁরাও তথা সব আদিবাসীর জীবনেই এমন কতকগুলি বিষয় থাকে যা দিয়ে তাঁদের প্রকৃত আদিবাসী চরিত্র ধরা পড়ে। দীর্ঘকাল সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসের ফলে এখানকার উঁরাওরা তাঁদের নিজস্ব সত্তার বহু কিছু আজ হারিয়ে ফেলেছেন। আরো সোজা করে বলা যায় পারিপার্শ্বিক মানুষ—তার ভষা সংস্কৃতি জলবায়ু—এবং দেশকালের চাপে পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা তাঁদের স্বকীয়তা বহুলাংশে হারাতে বাধ্য হয়েছেন। তাই আজ যাঁদের সুন্দরবনের উঁরাও বলি, প্রকৃত অর্থে তাঁরা "সুন্দরবনেরই উঁরাও"; রাঁচি-ছোটনাগপুর কিংবা ডুয়ার্স-আসামের নয়। এ-কথাটা খুব ভালো ভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

এখন দেখা যাক, প্রধানত কি কি মূল বিষয়ে তাঁরা আদিবাসী চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে গেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার ছোটনাগপুর অঞ্চলই হচ্ছে এখনো আমাদের কাছে আলোচনার মাপকাঠি। অতএব রায়-বাহাদুরের বই ছাড়া এক পাও এদিক ওদিক যাবার ক্ষমতা আমার নেই। যদিও আমরা নিশ্চিত যে, এ-রকম একটি মাপকাঠি ধরে আলোচনা করতে গেলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকবেই।

যাই হোক উঁরাও চরিত্রের মূল বিষয়গুলি কি দেখা যাক।

১। Dormitories (যুবকদের সাধারণ গৃহ)।

এই Dormitories আজ সুন্দরবনে উঁরাওদের জীবন থেকে একে-বারেই উঠে গেছে। অথচ এটা হচ্ছে উঁরাওদের জীবনে 'One of their most important sociopolitical Institutions" এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জীবনে অনুপস্থিত থেকে গেল অথচ তার কোনো গভীর প্রতিক্রিয়া (সামাজিক ও মানসিক) সৃষ্টি হলো না—এমন হতে পারে না। কেনতা উঠে গেল এবং এর

প্রতিক্রিয়াই বা কি সে-সম্পর্কে শ্রীদাস এবং শ্রীরাহা আরো কিছু আলোচনা করলে পারতেন। তাঁরা লিখছেন :

"In the Sundarban area, the original Oraon migrants did not introdeuce bachelor dormitories in their social and village life due to varied reasons." [page 27]

ডুয়ার্সের উরাওদের মধ্যেও Dormitories নেই।

২. Hunting (শিকার)।

আদিবাসী জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে শিকার। আদিবাসী চরিত্রের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে আছে এই শিকারপর্ব। এই শিকারের সঙ্গে ধর্মীয় উৎসব-আনন্দ এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক জড়িত রয়েছে। এই সব যৌথ শিকারপর্ব আদিবাসী জীবনকে অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত করে তোলে। কমপক্ষে বছরে তিনটে শিকার-উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। 'ফাগু সেন্দ্রা' (বসন্তকালীন শিকার), 'বিশু সেন্দ্রা' (গ্রীষ্মকালীন শিকার) এবং 'জেঠ সেন্দ্রা' (জ্যৈষ্ঠমাসের শিকার)।

কিন্তু সুন্দরবনের উরাওদের জীবনে শিকারপর্ব প্রায় অনুপস্থিত হয়ে গেছে। শ্রীদাস এবং শ্রীরাহা লিখেছেন :

"Hunting is almost absent now a days among the Oraons of Sundarban areas due to the lack of forest nearby. A few families have one or two hunting implements. ...No festival is associated with hunting or fishing...In Sundarban area the occasional hunting are never collective in nature but are individualistic in pattern." [page 45]

এই তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় সুন্দরবনের উরাওদের আদিবাসী চরিত্রে কি বিপুল রূপান্তর সাধিত হয়ে গেছে।

৩. Language (ভাষা)।

উরাওদের মাতৃভাষা হচ্ছে 'কুরুখ'। এর কোনো লিপি নেই। ছোট-নাগপুরের উরাওরা যখন নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে কথা বলেন তখন মাতৃভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় 'সাদরি' কিংবা হিন্দি ভাষা প্রয়োগ করেন। আসাম কিংবা ডুয়ার্সের চা-বাগানে মোটামুটি একই অবস্থা। ডুয়ার্সের গ্রামাঞ্চলের উরাওরা আবার সাদরি, হিন্দি, নেপালীর সঙ্গে রাজবংশী (যাকে চলতি কথায় 'বাহে বাঙলা' বলে) ব্যবহার করেন। শুদ্ধ বাঙলা-

ভাষা বলার লোক খুবই কম। কিন্তু সুন্দরবন এলাকায় অবস্থা কিছু ভিন্নতর।

শ্রীদাস এবং শ্রীরাহা লিখেছেন:

"The Oraons of this tract, speak in 'Sadri' when speaking among themselves or with other tribal caste people (who migrated from Bihar side). But while speaking with the local Bengalee people, they speak in fluent Bengalee." তাহলে দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষার চল নেই কোথাও। প্রসঙ্গত বলা যায়, সুন্দরবন অঞ্চলে যে 'সাদরি' ভাষায় কথাবার্তা চলে—তা রাঁচি এবং ডুয়ার্স অঞ্চল থেকে পৃথক। সুন্দরবনের 'সাদরি' বহুলাংশে বাঙলা শব্দের দ্বারা প্রভাবিত। ডুয়ার্স কিংবা রাঁচিতে তা নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের ৮৪ পৃষ্ঠায় সুন্দরবনের সাদরি এবং ছোটনাগপুরের সাদরি বলে যে দুটি উদাহরণ দেওয়া আছে, তাতে ছোটনাগপুরের বেলায় ভুল উদ্ধৃতি আছে। আসলে 'কুরুখ'কে 'সাদরি' বলে চালানো হয়েছে। আমার মনে হয় এটা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি।

৪. Culture (সংস্কৃতি)।

সাধারণভাবে বঙ্গদেশের সংস্কৃতি থেকে সুন্দরবনের উরাওরা অনেককিছু গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে দুটো সংস্কৃতি মিলেমিশে একটা অন্য জিনিস হয়ে গেছে। বাঙালিদের মতো জন্ম, বিবাহ, মুখেভাত, শবযাত্রা, শ্রাদ্ধ, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, কালী পূজা, শীতলা পূজা, নারায়ণ পূজা, মনসা পূজা এরা গ্রহণ করেছে; আবার করম, জিতিয়া, ফাগুয়া, সহরাই, গাঁওদেওতা অর্চনা নিজস্ব কায়দায় পালন করে থাকে।

গোত্র বদলায়নি। টোটেম-টাবু বদলায়নি। অথচ জোর করে সিন্দুর লাগিয়ে বিয়ে, বিয়ের আগে যৌনসঙ্গম, বিবাহবিচ্ছেদ এবং ঘরে শুয়োর পালা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রায় উঠে গেছে।

৪৭৬ পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থে বহু মূল্যবান গবেষণালব্ধ ফল স্থান পেয়েছে।

পরিশেষে গুটিকয়েক কথা বলে সমাপ্ত করব। আমার মনে হয়েছে একেবারে নিয়মমাফিক ধরাবাঁধা ছকে লেখার ছাপ গ্রন্থের সর্বত্র পরিস্ফুট। যার ফলে সত্যিকারের মাটির গন্ধ আসে না। আমি জানি না দুটোকে কি ভাবে মেলানো যায়। অথচ শ্রীদাস ও শ্রীরাহা যে অনেক ফিল্ডওয়ার্ক করেছেন বইয়ের পাতায় পাতায় তারও প্রমাণ রয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই বইগুলির

বিক্রির ব্যবস্থা কেন করেন না সেটা বোঝা গেল না। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে বইয়ের গণ্ডী বেঁধে দেওয়া সমীচিন নয় বলেই মনে করি। এ বইয়ের দাম, ঠিক করা উচিত, বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত।

টেবিলের উপর The Oraons of Sundarban দেখে একজন সাংবাদিক বন্ধু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সুন্দরবনেও কি উরাও থাকে?

এটা শিক্ষিত-অশিক্ষিতের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিকের বহু কিছু সম্পর্কে শুধু অজ্ঞ নয়, যাকে বলে একেবারে নিরেট।

তাই আবারো বলি এ-বইয়ের মূল্য অপরিসীম। কেবলমাত্র নৃতত্ত্ব-চর্চার দিক দিয়ে নয়, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে গোটা ভারতবর্ষের দিকে দিকে স্বাধিকার, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দাবিতে আদিবাসীদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে -সেই আন্দোলনকে বুঝতে গেলে, তার সঙ্গে থাকতে গেলে, মানুষগুলোকে প্রথমে জানা চাই। সেদিক দিয়েও এ-বই আন্দোলনের কর্মীদের অবশ্য পাঠ্য।

আরেকটি কথা। পশ্চিম বঙ্গের প্রায় ২৫ লক্ষ আদিবাসীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবন নিয়ে জেলাগতভাবে কাজ করার অবকাশ আছে। সবচেয়ে বেশি উরাওদের বাস যে জলপাইগুড়ি জেলায়—অবিলম্বে সেখানে কাজে হাত দেওয়া উচিত।

অস্থির সময়ের প্রত্যয়সিদ্ধ কাব্য

ধনঞ্জয় দাশ

বাংলা দেশের কাব্য-পাঠকদের কাছে মণীন্দ্র রায়ের নাম সুপরিচিত। দীর্ঘ তিরিশ বছরেরও বেশি তিনি সততা ও নিষ্ঠা সহকারে আধুনিক বাংলা কাব্যের আত্মায় ও শরীরে তাঁর কল্পনা-প্রতিভার দানে নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার অনেক স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিশঙ্কু মদন' প্রকাশিত হয়। আর, আমাদের আলোচ্য 'এই জন্ম, জন্মভূমি'-ই তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। এটির প্রকাশকাল ১৯৬৯ সাল। এই ব্যাপক সময়-পরিধির মধ্যে স্বদেশ ও বিদেশে অনেক পতন-অভ্যুদয় ঘটে গেছে। নানা ভাব সংঘাতে চঞ্চল হয়েছে আমাদের এই জন্ম ও জন্মভূমির 'গঙ্গাহৃদি' বাংলা দেশ। মণীন্দ্র রায়ের কাব্যেও বারংবার পালাবদল ঘটেছে। সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ভাবাদর্শগত প্রতিফলনে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধতর হয়েছে তাঁর কাব্য-সাধনা। তাই, চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে আমরা এখন মণীন্দ্র রায়কে নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধান কবিরূপে চিহ্নিত করতে পারি।

মণীন্দ্র রায় সম্পর্কে আমার এই উক্তি একটু বিবৃতিধর্মী হলো বোধ হয়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলা কাব্যের বন্ধুর পথ-পরিক্রমায় যে-কবি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তেরখানি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ তাঁকে যদি আমরা একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করার চেষ্টা করি তবে এই বিবৃত সত্যকে হয়তো কেউ-ই অস্বীকার করতে পারবেন না। সৌভাগ্যক্রমে, প্রায় পঁচিশ বছর মণীন্দ্র রায়ের কাব্য-সাধনা আমার প্রত্যক্ষগোচর এবং এ-পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর সমস্ত কাব্যগ্রন্থ পাঠের সুযোগও আমার ঘটেছে। আমার এই প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছি যে, তিরিশের দশকে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান পুরুষেরা যখন ম্লান মানবিক মূল্যবোধ, জীবন সম্পর্কে সংশয় ও নৈরাশ্য, আত্মসন্তুষ্টির বিরুদ্ধে শ্লেষ ও ব্যঙ্গকে আশ্রয় করে প্রায়

এই জন্ম, জন্মভূমি : মণীন্দ্র রায়। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১২। দু-টাকা

নেতিবাদী এক কাব্য-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করছিলেন তখন তার মধ্যে লালিত-পালিত যে তরুণ কবিগোষ্ঠি পরবর্তী দশকে বাঙলা কাব্যকে নতুন চেতনা ও আঙ্গিক-প্রকরণে নতুনতর লাবণ্য দান করলেন, মণীন্দ্র রায় তাঁদেরই অন্যতম।

চল্লিশের দশকের তরুণ কবি আজ বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ। 'এই জন্ম, জন্মভূমি', নিঃসন্দেহে সেই প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ কবির পরিণত কাব্য-ফসল। এই কাব্যগ্রন্থে মণীন্দ্র রায় ২৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী ৫৫৯ পংক্তি বিশিষ্ট দীর্ঘ কবিতায় গত তিন দশকের আধুনিক বাঙলা কাব্য-আন্দোলনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য তাকে আশ্চর্য শিল্প-নৈপুণ্যে বিধৃত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। চল্লিশের দশকের কবিদের সেই ইতিহাস-সচেতনতা, মানবিক আবেগ, হতাশার পরিবর্তে আশা, গ্লানি ও কুশ্রীতার বিরুদ্ধে শাণিত ব্যঙ্গ, আত্মসমালোচনা, বিশুদ্ধ মনন নির্ভরতার পরিবর্তে পরিপার্শ্ব ও সমাজ-সচেতনতা, দেশজ কাব্য-ঐতিহ্য গ্রহণের সদিচ্ছা, আঙ্গিকগত উৎকর্ষ অপেক্ষা বিষয়-গৌরবকে প্রাধান্য দান ইত্যাদি সকল প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিই তিনি নতুন পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বার নতুনতর তাৎপর্যে কাব্যভাত করায় আমি অন্তত খুশি। কারণ, আমার ধারণা—একটি নির্দিষ্ট যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ভাবাদর্শগত প্রতিফলন যে শিল্প-সাহিত্যে অস্বীকৃত, তা আঙ্গিকগত উৎকর্ষে লোভনীয় হলেও সৎ শিল্পী-মানসের ফসলরূপে সঞ্চয় করে রাখতে সর্ব দেশের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিধাবোধ করবে। আর, এ-কথা তো আমরা সবাই জানি যে, প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিক ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক কোন না কোন ভাবে তাঁর সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যে তাঁর কালেরই ভাবাদর্শকে প্রতিফলিত করে থাকেন। এই ভাবাদর্শেরও আবার দুই রূপ। যে ভাবাদর্শে ইতিহাস-সচেতনতা নেই মূলত তা প্রতিক্রিয়ার সহায়ক। সুতরাং সৎ শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে আমরা ইতিহাস-সচেতনতার দাবি খুব সঙ্গতভাবেই উত্থাপন করতে পারি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। ইতিহাস-সচেতনতার অর্থ সমসাময়িক ঘটনাস্রোতের তাৎক্ষণিক প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার নয়। দেশ ও কালে বিধৃত ব্যক্তি ও সমাজসত্তার সঙ্গে অতীত এবং বর্তমানের মিলন আর বিরোধজাত ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায় তাকে অনুসরণ করার অর্থই ইতিহাস-সচেতনতা। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত কবি-মন অন্তঃশীল এই চৈতন্য-প্রবাহকে কাব্যে ধারণ করে দেশ-কালের সীমা অতিক্রান্ত হয়, অবিস্মরণীয় উক্তিতে রেখে যায় কবিত্বের স্বাক্ষর।

আমরা জানি, মণীন্দ্র রায় প্রথমাবধিই ইতিহাস-সচেতন কবি। তাঁর 'ত্রিশঙ্কু মদন' থেকে 'মুখের মেলা' পর্যন্ত আটখানি কাব্যগ্রন্থে আমার এই উক্তির সপক্ষে অজস্র উদাহরণ যে-কোন সহৃদয় কাব্য-পাঠক খুঁজে নিতে পারবেন। কিন্তু আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ 'এই জন্ম, জন্মভূমি' ব্যতীত এই ষাটের দশকে প্রকাশিত অন্য চারখানি কাব্যগ্রন্থ ('অতিদূর আলোরেখা', 'কালের নিস্বন', 'মোহিনী আড়াল' ও 'নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়') পাঠে এ-উক্তি সমর্থনের জন্য পাঠকের মন বোধহয় কিছুটা দ্বিধান্বিত হবে। এই অস্থির দশকে মণীন্দ্র রায়ের কবি-মন হয়ত সেই স্থির বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি হারিয়ে অনেকখানি আত্মরতিতে মগ্ন হয়েছিল। তাই কিছুকাল আমারও মনে হয়েছে, মণীন্দ্র রায় যেন অতি ব্যস্ততা ও দ্রুততার সঙ্গে তার সু-আয়ত্ত প্রকরণ বিদ্যাকে খানিকটা যান্ত্রিক-ভাবে প্রয়োগ করে আমাদের মন ভুলাতে চেয়েছেন। এমনকি 'মোহিনী আড়াল' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে যখন তরুণতর কবিগোষ্ঠির একাংশ বেশ প্রশংসামুখর আমি তখন তার মধ্যে 'অন্তপথ', 'কৃষ্ণচূড়া', 'অমিল থেকে মিলে' ও 'মুখের মেলা'-র মানব-প্রত্যয়সিদ্ধ অবিস্মরণীয় উক্তির প্রাচুর্যে ভরা সময় ও জগতের সত্য অভিজ্ঞতার 'চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতা'র বাণীমূর্তি খুঁজে খুঁজে যথেষ্ট আশাহতই হয়েছিলাম। মণীন্দ্র রায়কে ধন্যবাদ, 'এই জন্ম, জন্মভূমি' উপহার দিয়ে তিনি আমার সেই হারানো বিশ্বাসকে শুধু ফিরিয়ে দেন নি, তাকে দ্বিগুণবেগে প্রজ্জ্বলিতও করেছেন।

'এই জন্ম, জন্মভূমি' আমাদের অস্থির সময়ের মানবমহিমাদীপ্ত সচেতন কাব্য-ভাষ্য। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে দেশে ও বিদেশে যখন স্থিতাবস্থা ভেঙে পড়ছে, মনের ভূগোল বদলে যাচ্ছে, স্তব্ধ রাত্রির বুকে আমরা পাগলা ঘন্টি শুনতে পাচ্ছি, যখন কয়েদখানার দরজা ভাঙছে, দিগন্তের তলা থেকে নিম্নচাপে উঠে আসছে ঝড়—তখন গঙ্গাহৃদি বঙ্গের স্থিরতার মন্দিরে বসে কবি মণীন্দ্র রায় তাঁর সমস্ত জড়তা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে ইতিহাস-সচেতন মন নিয়ে যুগসন্ধিকালের অস্থিরতাকে যেমন লক্ষ্য করেছেন তেমনি খুঁজেছেন স্থির প্রত্যয়ের 'পদস্থল বিন্দু'।

প্রকৃতপক্ষে, দক্ষ শিল্পী যেমন কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখায় তাঁর ঈপ্সিত দৃশ্যকে চিত্রায়িত করেন, মণীন্দ্র রায়ও তেমনি সহজ-সরল অথচ ব্যঞ্জনাময় বাক-নৈপুণ্যে কয়েকটি ছোট ছোট স্তবকে আমাদের যন্ত্রণা আর অবক্ষয় এবং এরি পাশাপাশি একই সময়ে বহমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সম্ভাবনাময় জীবনসত্যকে

আবিষ্কার করে 'এই জন্ম, জন্মভূমি'-র কাব্য-সৌন্দর্য পাঠকের মর্মলোকে পৌঁছে দেন। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই: 'সামঞ্জস্যহীনতার চিত্রিত চিৎকার' কিংবা 'বিপুল ধ্বসের চাপে ভেঙে-পড়া সেতু।' এই নির্বিশেষ দৃশ্যাবলীকে আরও বাস্তবগ্রাহ্য করার জন্য মণীন্দ্র রায় তুলে ধরেন: র‍্যাশানে বাজারে নাজেহাল মধ্যবিত্ত, খালাসীটোলায় মধ্যরাতে ঘুষোঘুষি করা পদ্য-লেখা বিদগ্ধ ছেলে, মুখে রঙ, ফাঁপা চুলে চুড়ো, খালি ফ্ল্যাটে লভ্য আইবুড়ো মেয়ের ছবি,—আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ের জীবন্ত দলিলচিত্র। কিন্তু এই বিকারই সব নয়। এদের জীবনেও দ্বন্দ্ব আসে, এ-কথা মণীন্দ্র রায় জানেন। তাই এই দ্বন্দ্বের কথা জিজ্ঞাসার স্বরে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে দেন: 'তুমি কি শোনো না সে চিৎকার?/ চিৎকার—না, গলাটেপা কান্না? কান্না—না, ঘৃণার চাপা বিদ্যুৎ?/ মেঘে মেঘে বাঁকা তলোয়ার!' আর, একই সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ করেন,, 'তেলকালি-মাখা মানুষ খনিতে বয়লারে কারখানায় পাগলা-ষাড় সময়ের শিং/দুটি হাতে ধরে হার মানায়'; কিংবা সোনার ধানে বর্গী নেমে এলে তিনি দেখেন, 'সামনে তার মানুষ পাহাড়।' দেশজোড়া এই তুমুল তোলপাড়কে তিনি আবেগ মথিত ছন্দে গ্রথিত করে বলে ওঠেন:

> ভেঙ্গে পড়ছে তরঙ্গে তরঙ্গ,
> সমুদ্র কী রুদ্র বঙ্গভঙ্গ,
> স্বপ্ন অশ্রু ঘূর্ণি আর ত্রাসে
> ও কে আসে দুরন্ত আকাশে.........

এরপর মণীন্দ্র রায় ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো 'হওয়া-না হওয়ার দ্বন্দ্ব ফেটে পড়বে দ্রুত বিস্ফোরণে'—এই কথা উচ্চারণ করতে ইতস্তত: করেন না। এবং এই পর্বে তিনি তাঁর জন্মভূমি, গ্রামে-গাথা 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গে'-র রিক্ত, নিঃস্ব জনপদ আর মানুষের হৃদস্পন্দনকে প্রবহমান পয়ারে এমন এক শিল্প-নৈপুণ্যে তুলে ধরেন, যা এই ষাটের দশকে প্রায় দুর্লভ। শুধু তাই নয়, তাঁর স্মৃতি-চারণায় আমিও যেন বহুকাল পরে তাঁর সঙ্গে পথ হাঁটি আর দেখি: 'ঐ তার আকাশ, ঐ মাইল মাইল মাঠ, / হঠাৎ অশথ, তাল, সবুজের পুঞ্জ, খড়ো চালা, / উঠোনে গৃহস্থ নিম, যুবতী ডালিম, ঝিঙেলতা; / ও দিকে পুকুর, নাকি দিঘি, ঐ গলুইয়ে কাছিম; / কলমির বেগুনি ফুলে সোনালি ফড়িং; / আর পায়ে চলা পথ, বাঁশ ঝাড়, আগাছার ঝোপ, / আকন্দ কি হাতিশুঁড়, কণ্টিকারি

কচু—/পাতার মখমলে তার সোনালি শিশির ;/এবং বাগান ঐ—জঙ্গলে জটিল / আম লিচু বকুলের গুলঞ্চের গলাগলি ভিড়ে / দপ করে হঠাৎ ওকি একথোবা অর্কিডের লাল ; / সমস্ত সকাল যেন চিত্রাপিত ; শুধু মানুষেরই হৃদয়ে আকাল।'

মণীন্দ্র রায়ের ইতিহাস-সচেতন কবি-মন এখানেও লক্ষ্য করে, স্বাধীনতার প্রসাদ বঞ্চিত আকালে নাকাল গ্রাম-বাঙলা ক্রমান্বয়ে ভিড় করছে পাটকলে, তরাইয়ের বাগিচায়, কয়লা কুঠিতে—দেশের লক্ষ কোটি শ্রমজীবী মানুষের বৃহত্তর বলয়ে। প্রতিটি প্রহর তাঁর কাছে স্তব্ধ জ্বালামুখী মনে হয়। তিনি উপলব্ধি করেন : 'যে-কোন বয়লারে, ক্রেনে, টার্বাইনে, ব্লাস্ট ফার্ণেসের/জলন্ত হলকায়, লেদে, হাইডেলে বা হাতুড়ির হাতে,/কয়েকটি প্রহর যেন বারেবারে আকাশে তাকায়। /কয়েকটি স্বপ্নের মধ্যে নিম্নচাপে হাওয়ার শন্‌শন্/ কেবলি ঝড়ের কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে তরঙ্গে তরঙ্গ/বলয়িত পরিধির বিস্ফারিত ঝাপটে হঠাৎ/কে জানে কখন জাগে আসমুদ্র হিমাদ্রি ঝন্ ঝন্/গঙ্গাহৃদি কূলপ্লাবি বঙ্গ !'

এই যখন দেশের অবস্থা তখন অগ্নিগর্ভ মুহূর্তে আমাদের ভূমিকা কি, কোথায় আমাদের অবস্থান, মণীন্দ্র রায় সোজাসুজি সে-প্রশ্নের সম্মুখে প্রতিটি সৎ মানুষকে দাঁড় করান। আত্মবিশ্লেষণ করে তিনি আমাদের দেখিয়ে দেন : 'জন্ম জন্ম, লোক-পরম্পরা/আমরাই তো বীজধানে আশা/নিয়ত রোপিত ; আমি,/ত্রিকাল আমারই বুকে ধরা,/একটা দেশ লোকজন মানুষ/ আমি বাঁচি তারই ভালোবাসা।' এবং দুরন্ত বলয় যখন বিপুল চাপে সঙ্কুচিত হতে থাকে তখন রক্তচক্ষু কালের সঙ্কেত তুলে ধরে বলেন : 'বিপুল বিরোধী স্রোতে আর্ত এই দেশ/তোমারই হৃদয়ে গোটা যুদ্ধভূমি জাগে।'

বাঙলা দেশের এই যুদ্ধক্ষেত্রে মণীন্দ্র রায় আমাদের মহত্তম পুরাণ কাহিনী থেকে একের পর এক প্রতীক খুঁজে এনে যখন ভীষ্ম, অভিমন্যু, শকুনী, জয়দ্রথ, কর্ণ, সুভদ্রা, গান্ধারী, অর্জুন কিংবা সেই পুরুষপ্রধান শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করে আমাদের দোলাচলবৃত্তি, বিদ্রোহী যৌবনসত্তা, ঈর্ষারিরংসা, নিয়তিতাড়িত জীবন-যন্ত্রণা, পুত্রশোকাতুরা মাতৃ-হৃদয়, ক্লীববীরত্ব এবং মাভৈঃ মন্ত্রে উদ্দীপ্ত চেতনাকে প্রকাশ করেন, তখন এই খণ্ড কাব্যও বিষয়-গৌরবে যেন মহাকাব্যের ব্যাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়। দীর্ঘ কবিতায় এমন গভীরতা, মনীষার দীপ্তি এবং শৈথিল্যহীন প্রকরণ-পদ্ধতি একমাত্র কবি বিষ্ণু দে-র 'অন্বিষ্ট' যুগের কাব্য ব্যতীত অন্য কোথাও আমার অন্তত লক্ষ্যগোচর হয়নি।

এই গ্রন্থের প্রাক-সমাপ্তি পর্বে তাঁর বৈদগ্ধ্য সত্যি বিস্ময়কর। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কেন স্বদেশ ও বিদেশ জুড়ে এই তুলকালাম কাণ্ড, কেন ছিন্নমস্তা সময়ের হাতে খরশান অস্ত্র, কেন এই নতুন প্রজন্মের সন্তান-সন্ততি আগুনে পাথরে দ্রোহে হেসে উঠছে, আত্মবলিদানে ছুটে চলেছে, তার তুল্যমূল্য বিচার করে কবি স্পষ্ট দেখেছেন: 'এক-একটা বিধান / কালাতিক্রমণদুষ্ট ফসিলের মতো / এ জীবন করে যাদুঘর। /......প্রতিষ্ঠান / সংঘ / দেখ ঐ ভূমিক্ষয়ে / মৃত / জরদ্গব / আত্মার পচনে আজ কেমন উলঙ্গ। / ....অথচ চেতনাকেন্দ্রে শতাব্দীর শেষে / অণুর তড়িৎনৃত্য, / আকাশের পারে মহাকাশ।'........

একদিকে অতীত মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, অন্যদিকে বর্তমান প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি আমাদের জীবনের তটে আছড়ে পড়ে যে নতুন চেতনার জন্ম দিচ্ছে তারই মধ্যে নিহিত এই অস্থির সময়ের মূল্যবোধ। পৃথিবীর মানবযাত্রার এই ইতিহাসকে কবি স্বাগত জানিয়েছেন, তাঁর জন্মভূমির দিকে তাকিয়ে শেষ কথা উচ্চারণ করেছেন: 'এই জন্ম, জন্মভূমি, এই / চেতনারই বিস্ফোরণে তরঙ্গে তরঙ্গ— / মানুষ মানুষ, প্রশ্ন, দিগন্ত উৎসার।'

'এই জন্ম, জন্মভূমি' নিঃসন্দেহে মণীন্দ্র রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। আধুনিক বাঙলা কাব্যে এ-এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কত সহজ-স্বচ্ছন্দে অথচ কী গভীরতায় একজন কবি শব্দ দিয়ে জীবন ও যুগের অনবদ্য ছবি আঁকতে পারেন, এ-কাব্য পাঠ না করলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। ছন্দের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও মণীন্দ্র রায় আশ্চর্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও মুক্ত বা ভাঙা পয়ারে, সমিল বা অমিল পদবন্ধে, কোথাও প্রায় সনেটীয় কারুকার্যে, কোথাও-বা প্রবহমান পয়ারের অনুপ্রাসীয় শব্দ-ঝঙ্কারে— পঙক্তি থেকে পঙক্তিতে অনায়াস বিহারে, ঠিক যেন জীবনের নিয়মে ছন্দ নিয়ে তিনি খেলা করেছেন। সমগ্র কাব্যের ভাবসঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রেখেই এ-কাজ নিঃশব্দে সাধিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সাম্প্রতিক কালের অনেক তরুণ কবি তাঁদের নৈরাজ্যময় কাব্যপ্রয়াসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে এই গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিতার সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ-হীনতার যে-কথা প্রায়শ উচ্চারিত হয়, আমার ধারণা, 'এই জন্ম, জন্মভূমি' সেই প্রায়চ্ছিন্ন যোগাযোগের সেতুপথ রচনায় এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রূপেও বিবেচিত হবে। এইসব মৌল কারণেই আমি এই কাব্যগ্রন্থের প্রতি সহৃদয় কাব্যপাঠকের দৃষ্টি সানন্দে আকর্ষণ করছি।

সময় কব্জিতে বাঁধা

রাম বসু

'সময় কব্জিতে বাঁধা বিবাহ সূত্রটি হয়ে আছে।'—তরুণ সান্যালের সাম্প্রতিকতম কবিতার বই 'রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা' সম্পর্কে এই উক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি যৌবনের এই দুঃসাহসকে স্বাগত জানাই। যে সহযাত্রীদের সঙ্গে তরুণ সান্যাল এসেছিলেন বাঙলা কবিতায় নতুন স্বাদ আর রূপ বদলের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, তাঁদের অনেকেই হাতের কব্জি থেকে সময়ের সুতো খুলে টান মেরে ফেলে দিয়েছিলেন ডাস্টবিনে। তাঁদের বিবেচ্য ছিল সময় নয়, স্থান কালে বিধৃত ব্যক্তি নয়, এবং সেইহেতু কোন মূল্যবোধও নয়। তাঁদের বিবেচ্য যে কি ছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। কারণ দেখা যায়, বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে ওই কবিদের বিবেচ্য বিষয় বদলে গেছে। বোদলেয়র-এর সঙ্গে সহ-অবস্থানে আসেন রিলকে, সংঘবদ্ধ নিঃসঙ্গবাদী কখনও হয়ে ওঠেন আনন্দবাদী গীতিকবি! অসঙ্গত বৈপরীত্য এবং পদে পদে স্ব-বিরোধিতায় দীর্ণ সেই সহযাত্রীরা সৎ আত্মানুসন্ধানের অভাবেই অচিরে আপোষ করলেন প্রথাসিদ্ধ সনাতনের সঙ্গে, প্যাচ্‌পেচে কবিয়ানার সঙ্গে যা সেন্টিমেণ্টালিজমের চেয়েও কদর্য।

শোনা গিয়েছিল রাজনীতি নাকি বাঙলা কবিতার স্বাস্থ্যহীনতার কারণ। তরুণ সান্যালের সহযাত্রীরা শোনালেন তাঁরা ব্যক্তি, ব্যক্তিমানস ও চেতনা ইত্যাদি উদ্ধার করতে চান। স্ব-বিরোধিতা এবং অস্থির-চিত্ততার মধ্যেও এই-ই ছিল সম্ভবত তাদের একমাত্র সদর্থক উক্তি এবং এই উক্তি খুবই গ্রহণীয়। যাদের সঙ্গে বিরোধ, সেই অভিশপ্ত রাজনীতিবাদীরাও, ব্যক্তি-চেতনা ও ব্যক্তি-মানসকে অস্বীকার করেছিলেন বলে জানা নেই। তাঁরা কবিতা লিখেছেন এবং লিখতে চান। তাই আদিভূমিকে অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই সব বাক্‌বিভূতির অন্তরালে যে তত্ত্বগত ধূর্ততা কাজ করে ছিল তা হলো ব্যক্তি সম্পর্কে চেতনা;—ব্যক্তি সমাজ-নির্ভর নয়; স্থান-কালে

রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা: তরুণ সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬, বিধান সরণী। কলিকাতা-৬। তিন টাকা

আবদ্ধ প্রাণী নয় যার প্রাণসত্তা তাকে বারবার টেনে নিয়ে যায় স্থান ও কালের ওপারের বোধের জগতে। তা যদি না হবে তবে রাজনীতি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে এই এলার্জি আসে কোথা থেকে ; তরুণ সান্যালকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্যে যে, তিনি এই চোরাবালিতে পা দেননি।

পরবর্তীকালে বাঙলা কবিতার ইতিহাস রচনার জন্যে যদি কোন বস্তুবাদী ঐতিহাসিক আসেন, তিনি এই সময়ে অনেকগুলি চমৎকার যোগাযোগ খুঁজে পাবেন। রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্যবিত্ত ও প্রতিভার যুগ শেষ হতে না হতেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর যাত্রা আরম্ভ হলো। আধুনিক কবিতার প্রথম পদাতিকদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের মূলধন হল একমাত্র প্রতিভা— আভিজাত্য এবং বিত্ত নয়। ফলে মধ্যবিত্তজীবনের দারুণ ভাঙন ও ব্যর্থতা সেখানে স্পষ্ট। পরবর্তীকালে মানুষ জীবন এবং অভিজ্ঞতাকে সামগ্রিকভাবে, সামাজিক দৃশ্যপটে বিচার করা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে নতুন মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা, নতুন মানবিকতাকে বাস্তব করে তোলার পিছনে যে কাব্যচেতনা কাজ করেছিল তার উৎস ছিল দেশের এবং বিদেশের মুক্তি-আন্দোলন। দ্বিতীয় পর্বের এই কবিরা প্রথম পর্বের কবিদের তুলনায় আরও বেশি বিত্তহীন। আরও নগ্ন ও হিংস্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি এই কবিরা স্বাভাবিকভাবেই আত্মীয়তা খুঁজে পেয়েছিলেন আন্দোলনে। কিন্তু স্বাধীনতা এবং বামপন্থী নেতাদের অকৃত্রিম ব্যর্থতা নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করল। ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে বৈদেশিক প্রভাব হলো স্পষ্ট। তার ছাপ এসে পড়লো সংস্কৃতিতে। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ হলো সহজ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ভাবতে পারেন নি এত সহজ হতে পারে। অদৃশ্য জাল পাতা হতে থাকলো নিপুণভাবে। নেহাৎ ব্যবসাদার বা মোটা মাইনের চাকুরে, যারা কাব্য আন্দোলন সম্পর্কে ক্ষীণতম উৎসাহ প্রকাশ করতেন না, তাঁরাই হতে থাকলেন পৃষ্ঠপোষক। কায়েমীস্বার্থ ও প্রতিক্রিয়া নিপুণ প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করলেন যে সাধারণ মানুষ গালে হাত দিয়ে থ' হয়ে ভাবতে থাকল—তা হলে এবার কিছু হলো!

প্রতিক্রিয়া যখন পৃষ্ঠপোষকতায় নেমেছে তখন কিছু না কিছু না-করিয়ে ছাড়বে কেন! সবরকমের জীবনবিদ্বেষী ধারণাগুলি, দায়িত্বহীনতা এবং অমানবিক বোধগুলি অভিষিক্ত হতে থাকল। ব্যক্তিবাদীরা এমন জবরদস্ত অঘোষিত সংগঠন গড়ে তুললেন যা রাজনীতি ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন সাহিত্যিকরা সংগঠন কুশলী হয়েও ভাবতে পারেন না।

বামপন্থী কুলগুরুরা চুপ করে থেকে কি লাভ করেছেন জানি না, তবে ক্ষতি করেছেন সমগ্রভাবে সাহিত্যের। বন্যার জলে সব ধুয়ে গেল। প্রসাদপুষ্ট হলেই যখন প্রতিষ্ঠার সদর রাস্তাটা খুলে যায়, তখন সেই পথে পা না-বাড়িয়ে তরুণ সান্যাল, যুগান্তর চক্রবর্তী, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ওই সময়ের কয়েকজন কবি যে সদাচার ও সাহিত্য নিষ্ঠার নিদর্শন রেখেছেন তা অদূর ভবিষ্যতে উদাহরণ হিসাবে স্বীকৃত হবে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খল পটভূমিতে তরুণ সান্যালের আলোচনা বাঞ্ছনীয়। তা ভিন্ন কিছুতেই স্পষ্ট হবেনা সময়ের বিশেষ বিন্দুতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কবিতার স্থিতি কি ভাবে হয়ে উঠলো কঠিন স্ফটিক।

যন্ত্রণার মুখ দেখে আমিও দর্পণে একা স্তব্ধ সাজঘরে
হাজার ওয়াট বালবে কপালের রেখা পড়তে চাই।

'মাটির বেহালা'র নিষ্পাপ ও উদ্ধত কবি অনেক আগেই হারিয়েছেন সহজ বোধ যা ছিল সকালের শিশিরঢাকা মাঠের মতো। জীবন ও অভিজ্ঞতা, জীবন সম্পর্কে ব্যাপ্ত দায়িত্ববোধ, সাধ ও সিদ্ধির বৈপরীত্য তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে জটিলতার নখ বড় তীব্র ও অব্যর্থ। সুকুমার শ্যামলতা অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ।

হে সময় আমার সময়
পৃথিবীর শ্যাম-রুক্ষ রণক্ষেত্রে শুয়ে আছি মাথা রেখে বাহুর ধনুকে
দীর্ঘবেলা।

এবং দীর্ঘবেলা রণক্ষেত্রে যে একা শুয়ে থাকে সে কোন একক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সত্তা নয়। সে এমন এক ব্যক্তি যে উপলব্ধির সাগরসঙ্গমে যেতে চায় বাঁচার দীনতা এবং বীরত্বের ভিতর। সে ব্যক্তি জানে জীবনের তাৎপর্যকে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যেতে হয় একা একা। সেখানে কেউ কারো সঙ্গী নয়। উপলব্ধির এই অনন্যতাই একই দর্শনে বিশ্বাসী বিভিন্ন কবিকে করে তোলে বিভিন্ন ও একক। এই জন্যে আরাগঁ হন না এলুয়ার, বিষ্ণু দে হন না সুকান্ত, তরুণ সান্যাল হন না যুগান্তর চক্রবর্তী। এবং এই বৈচিত্র্যের জন্যে মানুষ এত রোমাঞ্চকর। এই বিভিন্নতাই আনে নতুন স্বাদ। এই নতুন স্বাদের তলায় অন্তর্লীন ব্যাপ্ত জীবনবোধ সবাইকে গ্রথিত করে রাখে।

রণক্ষেত্র থেকে কোন দিন পালাবার কোন অবকাশ নেই। মানুষকে মানুষ হতে হলে, মানুষ—এই বোধের মধ্যে তীব্রতা সঞ্চারিত করতে হলে, এই

বোধকে নতুন ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য দিতে হলে, তাকে রণক্ষেত্রে আসতেই হবে। তাকে প্রবেশ করতে হবে ইতিহাসে,—যেখানে অহর্নিশ দ্বন্দ্ব চলছে ইতির সঙ্গে নেতির, স্বীকৃতির সঙ্গে অস্বীকৃতির, সাময়িকতার সঙ্গে চিরন্তনের। বাঁচতে গেলেই আমাদের কিছু রক্ষা করতে হবে, আক্রমণ করতে হবে 'কিছুকে'। এবং এই গ্রহণ ও বর্জন, এই ভালবাসা এবং ঘৃণা হলো জীবনের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ; যার পরিণতি ন্যায় বিচার এবং সুষম সৌন্দর্য ও সুঠাম বিবেক।

তাই যন্ত্রণাকে, অন্তর্দাহকে অঞ্জলি ভরে নিতে হবে। যা আছে এবং যা কাম্য এই নৈতিক ভারসাম্যহীনতা থেকে তারাই মুক্ত হতে পারে যারা জড় এবং অচেতন, অন্ধ এবং ভক্ত, যারা প্রশ্নহীন, এবং সেই জন্যে যারা সময়ের বাইরে, তাই ইতিহাসের বাইরে। কারণ ইতিহাস শুধু এই যান্ত্রিক অর্থে মূল্যহীন। বাস্তব ও জীবন্ত মানুষ সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে যে উদ্দেশ্য আরোপ করে, ইতিহাস সেই উদ্দেশ্যকে নিয়েই হয় দীপ্ত। তাই আদিতে থাকে মানুষ, থাকে অবিনশ্বর বিবেকবান মানুষের ন্যায় শান্তি আর সৌন্দর্যের জন্যে অবিরাম ভাঙাগড়া।

যার ওপর আলোকসম্পাত হয় নি, কবি তাকেই আলোকিত করে চলেন। পায়ের ছাপ রেখে এগিয়ে যেতে হয়। হয়তো ধূলি-ঝড়ে সেই চিহ্ন মুছে যায়। তবুও যেতে হবেই। এ যেন তার নিয়তি। শব্দের দর্পণে ধরতে হয় চেতনাকে। এমন কোন কিছুই নেই যাকে শব্দের দর্পণে ধরা যায় না। যদি কোন ধারণাকে শব্দ দিয়ে মূর্ত করা না যায় তবে দেখা যাবে সেই ধারণার মধ্যে গোলমাল আছে। সুররিয়ালিস্টরা সব ফর্ম ভেঙে অব্যক্তকে বলার যে আয়োজন করলেন তা তাঁদের বক্তব্যহীনতার দ্যোতক। জীবনাশ্রয়ী কবিরা ভাঙতে চান না, গড়তে চান। তাই সব কিছুকেই মানতে হয়। মমতার দাবি, অনাবিষ্কৃতের অনুরোধ সেটাই। রজনীগন্ধা থেকে মূত্রাগারের পিচ্ছল আভা, সবই সমান আগ্রহে ভেঙে পড়ে। প্রাচীন সংস্কৃতের উল্লেখ থেকে রূপান্তরের পথে বাঙলার গ্রাম্যজীবনে অনভ্যস্ত আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি,—তরুণ সান্যাল গ্রহণ করেছেন সব। হয়তো যৌনাক্রান্ত শব্দ, ওই সব উপমা অথবা মধ্যবিত্তের অচরিতার্থ উচ্চাশার ফলশ্রুতি,—কিছু 'রক্তসম্মত' শব্দ ব্যবহার করলে আধুনিক নামক বাজার চলতি কিম্ভুত ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারতেন, বনেদী মহলে কলকে পেতেন ; তবু শুধু এইটুকু, এইটুকুই, জীবনের কোন ক্ষুদ্র অংশও নয় বলেই, তরুণ সান্যাল আরও বিস্তৃত শব্দরাজি এবং তার

পরিবর্তিত ব্যবহার প্রণালীর দিকে হাত বাড়ান। যে-ভাবে প্রয়োগ করলে শব্দপুঞ্জ অর্থের ভার সহ্য করার আরো বেশি ক্ষমতা পায় তরুণ সান্যাল সেই ভাবে শব্দ প্রয়োগ করতে চান,—যদিও সবক্ষেত্রে তিনি সার্থক নন। গ্রামাঞ্চলেও বিস্তারের পথে নগরচেতনা যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, তরুণ সান্যালের সচেতন মন তাকেও গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। প্রথম পাঠে পাঠকের মিশ্র প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। অনেক সময় বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রয়োগ অনিবার্য বলে মনে নাও হতে পারে। তবু এই ইচ্ছাকৃত প্রয়োগ আর এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনানন্দের আবিষ্ট গ্রাম লোকান্তরিত কল্পনামাত্র। যে তীব্র ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে আমরা চলছি, বিরুদ্ধ স্রোতের মুখে উপযুক্ত নাবিকহীন নৌকার মতো আমাদের সমাজ ও জীবন যে ভাবে, বারবার নাকানি চোবানি খাচ্ছে তাকে সত্য করে তোলার জন্যে এই প্রয়োগ প্রচেষ্টা অভিনন্দনের দাবি করে।

চামড়া খুলে নাও, মাংস খুবলে তোল, অন্ধ করো চোখ
কোথায় আগুন পাওয়া যাবে ?
অথচ আগুন ছিল অঞ্জলিতে জলের প্রবাহে
কেন না আগুন আছে পর্বতের
গুহায় স্পন্দিত
ঝাঁ ঝাঁ প্রখর আঁধারে,

—এই যে ভায়লেন্স, এবং এই ধরনের ক্রোধদীপ্ত তীব্রতা যা অজস্র ছড়িয়ে আছে, তরুণ সান্যালের কবিতার গঠনকে পৌরুষ দেয় নি শুধু—এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আবার তাঁকে, তাঁর সহযোগী কবিদের কাছ থেকে, স্বতন্ত্র করে তুলেছে। যে সময়ে এই কবি-সম্প্রদায়ের যৌবন উন্মোচিত হল, জাতীয় জীবনে সেই সময় বড়ই মারাত্মক। দাঙ্গা, স্বাধীনতা, বঙ্গভঙ্গ, রাজনীতিবিদ ও সংস্কৃতিবিদদের অন্ধ লোভ-লালসা-ক্ষুদ্রতা, মূল্যহীনতা, সমগ্র পরিবেশকে নরক করে তুলেছে। এই পটভূমিতে কবিদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত তীব্র ভায়লেন্স এবং অস্বীকৃতি। তরুণ সান্যালের সহযোগী কবিরা সেই পথই বেছে নিলেন। কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব, ন্যায়বিচার এবং নতুন মানবতা প্রভৃতি সার্থক মূল্যবোধকে অংগীকার করে,—যে মূল্যবোধ এবং যে ধারণা তখনও সমাজের প্রতাপশালী অংশকে অস্বীকার করে, সংগ্রামী মানুষের সহযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠায় লিপ্ত, তার দিকে সামান্যতম আগ্রহ প্রকাশ না করার জন্য সহযোগী ওই সব কবিদের ওই ভায়লেন্স কোন স্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। ওই ভায়লেন্স কালক্রমে হয়ে উঠল

আত্মদ্রোহী এবং জীবন-বিদ্বেষী। এই ভায়লেন্স জীবন বিরোধী প্রতিক্রিয়াকে আঘাত করতে পারে নি। বরং জীবনকে আঘাত করেছে, মূল্যবোধকে আঘাত করেছে। তাই প্রতিক্রিয়া এই ভায়লেন্ট কবিদের কোলে তুলে নেচেছে। সুখের বিষয় তাদের অনেকেই হয়তো ভুল বুঝতে পেরে কিংবা অন্য কোন কারণে স্থিরতার পথে যাত্রা করছেন।

অথচ এই একই প্রতিক্রিয়া, এই একই ভায়লেন্সকে তরুণ সান্যাল নিপুণ ভাবে প্রয়োগ করলেন মানুষের কদর্য শত্রুদের বিরুদ্ধে; জীবনকে যারা নরক করে তুলেছে। তাদের বিরুদ্ধে হয়তো কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট, কখনো-বা বিমূঢ় সেই আক্রমণ। কিন্তু নিজেকে ইতিহাসের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে, সময়ের সব দায়িত্ব নিজের দায়িত্ব বলে মেনে নিয়ে কবি খুঁজে পান বাঁচার তাৎপর্য, যাতে আছে শ্রী এবং শ্রীহীনতা।

আমি চাইছি থাবার আঁচড়, তীব্র ভয়াল, ঠিক যেন আজ
আমারো মুখের আদলে চোথা বোঁচা বা বোকা স্বদেশ দেখি।

এ যেন আর এক ধরনের রূপ দর্শন, এ যেন এক দীপ্ত অংগীকার সেই অনিবার্যের কাছে, যার পায়ে নতজানু হয়ে বলা যায় :

পাবক, হে শমীশাখা, হে দাহিকা, আরও কিছুকাল
দগ্ধ হব, হতে চাই, তিক্ত কয়লা অঙ্গার করোটি
স্মৃতির অপার অশ্রু ঝরে আছে শ্যাওলায় দুপায়ে
হাওয়ায় যাবো না আমি, ঠাণ্ডা ঝরা অবিরল পাতা
বাইরে রাখো অগ্নিকুণ্ডে, কিছুক্ষণ তপ্ত যৌবনের
বাহুবন্ধে নিদ্রা যাও হে বয়স নিসর্গ বালিকা।

'সময় কব্জিতে বাঁধা বিবাহ সূত্রটি হয়ে আছে।'—আবার গোড়ার কথায় ফিরে আসি। এবং সেই সময়ের কথা আজ বড় মারাত্মক। বিপদজনক দেহলিতে দাঁড়িয়ে একটা কথাই বলা যায়,—নাউ অর নেভার। 'রণক্ষেত্রে দীর্ঘ বেলা একা' এই প্রশ্নকেই শাণিত করে তুলেছে। এবং তরুণ সান্যালের বিরোধী পাঠককেও দেবে সার্ত কথিত 'আনহ্যাপি কনসিয়ানস' এবং এই সময়ে তাই-ই হবে তাৎপর্যময়।

মার্কসবাদ ও নৈতিকতা

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পণ্ডিতেরা বলেন নীতিবিদ্যার চর্চারম্ভের বহু আগে থেকেই নীতিবোধ বা নীতিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে। আদিম সাম্যবাদী সংগঠনের মধ্যেও ভালমন্দ উচিতানুচিত, ন্যায়ান্যায় ইত্যাদির বিধিনিষেধ প্রচলিত ছিল; কিন্তু নীতি-বিদ্যার (ethics) চর্চা সুরু দাস-সমাজের আমলে। উইলিয়ম এ্যাশের 'মার্কসিজম এ্যাণ্ড মর‍্যাল কনসেপ্‌টস্' (মান্থলী রিভিউ প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৬৪) নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনাগ্রন্থ। এই আলোচনায় নীতিবোধ, নীতিজ্ঞান, ন্যায়ান্যায়, আচরণবিধিও সন্নিবদ্ধ হয়েছে। আজকের দিনে অনেক কারণেই এই ধরণের আলোচনা অভিপ্রেত।

ধনতন্ত্র আজ নয়া উপনিবেশবাদী চক্রান্ত ও ভিয়েতনামের মত স্থানীয় যুদ্ধ সত্ত্বেও বিপন্ন। ব্যক্তিমালিকানার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন আর এক প্রযুক্তি-বিপ্লবের সম্ভাবনা আজ সুস্পষ্ট। বুর্জোয়া নীতিজ্ঞান ও নীতিবোধ তাই মনোপলির নগ্ন স্বার্থ রক্ষায় নির্লজ্জভাবে সচেষ্ট। বুর্জোয়া নীতিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্রতরুণের বিদ্রোহ আজ নানা রূপপরিগ্রহ করে প্রচলিত নীতিজ্ঞান ও নীতিবোধের ভিত্তিমূলে আলোড়ন তুলেছে। বুর্জোয়া দার্শনিক আজ বলছেন, নীতিবিদ্যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই; মানুষের নীতিবোধ সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। আজ যে আচরণ নীতিসম্মত, কাল সেই আচরণ নীতিবিগর্হিত। এক দেশের বা এক সমাজের কাছে যা অনুমোদিত, অন্য দেশ বা অন্য সমাজের ন্যায়শাস্ত্রে তা হয়ত পরিবর্জিত, নিন্দিত। একই সমাজে একই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে ন্যায় অন্যায় বিভিন্নভাবে পরিগৃহীত। ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুবর্তিতার দরুন পারলৌকিক হিতের জন্য নরবলি যেখানে ঘৃণিত, ইহলোকের মঙ্গলের জন্য যুদ্ধে সহস্র বলি সেখানে প্রশংসিত। মুনাফা সঞ্চয়ার্থ শ্রম অপহরণ যে সমাজে নীতিসম্মত ও প্রচলিত, উপবাসী সন্তানের জন্য একখণ্ড রুটি অপহরণ সেই সমাজে নীতিবিগর্হিত ও ধিকৃত। এই ধরণের পরিচিত উদ্ধৃতির সাহায্যে

Marxism and Moral Concepts: William Ash: Nonthly Review Press.

নীতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্য একচ্ছত্র পুঁজির সর্বপ্রকারের দুর্নীতিকে অবস্থাসাপেক্ষ আচরণ হিসেবে স্বাভাবিকত্বের পর্যায়ে পরিণত করা। মানুষের আচার ব্যবহারের একান্তভাবে পরিবেশ-নির্ভরতা (মানুষ আসলে অবস্থার দাস) অথবা সর্বব্যাপারে মানুষের উন্মার্গগামী স্বাধীনতা—এ দুইই নৈতিক আপেক্ষিকতাত্ত্বিকদের সুবিধাবাদী প্রচার। খৃষ্টপূর্বযুগের গ্রীক দার্শনিক সন্দেহবাদী পাইরো এই শতকের নিও-পজিটিভিস্ট দার্শনিক রুডল্‌ফ কারনাপ, আলফ্রেড আয়ার এবং আরো অনেক প্রয়োগবাদী অস্তিবাদী দার্শনিক এই আপেক্ষিকতাবাদের সমর্থক। সাম্রাজ্যবাদীর জীবনদর্শনে এই আপেক্ষিকতাতত্ত্ব নিজেদের আচরণব্যবহারের স্বপক্ষে আত্মছলনাকারী যুক্তিহিসেবে উপস্থাপিত করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এর বিপরীতে অবস্থিত ধর্মভিত্তিক নীতিশাস্ত্র। সব নীতিকৃতের মূলে ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর। যা কিছু সৎ, যা কিছু মঙ্গল সবই ঈশ্বরের মধ্যে রূপায়িত ; অসৎ, অন্যায়, অমঙ্গল মানুষের আদিম পাপের ফল। ভালমন্দের একমাত্র বিচারক ও বিধায়ক একমাত্র মঙ্গলময় পরমেশ্বর, তিনি যা কিছু করেন মঙ্গলের জন্যই সম্পন্ন করেন ; এই ধারণা সবদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যেই প্রচলিত। ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী ; এই জন্মে নীতিপথে থাকার জন্য যে কষ্টভোগ, অন্যজন্মে বা বেহস্তে তার অবসান এবং ক্ষতিপূরণ। অতএব পরদ্রব্যে লোভ করা নিষেধ ,অপরের ঐশ্বর্যে বিদ্বিষ্ট হওয়া অধর্ম। প্রথম তত্ত্ব অর্থাৎ যা খুসি করবার দর্শন, উপরতলার লোকের, এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসন আপামর সাধারণের। মার্কসবাদীরা বেশির ভাগ বুর্জোয়া দার্শনিকের মতে নীতিহীন, বিবেকহীন যন্ত্রদানব ; উদ্দেশ্য-বিধেয়, উপায়-অভীষ্ট এদের কাছে সমার্থবাচক। শ্রেণীবিশেষের স্বার্থকে এরা সর্বসাধারণের স্বার্থ মনে করে। অভীষ্টসাধনের জন্য যে কোন উপায় গ্রহণে এরা রাজি। হিংসাকে এরা সমাজ-বিবর্তনের একমাত্র পন্থা হিসাবে মনে করে। যা কিছু সুন্দর যাকিছু সুস্থ—এরা ধ্বংসকরতে চায় ইত্যাদি, ইত্যাদি.... । মার্কসবাদের কাছে নীতির কোন মূল্য নেই,—অনেক সরলবিশ্বাসী ভালমানুষই এই মত পোষণ করেন। এ অবস্থায় নীতিবিদ্যার মার্কসবাদী বিশ্লেষণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আবার মার্কসবাদীর কাছেও আজ অন্য এক কারণে নীতিবিদ্যার বিচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ভিত ও অধিসৌধ (base & superstructure) সংক্রান্ত আলোচনা এই প্রসঙ্গে উঠবেই, (যেমন উইলিয়াম এ্যাশও তুলেছেন) এবং আমি মনে করি এই প্রশ্নে এখনও আমরা দ্বিধান্বিত ও সংশয়াচ্ছন্ন। দেহ-

মন, বস্তু-ভাব ;—এই বহু আলোচিত বিষয় নিয়ে—মার্কসবাদীদের মধ্যে 'সূক্ষ্ম মতপার্থক্যের সমাধানের ও নতুন পরিস্থিতির ডায়েলেকৃটিক বিচারের তাৎপর্য আজ অসীম। বুর্জোয়া পণ্ডিত আজ মার্কসবাদের মধ্যে যে তথাকথিত বহুকেন্দ্রিকতার পরিচয় প্রাপ্তিতে উল্লসিত, তার বীজ নিহিত ঐ ধরণের কয়েকটি অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে। বিষয়-বিষয়ী এবং দেহ-মন সম্পর্কে আরো বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। পাভলভ-বর্ণিত মস্তিষ্ক-টাইপের বিশিষ্টতা বিষয়-বিষয়ী সম্পর্ককে কতটা প্রভাবিত করে? নরমপন্থী চরমপন্থী মধ্যপন্থীর মানসিকতা গঠনে ও পন্থানির্ণয়ে ব্যক্তি-মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যের কোনো ভূমিকা আছে কি না? প্রচারের...ফলে রাজনৈতিক অবশেষণ তৈরী সম্ভব কী? মানুষের সামাজিক চেতনা ও বিজ্ঞানবুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন এই বর্ধিত চেতনা ও বুদ্ধির মূল কারণ ;—এ বিষয়ে অনেকেই একমত। কিন্তু যখনই প্রশ্ন তোলা হবে যে এই চেতনা বৃদ্ধির ফলে মস্তিষ্কের দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে কিনা, তখনও মার্কসবাদীরা ভিন্ন ভিন্ন সুরে কথা বলেন। দেখা যাবে এখনও আমরা মানবমনে ও সমাজ-মানসে উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের প্রভাবের মাত্রা নির্ণয়ে অক্ষম। থিওরি ও প্র্যাকৃটিসের দ্বন্দ্ব সমাধানে এখনও আমরা অস্পষ্ট। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান ও অবাধযৌনতা তত্ত্বে অনেক মার্কসবাদীই আচ্ছন্ন। 'ডেপ্থ্-সাইকোলজি' ও নীতিবোধের সম্পর্কনির্ণয়ে অনেক মার্কসবাদী জেম্‌স্, ইয়ুং-এর শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। নীতিবিদ্যার আলোচনা মার্কসবাদের অনেক আধুনিক সমস্যার উপর আলোকপাত করবে, আমাদের অনেক প্রশ্নকে তীক্ষ্ণাগ্র করে তুলবে, পরিবৃত্তি-কালীন বিচ্ছিন্নতা ও প্রক্ষোভাধিক্য বিশ্লেষণে সহায়ক হবে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে দাস-সমাজে প্রথম নীতিবিদ্যাচর্চার সুরু। তখনই এই বিদ্যা তথা মানবিকতা, মানবজীবন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বস্তুবাদী এবং ভাববাদী দার্শনিকের তাত্ত্বিক লড়াই-এর সূত্রপাত। প্রাচীন গ্রীস, ভারত ও চীনে নীতিবিদ্যা ভাববাদী ও বস্তুবাদী পণ্ডিতদের বিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল। তখনকার দুটি প্রধান শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত এই বিতর্কে প্রতিফলিত। ইউরোপে ধনতন্ত্র বিকাশের যুগে নীতিবিদ্যারও বিকাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে স্পিনোজা, রুশো, দিদেরো, ফয়ারব্যাক্ এর নাম উল্লেখ্য। অনেকে মনে করেন এই বিষয়ে কাণ্ট ও হেগেলের (ভাববাদী হওয়া সত্ত্বেও) অবদান বেশ মূল্যবান। পরবর্তী লর আন্তর্মানবিক সুস্থ সম্পর্ক

গঠনের পক্ষে অনুকূল ! বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্রের প্রগতিবাদী রূপের পাশাপাশি প্রতিক্রিয়ার চেহারাও ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। এর পর দেখা যায়—হেরজন, চেরনিসেভস্‌কী, বেলিন্‌স্‌কী প্রমুখ রুশ বিপ্লবীদের এবং ইউটোপীয় সোশালিস্টদের নতুন ন্যায়নীতি ও আন্তর্মানবিক সম্পর্কের কাল্পনিক ছবি। মার্কসীয় নীতিবিদ্যা অতীতের এই সব ভাববাদী পণ্ডিত-দার্শনিকদের ঋণ অস্বীকার না করেও তাদের তত্ত্বকে পুরোপুরি খণ্ডন করে। ভাববাদী তত্ত্বের সার কথা এই যে কেবল মাত্র শিক্ষা, উপদেশ, উৎসাহের সাহায্যে মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটানো যায়, নীতিভ্রষ্টতা দূর করা যায় অথবা শাসনযন্ত্রের [form of gorvernment] পরিবর্তন সাধন করলেই ঈপ্সিত নীতিবোধ সাধারনের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। মার্কসীয় নীতিবিদ্যা অনুসারে নীতিবোধ নীতি-জ্ঞান, ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। মানসিকতার অন্যান্য দিকের মত নীতিবিদ্যা দেশকালসাপেক্ষ। মার্কস এঙ্গেলস্, লেনিন,প্লেখানভ্, ক্রুপ্‌স্কায়া মাকারেংকোর নাম মার্কসীয় নীতিবিদ্যার প্রসারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। আজ মার্কসবাদী নীতিবিদ্যার বিরোধিতায় বুর্জোয়া দার্শনিকের বিভিন্ন রূপ ও ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ থাকা মার্কসবাদীর বিশেষ কর্তব্য। দুঃখের বিষয়, এদেশের মার্কসবাদী পত্র-পত্রিকা এসম্পর্কে অনেকখানি উদাসীন কিংবা উদার। নিও টমিজম, পজিটিভিজ্‌ম্, এক্‌জিস্‌টেনশিয়ালিজম্ স্বনামে, বেনামে, প্রকাশ্য প্রচ্ছন্নভাবে মার্কসীয় নীতিজ্ঞানকে বিকৃত করছে বস্তুবাদী নীতিবিদ্যার বিরোধিতা করছে। কেবল রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রযন্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই যথেষ্ট নয়, ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দের প্রশ্ন মার্কসবাদী পত্র-পত্রিকায় আরো বেশি তৎপরতার সঙ্গে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টি নিয়ে আলোচিত হওয়া দরকার। বিমূর্তায়িত মানবতাবাদের সমস্যা উপস্থাপিত করে অপক্ষপাতিত্বের মহিমা প্রচার করে, 'ন্যায়-অন্যায়কে' 'ভালমন্দ'কে দেশকালাতীত চিরায়িত বলে বর্ণিত করে ধনতন্ত্রের প্রবক্তারা বৈজ্ঞানিক নীতিবাদের অসম্ভাব্যতা প্রমানে তৎপর। অনেক উদারপন্থী মার্কসবাদী এই প্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। আবার অন্যদিকে, শ্রেণীআনুগত্যের ও শ্রেণীসংগ্রামের জিগির তুলে অনেকে দুর্নীতি ও পক্ষপাতমূলক আচরণকে মার্কসবাদসম্মত বলে দাবী করছেন অনেক সংকীর্ণ ও যান্ত্রিক ভাবাচ্ছন্ন মার্কসবাদী। আপেক্ষিকতাবাদীদের বক্তব্য সমর্থিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম এ্যাস লিখেছেন যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিকৃতি সম্পর্কে

মার্কসবাদীদের সজাগ থাকা দরকার। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উপর অতিগুরুত্ব যেমন ভাববাদের পথ ধরে কর্মক্ষেত্রে শোধনবাদ আমদানী করতে পারে, তেমনী বস্তুবাদী সারমর্মের দিকে অতি-প্রবনতা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্রয় দিয়ে সঙ্কীর্ণতাবাদকে উজ্জীবিত করতে পারে। তত্ত্বের ক্ষেত্রে—ব্যাপারটি কঠিন মনে হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠিন নয়। কেননা বিষয়মুখপরিবেশে প্রয়োগের ফলে তত্ত্ব স্বতঃসংশোধিত হতে থাকে, এবং ক্রমশঃ সংশয়-মোহ দূরীভূত হয়।

নৈতিকতা মূলত অর্থনীতিক বুনিয়াদের উপর নির্ভরশীল, তবুও এ্যাশ মনে করেন মানবজাতির নানাদেশে নানাসময়কার সংগঠনের মধ্যে হয়ত কিছু পরিমান সমধর্মিতা বিদ্যমান, যার ফলে দেশকালের গণ্ডী অতি-ক্রমক্ষম কিছু নীতিবোধক সর্বজনীন সর্বকালীন ধ্যানধারণার আভাস পাওয়া যায়। এ্যারিষ্টটলের 'পলিটিক্স'-এ উপযোগিতা ও বিনিময়মূল্যের আলোচনা আধুনিক অর্থনীতি শুধু নয়, নীতিজ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করেছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের সর্বাত্মীয়তাবোধ এই শ্রেণী-সমাজেও গর্বের বিষয়। বুর্জোয়া সমাজের রোমান্টিক প্রেম সমাজতান্ত্রিক সমাজেও কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু একথা তিনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন যে সাম্যবাদী সংগঠন ভেঙে পড়ার পর থেকে বিভিন্ন শ্রেণী নিজস্ব নিয়মে স্বকীয় আচারব্যবহার রীতিনীতির অধিকারী হয়েছে, এবং সমাজ অনুমোদিত রীতিনীতিতে সব সময়েই তৎকালীন উৎপাদনব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে। নীতির ব্যাপারেও বিশৃঙ্খল আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রচারকদের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি বলেছেন যে উৎপাদন পরিবেশন প্রণালীর সংখ্যা যেহেতু সীমিত, ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দেরও যুক্তি-সম্মত বিচার সম্ভব।

মার্কসবাদী নৈতিকতা বিষয়ীমুখী (subjective) মার্কসবাদীরা শ্রেণী-স্বার্থান্বেষী—এই অভিযোগ প্রায়শ শোনা যায়। কোন্ নৈতিকতা বিষয়মুখী নয়? কোন নীতিপ্রচার সমসাময়িক শাসকশ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য নয়? দাসসমাজে, সামন্তসমাজে, বুর্জোয়াসমাজে যে সব নীতিমালা রচিত ও প্রযুক্ত হয়েছে, তার উপর মহাপুরুষ মহাত্মাদের শিলমোহর থাকা সত্ত্বেও, তাদের শ্রেণীচরিত্র গোপন করা যায়নি। তাদের নিজেদের অন্তর্বিরোধও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মার্কসীয় নীতিবিদ্যা এই সব বুজরুকির সঠিক বিশ্লেষণে সমর্থ। শুধু তাই নয়, এই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ

মার্কসবাদী নীতিবিদ্যাকে বিষয়ী থেকে বিষয়মুখী করেছে। শোষণভিত্তিক শ্রেণীসমাজের নিষ্ঠুরতাকে নীতিবাক্যের আবরণ উন্মোচিত করে অনাবৃত করেছে। শ্রেণীসমাজ ও শোষণভিত্তিক সভ্যতার অবসানের জন্য সংগ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। শ্রেণীসমাজের অবলুপ্তির ফলেই শ্রেণীস্বার্থ-মুক্ত সত্যিকারের বিষয়মুখী মানুষের আবির্ভাব ঘটবে; প্রজাতি সভ্যতার পথে প্রথম পদক্ষেপ করবে। সর্তহীন বিশুদ্ধ নীতিবোধ সঞ্চারের পথ প্রশস্ত হবে। শ্রেণী সংগ্রামলিপ্ত সমাজে যীশুখৃস্টের প্রেমের বাণী প্রচারের কোনো যুক্তি নেই। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগের উদ্দেশ্য মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব-সৌহার্দ-মূলক নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা। সমাজ-পরিবর্তনের সম্ভাবনা কিন্তু সীমাহীন নয়। দাসসমাজ থেকে লাফ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজে আসা চলে না। পরিবর্তনের সম্ভাবনা অবশ্য অনেক সময়ে অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকে, সেই কারণে ভবিষ্যৎ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ অনেক সময় পশ্চাৎগামী সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। যতদিন পর্যন্ত কোনো উৎপাদন-পরিবেশন ব্যবস্থা সমাজের অধিকাংশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম, ততদিন সেই ব্যবস্থানির্ভর নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয় না। উৎপাদনব্যবস্থার সংকটের সমাধান না ঘটলে প্রতিদ্বন্দ্বী নীতিবোধ মূল্যবোধের মধ্যে তীব্র বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। উৎপাদন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে; নতুন বনিয়াদ রচিত হয়; গড়ে ওঠে নতুন অধিসৌধ (আইডিয়া)।

মার্কসীয় নীতিবোধ অবশ্যই সংখ্যালঘু উৎপীড়ক ও শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বহারার সমর্থক। সমর্থক শুধু নয়, সহযোদ্ধা। মার্কসবাদী ও সর্বহারার স্বার্থ অভিন্ন। এই সমর্থন, এই অভিজ্ঞতাবোধ শ্রেণীহীন শোষণহীন অবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা আনয়নের পূর্বশর্ত। নতুন সমাজে সর্বহারাও শ্রেণীহিসেবে নিশ্চিহ্ন। "We say that our morality is entirely subordinate to the interest of the class-struggle of the proletariat"—লেনিনের এই উক্তির সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন মার্কসবাদীর পক্ষেই শুধু সম্ভব।

এই ঐতিহাসিক ক্ষণে আমাদের সকলেরই নিজের শিবির চিনে নেওয়ার আশু প্রয়োজন আছে। বিশ্বব্যাপী পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই সঙ্কটের কালে নিরুত্তাপ নিরপেক্ষতা অসমীচীন, অসম্ভব। বুদ্ধিকে শাণিত করে, যুক্তিকে তীক্ষ্ণ করে, চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে আসন্ন বিপ্লবকে নৈতিক

সমর্থন জানাতে হবে। নীতিবিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনা আজ সাতিশয় গুরুত্বমণ্ডিত। সমাজতান্ত্রিক নীতিবোধের প্রসারে ও প্রচারে বুদ্ধিবাদীমাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত। অতীতে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে ধীরে-সুস্থে। সাধারণ মানুষকে অনবহিত রেখে। শ্রেণীসংগ্রাম বিক্ষিপ্তভাবে অনেককাল ধরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিজের শিবির চিনে নিতে পারেনি অনেকেই। সংগ্রামে অনেক সময় রীতিপ্রকৃতি না বুঝেই যোগ দিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সামন্তসমাজের পত্তনের সঠিক ইতিহাস এখনও অনাবৃত; সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের ইতিহাস জানা থাকলেও, শ্রেণীসংগ্রামের রীতিপ্রকৃতি সে-সময়কার সংগ্রামী শ্রেণীর কাছে সব সময় সুস্পষ্ট ছিল না। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের লড়াই-এর আসল উদ্দেশ্য ও শ্রেণীচরিত্র ছিল আরো অস্পষ্ট। সেদিনের পরিবর্তনের গতিবেগ আর আজকের গতিবেগে আসমান-জমিন ব্যবধান। সেদিন আর এদিনের পরিবহণব্যবস্থার পার্থক্যের সঙ্গে এই পরিবর্তন পার্থক্য তুলনীয়। শুধু তাই নয়, এ-পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে সংগ্রামী শ্রেণীচেতনাকে প্রবুদ্ধ করে; ফলে সমাজ-চেতনা গুণোত্তর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতের তুলনায় নীতিবোধ আজ অনেক বেশী শ্রেণীস্বার্থবহ ও সুস্পষ্ট। অধিসৌধের আইডিয়া প্রভাব অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। শ্রেণীহীন সমাজ গড়ায় প্রত্যেকেরই ভূমিকা আজ সুনির্দিষ্ট। সামাজিক ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ে বিচারভ্রান্তি আজ অমার্জনীয় অপরাধ। সততা, মানবতার দোহাই দিয়ে নিরপেক্ষ থাকার জবাবদিহি উত্তরপুরুষের কাছে কোনোমতেই গ্রাহ্য হবে না। পরিবর্তনের স্পন্দন আজ উন্নত অনুন্নত সবদেশের সর্বস্তরে অনুভূত। বিপ্লবতরঙ্গ আজ ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী।

বিপ্লবের ব্যাপকতা ও সর্বগ্রাসিতার দরুন সারা পৃথিবী জুড়ে আজ দুই ধরণের নীতিবোধের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তীব্রতাও বেড়েছে। নতুন ও পুরনো মূল্যবোধের সংঘাত চলেছে সর্বত্র। ধনতান্ত্রিক দেশে শুধু নয়, কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশেও ভাবধারার পরস্পরবিরোধিতা প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। প্রতিক্রিয়ার প্রচ্ছন্ন বিরোধীশক্তি পুরোপুরি নিঃশেষিত হবার পূর্বমুহূর্তে শেষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক শিবির থেকে প্রতিক্রিয়ার উৎসাহ যোগানো হচ্ছে, সংগ্রামের রসদ সরবরাহ হচ্ছে। নীতির প্রশ্নে নিহিলিজম বুর্জোয়া শিবিরের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এ-সম্পর্কে গ্রন্থকার নীরব।

বুর্জোয়া সমাজের অবক্ষয় সম্পর্কে গ্রন্থকার প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, সেখানকার নীতিভ্রষ্টতার বাস্তব চিত্র এঁকেছেন, বিচ্ছিন্নতার করুণ বিবরণ দিয়েছেন, বুদ্ধিবাদীর কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন। পুস্তকখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থকারের মতে,—'the actual process of deriving ethical concept from material condition'। এদিক থেকে তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক বলা চলে।

প্রথম অধ্যায়ে মূলসমস্যা বিশদভাবে আলোচিত। দ্রব্যের 'ভালমন্দ', উপযোগিতা ও মূল্যবিচার মার্কসবাদসম্মত। মূল্যনিরূপণে উৎপাদন খরচা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। সমাজ-সংগঠনের উপর মূল্য নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের সমস্যা বিবেচিত হয়েছে। সমসাময়িক সমাজের উৎপাদন-পরিবেশন ব্যবস্থার পক্ষে যা শুভ—তাই ভাল; যা অশুভ তাই মন্দ। বিভিন্ন সমাজের ইতিহাস, শ্রেণীসম্পর্ক ইত্যাদি বিশ্লেষিত হয়েছে। নীতিবিদ্যার আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে নৈতিক কর্তব্য, উচিত-অনুচিত প্রশ্ন তোলা হয়েছে। মার্কসবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—'স্বাধীনতা ও নিমিত্তবাদ' এখানে বিশেষ-ভাবে আলোচিত হয়েছে এবং সেই সূত্রে মার্কসবাদীর প্রধান দাবি মার্কসবাদে (একাধারে আছে সমাজের বিজ্ঞান এবং ক্রিয়াকর্মের আহ্বান)—বিশ্লেষিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'বিচ্ছিন্নতা-বিচার' প্রসঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিফলনজাত বুর্জোয়া নীতিবোধ মূল্যবোধ সমালোচিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক নীতিবোধ মূল্যবোধের সংঘাত আজ তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে, ফলে সমস্যা জটিল হয়েছে, নৈতিক বিশৃংখলা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থকার মুখবন্ধে ত্রুটী স্বীকার করেছেন যে সোভিয়েত রাশিয়া বা চীনের নৈতিক-প্রবণতা অথবা ন্যায়বিচারের মানদণ্ড, ব্যবহারবিধি ইত্যাদি নিয়ে তিনি কোনো আলোচনা করেননি। কারণ যাই হোক, গ্রন্থটির তাত্ত্বিক দিকটি যে-পরিমাণে ফুটেছে, এর ফলে তথ্যের দিক সেই পরিমাণে দুর্বল মনে হয়েছে। মার্কসবাদে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সমাজতান্ত্রিক দেশের নৈতিক মানের সঠিক পরিচয় জানতে উৎসুক। জনসাধারণের সম্পত্তি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার বিশিষ্টতা উল্লেখ করলেই উৎপাদন-পরিবেশন

ব্যবস্থার সামাজিকীকরণের ফলে চিন্তা-ব্যবহারের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুমিত হয় না। সমাজতান্ত্রিক মানুষের নীতিবোধ মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের দেশে নানা রকমের ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। অনেক ক্ষেত্রেই এ ধারণা উৎসাহজনক নয়। এই ধারণার মূলে আছে বুর্জোয়া প্রেসের কৌশলী অপপ্রচার, আমাদের সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পুরনো মানদণ্ড দিয়ে সমাজতান্ত্রিক মানুষের নীতিবোধ মূল্যবোধ বিচারের চেষ্টা। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, সোশালিষ্ট ইকনমি প্রবর্তিত হলেই সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা স্বত-উৎসারিত হয়ে উঠবে, এই ধরণের শিশু-সুলভ যান্ত্রিক মনোভাব অনেকেই পোষণ করেন। এর ফলে, সমাজতান্ত্রিক মানুষের ত্রুটী-দুর্বলতা, নীতিভ্রষ্টতা তাঁদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। বনিয়াদ ও অধিসৌধের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারে, আগেই বলেছি, অনেক সময়েই আমরা হয় বনিয়াদের উপর কিংবা অধিসৌধের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে বসি; ফলে বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ে এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা আছে; কিন্তু এর ফলাফল তথ্যসহযোগে তুলে ধরা হয় নি। সমাজতান্ত্রিক মানুষের পুরনো অভ্যাস চিন্তাধারা ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্য, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরও যে যুক্তিতর্ক ইত্যাদির সাহায্যে চেষ্টা চালানো দরকার, একথা অবশ্য গ্রন্থকার বেশ জোর দিয়েই বলেছেন। সমাজতান্ত্রিক মানুষ কেমন হওয়া উচিত বা কী রকম হবে গ্রন্থকার সুন্দরভাবে তা ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু সে কেমন হয়েছে এর কোনো আভাস পর্যন্ত তিনি উপস্থাপিত করেন নি। কোনো সমাজ বা দেশের নৈতিক মান নির্ণয় সহজ নয় আমরা জানি; কিন্তু অসম্ভবও বুর্জোয়া মানুষের বিচ্ছিন্নতা বিচারে (চতুর্থ অধ্যায়ে) তিনি যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, মার্কসবাদী দৃষ্টি দিয়ে বুর্জোয়া সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকটের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। সেই ভাবেই চীন ও সোভিয়েত দেশের মানুষের একটা নৈতিক পরিচয়ের ছবি তিনি তুলে ধরলে পাঠক অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা বোধ করত। দণ্ডার্হ অপরাধ-ঘটিত পরিসংখ্যান, অপরাধের প্রকৃতি, কিশোর-অপরাধীর সংখ্যা, মানসিক রোগাক্রান্তের খতিয়ান, এই সব থেকে, নৈতিকতার মোটামুটি একটা ধারনা দিতে পারতেন গ্রন্থকার। অন্তত তুলনামূলক পরিসংখ্যানের সাহায্যে বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে পার্থক্যটা ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে ভৌতিক সম্পদ সৃষ্টি ও সুসম বণ্টনের

দিক থেকে উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের প্রত্যয় আজ দৃঢভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা চলে। আজ বুর্জোয়া দার্শনিক তাই নৈতিক মান ও আত্মিক সম্পদের প্রশ্ন তুলে সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষ সম্পর্কে মানুষকে সংশয়াচ্ছন্ন করতে চায়। আমার মনে হয়, মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের প্রাথমিক কর্তব্য সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার প্রচেষ্টা ও সমাজতান্ত্রিক মানুষের ক্রটিবিচ্যুতির সহৃদয় বিশ্লেষণ।

মার্কসবাদ হিংসাত্মক কার্যকলাপের উৎসাহদাতা, লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য যে কোনো হিংস্র উপায়ের প্রশ্রয়দাতা—এই অভিযোগের উত্তরে লেখক বলেছেন যে নৃশংস হিংস্র উপায়ের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা বজায় রাখা হয়, সেদিকে দৃষ্টি না দিলে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগকেও হিংসাত্মক বা হিংস্র মনে হতে পারে। এইভাবে নৈতিক বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন গ্রন্থকার।

এ্যাশের এই গ্রন্থ ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বর্তমান সমস্যাবলির [চীন-সোভিয়েত সীমান্ত সংঘর্ষ, চেক-সোভিয়েত সম্পর্ক] নৈতিক দিকের উপর কোন রকম আলোকপাতের চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থে নেই কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, স্তালিন প্রসঙ্গ বা চীন-সোভিয়েত বিরোধের নৈতিক দিকটিও উপেক্ষিত। ব্যক্তিপুঁজীবাদ ও আমলাতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আরো অনেক আলোচনার দরকার। অন্য একটি দিক, যৌননৈতিকতা সম্পর্কে মার্কসবাদী পণ্ডিতেরা প্রায়শই নীরব ও অনীহ। ফলে, ফ্রয়েডবাদ অপ্রতিহত ভাবে মার্কসবাদীদের প্রভাবিত করে চলেছে। উইলিয়াম এ্যাশও সযত্নে এই আলোচনা পরিহার করেছেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আশা করতে পারি।

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যার পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ পংক্তিটির শুদ্ধপাঠ হবে:

এ-জীবনজিজ্ঞাসা থেকে আত্মরক্ষার উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে যে, গৌতমের উগ্র অন্ধতা-মন্ত্র এবং নির্মলের মোহহীন সিদ্ধির বুদ্ধি—'পার্ক ষ্ট্রীট' থেকে নকশালবাড়ি পার্ক স্ট্রীট—সমান দূর!

এই মুদ্রণপ্রমাদের জন্য লেখক ও পাঠকদের কাছে আমরা ক্ষমা প্রর্থনা করছি।—সম্পাদক, 'পরিচয়'

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও নতুন পরিপ্রেক্ষিত

গত ২৪-এ আগস্ট শ্রীবরাহগিরি বেঙ্কটগিরি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিরূপে শপথ নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর, এই রাষ্ট্রপতিপদটি ভারতে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার রাজনৈতিক সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারটি যেন বাম-দক্ষিণের ক্ষমতার লড়াইয়ের এক ধরনের ড্রেস রিহার্সাল। এবং শ্রীবরাহগিরি বেঙ্কটগিরির রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচন ভারতের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির গুরুত্বপূর্ণ একধাপ এগিয়ে যাওয়ার স্মারকচিহ্ন।

গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী প্রগতিশীল দলগুলি কর্তৃক সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থী ডক্টর গিরির এই নির্বাচনিক সাফল্য ভারতের রাজনীতিতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। গোটা ভারত জুড়ে গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগমন এদেশী একচেটিয়া মূলধনপতি ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ভীত করে তুলেছিল। একচেটিয়া মূলধনের মুখপাত্ররা 'গেল গেল' রব তুলে ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনবিধৃত নিরঙ্কুশ দাপট চালু করার দাবি জানাচ্ছিল। ভারতে মূলধনপতিদের দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলিও এই হুমকির সম্মুখীন হয়। এবং সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া মূলধনের মুখপাত্র কংগ্রেসের তথাকথিত 'সিণ্ডিকেট'-এর উদ্যোগে স্বতন্ত্র, জনসংঘ প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল দলের অশুভ গাঁটছড়া লোকসভার স্পীকার শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে কংগ্রেসের সরকারী প্রার্থীরূপে ঘোষণা করে। গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর রক্ষার সম্ভাব্য প্রতিভূকে স্বৈর শাসনের মঞ্চে চাবুক হাতে পাঠাবার জন্য তাঁরা গোপনে গোপনে তদবির চালান। উপরাষ্ট্রপতি প্রবীন শ্রমিক নেতা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা যোদ্ধা ডক্টর গিরি এই গোষ্ঠীপতিদের অশুভ আঁতাত ও আক্রমণের বিরুদ্ধে বিবেকের আহ্বানে উপরাষ্ট্রপতিপদ ত্যাগ করে রাষ্ট্রপতিপদে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের বিপুল সক্রিয় প্রতিবাদ এবং কংগ্রেসের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির চাপে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও 'সিণ্ডিকেট'-এর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে

লড়াইয়ে সরাসরি অবতীর্ণ হন এবং বিবেক অনুযায়ী ভোটদানের জন্য ফকরুদ্দীন আলী আমেদ ও জগজীবনরামের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। দক্ষিণপন্থী আঁতাতের বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ডক্টর গিরিকে বিজয়ী করতে ডাক দেন এবং সারা ভারত জুড়ে গিরির সমর্থনে বিপুল গণউদ্যোগ গড়ে তোলেন। ক্ষিপ্ত 'সিণ্ডিকেট'পন্থীরা পবিত্র ১৫ই আগস্ট কলকাতা শহরে এই রাজনৈতিক তাৎপর্য বিষয়ে প্রচাররত কমিউনিস্ট কর্মী শ্রীবিজয় দত্তকে খুন করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-ও ডক্টর গিরিকে সমর্থন জানান, এবং তাঁদের নেতা ঘোষণা করেন, ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অনাস্থা প্রস্তাবের তাঁরা বিরোধিতা করবেন। ১৬ই আগস্ট ১৭টি বিধানসভা, লোকসভা ও রাজ্যসভার জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেন, এবং ২০-এ আগস্ট নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়। শ্রীবরাহগিরি বেঙ্কটগিরি এই নির্বাচনে জয়ী হন। ডক্টর গিরি তাঁর জয়কে 'জনগণের জয়' বলে ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রাম তুঙ্গে ওঠে। 'সিণ্ডিকেট'-এর চাপের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণকে সঙ্গী করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেন, এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবাদাস অর্থমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর হাত থেকে অর্থদপ্তর ছিনিয়ে নেন। প্রতিবাদে শ্রীদেশাই পদত্যাগ করেন। অর্থাৎ শ্রীগিরির নির্বাচন একধরনের কংগ্রেসের মধ্যে তো বটেই, গোটা ভারতের প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দ্বৈরথের পরিপ্রেক্ষিত এনে দেয়। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসীদের সুখের ঘরও সচেতন কর্মীদের চাপে ভাঙছে ভাঙবে। সে লক্ষণও ফুটে উঠছে। আমরা জানি দেশে যত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপ বাড়বে, মূলধনবাদী ভ্রান্ত পথে অর্থনীতিক বিকাশের নষ্টস্বপ্নে মুগ্ধ গণতন্ত্রী কংগ্রেসীদেরও চৈতন্য ফিরবে। এবং ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর করে তুলবে। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যশ্রেণী ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী পুঁজিবাদীরাও এই ফ্রণ্টের সড়িক হবেন। শ্রমিকশ্রেণীকে নিতে হবে এই ফ্রণ্ট গঠনের উদ্যোগ। ডক্টর গিরির নির্বাচনে বিজয় এই ফ্রণ্ট গড়বার মত অনুকূল অবস্থা দ্রুত ত্বরান্বিত করছে। যুক্তফ্রণ্টের জয় হোক।

তরুণ সান্যাল

হো-চি-মিন, তুমি বাঁচো,

২৫ বছর আগে হানয়ের যে বা-দিন স্কোয়্যারে হো-চি-মিন ফ্রান্সের অধীনতা-মুক্ত স্বাধীন ভিয়েতনামের জন্ম-ঘোষণা করেছিলেন, গত ৯ই সেপ্টেম্বর সেইখানেই উত্তর ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সচিব লি-দুয়ান লক্ষাধিক অশ্রুসজল মানুষকে পড়ে শোনালেন হো-চি-মিন-এর অন্তিম দলিল : "বিদায়ের পরম লগ্ন যখন আসবে, তখন হৃদয় আমার ভারাক্রান্ত হবে শুধু এই জন্য যে আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে আমি আমার প্রিয় জনগণের সেবা করে যেতে পারলাম না।..."

এই উইলটি লেখা হয় গত ১০ই মে। তার ন-দিন পরে হো-চি-মিন ৭৯ বছর বয়েসে পা দেন। এবং মাত্র চার মাসের মধ্যেই, গত ৩রা সেপ্টেম্বর, এই অনন্ত পুক্রষের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়!

এক সাধারণ সরকারী কর্মচারীর পুত্র, রাজধানীর এক সাধারণ সরকারী স্কুলে পড়াশুনা করেছেন; কিন্তু হুয়েন মানুষটি ছিলেন অসাধারণ। প্রথাগত উচ্চশিক্ষা সম্ভব না হলেও বেশ কয়েকটা ভাষা শিখে নিয়ে একদিন ইয়োরোপ-আমেরিকাগামী এক জাহাজে রাঁধুনির চাকরি যোগাড় করে সমুদ্রে ভেসে পড়লেন। কিন্তু মোটেই তা নিরুদ্দেশ যাত্রা ছিল না।

নামলেন লণ্ডনে। বয়েস একুশ। হুয়েন তখন কবি। ছ-বছর লণ্ডনে কাটল। আশ্চর্য সব পংক্তি রচনা করলেন। কিন্তু সেই কাব্যলক্ষ্মীর সাধনাও কোনো নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনামাত্র ফরাসী বিপ্লব আর পারী কমিউনের দেশে চলে এলেন। লণ্ডন থেকে প্যারিস। শীর্ণকায় যুবক, পরনে ছেঁড়া পোশাক—দুই চোখে আগুন আর ভালোবাসা নিয়ে প্যারিসের পথে পথে বিপ্লবীদের এক আড্ডা থেকে আরেক আড্ডায় ঘুরছেন। প্যারিস তখন পৃথিবীর নানা দেশের নানা মাপের বিপ্লবকামীদের মিলনক্ষেত্র। বোঝাই যায় নিছক ভাষা শিক্ষার আনন্দে তিনি ইংরেজি, ফরাসী, রুশ, চীনা প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেননি।

নিজেই লিখেছেন : "প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমি প্যারিতে কখনও ফটো-গ্রাফের দোকানে "রিটাচারের" কাজ করে কখনও বা 'চীনা প্রাচীন শিল্প' (ফ্রান্সে তৈরি) এঁকে জীবিকা অর্জন করতাম। আর মাঝে মাঝে বিলি করতাম ভিয়েৎনামে ফরাসী উপনিবেশবাদীদের পাপ কাজের বিরুদ্ধে ইস্তাহার।

"তখন অক্টোবর বিপ্লবকে সমর্থন করতাম খানিকটা সহজাত প্রবণতার বশেই, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতাম না। লেনিনকে ভালোবাসতাম এবং শ্রদ্ধা করতাম। আমার কাছে তিনি ছিলেন মস্ত বড়ো একজন দেশপ্রেমিক যিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের মুক্ত করেছেন। তখনও পর্যন্ত তাঁর কোনো বই পড়ি নি।

"ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম এই কারণেই যে এই সব 'ভদ্রমহোদয় ও মহিলারা'—তখন কমরেডদের এই বলেই সম্বোধন করতাম—আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি। কিন্তু পার্টি কী, ট্রেড ইউনিয়ন কী, সোশ্যালিজম বা কমিউনিজম কী তার কিছুই আমি তখন বুঝতাম না।

"সোশ্যালিস্ট পার্টি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে থাকবে, না কোনো আড়াই আন্তর্জাতিক গড়বে, না লেনিনের তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দেবে এ-নিয়ে তখন সোশ্যালিস্ট পার্টির শাখাগুলিতে তুমুল আলোচনা চলছিল। সপ্তাহে দুদিন কি তিনদিন নিয়মিতভাবে এই সভায় যেতাম, আলোচনা শুনতাম মনোযোগ দিয়ে। প্রথমে সবটা ভালো বুঝতাম না। ভাবতাম আলোচনায় এত উত্তাপ সৃষ্টি হয় কেন? দ্বিতীয়, আড়াই অথবা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সাহায্যে বিপ্লব করতে হবে। তাহলে এত তর্ক কেন? আর প্রথম আন্তর্জাতিক, তারই বা কি হল?

"সবচেয়ে বেশি যা জানতে চাইতাম তা হল, কোন আন্তর্জাতিক উপনিবেশের মানুষদের সপক্ষে। কিন্তু ঠিক এই জিনিসটাই এই সব সভায় কখনও আলোচিত হত না।

"এক সভায় অবশেষে প্রশ্নটা তুললাম, আমার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা। কিছু কিছু কমরেড জবাব দিলেন : তৃতীয় আন্তর্জাতিক, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নয়। এক কমরেড আমাকে 'লুমানিতে'-প্রকাশিত লেনিনের 'জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা বিষয়ে নিবন্ধাবলী' পড়তে দিলেন।

"এই নিবন্ধাবলীতে এমন সব রাজনৈতিক পরিভাষা ছিল যা বোঝা কঠিন। বারে বারে পড়ে শেষপর্যন্ত মূল কথাটা বুঝতে পারলাম। আর এই বোধ আমার মনে কী প্রচণ্ড আবেগ এবং উন্মাদনা সৃষ্টি করল। দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল। আনন্দে আমার চোখে জল এল। ঘরে একলা বসেছিলাম তবু চিৎকার করে বললাম, যেন কোনো জনসভায় বক্তৃতা করছি: 'প্রিয় শহীদগণ, সহকর্মীগণ, ঠিক এই জিনিসটিরই আমাদের প্রয়োজন ছিল, এই আমাদের মুক্তির পথ।'

"...পার্টি ব্রাঞ্চের সভায়...এর পর থেকে লেনিন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রচণ্ড উৎসাহে খণ্ডন করতাম। আমার একমাত্র যুক্তি ছিল: 'যদি আপনারা উপনিবেশবাদকে নিন্দা না করেন, যদি উপনিবেশের মানুষের পক্ষ না নেন, তবে কী ধরনের বিপ্লব আপনারা করছেন?'

"...প্রথমে কমিউনিজম নয়, দেশপ্রেমই আমাকে লেনিনের প্রতি, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি আস্থাশীল করে। ধীরে ধীরে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, রাজনৈতিক কার্যকলাপের পাশাপাশি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করে ক্রমে ক্রমে এই সত্য উপলব্ধি করি একমাত্র সোশ্যালিজম-কমিউনিজমই সারা বিশ্বে নিপীড়িত জাতিগুলিকে, শ্রমজীবী মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারে।" ['যে পথে লেনিনবাদে এলাম।' 'পরিচয়'—ভিয়েতনাম সংখ্যা। অনুবাদ: শচীন বসু]

জন্মভূমি ও মানুষের মুক্তিকামী কবি এবং শিল্পী ঔপনিবেশিক শাসনাবসানের পথ খুঁজতে খুঁজতে এইভাবে তত্ত্বে ও তার প্রয়োগে সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হয়ে উঠলেন। দৈনিক 'কালান্তর'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাই স্পষ্টতই লেখা হয়েছে: "লেনিনের পরে এত প্রিয় নাম পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হয়নি।"

প্যারিসে বসে ফ্রান্সের কলোনি ইন্দোচীনের স্বাধীনতার দাবিকে তিনি জনপ্রিয় করলেন। ১৯২০ সালের ফরাসী সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে ইন্দোচীনের প্রতিনিধি হিসেবে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সমর্থক লেনিনবাদীদের সমর্থন জানালেন। যোগ দিলেন ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে। ১৯২৩ সালে কমিউনিস্ট কৃষক আন্তর্জাতিকের সভাপতিমণ্ডলীর সভ্য হিসেবে মস্কো গেলেন। ১৯২৪ সালে মারসেল কাশাঁর মতো ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির মহান

প্রতিষ্ঠাতা ও ভেয়াঁ কুতুরিয়ের মতো প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে নুয়েনকেও ফরাসী জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী করা হয়। ঐ ২৪ সালেই আবার মস্কো গেলেন লেনিনের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে। তখন এলো নতুনতর দায়িত্ব। মাইকেল বোরোদিনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা রূপে কমিণ্টার্ন তাঁকে চীনে পাঠাল।

নুয়েন ইতিমধ্যেই কমিণ্টার্নের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিশেষত তাঁর কলোনি-সংক্রান্ত তত্ত্বের জন্য। ফ্রান্সেও তাঁর প্রতিষ্ঠা কম নয়। কিন্তু প্যারিস-বাসের মোহ বা কমিণ্টার্নের নায়কতা তথা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ভূমিতে কিছুদিন বাস করার প্রলোভন ত্যাগ করে নুয়েন পাড়ি দিলেন প্রায়-অন্ধকার এক দেশে।

কিন্তু এটাও নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়।

কারণ "স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।" কারণ যখন যেখানেই থাকুন, ঠিক লেনিনের মতোই হো-চি-মিনও জানতেন—কী তাঁকে করতে হবে। তাই মহাচীনে একই সঙ্গে চলল চীন বিপ্লবের প্রস্তুতি ও ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে সংগঠিত করা। ইন্দোচীনের মূল ভূখণ্ডে গোপনে গড়ে তুললেন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন ও আন্দোলন। কেন্দ্র হলো বৃটিশ শাসিত হংকং ও ফরাসী শাসিত থাইল্যাণ্ডের অন্তর্বর্তী অঞ্চল। ফরাসী কলোনির ক্ষিপ্ত প্রভুরা হো-চি-মিনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল। হংকং-এর বৃটিশ শাসকরা ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার করে তাঁকে এক বছর কারাদণ্ড দিল।

অনশন, অর্ধাশন, আত্মগোপন অবস্থায় একটার পর একটা নাম গ্রহণ করে বিপ্লবী নায়ক একই সঙ্গে ফরাসী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জাল এড়িয়ে আপন অভীষ্টের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। সেই কবি ও শিল্পী জানতেন পৃথিবীতে এক-একটা সময় আসে যখন মাতৃভূমি ও মানুষকে ভালোবাসার ঋণ শোধ করার জন্য বিপ্লবীদের কখনো কখনো নিজের নাম পালটাতে হয়, কিন্তু তার আত্মপরিচয় থাকে একটাই!

জেল থেকে বেরিয়েই শুরু হলো জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। চীন সহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এক বিস্তৃত ভূখণ্ড জাপান আক্রমণ করল। হো-চি-মিন তখন চুনামে। গড়ে তুললেন জাপানী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গোপন সংগঠন।

তারপর দীর্ঘ দীর্ঘকাল পরে ১৯৪১ সালে স্বদেশে ফিরলেন। ফ্যাসিবিরোধী যুক্তমোর্চা গঠনের দাবি অগ্রাহ্য করে জাপানের হাতে রাজ্যপাট তুলে দিয়ে ফরাসীরা পালাল। কিন্তু থেকে গেল নতুন সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিনাশ করতে। শুরু হলো ভিয়েতমীন গেরিলাদের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম।

অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হলো। আর ফরাসীরা তো পলাতকই। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে হো-চি-মিন একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্মবার্তা ঘোষণা করলেন—গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র। কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ তার কলোনির অধিকার ছাড়বে কেন? ফলে দীর্ঘ ন-বছর ধরে চলল হো-চি-মিনের গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই। অবশেষে গিয়াপের নেতৃত্বে দিয়েন-বিয়েন-ফুর যুদ্ধে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হলো।

কিন্তু ভিয়েতনামের অগ্নিপরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। ফলে জেনিভা চুক্তি, দেশবিভাগ, দক্ষিণে মার্কিন তাঁবেদারদের দুঃশাসন। হো-চি মিনের প্রেরণায় সেখানে গড়ে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের অজেয় বাহিনী। একটু একটু করে তারা দক্ষিণের এক বিস্তৃত ভূখণ্ডকে মুক্ত করল। তখন ১৯৬৪ সালে আমেরিকা সরাসরি ভিয়েতনামের যুদ্ধে নামল। তারপর এই কয়েক বছরে কি উত্তর কি দক্ষিণ ছোট্ট একটা দেশের ওপর প্রায় অলৌকিক শক্তির অধিকারী পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদ ও নিকৃষ্টতম জহ্লাদরা যে পৈশাচিক পাপাচার অনুষ্ঠিত করেছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও তার নজির কম। কিন্তু স্বাধীনতা ও হো-চি-মিনের দীপ্ত প্রেরণায় ভিয়েতনাম অপরাজেয়। অবশেষে দক্ষিণেও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ও জোটনিরপেক্ষ অনেকগুলি দেশই তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে।

প্রায় আশি বছর বয়েস ভগ্নস্বাস্থ্য এক বৃদ্ধ—পৃথিবীর দেশে দেশে যাঁর নাম লেনিনের সঙ্গে উচ্চারিত হয়—বাঁশের তৈরি কুটিরে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করতেন। যেমন মুক্তিযুদ্ধের আমলে তেমনই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি একটিই জীবন যাপন করে গেছেন। আসলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত থেকেছে। তাই তিনি আরো দীর্ঘকাল বাঁচতে চেয়েছিলেন।

পুরাণে মহাঋষিদের তাপস-জীবনের যে বর্ণনা পাই—তার সঙ্গে আপাত কোনো কোনো মিল সত্ত্বেও এই বিপ্লবী সাধকের বাঁচাকে তাঁদের জীবনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। একমাত্র লেনিনের সঙ্গেই হো-চি-মিনের বাঁচার তুলনা চলে।

কিন্তু একটা তফাৎ তা সত্ত্বেও আছে। শিল্প, সাহিত্য আর সঙ্গীতপ্রিয় লেনিন বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অবিচল থাকার জন্য অনেক সময় সঙ্গীত পর্যন্ত শুনতে ভয় পেতেন। আর হো-চি-মিন শেষ বয়েস পর্যন্ত কবিতা লিখে গেছেন। প্যারিসে থাকার সময় তিনি নিয়মিত চিত্রপ্রদর্শনী দেখতেন এবং ফরাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর তাঁর অসামান্য দখল ছিল। আর ভিয়েতনামী সাহিত্যে তিনি তো স্ব-অধিকারেই বিশিষ্ট।

লেনিনের শিল্প ছিল প্রধানত মানুষকে নিয়ে। তাঁর কুড়ি বছর পরে জন্মে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিতে বলীয়ান হো-চি-মিন তাই মানুষের সঙ্গে গোটা সভ্যতাকেও তাঁর শিল্পের বিষয় করতে পেরেছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে দুজনেই ছিলেন কবি। ঐতিহাসিক শাস্তির উক্তি কোনো অ-কবির রচনা হতেই পারে না। আর, গত বছর বসন্তকালে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের বীরদের উদ্দেশ করে হো-চি-মিন লিখেছিলেন : "এ বসন্ত অন্য সব বসন্তের চেয়ে উজ্জ্বল, চারিদিকে বৈজয়ন্তী, দেশময় মানচিত্র বদল, উত্তর-দক্ষিণে মিল হোক, মুখোমুখি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, জানি চূড়ান্ত জয় আমাদেরই।" [দৈনিক 'কালান্তর'। ৫ ৯ ৬৯]

বর্তমান আলোচকের জীবনে একটি প্রবল উচ্চাকাংক্ষা ছিল—একবার ভিয়েতনামে যাওয়া, একটিবার হো-চি মিনের কর স্পর্শ করা।

আর তা হবার নয়। হয়তো ভিয়েতনামে যাওয়াও কোনোদিনই ঘটে উঠবে না।

কিন্তু তবু জানি "এ বসন্ত অন্য সব বসন্তের চেয়ে উজ্জ্বল, চারিদিকে বৈজয়ন্তী, দেশময় মানচিত্রবদল··।"

যে-কলকাতা শহর হো-চি-মিনের পদস্পর্শে পবিত্র—আমি সেই কলকাতার, সেই বাঙলাদেশের, সেই ভারতবর্ষের মানুষ। এই আমার মাতৃভূমির মৃত্তিকা স্পর্শ করে তাই তো বলতে পারি—তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম!

তাই তো জল মুছে দীপ্ত চোখে বলি—কমরেড হো-চি-মিন, তুমি বাঁচো।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'পরিচয়'-এর প্রিয় বন্ধু, বিখ্যাত কবি ও তেলেঙ্গানা কৃষক-বিদ্রোহখ্যাত জননেতা মখদুম মহীউদ্দিন সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লীতে হঠাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। উর্দু সাহিত্যে বিশিষ্ট মনস্বী অধ্যাপক মখদুম মহীউদ্দিন একদা অধ্যাপনা ছেড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অন্ধ্রের কমিউনিস্ট পার্টির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নিজামের স্বৈরাচার এবং পরবর্তীকালে একচেটিয়া মূলধনতন্ত্র ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের সংগ্রামে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। পশ্চিমবঙ্গের গত মধ্যবর্তী (১৯৬৯) নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারে এই সেদিনও উর্দুভাষী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছেন। তিনি সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য, অন্ধ্র বিধান পরিষদে কমিউনিস্ট দলের নেতা এবং অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ও বহু গণআন্দোলনের নায়ক ছিলেন।

মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীতকার ও মহান সংগ্রামী গণশিল্পী ওমর শেখ সম্প্রতি একটি মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বাঙলাদেশের শান্তি ও সংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মীদের কাছে ওমর শেখ প্রায় কিংবদন্তীর নায়ক।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গণনাট্য আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা আন্না ভাউ সাঠের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। ওমর শেখের মতো আন্না ভাউও আরেক কিংবদন্তীর নায়ক। উভয়ে তাঁরা আমাদের জাতীয় জীবনে এক অতি বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে মখদুম মহীউদ্দিন, ওমর শেখ ও আন্না ভাউ সাঠের অকাল মৃত্যুতে তাঁদের অগণ্য বন্ধুবান্ধব ও গুণমুগ্ধদের সঙ্গে আমরাও গভীরভাবে শোকার্ত। মহীউদ্দিন, ওমর শেখ ও আন্না ভাউ মৃত্যুহীন।

পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুনর্বাসন, ত্রাণ ও কারা (স্বরাষ্ট্র) মন্ত্রী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এই বিশিষ্ট প্রবীণ বিপ্লবী ও জননেতার অকালমৃত্যুতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর সঙ্গে আমরাও শোক প্রকাশ করছি। তাঁর অগণ্য বান্ধব ও পরিজনদের আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সম্পাদক, 'পরিচয়'

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ২-৩
ভাদ্র-আশ্বিন । ১৩৭৬
শারদীয় সংখ্যা

সূচিপত্র

কবিতাগুচ্ছ

গল্প

প্রচ্ছদপট : বিশ্বরঞ্জন দে

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। চিন্মোহন সেহানবীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে
কলকাতা মেলা
১৯৬৯ ১৫-২৩ অক্টোবর
মিলনের সুরই বাঙালীর শারদীয় উৎসবের মর্মবাণী। সেদিন ভাইয়ের সঙ্গে মিল হয় ভাইয়ের ; মুছে যায় ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভেদ।
এবারে পূজার সময় আমরা মহোৎ-সবের আয়োজন করেছি কলকাতায়, ভারতবর্ষের মহোত্তম মিলন-কেন্দ্রে। বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় দান এ-উৎসবের লক্ষ্য। বাংলা-দেশের সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, যাত্রা, চিত্রকলা, চলচ্চিত্রের বিচিত্র অর্ঘ্যে সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠান-সূচী। বিদেশ থেকে এবং ভারতের নানান রাজ্য থেকে যাত্রীরা আসবেন কল-কাতা-মেলায় যোগ দিতে।
ভিন্‌দেশী বন্ধুদের স্বাগত জানান। সপরিবারে ও সবান্ধবে আপনিও যোগ দিন এই সর্বজনীন মিলনোৎ-সবে।
বিশদ নির্দেশনার জন্য যোগা-যোগ করুন
ট্যুরিস্ট ব্যুরো
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২ ডালহৌসী স্কোয়ার (ঈস্ট) কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : 'TRAVELTIPS'

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ২-৩
ভাদ্র-আশ্বিন । ১৩৭৬
শারদীয়

ম্যাকসিম গোর্কীর দৃষ্টিতে শিল্পী ও সমাজের সম্পর্ক

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

শিল্প ও সাহিত্যকে সচেতনভাবে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এই লেনিনীয় নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রটির তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় শিল্পী ও সমাজের সম্পর্কের পটভূমিতে। সেদিক থেকে ম্যাক্সিম গোর্কীর 'Disintegration of Personality' শীর্ষক প্রবন্ধটি খুব সহায়ক। প্রবন্ধটিকে লেনিনের 'Party Organisation and Party Literature' নামে প্রবন্ধটির পরিপূরক হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। লেনিনের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে এবং গোর্কীরটি ১৯০৯ সালে।

লেনিনের উপরোক্ত প্রবন্ধটির অনেক অপব্যাখ্যা হয়েছে। ভুল বোঝা এবং নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের চেষ্টাও কম হয় নি। সে আলোচনা অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে যেহেতু বিষয়টি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই গোর্কীর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে লেনিনের প্রবন্ধটি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

লেনিন যে পটভূমিতে প্রবন্ধটি লেখেন সে সময়ে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বকে সৃজনশীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেয়ে শ্রমিক-শ্রেণীর নিজস্ব নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি রূপরেখা উপস্থিত করা। সামাজিক দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয় সমাজ সচেতন শিল্পী ও সাহিত্যিকের। অতএব শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে—এটাই ছিল লেনিনের মূল বক্তব্য।

লেনিনের মতো বিরাট প্রতিভাধর পথপ্রদর্শক শুধুমাত্র সূত্র উপস্থিত করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি উত্থাপনের

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার দ্বন্দ্বমূলক চরিত্রের কথাও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে শিল্পে ও সাহিত্যে যান্ত্রিকতা, সব কিছুরই একই ধরনে বর্গীকরণ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের মত চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি অচল। এই ক্ষেত্রটিতে যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যক্তির অভিরুচি, চিন্তা ও কল্পরূপ (Fantasy), আঙ্গিক ও আধেয় ইত্যাদিকে অনেক বেশি সুযোগ দিতে হবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্নটির অপর দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে তাই বলে 'পার্টিজান সাহিত্য' অর্থাৎ সামাজিক দ্বন্দ্বে সাহিত্যের পক্ষভুক্তির তত্ত্ব নাকচ হয়ে যায় না। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনকে সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে হবে। তার উপরে তত্ত্বাবধান করতে এবং তার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন্ত লক্ষ্যের প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করার জন্য উদ্যোগী হতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে ঐ দুটি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে, বিশেষত যাঁরা শিল্পের সামাজিক চরিত্র ও ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত নন তাঁদের চোখে। অন্যপক্ষে উপরোক্ত দুটি বক্তব্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্বমূলক ঐক্যের সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে সচেতন না থাকলে মার্কসবাদীদের দিক থেকেও যান্ত্রিক ব্যাখ্যা তথা বিকৃতি ঘটে।

লেনিন নিজে তাঁর উপস্থাপিত সূত্রের প্রয়োগগত কার্যটিকে মোটেই অতিসরলীকৃতভাবে দেখেন নি। তিনি বলেন যে সাহিত্যকর্মে এই— রূপান্তর সাধনের কাজটি রাতারাতি সম্ভব নয়। যা৹ প্রয়োজন তা হলো এই যে, সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে নতুন সমস্যাটি সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, সেটিকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবে সঠিক সমাধানে তিনি মন্তব্য করেন আমরা এক নতুন ও কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি। তবে সেটি বড় মহান ও সুন্দর কর্তব্য, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত একটি ব্যাপক, বহুমুখী ও বিচিত্র সাহিত্য গড়ে তোলা।

লেনিন সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ করে গিয়েছেন উল্লিখিত প্রবন্ধ-টিতেই। বলেছেন যে 'পার্টিজান সাহিত্য' হবে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন সাহিত্য। প্রথমত তা বুর্জোয়া-দোকানদারী সাহিত্য সম্বন্ধের অর্থাৎ ব্যবসায় বুদ্ধির জালে ধরা দেবে না। দ্বিতীয়ত তার পক্ষে যে সব নতুন শক্তি যোগ দেবে

তারা আসবে সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে। শ্রমজীবী জনগণই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, প্রাণশক্তির উৎস এবং ভবিষ্যতের প্রতিনিধি। তাদের সেবায় আত্মনিযুক্ত সাহিত্য সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা ও জীবন্ত কার্যকলাপকে মানবতার বৈপ্লবিক চিন্তার সর্বশেষ অবদানের দ্বারা সমৃদ্ধ করবে। সংক্ষেপে, 'পার্টিজান' শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী বাহিনীতে যোগ দেবেন নিজের সচেতন সমাজদৃষ্টি এবং অন্তরের তাগিদে। তাঁদের সৃষ্টির মূল উৎসরূপে কাজ করবে সেই সংগ্রামের আদর্শ ও অভিজ্ঞতার অনুপ্রেরণা।

গোর্কীর প্রবন্ধটিতে ঐ উৎসের কথাই আলোচনা করা হয়েছে। তিনি সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন যে, তা কিভাবে শিল্প-সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

গোর্কী বলেছেন যে জনগণ শুধুমাত্র বৈষয়িক সম্পদেরই স্রষ্টা নয়, তারাই হলো সমস্ত আত্মিক মূল্যের অফুরন্ত উৎস। সময় সৌন্দর্য ও প্রতিভার দিক থেকে তারাই যৌথভাবে প্রথম ও প্রমুখ দার্শনিক এবং কবির ভূমিকা পালন করেছে। পৃথিবীর সমস্ত মহান কাব্য ও ট্রাজেডি, বিশেষত বিশ্বসংস্কৃতির ট্রাজেডির সৃষ্টিকর্তা তারাই।

সংস্কৃতির স্রষ্টা হিসাবে জনগণের ভূমিকাকে গোর্কী কালগত তথা সমাজের বিকাশের দিক থেকে দুটি প্রধান অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথমটি হলো আদিম সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজ এবং দ্বিতীয়টি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ।

প্রথম অধ্যায়ে যৌথ কার্যকলাপ এবং যৌথ চেতনারই সর্বাত্মক প্রাধান্য। সেই প্রথম যুগে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বহু বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে নতুন নতুন জয়লাভ করেছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে অর্জন করেছে নতুন নতুন জ্ঞান। সেই সব অভিজ্ঞতাকে তখনকার চেতনার রঙে রাঙিয়ে নানা কাহিনী; রূপকথা, অতিকথার জন্ম দিয়েছে। সেই যুগের প্রকৃতিভিত্তিক ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই মূর্ত হয়েছে তাদের কাব্য এবং প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞানের সমষ্টি।

সেদিনের মানুষের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব ছিল শুধুমাত্র সঙ্ঘশক্তির জোরে। প্রকৃতির উপরে অর্জিত প্রথম বিজয়গুলি তাদের মনে আত্মশক্তিতে অর্থাৎ সঙ্ঘশক্তিতে বিশ্বাস এনে দিয়েছে। নতুন নতুন জয়ের

প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। এই প্রেরণা থেকেই বীরগাথার উৎপত্তি। তার মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে এযাবৎ অর্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং সেই সঙ্গে এগিয়ে চলার তাগিদ ও স্বপ্ন। অতিকথা ও বীরগাথা একসঙ্গে মিলে একাত্ম হয়ে গিয়েছে কেননা সেদিনের বীর ছিল কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, সঙ্ঘশক্তির প্রতীক। সে বীরের ব্যক্তিত্ব সমগ্র সমাজের সমবেত সৃষ্টি, সমাজের যৌথ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, যৌথ মানসিকতায় অনুপ্রাণিত। ঐ সব কাহিনীর মহাবীরেরা সমগ্র সমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি। গোর্কী বলেছেন ভাষা যেমন সমগ্র সমাজের যৌথ সৃষ্টি তেমনি সুপ্রাচীন বীরগাথাগুলিও তাই। সেখানে ভাব, রূপ, কল্পনা প্রভৃতির যে সরল অনাড়ম্বর অথচ বিপুল প্রাণশক্তিতে বলিষ্ঠ অপরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায় তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব শুধুমাত্র সঙ্ঘ-জীবন ও চেতনার বিরাট শক্তির আলোকে। গোটা সমাজ একমনপ্রাণ হয়ে চিন্তা ও কাজ করেছে বলেই সম্ভব হয়েছে প্রমেথিউস, হারকিউলিস প্রভৃতির মত অনবদ্য মহাশক্তিধর বীরচরিত্র সৃষ্টি। গোটা সমাজের শক্তি ও ভাবনার বলে বলীয়ান হয়েই তাঁরা দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পেরেছেন।

সঙ্ঘ কিভাবে বীরচরিত্র সৃষ্টি করেছেন তা সঠিকভাবে বোঝা আজকের দিনে সম্ভব না হলেও গোর্কী ঐ প্রক্রিয়ার একটা রূপরেখা উপস্থিত করেছেন।

'কৌম' একটি অতিক্ষুদ্র জনসমষ্টি, চারিদিকে প্রতিকূল শক্তি সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তার নিজের অস্তিত্বরক্ষা এবং জীবন যাত্রায় এগিয়ে চলা সম্ভব নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে। কৌমের প্রতিটি সভ্যের অন্ত-র্জীবন, অনুভূতি, চিন্তা, অনুমান সবকিছু প্রত্যেকের নিকট একটি খোলা বইয়ের মত। অনুক্ষণ চিন্তা ও অনুভূতি বিনিময়ের মাধ্যমেই সেখানে ব্যক্তি প্রতিকূল শক্তিগুলির আক্রমণের বিপদের সামনে নিজের অসহায়তা কিছু পরিমাণে লাঘব করতে সমর্থ হয়। এই বিনিময়ের প্রক্রিয়ার একদিকে ব্যক্তির সমস্ত চিন্তা ভাবনা, অভিজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সঙ্ঘের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হয় অন্যদিকে সঙ্ঘের যৌথ অভিজ্ঞতা প্রতিবিম্বিত হয় ব্যক্তির অভিজ্ঞতা তথা মানসিকতায়।

সঙ্ঘ ও ব্যক্তির উপরোক্ত দ্বন্দ্বমূলক সম্বন্ধটি আরো বেশি মূর্ত, জীবন্ত হয়ে ওঠে সঙ্ঘের কোন সভ্যের মৃত্যুতে। সেই সমাজে একজন সভ্যেরও মৃত্যুর অর্থ হল যৌথ শক্তি হ্রাস পাওয়া। সুতরাং ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার মানসিক তাগিদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে মৃতকে অমর অর্থাৎ তার স্মৃতি

তথা অস্তিত্বকে স্থায়ী করে রাখার আকাঙ্ক্ষা। গোর্কীর মতে সুপ্রাচীন বীর গাথাগুলির মহাবীর চরিত্র সৃষ্টির পিছনে এই উপাদানটির অর্থাৎ মৃত্যুর উপরে জয়লাভের কামনার প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করেছে। বিশেষত যে কুলপতি জীবিত অবস্থায় ছিল গোটা সঙ্ঘের প্রতিনিধি এবং অভিজ্ঞতার প্রতিভূ তার মৃত্যুকে সেদিনের মানুষ মেনে নিতে চায় নি। মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপলক্ষে সমবেত কৌমের প্রত্যেক সভ্য হারানো কুলপতি সম্বন্ধে স্মৃতি চারণের সময় তার ব্যক্তিত্বে পৃথক পৃথক ভাবে যে সব গুণ আরোপ করেছে সেগুলির একত্রিত রূপ মৃত কুলপতিতে সমাজের সামগ্রিক চেতনা, অভিজ্ঞতা শৌর্যের আকারে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কোন ব্যক্তির নিজের অহংকে সঙ্ঘ থেকে আলাদা করে দেখে নি এবং প্রত্যেকের অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে তাদের সামনে রূপপরিগ্রহ করেছে এক মহাশক্তিধর পুরুষের ভাবমূর্তি। তা অমরত্ব লাভ করেছে সমাজের সামূহিক অনুভূতি, চিন্তা, চেতনা ও স্মৃতিতে। এই ভাবে জীবিত কৌমের উর্ধ্বে এক বীর চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে এবং তা হয়ে দাঁড়িয়েছে গোটা সমাজের গর্ব, গৌরব ও শ্রদ্ধার বিষয়—নিজেদের সঙ্ঘশক্তির প্রতি আস্থার প্রতীক। ক্রমে স্বাভাবিক ভাবেই সেই মহানায়ককে সমাজ খাড়া করেছে দেবতা ও প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী সত্তা রূপে। ঐ প্রতীকের নামেই তারা নতুন ভাবে এগিয়ে চলেছে প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় লাভের অভিযানে।

গোর্কী বলেন, সামাজিক চেতনার বিকাশের এই পর্যায়ে 'আমরা' ধারণার পাশাপাশি 'তিনি'র ধারণা রূপ নিয়েছে। কিন্তু 'আমি' ধারণা এখনও রূপ নেয়নি।

ক্রমশ বিভিন্ন কৌম মিলিত হয়ে উপজাতি গঠন করেছে। বিভিন্ন কৌমের বীর চরিত্রগুলির সংমিশ্রণে রূপায়িত হয়েছে উপজাতির মহান বীরের ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন কৌম ও উপজাতির মধ্যে প্রায়শ সঙ্ঘর্ষ ঘটেছে। এক সঙ্ঘের প্রতিদ্বন্দ্বী অপর সঙ্ঘ। ফলে সঙ্ঘচেতনা এবং 'আমার' ধারণার মুখোমুখি বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়েছে 'তারা' ধারণা। গোর্কীর মতে শত্রুভাবাপন্ন দুই সঙ্ঘের মধ্যে সংঘাত থেকেই 'আমি' ধারণা অঙ্কুরিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হয়েছে ঠিক বীরচরিত্র সৃষ্টির অনুরূপ ভাবে। 'তাদের' অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী অপর সঙ্ঘের এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিভিন্ন দিকগুলি পরিচালনার জন্য

ক্রমশ শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, 'স্পেশালাইজেশন' বা বিশেষত্ব গড়ে তোলা এবং সভ্যদের মধ্যে যৌথ অভিজ্ঞতাকে বণ্টন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই ক্ষণটি থেকেই সঙ্ঘের যৌথশক্তি বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। অবশ্য এই পর্যায়েও সঙ্ঘ যখন কোন ব্যক্তিকে 'প্রধান' অথবা 'পুরোহিত' পদে অধিষ্ঠিত করে তখনও সঙ্ঘশক্তির ঐক্য সম্বন্ধে অন্তর্চেতনা ক্ষুণ্ণ হয় নি। কেননা অতীতে যেভাবে মৃত কুলপতির ব্যক্তিত্বে সঙ্ঘেরই সামূহিক শক্তি ও জ্ঞান আরোপিত হতো তেমনি ভাবেই নতুন 'প্রধান' বা 'পুরোহিত' কে সমগ্র সমাজেরই প্রতীকরূপে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ঐক্যের চেতনা ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করে শেষোক্ত ব্যক্তিদের মানসিকতায়। প্রথম দিকে সে সঙ্ঘেরই প্রতিনিধিরূপে কাজ করে যায়। সাঙ্ঘিক পরিবেশ, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, অতীতের বীরনায়কদের স্মৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে সঙ্ঘের সঙ্গে তার যোগসূত্র এত ঘনিষ্ঠ যে সে নিজের চারিদিকে কোনরূপ শূন্যতা বোধ করে না। সে সঙ্ঘের শক্তির উৎস থেকেই শক্তি আহরণ করে চলে, নিজেকে মনে করে সাঙ্ঘিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানেরই রক্ষক এবং বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতা তথা জ্ঞানকে নতুন সৃজনশীল শক্তিরূপে বিকশিত করে।

কিন্তু ক্রমশ নিজের বিশেষ দক্ষতা, এককথায় বিশেষজ্ঞতা ও বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তি নিজেকে সঙ্ঘের যৌথ অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন বা তার ঊর্ধে অবস্থিত বলে বোধ করে। এই সময় থেকেই শুরু হয় ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রক্রিয়া। তার নতুন আত্মসচেতনতা থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বা 'অহং'বাদের নাটকের সূচনা হয়। অবশ্য বিকাশের সেই আদিম স্তরে ব্যক্তিত্ব তথা 'অহং'বাদ ছিল বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত নিতান্ত অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে সীমিত।

ব্যক্তি যখন নিজেকে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সঙ্ঘের উপরে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছে তখন সে নিয়েছে আত্মিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক রক্ষণশীল ভূমিকা। সঙ্ঘের পক্ষে নিজের শক্তিকে চিরস্থায়ী করার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন ওঠেনা। তার পক্ষে নিজের অমরত্ব প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই—সেটাই ত স্বাভাবিক ও সহজাত। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি নিজের বিশেষ মর্যাদা এবং অধিকারকে সুরক্ষিত করতে তথা স্থায়ী

রূপদানে সমর্থ হতে পারে জীবনযাত্রার পুরাতন রূপ, রীতিনীতি ইত্যাদিতে অপরিবর্তনীয় শাশ্বত চরিত্র আরোপের মাধ্যমে।

জনগণের সৃজনশীল কার্যকলাপ এগিয়ে চলে স্বতস্ফূর্তভাবে, প্রকৃতির উপরে বিজয়লাভের লক্ষ্য নিয়ে, সমন্বয়সাধনের প্রেরণার দ্বারা চলিত হয়ে। কিন্তু ব্যক্তির সামনে দেখা দেয় নিজের উপরে সমাজ কর্তৃক আপত বিশেষ মর্যাদাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার প্রশ্ন, নিজের বিশেষ অধিকারকে চিরন্তন ভাবে প্রতিষ্ঠার সমস্যা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজ কর্তৃক অর্জিত উত্তরোত্তর সাফল্যগুলিকে সে নিজের ব্যক্তিগত অবদান রূপে ভাবতে অভ্যস্ত হয়। সেই সাফল্যগুলিকে নিজের কাজে লাগাবার জন্য তার সামনে দেখা দেয় বিশেষ ধরনের সমস্যা, সঙ্ঘের সৃজনশাল কার্যকলাপকে সঙ্কুচিত ও তার করণীয় কার্যকে সীমিত করার সমস্যা। গোর্কীর মতে এই প্রচেষ্টা থেকেই সে সঙ্ঘের চেতনার উপরে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণা অর্থাৎ ঈশ্বরকে এক বিরাট ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরূপে কল্পনা চাপিয়ে দেয়।

'অহং'বাদ যখন নিজেকে সমাজের উপরে উৎপীড়ন চালাবার অধিকারসহ শাসক উপাদান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় তখন সে সৃষ্টি করে এক শাশ্বত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা। সে নিজের 'দৈবী' বা দৈবতুল্য ব্যক্তিত্বকে মেনে নিতে জনগণকে বাধ্য করে। নিজ সৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে তার মনে জন্ম নেয় অবিচল প্রত্যয়।

'অহং' বাদের বিকাশের প্রক্রিয়া যখন শীর্ষে পৌঁছায় তখন তার অনপেক্ষ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেরই সৃষ্ট ঐতিহ্যপরম্পরার সংঘাত বাধে। 'অহং' দেখে, যে শাশ্বত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সে একদিন সৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের দ্বারা পবিত্র বলে প্রতিষ্ঠা করেছিল তাই এখন প্রকাণ্ড অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সে শাশ্বত ঈশ্বরকে হত্যা করতে বাধ্য হয়। এই ক্ষণ থেকে শুরু হয় দেবতুল্য ও নিঃসঙ্গ 'অহং'-এ অধঃপতনের প্রক্রিয়া। তার পক্ষে বাইরের কোন শক্তির সাহায্য ব্যতীত নিজের সৃজনক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। যেহেতু বাঁচা মানেই সৃষ্টি অতএব সৃজনক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পর 'অহং'-এ পক্ষে বাঁচা অসম্ভব বা নিরর্থক হয়ে পড়ে।

গোর্কী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, আমাদের সমকালীন 'অহং'বাদ আবার নানাভাবে ঈশ্বরকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে। আজকার 'অহং' সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের অরণ্যে পথ হারিয়েছে। সমস্ত জীবন্ত সৃজনীশক্তির

উৎস 'সঙ্ঘ'-এর সঙ্গে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই সে আশা করে যে পুনরুজ্জীবিত ঈশ্বরকে খুঁটি হিসাবে আঁকড়ে ধরে নিজের নিঃশেষিত শক্তি ফিরে পাবে।

'অহং'-এর বিকাশ এবং অবক্ষয়ের এই প্রক্রিয়া চলেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। তা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীভেদের উদ্ভব এবং শ্রেণীশোষণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবই জনগণের ঐক্যকে নষ্ট, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে তিক্ত এবং আপোষের অতীত সংঘাতের জন্মদান করেছে। দারিদ্র্যের গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে মানুষকে। সে সংগ্রামে ব্যক্তি ক্রমশ সঙ্ঘের থেকে দূরে সরে গিয়েছে। অবশেষে এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যখন সে নিজেকে অনুভব করেছে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো।

'অহং'-এর বিকাশ ও অবক্ষয়ের প্রক্রিয়াটিকে গোর্কী নিছক নেতিবাচক ভাবে আলোচনা করেন নি। ঐ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত অপর দুটি দিকের উপরও আলোক সম্পাত করেছেন। একটি হল সঙ্ঘের ক্ষমতা সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ, শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের যুগ যুগ ব্যাপী সংগ্রাম। অপরটি হল, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ, সঙ্ঘচেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তির সৃজনশীল ভূমিকা ও অবদান। তিনি শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে সঙ্কুচিত করতেও চান নি বা তার অবদানকে ছোট করেও দেখেন নি। ব্যক্তি যখন নিজেকে সঙ্ঘের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে খাড়া করে তখন থেকেই তার অবক্ষয়ের সূচনা। কিন্তু ব্যক্তি তথা 'অহং' যখন সঙ্ঘেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা-চেতনাকে নিজ সৃষ্টিতে শিল্পায়িত করে তখন তার প্রচেষ্টা ধন্য হয় সার্থকতার আশীর্বাদে।

যখন থেকে 'ব্যক্তি' নিজেকে সমাজের উর্ধে স্থান দিতে ও কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে শুরু করে তখন থেকে উপজাতীয় সমাজের জনগণের মধ্যে 'ব্যক্তি'র সম্বন্ধে সন্দেহ এবং তার প্রতি বিরোধিতার মনোভাব জাগ্রত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ প্রথার উদ্ভব হয় যে কোন 'প্রধান' একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার পরে ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। যদি স্বাভাবিকভাবে তার মৃত্যু না হয় তবে তাকে সমাজের বিধানে মৃত্যুবরণ করতে হবে। গোর্কী বলেন যে লোককথাগুলির একটি মূল সুর হল এই যে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই 'সঙ্ঘ' শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। সঙ্ঘ শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন 'ব্যক্তি'র

অসহায়তার এবং তার নিজ শক্তির অত্যধিক বিশ্বাস সম্বন্ধে বিদ্রূপ এবং ক্ষমতাকাঙ্ক্ষার নিন্দা করে বহু লোককথার প্রচলন দেখা যায়। 'ব্যক্তি'র উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে জনগণের মনোভাবের এই রূঢ় অভিব্যক্তির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজের সামগ্রিক ঐক্যের জন্য আহ্বান।

ঐ পর্যায়টি ছিল আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে সুস্পষ্টভাবে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকাল। সমাজ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার ফলে পূর্বতন যুগের স্বতস্ফূর্ত সঙ্ঘচেতনার মূলে আঘাত লাগে। একদিকে যৌথচেতনা ও যৌথ শক্তিতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরে এবং অন্যদিকে প্রভুশ্রেণীর নিপীড়নের ফলে আগেকার সামগ্রিক কল্পনা, অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টির প্রবাহ স্বভাবতই দুর্বল হয়ে আসে। এই অধ্যায়ের লোককথায় তাই দেখা যায় যে প্রাচীনতম যুগের স্বচ্ছন্দ স্বতস্ফূর্ত সৃষ্টির ধারা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। উপরন্তু শোষক শ্রেণীগুলি নিরন্তর চেষ্টা করে জনগণের কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসগুলিকে চিরন্তনরূপ দিয়ে অথবা নতুন নতুন মোহজাল সৃষ্টির দ্বারা তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে। দেবতার কল্পনাতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। আদিম যুগের দেবতারা ছিল হয় প্রাকৃতিক শক্তিগুলির প্রতিনিধি নতুবা মানুষেরই বিশেষ শ্রমদক্ষতা শৌর্য ও জ্ঞান ইত্যাদির প্রতীক। দেবতারা সে যুগে মানুষের কল্পনায় তাদের সুখদুঃখের সাথী হয়ে মানুষের মধ্যে বিচরণ করত। কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যে পরিমাণে প্রভুশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে সেই অনুপাতেই যেন দেবতারা অনেক দূরে, বহু উর্ধে সরে গিয়েছে। দেবলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেবাদিদেবের একচ্ছত্র আধিপত্য।

তাই বলে লোকমানসের সৃজনী প্রবাহ কোন সময়েই একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। কখনই তারা শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের সামনে চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে নি। তাদের প্রতিরোধ কখনও আত্মপ্রকাশ করেছে মৃত্যুভয়হীন বিদ্রোহের মূর্তি নিয়ে, আবার কখনও তা ফল্গুধারার মত প্রভুশ্রেণীর মানুষদের দৃষ্টির আড়ালে আপন মনে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যখন তারা বিদ্রোহ করেছে তখন বিদ্রোহের নায়কদের নিয়ে প্রাচীন বীরগাথার মহানায়কদের অনুরূপ চরিত্র সৃষ্টি করেছে। সেই সব চরিত্র শ্রমজীবী জনগণের সমষ্টিগত শক্তি ও প্রতিরোধের দুর্জয় সঙ্কল্প এবং জয়লাভের

আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এইসব বীরেরা সেইজন্যই মরেও মরেনা, জনগণের সংগ্রামী সঙ্কল্পের প্রতীক বলেই তারা মৃত্যুহীন। যে সময় শ্রমজীবী জনগণ প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেনি তখন তাদের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে প্রভুশ্রেণীর মানুষদের বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, ধিক্কার ও নিন্দাবাদসূচক কাহিনী, গান, ছড়া প্রভৃতির মাধ্যমে। অর্থগৃধ্নুতা, নৃশংসতা প্রভৃতিকে ঐসব কাহিনীতে করা হয়েছে ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত। গোর্কী বলেন যে শ্রমজীবী জনগণের জীবনে নিদারুণ লাঞ্ছনা ও অমানুষিক শোষণের পরিবেশ সত্ত্বেও লোক-কথায় হতাশ এবং নৈরাশ্যের অভিব্যক্তি খুব বিরল। সঙ্ঘ শক্তির অমরত্ব ও চরমে বিজয়লাভের সম্বন্ধে যে প্রত্যয় জনগণের অন্তরে ফল্গুধারার মতো সঞ্চারিত হয়ে থাকে এটি হল তারই নিদর্শন।

এবার আসা যাক উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় দিকটির প্রসঙ্গে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ব্যক্তির সৃজনীশক্তি ও সম্ভাবনাকে গোর্কী কখনই অস্বীকার করেন নি। সমাজ যত এগিয়ে চলে, জীবন যাত্রার ধরণ হয় যত জটিল ততই মানবের জ্ঞান ও কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশিষ্ট স্থান ও ভূমিকা অর্জন করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তাদের মধ্যেও 'স্পেশালাইজেশান' বিশেষ দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমাদের আলোচ্যপ্রসঙ্গ শিল্প সৃষ্টির প্রশ্নে সীমিত। সেই প্রশ্নে গোর্কী বলেছেন যে সাঙ্ঘিক ও ব্যক্তিগত দুটি সৃজননীতি বা শক্তির মধ্যে একটি হল প্রাথমিক বা উৎস এবং অপরটি হলো প্রথমটি থেকে উদ্ভূত। জনগণই উৎস, ব্যক্তির সৃষ্টি তা থেকে উদ্ভূত। ব্যক্তি যখন উৎসের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে এবং সেখান থেকে উপাদান আহরণ করে তখনই তার শিল্পকর্ম বিপুল প্রাণসম্পদে সমৃদ্ধ হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ গোর্কী বলেছেন যে বিভিন্ন জাতির সুপ্রাচীন মহাকাব্যগুলি লোককথার যুগযুগ সঞ্চিত ভাণ্ডারকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে। বহুকাল থেকে লোকমুখে যে সব কাহিনী প্রচলিত হয়ে এসেছে পরবর্তীকালের কোন মহান শিল্পী সেগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত এবং মার্জিত ও সংস্কৃত করে মহাকাব্যের রূপদান করেছেন। মহাকাব্যের কাঠামোর মধ্যে লোকমানসের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, চিন্তা, কল্পনার একত্র মিলন ঘটেছে। হয়ত সেখানে অনেক অতিরঞ্জন ও অসংলগ্ন ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। তবু তা যুগ যুগ ধরে জনচিত্তকে প্রভাবিত করে। কারণ তা

সমগ্র জনগণের সমবেত ঐতিহাসিক সৃষ্টি এবং তাদের গোটা অন্তঃকরণ যেন সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

দেখা যায়, মহাকাব্যগুলি রচিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট জাতির জনগণের জীবনে এক সামগ্রিক অগ্রগতির অধ্যায়ে। তখন আবার সঙ্ঘচেতনা, অতীতের তুলনায় সীমিত হলেও, নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

শুধু মহাকাব্যগুলিই নয়, পরবর্তী যুগগুলিতেও দেখা যায় যে বিভিন্ন জাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতিগুলি রচিত হয়েছে লোককথার উৎসকে অবলম্বন করে। প্রভুশ্রেণী কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া আত্মিক-মানসিক শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হওয়া সত্ত্বেও জনগণের অন্তর্জীবনের গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত হয়েছে অজস্র কাহিনী, গান, প্রবাদ ইত্যাদি। তাতে শোষকশ্রেণীর আত্মিক দৈন্য এবং সঙ্ঘজীবন হতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির দেউলিনাপনাকে চিত্রিত করা হয়েছে। সেই উৎস থেকে মহান শিল্পীরা কিভাবে সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে গোর্কী বলেছেন যে জার্মাণ মহাকবি গ্যয়তে 'ফাউস্ট' রচনা করেন লোককথাকে ভিত্তি করে। গ্যয়তের বহুপূর্বে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও পোলাণ্ডের লোকসাহিত্যে 'ফাউস্ট' কাহিনীর সাক্ষাৎ মেলে। ওথেলো, হ্যামলেট, ডনজুয়ান প্রভৃতি চরিত্রের সৃষ্টি প্রথম হয়েছিল লোকসাহিত্যে। মধ্যযুগীয় 'নাইট' প্রথা বিখ্যাত স্পেনীয় লেখক সেরভান্তেসের অনেক আগে লোকসাহিত্যে বিদ্রূপের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। শেকস্‌পীয়র ও বাইরণ, মিল্টন ও দান্তে, মিকিয়েভিৎস, গ্যয়তে এবং শিলার প্রমুখ মহান শিল্পীরা লোকমানসের সেই সামূহিক সৃষ্টিকে অবলম্বন করেই শিল্পকর্মের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গোর্কী বলেছেন যে সংস্কৃতির ইতিহাসে যথাক্রমে অবক্ষয় ও নিস্তরঙ্গ অবস্থা এবং অন্যদিকে সামাজিক জাগরণ ও জীবন চাঞ্চল্যের যুগগুলিতে ব্যক্তির ভূমিকা পর্যালোচনায় তাঁর প্রতিপাদ্যই সত্য প্রমাণিত হয়। সমাজ যখন অচলায়তনের মত হয়ে রয়েছে, অবক্ষয়ের ব্যাধির লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে তার প্রতি অঙ্গে, সেই সময়ে ব্যক্তির রক্ষণশীলতা, নৈরাশ্য, নিষ্ক্রিয়তা ও জীবন তথা জগৎ সম্বন্ধে চরম নেতিবাচক মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তখন জনগণ থেমে দাঁড়িয়ে নেই। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে রূপদানের চেষ্টা নিরন্তর করে চলেছে। কিন্তু ব্যক্তি তার সৃজনশীল ভূমিকাকে অস্বীকার করে অর্থাৎ সামূহিক অভিজ্ঞতাকে ভাব, উপপাদ্য, তত্ত্ব ইত্যাদির

আকারে সুত্রান্বিত করার মহান কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে ক্রমশ জনজীবন থেকে দূরে সরে চলেছে; জনগণের জীবন, চিন্তাভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে তার নিজেরই অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায় একঘেয়ে, বিবর্ণ, অর্থহীন।

অপরপক্ষে রেনেসাঁ ও রিফর্মেশানের মত যুগগুলিতে দেখা যায় ব্যক্তির আত্মিক ক্ষমতা বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে শিখরের পর শিখর জয় করে চলেছে। তার একমাত্র কারণ, ব্যক্তি তখন সমাজের সামূহিক প্রাণ চাঞ্চল্যের কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের ইচ্ছায় ও চিন্তাভাবনায় সে তখন অগণিত মানুষের ইচ্ছা, চিন্তা, সঙ্কল্প, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রীভূত এবং প্রতিবিম্বিত করেছে। এই সব যুগে ব্যক্তিত্ব তার সমস্ত গৌরব মহিমা ও সৌন্দর্যে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। তার কারণ ব্যক্তির সেই মহিমা এবং গৌরব সমাজের জনগণ এবং উদীয়মান শ্রেণীর সামূহিক চিন্তা ভাবনা ও সঙ্কল্পের উজ্জ্বল আলোক প্রভায় উদ্ভাসিত। মহান ব্যক্তিত্ব গণমনের প্রতিনিধি ও প্রতীক বলেই মহত্ত্ব লাভ করে। এই ধরণের শিল্পীর কৃতি হয়ে দাঁড়ায় জনমানসের সৃষ্টিরই ঘনীভূত ও সুসংস্কৃত রূপ।

গোর্কী বলেন যে ইতালীতে প্রাক্ রাফেলীয় চিত্রকলার উদ্ভব হয় জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মিক ও দৈহিক সংযোগ থেকে। সিমাবু যখন 'মাদোনা' চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণ করেন তখন তাঁর বাসস্থানের অঞ্চলটি জুড়ে দেখা দেয় উৎসব ও উৎসাহের বিরাট চাঞ্চল্য। রেনেসাঁর ইতিহাসের বহু ঘটনা ও তথ্য সাক্ষ্য দেয় যে সেই যুগে শিল্প জনগণকে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে প্রভাবিত করত এবং তা ছিল জনগণের জন্যই উৎসর্গীকৃত। অন্যদিকে জনসাধারণও শিল্পকে লালন করত, শিল্পের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিত নিজেদের মৃত্যুহীন, মহান অথচ শিশুর মত সরল আত্মিক জীবনকে। ইতালীর প্রজাতন্ত্রগুলির অস্তিত্বের কালে যে সেখানে বহুসংখ্যক মহান শিল্পীর উদ্ভব হয়েছিল তার মূলে এই কারণটিই কাজ করেছে। ইতালীয় জনগণের সৃজনমূলক কার্যকলাপ আত্মিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নবসৃষ্টির বন্যাপ্রবাহের গতিপথ উন্মুক্ত করেছিল।

শিল্পীর বিচ্ছিন্নতা চরমে ওঠে ধনতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়ের যুগে। প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে আদিম সঙ্ঘজীবনের ও চেতনার অবশেষগুলি দীর্ঘকাল পর্যন্ত শক্তিশালী থাকে। রীতি-নীতি, উৎসব অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য

ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। সেই সঙ্গেই আবার অতীতের অবশেষের মৃত ও নেতি-বাচক দিকগুলি শৃঙ্খলিত করে রাখে মানুষের মনকে। সামন্তযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর চিন্তানায়কেরা যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তির চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, যুক্তির প্রাধান্য ইত্যাদির পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে তখন তা মানুষের মনকে সামন্তযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও সংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভে সাহায্য করে। সেই সময় ধনিকশ্রেণীর চিন্তানায়কেরা নিজেদের বিবেচনা করে সমগ্র জন-গণের প্রতিনিধিরূপে। গণজীবন ও গণমানসের সঙ্গে তাদের যোগসূত্রও থাকে ঘনিষ্ঠ।

গোর্কীর মতে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যখন প্রগতিশীল ভূমিকা পূরণ করেছে তখনও কিন্তু হারকিউলিস বা প্রমেথিউসের মতো অপরূপ মহাবীর চরিত্র সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। তারপরের অধ্যায়গুলিতে ধনতন্ত্রের ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির নির্মম রথচক্র ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে নিষ্পেষিত করেই এগিয়ে চলেছে। তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের চরিত্র হয়ে পড়েছে ক্রমশ দেউলিয়া, বচনসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক। সামাজিক দ্বন্দ্বের তথা বাস্তব জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যারা সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তির চিন্তা ও সৃষ্টির স্বাধীনতার তত্ত্বের খোলসটাকে আঁকড়ে ধরে থেকেছে তাদের অন্তর্জীবন হয়েছে দ্বন্দ্বে-সংঘাতে জর্জরিত, হতাশা ও অবসাদে আচ্ছন্ন। গোর্কী মন্তব্য করেছেন, এই সময়ের শিল্পকর্মে অনেক সময় শক্তির স্বাক্ষর দেখা যায় বটে তবে সে শক্তি মানসিক সংঘাত এবং আকুলতা থেকে উৎসারিত। ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবক্ষয়কে তারা সংস্কৃতির অবক্ষয় তথা বিনাশ বলে মনে করে। আশ্রয় খোঁজে নিজের অন্তর লোকে। কিন্তু সেখানেও তাদের চেতনা ও অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে নিঃসঙ্গতার অসহনীয় যন্ত্রণা।

'অহং'বাদ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত সেই সময়েই ধনতন্ত্রের নির্মম আধিপত্য নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্ঘশক্তিকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করে। ধনতন্ত্রের মৃত্যুবাণ বহনকারী শ্রমিকশ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে নতুন নৈতিক শক্তি রূপে। ধীরে ধীরে অথচ ক্রমবর্ধমান বেগে সে উপলব্ধি করে যে পৃথিবীর

মহান সঙ্ঘচেতনার প্রতিনিধিরূপে তারই উপরে এসে পড়েছে জীবনকে নতুন ও স্বাধীন ভাবে সৃষ্টির ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

'অহং'বাদীদের চোখে এই নতুন শক্তির আবির্ভাব প্রতিভাত হয় ঈশাণকোণে কালবৈশাখীর মেঘের আবির্ভাব রূপে। কেননা এই শক্তির অভ্যুদয় হল বিচ্ছিন্ন অহংবাদের তথা দোকানদারী সাহিত্যের মৃত্যু পরোয়ানা স্বরূপ। এই ধরনের বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার মহান কর্তব্যের অজুহাত খাড়া করে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার অথবা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যুক্তি হিসাবে।

গোর্কী রুশিয়ার চিরায়ত সাহিত্যের মানবতাবাদী সংগ্রামী ঐতিহ্য ও গণমানসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের সত্যটি তুলে ধরে নতুন যুগের সৎ শিল্পীদের প্রতি শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে রুশ সাহিত্যে প্রত্যেক মহান শিল্পীরই নিজস্ব অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু প্রত্যেকের শিল্পকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে একটি নিবিড় ঐক্যসূত্র—তা হলো নিজ দেশের ভবিষ্যৎ এবং জনগণের ভাগ্যকে উপলব্ধি ও রূপায়িত করার প্রেরণা। মানুষ ও ব্যক্তি হিসাবে এই সব শিল্পীদের হৃদয় ছিল জীবন, সাহিত্য ও শ্রমজীবী জনগণের প্রতি ভালোবাসার আলোকস্নাত। নিজের নিরানন্দ দেশের জন্য দুঃখে তাঁর হৃদয় বেদনার্ত। তিনি ছিলেন সৎসংগ্রামী, সত্যের শহীদ, শ্রমে মহাশক্তিধর। সারা জীবন ধরে তিনি সত্যের অবশ্যম্ভাবী জয়ের কথা ঘোষণায় নিজ হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন, জনগণের দুঃখ দুর্দশার প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন থেকেছেন। নতুন যুগসন্ধিক্ষণে সেই মহান ঐতিহ্য রক্ষা ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব শুধু শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের সাথী হয়ে।

উপরোক্ত দুই ধরনের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন 'অহং'বাদ এবং সঙ্ঘচেতনায় অনুপ্রাণিত ব্যক্তির ভূমিকা—এই দুটির বিপরীত চরিত্রকে গোর্কী সার্থক শিল্পরূপ দান করেছেন 'ক্লিম সামগিন' নামক মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসটিতে।

সামগিন হলো সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দেউলিয়া চরিত্রের প্রতীক। বুর্জোয়া সমাজের সঙ্কটের আবর্তে পতিত ব্যক্তির মানসিক অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে

গোর্কী ফুটিয়ে তুলেছেন ইতিহাসের বিশাল ক্যানভাসে বিপ্লবে অংশ-গ্রহণকারী বিভিন্নশ্রেণীর ভূমিকা তথা ভবিষ্যতের চিত্র। বিপ্লবী সংগ্রাম যে পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করছে ও সুদক্ষভাবে সংগঠিত হচ্ছে সেই পরিমাণে জনগণের চরিত্রে নতুন নতুন পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। যে সব নরনারীকে দৈনন্দিন জীবনে মনে হয় অতি সাধারণ, তারাই ব্যারিকেডে প্রাণ বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসে।

উপন্যাসটিতে গোর্কী জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত যে সব বীরচরিত্র রূপায়িত করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র হল বলশেভিক কুতুজভ। কুতুজভও ব্যক্তির 'আত্মিক স্বাধীনতা' চায়, তবে তার 'আত্মিক স্বাধীনতা' নিজেকে জনগণের ঊর্ধ্বে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আসনে বসাতে প্রয়াসী হয় না, সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে না। তার 'আত্মিক স্বাধীনতা', সচেতন ভাবে বিপ্লবের সেবায় আত্মনিয়োগের প্রেরণা যোগায়।

অবিরত চেনা-মুখ

অমলেন্দু চক্রবর্তী

একে একে সকলেই একেবারে সদর দরজার দোর-গোড়ায় রাস্তার ফুটপাতে এসে দাঁড়াল—মা, বাবা, ভাই, বোন—সাতজন। কেউ কথা বলছে না, সাহস নেই, শুধু অপেক্ষা করছে, নিজেদের মধ্যেই কেউ একজন হঠাৎ কথা বলে স্তব্ধতা ভাঙবে, তারপর সকলেই পরস্পরের দিকে চোখ তুলে তাকাবে, বুক-চাপা দীর্ঘ শ্বাসটা কণ্ঠনালীর গোড়ায় যেখানে দলা পাকিয়ে বুকের ভিতর যন্ত্রণা ছড়াচ্ছে, হাতের মুঠোয় সেই গলাটা চেপে ধরে ভয়ে আতঙ্কে সবাই চারদিকে এলোমেলো তাকাতে লাগল। কেমন নিঃঝুম হয়ে আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ছে গলিটা। চারপাশে একসঙ্গে রেডিও বাজছিল কতোগুলি, একই সঙ্গে 'জয়-হিন্দ' ঘোষণা জানিয়ে সব বোবা বনে গেল। রাত এগারটা, এখনও দোতলা-তিনতলায় কয়েকটা আলো, টুপ টুপ করে সেগুলিও নিভে যাবে। প্রায় নির্জন গলিটা তারপরও মরা-মানুষের মতো পড়ে থাকবে সারারাত, কর্পোরেশনের তিনটে লাইটপোষ্ট সারারাত জেগে মরা-গলিটাকে পাহারা দেবে, রাত বাড়লে কুকুরগুলি একে একে ছুটে আসবে, হাইড্রেন্টের আশে-পাশে জঞ্জালের মধ্যে খাদ্য খুঁজবে, একজনের আহার কেড়ে নিতে আর সবাই চিৎকার করবে। এবং মাঝে মাঝে মরা-গলিটার স্তব্ধতা ভেঙ্গে মধ্যরাত্রিকে আরও বীভৎস, আরও ভৌতিক করে ওরা জানান দেবে পৃথিবীটা এখনও নিঃশেষে প্রাণী-শূন্য নয়। এবং হয়তো তখনও, রাত গড়িয়ে গড়িয়ে যদি ভোরও হয়, তবু বুকের যন্ত্রণাগুলিকে সবাই মিলে চেপে থেকে, সারা রাত জেগে, ওই ল্যাম্পপোষ্টগুলির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ওরা এই মরা-গলিটার শব পাহারা দেবে। যখন ঘরে ঘরে সব আলো নিভে যাবে, সব বাড়ির সদর দরজায় যখন খিল আঁটা, ঠিক তখনও হয়তো উনচল্লিশের-বি বাড়ির দরজায় মানুষগুলি কথা-না-বলে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি মেয়েটা সত্যি না আসে!

অদূরে তিনতলা বাড়িটার দোতলায় জোরালো সাদা বাতি নিভে গিয়ে নীল আলো জ্বলল, উর্ধ্বে নীল-আলোর দুটি চতুষ্কোণ। সবাই তাকাল। মুহূর্তে চমকে উঠল। অতর্কিতে মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সকলের আগে বাইরে এসে

চৌকাঠে বসে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন মা। পথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল তিন বোন, বসে পড়ল মাকে ঘিরে—'মা, তুমি কেঁদো না মা। মা শোন···মাগো···'

'দাদা থানা থেকে ফিরবে এক্ষুনি। একটা খবর নিশ্চয়ই পাবো—'

'ওঠো মা, ঘরে চলো মাগো—'

মেজো বোন মিনুর শাড়ির আঁচল গড়াচ্ছিল রাস্তায়, বিহারী মুচিটা যেখানে সকাল-সন্ধ্যা বসে জুতো সেলাই করে। ভাই মণ্টু এসে মেজদির আঁচলটা কাঁধে তুলে দিল।

বৃদ্ধ বাবা, হাঁপানি রোগী, কান্নার গোঙানী' শুনে, এবং এ দৃশ্য দেখে ধুঁকতে ধুঁকতে প্রায় অন্ধের মতো রাস্তা ধরে এগোতে লাগলেন। সন্তানেরা ছুটে এল—'আপনি অসুস্থ, আপনি যাবেন না বাবা।'

কিন্তু উদাস বৃদ্ধ কী ভাবছেন উর্ধ্বে তাকিয়ে, কান্না-দুঃখ-কাকুতি মিনতি সব স্পর্শের বাইরে সম্মোহিতের মতো এগোলেন সামনের দিকে। খালি গায়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের উপবীত, একটু পরে পরেই আকাশের দিকে করজোর তুলে ঈশ্বরকে প্রণাম। কী বিশাল রাক্ষুসে শহর কলকাতা, খালি-পায়ে, ছানি পড়া চোখে চশমা ছাড়া কোথায় আর যাবেন! কতোটুকু? হাঁটতে হাঁটতে মানুষ শুধু একটি রেখা ধরেই এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কতোদিকে, কতোভাবে হারিয়ে যেতে পারে মানুষ। কে কোথায় খুঁজবে কাকে! এই রাতে, অন্ধকারে কলকাতা শহরে! একেবারে ছোট ছেলে মণ্টু, স্কুলে পড়ে, বাবার পাশে পাশে রইল।

এবং এদিকে সদর দরজায় আর সব ভাই বোনেরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাকিয়ে রইল। মা পথে বসে আঁচলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, বাবা নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছেন অন্ধকারে, দাদা থানায়। ইংরেজি 'টি'-এর মতো গলিটা যেখানে ডানে-বাঁয়ে ছড়ানো আরেকটা মাঝারি গলির মুখে গিয়ে মিলেছে, সেখানে পান-বিড়ির দোকানটার সামনে এখনও কয়েকটা মানুষ, ইতস্তত কয়েকটা রিকশ, ট্যাকসি। নাইট-শোর শেষে শালিদের নিয়ে মফঃস্বলের জামাইবাবু ফিরছে, অথবা নব-দম্পতি। দূর থেকে কতোগুলি অস্পষ্ট মানুষের ছায়া-ছায়া শরীর। এখন মধ্যরাত্রি, অথচ ঘরে-ফেরার সময় এখনও ফুরোয়নি মানুষের। ভোরবেলা খুলে দিলে পোষা-পায়রাগুলি ফর্‌ফর্‌ করে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়, সারাদিন ধরে, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত অবধি গোটা কলকাতার আনাচে-কানাচে কিলবিল করে

মানুষ, কিন্তু কলকাতা তার সব খুপরির দরজা সেঁটে দেবার পরও সব পাখি ফেরে না। কতো রাত! কতো রাত পর্যন্ত মানুষ হাঁটে রাস্তায়? ওরা যে যার মতো অনড় পুতুল হয়ে রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে—যদি এখনও হঠাৎ এক ঝলকে একটা শাড়ির আঁচল আচম্‌কা বাঁক ফেরে গলির মুখে।

'রাত ক'টা বাজে রে এখন?'

মা-র ক্লান্ত কণ্ঠস্বর। সবাই তাকায়।

'ঝুনু...'

'এই সওয়া এগারটা, সাড়ে এগারটা হবে।'

'না মা, রেডিওর সময়-সঙ্কেত হয়েছে সেই কখন—' পায়জামা হাঁটুর উপর তুলে রাস্তার উপরই বসে ছিল পল্টন। উঠে দাঁড়ায়—'বারোটা বেজে গেছে।'

মায়ের পিছন থেকে মিনু ঠোঁটে তর্জনী তোলে—'না মা, এখনও এতো ভেঙে পড়ার মতো কিছু হয় নি। ও-বাড়ির শোভা-ওরা নাইট-শোর সিনেমায় গেছে, এখনও ফেরেনি।'

এবং ঠিক তখনই চারদিকে নিঃঝুম বাড়িগুলি থেকে গির্জার ঘণ্টার মতো সমস্বরে ঘড়িগুলি বেজে উঠল, বাজতে লাগল, ঢং ঢং ঢং...এক···দুই · তিন...চার ...প্রতিটি ধ্বনির তরঙ্গে কতগুলি মানুষের পাঁজরায়, কাঁসার পাতে এসে হাতুড়ির ঠোক্কর লাগছে···এক·· দুই···তিন···চার·· এবং মানুষগুলি সময় গুনছে না, শক্ত হয়ে স্থির নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থেকে শুধু শেষ ঘণ্টাটার প্রতীক্ষায় রইল। এবং নিয়মমাফিক শোক প্রকাশের জন্য দু-মিনিট নীরবতা পালনের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষগুলি বিচ্ছিন্নভাবে একা-একা অথবা সমবেতভাবে আবিষ্কার করল, রাত দুপুরের এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একটা সামান্য শব্দেও ভূতেরা খেলা করে, বুকের ভিতরটায় ভয়ের পেণ্ডুলাম দোল খায়। ঘরের অন্ধকারে ছেলে-মেয়েকে পাশে নিয়ে শুয়ে অবশ হাতের হাতপাখাটা যদি কারও গায়ে লেগে শব্দ হয়, মেঝেতে তিনবার পাখা ঠুকে মা শব্দের ভয় তাড়ান, ঘুমের মধ্যে টিক্‌-টিকির ডাকেও তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে তিনসত্যি দেন। নিস্তব্ধ অন্ধকারে শব্দকে এত ভয়! অথচ ঝিমোন গলিটার উপর দাঁড়িয়ে অবোধ ছেলে-মেয়েকে নিয়ে অসহায় মা শুধু পরস্পরের চোখে চোখ রেখে পরস্পরকে বিশ্বাস করে ঘড়ির কাঁটায় সময়ের গর্জন শুনে প্রতিটি মুহূর্ত গোনেন। অপলক তাকিয়ে থাকেন ঊর্ধ্বে, অন্ধকারে গাঢ় নীল আলোর দুটি চতুষ্কোণের দিকে।

দক্ষিণ খোলা জানালায় এখন ওদের প্রচুর বাতাস। মিনু ঝুনু রানু আর পল্টন মা-র অপলক চোখের চেয়ে-থাকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'দিদি বলছিলেন, আমাকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেবেন—' সবচেয়ে ছোট-বোন আট বছরের রানু ঘুম-জড়ানো গলায় বলল—'দিদি আসবে না মা ?'

রাত দুপুরে ঘড়ির ঘণ্টার মতোই অতর্কিতে কয়েকটি ধ্বনি, শব্দ, কথা। সবাই চমকে তাকাল। তারপর একজন আরেকজনের দিকে। ক্ষুব্ধ অভিমানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মা, দাদা, দিদিদের দিকে তাকাল রানু। কেউ তাকে আদর করে ডেকে নিচ্ছে না, সাড়া দিচ্ছে না কেউ। এবং সকলেই মাথা নুয়ে নিজেদের বুকের কান্নাকে দাঁতের কামড়ে ঠোঁটে চেপে স্থির হয়ে আছে। আচমকা হাত বাড়িয়ে মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিলেন মা। বললেন, কান্নায় ভিজছে গলা—'ঘুম পেয়েছে ওর। ওকে একটু শুইয়ে দিয়ে আয় মিনু।' এবং কান্নাকে বুকে চেপে রাখার অমানুষিক যন্ত্রণায় যখন শরীর কাঁপছে, সকলের অলক্ষ্যে বালিশে মুখ গুঁজে শুধু একটু কাঁদবার লোভে ছুটে এসে প্রায় ছোঁ মেরেই ওকে টেনে নিয়ে গেল মিনু।

আর আধো অন্ধকারে, আবছা আলোয়, দরজায় স্থিরচিত্রের মতো স্থবির হয়ে রইল তিনজন। দূরে রাস্তার মোড়ে পান-সিগারেটের দোকানটাও বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আর মানুষ নেই পথে, এ পাশে ওপাশে ছায়াচ্ছন্ন বাড়িগুলিতে শুধু নিরাপদ ঘুম, ঘুম, কী আশ্চর্য শান্তি ওদের জন্য। কয়েকটা ঘেয়ো-কুকুর খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল, একটা কুকুর হাইড্রেন্টের পাশে আবর্জনার মধ্যে কী শুঁকছে, একটা কুকুর উঠে এসে ঝুনুর গা ঘেঁসে দাঁড়াল। ঘেন্নায় অথবা ভয়ে ঝুনু একলাফে মা-র কাছে ছুটে এল। একটা ঢিল খুঁজে পল্টন হাতে তুলে নিতেই মা বাধা দিলেন—'থাক'। ঢিল ছুঁড়লেই ওরা চিৎকার করবে একসঙ্গে এতগুলি কুকুর, ওদের হল্লায় সাড়া দিয়ে দূরে মোড়ের দিকে কুকুরগুলি ডেকে উঠবে, তারপর দূর থেকে, দূরে, চারদিক থেকে রাত দুপুরের নিশুতি ভেঙে সারা শহর জুড়ে কুকুরেরা চিৎকার করবে। এখন এই রুদ্ধশ্বাস ভয় ভয় নীরবতার যে কোন শব্দেই বুক কাঁপে। রাত গভীর হলে, এ শহর কুকুরদের, সারা রাত ধরে শুধু ওরা, শুধু ওরাই পথে পথে, মোড়ে মোড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ওরা তিনজন, চৌকাঠে গা এলিয়ে আঁচলে চোখ ঢেকে চুপ করে মা, মায়ের কাছাকাছি একেবারে রাস্তায় ধুলোয় হাঁটু ভেঙে বসে ঝুনু, এবং একেবারে রাস্তার মাঝখানে ষোল বছরের কিশোর পল্টন পায়জামাটা হাত দিয়ে

হাঁটুর উপর টেনে গোটা কলকাতায় পাল-পাল লোভী কুকুরের ছুটোছুটির কথা ভাবে, আর মনে হয়, দু-পাশের শ-এ শ-এ কুকুর ঘেউ ঘেউ করে শহরের ঘুম কাড়ছে আর ওদের দু-পাশে সরিয়ে মৃত নগরীর বড়ো বড়ো রাজপথের ঠিক মাঝখানে, ট্রাম-রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটুর দিকে শাড়ির কুঁচি ডান হাতে মুঠো করে ধরে, শায়া শুদ্ধ গোড়ালির কাপড় একটু তুলে; ব্যাগটাকে বাঁ-হাতের কনুই-এ ঝুলিয়ে, বাঁ-হাতটা বুকে চেপে একা, জনহীন নিঃঝুম রাত্রির বুক ছম ছম ভয় মাড়িয়ে দিদি, চিনু,...চিন্ময়ী...দিদি ঘরে-ফেরার পথে। সকাল নটায় ভাত খেয়ে অপিশে বেরিয়েছেন, সারাদিন ধরে কতো কাজ করছেন দিদি, এখন ক্লান্ত, দূরের টিউবওয়েল থেকে আমরা সবাই মিলে বালতি বালতি জল এনে দেব দিদিকে, স্নানের জল, কী ভীষণ ঠাণ্ডা...দিদির শরীর জুড়োবে। যেন কিসের নেশায় একটু একটু করে, দূরের রাস্তার আলোটাকে নিশানা করে এগিয়ে যাচ্ছে পল্টন, ঝুনু আর মা তাকিয়ে থাকে, বাধা দেয় না, কুকুরগুলি সোরগোল তুলে তেড়ে যায়, পল্টন আমল দেয় না, পায়ে পায়ে হাঁটে, দূরে কর্পোরেশানের আলোটাকে ঠিক সোজাসুজি মাথার উপর রেখে নিজের ছায়াটাকে সারাশরীরে জড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, কুকুরগুলি গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, নিজের ছায়াটাকে আবার সামনের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে এগোতে থাকে পল্টন। দু আলোর মধ্যবর্তী একটুকু অন্ধকার, অন্ধকারটুকু পেরুলেই ছায়াটা পিছনে আছাড় খায়, এক আলো থেকে অন্য আলোয় নিজেরই ছায়াকে রাস্তায় আছড়াতে আছড়াতে পল্টন একেবারে মোড়ের দিকে বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে যায়। সঙ্গে কুকুরগুলি হাঁটে, এই অন্ধকার রাতের শহর এখন ওদের, এখন অনধিকারে মানুষের পথ-চলা।

'মা, পল্টনও কোথায় চলে গেল।' ঝুনু ভয়ে মা-কে জড়িয়ে ধরে।

'যাক—'

'মা,—' ফিসফিস করে ঝুনু—'ঘরে কেউ আর রইল না মা, কে পুরুষ মানুষ।

'ঘরের তিরিশ বছরের আইবুড়ো মেয়েটা রাত দুকুর তক্ বাড়ি ফিরছে আর পুরুষমানুষগুলি বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমোবে! যাক্...'

'কিন্তু মা, পল্টন...এতটুকুন বাচ্চা ছেলে, এত রাতে...'

'যাক, যাক, সব যাক...' অতর্কিতে নড়েচড়ে হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মা একটা দীর্ঘশ্বাস, যেন অনেকক্ষণ ধরে বুকের মধ্যে আটকে ছিল, বেরিয়ে এল

এবং সঙ্গে সঙ্গেই দেয়ালে দেলান-দেওয়া শরীরটা বাঁ-দিকে ঝুঁকিয়ে মেঝেতে বাঁ-হাতের ভর রেখে, ভেঙে ডুকরে উঠলেন, তারপরই রোগা শুকনো শরীরটা চৌকাঠের উপর লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়—'চিনু, চিনু রে, এতগুলো পেটের জোগান দিতে গিয়ে কোন শেয়াল-শকুনে খেলো রে তোকে।'

ঝুনু অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে, মিনু ছুটে আসে। দু-বোন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে চোখ সরিয়ে নেয়। পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে লুটোচ্ছেন মা। মা-র পা দুটো চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায়, শরীরটা মাথাটা ঘরের দিকে। ওরা ঝুঁকে পড়ে মা-কে ডাকল। কান্না থেমে গেছে। মা-র ঠোঁট ফাঁক করে দাঁতে আঙুল ঠেলল মিনু, হাতের মুঠো পরখ করল। দু-বোন ঠেলে নিয়ে মা-কে আরও একটু ভিতরের দিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল। জল আনল, হাতপাখা।

'মেজদি!' ঝুনুর গলায় কান্না—'আমার ভয় করছে।'

মিনু সাড়া দিল না। জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগল মা-র চোখে। জলে জলে ভিজিয়ে দিল মা-কে। মা-র কাচা-পাকা চুলের সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লেপ্‌টে যাচ্ছে জলে। চোয়াল-ভাঙা শুকনো মা-র কঙ্কাল মুখটায় স্বাস্থ্যবতী দিদির আদল।

'দরজাটা বন্ধ করে দেব মেজদি?'

'আরও জোরে হাওয়া কর।'

ঝুনুর হাত নড়ে না। কাঁপে। এতরাতে, রাত কতো এখন কে জানে, একটা…দেড়টা…দুটো…বাইরের রাস্তাটায় এখন কী ভীষণ ভয়! আরও গুটি-সুটি মেরে আঁচলে মুখ চেপে বসে থাকে ঝুনু। কেমন কান্না পাচ্ছে, পেটে মোচড় লাগছে। দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভেজানো দরজাটায় যদি এক্ষুনি কেউ ধাক্কা দেয়, দড়াম করে দরজা খুলে যদি কেউ ঢুকে পড়ে…বুকটা স্যাঁৎ করে ওঠে। আর যদি, আর যদি দিদিই…দিদিই ঢুকে পড়ে হঠাৎ। দিদি! শিউরে ওঠে বুকটা! এতক্ষণ কোথায় ছিলি দিদি…কি ভীষণ সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে দিদি…তুই…দিদি…মা-কে দেখে দিদি থমকে দাঁড়াবে…আমরা সবাই মিলে ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছি তোর জন্যে, শুধু তোর জন্যে…দিদি…হঠাৎ, একে-বারে অতর্কিতে হাত থেকে পাখাটা খসে পড়ে, হাঁটু ভেঙে উপুড় হয়ে মাথাটা মেঝেতে ঠুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে থাকে। এবং মিনু অসহায়-ভাবে চারদিকে তাকিয়ে, ভেজানো দরজা, দরজার উপরে বাড়িওয়ালার গণেশ-

মূর্তি, সরু প্যাসেজের দু-পাশে স্যাতসেঁতে দেয়াল, উপরে কড়ি বরগা, রাশি রাশি ঝুল, ঝোলানো হলদে-বালবের ম্যাট্‌মেটে আলো আর সামনে ধুলোয় লুটোনো মায়ের শরীর, এক পলকে বড়ো খারাপ ছবি মনে হয়, যেন ঘর থেকে মা-কে বাইরে আনা হয়েছে, নিঃস্পন্দ শরীর চিৎ হয়ে পড়ে আছে, ঝুনু ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, ওর খোলা এলোচুল মুখের পাশে ঝুলে পড়েছে, পিঠটা থরথর করে কাঁপছে। নিজেকে অসহায়, বড়ো বিপন্ন মনে হলো, এতোবড়ো বিপদের মুখে এখন সে একা, একা দাঁড়িয়ে এই মরা-মানুষের ঘর সামলাতে হবে। নিজেদের খেয়ালে, ভীরুতায়, কাজে বা অকাজে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক দিদি, দিদির মতো। ছোট ছোট ভাই-বোন আর মা-বাবাকে নিয়ে এতো বড়ো সংসার-টাকে দিদি যেমন ঝড়ের মুখে একা রুখে যাচ্ছে। আপিশ, ট্যুশানির শেষে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দিদি যখন তিরিক্ষি হয়ে থাকে, তখন অপরাধী মনে হয় নিজেদের। দিদিকে খুশি করতে মা বাবাকে সারাক্ষণ ভাত গেলার খোঁটা দেন আর পেনশানের সামান্য টাকা-কটায় বাড়ি-ভাড়া চুকিয়ে সারামাস মাথা নুইয়ে সময় কাটান বাবা, আপিশ থেকে ঘরে ফিরলে বড়ো মেয়ের ছাড়া শাড়ি-ব্লাউজ ভাঁজ করে গোছাতে গিয়ে অকারণে ধমক খান। অনেক রাতে ক্লান্ত হয়ে, সারারাত ঘুমোতে না পেরে, শুধু ছট্‌ফট্‌ করে, ঘুমন্ত ভেবে পাশ থেকে ছোটবোনের হাতটা বুকে টেনে নিয়ে···বড়ো উত্তাপ, বড়ো জ্বালা তোর দিদি। সকালে চোখে চোখ রাখতে লজ্জা। আর একটা বছর দিদি, বি-এ-টা পাশ করে নিই, তোকে মুক্তি দেব, এর মধ্যে দাদা যদি একটা চাকরি খুঁজে নিতে পারে! মিনু নিজেও এবার নিজের উপর অধিকার হারায়, ভিতর থেকে একটা কান্নার চাপ চাগিয়ে উঠতে চায়। দুর্বৃত্তরা নারী-মাংসের ব্যবসা লোটে···হাওড়া ষ্টেশনে বাক্‌শোর ভিতর টুকরো টুকরো যুবতীর দেহ...পুকুরের জলে ভাসমান রমণীর শব···রগরগে দু-চোখের পাশে শিরায় শিরায় টান ধরে, খবরের কাগজে রোমহর্ষক সব কাহিনী মা-গো। মিনু মায়ের মজা বুকটায় কাপড় টেনে দেয়, ভেজা চুলে হাত বুলিয়ে আদর করে। হাত শিথিল হয়ে আসে, এক ঝটকায় মাথা তোলে ঝুনু, কান্নায় কান্নায় কী বীভৎস ওর মুখ, ভয়ে সিঁধিয়ে গেছে ভিতরে। দু-বোন চোখে চোখে তাকায়, নিঃশব্দে, কান পাতে, এখন নিঃশ্বাসেরও শব্দ শোনা যায়, দরজাটার ও পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয়, দু বোন রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাকিয়ে থাকে, মধ্যরাত্রির ঘুমন্ত শহরের থম্‌থমে স্তব্ধতা কাঁপিয়ে ফেরিওয়ালার মতো সুরে কারা যেন হরিধ্বনি হাঁকে। শিউরে ওঠে মিনু, সারা শরীরে ঘাম জমে, শিরশির শিরশির করে গায়ে কাঁটা দেয়।

'মেজদি—' প্রায় শোনা-যায়-না ঝুনুর চাপা গলা।

'তুই ঘরে যা—'

'তুই!'

'মা-কে ধরে আছি, তুই যা, মন্টু একা শুয়ে আছে, ভয় পাবে।'

ঝুনু সত্যি চলে যায়। ছোট বোনকে স্বার্থপর মনে হয় না মিনুর। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে সবাই, বুকের মধ্যে যন্ত্রণা নিয়ে আর সইতে চাইছে না কেউ, এড়িয়ে যাচ্ছে, পালিয়ে বাঁচছে। তোর পরেই আমি দিদি, তোর মতোই আমি একা, একা আমি কী করব! মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা মা-কে জড়িয়ে হু-হু করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে, সারা শরীরে প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে ঠেলে উঠছেন মা, নাকে-মুখে প্রেশার-কুকারের ঠেলে-ওঠা বাষ্পের মতো দীর্ঘশ্বাস, মুখে গ্যাঁজলা উঠছে। আবার জলের ঝাপটা দেয় মিনু, মা-র ঠোঁট খুলে আঙুল দিয়ে দাঁত দেখে, হাতের মুঠো খুলে হাত বুলোয়। ভেজানো দরজাটা কাঁপছে, তাকায় তাকিয়ে থাকে। বাতাস! সান্ত্বনা খোঁজে. সাহস। আবার হরিধ্বনি, রাত কাঁপিয়ে কারা যায়। কুকুরগুলি চিৎকার ক'রে ছুটছে, খই ছড়ানো পথে ওরা মানুষের গন্ধ পাচ্ছে। ভয়ে সিঁধিয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে মা-কে জড়িয়ে ধরে। হরি হরি বোল·· নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, মায়ের মজা-বুকে মুখ লুকোয় মিনু—হরি বোল...কোথায় একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে, মাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে মিনু, তিন-সত্যি দিও না মাগো। মা.. এখন বিশ্বাস রাখো, তুমিই বলেছিলে বরিশালের গ্রামে ঘরের দোতালায় বসে মাঝরাত্তিরে কাল-পেঁচা ডেকেছিল, অমঙ্গল, ঠাকুরমা মারা গেলেন, কলকাতায় আর কাল-পেঁচা নেই, লক্ষ্মী-পেঁচাও না। এখানে তবু ভয়! ভয়ে বুক কাঁপে সারাক্ষণ। তবু অমঙ্গল,—

মিনু মাথা তোলে, উৎকর্ণ হয়, দাঁতে ঠোঁট চেপে শক্ত হয়ে কান পেতে থাকে। ও-দিকে রাস্তার মোড়ে যেন একটা গাড়ি থামার শব্দ! ঠিক শুনলাম তো! কেমন সংশয়। ট্যাক্সি! মোটর! দিদি! বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। বাইরে ছুটে গিয়ে দেখার সাহস নেই, মায়ের শরীর আগলে বসে থাকতেও ভয়। চোখ বুঁজে, দম বন্ধ করে প্রতীক্ষা করে। ওই মোড় থেকে বাড়ির দরজা। কতোটুকু! কতোক্ষণ! কয়েকটা ভারি জুতার শব্দ, এ-দিকেই আসছে! বুকটা সাৎ করে ওঠে, ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ায় মিনু, বুকের কাপড়ে টান লাগে, মা শুয়ে আছেন আঁচলের উপর। হ্যাঁচকা টানে শাড়িতে বুক ঢাকে। এখনও চোখ খোলো মা, কান্না আসছে, আমি তোমার আরেক কুমারী মেয়ে! মা গো—

ইচ্ছা করে মা-কে একা রেখেই ঝুনুর মতোই পালিয়ে বাঁচে। শান-বাঁধানো রাস্তা কাঁপিয়ে জুতোর শব্দ আসছে, এ-রাতে এ-বাড়ি ছাড়া আর কোথাও কোন ঘটনা নেই। গলা শুকিয়ে আসে, তেষ্টা, দু হাতের মুঠো মুখে তুলে আঙুল কামড়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে। গোটা পাড়ার-লোক জাগিয়ে দিয়ে নিজে বাঁচুক। মিনু চোখ বুঁজে অনেকক্ষণ ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে, শুধু সময় গোনে এবং যেন অবধারিতভাবেই দরজার কড়াটা খুব আলতোভাবে বেজে ওঠে। এত মৃদু, তবু তীব্রভাবে কানে এসে বিঁধছে। কয়েক হাত দূরে অথচ এগিয়ে গিয়ে সাপের ঝুপরির ডালা খুলতে ভয়। 'কে ?—নিজের কানেই ফ্যাসফেসে গলার স্বরটা কেমন অদ্ভুত শোনায়, যেন কণ্ঠনালীতে আটকে আছে কি !

আবার কড়া নড়ে—'কে আছেন, দরজা খুলুন।'

মিনু স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বুকে সাহস জোগায়।

'দরজা খুলুন, আমরা থানা থেকে আসছি।'

থানা ! পায়ের পাতা থেকে তরতর একটা শিহরণ সারা শরীরে খেলে যায়। থানা কেন ? একলাফে ছুটতে গিয়ে হোঁচট খায়, মূর্ছিত মায়ের কোমরে লাথি লাগে, প্রণামের জন্য হাত বাড়িয়েও থমকে যায়, ঘুমন্ত মানুষকে প্রণাম করতে নেই। ভেজানো দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখে নেয়, বাইরে সত্যি দু-জন পুলিশ অফিসার। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে নিজেকে পিছন-পিঠ করে অসম্বৃত মাকে ঢাকে—'আপনারা ! আপনারা কেন ?'

'এটা উনচল্লিশের বি, মিস চিন্ময়ী সেনগুপ্তর বাড়ি !'

'হ্যাঁ, দিদি কোথায় ?'

'তার বাবার নাম শ্রীঋষিকেশ সেনগুপ্ত ?'

'হ্যাঁ,

তাঁকে ডাকুন, কথা আছে।'

তিনি বাইরে গেছেন, দিদিকে খুঁজতে।'

'কোথায় ?'

'জানিনা।' মিনু হাঁপাতে থাকে।

'বাড়িতে আর কোন ব্যাটাছেলে !'

'দাদা থানায়।'

'জানি, সেখান থেকে তাকে আমরাই পাঠিয়েছি !'

'কোথায় ?'

'সে কথা থাক,—' ওরা নিজেদের মধ্যে কীসের ইঙ্গিত জানাল—'আপনার দাদা রাত দশটায় ডায়েরি করার পর থেকে এখন পর্যন্ত আপনার দিদিকে ট্রেস আউট করতে পারি নি। সম্ভবও নয়।'

'সম্ভব নয় !'

'এই রাতের অন্ধকারে এত বড়ো শহরে, সত্তর লক্ষ মানুষের মধ্যে যদি একটা মেয়েছেলে হারিয়ে যায়, বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই ফিরবেন। নইলে...'

'বলুন—'

'নইলে তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পেয়ে তদন্ত শুরু করব—'অফিসার বগলের ব্যাটনটা হাতে তুলে নিয়ে নিস্পৃহ-ভঙ্গিতেই বলতে লাগলেন—'শুনুন, যা বলতে এসেছি। খোঁজ খবর নিয়ে এখন পর্যন্ত যা জেনেছি, হাসপাতাল বা পুলিশ-সোর্সে আইডেন্টিফায়েড অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ রিপোর্টের মধ্যে ও-নামে কেউ নেই, কিডন্যাপ্‌ড আর ইল্‌লিসিট কানেকশানের জন্য আজ ভদ্রঘরের যে-কজন মেয়েছেলের নাম রেকর্ডেড হয়েছে, লালবাজার থেকে খবর এসেছে তাতেও আপনার দিদি নেই। তবে এইমাত্র হেড-কোয়ার্টার্স থেকে টেলিফোনে একটা নতুন কেসের খবর পেয়েছি তার জন্যই কিছু ইনফরমেশন চাই।'

'নতুন কেস্‌! কী কেস্‌! দরজার ফাঁক থেকে এক ঝামটায় বেরিয়ে আসে মিনু—'বলুন—'

ওদের একজন বুক পকেট থেকে ছোট একটা নোটবুক বের করলেন। রাস্তার ম্লান আলোয় কিছু লিখবেন বলে কলমও খুললেন—'আচ্ছা, মিস সেনগুপ্ত, আপনার দিদি আজ কী পরে অফিসে গেছেন। শাড়ীর রং, ব্লাউজ অ্যাণ্ড আদার ডিটেল্‌স্‌...'

মিনু ভাবতে চেষ্টা করে। কপালে উপচে পড়া এলোমেলো চুলগুলি দুহাতে ঘসে পিছনে টেনে নেয়। কিছুই মনে নেই, রোজকার মতো এতো সামান্য ঘটনা। দিদির শাড়িগুলি ভাবতে চেষ্টা করে। তা ছাড়া দিদির শাড়ি বলতে কী-ই বা বোঝায় ? তিন বোনই তো তিন বোনের শাড়ি-ব্লাউজ-শায়া পরে আপিসে কলেজে যায় আসে।

'কী হলো—'অফিসার হাসলেন—'মনে পড়ছে না তো !'

'না, ঠিক...আচ্ছা, দাঁড়ান, ছোটবোন আছে, ওকে জিজ্ঞেস করলে...'

'লিভ্‌ ইট্‌, ওয়েল মিস সেনগুপ্ত, আপনার দাদা তার ডায়েরির স্টেট্‌মেন্টে

ভদ্রমহিলার কোন আইডেন্টিফাইং-মার্ক বলতে পারেন নি। কিন্তু আপনি কী জানেন ঠিক এখানে, এই জায়গাটায়—'অফিসার তার নিজের ডানদিকের উরু দেখালেন—'কোন বড়ো রকমের আঁচিল আছে কী ?'

'ঠিক জানি না তো, বাবা বলতে পারবেন, মা—'মিনু মৃতবৎ মায়ের কথা ভাবল। দরজার ফাঁকটুকু একেবারে পুরোপুরি বন্ধ করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল 'মা সেই তখন থেকে সেন্‌স্‌লেস্‌—'

'চিন্ময়ী দেবীর সব প্রাইভেট খবর, এক্‌স্‌ক্লুসিভ্‌লি পার্সোনাল অ্যাফেয়ার্স আপনাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি জানে।'

'দিদির পরে দাদা, তারপরে আমি। দিদি চাপা মেয়ে তবু যেটুকু বলেন, আমাকেই বলেন।'

'আজ অফিসের ছুটির পর ক্যানিং-ডায়মণ্ডহারবার লাইনে কোথাও কী যাবার কথা ছিল ?'

'কই, জানি না তো' !

'পরেশ বসু বলে কাউকে জানেন ?'

'না।'

'কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার দিদির কোন প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্স !'

'কই, শুনি নি তো কখনও।'

'কিছুই তো জানেন না দেখছি—' অফিসাররা হাসলেন। নোটবুকটা নিষ্প্রয়োজন বলে পকেটে গুজলেন।

মিনু ওদের লম্বা চওড়া বিরাট শরীর, চওড়া বেল্ট, কাঁধের ইন্‌শিগনিয়া, কোমরের পিস্তল, মাথার টুপি, সর্বাঙ্গে চোখ বুলোয়। প্রায় স্বপ্নের মধ্যে বলে ওঠে— 'একজন ছিলেন।'

'কে ?'

'কিন্তু সে তো অনেক আগে। দিদি তখন কলেজের ছাত্রী—'

'কী নাম ?'

'সোমনাথ চাটার্জী।'

'কোথায় তিনি ?'

'কী এক ছাত্র-আন্দোলনের সময়ে আপনাদের…মানে পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন। দিদি লুকিয়ে কেঁদেছিলেন। দিদি বলেন, তাঁর জন্তেই আজও এ-ভাবে লড়তে পারে।

অফিসাররা যেন অকারণেই ভারি-জুতোর গোড়ালী ঠুকলেন রাস্তায়। থম-থমে চারিদিকে প্রতিধ্বনি উঠল। পরমুহূর্তেই মুখোমুখি তাকালেন—'আপনার দাদা গেছেন মর্গে—'

'মর্গে! কেন?'

'আন আইডেন্টিফায়েড ডেড্ বডির মধ্যে যদি কারও মুখ...' অফিসার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে ফিরলেন—'এইমাত্র হেড-কোয়ার্টার্স থেকে টেলিফোনে খবর পেলাম।

দেয়ালে শরীর এলিয়ে ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে মিনু। যেন দূরে কোথাও গ্রামোফোনের ডিস্কে অথবা রেডিওতে একটা রোমাঞ্চকর নাটকের সংলাপ— 'ক্যানিং-এর একটা লোকাল ট্রেনে সন্ধ্যে আটটা নাগাদ হঠাৎ সোনারপুরের কাছে রানিং ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে-ছিলেন একজন মহিলা। এখন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হস্‌পিটালে, এমার্জেন্সি ওআর্ড, বেড নম্বর ফিফটি ফোর। প্রফিউজড ব্লিডিং, কন্‌ডিশান সিরিয়াস। ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটা কালো লেডিজ-ব্যাগ ছিল, কোণে ছোট্ট স্টিলের ব্যালেরিনা—'

আর্তনাদ করে নিজের চুড়ি-শুদ্ধ হাত কামড়ে ধরে মিনু।

'ডোণ্ট্ গেট্ নার্ভাস্। ও রকম কয়েক হাজার ব্যাগ প্রতিদিন বিক্রি হয় কলকাতায়। সবুজ পাড় সাদা তাঁতের শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, হাতে দু-গাছা সোনার চুড়ি— ছোট একটা ফুল আঁকা রুমাল, এককোণে ইংরেজিতে 'সি' লেখা। কান্নার হিক্কায় থরথর থরথর শরীর কাঁপে। দু হাতে মুখ ঢেকে ঝুঁকে পড়ে মিনু।

'আর একটা চিঠি ছিল; নিজের নাম ঠিকানা কিছু নেই। পরেশ বসুকে লেখা—হু ডেজার্টেড হার অ্যাণ্ড সি ওঅজ প্রেগনেণ্ট, অব কোর্স ইন্ ভেরি আর্লি-স্টেজ নাউ—'

শরীরে-মনে প্রায় সর্বস্বান্ত মিনু হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠে। মাথা তুলে তাকায়। অফিসাররা নিজেদের কর্তব্য শেষ করে 'যেন কিছুই নয়'-গোছের ভাব দেখিয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা দূরে গিয়ে সিগারেট ধরাল, পিছনের দিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগল, এ-পাশ ও-পাশ গোটা রাস্তা জুড়ে ওদের বিশাল ছায়াদুটো নির্জন রাস্তায় তোল-পাড় করছে। গলির মোড়ে কালো গাড়িটা কী বীভৎস। আঁচলে মুখ ঢেকে মিনু তাকিয়ে থাকে। গির্জার ঘণ্টার মতো চারিদিকে কোথায় যেন সমস্বরে ঘড়িগুলি বেজে ওঠে—রাত দুটো। এতরাতে গেরস্ত ঘরের

মেয়ে ফিরে না এলে সে মর্গে ঘুমোয়, নয়তো হাসপাতালে অক্সিজেন টানে নয় তো···আর ভাবতে পারে না মিনু। এত বড়ো কলকাতা শহর, সত্তর লক্ষ মানুষের মধ্যে কোথায় যেন অন্ধকারে খুনীরা সব লুকিয়ে আছে। দিদি, শেষে তুই, তুই-ও বাঁচার নেশা ছাড়তে পারলি না! আমি যে তোকে সত্যি ভালবাসতাম! তোর জন্যে কতোরাত আড়ালে কেঁদেছি। শেষে তুই! চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসছে সব। নিঃঝুম রাস্তা, রাস্তার আলো, থম্‌থমে বাড়িগুলি। গোটা কলকাতা শহরটাই এখন অন্ধকারের তলায় অসাড় হয়ে পড়ে আছে, আর রাস্তার আলোগুলি খুনীর চোখের মতো জ্বলছে। এরই মধ্যে জীবিত অথবা মৃত, দিদি কোথাও আছে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল! বেড নম্বর! মনে করতে চেষ্টা করল মিনু, ফিফটি ফোর। এমার্জেন্সি ওয়ার্ড। হঠাৎ যেন চোখের সামনে জ্যান্ত একটা মুখ। দিদি তুই! কিছুতেই ঠিক বিশ্বাস হয় না, যেন আরও অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি নিষ্পাপ মনে হয়, অসম্ভব! এই এত বড়ো কলকাতা শহরে সত্তর লক্ষ মানুষের মধ্যে তোর মতো, আমার মতো, হাজার হাজার মেয়েই তো আমরা সবাই একরকম দিদি। কয়েক লক্ষ কালো ব্যাগ আছে বাঙলাদেশের মেয়েদের হাতে, লক্ষ লক্ষ ব্যাগের কোণে স্টিলের ব্যালেরিনা, সবুজ পাড় শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, লক্ষ লক্ষ, লক্ষ লক্ষ মেয়ের নামের আদ্যাক্ষর ইংরেজির 'সি' দিয়ে শুরু, তাদের মধ্যে হাজার হাজার মেয়ে রুমালে ফুল এঁকেছে, নাম লিখেছে তোর মতো, আর-সংশয় জাগে, দ্বিধা—তবু বিশ্বাস হারাতে কষ্ট হয়, হাজার হাজার মেয়ের শরীরে সঙ্গোপনে লুকোন জন্মের দাগ, ঠিক তোর মতো। আমরা কেউ-ই তো একজন অন্যজনের মতো নই দিদি। তবু একজনের নামে অন্যজন সাড়া দিয়ে উঠি, একজনকে অন্যজনের মতো মনে হয়। কালো ব্যাগ, ব্যালেরিনা, রুমাল, সবুজ পাড় শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, এমন কি জন্মের আঁচিল মিলিয়েও ঠিক অন্য কোন মেয়ে! ঠিক জ্যামিতির উপপাদ্যের মতো সব শর্ত মিলিয়ে দুটো ত্রিভুজ যেমন সর্বাংশে সমান সমান হয়ে ওঠে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হস্‌পিটাল এমার্জেন্সি ওঅর্ড, বেড নম্বর ফিফটি ফোর— কার মুখ? না, দিদি নয়; অসম্ভব। অমনভাবে দেউলে হবার আগে দিদি—না, কী-ই বা করতে পারত ও। কেমন যেন খটকা লাগে, দিদির চেহারাটা সামনে ভাসে, কিছুদিন ধরে কেমন যেন বড়ো বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছিল, বড়ো বেশি

গম্ভীর, কিসের একটা ভয়। আপিসের খাটুনি, র‍্যাশানালাইজেশন! অটো-মেশনের খাঁড়া! জোট বাঁধছে য়ুনিঅন, আসন্ন ধর্মঘট, মিছিল মিটিং অভিযান! মিথ্যে কথা, সব মিথ্যেকথা! দিদি তুই! ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ—

মিনু হঠাৎ নড়ে ওঠে। গলির মোড়ে আবার কিছু মানুষের শব্দ; এক-দল মানুষ। আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ রগড়ে নিয়ে আরও নিবিষ্ট চোখে দেখে—বাবা, দাদা, পল্টন, পল্টনের কাঁধে মন্টু। মন্টু নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বুকে সাহস বাড়ে, শক্ত হতে চেষ্টা করে মিনু। ঘরের মানুষগুলি ফিরেছে, দিদিকে বাদ দিয়েই এখন সংসার। ভাবতেও কেমন যেন ধক করে ওঠে বুকটা। এত অনায়াসে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় একটা মানুষকে! অথচ যাকে বাদ দিলে, আজ, পুরো সংসারটাই যেখানে বাতিল হয়ে যায়। মস্তো একটা অভিশপ্ত নগরীর মাত্র কয়েকজন জীবন্ত জেগে-থাকা মানুষ জনহীন রাস্তার নীরবতা ভেঙ্গে অত্যন্ত আস্তে আস্তে পা গুণে গুণে, মাথা নুইয়ে এগিয়ে আসছে। শ্মশান যাত্রীর ঘরে-ফেরার মতো, ঘরের কাছে এসে মৃত-আত্মার শোকে বিহ্বল। লোহা আর আগুন রাখতে হয় দরজার গোড়ায়। একে একে সবগুলি ছায়া এসে মিনুর শরীর অন্ধকারে ঢাকল। দরজায় পিঠ দিয়ে স্থির সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিনু। ওরাও নির্বাক থমকে দাঁড়াল। সকলকেই একবার করে ভালো-ভাবে দেখল সবাই। তারপর আবার চুপ করে রইল। মন্টুকে ঘরে শুইয়ে দেবার জন্য দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই চিৎকার করে উঠল পল্টন—'মা—আ—আ—'

সবাই হুমড়ি খেল। তাকাল মিনুর দিকে। এবং স্বগতোক্তির মতোই প্রতিটি শব্দের নিখুঁত উচ্চারণ করে গেল মিনু—'ফিট হয়ে পড়ে আছেন রাত একটা থেকে, একা যতটুকু পেরেছি, করেছি—' কেউ অবাক হলো না। পল্টন পাশ কাটিয়ে চলে গেল। নিতাই অস্থিরভাবে অন্যমনস্ক পায়চারি করতে লাগল দু-চার পা। বাবা স্থবির। সত্যি বীভৎস হয়ে উঠেছে দাদা, যেন সারা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজে ফিরেছে, চোখে-মুখে বিভীষিকা।

'দাদা—'

নিতাই থমকে দাঁড়াল।

'মর্গে গিয়েছিলি?'

নিতাই ছুটে আসে—'তুই জানলি কী করে?'

'পেলি দিদিকে ?'

'না।'

'কী দেখলি ?'

'ওঃ—ফ্'—উত্তেজনায় ক্ষেপে যায় নিতাই। দু-হাতে চুলের মুঠি ধরে চীৎকার করে ওঠে—'সে একটা নরক, নরক, উঃ—'

'ও-ভাবে চেঁচাস নে দাদা। পাড়ার লোকে জেগে উঠলে কেচ্ছা রটবে।'

'কেচ্ছা এখন রটবে না ?'

'ভালোয় ভালোয় ভোর হলে কাল সকালে বলব, দিদি মামা-বাড়ি গেছেন ছুটি নিয়ে। বেড়াতে।'

'তারপর !'

'বলব, সেখান থেকেই বিয়ে হয়ে গেছে। বর ইঞ্জিনিয়ার, ফারাক্কা কি মাইথনে থাকে।'

'তারপর !'

'তারপর আর এ পাড়ায় আমাদের দায় নেই। বাড়ি তো আমাদের ছাড়তেই হবে। এরপর আরও শস্তা কোন ঘর, একঘরে সবাই, বস্তি বা অন্য কোথাও, বাবার ও কটা পেনশনের টাকা, তুই যদি চাকরি না পাস, পড়া ছেড়ে আমাকেও নামতে হবে। সেখানে আমরা দিদিকে ভুলে যাব। দিদি বলে আমাদের কেউ ছিল না। তারপর একদিন রাতে আমিও বেমালুম হাওয়া হয়ে যাব। তোরা নতুন ঘরে যাবি।'

তিনজনই আবার চুপ করে যায়। তিনজনের উপর দিয়ে দ্রুত এবং নিঃশব্দে সময় প্রবাহিত হয়। একইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ মিনু ডাকে—'বাবা।'

বৃদ্ধ ঋষিকেশ ফিরে তাকান।

'এখানে, ঠিক এ রকম কোথাও দিদির কোন আঁচল আছে ?'—মিনু নিজের উরুতেই সেই সম্ভাব্য স্থান নির্দিষ্ট করে—'মনে আছে আপনার ?' বৃদ্ধ বিস্মিত হন, বিস্ময়ে তাকায় নিতাই—'কী সব বলছিস্ তুই ?'

'বলুন না, মনে আছে আপনার ?' মিনু স্বাভাবিক—'দাদা যদি মর্গে দিদির মুখ দেখে আসতে পারত অথবা এখনও যদি আমার প্রশ্নের উত্তরটা পাওয়া যেত, আমরা ঘরে ফিরতে পারতাম।'

নিতাই আবার ক্ষেপে ওঠে—'কী, তুই পাগল হলি নাকি, কী বলছিস সব ?' দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে ঠোক্কর খেয়ে মাও দরজার পাশে এসে দাঁড়ান। রাস্তার আবছা আলোয় মাকে কী কুৎসিত দেখায়। ক্লান্ত-রুগ্ন চোয়াল ভাঙ্গা মুখটায় যেন দীর্ঘ রোগভোগের কাতরতা। সবাই তাকায়, কেউ কুশল প্রশ্ন করে না। শাড়ির ভেজা অাঁচলটা টানতে টানতে শুধু দীর্ঘ বিলম্বিত উচ্চারণে মা প্রশ্ন করেন—'চিনু এলো না ওর কোন খোঁজ পেলি না নেতাই ?'

যেন সাড়া দেবার দায় নেই কারও। চারজনের মাঝখানের শূন্যতায় সংসারের বড়ো মেয়ের, একমাত্র রোজগেরে মেয়ের স্মৃতির শবটাকে ঘিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আর মধ্যরাত্রির নীরবতা চারদিক থেকে ওদের ঘিরে রাখে।

'মা—' মিনু মা-র দিকে তাকায়—'তোমার মনে আছে, এখানে, এই কোমরের কাছে দিদির কোন অাঁচিল আছে ?'

'আঁচিল ! চিনুর !' মা যেন স্মৃতি হাতড়ে খুঁজছেন কিছু। উদাসভাবে অন্ধকারের উর্ধ্বে আলোর চতুষ্কোণের দিকে তাকালেন—'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'বাবা—'

'সে আজ অনেকদিনের কথা মা, কী করে বলব।'

'বাঃ, বেশ তো—' সকলের মধ্যে অন্তত এই প্রথম একজন, মিনু, অনেক কষ্টে হাসতে চেষ্টা করে—'তোমাদের কোলে বড়ো হয়েছি আমরা আর আমাদের বড়ো হয়ে ওঠা, আমাদের শৈশবকে তোমরাও মনে রাখো নি ? তোমাদের সন্তান বলে আমাদের সনাক্ত করতে তোমরাও পারবে না ?'

আবার সেই আশ্চর্য নীরবতার মধ্যে তিনজন ডুবে যায়। আর হাতপাতালের একখানি সাদা বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকা একটি নারীর কথা কল্পনা করে মিনু, যেখানে একটি শিশু অন্ধকার খামচে খামচে জন্মের মধ্যেই তিলে তিলে মরে যায়। এবং আরও একজন লজ্জায়, ঘৃণায়, অন্তর্দাহে শুধু জীবনের মোহে মায়ের মুখ ভাবে। 'বলব না রে দিদি, শুধু নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে তোকে ভদ্রভাবে বাঁচিয়ে রাখব। আন আয়ডেন্টিফায়েড ডেড-বডি বলে মর্গে, অন্ধকারের নরকে পচে গলে শেষ হয়ে

যা তুই, বডি আন্ ক্লেইম্‌ড। আর সকলের মধ্যে সতী হয়ে, লক্ষীমেয়ে হয়ে বেঁচে থাকবি তুই। এক রহস্যময়, রোমাঞ্চকর গল্পের নায়িকা।

'তোর বাপকে ঘরে যেতে বল্ নেতাই। হেঁপো রোগী, ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলে টান বাড়বে—' মা-র জড়ানো কণ্ঠস্বর—'মিনু।'

'হু—'

'ঘরে চল্ মা—'

ওদিকে গলির আড়ালে একটানা ঘস্‌ঘস্ শব্দ। নিতাই উঠে দাঁড়ায়—'আমরাই আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? কর্পোরেশনের ঝাড়ুদাররা বেরিয়ে পড়েছে। রাত ফুরিয়ে এসেছে।'

বাবাকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে টেনে নিয়ে এলো নিতাই, ভিতরে ঢুকতে হোঁচট খেলেন বৃদ্ধ। মা-কে ধরে অন্দরের দিকে ঠেলতেই মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। নিতাই মিনুর দিকে তাকাল। নিঃশব্দে রাস্তা থেকে উপরে উঠে এল মিনু। কলকাতাটা এবার সত্যি সত্যি ঘরের বাইরে চলে গেল। এবং ভিতরে ঢুকে কপাটদুটো সশব্দে টেনে দিয়ে খিলটা ধরে থমকে দাঁড়াল নিতাই—'দরজাটা?'

সবাই চমকে উঠল। পরস্পরের দিকে তাকাল, তাকাল দরজাটার দিকে। কেউ কোন নির্দেশ দিতে পারল না। এবং নিতাই এর খিল তোলার শব্দটা আচমকা তিনজনেরই বুকে ধরাস করে বাজল। আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন মা।

ভিড়ের ট্রেনে থার্ড-ক্লাস কামরার মতো ট্রাঙ্ক-বাক্‌শো তক্তপোষ জামাকাপড় ঠাসাঠাসি একচিলতে ঘর। মেঝেতে বিছানা পাতা হলে দুটো মানুষের বেশি দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। ঝুনু, পল্টন, মন্টু, রাণু এলোপাথারি ঘুমিয়ে পড়েছে মাটিতে, এখানে ওদের নিয়ে মা ঘুমোন, উপরে তক্তপোষে দিদির সঙ্গে মিনু। এবং তক্তপোষের শূন্য শয্যায় মিনু কোন পুরুষমানুষ নয়, দিদির কথা ভেবে বুকের নিঃশ্বাস টানল। দাদা মেঝের বিছানায় হাঁটু ভেঙে, হাঁটুর উপর দু-হাতের আড়াআড়ি ভাঁজ রেখে মাথা গুঁজে বসল চুপচাপ। বাবা নিঃশব্দে তক্তপোষের উপর বসে বালিশে হাত বুলোতে লাগলেন এবং কাঠের পুরনো আলমারিতে ঠেস দিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন মা। বহু বছরের পুরনো ক্যালেণ্ডারের অসংখ্য রঙিন

ছবি, এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে টানা দড়িতে স্তূপীকৃত শাড়ি ধুতি প্যান্ট জামার বোঝা, আলমারির উপরে মন্টুর ঘুড়ি লাটাই, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার বিবর্ণ ফটো, মা-বাবার পুরনো বিয়ের ছবি, খাঁজ কাটা দেয়ালের তাকে মা-র ঠাকুর দেবতা, দেয়ালে কালো কাপড়ে লাল-পদ্ম, সাদা-সুতোর উপরে নিচে মা-র যৌবনের সূচিশিল্প—'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' তার পাশে দিদির কন্‌ভোকেশনের ফটো। মিনু তাকিয়ে থাকে। এর চেয়ে অনেক সুন্দরী দিদি।

'মেয়েটা তাহলে সত্যি এলো না!' বাবা উদাসভাবে সামনের দেয়ালের দিকে তাকালেন—'এখন আমরা কী করব ?'

'এই সংসার!' মা যেন অদূরে তার আরাধ্য দেবতার কাছ থেকে স্থিরদৃষ্টিতে কোন সান্ত্বনা খুঁজছেন।

'আমাদের কী হবে!' একরাশ চুল ঝাঁকিয়ে মাথা তুললেন দাদা। 'আমরা ভেসে যাব, কিন্তু আমাদের চেয়ে আরও ভেসে গেলেন দিদি। তোমরা ওর কথা কোনদিন ভাবলে না। তোমাদের বড়োমেয়ে তোমাদেরই চোখের ওপর বড়ো হয়ে উঠল, তোমরাই বড়ো করে তুললে। আর—'

বৃদ্ধ ঋষিকেশ অসহায়ভাবে তাকালেন। মার কণ্ঠস্বরে দীর্ঘশ্বাসের টান —'আমারও কী সাধ যায় না তোদের ঘর-সংসার গড়ে দিয়ে তোদের হাসিমুখ দেখি। কিন্তু—'

'তোমাদের ওই কিন্তু, গাদা গাদা কিন্তুর চাপে আমরা যে শেষ হয়ে গেলাম মা—'

'না, তুই দেখিস—' মা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আলমারিটা আঁকড়ে ধরলেন—'ঠাকুর যদি ওকে সুস্থশরীরে ফিরিয়ে এনে দেন, এবার ওর জন্যে কথা দিচ্ছি, দেখিস, দেখিস তোরা—'

'না, মিথ্যে কথা, কিছুই করবে না—' মিনু চিৎকার করে ওঠে—' রেশন থেকে বাজার থেকে মন্টু না বলে কুড়ি কি পঁচিশ পয়সা নিলে তুমি ধমকে বলো, চাইলে কী দিতাম না, তাই বলে চুরি করলি কেন ? না মা, চাইলে তুমি দাও না, দিয়েছ কখনও ? একটা সিকি বাঁচাতে চোর বানাও—? ক্রোধে আর উত্তেজনায় ফুঁসছে মিনু—'ধরো, কাল সকালেই যদি খবরের কাগজে ছবি দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে তোমার মেয়ের গল্প ছাপা হয়, নষ্ট মেয়েছেলের

কেচ্ছা, ট্রেনের তলায় কী বাসের তলায় ইজ্জত বাঁচাতে মরেছে চিন্ময়ী সেনগুপ্ত নাম্নী জনৈকা তরুণী—'

'মিনু মেরে ফেলব, মেরেই ফেলব তোকে—' তেড়ে ফুঁসে জানোয়ারের মতো এক ঝটকায় লাফিয়ে ওঠে নিতাই।

'শোক, না? দিদির জন্যে আজ একবারে শোক উথলে উঠছে তোদের না!' মিনুও ঠিক পাল্লা দিয়ে রুখে দাঁড়ায়—'মর্গের অন্ধকারে হঠাৎ মরা মানুষ ঘেঁটে এসে আজ খুব ভাবুক হয়ে গেছিস, না দাদা। আর দিনের পর দিন এই ঘরটায়, এই মর্গে আর নরকটার মধ্যে কুঁড়ে কুঁড়ে এতগুলি মরা-মানুষ যে পচে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কোন হুঁস ছিল না তোর? দিনের পর দিন হিন্দী ফিল্ম, হিন্দী ফিলমের শিস, আর এই সব অসভ্য পোষাক আশাক পরে পাড়ার মোড়ে, রেষ্টুরেণ্টে বন্ধুদের সঙ্গে মস্তানি, দিদি বিরক্ত হয়েছে, যাচ্ছে-তাই বলেছে, সেদিন মেয়েটার জন্যে তোদের এত দরদ কোথায় ছিল রে দাদা, আর, আর—' মিনু এক-নাগাড়ে চিৎকার করে হাঁপাতে থাকে, কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন খাদে নেমে আসে। তোদেরই বা কী বলব বল। আমি, হ্যাঁ আমিও তো দিদিকে শুষে নিয়েছি তোদের মতো। আমরা সবাই, সবাই যেন কেমন স্বার্থপর হয়ে উঠছি, কেউ আর কাউকে ভালোবাসে না, বাসি না,—দোকানী আর খদ্দেরের মতো তাই না মা? কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে সব। বাবা, কিছু বলুন, চুপ করে রইলেন যে, দাদা, কী হলো? চুপসে গেলি যে হঠাৎ, বল—'

আচমকা চমকে উঠল সবাই। মধ্যরাত্রির নিঝুম নৈঃশব্দে কাঁপিয়ে দরজায় কড়া নড়ে উঠল হঠাৎ। এবং ঘরের মানুষগুলি সেই অতর্কিত শব্দের আক্রমণে ভয়ে, বিস্ময়ে আর উৎকণ্ঠায় নিজেদের মধ্যে সিঁধিয়ে স্থিরচিত্রের মতো পাথর হয়ে গেল। প্রত্যেকেই তাকিয়ে রইল শব্দটার দিকে। একটা বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে খুব চাপা-গলায় বলে উঠল নিতাই—'পুলিশ, নির্ঘাৎ পুলিশের লোক।' মিনু মা-র ফ্যাকাসে ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকাল; 'হাসপাতালের লোক। দেখো ঠিক হাসপাতালের লোক। মৃতদেহ সনাক্ত করতে যেতে হবে আমাদের।'

ও দিকে মাঝ-রাতের আর্জেন্ট টেলিগ্রামের পিয়নের মতো গোটা পাড়ার মানুষকে জানান দিয়ে কড়াটা আবার বেজে উঠল, অত্যন্ত কর্কশ, জোরে। একলাফে ছিটকে বেরিয়ে গেল নিতাই। আস্তে আস্তে অত্যন্ত

সন্ত্রস্ত উৎকণ্ঠায় পিছু পিছু এগিয়ে গেলেন মা, বাবা আর মিনু। দরজার ছিট্‌কিনিটা বড়ো শক্ত, খুলতে গায়ের জোর লাগে। উদগ্রীব চোখে নিতাইর দাঁত খিঁচুনির ভঙ্গিটার দিকে চেয়ে থেকে, ভয়ে-ভাবনায় কুঁকড়ে আসা বুকের হৃদপিণ্ডে ধুক্ ধুক্ গুণে এখন মুহূর্তের অপেক্ষা শুধু।

এবং দরজাটা দরাম করে খুলতেই একসঙ্গে চারটে মানুষ, যেন একটা অভাবনীয়, অকল্পনীয় দৃশ্যের ধাক্কায় একবার বুক-চাপা আর্তনাদ করে উঠেই আবার হতবাক বিস্ময়ে সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে ভিতরের তোলপাড় আবেগগুলিকে সংহত করতে ব্যর্থ হয়ে, শুধু যে যার জায়গায় স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভেজিয়ে এবং দরজায় পিঠ দিয়ে চিন্ময়ী সকলের দিকে তাকাল—'এ কী তোরা—তোমরা ঘুমোওনি এখনও। আমি জানতাম, তোমরা ভাববে, সারারাত জেগে থাকবে। কিন্তু কী করব, বলো, আমি--আমিও যে বিচ্ছিরিভাবে আটকে গেলাম। ও কী, তোমরা ও-ভাবে তাকিয়ে আছো কেন? নিতাই, নিতাই কী হলো তোর—'

নিতাই দিদির দিকে তাকিয়ে মর্গের অন্ধকার দেখে, নরকের দুর্গন্ধ।

'মা, কী হলো মা, কথা বলছ না কেন, মা—আ—'

ভেজা আঁচল দাঁতে চেপে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকেন মা। চোয়াল দুটো থরথর করে কাঁপছে। যেন এতদিন বাদে খুঁজে পেলেন; বয়স নামছে মেয়ের শরীরে।

'বাবা—' চিন্ময়ী অস্থির হয়ে ওঠে।

অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকেন বৃদ্ধ ঋষিকেশ—ঈশ্বরের অপার করুণা, সামনের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেলেন যেন।

'দোহাই তোদের, তোরা কথা বল্ মিনু।'

মিনু স্থিরনিবদ্ধ চোখে দিদির সবুজ পাড় শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, হাতের কালো ব্যাগ দেখে।

'কী হলো! আমি কী পাগল হয়ে যাব? তোরা কথা বল মিনু, নিতাই, মা, দোহাই তোমাদের—' চিন্ময়ী ঠিক সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সকলের নির্বাক মূর্তিগুলি নিরীক্ষণ করে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে 'আমি কী খুব ভুল করলাম ফিরে এসে? তোমরা ও-ভাবে তাকিয়ে আছো কেন মা। সন্দেহ করছ? বলো, স্পষ্ট বলো।'

চিন্ময়ী ছুটে ঘরে আসে। মেঝেতে লুটোন বিছানায় ঘুমন্ত ভাইবোনের

দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে থেকে হাতের ব্যাগটা তক্তাপোষের দিকে ছুঁড়ে মারে। পিছনে সবাই এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। মিনু এগিয়ে গিয়ে কালো ব্যাগের কোণে ছোট ব্যালেরিনা খুঁজে পায়, ব্যাগের ভিতরে কয়েকটা ভাঁজ করা টাকা, কিছু খুচরো পয়সা, একটা রুমাল—ফুল আঁকা, কোণে ইংরেজি অক্ষরে 'সি'। মিনু বিস্ময়ে দিদির দিকে তাকায়।

চিন্ময়ী মার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়—'কী হলো মা, তোমরা কৈফিয়ৎ চাইছ না? আমাকে ধমকাতে পারছ না মা? তোমাদের মেয়ে, তিরিশ উনত্রিশ বছরের একটা মেয়ে রাত ভোর করে সাড়ে তিনটেয় একা একা বাড়ি ফিরল আর তোমরা তাকে শাসন করতে পারছ না? বাবা, আপনিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন শুধু, আমাকে বলতে পারছেন না কিছু—' কতোগুলি নির্জীব জড় শক্তিকে নাড়া দিতে গিয়ে নিজেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। হাঁপিয়ে ওঠে— বিশ্বাস করো মা, বিশ্বাস করো, নিজের মেয়েকে সন্দেহ করো না। সুমিতা ব্যানার্জি আমার বন্ধু মা, একই সঙ্গে কাজ করি, একই সেকশানে পাশাপাশি টেবিলে,— চিন্ময়ীর একবার মনে হলো, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে নিজেই নিজের কৈফিয়ৎ দেয়…মেয়েটা ভীষণ রোগা মা। অ্যানিমিয়ায় হলদে হয়ে গেছে, লো-প্রেসার। হঠাৎ ছুটির পর সেনস্‌লেস হয়ে পড়ে যায়। ওর স্বামী এসে নার্সিং-হোমে নিয়ে যান। ওদের আর কেউ নেই এখানে। সারারাত জেগে ওর পাশে বসে কাটাতে হলো। ওর স্বামী বিভূতিবাবু ট্যাক্‌সি করে, নিজে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সামনে বোবা মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় কী রকম অস্থির হয়ে ওঠে চিন্ময়ী। রাতদুপুরের এই অদ্ভুত আশ্চর্য ঘরটায় নিজের গলার স্বরেই কেমন চমকে উঠতে হয়, নিজেকে বোকা-বোকা লাগে। আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে, চিন্ময়ী কঠিন হয়ে ওঠে। মার কোটরে লুকোন কুৎকুতে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে বলে—তা-হলে সত্যি কথাই বলব তোমাদের। আপিশে চাকরি করতে হলে তোমার মতো সতী থাকা যায় না মা। হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম, আমাদের সেকশানের পার্সো'না-নেল অফিসার মিঃ বাসুর সঙ্গে আমি ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের একটা হোটেলে এত-ক্ষণ কাটিয়েছি। প্রায়ই যাই, যেতে হয়। নইলে চাকরি থাকবে না, তোমরা খাবে কী? আজই একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। মিঃ বাসু নিজে গাড়ি করে মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।—কিন্তু অসহ্য! মানুষ কথা না

বলে বোবা হয়ে থাকলে স্তব্ধতা যে এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, কোনদিন ভাবে নি। ইচ্ছে করে, চারদিকে এলোপাথারি বালিশ তোষক বিছানা ট্রাঙ্ক বাক্স জামা কাপড় ফটো ক্যালেণ্ডার যেখানে যা আছে, সব কিছু ভেঙেচুরে দুমড়ে, উল্টে-পাল্টে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তবু মাহুষগুলি একবার অন্তত হৈ-চৈ করে উঠুক। নিতাই-মিনুর দিকে মুখ ফেরাল চিন্ময়ী। ওরাও হা হয়ে আছে। তোরা, তোরাও অবিশ্বাস করছিস্। অল্প বয়স তোদের, অন্তত তোরাও তো এটুকু ভাবতে পারিস, বেঁচে থাকার জন্যে সারাদিনের কাজের পরও মানুষকে কতোভাবে লড়তে হয়। ইউ-নিয়নের মেমোরেণ্ডামের উত্তর দেবার শেষদিন ছিল আজ। ওরা ডেস-পারেট্, কোন কথাই বলতে চায় না। মিঃ পি. বাসু ইতর লোকটা, সেক্রেটারীকে বলে বসল—'ডার্টি রেড সোয়াইন।' আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘেরাও শুরু হয়ে গেল। ওদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। এখনও সবাই বসে আছে, সারারাত থাকবে। কর্তারা কেউ বেরোতে পারছে না। শেষে ইউনিয়নের নেতারা আমাদের. মেয়েদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। সুবিনয়বাবু, পার্চেশ-সেকশানের বুড়ো ক্লার্ক, বড়ো ভালো মানুষ, আমাকে ট্যাক্সি করে মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।—চার-দিকের কতোগুলি অদ্ভুত বোবা স্থিরমূর্তির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ঘুমন্ত শহরটার এই বিপুল নৈঃশব্দ্যের যে কোথায় একটা একটানা ধ্বনি আছে, তারদিকে কান পেতে ক্লান্ত হয়ে, চিন্ময়ী ওর শেষ চেষ্টায় ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ মিনুর দিকে এগোল, নিজের ছায়ায় এই শক্ত দেয়ালগুলি অন্তত কাঁপুক। মিনু দু হাত বাড়িয়ে দিদিকে ভালোবাসায় জড়াল—'তুই পরেশ বসু বলে কাউকে চিনিস দিদি।'

চিন্ময়ী চমকে ওঠে—'তুই ওকে চিনলি কী করে? একটা ইতর, একটা জানোয়ার...'

'জানি, খুব নোংরা—তোকে কখনও কিছু বলেনি লোকটা?'

'আমাকে! না...' চিন্ময়ী হাসল—'মেয়েদের প্রতি মানুষটা অসাধারণ ভদ্রলোক। হলে হবে কী, একটা অভদ্র, ইতর। ইউনিয়নের মেমোরেণ্ডামে ওর বিরুদ্ধে পাঁচটা অভিযোগ। কিন্তু তুই! তুই অতোসব জানলি কী করে? তোকে ওর কথা বলেছি কখনও?'

'না—'এক ঝমটায় মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের দিকের অবাধ্য চুলগুলি পিছনে টেনে নিয়ে মিনু দিদিকে টানল—'দিদি শোন…'

একেবারে কলতলার অন্ধকারে টেনে নিয়ে দিদিকে আরও নিবিড় করে বাঁধল মিনু। সেই আঁচিলের প্রশ্নটা আর করল না। যেন ধরেই নিল—আছে, থাকতেই হবে। দিদি নয় অথচ দিদিরই মতো হুবহু এক, যেন কার্বন-কপি আরেকজন, আরেকটি মেয়ে ঘরে ফেরেনি, ফিরবেও না কোনদিন—অজ্ঞাত যুবতীদেহ, মর্গ, নরক, নরকের অন্ধকার…দিদির কাঁধে থুতনি রেখে, কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্ করে মিনু যেন দুঃস্বপ্নের প্রলাপ বকতে লাগল—'বিশ্বাস করবি না দিদি, একেবারে তোর মতো, তোর সঙ্গে সব মেলে, অবিকল তুই, আরেকটি মেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে রে। সে অনেক কথা, তোকে পরে বলব। একই সঙ্গে বাঁচতে চেয়ে তুই ফিরে এলি, ভাগ্যিস আমাদের। কিন্তু ও আর ফিরবে না রে, ওর ঘরে সারারাত অপেক্ষা করবে সবাই। আর যখন ভোর হবে তখন ও হয়তো মর্গে যাবে, ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকারে…'

বিমূঢ় চিন্ময়ী সেই রাতের সবচেয়ে বড়ো রহস্যটাকে সবিস্ময়ে বুঝতে চেষ্টা করে। আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়াতে চায়—'কী, কী তুই বলছিস্ এসব।' এবং সেই রাতে নিজের দুর্বলতায় তখনই প্রথম কান্নায় ভেঙে পড়ল মিনু। পঞ্চবটীর গণ্ডী ডিঙিয়ে একদিন ওকেও পা ফেলতে হবে।

আচার্য শহীদুল্লাহ

অন্নদাশঙ্কর রায়

শহীদুল্লাহ সাহেবকে আমি প্রথম দেখি প্যারিসে। প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে। আমার তখন তেইশ বছর বয়স। লণ্ডন থেকে প্যারিসে গেছি বেড়াতে। তার আগে সুইটজারল্যাণ্ডে রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি। কিংবা এমনও হতে পারে যে তার পরে সুইটজারল্যাণ্ড ঘুরে আসি। এতকাল পরে স্পষ্ট মনে নেই।

কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে যে হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে একটি ছোটোখাটো মানুষ নিবিষ্ট হয়ে কী যেন পড়ছিলেন। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন আমার প্যারিসের বন্ধু বা বন্ধুরা। তখনি তাঁর বয়স চল্লিশের উপর। আমাদের মতো তিনি ছাত্র-বয়সী নন। কিন্তু ডকটোরেটপ্রার্থী। অধ্যয়নই তাঁর তপ। আমরা তাঁকে আমাদের দলে টেনে নিয়ে যেতে পারিনি। আড্ডায় বা হৈ চৈতে তাঁর রুচি নেই।

তাঁর সঙ্গে একদিন নিভৃতে কথাবার্তা হয়েছিল। তার এক আধ টুকরো মনে আছে। আমি তাঁকে খবর দিই যে স্বরাজ আসন্ন। আর ক'টা বছর সবুর করলে দেখে যেতে পারবেন যে আমরাও ইংরেজ ফরাসীদের মতো স্বাধীন।

তা শুনে শহীদুল্লাহ্ সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করেন, "স্বরাজ তো হবে। তারপর চাষীদের কী হবে? জমিদার থাকবে না উঠে যাবে?"

ওকথা আমি চিন্তা করিনি। কিন্তু শহীদুল্লাহ্ সাহেব তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলেও গ্রাম বাঙলার মানুষ। তাঁর কাছে জমিদার আর চাষীর সম্পর্কটা নিত্য জাগ্রত সত্য।

আমি কী বলেছিলুম মনে পড়ছে না। বোধহয় আশ্বাস দিয়েছিলুম যে স্বরাজটা একবার হাসিল করতে পারলেই বাকী সব আপনি হবে। আর স্বরাজ হাসিল করতে তেমন কিছু কষ্ট হবে না। যদি হিন্দু মুসলমান একবার এক হয়। দিবাস্বপ্ন।

প্যারিসে আমি মাত্র দু'তিনদিনের মোসাফের। তর্কবিতর্ক করতে তো যাইনি। বিশেষত স্বদেশ সম্বন্ধে। বিদেশ দেখতেই তখন আমি মশগুল। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতে পারত রেস্তোরাঁয়। যদি তিনি আর সকলের মতো সেখানে যেতেন। কিন্তু তিনি যেতেন না। দূরে দূরেই থাকতেন। কেবল দেশের খবরের কাগজ পড়ার জন্যে, খবর পাবার জন্যে হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনে যেতেন। পরনে গলা বন্ধ কোট, বেশ মনে আছে। মাথায় বোধ হয় কালো একটা টুপি। ফেজ নয়। আর সব ইউরোপীয়দের মতো। দাড়ি ছিল বইকি। বেশ বর্ধিষ্ণু দাড়ি। সুন্দরভাবে ছাঁটা।

লেখকহিসাবে তখনো আমি অখ্যাত। আর বিদ্বান হিসাবে তিনি সুপরিচিত হলেও আমি তাঁর বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিলুম না। কথাবার্তা ওই জমিদার ও চাষীতেই ক্ষান্ত হয়। তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন চাষীরা কেন জমিদারি ব্যবস্থায় সুখী নয়। তখনি লক্ষ করি যে তাঁর হৃদয় চাষীর জন্যে কাঁদে, তাঁর প্রাণ দেশের মাটির কাছাকাছি। কিন্তু একবারও তিনি এমন ইঙ্গিত দেননি যে চাষীরা মুসলমান বলেই তিনি তাদের জন্যে চিন্তাকুল।

এর বছর পাঁচেক পরে ঢাকায় আবার আলাপ। সেখানে তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙলা বিভাগের রীডার। আর আমি তখন জুডিসিয়াল ট্রেনিংএ নিযুক্ত। একবার তার বাড়ি গেছি দেখা করতে। চারদিকে বইপত্র। একজন মহাপণ্ডিতের উপযুক্ত। ততদিনে তাঁর দাড়িতে পাক ধরেছে। সেই প্রথম তাঁর হাস্যরসের দৃষ্টান্ত দেখি।

জানতুম না যে তাঁর আটটি কি ন'টি সন্তান। তিনিই জানান। "আপনারা বলবেন কেন আমি জন্মশাসন করিনে। কিন্তু কে বলতে পারে যে আমার অষ্টম সন্তানটি রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাশালী হবে না?"

আমি হাসি, তিনিও হাসেন।

শহীদুল্লাহ্ ঢাকাতেই কোনো একবার আমাকে আর একটি কথা বলেছিলেন যেটি আমার মনে বিঁধে আছে। গেছলেন তিনি পুনাতে না কোথায় যেন একটি আরবী ফারসী বা ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিতে। অন্যান্য মুসলিম ডেলিগেটদের সঙ্গে মিলে মিশে তিনি এমন এক অভিজ্ঞতা অনুভব করলেন যা কেবল মুসলমানের সম্ভব। বলতে বলতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ সেই মুহূর্তে তিনি আমার মতো বাঙালি নন, ওঁদের মতো মুসলিম! এই দ্বৈত সত্তা আমার নিজের মধ্যেও কি ছিল না? আমিও কি হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু নই? তা হলেও কেমন বেসুর বাজল। মনে হলো মুসলমানরা আগে মুসলমান, পরে বাঙালি। সে সময় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ নিয়ে হিন্দু মুসলমানে মনোমালিন্য আরম্ভ হয়ে গেছে।

কিন্তু তাঁর অসাধারণ স্বভাষাপ্রীতি তখনি স্পষ্ট ছিল। তাঁর উদারতার পরিচয়ও যথেষ্ট পেয়েছি। একবার তিনি রামমোহন শতবার্ষিকীর একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। আমিও ছিলুম সভামঞ্চে। কিন্তু আমাকে তিনি আর সকলের মতো ছেড়ে দিলেন না। বললেন, "আপনি চলে গেলে সভা ভেঙে যাবে।" বক্তাদের মধ্যে আমিই সর্বশেষ। সভাপতির এই জুলুমের ফলে আমার পেট তখন বিদ্রোহী! সেদিন আমি চা পর্যন্ত খাইনি। ভেবেছিলুম তাড়াতাড়ি ফিরে চা খাব। ওদিকে ন'টা বাজে।

মেজাজটা বিগড়ে গেলে যা হয়। রামমোহন সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে উঠে এমন সব কথা বলি যাতে আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদের কর্ণ স্থির। আমি বলতে গেলে তাঁদেরই একজন। রামমোহন রায় আমারও হীরো। আমি রামমোহন ঐতিহ্যে লালিত। অথচ সেই আমি তাঁর স্থান নির্দেশ করি সেকুলার ইতিহাসে। ধর্মের ইতিহাসে নয়। বলি, মাহদজী সিন্ধিয়া, রণজিৎ সিং প্রভৃতির সঙ্গেই তাঁর ঐতিহাসিক আসন। সেই অর্থে তিনি মহাপুরুষ। তাঁদের মতো তাঁর দোষগুণ দুই ছিল। তাঁকে রাজর্ষি বলা ঠিক নয়।

কথাগুলো তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। পেটের উত্তাপ যতই বাড়ছে বাক্যের উত্তাপও ততই বাড়ছে। শহীদুল্লাহ সাহেব এর জন্যে দায়ী। যাক, আমি আপনি থেমে যাই। তারপর ছাড়া পেয়ে একলাফে বাড়ি। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ভাষণ বোধহয় শুনতে পাইনি।

ঢাকার সেই দিনগুলির পর তাঁর সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। বছর কয়েক আগে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন। কিন্তু আমি তখন বিদেশে বা দেশের অন্য কোনোখানে। আমার গৃহিণীর সঙ্গেই কথাবার্তা বলে বিদায় গ্রহণ করেন। আমি বাড়ি ফিরে আফসোস করি।

ইচ্ছা ছিল দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতি হলে তাঁর ওখানে রিটার্ন ভিজিট দেব। সেটা আর সম্ভব হলো কই?

সান্ত্বনা

বিষ্ণু দে

বার্ধক্য চৈতন্যে শ্রেষ্ঠ, কৈশোরক যা-হয় ভাবুক্ ?
হয়তো তুমিই ঠিক।
জরা বিকাশের শেষ চূড়া
মহা আয়ুর সাগরে—অতলান্ত বা প্রশান্ত—
বিচ্ছুরিত প্রবালের দ্বীপ, এখানেই বুঝি ক্ষান্ত
সুন্দরী-এ পৃথিবীর সম্ভাব্য জীবনযাত্রা।

অথচ হয় না ক্ষান্ত অন্তত ব্যক্তির জৈবকালে,
সকালে সংবাদ হানে হরেকরকম্‌বা-র চাবুক
সন্ধ্যায় বিষণ্ণ নীলে ভোলে মন স্বীয় ন্যায্য মাত্রা
আর ভাঙা ঘুমে দেখে সুন্দরের নানান্ কৌতুক।

বার্ধক্যে সান্ত্বনা শুধু স্বাস্থ্যরক্ষা সন্ধ্যায় সকালে ?
সম্পূর্ণ মানুষ হয় বয়সেই দুরন্ত ভাবুক।

লেনিনের হাসি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

লেনিন হাসছেন।
নিরবচ্ছিন্ন চেতনার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়
অবিকৃত তাঁর শতাব্দী শরীর,
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম
তাঁর থার্মোনিউক্লিয়ার হাসি
বিশ্ববীক্ষায় নির্নিমেষ।

লেনিন হাসছেন।
সূর্যে সূর্যমুখী ফুলে
সে হাসির বর্ণালি ব্যঞ্জনা
সৃষ্টিলাবণ্যের
সর্বার্থসিদ্ধ ব্যক্তিত্বে
রৌদ্রদীপ্ত।

লেনিনের হাসি
নিষ্কম্পনিথর বিদ্যুতে
সংহতগম্ভীর
শ্রমিক সংহতির
ডাইনামিক ভারকেন্দ্রে
সমর্পিত।

লেনিনের হাসি
সশস্ত্র বিপ্লবের তুরুপের তাস
প্যাকেটে মজুত রেখে,
আরণ্যক নৃশংসতার
বহু বহু উর্ধ্বে
জাতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতে
আন্তর্জাতিক স্মরস্তম্ভ রচনা করে।

লেনিনের হাসিতে
অপ্রমত্ত মানবাধিকারের
দ্বেষজয়ী
হিংসাজয়ী
ক্রূরতা মূঢ়তাজয়ী
অমিত প্রত্যয়সিদ্ধ পরাক্রম,
লেনিনের হাসিতে
পার্থিব ভালবাসার
অনন্ত অপার
ভাবতরঙ্গ।

লেনিন হাসছেন
আমাদের চেতনায়
আমাদের ভাবনায়
আমাদের শিল্পসাধনায়
অমোঘ বিভ্রান্তি বিজয়ের নির্দেশ।

এলাহাবাদ ইস্টিশনের

অরুণ মিত্র

এলাহাবাদ ইস্টিশনের ঘুমন্ত গোল ঘড়িটা একবার দেখি। না, তার গায়ে কোনো ঢেউ লাগেনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আজকাল পরশু আগের বছর। অথচ লাইনগুলো ঝমঝম করে, প্ল্যাটফর্মটা টাল খায়। আমি সমুদ্রের আস্বাদের জন্যে মুখ তুলি। অতল আবেগের মধ্যে যাওয়া, অন্ধকার থেকে মুহূর্তগুলোকে দুরন্ত স্রোতার দিকে উছ্‌লে দেওয়া। পাথরের মেঝের উপর পা সেঁটে আমি তার কতখানি ছোঁয়া পাব? তবু ইস্টিশন পর্যন্ত বুলা আমায় সঙ্গে নিয়ে এসেছে ব'লে আমি বেহুঁশ শহরকে একটু ভুলতে পেরেছি।

সার্চলাইট পড়তে বুলা ঢেউয়ের উপর নাচে। তার কথার রাশ দক্ষিণের হাওয়ায় উড়ে উড়ে ট্রেন থেমে থাকার সময়টা ভরিয়ে ফেলে। ইঞ্জিনের ভোঁ বাজার আগেই তার দু'চোখের আবিষ্কার শুরু হয়ে যায়। গল্পের জমি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, জীয়নকাঠির খেলা দেখার জন্যে কপাটগুলো হাট হ'য়ে সকলকে ডাকছে। সীমান্তের লালবাতি সবুজ হয়, ট্রেন নড়ে ওঠে। তার ঝনৎকার ছাপিয়ে বুলার পায়ের শব্দ কলকাতার কোণে কোণে ছুটে যায়। আমি মগজে পৃথিবীর তোলপাড় নিয়ে দু'ফুট জায়গায় সামনে ঘুরে দাঁড়াই।

অথচ আমি তো দেখছি

মণীন্দ্র রায়

একি শুধু দাঁতে-দাঁত বাতিল ইচ্ছের
কাটাকুটি ছেঁড়া দলাপাকানো কাগজ
উত্তেজিত লেখা আর ফেলা?
একি শুধু জঙ্গলের সুঁড়ি পথে ঢুকে
সর্বাঙ্গে দুচোখ মেলে শিকারীর মন
হটকারী রক্তে করে খেলা?

না, আমি মানুষ বলে যারই কাছে যাই
চতুর্দিকে গন্‌গনে উত্তাপ।
কখন হঠাৎ দেখো একবুক নিঃশ্বাসের ঝড়ে
দপ্‌ করে মেলে ধরবে স্বপ্নের ভিতর
আগুনের ময়ূর কলাপ!

তুমি কি পাচ্ছ না টের?
তুমি ভাবছ এ রকমই নিস্তেল চাকার
আর্তনাদে দিনগুলি যাবে ঘুরে ঘুরে?
অথচ আমি তো দেখছি, তোমাকেও নিপুণ সময়
বারুদ-ও-লোহায় বেঁধে হাতবোমার মতো
ইতিহাস-বিদীর্ণ সে ভয়ঙ্কর স্তব্ধতার বুকে
নিয়ে যাচ্ছে ফেলে দিতে ছুঁড়ে!

বুকে বুকে বারুদ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

একজন প্রশ্ন করলো : দেশলাইতে মোট কটা কাঠি থাকে ?
একজনের জিজ্ঞাসা : অ্যালসেশিয়ানের বিষদাঁত কটি ?
উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকি।
আমি সিগারেট খাই না,
কুকুর পুষি না।

অথচ ভীষণ অন্ধকার দেখছি চতুর্দিকে ;
কুকুরের মতো তাড়া করে আসছে,
আমার হাতে কোনো দেশলাই নেই,
আমি দেশলাইয়ের কাঠি গুনতে থাকি মনে মনে,
এ্যালসেশিয়ানের দাঁতগুলো
জ্বলতে থাকে চোখের সামনে।

একজনের প্রশ্ন : 'সোনালী দিন' কথাটার মানে কি ?
আমরা কি সোনালী দিন দেখে যেতে পারবো ?
মাঝে মাঝে সন্ধ্যার আকাশে সোনা রঙ
যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে ;
কিন্তু তার পরেই অন্ধকার,
বুকে বুকে পাষাণের মত ভারি অন্ধকার।
অন্ধকারের পর আবার নতুন সকাল
নতুন মুখের অবগুণ্ঠন তুলে
হাসবে একদিন, আমন্ত্রণ জানাবে।

বুকে বুকে বারুদ ক্রমশই স্তূপ হয়ে উঠছে
আমি সিগারেট খাই না কিন্তু আগুন জেলে
অন্ধকার তাড়াবো,
আর তখনই হিংস্র কুকুরের বিষদাঁতগুলো
নিজের রক্তে ভাসতে থাকবে...
রাত ভোর হবে।

অবশ্য নিয়তি

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকার কাক-জ্যোৎস্না অন্ধকার
যে-রাত্রে মখমল-মৃদু শিহরশরীর
নারীর শরীরে থেমে মগ্ন হতে গেছি
তলিয়ে তলিয়ে আলো—
    অন্ধ আলো রোমাঞ্চিত চুম্বন মুহূর্ত
পৌঁছেই পেয়েছি টের—
ও আমার পাশে
পৃথিবীর দীঘি ও তড়াগ শুষে নিয়ে
বুকে পুষে গোটা মরুভূমি পিপাসার
রুক্ষ ফাটা ঠোঁট মেলে
ও আছে তাকিয়ে
যে-রাত্রে যে-কোনো রাত্রে
চাঁদের চমরী নারী খুঁজে খুঁজে বুকে রাখতে চাই
অমোঘ সে-রাত্রি ওর
তীব্র সুখবিষ ব্যগ্র লিপ্সু ওষ্ঠাধর
মধ্যে
তিক্ত ব্যবধান ও-ই

কে ও?
ও কি কেউ……
না—ও আমার কেউ নয়……
তবু ও আমার পাশে
তবু ও আমার মধ্যে
আমারই বুকের নিচে অনিবার্য অবশ্য নিয়তি

শখের ড্রইংরুমে স্বস্তির পুতুল
সোফায় নরম রঙ, চুলে চুড়ো চামচে স্নিগ্ধ
উজানী পালের হাওয়া পর্দায় যখনই

যেই আমি স্বেচ্ছাবন্দী সৌজন্য সকাশে
হেসে
হাসিকেই হৃদয়ের বিকল্প জেনেছি
হেসে
সুসজ্জ আলাপে সুরভিত রসালাপে
নিজ মনে মুগ্ধ হতে গেছি
অমনি লক্ষ ভিখিরির কর্কশ কলহ
আক্রোশ অশ্লীল ক্ষুধা বিবস্ত্র বিদ্বেষ
কাককণ্ঠ কুটিপাটি হাসি
ট্র্যাফিকহকারভিড়-ভৈরব রৈ-রৈ
আচম্‌কা পাখ্‌সাটে ভ'রে ঘর
ভাঙে শান্তি স্থিতি
সুজন
সংসার

আর
চমকে উঠে চিনেছি ওকেই
আমার একান্ত কাছে
পাশে
কিংবা স্বস্তি ও আমার মধ্যে
ও-ই আগন্তুক

কে ও ?
ও কি কেউ……
ন্‌না—ও আমার কেউ নয়……
তবু ও আমার পাশে
তবু ও আমার মধ্যে
আমারই বুকের নিচে অনিবার্য অবশ্য নিয়তি।

বাঘবন্দী

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রাস্তায় কিছু একটা হলেই
আমি বাইরে আসি ;
আমার মন বলে, এইবার—
হ্যাঁ,
ঠিক এইবার সব কিছু বদ্‌লাবে।

আমি খোঁজ নিই
কোন্ মিছিল কোন্ দিক থেকে আসছে,
আমি কান খাড়া করে শুনি
কার কী আওয়াজ।

তারপর আবার সব চুপচাপ
শুধু শুনতে পাই
ঝাঁঝরিতে জল পড়ার শব্দ,
রাস্তায় শালপাতাগুলো
হাওয়া লেগে ছটফট করে।

যখন সিনেমা-ভাঙার যাত্রীদের ট্যাঁকে গুঁজে
রাত্রের শেষ ট্রাম
ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গুমটিতে ফেরে—

ময়দানের খুব কাছ থেকে
বন্দী বাঘ খাঁচার মধ্যে ডেকে ওঠে।

নিষিদ্ধ শিকারে

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

সামনের পা দুটি গুটিয়ে মাথা তুলে বাঘটা খোলা বালিতে ঠায় নিথর হয়ে বসে রইল। দাশগুপ্ত একটা কুশঝাড়ের আড়াল থেকে পর পর তিনটি গুলি চালিয়ে গেলেন, লাগল না একটাও।

সমুদ্রের বালুতট। একদিকে সমুদ্র অন্যদিকে জঙ্গল। মাঝখানে উন্মুক্ত একটা বালুময় স্থান খণ্ড চন্দ্রাকারে কুশঝাড়ে ঘেরা। তারই একটি কুশঝাড়ের আড়ালে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ গজ দূরে দাশগুপ্ত বসেছিলেন, কখন বাঘটি উপস্থিত হয়েছিল লক্ষ্য করেননি। ইন্দ্রজালের খেলার মতো কখন অলক্ষিতে রঙ্গভূমিতে সে অবতীর্ণ হয়েছিল। দেখতে পেয়ে রাইফেল তুলে তার কাঁধের ঠিক নিচে কল্‌জিতে নিশান করে গুলি চালালেন। সে গুলি বাঘের এক বিঘৎ ওপর দিয়ে চলে গিয়ে দূরে বালি ওড়াল। বাঘটি শুয়েছিল, গুলির আওয়াজে পা গুটিয়ে মাথা তুলে উঠে বসল ও চারদিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল; নড়ল না। পর পর তিনটি গুলি ব্যর্থ হবার পর সে ত্বরিতে উঠে লাফ মেরে পাশের জঙ্গলে অন্তর্হিত হলো।

আমরা আর চারজন ছিলাম আশপাশের কুশঝাড়ের আড়ালে দূরে দূরে বসে। রাইফেলের আওয়াজ শুনছিলাম, কিন্তু শিকার সমাপিত না হওয়া পর্যন্ত নড়াচড়া বা দেখার চেষ্টা নিষিদ্ধ বলে অশান্ত উদ্বেগে অপেক্ষা করে রইলাম। বাঘ প্রস্থান করলে দাশগুপ্ত এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে সব বৃত্তান্ত শুনলাম। তাঁর এই অতি অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতায় আমরা যেমন ক্ষুব্ধ, তেমনি তাজ্জব বনে গেলাম। এত কাছ থেকে অত বড় একটা নিশ্চল জানোয়ারের গায়ে গুলি লাগাতে পারলেন না—তিনটি আওয়াজেও! এমন বিস্তীর্ণ খোলা জায়গায় অতর্কিতে বাঘের দেখা পাওয়া একটা দুর্লভ বরাৎ। এ বরাৎ সত্ত্বেও ব্যর্থতা দুর্দৈবের চক্রান্ত ছাড়া আর কী হতে পারে! আমাদের ক্ষোভের অন্ত রইল না।

ঘটনাটি ঘটেছিল সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলের দ্বীপগুলির এক বালুতটে, নাম 'বড়বালি'। সেখানে আমরা পাঁচজন গিয়েছিলাম বাঘ শিকারে, বাগচির সঙ্গে। দাশগুপ্ত ছিলেন আমাদের দলের একজন। তাঁর নিকটবর্তী কুশঝাড়ের আড়ালে ছিলেন—বুধন, দলের আর-একজন। সে আজ ত্রিশ বছরেরও আগের কথা। তখন সুন্দরবনে শিকারে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া এখনকার মতো দুর্ঘট ছিল না। আমাদের মতলব ছিল—'বড়বালিতে' একটা হরিণ মেরে, জঙ্গলে বাঘের পাঞ্জা খুঁজে বার করে, মড়িটা বাঘের যাতায়াতের পথে খুঁটিতে বেঁধে রেখে, কাছের কোনো গাছের ডালে শিকারী বসে থাকবেন। গন্ধ পেয়ে বা এমনি ও-পথে বাঘ এসে পড়ে লাশটাকে খেতে আরম্ভ করলে শিকারী মারবেন বাঘকে গুলি করে। তাই হরিণ মারতে আমরা কুশঝাড়ের আড়ালে বিকেলে বিক্ষিপ্ত হয়ে বসেছিলাম। এমন সময় বাঘ নিজে এসে উপস্থিত। বালির ওপর দিয়ে যাবার সময় বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে আমরা চলে গেলাম হরিণ মারতে। ফলে এই ব্যর্থতা।

বাঘ শিকারের তিনটি পদ—প্রথমটি হলো বাঘের তত্ত্ব-তালাস সংগ্রহ। দ্বিতীয় হলো তার সঙ্গে মোলাকাত। তৃতীয় হলো শিকারীর হাতিয়ার—উপযোগিতা ও লক্ষ্যভেদের দক্ষতা।

প্রথম পদটি জরুরি। অভীষ্ট বাঘের অবস্থান জেনে তার চলে ফিরে বেড়ানোর ও শিকারের এলাকা নির্ণয় করা। জঙ্গলঘেঁষা গ্রামাঞ্চল বা যেখানে গরু-মোষ বা মানুষের ওপর বাঘের অত্যাচার হয়—সেখানকার গ্রামবাসীরা সেই গরু-মোষ বা মানুষখেকো বাঘের সঠিক খবরাদি দিতে পারে। ভাড়াটে শিকারীরা খোঁজখবর করে জঙ্গলের বা পাহাড়-অঞ্চলের বাঘের খবর এনে দেয়, পাঞ্জা খুঁজে বার করে। এ-কাজ শিকারী নিজে করতে পারলে তাঁর শিকার-সিদ্ধি সমধিক। এরপর দ্বিতীয় পদ—অর্থাৎ বাঘকে পাল্লার ভেতর আনানো, অথবা জানতে না দিয়ে তার কাছে উপস্থিত হওয়া।

বাঘ অতি হিংস্র, শক্তিশালী, ধূর্ত, কৌশলী, সাহসী, দৃষ্টিপটু ও সজাগ আত্মগোপনকারী জীব। বাঘ একেবারে নিঃশব্দে চলে ফিরে বেড়াতে পারে। তার শিকার-অভিযান হয় রাত্রের গভীরে। জ্যোৎস্নাহীন রাতের গাঢ় অন্ধকারে ঘন জঙ্গলে সে বিনা ভ্রূক্ষেপে পথ করে নেয়। কৌশলে তাকে প্রলুব্ধ করে অথবা হাঁকাই করে তার গুপ্ত স্থান থেকে না বার করলে তাকে চাক্ষুষ

প্রত্যক্ষ করা প্রায় অসম্ভব। অবশ্য কখনো-সখনো তার সাক্ষাৎ দর্শন হয়। কিন্তু তা নিতান্ত দৈবাৎ। তার পাঞ্জা খুঁজে পেয়ে তার সতর্কতাকে নিরস্ত করে তার বুদ্ধি ও ধূর্ততাকে হার মানানোই হলো বাঘ শিকারের সারাংশ। পাঞ্জার রহস্য উদ্‌ঘাটন-কাজ বই পড়ে তার মর্মোদ্ধার করার মতো।

এর পর হলো শেষ পদটি—শিকারীর চরম পরীক্ষা, তার লক্ষ্যভেদ-দক্ষতা। সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্র তাকে প্রত্যুৎপন্নভাবে মোক্ষম স্থানে গুলি লাগিয়ে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে হবে। শিকারীর অচল স্থৈর্য ও একাগ্রতা থাকা চাই; চাই চোখের দৃষ্টির সঙ্গে হাতের ঐকান্তিক সঙ্গতি। অপরিসীম ক্ষিপ্রতায় নলের মাছি ও পিছনের দাড়াকে সই করে বাঘের কাঁধে বা গর্দানে গুলি বিদ্ধ করতে হবে। পলকের দ্বিধা, বিহ্বলতা, শ্রান্তি, নিদ্রালসতা বা চিন্তাবিলাস সফলতার দুর্জয় প্রতিবন্ধক।

প্রথম দুটি পদের ভার অনেক ক্ষেত্রে ভাড়াটে শিকারীর ওপর ন্যস্ত হয়। বাঘ শিকার করিয়ে দেওয়া আজকাল একটা ব্যবসা হয়ে উঠেছে। এতে শিকারের মান লঘু হয়; অবশ্য বাঘের ছালটি শিকারীর বৈঠকখানার শোভা-বর্ধন করে। তাতে শিকারীর লক্ষ্যভেদ-দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয় না; কিন্তু শিকারীর অধ্যবসায়, সাহস, কায়িক ও মানসিক শক্তির সম্যক পরীক্ষা হয় না। উৎকৃষ্ট শিকার হলো শিকারী যথাসম্ভব স্বয়ং জঙ্গল ঘুরে ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে পাঞ্জা বার করে নিজের বুদ্ধি ও কৌশলক্রমে বাঘকে নিকটে আনাবেন এবং একগুলিতে তার মৃত্যু ঘটাবেন বা সাংঘাতিক জখম করবেন। জঙ্গলে ঘুরে শিকারী জানোয়ারের জীবন-রীত যা সংগ্রহ করবেন—তার মূল্য অল্প নয়।

এভাবে শিকার সম্ভব সমতল প্রদেশের জঙ্গলে ও তরাইয়ে। সুন্দরবনের নদী-খালের তটস্থিত জঙ্গলের ঘন এঁটেল কাদায় ও কেওড়া গাছের শিকড়ের উর্ধ্বমুখী গজাল, হেঁতেল, হোগলা, গোলপাতা, গরাণ, সুঁদরী সমৃদ্ধ মাটিতে ও বাদায় এ-পদ্ধতি অনুপযুক্ত এবং অতীব বিপজ্জনক। সুন্দরবনের বাঘ সবই মানুষ-খেকো ও অত্যন্ত দুঃসাহসী। যে সময়ে শিকারী বাঘের পাঞ্জা অনুসরণ করতে নিযুক্ত থাকবেন, ঠিক সেই সময়েই ধূর্ত বাঘ লাফিয়ে এসে আক্রমণ করে শিকারীর ঘাড়ে পড়বে। তিন-চারজনে একত্র হয়ে আগুপিছু ডাইনে-বাঁয়ের মোয়াড়া রেখে বন্দুক-রাইফেল নিয়ে অগ্রসর হয়েও এ-রকম জায়গায় বাঘের আচমকা সাংঘাতিক আক্রমণ থেকে তাঁরা নিস্তার পাননি। তাই সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে গেলে নির্ভর করতে হয় লঞ্চ বা নৌকোর

মধ্যে থেকে তাকে হাতিয়ারের পাল্লার মধ্যে পাবার আশা বা ব্যবস্থার ওপর। সমুদ্রতট কিন্তু বালুময় হওয়ায় সেখানে ও তার সন্নিহিত জঙ্গলে বাঘের পাঞ্জা খুঁজে শিকার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

এই শেষোক্ত মতলবে এবার আমরা পাঁচ বন্ধু এসেছিলাম সুন্দরবনের 'বড়বালি'তে। পাখি শিকার অর্থাৎ স্নাইপ, হাঁস, তিতির প্রভৃতি ও বড় জানোয়ার শিকার অর্থাৎ বাঘ, কুমীর, চিতাবাঘ, চিতল, সম্বর, শুয়োর, ভালুক—প্রভৃতির জন্য আমাদের ছ-সাতজনের একটা শিকারীর দল ছিল। হাঁস মারার জন্য যেতাম চিল্কায়, শোন নদীর ওপর ডিহিরিতে, সাহেবগঞ্জে, রাজমহলে, পদ্মার চরে, মালদায়—এছাড়া কলকাতা গোড়ে প্রভৃতির উপকণ্ঠে নানা ভেড়িতে ও পোর্ট ক্যানিং-এর মাতলায়, হাড়োয়ায়। কলকাতার উপকণ্ঠের গ্রামাঞ্চলের ধান ও পাটক্ষেতে অফুরন্ত স্নাইপের সমাবেশ; বড় জানোয়ারের জন্য যেতাম ছোটনাগপুরের জঙ্গলগুলিতে। কখনও কখনও আরও দূরে—উত্তর প্রদেশের তরাইয়ে, উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে ও সুন্দরবনে। কার্তুজের অভাব ছিল না আর দামও ছিল শস্তা। আমরা যে-সময়ে ঐসব শিকারে যেতাম, তখন বন্দুকের কার্তুজের দাম ছিল আট দশ টাকা শ, রাইফেল কার্তুজের দাম সেই অনুপাতে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, চার-পাঁচজনে আমরা হাঁস বা স্নাইপ শিকারে নামলে আমাদের এক একদিনের শিকারের বোঝা দেড় শ দু-শর কমতি হত না।

আমাদের শিকার-দলের যুগ্ম দলপতি ছিলেন ঘোষ ও বাগচি। সুন্দরবনে শিকারে গেলে বাগচি তাঁর ক্যানিং, গোসাবা সার্ভিসের কোনো একটি মোটর লঞ্চ স্বয়ং চালিয়ে আমাদের নিয়ে যেতেন।

দিন পাঁচ-ছয়ের মতো খাবার রসদ মিঠে জল (কেননা সুন্দরবনের নদীর জল নোনা) কেরোসিন হাতিয়ার কার্তুজ প্রভৃতি জোগাড় করে পোর্ট ক্যানিং থেকে যাত্রা করে দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যায় আমরা 'হাড়িয়াভাঙ্গা' নদীর সঙ্গম উপকূলে 'বড়বালি'র দ্বীপে এসে পৌছলাম। তখন জোয়ার, লঞ্চ একটা খালের মধ্যে নিয়ে গিয়ে নোঙর করা হলো। 'বড়বালির'ই একটা খাড়ি বা খাল। রাত্রে খাওয়া সেরে নিদ্রা দেওয়া হলো—সমুদ্রের চাপা আওয়াজ নির্মল আকাশের নক্ষত্রশোভা ও সমুদ্র শিকরের ভিজে হাওয়ায় নিদ্রা হলো প্রচুর। সে-সময় এপ্রিল মাস, সামান্য শীতের আমেজ ছিল। লঞ্চের ছাদের ওপর একজন সার্চলাইট ও রাইফেল নিয়ে পাহারায় রইলেন—লঞ্চে কোন বাঘের না উপদ্রব হয়!

রাত্রিশেষে অন্ধকারের প্রলেপ মুছে গিয়ে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল উষার নিরুপম আলো। সুস্পষ্ট হলো একদিকের গাছপালার শ্যামল, অন্যদিকে সমুদ্রের এমারেল্ড, আর ওপরে অসীমের নীল। বাঙ্কে উঠে বসলাম। 'বড়বালি'তে এ-আমাদের দ্বিতীয়বার আসা। এর আগের বার এসে বালিতে বাঘের পায়ের দাগ দেখে দিন তিনেক সকলে চেষ্টা করে বিফল হয়ে ফিরে গিয়েছিলাম। নতুন আশায় আবার এলাম।

সূর্যোদয় হলে জায়গাটি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ হলো। রাতে ভাটা পড়ে খালের জল নেমে যাওয়ায় লঞ্চটি কাৎ হয়ে বালিতে ঠেকে গিয়েছিল। সকালে চা-পর্ব শেষ করে বালির চরেতে সকলে নেমে পড়লাম। অদূরে হাড়িয়াভাঙা নদী এসে মিশেছে সমুদ্রে। উপকূলটি ছিল ঈষৎ ঢালু। আমরা শর্ট-শার্ট ছেড়ে তোয়ালে জড়িয়ে সমুদ্রে স্নান করলাম। তারপর বাঘ পাবার ও মারার ফন্দি-ফিকির আলোচনা করা গেল। বালির চরেতে ছিল বিস্তর কুশের ঝোপঝাড়, তাদের ভেতর দিয়ে চলে গেছে জানোয়ারের পায়েতৈরি পথ। তাতে অজস্র হরিণ ও শুয়োরের পায়ের দাগ। সমুদ্রের অপরদিকে ঘন জঙ্গল—মাঝে অনেকটা ফাঁকা বালি। ঠিক হলো বিকেলে কুশঝাড়ের ভেতর বসে থেকে হরিণ শুয়োর যা চরে বেড়াবে পাল্লার মধ্যে মারা হবে একটা-ছুটো। জঙ্গলে বাঘের পায়ের পাঞ্জা খুঁজে দেখে পূর্ব-সঙ্কল্প মতো একটা গাছ বেছে লাশটার পেট চিরে দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হবে। গন্ধ পেয়ে বাঘ আসবে সেখানে ও হরিণের লাশটা খেতে আরম্ভ করবে—যদিও বাঘের ঘ্রাণশক্তি তেমন প্রবল নয়। চড়াটা ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখে এলাম। লঞ্চে ফিরে এসে ছুপুরের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে নেওয়া হলো। ইতিমধ্যে জোয়ার এসে নালা ভরে উঠেছিল ও লঞ্চটি সোজা হয়ে ভাসছিল। সিঁড়ি বেয়ে আমরা তাতে উঠেছিলাম।

খাওয়া হয়ে গেলে আমরা খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম, রাত জাগতে হতে পারে। ঠিক হয়েছিল বাঘ শিকারের জন্য গাছে কে উঠে বসবে তা লটারি করে ঠিক করে নেওয়া হবে।

বেলা চারটায় চা-বিস্কুট খেয়ে আমরা পাঁচজন স্ব-স্ব হাতিয়ার নিয়ে বালিতে নেমে গেলাম। লঞ্চে রইল তিনজন লস্কর।

জোয়ারের জল তখন অনেক নেমে গেছে। চড়ার অনেকখানি জোয়ারের

জলে ডুবে গিয়েছিল। সে-জল সরে যাওয়ায় বালিটা শক্ত হলেও ভিজে ভিজে ছিল।

শ-দুই গজ এগিয়ে যেতেই আমার চোখে পড়ল বালিতে একটা অস্পষ্ট চাপড়া দাগ। কাছে গিয়ে ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখতেই বুঝলাম, এ যে একেবারে স্বয়ং বাঘের পাঞ্জা! যা খুঁজে বার করবার যুক্তি হয়েছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম সামনে আরও কয়েকটি পায়ের ছাপ। বাগচিকেই ডেকে দেখালাম—তিনিই অভিজ্ঞ শিকারী; বাঘ মেরেছেন গুটিকয়েক, চিনবেনই ঠিক তিনি। বাগচি কিন্তু দেখে স্থির করলেন যে ওগুলি গতকালের দাগ। জোয়ারের জল দু-তিন বার ওদের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় দাগগুলি ভেঙে-চুরে গেছে ও নিষ্প্রভ হয়েছে। কিন্তু আমার স্থির ধারণা হলো ওগুলি সদ্য সেদিনের। বাঘ নিকটেই কুশঝাড়ের আশে পাশে কোথাও আছে, আর বাগচি অথবা অন্য কেউ সন্তর্পণে এগিয়ে গেলে বাঘ দেখতে ও মারতে পারবেন। বাগচি শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন আমাদের যে প্ল্যান স্থির হয়েছে সেই মতো চলাই ভালো। আগে একটা হরিণ বা শুয়োর মেরে নেওয়া যাক। তারপর জঙ্গলে বাঘের পাঞ্জা বার করে কোনো জায়গা বেছে নিয়ে সেইখানে লাশটাকে খুঁটিতে বেঁধে রেখে গাছের ডালে বসা যাবে।

এই প্রকল্প মতো আমরা পাঁচজন ইতস্তত ছড়িয়ে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে দূরে কুশঝাড়ের আড়ালে বসলাম। দাশগুপ্ত কুশঝাড়গুলির প্রান্তস্থ একটির আড়ালে বসলেন; তাঁর নিকটবর্তী কুশের আড়ালে রইলেন বুধন, কেননা দাশগুপ্ত আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন এই প্রথম। বুধন খুব পোক্ত শিকারী না হলেও মোটর লঞ্চে হামেশা যাতায়াত করেন ও এ-অঞ্চল সব ভালো করে জানেন। যদি কোনো সাহায্য-পরামর্শের দরকার হয়, তাই বুধনকে দেওয়া হলো দাশগুপ্তর কাছাকাছি। ইংরাজী অক্ষর "এল"-এর মতো কুশঝাড়গুলি সাজানো। গুলি চালানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো তার এক শাখার ঝাড়ের পিছনের যাঁরা গুলি চালাবেন তির্যক ডাইনে—অপররা তির্যক বাঁয়ে। কারুর যাতে দৈবাৎ আঘাত না লাগে।

ঘণ্টাভর কেটে গেল উৎকণ্ঠিত স্তব্ধতায়। বাঁ হাতে রাইফেল নিবদ্ধ হয়ে কোলে রাখা, ডান হাতে আলগা করে বাঁট ধরা। যে কোনো মুহূর্তে রাইফেলটি কাঁধে তুলে আওয়াজ করা যাবে। চেয়ে দেখছি একবার করে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে। কোনো জানোয়ারের চিহ্ন, সাড়াশব্দ নেই। সওয়া পাঁচটা

নাগাদ দাশগুপ্তর দিক থেকে এলো আকাশ ফাটানো রাইফেলের আওয়াজ—"দুম"। দৃঢ় মুঠিতে রাইফেল অর্ধেক তুলে ধরে নিবিষ্ট চাউনি ফেললাম সামনে। একটু পরেই আবার আওয়াজ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে সব দেখবার ইচ্ছা সংযত করে বসে রইলাম। পাঁচ সেকেণ্ড যেতে না-যেতেই তৃতীয়বার আওয়াজ। বুকের স্পন্দন তীব্র হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। নিঃশব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে বসে রইলাম—যদি বাঘের ওপর গুলি হয়ে থাকে ও যদি জখম বাঘ সামনাসামনি এসে পড়ে? অভ্রান্ত গুলি লাগাতে পারব তো? যদি না পারি, যদি যায় ফসকে তো সাক্ষাৎ মৃত্যু। হরিণের ওপর গুলি হয়নি; তা যদি হত তো হরিণের দল লাফিয়ে ছুটে এদিক-ওদিকে চলে যেত। সে লক্ষ্যীভূত না হয়েই পারে না। বাঘ নিশ্চয়। উৎকণ্ঠায় সেকেণ্ড-মিনিট পার হয়ে গেল। মিনিট দশ পর দেখি বাগচি নিজের জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। দেখাদেখি আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। অবিলম্বে দাশগুপ্ত এসে পড়লেন ও আমরা সকলে একত্র হলাম। বুধনও এলেন।

ঘটনাটির বিবরণ দাশগুপ্ত ও বুধনের মুখে যা শুনলাম তা এই:

আওয়াজ বাঘের ওপরই করা হয়েছিল, দাশগুপ্তর '৪০৪ বিবরের জেফনির রাইফেল দিয়ে। প্রত্যেকটি গুলি এক বিঘৎ ওপর দিয়ে চলে যায়। তিনটে আওয়াজের পর বাঘ লাফ দিয়ে চম্পট দেয়। দাশগুপ্ত বললেন কুশঝাড়ের আড়ালে ঠাঁই করে বসার আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে হঠাৎ বাঘটা দেখতে পান। সামনে ছিল বেশ খানিকটা ফাঁকা বালি—প্রায় শ গজ লম্বা, শ গজ চওড়া ও তার পিছনে জঙ্গল। বাঘটা ছিল শুয়ে, আন্দাজ চল্লিশ গজ দূরে। এক নিমেষ আগে ছিল না, এক নিমেষ পরে দেখলেন তাকে, কে যেন মন্ত্রবলে উড়িয়ে বাঘটিকে সেখানে হাজির করেছে। প্রথমটায় বিস্ময়ে গেলেন হক-চকিয়ে। গয়া, গরপা-গুজণ্ডির জঙ্গলে বাঘ শিকার করেছেন ও মেরেছেন দুটি; কিন্তু উন্মুক্ত আকাশের নিচে এভাবে বাঘ বসে থাকতে দেখেননি কখনও। বিস্ময়ের আর-একটা কারণ—কী করে কোথা দিয়ে অমন আচম্বিতে ও হাজির হলো। এসব চিন্তা দমন করে ভাবতে লাগলেন খোলা জায়গায় সামনা-সামনি গুলি লাগানো সঙ্গত হবে কিনা। গুলি খেয়ে আহত না হলে বা ঘায়েল না হলে রাইফেলের নলির মুখে আগুনের ঝলক দেখে বা আওয়াজ অনুসরণ করে সে দৌড়ে এসে তাঁর ওপর না ঝাঁপিয়ে পড়ে! এই চিন্তা মনে আনাগোনা করতে লাগল। বাঘটি ইতিমধ্যে বালিতে গড়াগড়ি

দিতে লাগল, আবার এলিয়ে আধশোয়া হয়ে জিভ দিয়ে গা পিঠ কোমর পা থাবা চেটে পরিষ্কার করতে লাগল, যেমন কুকুরে করে। কী নধর তার গা, আলোয় দেখাচ্ছিল চুনে-হলুদের রঙ; তাতে মোটা করে আঁকা কালো কালো ডোরা। প্রায় বিশ মিনিট ধরে তার প্রসাধন-ক্রিয়া ও শরীরের বাহার প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। এমন সময় দেখলেন বুধন শুয়ে শুয়ে কুশঝাড়ের ভেতর দিয়ে তাঁর কাছে এসে হাজির। কানে মুখ লাগিয়ে বললেন—তিনি যেন আওয়াজ না করেন, বুধন শুয়ে শুয়ে গিয়ে বাগচিকে ডেকে আনবেন; বাগচির হাত অব্যর্থ। নয়তো তাঁর মার ফসকে যেতে পারে।

দাশগুপ্ত তাঁকে নিরস্ত করলেন; বললেন, বাগচির কাছে পৌঁছে তাঁকে ডেকে এনে বাঘ মারানো অসম্ভব কল্পনা। তার আগেই বাঘ ওঁকে দেখতে পাবে।

আর বিলম্ব না করে আওয়াজ করাই স্থির করলেন। বাঘের কাঁধের নিচে নিশান করে রাইফেল চালালেন। গুলি লাগল না; বাঘ একটু চমকে মুখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল ও মুখ তুলে বসে রইল। হাত স্থির করে আবার গুলি চালালেন. সেও লাগল না। তৃতীয় দফা গুলি চালালেন, অনেক দূরে বালি ছিটকে উঠল। বুঝলেন গুলি ক্রমাগত ওপর দিয়ে গেছে। নিচুতে নিশান করবেন বলে রাইফেল ঠিক করে ধরলেন। কিন্তু মুহূর্তে বাঘ উঠে দাঁড়িয়ে লাফ মেরে তার পিছনের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

দাশগুপ্তর বিবরণ শুনে আমরা সকলে নানা মন্তব্য করতে লাগলাম ও নানা প্রশ্ন তুললাম। সবিশেষ কথা হলো—শিকারে আসার আগে কি রাইফেলের নিশান পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন? তিনি আশ্বস্ত করলেন, শিকারে আসার আগের রবিবারে ম্যাণ্টনের রেঞ্জে ভালো করে তা দেখে নিয়েছেন। শুনে বাগচি বললেন, নিশ্চয় তবে হাত কেঁপে গিয়েছিল!

এতগুলি আওয়াজের ও আমাদের উপস্থিতির পর নিশ্চয় ওখানে আর দলবল নিয়ে শিকার হবে না। আমরা তাই গল্প করতে করতে লঞ্চে ফিরে এলাম। লঞ্চে উঠে দেখি লস্কর তিনজনের ভয়ে আড়ষ্ট ভাব, শুকনো মুখ। কী ব্যাপার?— শুধোলে যা বললে তা আরব্যোপন্যাসের এক কাহিনী!... আমরা বালিতে নেমে যাবার অল্প কিছুকাল পরেই মেটরা দেখতে পেল আমাদের গন্তব্যমুখের একটু ডাইনে লালচে রঙের ঘোড়ার মতো বড় একটা জানোয়ার থেমে থেমে লঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা নিজেদের মধ্যে ঠিক

করল জানোয়ারটা সুন্দরবনের বুনো-ঘোড়া। কাছে এসে পড়তেই ওরা বুঝতে পারল ঘোড়া নয়, আসলে ওটা "বড়মিঞা"। বাঘটা সরাসরি লঞ্চের মুখে চলে আসছে দেখে ওদের রক্ত জল হয়ে গেল; বুদ্ধি পেল লোপ। লঞ্চের সামনেটার খোলে ঢোকার জন্য ছিল একটা পাটা দিয়ে ঢাকা দরজা। তার পাটা তুলে ওরা তিনজন খোলের মধ্যে ঢুকে বসে ইষ্ট নাম জপ করতে লাগল। বাঘটা এসে প্রথমে লঞ্চের চারিদিক ঘুরে দেখে এলো; তারপর নখ দিয়ে আঁচড়ে ধরে সামনেটায় উঠে পড়ল। যে-পাটা তুলে ওরা খোলে ঢুকে বসেছিল, সেটাকে খুব খানিকটা আঁচড়াল। কিন্তু কিছু করতে না-পেরে খানিকটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করে নেমে গেল। খোলের ভেতর মেটরা ভয়ে প্রায় নিষ্প্রাণ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। আধ ঘণ্টা পরে পর পর তিনটে রাইফেলের আওয়াজ শুনে তাদের মনে হলো বাঘটাকে মারা হয়েছে। তখন তারা পাটা তুলে ওপরে উঠে এসেছে।

আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে বাঘের পায়ের দাগ যা আমার নজরে পড়েছিল তা সদ্য সেদিনেরই—সম্ভবত সকালের দিকের। আমরা বালিতে নামার পর বাঘ আবার এসেছিল লঞ্চ পরিদর্শন করে দেখে যেতে—কী বস্তু ওটা, অথবা ওর খাবার কিছু সংগ্রহ হয় কিনা। সুন্দরবনে যে নৌকো-লঞ্চ প্রভৃতি যাতায়াত করে—সুন্দরবনের বাঘের সেটা অজানা অপরিচিত নয়। নৌকোর পাটার ওপর লাফিয়ে পড়ে ঘুমন্ত বা অন্যমনস্ক মানুষ মুখে তুলে নিয়ে জলে বা ডাঙায় লাফিয়ে পড়ায় তারা বেশ অভ্যস্ত। কিছু হলো না দেখে বাঘ ঐ খোলা বালির মাঠে এসে খোস মেজাজে গড়াগড়ি দিয়ে শরীরে প্রসাধন করছিল। সেই সময়ে দাশগুপ্ত দেখতে পান। এমন নিঃসাড়ে বাঘ চলাফেরা করতে পারে যে তার আগমনটি তাঁর চোখে পড়েনি। তাই বালিতে বাঘের উপস্থিতি ইন্দ্রজালের মতো মনে হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার হলো তাঁর হাত থেকে বাঘ ফসকে যাওয়া।

ওখানে আর বাঘ শিকারের আশা নেই বললেন বাগচি ও রাত্রের মুখে জোয়ার এলে নোঙর তুলে নিয়ে লঞ্চকে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। আবার বড়-ছোট নদী-নালা ও তাদের শাখা-প্রশাখা ধরে কিনারার জঙ্গলে সার্চলাইট ফেলে চললাম আমরা। ইঞ্জিনের অবিরাম ধক ধক শব্দ, বাতাসের মর্মরিত হিল্লোল, আকাশের মসী নীল জমিতে তারাময় হীরা-মাণিক্যের অবর্ণনীয় শোভা উপভোগ করতে করতে ফিরে চলেছি। মন চলে গেল বাস্তব-অবাস্তব

মেশানো এক নিরালায়। কোথাও খাল ও নদীর তটে আর বাঘ দেখা গেলনা। রাত্রি একটায় বিদ্যা নদীর এক খালে রাত্রের মতো লঞ্চ নোঙর করা হলো।

পরদিন সকালে চা-পর্বের পর লঞ্চ ছাড়া হলো। প্রভাতের ছাঁকা আলোয় নদী-নালার দুই কিনারা ঝলমল করছে। হালের চাকা ধরে বসেছেন বাগচি, আমি বসেছিলাম তাঁরই সান্নিধ্যে। একটু দূরে একটা বাঙ্কে বসে দাশগুপ্ত তাঁর রাইফেল সাফ করছিলেন। শেষ হলে রাইফেল খোলে পুরে কাছে এসে বসলেন। আমি পাড়লাম গত বিকেলের অসাফল্যের কথা। শিথিল মনে আমার ঐ কথাটাই ঘোরাফেরা করছিল।

বললাম, রাইফেল চালানোয় হাত বেশ রপ্ত না হলে জানোয়ারের গায়ে রাইফেলের মাছিটার ছবি মিলিয়ে অস্পষ্ট হয়ে আসে চোখে। তখন ভালো করে দেখার তাগিদ আসে চোখ থেকে, আপনিই মাছিটাকে উঁচু করে ধরা এসে যায়। গুলি শিকারের ওপর দিয়ে ছুটে যায় ও গোড়ায় গোড়ায় তা বোঝা যায় না। নিশানা করার সময় এ-বিষয়ে সতর্ক হতে হয়। পিছনের দাড়ার খাঁজের মধ্যে মাছি যেন নেমে বসে, ভেসে না ওঠে। বললাম, আমার নিজের এ-রকম হয়েছে। কৃষ্ণসার হরিণ শিকারে একবার দিল্লী থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে এক পেশাদার শিকারীর সঙ্গে গিয়ে আমার এইরকম হয়েছিল। একদল হরিণ ছিল দল বেঁধে, এক জঙ্গলের ভেতর এক বিস্তীর্ণ মাঠে। দু-তিনটি বড় শিঙেল ছিল তার মধ্যে—যাদের শিং কম-বেশ বিশ ইঞ্চি লম্বা, তিন পাক খেয়ে চারটেয় পড়েছে। পিঠের রঙ গাঢ় কালো। চোখে যেন শাদা চশমা পরা। সন্তর্পণে পা-পা করে এগিয়ে গেলাম। বেশি কাছে যেতে পারলাম না। তারা ছিল তিন-চারটি বাবলা গাছের একটা ঝোপের মতো জায়গার ছায়ার নিচে। বেলা তখন দুপুরের পর। শিঙেল-গুলি বসে, তিন-চারটি মাদী হরিণ ইতস্তত দাঁড়িয়ে পাহারায় রত। আমায় দেখে হরিণগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। শ-দুই গজের কাছাকাছি হয়ে খুব স্থির ধীর হয়ে চালালাম গুলি, আমার 'ওয়েস্টলি রিচার্ডস'-৩১৮ বিবরের রাইফেল থেকে। উপরি উপরি চারটি আওয়াজেও একটি লাগল না। হরিণের দল ছুটছিল সেই মাঠে আমায় চক্রাকার কেন্দ্রে রেখে বৃত্তাকারে, দূরত্ব একই বজায় ছিল। তাতে আমার গুলি চালানোর কোনো ফারাক হয়নি, এক রাইফেলটিকে তাদের সঙ্গে সমানে চক্রাকারে ঘোরানো ছাড়া। সে-এক দৃশ্য, মনেতে ছাপ রেখে দিয়েছে চিরজীবনের জন্য। চারটে গুলির পর দূরে গুলি লেগে ধুলো

ওড়ানো দেখে বুঝলাম সব যাচ্ছে হরিণগুলির পৃষ্ঠরেখার ওপর দিয়ে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিশান শুধরে রাইফেলের মাছি নামিয়ে একটা বড় শিঙেলের নাক থেকে হাতখানেক সামনে গুলি ছাড়লাম অপসরণমান রাইফেল থেকে। সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা পড়ল ধড়টা সামনে করে, মুণ্ডটা ঘুরে উল্টে। গুলিটা লেগে-ছিল একেবারে গর্দানে, যেন কে গর্দানটাকে গেঁথে দিল বল্লমে—যাকে বলে pole-axed। মাছির খাড়াইটা জেনেও জানোয়ারের পক্ষে তুরন্ত করতে একটু অভিজ্ঞতা লাগে। শুধু চাঁদমারির অভ্যাসে এটা আয়ত্ত হয় না। শিকারে নামলে দু-দশটা ছুট হবেই গোড়ায়।

আমার গুলিতে জানোয়ার পড়লে আমি লম্বা পায়ের ক্ষেপে দেখে নি কত দূরে ছিল। এ-হরিণটা ছিল ১৯৫ ক্ষেপ দূরে, কম-বেশি ১৭৯ গজ। সাহেবরা দেখেছেন মোটরে পাল্লা দিয়ে যে কৃষ্ণসার দৌড়য় প্রায় ঘণ্টায় পয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল বেগে! অমন দূরে ও অমন বেগবান শিকারে গুলি লাগানোর সাফল্যে আমি কৃতার্থ হলাম। ওটা আমার একটা রেকর্ড। নিজের রাইফেলে হাতসই হলে মাছির খাড়াই নিজ হতে ঠিক হয়ে যায়—শিকারীর চৈতন্য শিকারের ওপর নিবদ্ধ হয়ে যায়। আর চলন্ত বা দৌড়নো জানোয়ারে সঠিক গুলি লাগানোও অভ্যাসের বস্তু হয়ে ওঠে।

আমার কথা শুনে দাশগুপ্ত ব্যগ্রভাবে বললেন, না না, ভটচাজ, ওটা আমার মাছির খাড়াইজাত বা ওসব কিছুই নয়; সবটা শুনলে আপনি বুঝবেন। অন্য কাউকে বলবার নয়। তারা তাদের সীমিত জ্ঞানে ওর মর্ম গ্রহণ করতে পারবে না। আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ওসার পর্যাপ্ত—আপনার কাছে এর অলৌকিক তথ্যটি অপরিচ্ছন্ন থাকবে না। একজন আমার বাঘ শিকারে এক অভিশাপ দিয়েছে—সে-অভিশাপ আমার জীবনে ফলেওছে। কোনো অলৌকিক ব্যাপারে আমার তিলমাত্র বিশ্বাস নেই। আমি চেষ্টা করি মন থেকে মুছে ফেলতে—ব্যর্থতা এড়াতে। কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হইনে, গুলি চলে যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে। আমি অলৌকিকে অবিশ্বাসী, কিন্তু কিছুতেই তার প্রভাব থেকে নিস্তার পাচ্ছিনে। শুনুন সবটা।

দাশগুপ্ত বলে গেলেন—প্রায় বছর দশ আগের কথা। আমি যখন বি-এ পড়ি প্রেসিডেন্সি কলেজে, তখন আমাদের সঙ্গে পড়ত সুলতান আমেদ। মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রেসিডেন্সিতে দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের দেওয়া বৃত্তি ছিল। আমেদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়; সে ছিল গয়া অঞ্চলের।

পাটনা কলেজ থেকে পাশ করে সে এই কলেজে এসে ভর্তি হয়। আমার বাবা তখন গয়ার দেওয়ানি কোর্টের জজ। গয়ায় আমি কাটিয়েছি অনেক বছর। ওই অঞ্চলের ছেলে বলে আমার সঙ্গে সুলতান আমেদের খুব ভাব জমে ওঠে।

ইংরেজী অনার্সে বি-এ পাশ করে বিহারে ডেপুটির চাকরি পেয়ে সে চলে যায়। দু-বছর পরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয় হাওড়া স্টেশনে। তখন আমি এম-এপাশ করে সবে ল-কলেজে ঢুকেছি। ইস্টারের ছুটিতে যাচ্ছি চাতরায় বাবার কাছে। বাবা ছিলেন খুব শিকারপ্রিয়; গয়া অঞ্চলের সব বিখ্যাত শিকারীদের সঙ্গে তাঁর ছিল দোস্তি: মহারাজা টিকারী, বক্তিয়ারপুরের নবাব ও আরও সব। আমিও কলেজে পড়ার সময় থেকে বাবার সঙ্গে যেতাম শিকারে এবং তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের কাছে শিকার শিখি। এবার গয়া যাবার সময় আমি সন্থ নতুন একটি রাইফেল কিনে নিয়ে যাই, জেফরি—'৪০৪ বিবরের—যা দিয়ে গতকাল গুলি চালিয়েছিলাম।

আমার এই রাইফেল কেনার ছোট একটু ইতিহাস আছে। শিকারে গেলে হয় বাবা নিজের বন্দুক—রাইফেল দিতেন, নয়তো তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ তাঁদের বাড়তি কোনো হাতিয়ার দিতেন আমাকে। মহারাজা টিকারীর কাছে শিখেছিলাম ওড়া হাঁস, স্নাইপ, তিতির শিকার করতে। তাঁরই কাছে হয় আমার বাঘ মারার হাতেখড়ি। কিন্তু তাঁর ছিল খুব কেতাদুরস্ত আইন-কানুন। ভঙ্গ করলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন, আর তাঁকে সঙ্গে নিতে চাইতেন না। মহারাজা টিকারীর মতো পোক্ত শিকারী বেশি দেখা যায় না এদেশে।

আমার ছিল কিশোরের প্রগলভতা। মহারাজার আমন্ত্রণে গিয়েছি বাঘ শিকারে। অতিথিদের ও তাঁর নিজের জন্ম মাচান করা হয়েছিল চারটি। প্রথমটিতে স্বয়ং মহারাজা, পরেরটিতে আমি, তার পরের দুটিতে পুলিশ সুপার ও নওয়াদর সব-ডিভিসন্যাল অফিসারের মাচান হয়েছে। তাঁর নিজস্ব একটি '৪০৪-জেফরি মহারাজা আমায় দিয়েছেন ব্যবহার করতে। মাচায় ওঠার আগে বলে দিলেন শিকারের জন্ম হাঁকাই আরম্ভ হলে বাঘ জানোয়ার যা বার হবে আগে পার হতে চেষ্টা করবে মহারাজার মাচানের নিচে বা সামনে অথবা পিছন দিয়ে। প্রথম গুলি হবে তাঁর হাত থেকে। তারপর আমরা যে যেমন মোকা পাই গুলি চালাব। শিকারের এই শিষ্টতা বজায় রাখতে হবে, যেন অন্যথা না হয়।

হাঁকাই শুরু হয়ে গেল। মহারাজার মাচার নিচে দিয়ে সন্তর্পণে আত্ম-গোপন করে ঐকটা বাঘ নিঃশব্দে চলে এলো আমার দিকে। আমি চকিতে হঠাৎ এক ঝলক কমলা রঙ দেখতে পেলাম। বাঘ দ্রুত পায়ে অথচ না-দৌড়ে আমার মাচার কাছে এসে এক মুহূর্ত পিছু ফিরে দেখে নিল, হাঁকাইদাররা কত দূরে। বাঘ দেখে আমি মহারাজার নির্দেশ একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। নিশ্চল বাঘ পেয়ে আমি তার ঘাড়ে গুলি করলাম। গাঁক-আওয়াজ করে সে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু আর গুলির অবসর না দিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে ছুটে চলে গেল। খানিকটা গিয়ে সে কাবু হয়ে বসে পড়ে—একটা ক্ষীণ পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। মিনিট পনের পরে হাঁকাইয়ের লোকজন এসে পড়ল। মাচা থেকে আমরা কেউ যেন না নামি সাবধান করে দিল ও গাছে গাছে চড়ে বাঘটিকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতে লাগল। মিনিট দশের মধ্যেই মুখে মুখে খবর এলো বাঘটি মরেছে।

মহারাজা নেমে এলেন, আমিও নামলাম। তাঁর মুখে চোখে কাঠিন্য। বললেন আমি আগেই আওয়াজ করে শিকারের শিষ্টাচার ভঙ্গ করেছি। তিনি তারপর আমায় কখনও শিকারে যাবার আমন্ত্রণ জানাননি। বাঘটি ছিল—নাকের ও ল্যাজের ডগায় খুঁটি পুঁতে—লম্বায় ন-ফুট চার ইঞ্চি।

এর পর যা দু-একবার বাঘ শিকারে গিয়েছি তা বক্তিয়ারপুর নবাবের পার্টিতে। ওঁদের সঙ্গে গিয়ে আমার দ্বিতীয় বাঘ শিকার। তার পর যেবার আমাদের সঙ্গে দেখা হলো—সেবারও আমন্ত্রণ ছিল বক্তিয়ারপুর নবাবের। এরই জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছিলাম ·৪০৪ বিবরের জেফরি।

স্টেশনে আমেদের সঙ্গে দেখা হলে বলল সে সদ্য বিয়ে করে বৌ নিয়ে গয়ায় যাচ্ছে। সেখানে রাত্রে ডাকবাঙলোয় কাটিয়ে সকালে মোটরে রওনা দেবে নওয়াদায়। সেখানেই সে তখন ডেপুটি পদে নিযুক্ত। আমি জানালাম আমিও যাচ্ছি গয়ায়, সেখান থেকে চাতরায়। আমায় আমেদ সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিল তার স্ত্রী সুলতানার সঙ্গে। বোরখা পরা, মুখের ঢাকা খোলা। বয়স কুড়ি একুশ হবে। ডালিমের দানার মতো লালচে গাল, জুঁইএর মতো সাদা দাঁত, ঘন চোখের পাতায় সুর্মা। তাঁর সঙ্গে সেলাম ও সম্ভাষণ শেষ হলে আমেদ আলাপ করিয়ে দিল স্ত্রীর সঙ্গীনীর সঙ্গে—সুলতানার চাচার কন্যা ফিরোজা। ফিরোজার ছিল শাড়ি পরা সাধারণ বাঙালি মেয়ের বেশ। রঙ—যাকে আমরা বলি মাজা শ্যামবর্ণ। সুলতানার গণ্ডকান্তি যদি

বলা যায় ডালিমের মতো, ফিরোজার বলতে হয়, ছিল আঙুরের মতো। তার মুখের দিকে তাকাতে দেখি তার চোখে অসতর্ক কটাক্ষ। চোখাচোখি হতে ফিরোজা লজ্জিত হয়ে একটু ঘুরে দাঁড়াল। তারিফ করার মতো গড়ন; যৌবনের জোয়ার দেহতট ছাপিয়ে গিয়েছে—যেমন আমরা দেখে এলাম সুন্দরবনের খালগুলিতে। সামনে গিয়ে বললাম আল্লার দোয়ায় আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো, গয়ায় রাত্রিটুকু একসঙ্গে কাটবে বেশ। সকালে চলে যাব যে যার নিজের আস্তানায়। তারপর আমেদের কাছে গিয়ে আস্তে করে বললাম, কি রে, এ যে দেখছি এক ঢিলে দুই পাখি?

আমেদ বলল—তোর যদি লোভ থাকে, একটি না হয় তুই নিস।

আমি বললাম—তোবা, তোবা! ফিরোজা কি অবিবাহিত? আমেদ বলল—সে বড় দুঃখের কাহিনী। ফিরোজার বিয়ে হয়েছিল। আমার স্ত্রীর চেয়ে সে দু-তিন বছর বড়। কিন্তু সে তার মরদের সঙ্গে ঘর করতে পারেনি। তালাক দিয়ে চলে এসেছে।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এলো। মেয়েদের এক কামরায় দুই বোনকে তুলে দিয়ে আমরা পুরুষের এক কামরায় এসে বসলাম। গল্প-গুজবে সারাদিন কেটে গেল। ভরা সন্ধ্যার সময় গয়া স্টেশনে পৌছে ট্রেন থেকে সবাই নেমে এলাম। স্টেশনে উভয়েরই মোটর এসেছিল। ডাকবাঙলোটি স্টেশন থেকে মাইল দেড় দূরে। অবিলম্বে সেখানে সকলে হাজির হলাম।

ডাকবাঙলোটির প্রধান অংশে দুটি শোবার ঘর, মাঝেরটি খাবার ও বসবার। কিন্তু হাতার মধ্যে একটা বহির্বাটিও ছিল—এক কামরার, সংলগ্ন গোসলখানা আর একটা বেশ চওড়া বারান্দা। স্থির হল বড় বাঙলোটির এক কামরায় থাকবেন আমেদ দম্পতি, অপরটিতে ফিরোজা, আর ছোট বাঙলোটিতে থাকব আমি। আমাদের আসার কথা জানানো ছিল। খানসামা-বাবুর্চি বলল আমাদের বিছানাদি লাগিয়ে দিয়ে, খানা খাইয়ে দিয়ে চলে যাবে তারা। আমেদ তথাস্তু বলে, বারান্দায় খাবার টেবল এনে দিতে বলল। ঘরে ঘরে জ্বলল ডীট্‌সের টেবল ল্যাম্প, বারান্দায় ওরা পেতে দিল খানার টেবল, কুর্সি। আমরা চারজন নানা গল্পগুজবে মশগুল হলাম—বিশেষত শিকারের গল্প। সুলতানা বেশি কথা বলল না, কিন্তু ফিরোজা সমানে আমাদের গল্প-আলোচনাদিতে যোগ দিল।

ফিরোজাই আমায় জিজ্ঞেস করল—আমি সঙ্গে রাইফেল নিয়ে চলেছি

কেন? দেখে তো মনে হচ্ছে নতুন কেনা। শিকারের সখ বুঝি আছে আমার। কী শিকার করি?

আমি মোটামুটি এর উত্তর দিলাম। টিকারীর মহারাজার সঙ্গে শিকারে বসে যে-বাঘটি মেরেছিলাম—এইমাত্র বলেছি—সেই গল্প বললাম।

ফিরোজা প্রশ্ন করে বসল—বাঘ যা মারতে যাই তা কি মানুষ খায়?

—না, গ্রামবাসীর গরু-মোষ খায়।

—সে তার খাবার জিনিসই মারে আর খায়। আপনারা ত বাঘের মাংস খান না—বাঘ মারেন কোন ওজরে? আর গ্রামবাসীর গরু-মোষ খায় বলে যদি মারতে হয় তো সামনাসামনি লড়ে মারুন। নানা ফিকিরে ব্যাঘের অজ্ঞাতে গাছের ওপর থেকে লুকিয়ে দূর পাল্লার বন্দুক রাইফেল দিয়ে মারাতে কী বাহাদুরি? তার তো সম্বল শুধু নখ দাঁত আর ইস্পাতের মতো জোরালো মাংসপেশী, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধি আর ক্ষিপ্রতা। আপনারা বলেন শিকার খেলেন। খেলা হয় সমানে-সমানে—ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, কুস্তি—সব তাই। কিন্তু আপনাদের বাঘ শিকার কেমন খেলা? তা ছাড়া যিনি দুনিয়া ও তার প্রাণসম্পদ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছে কী জবাবদিহি করবেন?

ফিরোজার প্রশ্নের জোড়াতাড়া দেওয়া যাহোক একটা জবাব দিলাম; কিন্তু তার স্পর্ধিত যুক্তিতর্কের বহর দেখে অবাক ও সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। জানতে চাইলাম তিনি এত কথা শিখলেন কোথা থেকে? সে উত্তর দিল তার বাবাও কয়েকবার গেছেন বাঘ শিকারে ও একবার একটা চিতা বাঘ মেরেছেন। ফিরোজা তাঁর সঙ্গে তর্ক করে তাঁকে আর শিকারে যাওয়া থেকে নিরস্ত করেছে।

আমেদ বলল—খানাসামা-বাবুর্চি চলে গেছে; এবারে ওঠা যাক। সভা ভঙ্গ করে আমরা উঠে পড়লাম। আমার তখন মনে পড়ে গেল, রাত্রে আমার পিপাসা পায়; আমার ঘরে খাবার জল নেই। মাথাটাও ধরেছিল, একটু অ্যাস্পিরিন দরকার। আমেদকে বললাম—কী ব্যবস্থা করা যায়।

ফিরোজা আগাম হয়ে বলল—তাদের একটা বাড়তি সোরাই আছে। তাতে জল ভরে সে দিয়ে আসবে আমার ঘরে। বললাম, খাসা বাৎ। যদি আমেদের কাছে থাকে তো একটা অ্যাসপিরিনের বড়িও যেন পাঠিয়ে দেয়।

যাবার সময় আমেদ কাছে এসে টিপ্পনি কেটে বলল—দেখিস, সামলে।

দু-দিকে ইট দিয়ে বাঁধানো খোয়া বিছনো একটা রাস্তা বড় বাঙলো থেকে গিয়ে শেষ হয়েছে ছোট বাঙলোতে। দু-ধারে তার কেয়ারি করা বেল ফুলের ঝাড়। টাটকা ফোটা ফুলের গন্ধে বাতাস মাত করে রেখেছে। দশমীর চাঁদ বড় বড় শিরিষ গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে হাতার জমিতে একটা মায়াময় সতরঞ্চ বুনে দিয়েছে। আমার একটু গান গাওয়ার রেওয়াজ আছে, জানেন তো। গান-বাজনা গয়ায় এক ওস্তাদের কাছে শিখেছিলাম, স্কুল-কলেজে পড়ার সময়। চারটি বেল ফুল তুলে সংগ্রহ করে একটা খাম্বাজের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এলাম ছোট বাঙলোয়। গানটা হলো দ্বিজেন্দ্রলালের—"মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে।"

কামরার ভেতরে এসে ডিট্‌স ল্যাম্পের বাতিটা বাড়িয়ে দিয়ে শর্ট-শার্ট ছেড়ে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে একটা বর্মা ধরিয়ে আরাম-কুর্সিতে এসে পা মেলিয়ে একটু বসেছি, এমন সময় দরজায় টোকার আওয়াজ পেলাম।

বললুম—কে?

উত্তর হলো—জী, আমি ফিরোজা। আপনার জন্য জল ও দাওয়াই এনেছি। আমি বেরিয়ে গিয়ে স্বাগত জানিয়ে তাকে ভেতরে ডেকে আনলাম।

সেই সঙ্গে মাথায় একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। সোরাই, গেলাস ও ওষুধটা টেবিলে রেখে দিতে বলে সে ঘরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। শব্দ শুনেই সে চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—বাবুজী, আপনি দরজা বন্ধ করলেন কেন? ওষুধ-জল রেখে আমি চলে যাব।

তার গলার স্বর শুনে মনে হলো সে ভয় পেয়ে গেছে। ভয় পাবারই কথা।

আমি বললাম—তাতে কী হয়েছে? ভয় কী? আমি তো শের নই যে আপনাকে আঁচড়ে কামড়ে দোব? হুরীর মতো খুবসুরৎ আপনি। আমি তো কোন ছার, আপনাকে পেলে শেরও বহুৎ পেয়ার করবে। আমরা ছেলেবেলায় এরকম গল্প শুনেছি যে শের সুন্দরী মেয়েকে পেয়ে আদর করে তাকে পিঠে করে ঘরে নিয়ে গেছে।

ফিরোজা বলল—শেরকে আমি ভয় করিনে। কিন্তু মানুষকে আমি শেরের চেয়ে ঢের বেশি ভয় করি। শের মানুষের দুষমন নয়। তাকে রুখে না দাঁড়ালে বা তার খোরাকের ঘাটতি না হলে মানুষকে সে তেড়ে যায় না বা তার কোনো ক্ষতি করে না। মানুষ কিন্তু বে-ওজর মানুষের ক্ষতি করে বে-ফয়দা বাঘ হত্যা করে। শুধু লালসে।

আমি বললাম—আপনার ওপর আমার কোনো লালস নেই। বিশেষ করে আপনি পরের জনানা, আর এ-রাতে আমার অতিথি। তবে কিনা খুশিসে আপনি আমার তৃষ্ণার জল এনে দিলেন। আমি ভাবলাম বেশ হলো, আপনার সঙ্গে একটু গল্প-আলাপ করা যাক। এখনও রাত বেশি হয়নি; মেহেরবানি করে যখন এসেছেন, একটু বসে যান। আসুন, আমার বিছানাটায় বসুন—বলে তার কোমর বেষ্টন করে খাটিয়ায় নিয়ে এসে তাকে বসালাম। বিনা আপত্তিতে আমার সঙ্গে এসে সে বসল।

ফিরোজা বলল—আপনাকে জল এনে দেবার কোনো লোক ছিল না। আপনি আমেদ সাহেবের কলেজের দোস্ত। তাই আমি স্ব-ইচ্ছায় আপনাকে জল দিতে এলাম। এখন জল-দাওয়াই গেল—আপনি চাইছেন আমার মতো একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে গল্প করতে! আপনারা গুণী লোক, সমাজের তক্তে আপনাদের জায়গা। আপিস-সেরেস্তা-আদালত-ক্লাব হলো আপনাদের এলাকা। আমি মূর্খ স্ত্রীলোক—আপনার সঙ্গে গল্প-আলাপ কী করতে পারি?

আমি বললাম—আপনি মূর্খ হতে যাবেন কেন। মূর্খ কেউ কি আপনার মতো কথা বলতে পারে?

—একটু আগে আপনি বলেছেন আমি হুরির মতো; এখন বলছেন আমি কেন মূর্খ হব। তাহলে হুরিরা শুধু খুবসুরৎ নয়, খুব বুদ্ধিমতী? আপনি কি হুরি দেখেছেন?

আমি বললাম—আমি স্বপ্নে একবার এক হুরি দেখেছি। আমার খুব মনোকষ্ট হয়েছিল। সে এসে আমায় বুকে জড়িয়ে নিয়ে চোখের জল মুছে দিল। আপনি দেখতে ঠিক তারই মতো।

সে বলল—স্বপ্ন সত্য হয় না; আর আমিও হুরি নই। তাছাড়া, আপনার কিসের মনোকষ্ট? টিকারীর মহারাজা আর আপনাকে বাঘ শিকারে দলে নেন না, সেই দুঃখ?

ফিরোজার বাক্‌চাতুর্যে আমি যেমন মোহিত হলাম, তেমনি অবাক হলাম তার প্রতিভার অসামান্যতায়। বললাম—শের, হুরী থাক। আমায় আপনি আপনার নিজের জীবনের, বাপ-মা-স্বামীর গল্প বলুন। আমেদের কাছে শুনেছি আপনার শাদি হয়েছে এক আমীর আদমির সঙ্গে।

সে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ভারি গলায় বলল—কী আর আমার জীবনের গল্প! সে সামান্য কহানি শুনে আপনার কি ভালো লাগবে?

—যত সামান্যই হোক, বলুন আমি শুনব। বুঝতে পারছি আপনার জীবন-অভিজ্ঞতা বিষাদের। তার যতটুকু বলতে ইচ্ছে না হবে ততটুকু বাদ দিয়ে বলুন।

দুহাতে গাল রেখে সে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আমার শুধোল—স্বামীর কথা কী বলেছেন আমেদ সাহেব?

—বলেছেন, তিনি খুব ধনী ব্যবসাদার। তবে আপনার সঙ্গে নাকি তাঁর সমজোতার ঘাটতি হয়েচে।

ফিরোজা বলল—সব কথা আমি খোলসা করেই বলছি। গোলাম রসুলকে, যার সঙ্গে আমার সাদি হয়েছিল, আমি তালাক দিয়ে চলে এসেছি। আমেদ সাহেবের শ্বশুর আমার চাচা। তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

সে বলে গেল—তারা বিহারী মুসলমান, গয়া জেলার। ছোট বয়সেই তার মা মারা যান। বাবা ওকে অতি যত্নে ও আদরে মানুষ করেন। বাবার ছিল চাঁদনিচকে কাটা কাপড়ের দোকান। খুব ফলাও কারবার। শুধু কলকাতায় নয়, তাঁর খদ্দের ছিল বাঙলা মুলুকের তামাম সব শহরে—বর্ধমান, আসানসোল, রানীগঞ্জ, বহরমপুর, কুষ্টিয়া, জলপাইগুড়ি, রঙপুর প্রভৃতিতে। এই সব শহরে দুবার করে ঘুরে অনেক অর্ডার নিয়ে আসতেন। ওদের বাড়ি ছিল কনভেণ্ট রোডের এক গলিতে। গোলাম রসুলও গয়া জেলার লোক, আর তারও বাড়ি ছিল ওই গলিতেই। তাঁর বাবা ছিলেন ওর বাবার দোস্ত। রসুলের জোয়ান বয়স, চর্বির ব্যবসায় সে খুব ফেঁপে উঠেছিল। বড় বড় সাবানের কারখানায় সে চর্বি যোগান দিত। পাটকিলে রঙের হুইলার ঘোড়া জুতে টমটম হাঁকিয়ে ফিরোজাদের বাড়ির সামনে দিয়ে সে যাতায়াত করত—পাড়ার লোক খুব তারিফ করত। ফিরোজার বাবা এক সাহেব মক্কেলকে ধরে তাকে লরেটোয় ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার সময় এক-একদিন গোলাম রসুল ফিরোজাকে দেখতে পেলে টমটমে তুলে নিয়ে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনতেন। তখন সে পড়ত স্কুলের ওপর ক্লাসে। এর কিছুদিন পরেই বাবার কারবারে খুব মন্দা আসে। কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় কাটা কাপড়ের দোকান ছড়িয়ে পড়ায় চাঁদনীর জলুস কমে যায়। তার বাবা রসুলের কাছে কিছু মোটা কর্জ করে সেবার সামলে যান। কিন্তু বছর দুই পরেই তাঁর কারবার ফেল মারে। রসুল ওর বাবার কাছে ধারের টাকা দাবি করে বসে। ওর তখন লরেটোর সেকেণ্ড-ইয়ার। একদিন ও শুনল রসুল ওর বাবাকে

বলেছে যে ওর সঙ্গে রসুলের সাদি দিলে ধারের টাকাটা মকুব করে দেবে। শুনে ও বেঁকে বসল—ওই কলেজে না-পড়া চর্বিওলাকে কিছুতেই সে বিয়ে করবে না। কিন্তু ওর ওজর রইল না। দেনার দায়ে বাবা রসুলের সঙ্গেই ফিরোজার বিয়ে দিলেন।

তারপর থেকে শুরু হলো ফিরোজার দুঃখের জীবন। রসুলের ঘরে এসে কিছুদিনের মধ্যেই ও জানতে পারল তার এক পেয়ারের আওরৎ আছে। তাকে রসুল এক-এক দিন বাড়ি আনত। একদিন ফিরোজাকে টেনে এনে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গেল। ফিরোজার শরীরে মনে আগুন জ্বলে উঠল। ও মোল্লা ডেকে এনে তালাক দিয়ে চলে এল। ওর বাবা তখন মৃত্যুশয্যায়। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর যা কিছু ছিল সব রসুলের হাতে গেল। ফিরোজা আশ্রয় পেল তার চাচার বাড়িতে।

তার জীবনকাহিনী শেষ করে ফিরোজা বিমর্ষ হয়ে বসে রইল। আমি বললাম—মানুষ না জানোয়ার! আপনি ঠিকই বলেছেন—মানুষকে লালস জানোয়ারের চেয়ে খারাপ বানায়। কী দরকার ছিল আপনাকে সাদি করবার যদি তার পেয়ারের জেনানা ছিল? আমার নসিবে যদি আপনার মতো স্ত্রী লাভ হত—

ফিরোজা আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলল—আপনার নসিবে যদি আমার মতো বেপরোয়া মুখরা স্ত্রী লাভ হত তো কী করতেন আপনি? আর আপনি কি মুসলমান মেয়ে সাদি করে ঘরে তুলতেন?

আমি ফাঁপরে পড়লাম। তবু বললাম—হিন্দু-মুসলমান সাদি তো দু-একটা হচ্ছে। আরও হোক না কেন। আমার সাথে সাদি হলে আমি আপনাকে রাখতাম বুক পকেটের রুমাল করে।

সে বলল—ওসব কথা আমি খুব জানি। বাঘ আর পুরুষ মানুষ আপনারা সবই এক জাতের; হয় ডোরাকাটা নয় গুলদার। খোরাক চাই যেমন করে হোক। বাঘ তবু ভালো, জীব হত্যা করে পেটের দায়ে, আর আপনারা অপরের সুখ-সম্পদ লুটে কেড়ে নেন বেবাক নেশার দায়ে।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম,—একদম না। সাদি না হলেও আপনাকে আমি গলার মালা করে নিতে পারি, যদি অভয় দেন।

সে বলল—ও মতলব আপনার আমি আগেই বুঝেচি। কিন্তু আপনি যা চান তা হবে না! শুধু এক রাতের জন্ত ফিরোজা কারুর গলার মালা হতে

চায় না। যদি মালা হতেই হয় তো জীবন ভরের জন্য। নয়তো গোলাম রসুলকে ছেড়ে এলাম কেন।

আমি চুপ করে রইলাম। দক্ষিণের বাতাস বইছিল এলোমেলো। দশমীর চওড়া একফালি চাঁদের আলো জানলা দিয়ে ফিরোজার মুখের ওপর পড়ে তাকে অপরূপ মায়াবিনীর মতো দেখাতে লাগল। ঈষৎ একটা আভা তার মুখে চোখে খেলে গেল। কোথা দিয়ে আমার সংযমের বাঁধ ভেসে গেল। ফিরোজাকে দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে তার মুখ-চুম্বন করলাম। কোনো বাধা দিল না সে। শুধু আমার হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—আর বেয়াদবি করলে চলে যাবে সে।

আমি বললাম—দরজা খুলে দিচ্ছি। য়না হ বলুন সঙ্গে নিয়ে আপনার ঘরে পৌছে দিয়ে আসি।

ফিরোজা একটু থমকে থেকে বলল—আমি কী করে এখন যাই! গেলে বহিনজী টের পাবে। এখনও সে ঘুমোয়নি। মনেক রেছে আমি কামরাতেই আছি, জল দিয়ে অনেক আগেই ফিরে গিয়েছি।...তার চেয়ে রাত্তিরটা আপনার ঘরেই থাকি—কৃপা করে যদি গলার মালা বা বেয়াদবি না করেন। বলুন—

আমি বললাম—আপনার হুকুম পুরা তামিল করব। আমার বিছানায় আপনি শুয়ে যান, আর আরাম-কুর্সিতে আমি লেটে যাব। ভোর হলে চলে যাবেন।

সে রাত্রে যা ভাবতেও পারিনি, তাই হলো। ফিরোজা বলেছিল স্বপ্ন সত্য হয় না। আমার স্বপ্ন কিন্তু সত্য হলো, ফিরোজা তার রণচণ্ডী মূর্তি ত্যাগ করে আমার কাছে ধরা দিল।...

ভোরের আগে অন্ধকারটা যখন পাতলা হয়েএ সেছে—আমার হাতে রাখা তার মাথা তুলে নিয়ে উঠে পড়ল! বেশবাস ঠিকঠাক করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। বলল—আপনার মতলব পূরণ হলো, এখন আমায় পৌচে দিয়ে আসুন।

আমি তৈরি হয়ে বললুম—চলুন।

যাবার মুখে গাঢ় স্বরে সে বলল—বাবুজী, আপনার মতলব বুঝেছি বলে আপনার বদনামি করেছি। কিন্তু আমার নিজেরই মাথার ঠিক ছিল না। হাওড়া স্টেশনে পয়লা যখন চোখাচোখি হয়, তখনই আমার মনে একটা শঙ্কা

জেগেছিল। তারপর যখন সোরাই ভরে জল দিতে এলাম আপনার ঘরে, তখন কোথায় তলিয়ে গেলাম। যা পেলাম তা শুধু এক রাতের, কিন্তু তা সাচ্চা জহরৎ। আমাদের বয়সের মেয়েরা যা চায় তা হলো মহব্বৎ। আমার জীবনে এই প্রথম তা পেলাম। একে আমি সারা জীবন আমার গলার লকেট করে রাখব। কিন্তু আপনি? আপনি কি এই সামান্য তুচ্ছ এক মেয়ের সঙ্গে একরাত্রি-বাসের কথা মনে রাখবেন?

তার কাঁধ দুটি ধরে আমি বললাম—ভুলব না কখনও আপনাকে।

সে বলল—আমার কথা মনে রাখতে হলে মানতে হবে আমার তর্ক-যুক্তি। বাঘ তো আপনাদের দলের শিকারীদের কোনো অনিষ্ট করে না। তাই আপনার আর বাঘ মারা চলবে না। আমার এই তুক রইল, যদি বাঘ শিকারের আপনি চেষ্টা করেন তো আপনার গুলি যাবে ফস্কে। মনে রাখবেন এই হলো আমার হক।

তখনকার মতো "আপনার হক রাখব"—বলে ফিরোজাকে তার কামরায় পৌছে দিয়ে এলাম। দরজা শুধু ভেজানো ছিল—টানতেই খুলে গেল, সে ভেতরে চলে গেল। আমেদ দম্পতি ঘুমিয়েছিলেন।

সকালে উঠে তৈরি হয়ে চা খেয়ে আমরা যে যার মোটরে উঠে পড়লাম।

চাতরায় বাবার বাঙলোয় পৌছে তাঁকে আমার ·৪০৪ জেফরি রাইফেল দেখালাম। দু-দিন পরেই বক্তিয়ারপুর নবাবের আমন্ত্রণ এলো বাঘ শিকারের। খবর এসেছে মোষ বাঁধা হয়েছিল, তা হত হয়েছে ও তার খানিকটা বাঘ খেয়ে গেছে। মড়িটা সরিয়ে খুঁটিতে বেঁধে নিকটের দুটি গাছে মাচা বাঁধা হয়েছে। একটি আমার জন্য, অন্যটি স্বয়ং বক্তিয়ারপুর নবাবের জন্য।

বিকেল থাকতেই মাচায় উঠে বসলাম। আগের দিনে একটা নির্জন জায়গায় চাঁদমারি বানিয়ে রাইফেল চালিয়ে তার মাছির খাড়াই ও নিশানা সাবুদ করে নিয়েছি। মাচায় উঠে রাইফেল হাতের কাছে জুৎসই করে রেখে দারুণ প্রতীক্ষায় বসে আছি। প্রথমে আবির্ভাব হলো একটি শেয়ালের। এদিক-ওদিক একটু দেখে সে ত্বরিত ভাবে পালিয়ে গেল। খানিক পরে এলো একটা শুয়োর। সে এক কামড় লাগাল মড়িটাতে। সঙ্গে সঙ্গে উঠল চাপা গলায় গুরুগম্ভীর ধমকের আওয়াজ। অবিলম্বে শুয়োর মহারাজ দিলেন চম্পট। একটু পরেই দেখলাম কী একটা বস্তু যেন মাটির ঘাস-কুটোর ওপর দিয়ে একটু একটু করে সরে সরে আসছে। বুঝলাম বাঘ আসছে অতি সন্তর্পণে

মাটিতে মিশে গিয়ে। একটু পরে তার সবটা স্পষ্ট দেখলাম। মড়িটার একেবারে কাছে। বাঘটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে থেকে অনেকক্ষণ ধরে এদিক-ওদিক ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। কী সুন্দর দেখতে, আর তার আসাও যেন ম্যাজিকের খেলার মতো। শেষবার এদিক-ওদিক দেখে মড়িটার গা ঘেঁষে উঠে দাঁড়াল। তারপর লাশটার কাঁধের কাছটায় মুখ দিয়ে চেপে ধরে খুঁটির বাঁধন ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করল খানিকটা। না-পেরে রাগে গোঁ গোঁ করল কয়েকবার। তারপর পাছার কাছে দাঁত বসিয়ে মাংস টেনে ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করল। এইবার আমার গুলি করবার অবসর—স্থির হয়ে বসে খাচ্ছে সে। রাতে যদি রাইফেল চালাতে হয় তাই তার ডগায় লাগিয়েছিলাম বড় মাপের মাছি। গোধূলির আলোয় সেটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। অত্যন্ত ধীর স্থির হাতে বাঘের কাঁধে নিশান করে আস্তে আস্তে ট্রিগারে চাপ দিলাম। কিন্তু কী এক ছায়ামূর্তি যেন আমার হাত চেপে ধরে বলল—ও তো আমার কোনো ক্ষতি করেনি। ওর নিজের আহার্য ও খেতে এসেছে। আমার হাত চেপে ধরার ফলে রাইফেলের মুখ উঠে গেল—গুলি চলে গেল বাঘের ওপর দিয়ে। বাঘ একটু পিছু হটে লাফ মেরে চলে গেল। নবাব সাহেব আমার গুলির শব্দ শুনে তৈরি হয়েছিলেন। বাঘটা তাঁর মাচার দিকে ছুটে গিয়ে তার বেগ থামিয়ে গুটি গুটি চলে যাবার সময় নবাব সাহেব তাকে ধরাশায়ী করেন।

তার পর থেকে গয়ার আশেপাশে যতবার গিয়েছি বাঘ শিকারে, ততবারই শুনেছি ফিরোজার সতর্কবাণী—ও তো তোমার ক্ষতি করেনি; ততবারই বিফল হয়েছি। গতকালও যখন 'বড়বালিতে' বাঘের ওপর তিন-তিন বার গুলি চালাই, ততবারই ফিরোজার অশরীরী ছায়ামূর্তি আমার হাত চেপে শিকার নষ্ট করে দিয়েছে। বলেছিলাম তাকে তার হক রাখব—আজ দশ বছর হয়ে গেল, তবু তার ইন্দ্রজালের মোহ এড়াতে পারলাম না।

দাশগুপ্ত নিস্তব্ধ হলেন। একটানা আওয়াজ করতে করতে বাগচির চালিত লঞ্চ ফিরে চলেছে। আকাশে উপচে পড়া আলো। নদীর পর খাল, খালের পর নদী। বিকেলে আমরা পোর্ট ক্যানিং ফিরে এলাম।

'বড়বালির' বাঘটি মারা পড়েছিল বাগচি ও ঘোষের যুগ্ম গুলিতে, এর পরের এক যাত্রায়।

সাদা ঘোড়া

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিক চিক করে বালি কোথা নাই কাদা, দুই ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা। এই নদীর চরে উড়লে বোঝা যায় ফেনতু আসবে তার সাদা ঘোড়া নিয়ে। নদীর পারে পারে কাশবন। সকাল হলেই সূর্য ওঠে। পাখিরা উড়ে আসে এবং গ্রীষ্মের দিনে জল কম থাকলে পার হয় গরু, পার হয় গাড়ি'। ফেনতুর বাবা সহরে যায় গঞ্জে যায়। সঙ্গে ঘোড়া থাকে। ঘোড়ার পিঠে লট বহর। পাল বাবুর বাক্স যায়, গঞ্জের হাটে ঘোড়ার পিঠে আলু পটল যায়। ফেনতুর বাবার ঘোড়াটা লাল রঙের। নাম তার পংখি। এবং গত সালে এই পংখি একটা বাচ্চা প্রসব করেছে। ফেনতু ডাকে অনজি। ফেনতুর ঘোড়া সাদা রঙের। সকাল হলেই অনজি মার সঙ্গে মাঠে নেমে আসে, মায়ের সঙ্গে লেজ নেড়ে নেড়ে ঘাস খায়। মাকে ছেড়ে অনজি কোথাও যায় না! গরমে মাঠ রাঙা, বাতাসে ধুলো—সূর্য দেখা যায় না আকাশে। মনে হয় মেঘ জমে আসছে। ফেনতুর বাবা তখন মাঠে নেমে ডাকে—অন্‌জি, পংখি বাড়ি আয়। ফেনতু বাড়ি আয়।

এই লাল রঙের পংখিকে বাবা কতকাল আগে নতুন হাট থেকে কিনে এনেছিল। অনজি ঘরের দিকে ফিরলেই মনে হয় মল বাজিয়ে উঠে আসছে, পংখি উঠে আসে ধীরে ধীরে। ভাল খেতে দিতে পারে না বলে পংখি এখন নির্জীব। বাড়ির দিকে উঠে আসার সময় টল টল করে তাকিয়ে থাকে। ফেনতুর ইচ্ছা হয় তখন দু পায়ের দড়ি খুলে দিতে। খুলে দিলে পংখি এবং অনজিকে নিয়ে সেই বড় মাঠে এবং নদীর পারে চলে যেতে পারবে। এখন বাবা ঘোড়াটাকে চানা পর্যন্ত খেতে দিতে চায় না। সেই দুর্বৎসরে বাবা এবং গ্রামের কিছু লোক সেই যে কোথায় মাকে বাঁধা ছাঁদা করে নিয়ে গেল আর ফিরিয়ে আনল না। সেই থেকে সংসারে কেমন অভাব অনটন। বাপের পংখিই কেবল সম্বল। বাপ নতুন হাটে অথবা গুসকরা কখনও কখনও বলগনা ঘোড়ার পিঠে বাবুদের এবং সূর্য সাহার মনিহারি দোকান বোঝাই দিয়ে চলে যায়। প্রায় দিনের পথ। ফেনতু একা। এই বাড়িতে আর কে আছে। আগে আগে বাপের সঙ্গে গঞ্জে যেত, সহরে যেত। ফেনতুর বয়স তখন আর কত।

সে শুধু মনে করতে পারে—মাঠে মাঠে ফসল ফলত! সূর্য সাহা বলত, তুই নগেন দুই বিঘা ভুই কিনে ফেল।

বাপ হাসত। খেতে নাই যার কিছু, এই পংখি যার একমাত্র সম্বল—তাও বউটা বেঁচে থাকলে সংসারে সব সময় এত দুঃখ থাকত না—বউটা বড় লক্ষ্মী বউ ছিল। হাতের গহনা পায়ের বৈজু, কোমরের রূপোর বিছাহার দিয়ে এই পংখিকে কিনে এনেছিল নগেন। পংখির এখন বয়েস হয়েছে।

শুধু আশা ভরসা পংখির একটা ছানা হয়েছে। রঙ তার সাদা। পাল দিতে ছুটে এসেছিল সেনেদের ঘোড়া। সে কি দুই ঘোড়ার চিৎকার! পংখি তখন দামাল বনে গেছে। দড়ি দড়া ছিটকে বের হয়ে গেছে! তারপর দুই ঘোড়া মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে থাকলে বাপ চলে গেল কোথায়। পংখি ফিরে এল যেদিন, সেই দিনে বাপও ফিরে এল। বাপের সঙ্গে এল নতুন বউ। বাপ দুই বিঘা ভুঁই পেয়ে নতুন বৌ ঘরে তুলে আনল।

বাবু বললেন, তা নগেন তোমার কপালে দুই বিঘা ভুঁই মিলে গেল।

—তা গেল বাবু। সব বাবুদের দয়া।

দয়া যে কার, বাবুর না নসিবের নগেন এখন আর তা ঠিক মনে করতে পারে না। নগেন সকাল হলেই বৌকে বলে, চিড়া কুটে দে। অথবা কোচড়ে মুড়ি নিয়ে নগেন দুই হাত সম্বল করে চাষের জমিতে চলে যায়! ফেনতু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। সূর্য সাহার লোক আসে। সে এখন এই পংখিকে খাটায়। টাকায় এখন ভাগ হয়। বাপ দুই বিঘা চাষের জমি পেয়ে পংখিকে কেমন ভুলে যাচ্ছে। পংখিও যেন এটা বুঝতে পারে। সূর্য সাহার লোক এলেই আস্তাবলে পংখি পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে অথবা কোন কোন দিন পংখির নাকে এক রকমের শব্দ হয়। ফেনতু বুঝতে পারে পংখি ভীষণ রেগে গিয়ে নাক ঝাড়ছে। আগে আগে গঞ্জ থেকে ফিরলেই ফেনতুর কাজ বেড়ে যেত। নগেন ঘোড়ার পায়ে দড়ি বেঁধে দিলে ফেনতু পিছনে পিছনে ঘোড়া নিয়ে মাঠে নেমে যেত। সে নদীর ধারে চলে যেত। আকাশে শরতের বৃষ্টি। বর্ষা এলে কাশ ফুল ভিজে যায়। তখন মাঠের ভিতর আকাশের নিচে ফেনতু লাল রঙের ঘোড়া এবং কাশ ফুল—নদীর জল ঘোলা ঘোলা। এই বুঝি কোথাও পাড় ভাঙল! ফেনতু পংখিকে ঘাস খাওয়াতে খাওয়াতে সহসা পার ভাঙার শব্দে ওর বুক কাঁপে। ঘোড়াটাকে ফেনতু কাশবনের ভিতর নিয়ে যায় না, যেখানে সবুজ ঘাস মঁ মঁ করে বেড়ে উঠেছে ফেনতু ঘোড়া নিয়ে সেদিকে উঠে আসে।

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সে গান গায়। মা গানটা গাইত বর্ষাকালে, বাপ যখন গঞ্জে যেত পংখিকে নিয়ে তখন কাঁথার ভিতর ফেনতুকে জড়িয়ে একটা গান, গানটার সব মনে পড়ে না—রাজপুত্র আসে ঘোড়ায় চড়ে, তারপর কি সব কলি এবং শেষে এক পাল্কি, পাল্কির কথা মনে হলেই মার কথা মনে হয়। মা বলত, পংখির ছানা হলে নিয়ে যাবে। রাজপুত্রের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। তারপর মা হাসত। মা, বাবা গঞ্জে গেলে রাজা না-হয় রাজপুত্রের গল্প করত। ফেনতুর সেই থেকে এই সব মাঠে অথবা নদীর পারে পায়ে হাঁটলে মনে হতো, এক রাজা অথবা রাজপুত্র নদীর ও-পারে ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে। নদী পার হতে পারলেই বুঝি দুঃখী মা তাকে রাজার দেশে নিয়ে যাবে।

কিন্তু কারা এসে সেই যে মাকে বেঁধে-ছেদে নিয়ে গেল, মা আর ফিরে এল না। সূর্য সাহার লোক এসেছে ঘোড়াটাকে নিতে। ঘোড়াটা এত নির্জীব যে ভাল করে হাঁটতে পর্যন্ত পারে না। কিন্তু সেই লোকটা লাগাম ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। পেটে খোঁচা মারল। বাপ গেছে জমিতে—বাপের দুই বিঘা ভুঁই মিলে গেছে। কেউ নেই যে নালিশ দেবে ফেনতু। কেবল ঘরের ভিতর শৈল ওর দিকে চেয়ে আছে দেখতে পেল। ভয়ে ভিতরটা ফেনতুর শুকিয়ে যাচ্ছে। অনজি গেছে কোথায়? সূর্য সাহার লোকটা পংখিকে নিয়ে গেলে অনজি নিরুদ্দেশে চলে যেতে চায়। অনজি পংখির পিছু পিছু পথে নেমে আসে, ফেনতুর কাজ অনজিকে ধরে রাখা, না রাখলে মাঠে নেমে ছুটতে হয়। সে বড় ঝকমারি। সে পুকুর পার ধরে বাঁশ বনে ঢুকে সন্তর্পনে লুকিয়ে থাকল। আলে ঘাস খেতে লাগলেই পিছু ছুটে কানে খপ করে ধরে ফেলবে। যেদিকে ওর মা গেছে, অনজি সেদিকে হাঁটতে থাকল।

ফেনতু রাস্তায় নেমে এল একটু পরে। রোগা মেয়ে নাকে নথ। পায়ে রূপোর মল। ছুটলে ঝম ঝম শব্দ হয়। ঝম ঝম শব্দ পেলেই অনজি মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে থাকে। সে তাই পা টিপে টিপে, যেন পায়ে শব্দ না হয়, পাখি না ওড়ে, ঘাসের কীট পতঙ্গ পর্যন্ত টের না পায় অথবা বর্ষার জল ঝম ঝম শব্দে নেমে এলে এই বুঝি সব ভেস্তে দিয়ে গেল—ফেনতু একেবারে বড় বড় পা ফেলে না। ছোট ছোট পায়ে কড়ি ঘাসে ফড়িঙ যেমন খেলে বেড়ায়—তেমন নিত্য এই ঘোড়ার বাচ্চা নিয়ে মাঠে ফেনতুর খেলা। সৎ মা শৈলর চোখ মনে পড়তেই সে তাড়াতাড়ি অনজিকে খুঁজতে থাকল। কাপড়ের খোটে বেঁধে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। রেঁধে-বেড়ে সৎমা বসে থাকবে। বাপের

ভাত নিয়ে যেতে হবে মাঠে। স্কুলের ঘড়িতে দশটা বাজে। সে চারদিকে তাকাল। বাপের ওপর অভিমানে অনজিকে বেঁধে রাখেনি। ছেড়ে দিয়েছে। কোথায় যে অনজি! সকাল থেকে সে বসে থাকল, না কোথাও ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অনজির গলা নড়লেই ঘণ্টা বাজবে। বাপের ভাত দিয়ে আসার সময় হয়ে গেছে। ফেনতু এবার কান্না কান্না গলায় ডাকল, অনজি। কোথাও কোন শব্দ হলো না। ফেনতু অনজিকে ডাকলে, কোনো কোনো সময় সাড়া আসে। আজ সে সাড়াটা পর্যন্ত পেল না। ফেনতুর কান্না পেতে থাকল।—আয় অনজি। লক্ষ্মী আমার, তুই না এলে মা আমায় মারবে, বন-বাদারে চলে যেতে বলবে। কিন্তু কোথায় অনজি, কোথায় গলার ঘণ্টার শব্দ। সে অনজিকে কোথাও না পেয়ে বাড়ি উঠে এল।

শৈল দেখল একা ফেনতু বাড়ি ফিরছে। ওর সোহাগের ঘোড়ার ছানা, বছর ঘুরে এলে সোনার দামে বিক্রি, বিছে হার হবে, হাতে বাজু, কানে মাকরি, কিন্তু অনজি নেই, একা ফেনতু। সে চিৎকার করে বলল, পোড়ামুখি, গতরখাকি অনজি কোনখানে?

ফেনতু গাছের দিকে তাকাল। শৈলর দিকে তাকাতে সাহস পেল না। পিঠের ওপর গুম করে কিল পড়বে। সে পিঠ শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকল।

এখন এই সাদা রঙের ঘোড়া গেল কোথায়। ঠিক যেন এক হরিণ ছানা। বিলাতি হরিণ ছানা। কেবল মাঠের ভিতর লাফায়। লোকে দেখলে বলে, নগেনের বেটা নেমে এসেছে। দুঃখে কুটিলা বেদম প্রহার করল ফেনতুকে। বাপের চোদ্দ গুষ্টি, মায়ের বংশ এবং সতীনের ঘর সাত জন্মে যেন কেউ না করে—আর কি বলে, আর বলে না—বাঁজা মাগি মাজা দোলায়, যা মুখে আসে তাই ফেনতুকে তিরস্কার করতে থাকল। মেয়েটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। শক্ত পিঠে দাঁড়িয়ে মার খায়। বাপ এলে কোনো কোনো দিন বলতে পর্যন্ত সাহস পায় না। অথবা মাঠে গেলে বাপকে সে ভয় পায়, বাপ কাদা করছে, এখন রোয়া পুঁতবে। সে যাবে ভাত নিয়ে। মা এখন ভাত বাড়ছে। মা না ডাইনি! ফেনতু ঘৃণায় মায়ের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। বরং সে দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকল। একদিন অনজিকে নিয়ে সে কোথাও চলে যাবে, কেউ টের পাবে না।

শৈল বলল, সাত জন্মের আবাগি। আমার কাছে রেখে গেল। মরলে হাড় জুড়ায় বাঁচি। এই বলে ভাতের থালা মাথায় তুলে দিল ফেনতুর। সেই

নদীর পারে, যেখানে এখন কাশ ফুল ফুটবে, জল ফুলে ফেঁপে কিনার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে পার খাড়া, মাটি পড়ছে জলে. টুপটাপ, কোথাও নদী আপন বেগে ফসলের খেত নিয়ে বুক ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে সেখানে ভাত মাথায় করে যাবে ফেনতু। যাবার সময় সোজা পথের দিকে তাকাবে না—চারদিকে তাকাবে—অনজি পংখির পিছু পিছু মাঠে নেমে পথ হারিয়ে ফেলতে পারে অথবা বাপের সঙ্গে নদীর পারে চলে যেতে পারে। সূর্য সাহার লোকটা ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এবং গঞ্জের হাটে বিক্রি করে দিলে কে ধরবে। আর যদি অনজি মায়ের পিছনে নাচতে নাচতে দুলতে দুলতে গঞ্জেও চলে যায় তবে একা একা ফিরে আসতে পারবে না। বুক কাঁপে। এই বুক, ছোট্ট বুকে কত আর ভালবাসা রেখেছে অনজির জন্য—মার জন্য যা ভালবাসা ছিল, অনজি বড় হতে গিয়ে সব কেড়ে নিল। মার মুখ মনে পড়ে। কোনো কোনো দিন যখন সূর্য ডুবে যায়, নগেন মেয়ের হাত ধরে যখন বাড়ি ফেরে অথবা মেয়েটা বর্ষার জলে একা নদীর পারে দাঁড়িয়ে কাশ ফুল তুলে আনে—তখন বুঝি মেয়ের প্রাণে মায়ের কথা উদয় হয়। নদীর পারে এলেই ফেনতুর চোখ ছল ছল করতে থাকে। মাকে বাবা নদীর ওপারে কোথায় রেখে এসেছে। সে একবার অনজিকে নিয়ে নদীর ওপারে চলে যাবে মাকে খুঁজতে।

ভাতের থালা মাথায় নিয়ে বাড়ি থেকে নামার সময় পেছনে তাকায়, সৎমা শৈল হাঁকছে, হারামজাদি মেয়ে অনজিকে না নিয়ে এলে বাড়ি ঢুকবে না। তোমার মা যেখানে গেছে দয়া করে সেখানে চলে যাবে বাছা। না হলে চেলা ভাঙব পিঠে। এইসব শব্দগুলি ফেনতুর মনের ভিতর ক্রমে এক ঝড় তুলছে। সে ডাকল, মা, মাগো। কি যেন অশুভ চারদিকে ওর ঘুরছে। বাপকে বললে, কিছুই হবে না। বাবার মুখ হতাশায় ভরে যায়। কোনো কোনো দিন রাগ করে খায় না। বারান্দায় মাদুর পেতে ফেনতুকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। মধ্য রাতে ফেনতু জেগে গেলে টের পায়—বাবা এখন ভিতরে, মার সঙ্গে ফিস ফাস কি সব কথা বলছে—তখনই ভয় হয়, বুঝি বাবা এবং সৎমা মিলে মার মতো তাকেও বনবাসে দিয়ে আসবে। মাদুরে একা ফেনতু, চারদিকে অন্ধকার, বাঁশ গাছে জোনাকি জ্বলছে, কিসের যেন শব্দ চারদিকে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। রাতের কীট পতঙ্গ শব্দ করছে। অথবা মনে তার চারদিকে সব বন্যজন্তু। সে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরিচিত কাঠবিড়ালিকে বলছে, নিয়ে যাবি আমাকে, মায়ের কাছে চলে যাব। তারপর গরুর ছানা,

পাখির ছানা, যার যা ছানা যত, যেন সবাই মিলে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ওর সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। মাঝ রাতে মা যে কি সব ফিস ফিস করে বলে বাবাকে, বোঝে না। ওর মনে হয় এক ডাইনি বুড়ি বাবার কানে মন্ত্র পড়ছে। বাবার সব রাগ কেমন উবে যায়। সকাল হলেই বাবা কেমন গোল গোল চোখে তাকায় ফেনতুর দিকে। চোখ দেখলেই বুঝতে পারে বাবা সব রাগ ভুলে গেছে। মেয়ের ওপর রাগে এখন কটমট করছে। এই মেয়ে যত অশান্তির মূলে। বাপ তেড়ে আসে সকাল না হতেই। চুল ধরে বিছানা থেকে টেনে তোলে, সংসারে কুটোগাছটি দিয়ে সাহায্য হয় না। ভয়ে ভয়ে ফেনতু কাপড়টা বগলে নিয়ে মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—বাপ রাগলে মাথা ঠিক থাকে না। মেয়ে যেন দিন দিন মাঠ পেলে, নদী পেলে আর অনজি থাকলে সারা মাঠে যেন সে নাচে না, উড়ে বেড়ায়। বাপ ফেনতুকে ধরার জন্য কোনো কোনোদিন পেছনে ছোটে। ফেনতুর সঙ্গে বাপ দৌড়ে পারে না। তখন নগেন ভয়ানক ক্ষেপে যায়, চিৎকার করতে থাকে, ফেনতু পিঠে তোর পড়বে, আমার হাতে তুই মরে যাবি একদিন।

কাকে বলবে আর, অনজি থাকলে বলতে পারত, মা আমাকে খেতে দেয়নি অনজি। তারপর বনবাদারে ঢুকে যাওয়া—গাছে গাছে কত ফুল ফল ফলে থাকে। এখন সারামাঠে তিল ফুলের গাছ। সে নদীর পারে যাবার সময় ফুল থেকে চুষে চুষে মধু খাবে। অথবা অনজি থাকলে সে অন্য একটা গাছের খবর রাখে, বনের ভিতর ছোট্ট গাছ, সফেদা ফলের গাছ, মিষ্টি ফল। বাপকে ভাত দিতে যেতে না হলে সে এখন সেখানে চলে যেতে পারত। বনের গাছ, বনের পশুপাখি ফল খায় মধু খায়, ফেনতু বনের জীবের মতো হয়ে যায় তখন। তা ছাড়া অনজি না থাকলে সে সেখানে যেতে সাহস পায় না, পথটা একেবেঁকে গেছে, কোন কোন জায়গায় বড় জলাশয় আছে, অনজি থাকলে ফেনতুর কোন ভয় থাকে না। যেন অনজি এইসব গাছপালা পাখি এবং মাঠ, মাঠের কোথায় কি ফুল ফুটে থাকে সব টের পায়। দুঃখী মেয়ে ফেনতু। অনজি আজকাল ফেনতুর দিকে তাকালেই টের পায়। বাপ অনজির গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছে। কাছে কোথাও নেই অনজি, থাকলে সে ঘণ্টার শব্দ পেত। সে আজ একা একা, অন্যদিন সে এবং অনজি বাপকে ভাত দিতে যায়। যেতে যেতে অনজি ফুল ফলের লোভে অথবা আকাশের এমন নীল রঙ দেখে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকলে ফেনতু ডাকে,

অনজি, বাপ বকবে। তাড়াতাড়ি আয়। বাপের খিদে পেয়েছে।

ফেনতু বাড়ি থেকে নেমে কিছুদূর এলে দেখল সেই কাক দুটো উড়ে আসছে। দুটো কাক দুরকমের। একটা কাকের ঠোঁট কাটা, অন্য কাকটার ঠ্যাঙ খোঁড়া। সে অন্যদিনের মতো বড় সড়কে উঠে উঁকি দিয়ে দেখল, মা শৈল উঁকি দিয়ে আছে কিনা। ফেনতু যেতে যেতে বাপের ভাত চুরি করে খায়, আরও কত কথা। না বাড়িটা আর দেখা যাচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি গামছাটা খুলে ফেলল। একটা অশ্বত্থ পাতায় সামান্য ভাত দিয়ে বলল, নে খা। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। আর আসবি না। এলেও দিতে পারব না। মা আমার নেই। সৎমা। খেতে দেয় না কেবল মারে। অনজিটা কোথায় চলে গেছে। আমার মন ভাল নেই। কাক দুটো এই শুনে উড়ে গেল। যেন অনজি অথবা মায়ের খবর আনতে নদীর ওপারে চলে গেল তারা।

তারপর ডাইনে পথ, মাঠের দিকে নেমে গেছে। পাশে ক্যানেল। ক্যানেল থেকে মাঠে জল দিচ্ছে বাবুদের ভাগিদার নন্দ। সে বলল কিরে ফেনতু বাপকে ভাত দিতে চললি।

নন্দর ঘাড় গলা মোটা। ওর মনে হয় এই নন্দ এই মাটির ভিতর কতকাল থেকে পড়ে আছে। সে যতবার এই পথে বাপকে ভাত দিতে গেছে নন্দ কোদাল নিয়ে অথবা লাঙল নিয়ে, কোন কোন সময় কাস্তে নিয়ে—যেন এই মাটির মতো আর ভালবাসার কি আছে, এই মাটির ভিতরই মানুষটা গ্রীষ্ম বর্ষা পড়ে থাকে। ঠিক বাপ, যেমন বাপের কোন জমি ছিল না, কেবল পংখি ছিল, পংখি বাবার জন্য খাটত, এতটুকু দুঃখ থাকত না। এখন বাবার জমি হয়েছে, পংখিও আছে, পংখিকে বাবা ভাড়া দিয়েছে, সূর্য সার লোকটা এসেই একগাল হাসে, ফেনতু সোনার মেয়ে, কোন নদীর জলে তুই সান করিস, আমি তরে নিয়ে যাব পদ্মার পারে। তা হাশে আমার গোলভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা দুধ ছিল, আমার কি ছিল না ফেনতু, বলে কট কট করে তাকায়। ফেনতু ভেবেছে লোকটা এলেই হাত কামড়ে দেবে, মাথায় এবং গায়ে হাত দিয়ে আদর করে ফেনতু টের পায়, ফেনতু ভয়ে গলা কাঠ কাঠ করে রাখে—এই নন্দ তুমি জান সূর্য সার লোকটা খুব পাজি। বাবার কাছে আমার জন্য বিয়ের কথা বলেছে।

—তোরে বিয়ে করবে?

—হ্যা। বলে কিনা, কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। অনেক বেলা হয়ে

গেছে, বাপ হাত মুখ ধুয়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে নদীর জল থেকে উঠে এসেছে। একটু বিশ্রাম নেবে। একেবারে মাটি থেকে উঠে এসেই নগেন দু পা ছড়িয়ে গাছের নিচে, কি গাছ ওটা, মনে পড়ল ওটা কদম ফুলের গাছ, শত শত সাদা ফুল ফুটে আছে, সে ভাত নিয়ে গেলেই সব পাখিরা গাছ থেকে উঁকি দিয়ে দেখবে, নিচে বাপ খাচ্ছে, মেয়ে বসে আছে, বাপ ভাতের গ্রাস মুখে দিচ্ছে, মেয়ে তাকিয়ে আছে. বাপ নিচে হাত দিয়ে নুন দিয়ে পোস্ত এবং আলু ভাজা দিয়ে একটা কাচা লঙ্কা, লঙ্কার কি সুন্দর গন্ধ, জিভে জল চলে আসে, নগেন মেখে মেখে লঙ্কার সবটা একেবারে ভাতের সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। ফেনতু বাপের দিকে তাকালে, এক দুই করে ছোট ছোট কটা গ্রাস তুলে রাখে, কখনও হাঁ করতে বলে, নগেন হাঁ করা মুখে ডেলা ভাত দিয়ে বলে, আরও দেব? ফেনতু জানে এই ভাতে বাপের হয় না, সে বলে না বাপ তোর কম হবে। তুই খা। মেয়েটার কি চুল, কি চোখ আর ঐই যে চুলে তেল পড়ে না, চুল লাল লাল হয়ে যাচ্ছে। যাব একবার চলে নূতন হাটে গন্ধের তেল নিয়ে আসব। নাকে মুখে সেই গন্ধের তেল যেন নগেনের তখন সুবাস ছড়ায়। মেয়ের মুখে লাবণ্য আর ধরে না। মাথার উপরে বাদাম গাছ, ওপরে তাকাল, পাশে নদী, নদীর পারে পারে কাশবন, সাদা ফুল, সামনে শুধু কচি ধানের চারা, বাতাসে জলে যেন সব উড়তে থাকে, নাচতে থাকে, তখন মেয়ের দিকে তাকালে নগেনের বড় কষ্ট হয়।

—কিরে ফেনতু চলে যাচ্ছিস! কথা না বলে চলে যাচ্ছিস। বাপের জন্য কি রেঁধে নিয়ে যাস দেখাবি না।

ফেনতু কথার জবাব দিল না। নন্দ দেখল মেয়েটা মল বাজিয়ে আল ধরে চুপচাপ নদীর দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বেশ কিছু পথ হাঁটতে হবে। ক্যানেলের পারে পারে কিছু পথ, ডানদিকে ঘুরে গেলে আফাজদ্দির মসজিদ, মসজিদ পার হলে বাঁয়ে সেই ছোট্ট একটা বন। বনের ভিতর ঢুকে গেলেই ফেনতু টের পায় কাঠ বিড়ালিটা নড়ছে। ওর লেজ কাটা। কে যে লেজটা কেটে দিল। কাঠ বিড়ালিটা গাছের গুড়িতে বসে থাকে। ছোট্ট এক শাল গাছ। ক সাল আগে সরকার নিস্ফলা জমিতে একটা বন গড়ে তুলেছিল, গাছগুলো এত ছোট এখন যে ফেনতুর কাছে খেলনার গাছ মনে হয়, যেন এই ছোট্ট বন ফেনতু এই পথে যাবে বলে কারা সৃষ্টি করে গেছে। সে বনের ভিতর ঢুকলেই কাঠ বিড়ালিটা পায়ে পায়ে নেমে আসবে, হাঁটবে পিছু পিছু, একটা ছোট্ট

পাতা ছিঁড়ে যতক্ষণ দুটো ভাত না দিচ্ছে কাঠ বিড়ালিটা যাবে না। মন ভাল নেই, আনজি কোথায় নিরুদ্দেশে গেছে, মা তার হাতে চেলাকাঠ নিয়ে আছে, বাপ তার মাঠে, এখন কি যে করে ফেনতু! সে চারিদিকে তাকাল। কাঠবিড়ালিটা দুবার শব্দ করল কট কট, কিছু শাল পাতা দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল, একখণ্ড কালো মেঘ আকাশে—নড়বড়ে মেঘটা বুঝি কোথাও বৃষ্টি ঢেলে এসেছে। ফেনতু আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য মাথার উপর। মাঠের দিকে তাকাল, শুধু কচি কাচা ঘাস। কোথাও অনজি নেই।

কাঠবিড়ালিটা ওর আশে পাশে ঝোপ থেকে ঝোপে, সুরুত করে বের হচ্ছে আবার ঝোপের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। ফেনতু বুঝি ভুলে গেছে সব। কাঠবিড়ালিটা আবার শব্দ করছে কট কট। আমায় দুটো দে ফেনতু। আমি বসে আছি তুই কখন বনের ভিতর দিয়ে যাবি। চোখ দুটো দেখলে ফেনতুর এমনই মনে হয়। সে একটা শালপাতাতে দুটো ভাত রাখল। বলল, নে খা। বেশি পাবি না। বাপের ভাতে কম পড়বে। আমি দুটো খাব বাপের সঙ্গে। তুই বড় রাক্ষুসে জীব। আমি সব বলে দেব বনদেবীকে। বাবা বলেছে বন থাকলেই বনে দেবী থাকে। সব পশু পাখিকে দেখেশুনে রাখে বনদেবী। বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মনে হয় বনদেবী ওকে সব সময় দেখছে। সে তখন গাছ পাতা ফুল যাই পায় আগে হাত তুলে কপালে ঠেকায়, বলে দেবীঠাকুরুন আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও। বাবার সুমতি দিও। পংখীকে বাবা যেন আর না খাটায়। পংখীটা দুবলা হয়ে গেছে মা-ঠাকুরুন! অনজিটা যে কোথায় গেল! অনজিকে আমি পেলে একদিন ভাত এনে তোমার সব জীবকে খাইয়ে যাব।

নতুন শালগাছ। খুব বড় হলে ওরা আট দশ ফুট উঁচু হবে। আর কি সবুজ ঘন বড় বড় পাতা। নতুন পাতার সোদা গন্ধ। ফেনতু শুকল। এই পথ সে যেন কতকাল আগে আবিষ্কার করেছে। মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি যেতে এমন একটা পথ ছিল। এখানে এলেই মনটা ওর আরও খারাপ হয়ে যায়। সে দু পা তুলে যেন সন্তর্পনে যেন হাঁটে না, চলে না, ঘোরে না, কেমন এক ছোট্ট বনদেবীর মতো বনের ভিতর ঘুরে বেড়ায়। মামার বাড়ি যাবার পথটা সে আর কিছুতেই খুঁজে পায় না।

জমির আলে এসে দাঁড়াতেই নগেন দেখল মেয়ের মুখ কালো। নগেন বলল, ফিরে কি হয়েছে? মুখ এমন করে রেখেছিস কেন?

ফেনতু কিছু বলল না। ভাতের থালা নামিয়ে বাপের জন্য ঘটি করে নদী থেকে জল আনতে চলে গেল। ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। এখন আর হাঁটু জল নেই। ঘোলা জল। কি তীব্র বেগে জল নেমে যাচ্ছে। এখন চাষ আবাদের সময়। দুই বিঘা ভূঁই পেয়েছে নগেন। সারা দিনমান এই মাঠে মাঠে পড়ে থেকে—এই যে মাঠ, সুজলা সুফলা জমি, এবং শস্য ক্ষেত্র, উপরে কাদা মাটি এবং নিচে বালিমাটি, বাবুদের এই জমি ছিল একদা, এখন এ-জমি নগেনের, সে নিচের বালি মাটি উপরে তুলে আনছে এবং কাদামাটি বালিমাটি মিশিয়ে দো'আঁশ করার ইচ্ছা, তার জন্য নগেন, যেন নগেন এক জীব, মাটির জীব, এই মাটিতে পড়ে থাকতে পারলে আর কিছু চায় না। মাটি যে কি ছিল, বাবুদের মাটি, সম্বৎসর ব্যানা ঘাসে ঢেকে থাকত, কোনো কোনো সময় এখানে গরু চরাতে আসত নাবাল দেশ থেকে, উঁচু জমি বলে চাষাবাদের অসুবিধা ছিল। নগেন দিনমান খেটে জমিকে সরেস করছে, যেখানে যা উর্বরা কিছু পাচ্ছে মাটিতে এনে ফেলছে—যেন এই মাটির নিচে এক অজানা রহস্য নগেন দুহাতে মাটি খুঁড়ছে, ব্যানা বন উপড়ে ফেলছে, ঘাসের বীজ সে মাটি খুঁড়ে অতল থেকে তুলে আনছে। তার আর কোন-হুঁস নেই, মনে হয় ফেনতু অনজি অথবা পংখি ওর আর এক জন্মের দোসর ছিল। সে এখন একা আর এই মাটি, মাটি সংলগ্ন গাছ-গাছড়া সব এখন তার। সে আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের তলায় মাটি। আর মাথার উপরে সূর্য এমন কিরণ দেয় তার যেন জানাই ছিল না।

ফেনতু জল নিয়ে এল। গামছাটা খুলে দিল। একপাশে ছোট্ট এনামেলের বাটি, দুটো কাঁচা লঙ্কা একটা গোটা কাঁচা পেঁয়াজ, মোটা মোটা আগুনি ধানের ভাত এবং পোস্ত বাঁটা—আর সরসের তেল সামান্য। নগেন হাত পা ধুয়ে এল। আজ অন্যদিনের মতো কদম গাছটার নিচে সে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি। জমিতে কাদা করা শেষ। রোয়া ধান পুতে দেবে—পুতে দিতে পারলেই যেন এ-সালের মতো খাটা-খাটনির ফল পেতে সুরু করবে। বাতাসে দুলবে সেই সব গাছ, বড় হবে, কালো রঙ ধরবে, তারপর এসে যখন সোনালি রঙের মাঠ রাঙা হয়ে যাবে তখন কে আগে যাবে জমিতে, ফেনতু না পংখি না অনজি না শৈল। মুখে চোখে জমির দিকে তাকালে তার যেন এখন নিশ্বাস পড়তে চায় না। নরম মাটি, ভিজে লাল, তার উপর কদমের ডাল, অজস্র ফুল ফল পাখি এবং নদীতে ঢেউ, যেন পারে বসে নগেনের কেবল গান

করতে ইচ্ছা হয়। মেয়ের দিকে তাকালেই বড় চোখ দেখতে পায়, মুখ দেখতে পায়। মেয়ের বয়সের কথা মনে পড়ে। এবার যদি ভালো ফসল হয় তবে নতুন হাটের সর্দারের ছেলের সঙ্গে একটা কথা চালাচালি হয়ে যাবে। সে এ-জন্য পংখিকে পর্যন্ত একটা অমানুষের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। পংখিটা আর পারছে না। বড় কষ্ট হয়। তবু এই সংসার যেন নিত্য নতুন ফল ফুলের গাছ, যত হবে তত পেড়ে নিতে হবে।

নগেন ভাত মাখতে মাখতে বলল, এবার আমি নতুন হাটে যাব। ফসল উঠুক। তোর জন্য গন্ধ তেল, তোর মায়ের জন্য আর্শি, পংখির জন্য গামলা। অনজিটাকে বেঁধে রেখে দিসত। যা হয়েছে! কোথায় যে চলে যাবে?

ফেনতু এবার কেঁদে দিল। অনজিকে পাচ্ছি না বাবা।

—পালেদের জমিতে দেখেছিস?

—হ্যাঁ বাবা।

—ইস্কুলের মাঠে?

—হ্যাঁ বাবা কোথাও নেই।

—কোথায় আর যাবে? পংখিটা বাড়ি থাকে না বলে মন খুব উচাটন। দেখে শুনে রাখিস। গিয়ে দেখবি ফিরে এসেছে।

—বাবা।

—কি!

—মা আমাকে মেরেছে।

নগেন কিছু বলল না। ফেনতুর মাকে মনে পড়ছে। মায়ের মুখ মেয়ে পায়নি। শুধু মায়ের বড় বড় চোখ পেয়েছে ফেনতু। চোখ দুটো দেখলে ফেনতুর মাকে এখন কেমন ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় নগেন। কিছুই তখন ভাল লাগে না। শৈলটা সংসারে সুখ দুঃখ বোঝে না, মা-মরা মেয়েটাকে ভালবাসেনা। আর রাতে যে ওর শরীরে কি ভর করে—সারাদিন খাটা-খাটনির পর নগেন ফিরলে শৈল কেমন হা করে বসে থাকে, মানুষটা ফিরলেই তাকে গিলে খাবে। এসব মনে হলে নগেন শুধু মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। সে এই জমি পেয়ে আরও দু বিঘা জমি কেনার তালে আছে। পংখি, এতদিনের বিশ্বাসী এবং পরিশ্রমী পংখিকে পর্যন্ত সে একটু শ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না। দুর্বল, বয়স হয়েছে হয়ত এ-সালেই মরে যাবে। সে নিজেকে লোভী ভাবল। যেন সে চাতুরি

খেলছে পংখি এবং ফেনতুর সঙ্গে। ওর এত ক্ষিদে যে এখন এ-সব ভাবতে ভাবতে সে সব কেমন খেয়ে ফেলল। মেয়েটা যে ভাতের দিকে এবং ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তা পর্যন্ত মনে পড়ল না। মেয়েটা সামনে বসে বসে কেবল বাপের খাওয়া দেখছে।

—এই যা! নগেনের যেন এতক্ষণে মনে পড়ল। সব খেয়ে ফেললাম।

ফেনতু কেমন সঙ্কোচের সঙ্গে হাসল,—বাবা জল খাবি। নদী থেকে জল নিয়ে আসছি।

অভিমানে চোখ ফেটে জল আসছিল ফেনতুর। সে তাড়াতাড়ি ঘটিটা নিয়ে ফের এক ঘটি জল আনতে চলে গেল। মা মেরেছে, বাপ খেতে বসে সবটা একাই খেয়ে ফেলল—কেউ ভালবাসে না। ফেনতু বাপের সামনে ধরা পড়ে যাবে ভয়ে এক দৌড়ে সেই সাদা ফুলের কাশবন পার হয়ে পাড়ে নেমে জল তুলে আনল। আর কোন কথা বলল না বাপের সঙ্গে। ভাঙা টিনের থালা গামছায় বেঁধে সে হাঁটতে থাকল। সূর্য নেমে যাচ্ছে নদীর ওপারে। কদম গাছে এখন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বসে আছে, কি ফুল ফুটে আছে বোঝা যাচ্ছে না। ফুল হতে পারে, পাখি হতে পারে, হাওয়া দিলেই সব ফুল পাখি হয়ে যাবে এবং যেন ফেনতুর মাথার উপর উড়তে থাকবে। সে এখন অনজিকে আবার খুঁজছে। অনজিকে না নিয়ে যেতে পারলে মা ভাত দেবে না। ক্ষুধায় ফেনতু ঘোলা ঘোলা দেখছে। কাঠ কাঠ গলা। ক্যানেলের জল নামছে নদীতে। লাল জল। সে উবু হয়ে জল খেল। কোথায় অনজি। চারিদিকে শুধু মাঠ আর ধানের জমি। সব জমিতে ধান পোতা হয়ে গেছে। কেবল নগেনের জমিটা খুব উঁচু, নগেনের জমি ধান পোতা হলেই এ-মাঠে আর অনাবাদি জমি থাকল না। আর আছে বন, সে বন পার হয়ে এল। নন্দ বাড়ি চলে গেছে। তুটো মোষ তাড়া করে ছুটছে। বড় সড়কের পাড়ে হিজিবিজি কিছু দেখা যাচ্ছে। গাই গরু কি মোষ, কি ছাগল গরু সে বুঝতে পারছে না। যেন দূরে কোথাও ঘণ্টা বাজছে। ফেনতু কান খাড়া করে রাখল। সেই তালে তালে পা ফেলে অনজি যখন মাঠে দৌড়ায় তখন কি সুন্দর আর কি রোদ, কি চকচক করে পিঠ, সাদা রঙটা একেবারে সবুজ মাঠে একটা হরিণ ছানার মতো দৌড়ায়।

ফেনতু সব খুঁজে খুঁজে দেখল। ক্যানেলের পারে, সেই বনের ভিতর, নদীর পারে কাশ বনে, সব দেখে এল। সে দূরে দেখল সূর্য এবার নামছে,

সে বলল, মাঠের দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমাদের অনজি কোথায় গেছে বলে দাও ঠাকুর। পংখি রাতে ফিরে আসবে। অনজিকে না দেখলে পংখি কাঁদবে। ঠাকুর, সে কোনদিকে গেছে। সে এই মাঠে ঠাকুর বলতে বড় বটগাছটাকে বোঝে। এখনও অনেক দূরে আছে অশ্বত্থ গাছ, মনে হয় আর একটু হাঁটলেই সে ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাবে। সে গ্রাম মাঠ ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। কেউ দেখে ফেললে বলছে, তুই কার মেয়ে রে?

—আমি নগেন দলুইর মেয়ে। আমাদের বাচ্চা ঘোড়াটা দেখেছেন বাবু?

—ঘোড়াটা। দেখত সন্তোষপুরের মাঠে আছে কিনা। কেউ বলল ব্যারেজের দিকে দেখেছে, কেউ বলল, একটা বড় ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই পিছনে একটা বাচ্চা ঘোড়া লাফাতে লাফাতে চলে গেছে। সূর্য সাহার লোকটা যদি অনজিকে হাটে বেচে দিয়ে আসে। ওর এবার কেন জানি সন্দেহ হল। সূর্য সাহার লোকটা কাজ না থাকলেও চলে আসে। ঘরে বসে থাকে। ফেনতুকে মা ছাগল আনতে মাঠে পাঠিয়ে দেয়। ফেনতু এখন যে কি করবে, ভাবতেই সে দেখল এখন মাঠের ভিতর এসে গেছে, মাঠের শেষে সে আর যেতে পারবে না। নদীটা এখানে বাঁক খেয়েছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সে এবার কি করবে বুঝতে পারল না। সে বাড়ি ফেরার জন্য ছুটতে থাকল। সে অনজিকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূরে চলে এসেছে। অপরিচিত জগত, নদীর জল সেই একরকম, বন আছে, মাঠ আছে, তবু সে কোথায় আছে এখন বুঝতে পারল না। সে চিৎকার করে ডাকল অনজি।

আর তখনই মনে হল সেই ঘোড়াটা মাঠের উপর দিয়ে ছুটে আসছে। সাদা রঙের ঘোড়া। ফেনতু ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলে গেল। বনের ভিতর থেকে ঘোড়াটা বের হতেই মনে হলো এবার আর ভয় নেই। সে এই ঘোড়া নিয়ে যত রাত হোক বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু ঘোড়াতো ঘোড়া, সে কেন বুঝবে ফেনতু এসেছে ওকে নিতে, যেমন সে প্রতিদিন সকালে এক চোট ফেনতুকে নিয়ে মাঠে, বাঁশ বনের ভিতর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে, ফেনতু কাছে গেলেই ছুটে পালায়, আবার কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন কিছু জানে না, একেবারে নিরীহ জীব, প্রাণপণ কেবল ঘাস খাওয়া, জানে না। ছুটু মেয়ে ফেনতু পা টিপে টিপে আসছে, এবারে ধরবে, ধরতে নেই ছুট, ছুটে পালানো, মাঠ পার হয়ে নদী পার হয়ে ফেনতুকে আশ্চর্য খেলায় মাতিয়ে দেয়। যখন কিছুতেই ধরতে পারে না তখন ফেনতু আলে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে। দুঃখে বিরক্তিতে ওর কান্না পেলে অনজি কাছে এসে মাথা দিয়ে অথবা কচি কাঁচা দাঁত দিয়ে হাত পা চুল এবং চিবুক যেখানে পায় কামড়ায়। ফেনতুর ভাল লাগে। কি কচি নরম নরম দাঁত, এবং মুখের ভিতর ঘাসের গন্ধ, সে মুখের চোয়াল ফাঁক করে মুখ ঢুকিয়ে ঘ্রাণ নেয়।

অনজি খুব একটা কাছে এল না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে দেখল। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে চাঁদ। নীল আকাশ। সে বলল, চল ঘরে ফিরি।

কি বুঝল অনজি, যেমন পোষমানা কুকুর প্রভুকে দেখলে চারপাশে ছুটে ছুটে বেড়ায় অনজি প্রথম এমন ছুটে বেড়াল। কচি কাঁচা ঘাস খেয়ে পেট ভরে আছে। ফেনতু ঘাস কোমর বাঁধা শাড়ির একটা অংশ খুলে ফেলে অনজিকে পেটটা দেখাল। বলতে চাইল, কিছুই খায়নি সারাদিন, তোকে নিয়ে যেতে পারলে মা আমায় খেতে দেবে। বুঝি অনজি বুঝেও বুঝল না। সে মায়ের পিছনে চলতে চলতে মাঠ পার হয়ে এলে সূর্য সাহার লোকটা তাড়িয়ে দেয়। তারপর অনজি আপন মনে ঘাস খাচ্ছিল। এক দঙ্গল ছেলে ছোকরা ধরতে এলে সে ছুটে পালিয়েছে। ওরা এখনও পিছু ছাড়েনি। ঘণ্টার শব্দ শুনে ওরা বনের ও পারে কোথায় সেই সাদা রঙের ঘোড়াটা টের পাবার চেষ্টা করছে। আর অনজিও চালাক, পায়ের শব্দ পেলেই ছুটছে।

এখন জ্যোৎস্না। ঘোড়াটাকে ফেনতু মাঠের ভিতর ধরে ফেলেছে। বনের ও-পারে কারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে। অনজি খুব সন্তর্পনে হাঁটছে। এক দঙ্গল রাখাল ছেলে বনের ভিতর দেখল, একটা ছোট মেয়ে, একটা সাদা রঙের ঘোড়ার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা বুঝল, এ ঘোড়া মানুষের নয়। এ ঘোড়া বনদেবীর। ওরা যতটা পারছে দ্রুত ছুটে পালাচ্ছে।

নগেন ঘরে ফিরেই দেখল বৌ নেই। সে ডেকে ডেকে সাড়া পেল না। সূর্য সাহার লোকটা শুধু খবর দিয়ে গেছে পংখি নতুন হাটে পৌঁছাতে পারেনি। বৃষ্টির জলে এক হাঁটু কাদা ভাঙতে গিয়ে সেই যে বসে পড়ল পংখি কাদা জলে আর উঠছে না। মালপত্র সব কাদায় মাথামাথি। কাদা থেকে পংখিকে কেউ তুলতে পারেনি। ঠেলাঠেলি করতে গিয়ে দেখেছে পংখি চোখ উল্টে আছে। আরও খবর অনজি আসেনি, ফেনতু সেই যে বাপের ভাত নিয়ে গেছে সেও ফেরেনি। সে বলল, মা বসুন্ধরা আমার কি লোভ হয়েছিল! আমি কি মা বসুন্ধরা জমি পেয়ে জমিদার হতে চেয়েছিলাম। আমি ছিলাম।

বিয়ে করলাম শৈলকে, সেই শৈল পালাল। দুবিঘা জমি কিনব বলে পংখিকে ভাড়া দিলাম। জমি আর ফসল, এক দুই করে স্বপ্নের চারা আবাদ করেছিলাম মা জননী, তুই কি রাগ করে লোভী ছেলের মুখ না দেখার জন্য ঘর ছাড়লি। নগেন একটা লাঠি নিল বগলে, লণ্ঠন নিল হাতে। গ্রাম ভেঙে মাঠে নামার সময় ডাকল ফেনতু। কোথাও থেকে সাড়া এল না। অনন্তি! কোথাও থেকে ঘণ্টার শব্দ উঠল না। পথে পাখালি, কাঠবিড়ালি সকলকেই যেন বলতে বলতে গেল, ওগো জীবেরা লোভ ভাল নয়, এই লোভে আমরা কে কি করছি জানি না। আমার যা ছিল, আমি তা দিয়েই মা বড় হতে পারি, আর কি পারি মা জননী, চল তোকে নিয়ে যাব নদীর ধারে। সেই এক জগতের স্বপ্ন দেখল নগেন। যেন একটি মাত্র ফসলের জমি, সকলে যার যার মতো প্রয়োজন মতো ফসল ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। মাঠের ভিতর দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন, সবই সেই দেবতার। তোমরা কেবল ফসলের জন্য চাষ করো। তোমার আমার জননী জন্মভূমি। সে আবার ডাকল, ফেনতু। না কোন সাড়া এল না। শুধু আকাশের উপরে চাঁদ। চাঁদের বুড়ি এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে চাঁদ অথবা আলোকিত পথে নিজের ছায়া দেখে আঁৎকে উঠল। এটা নিজের ছায়া কিনা—না এই যে ধরিত্রী, এবং আকাশ দূরে বন, উপরে অজস্র নক্ষত্র এবং বনের ভিতর থেকে কিছু মানুষ এদিকে ছুটে আসছে, তাদের কোলাহলে কি যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে—সে চিৎকার করে বলতে চাইল, ফেনতু আয় মা তোকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সেই রাখালেরা বলল, তুমি যাবে না ওদিকটাতে। আমরা বনদেবীকে দেখে এলাম। একটা সাদা রঙের ঘোড়া নিয়ে বনে বনে দেবী হাঁটছেন।

নগেন কেমন সেদিকে পাগলের মতো ছুটতে থাকল। কোনদিকে কোথায়? সেই বন মাঝে মাঝে ওর কাছে যেন চাঁদ সদাগরের দেশ হয়ে যাচ্ছে—মাথা খারাপ ভেবে বড় সড়কে উঠে গেল রাখালেরা। ওরা সারা বিকেল ঘোড়াটাকে ধরার জন্য ছুটেছে। বনের ভিতর ঢুকে গেলে মরীচিকার মতো শুধু ঘণ্টা ধ্বনি। এই ঘণ্টা ধ্বনি ওদের কাছে খেলার সামগ্রীর মতো, লুকোচুরি খেলতে গিয়ে নিশি পাওয়া ভূতের মতো বনের ভিতর পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর যখন ঘোড়া দেখল, তখন এক বালিকা শরীরে কোন বসন নেই, ঘোড়াটাকে নিজের বসনে বেঁধে বনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নগেন দেখল একটি গাছের নিচে, হ্যা সেটা সেই বড় অশ্বত্থ গাছটাই হবে,

তার নিচে ফেনতু ঘোড়াটার পিঠে মাথা রেখে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে। ক্লান্ত অবসন্ন মুখ। অনজি এবং ফেনতু পাশাপাশি শুয়ে ঘুম যাচ্ছে। লণ্ঠনের আলো তুলে মুখ দেখল নগেন। ডাকল, ফেনতু ওঠ। আমি তোদের নিতে এসেছি।

ফেনতুর ভয় ছিল না। অনজি থাকলে ভয় থাকে না। কিন্তু লণ্ঠনের আলোতে সে হকচকিয়ে গেল। তারপর বাপকে দেখে বলল, বাবা আমি আর বাড়ি যাব না। ঘোড়া নিয়ে কোথাও চলে যাব।

নগেন বলল, ওঠ মা। আমিও যাব না। তুই আমি আর অনজি অন্য কোনখানে আবার চলে যাব। যেন বলার ইচ্ছা সেখানে আর যেই থাকুক সূর্য সাহার লোকটা থাকবে না। সে থাকলেই ঘোড়া মরে যায়, নদীতে বান আসে।

একটি কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী

ধরণী গোস্বামী

১৯৩০ সাল। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে দেখা দিয়েছিল এক ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ। স্থানীয় লোকমুখে এই বিদ্রোহ 'মহাজন বিরোধী-আন্দোলন' নামেও পরিচিত। ময়মনসিংহ জেলা এখন পূর্ব-পাকিস্তানের এক বৃহত্তম অঞ্চল একথা সকলেই জানেন। বাঙলাদেশের আধুনিক যুগের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৩০ সালের কিশোরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই আন্দোলন গরীব কৃষক শ্রেণীর অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল, যদিও কিছুদিনের মধ্যেই তা স্বার্থান্বেষীদের প্রভাবে বিপথগামী হয়ে যায় এবং সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে।

অবিভক্ত বাঙলায় ময়মনসিংহ জেলা ভৌগোলিক আয়তনে ও অধিবাসীর সংখ্যাগত হিসাবে ছিল ভারতের একটি বৃহত্তম অঞ্চল। সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছিলেন মুসলমান। ময়মনসিংহ জেলা ছিল মুখ্যত একটি জমিদার ও তালুকদার প্রধান জেলা। অতি সাবেকী আমল থেকেই বৃহত্তম সংখ্যা কৃষক শ্রেণীর মানুষ জমিদার ও তালুকদার শ্রেণীর অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছিল।

আন্দোলনের পটভূমিকা

বাঙলা দেশের অতীত ইতিহাসে বিভিন্নকালে ছোট বড় বহু কৃষক বিদ্রোহের নজির আছে। এই সকল বিদ্রোহ ঘটেছে জমিদার শ্রেণীর অমানুষিক শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্তরূপে। ১৯৩০ সালের কৃষক বিদ্রোহ বা যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মহাজন বিরোধী আন্দোলন-ও ছিল তারই অন্যতম। কিন্তু একটু ভিন্ন ধারার অতীতের আন্দোলনের সঙ্গে এর একটা পার্থক্যের সীমা রেখা টানা যায়। এই কারণে যে, ১৯৩০ সালের এই কৃষক আন্দোলনের গোড়ায় ছিল এক নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেরণা।

১৯৩০ সন, ভারতে বিরাট রাজনৈতিক উত্থানের জন্ম ইতিহাসে খ্যাত। জনগণের হৃদয়ে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ও ধূমায়িত অসন্তোষের বহ্নি গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সারা ভারত জুড়ে রুদ্র মূর্তিতে ফেটে পড়েছিল। এর পূর্বগামী ছিল ১৯২৮-২৯ সালের ভারত জুড়ে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক জঙ্গী ধর্মঘটের আন্দোলন। কৃষক শ্রেণীও ঐ সময়ে পিছনে পড়ে ছিল না এবং জমি, খাজনা বন্ধ প্রভৃতি দাবি নিয়ে তারাও স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—ভারতের নানা স্থানে। সারা ভারত জুড়ে বিপুল রাজনৈতিক আলোড়নের ফলে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে এক নতুন জাগরণ দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত এক নব যুব আন্দোলনের জন্ম হয়। নব আদর্শে দীক্ষিত তরুণ দল এই সর্ব প্রথম শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে প্রবেশ করে।

ইয়ং কমরেড লীগ

১৯২৯ সালে এক নতুন যুব আন্দোলনের জন্ম হয় বাঙলা দেশে এবং নব সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ইয়ং কমরেড লীগ-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর যুবসংস্থা সংগঠিত হয়। এর কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল কলকাতায় এবং এই প্রবন্ধ লেখক ছিলেন এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক। ইয়ং কমরেডস লীগের লক্ষ্য ছিল জঙ্গী যুব সাধারণ বিশেষতঃ জঙ্গী, শ্রমিক-কৃষক-যুবদলকে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহযোগী শক্তিরূপে সংগঠিত করা এবং তাদের বৈজ্ঞানিক সামাজতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষিত করে তোলা।

১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতৃবর্গের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সংস্পর্শে গ্রেফ্‌তারের ফলে উক্ত লীগের কাজকর্ম সাময়িক বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু শীঘ্রই লীগ পুনঃসংগঠিত হয় এবং দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এর শাখা গড়ে ওঠে। ১৯৩০ সালে রাজসাহীতে সারা বাঙলা দেশে ইয়ং কমরেড লীগের একটি সম্মেলন হয় এবং ঐ বছরে কিশোরগঞ্জে-এ এর একটি শক্তিশালী শাখা সংগঠিত হয়। পুলিশের আক্রমণ এড়িয়ে ঐ বছরেই দমদমে অজিত মৈত্রের বাড়ীতে ইয়ং কমরেড লীগের এক কর্মী সম্মেলন হয়েছিল। পূর্বেকার সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী দল—অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতির যুব কর্মী ও নেতৃস্থানীয় অনেকে নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে

লীগের সাংগঠনিক কাজে উদ্যোগ নেন। এই উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন নগেন সরকার যিনি পরবর্তীকালে বাঙলা দেশের অন্যতম প্রবীন কৃষক নেতা-রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং যিনি সুদীর্ঘ কারানির্যাতন ভোগের পর গণ-আন্দোলনের চাপে সম্প্রতি পাকিস্তান জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। এদের সঙ্গে ছিলেন অন্যতম প্রধান সংগঠক সুধাংশু অধিকারী, আলি নেয়াজ খাঁ ছাত্র নেতা মণীন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মিগণ।

ইয়ং কমরেডস লীগের কিশোরগঞ্জশাখার কর্মিগণ গোড়া থেকেই গ্রামাঞ্চলকে কেন্দ্র করে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে কাজের উপর বিশেষ জোর দেন। কর্মিগণ কিশোরগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে ও দূর গ্রামের কৃষকগণের মধ্যে বহু বৈঠকী সভা ও জনসভা করেন। এই সমস্ত সভায় ১৯১৭ সালের সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের ঘটনা ও সোভিয়েতের ভূমিকা ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্বন্ধে প্রচার আন্দোলন পরিচালিত করেন। পেছনে পড়া নির্যাতিত গরীব কৃষকশ্রেণী এই সর্বপ্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্র ও তার আদর্শ ভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। কৃষকশ্রেণীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায় এবং এক নবচেতনা জাগ্রত হয়। বিশেষভাবে যুব কৃষকগণ নতুন আদর্শে সাড়া দেয় এবং লীগের সদস্য তালিকাভুক্ত হতে থাকে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন যুব নেতার সৃষ্টি হতে থাকে। কিশোরগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী এক গ্রামের বাসিন্দা গরীব যুব কৃষক সন্তান আবদুল জলিল কিছুদিনের মধ্যেই কৃষকশ্রেণীর একজন জনপ্রিয় নেতা ও প্রভাবশালী বক্তারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তার বক্তৃতা শুনবার জন্য হাজার হাজার কৃষক জমায়েত হতো এবং তারা উদ্বুদ্ধ হতো।

মহাজনবিরোধী আন্দোলনের শুরু

ইয়ং কমরেডস লীগের প্রচার আন্দোলনের স্বল্প কালের মধ্যেই মুসলমান ও হিন্দু নির্বিশেষে কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের সঙ্কল্প নেন। এই আন্দোলন পরিচালিত হয় বড় বড় জোতদার তালুকদার ও কুসীদজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে, যারা দুঃস্থ কৃষকদের নিকট থেকে নির্দয়ভাবে কল্পনাতীত হারে সুদ আদায় করত। দুর্দিনে অর্থাভাবে পড়ে গরীব চাষীরা মহাজনদের নিকট থেকে পরিবারের ভরণপোষণ ও চাষাবাদের জন্য অতি উচ্চ হারে সুদ প্রদানের কড়ারে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হতো। ঋণ পরি-

শোধের গ্যারান্টি হিসাবে কৃষকগণ নিরুপায় হয়ে তাদের সামান্য জমিজমা এমনকি বাস্তুভিটা পর্যন্ত রেহান বন্ধক রাখতে বাধ্য হতো। অধিকাংশ কৃষকই কবলা-পাট্টায় চুক্তিবদ্ধ মেয়াদের মধ্যে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে সমর্থ হতো না। সুতরাং মহাজনরা ঋণ আদায় দানে অসমর্থ কৃষকদের যাবতীয় জমিজমা কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তুভিটাটিও ক্রোক করে দখল করত। এইরূপে প্রতি বছর কৃষক শ্রেণীর অধিকার থেকে মহাজন ও জোতদার তালুকদার শ্রেণীর হাতে জমি হস্তান্তরিত হতে থাকে।

বাঙলাদেশের নিদারুণ গ্রামীন অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবিই হলো এই। তার একদিকে প্রতি বছর সারিবদ্ধ হচ্ছে হাজার হাজার জমিচ্যুত নিঃস্ব কৃষক বাহিনী আর অপরদিকে সঞ্চিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক তালুকদার জোতদার, মহাজনের হাতে প্রচুর পরিমান অর্থ ও জমি। তাই বলা যায় ১৯৩০ সনের কিশোরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ ছিল গরীব কৃষক শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের এক বহিঃপ্রকাশ বিশেষ।

আন্দোলনের প্রথম পর্যায়

কিশোরগঞ্জ শহর থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে অবস্থিত পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত এক গ্রাম থেকে আন্দোলন শুরু হয়। এরূপ জানা যায় যে বিক্ষুব্ধ কৃষকশ্রেণীর দ্বারা প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল এক মুসলমান তালুকদার-মহাজনের বাড়ি। থানার ডাইরীতে প্রথম এজাহার লিপিবদ্ধ করেছিলেন একজন মুসলমান তালুকদার। তার বাড়িটি এক বিরাট মুসলমান ও হিন্দুর কৃষকের মিলিত বাহিনী কর্তৃক ঘেরাও হয়েছিল এবং দলিলপত্র ও বাড়ির আসবাবপত্র ছাড়খার করে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে এই কৃষক বিদ্রোহের গোড়ার রূপ ছিল অ-সাম্প্রদায়িক ও আর্থনীতিক। বিদ্রোহ অতিশীঘ্রই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতো ছড়িয়ে পড়ল।

আন্দোলনের নৃশংস রূপ

একরাত্রে এক বিপুলাকার বিক্ষুব্ধ কৃষক জনতা উক্ত পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া গ্রামের বিরাট ধনী ও প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাড়ি ঘেরাও করে। কৃষক জনতা প্রথম দিকে শান্ত ছিল। কৃষকরা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট তাদের ঋণপত্রগুলি ফেরৎ দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। কিন্ত

কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রত্যুত্তরে শান্ত কৃষক জনতার উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করেন। শোনা যায় যে ৮ জন কৃষকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল। এই ৮ জন মৃত কৃষকের মধ্যে হিন্দু কৃষক কেউ ছিলেন কিনা, সে তথ্য আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। জনতা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে যেতে থাকে। এরূপ খবর পাওয়া যায় যে বিদ্রোহী জনতা যখন প্রত্যাবর্তনমুখী ঠিক সেই মুহূর্তে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের এক মুসলমান বালক গৃহভৃত্য জনতার পিছনে ছুটে যায় এবং চিৎকার করে তাদের জানায় যে কেষ্টবাবুর বন্দুকের গুলী নিঃশেষ হয়ে গেছে, এখন আর গুলী বর্ষণের ভয় নেই। এই সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ জনতা ফিরে আসে এবং ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার মূর্তি ধারণ করে। তারা কৃষ্ণ রায়ের বাড়ি পুনরাক্রমণ করে এবং গৃহের আসবাবপত্র ও যাবতীয় সম্পত্তি তছনছ করে ফেলে, লোহার সিন্ধুক ভেঙ্গে তমসুকগুলি খুঁজে বার করে আগুন ধরিয়ে দেয়। কৃষ্ণ রায়কে বাড়ীর ভেতরে ঘটনাস্থলেই খুন করে ফেলে। কৃষ্ণ রায়ের স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যরা কৃষ্ণ রায়ের জীবন রক্ষার জন্য অগ্রসর হলে আক্রমণকারী জনতা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। বিক্ষুব্ধ জনতা এরূপ ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের পর প্রত্যাবর্তন করে।

জীবন ভিক্ষা

গ্রামাঞ্চলে আজও এরূপ কথিত হয়ে থাকে যে কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিজের ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রাণ রক্ষার জন্য ক্রুদ্ধ কৃষক জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পূর্বাহ্নে তাদের হাতে চল্লিশ হাজার টাকা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তার বদলে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। আজও গ্রামাঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে একটি গানের ছড়া শোনা যায় যাতে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রাণ ভিক্ষার মর্মস্পর্শ আকুল আবেদনের কথা প্রকাশ পায়—

"জাঙ্গালিয়ার কিষ্ট রায় চল্লিশ হাজার দিতে চায়,
তবু প্রাণ ভিক্ষা সে না পায়।"

কিশোরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাড়ির ঘটনাই ছিল একমাত্র মর্মান্তিক চিত্র। বিদ্রোহ এক সপ্তাহেরও কম স্থায়ী ছিল। আক্রমণের আঘাত পড়েছিল সবচেয়ে বেশি জাঙ্গালিয়া, হুসেনপুর, মঠখোলা ও গোবিন্দপুর গ্রামে। শেষোক্ত গ্রামে গোবিন্দপুরে লেখকের মামার বাড়ি (খুড়ীমার দিক দিয়ে) আক্রান্ত হয়েছিল। এরাও বড়

তালুকদার ছিলেন। কিন্তু এঁদের পরিবারের কেউ-ই আক্রান্ত বা লাঞ্ছিত হন নি। তাদের গৃহসম্পত্তিও নষ্ট বা লুণ্ঠিত হয় নি। আক্রমণকারীরা তমসুকগুলি দাবি করেছিল এবং সেগুলি ফেরৎ পেয়ে তারা ফিরে যায়।

ইয়ং কমরেডস লীগের ব্যর্থতা

গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা-শূন্য নবগঠিত ইয়ং কমরেডস লীগের নেতৃত্ব কৃষকশ্রেণীর জঙ্গী আন্দোলনের অপ্রত্যাশিত ও ক্ষিপ্রগতি ব্যাপকতার সঙ্গে সমান তালে অগ্রসর হওয়া ও আন্দোলন পরিচালনায় সমর্থ ছিল না। আন্দোলনের বিস্তৃতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ও নোয়াখালি থেকে দলে দলে সাম্প্রদায়িক নেতারা কিশোরগঞ্জে পৌছোলেন। সাম্প্রদায়িক নেতারা অনতিবিলম্বেই আন্দোলনের রাজনীতিক আর্থনীতিক লক্ষ্য থেকে মোড়-ফিরিয়ে সাম্প্রদায়িকতার দিকে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হলো। সাম্প্রদায়িক নেতাদের দ্রুত উপস্থিতি এবং আন্দোলনের মোড় ঘুরাবার গতিপ্রকৃতি থেকে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে সবই যেন ছিল পূর্ব-প্রস্তুতির ফলশ্রুতি বিশেষ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কিশোরগঞ্জের কৃষকবিদ্রোহের মাত্র কিছুদিন পূর্বেই ঢাকা শহরে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল। এই ঘটনাবলীর নিবিষ্ট পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে বৃটিশ শাসক শ্রেণীর এক অদৃশ্য হস্তের ভূমিকা এর পিছনে ছিল।

বৃটিশ শাসকশ্রেণীর বলগাহীন আক্রমণ

সকলেরই জানা আছে যে ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল সশস্ত্র বিপ্লবী দল কর্তৃক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরমুহূর্তেই ১৯শে এপ্রিল বৃটিশ সরকার এক অর্ডিন্যান্স (বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন) জারি করে এবং এই আইনের বলে সারা বাঙলাদেশের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের যুগপৎ গ্রেপ্তার করে জেলে কিম্বা বন্দীনিবাসে আটক রাখে। এই আইনের জের পরবর্তী দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলে। ইয়ং কমরেডস লীগের নেতাদের মধ্যে অনেকেই তখন গ্রেপ্তার এড়াবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেউ কেউ পূর্বেই গ্রেপ্তার হয়ে বন্দীনিবাসে নিক্ষিপ্ত হন। কেউ কেউ স্থান ত্যাগ করেন। সাম্প্রদায়িক নেতারা কৃষক বিদ্রোহের সময়ে সাংগঠনিক নেতৃত্বের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং বাধাবিমুক্ত পরিস্থিতিতে

বিদ্রোহকে সে সহজেই বিভ্রান্ত করতে ও তাদের স্বার্থানুকল্পে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়।

সাম্প্রদায়িক নেতারা মুসলমান কৃষকদের একাংশকে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং তাদের হিন্দু মহাজন ও জোতদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য উত্তেজিত করে তোলে ও আক্রমণের জন্য উস্কানী দেয়। সমাজবিরোধী শক্তিগুলি ও দাঙ্গাবাজ লুঠেরার দল এর সুযোগ নেয় এবং সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের শরিক হয়ে যায়। এর ফলে নানাদিকে কিছু কিছু হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনা ঘটে যা আন্দোলনের শুরুতে দেখা যায় নি।

বিদ্রোহের সাধারণ চরিত্র

এই কৃষক বিদ্রোহের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আন্দোলনের স্থায়িত্বের সমগ্র কালের মধ্যে কোন বড় জমিদার আক্রান্ত হয় নি, তাদের কোন জমি দখল করা হয় নি। অপর এক বৈশিষ্ট্য এই যে এই বিদ্রোহ-কাল মধ্যে একমাত্র উপরিবর্ণিত কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাড়ির নির্মম ঘটনা ছাড়া কোথাও কোন গণহত্যা, খুন জখম নারীর উপর অত্যাচার বা বীভৎসতার কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় না।

বৃটিশ সরকারের প্রতিহিংসামূলক আচরণ

সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত তাণ্ডব কয়েকদিন পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলতে দেওয়ার পর বৃটিশ সরকার প্রকাশ্য মঞ্চে অবতীর্ণ হল। ঢাকা থেকে সশস্ত্র গুর্খা পুলিশ বাহিনীর এক দল কিশোরগঞ্জে প্রেরিত হল। এই গুর্খা পুলিশ দল অনতিবিলম্বে উপদ্রুত গ্রামগুলির দিকে রওনা হয়ে গেল। তৎকালে কিশোরগঞ্জে অবস্থিত বৃটিশ খৃষ্টান পাদ্রী মিঃ ফ্রাঙ্কলিন নিজস্ব রাইফেলসহ সশস্ত্র গুর্খা পুলিশদলের সঙ্গে যোগ দিলেন। এরূপ রিপোর্ট পাওয়া যায় যে উক্ত মিঃ ফ্রাঙ্কলিন গ্রামের বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে তাঁর রাইফেল ব্যবহার করেছিলেন বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে। গুর্খা পুলিশ দলকর্তৃক গ্রামে গ্রামে এক সন্ত্রাস সৃষ্টির ফলে কৃষকবিদ্রোহ কয়েকদিনের মধ্যেই ধীরেধীরে অবদমিত হয়।

আন্দোলনের শুরু থেকেই নানারকমের গুজব, বিভ্রান্তিমূলক ভীতির সংবাদ

লোকের মুখে মুখে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অমূলক ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। শোনা যায়, বিদ্রোহের অগ্রগতির কয়েক দিন পূর্বে 'খাদেম উল-ইসলাম' নামে একটি মুসলিম সমাজ সেবা সমিতির ডাকে মহরমের দিনে মুসলমানদের এক বিরাট জমায়েত সংগঠিত হয়েছিল। এই জমায়েত থেকে নাকি ধ্বনি উঠেছিল "গান্ধী মুর্দাবাদ" "আল্লা-হো-আকবর" ইত্যাদি। জমায়েতের পর গ্রামের পথে এক শোভাযাত্রাও বেরিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক নেতারা এই শোভাযাত্রায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজনা প্রচার করে এবং হিন্দু তালুকদার ও মহাজনদের উপর আক্রমণের উস্কানী দেয়। শোনা যায় একজন সরকারী পদস্থ প্রভাবশালী মুসলমানের নাকি এর পিছনে কিছু ভূমিকা ছিল! কিন্তু এই উত্তেজনা প্রচার সাফল্য লাভ করে নি।

হিন্দু-মুসলমানের আদর্শ গ্রামীন জীবন

একদিকে কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতা, অপর দিকে সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডবের এই দিনগুলিতেও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় সকলে উত্তেজনার শিকার না হয়ে গ্রামীন জীবনের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া ও ঐক্যবদ্ধ জীবনযাত্রার ধারাকে বজায় রাখতে পেরেছিলেন সেরূপ দৃষ্টান্তও দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ লেখা উপলক্ষে তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে আমি ময়মনসিংহ জেলার অনেকের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একটি আদর্শ গ্রামীন জীবনের চিত্রের সন্ধান পেলাম।

কিশোরগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে হুসেনপুর বাজারের সন্নিকট ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে 'আড়াইবাড়িয়া' একটি গ্রাম। হিন্দু সাহা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও মুসলমান মৎস্য ব্যবসায়ী (নিকারী) সম্প্রদায় এই গ্রামের সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে আসছেন। কোন কালে তাদের মধ্যে কেউ কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতায় উত্তেজনামূলক ঘটনার কথা শোনে নি। এই কৃষক বিদ্রোহের সময় সর্বপ্রথম এক বহিরাগত মৌলবীর চক্রান্তের ফলে সামান্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু উত্তেজনা ফলপ্রসূ হওয়ার পূর্বেই গ্রামের উভয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগ সেটি অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। আড়াই বাড়িয়ার হিন্দু মুসলমান তাদের সুদীর্ঘ কালের ঐক্যবদ্ধ সুন্দর শান্তিপূর্ণ গ্রামীন জীবনের আদর্শকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

খাদেম-উল-ইসলামের নির্দেশ

পূর্বোল্লিখিত মুসলিম সেবা সমিতি খাদেম-উল-ইসলাম আন্দোলন পরিচালনার জন্য কয়েকটি নির্দেশ জারি করেছিলেন, তার মধ্যেও কোন সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী নেই। তাদের নির্দেশ করেছিলেন।

১। রাত্রে কোন আক্রমণ পরিচালনা করবে না।

২। স্ত্রীলোকের উপর কোন আক্রমণ করবে না।

৩। মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ-পত্র, কবলা ইত্যাদি কেড়ে নেবে।

৪। আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করবে।

১৯৩০ সনে এই কৃষক বিদ্রোহের সময়ে আমি অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে মীরাট জেলে আবদ্ধ ছিলাম। এই কৃষক বিদ্রোহের ঘটনাবলি আমরা নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করতাম। মীরাট মামলায় অভিযুক্তদের জবাবে এই বিদ্রোহের উল্লেখ আছে। আমার মনে পড়ে কৃষক-বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর ময়মনাসিংহের তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (তাঁর নাম আমার এখন মনে নেই) এই কৃষক বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনামূলক এক সরকারী রিপোর্টে এ কথাই স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন যে এই কৃষক বিদ্রোহ ছিল মূলত আর্থনীতিক কারণপ্রসূত। তখনকার ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ও স্টেটসম্যান পত্রিকায় উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন সরকারীভাবে বে-আইনী ঘোষিত না হলেও গোপন ভাবেই কাজ করত। আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ইয়ং কমরেডস লীগের কর্মীরাও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই কাজ করতেন। কিন্তু পার্টির নেতৃত্বও তখন ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও অসংগঠিত।

১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন কলকাতা কমিটি কর্তৃক প্রচারিত এক ইশতাহারে এই কৃষকবিদ্রোহের মৌলিক অর্থনৈতিক কারণগুলি অনুধাবন করে বাঙলার কৃষকশ্রেণীকে কিশোরগঞ্জের সংগ্রামী কৃষক শ্রেণীর সারিতে দাঁড়ানোর আহ্বান দিয়েছিল। এই ইশতাহারে বর্ণিত হয়েছিল যে কিশোরগঞ্জের গরীব কৃষক শ্রেণী জমিদার জোতদার ও মহাজনদের শোষণ উৎপীড়ন আর বরদাস্ত করতে না পেরে অবশেষে বিদ্রোহ

ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মিলিতভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেছে। কিশোরগঞ্জের কৃষকগণ পূর্ব বছরের দুর্ভিক্ষের জের সামলে উঠতে পারে নি। কিন্তু জমিদার জোতদার মহাজনের দল এরই মধ্যে তাদের নিকট থেকে শতকরা ৩০% থেকে ১০০% এমন কি ১২০% পর্যন্ত সুদ আদায় করেছে। কিশোরগঞ্জের অন্যতম লাভজনক কৃষিপণ্য পাটের দাম ক্রমশ পড়ে যাওয়ায় কৃষকদের চরম দুর্দশা দেখা দিয়েছিল। ভূমিহীন কৃষি-মজুর বেকার হয়ে পড়েছিল এবং অনাহারে দিনপাত করছিল।

জাতীয়তাবাদী পত্রিকার ভূমিকা

এই কৃষক বিদ্রোহ সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে বিভ্রান্তিমূলক ভূমিকার উল্লেখ করে ইশতাহারে বলা হয়েছে যে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রগুলি বৃটীশ সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর প্রভাবে কৃষক-বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিভ্রান্তমূলক প্রচার চালিয়েছিল। কোন কোন জাতীয়তা বাদী সংবাদপত্র এই কৃষক-বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রূপে চিত্রিত করেছিল এবং শাসকশ্রেণীকে অবিলম্বে জোতদার জমিদার মহাজন শ্রেণীর স্বার্থানুকল্পে কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমনের জন্য লিখেছিল।

বামপন্থী জাতীয়তাবাদী দৈনিক 'লিবার্টির' ২৮শে জুলাই, ১৯৩০এর সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে বিদ্রোহ দমনের জন্য গভর্ণর কর্তৃক স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের হস্ত শক্তিশালী করার চেষ্টা সত্ত্বেও লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি এখনও ঘটছে এবং সরকারী কর্মচারীগণকে হেয় প্রতিপন্ন করছে। গভর্ণরের উদ্যোগের প্রশংসা করে দমন নীতি অধিকতর মাত্রায় চালানোর জন্য 'লিবার্টি' দাবি করে বলেছিল 'কিশোরগঞ্জের অপরাধমূলক কাজের চরিত্র যাই হোক না কেন…' দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার ১৮ই জুলাই ১৯৩০-এর সংখ্যায় লেখা হয়েছিল "গোলমালের মূল কারণ আর্থনীতিক কিম্বা সাম্প্রদায়িক যাই হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। অবস্থা যে অত্যন্ত গুরুতর এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গোলমাল আয়ত্তে আনার জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের যে প্রয়োজনীয়তা আছে সে সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে?' ['কিশোরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ'— ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কলকাতা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ইশতাহার আগষ্ট ১৯৩০]

খুনী

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেবেছিল বাড়িতে কিছু বলবে না। মানে আজই বলবে না। সুযোগ মতো বলবে। আগে নীহারকে বলবে।

কখন, কী ভাবে বলবে মনে মনে তার মহড়াও দিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র শান্তার 'ওই তো দাদা এসে গেছে' শুনে দিবাকর চমক খায়।

দুপা এগিয়েই থমকে দাঁড়ায়: সবাই সদর ঘরে! দু ভাই তিন বোন মা বউ! বেতো বাড়িওলা অব্দি ওপর থেকে নেমে এসেছে!

ঢোঁক গিলে শুধায়, 'কী ব্যাপার? মিটিং ফিটিং মনে হচ্ছে?' হাসির নামে দাঁত দেখায়।

'নির্মল বলে গেল—'

'আঃ, থামো না মা। আসতে না আসতে—' সরোজিনীকে ধমক দিয়ে শান্তা বলে, 'যাও দাদা, তুমি কাপড় চোপড় ছাড়ো, আমি চা করছি। চলো বৌদি।'

শান্তা তক্তাপোষ ছাড়ে, দিবাকর বসে পড়ে।

নির্মল এসেছিল মানে নির্মল তার অফিসেও গিয়েছিল? সেখানে সব জেনে এখানে এসে জানিয়ে গেছে? তাই সবার মুখ হাঁড়ি হয়ে আছে?

রাসকেল! দুই চোয়াল দিবাকরের জুড়ে যায়।

'এসোনা বৌদি! দুখানা পরোটা ভেজে দেব দাদা?

ন্যাকামি! তাকে চমকে দিয়ে মাকে ধমক হাঁকিয়ে কিছুই যেন হয়নি ভাব করা! কটমটিয়ে দিবাকর বোনের দিকে তাকায়।

'এই দাদা।'

'তোমার চা—'

'নির্মল এসেছিল? কী বলে গেল?

'তোমার চা—'

'বিয়েটিয়ে করবে, না মাগনা প্রেম করে কাটিয়ে দেওয়ার মতলব?'

বোনের চাপা আর্তনাদকে আমল না দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'বুঝলেন মেসোমশাই, আমার শালাটি এক রত্ন। পাক্কা দু' বছর ধরে—'

নীহার গর্জে ওঠে, 'ভদ্রভাবে কথা বলো। ও তোমার খায় না পরে?'

'আচ্ছা!'

'আচ্ছা আবার কী? তোমার মতলব কে না জানে। বোনকে পার করার জন্যে নিজেই—'

'বৌদি!' শান্তা কঁকিয়ে ওঠে। ছিটকে বেরিয়ে যায়।

'বৌমা!' সরোজিনী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

চার ভাই বোন জড়োসড়ো হয়ে বসে।

'আহা, কী হচ্ছে কী!' হরিধন নামে সালিশের ভূমিকায়। 'তুমি তো অবুঝ নও বৌমা। দিবুর মন মেজাজ খারাপ—আজকালকার বাজারে—রাগের মাথায় ও যাই বলুক, তাই বলে তোমার কি—'

'মন মেজাজ খারাপ! মন মেজাজ খারাপের জন্যে আমার ভাই দায়ী?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে মেরে নীহার চলে যায়। দুমদাম পা ফেলে চলে যায়।

'কাণ্ড!' করুণ হেসে হরিধন বলে, 'খবরটা শুনে ইস্তক—বেচারা!—নইলে শাশুড়ীর সামনে—আমার সামনে—বুঝলে না বাবা?'

কপালের রগগুলি দিবাকরের দাপাদাপি করে। বুড়ো শকুন!

হরিধন বলে, 'এই, তোরা যা। সন্ধে হয়ে গেছে, পড়তে বোসগে। আপনারও তো আহ্নিকের সময় হয়ে এল, যান, আপনিও যান। ওকি দিবু—তুমি বোসোনা—'

'ওরা এ ঘরেই পড়ে মেসোমশায়।' দরজার কাছে গিয়ে দিবাকর ফিরে দাঁড়ায়। 'আমার কাছে আর নতুন কিছু শোনার নেই। যা শুনেছেন ঠিক শুনেছেন। তবে ভাববেন না। ভাড়া আপনার বাকি পড়বে না। তিন মাসের মাহিনা পেয়েছি, চান তো এখনি তিন মাসের আগাম দিয়ে দিতে পারি।'

এক দমে কথাগুলি বলে বাড়িওলাকে বেকুব বানিয়ে ফেলে রেখে শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। আলো নিভিয়ে ফ্যান খুলে দিয়ে বিছানায় চিৎ হয়। জামাকাপড় না ছেড়ে। স্যাণ্ডেল না খুলে। ব্যাগটাকে বালিশ করে।

গেল! সব ভেঙে গেল!

কত কষ্টে মনটাকে পোষ মানিয়েছিল, ফের বিগড়ে গেল!

পিওনবুকে সই করার সময় হাত কাঁপছিল, চিঠি পড়তে পড়তে দম আটকে এসেছিল, চোখে অঁাধার ঘনিয়েছিল।

তারপর শুরু হয়ে যায় টানা পোড়েন।

নিজের কামরায় তলব করে দত্ত হাত ধরতে কেবল বাকি রাখে: শুধু একটু রিগ্রেট করুক, নামকাওয়াস্তে অ্যাপলজি চাক—তাহলেই সব চুকেবুকে যাবে। এই অর্ডার উইথড্র করে নেওয়া হবে।

'প্লিজ দিবু, প্লিজ! বন্ধু বলেই তোকে—।' সে কী কাতর মিনতি।

তাই শুনে সুকুমাররা হয়ে যায় আগুন।

'ক্ষেপেছেন মশায়! এইভাবে ওরা আমাদের মোরাল ভেঙে দিতে চায়।' 'এখন রেহাই পেলেও ওই অ্যাপলজি ওদের হাতে মারণাস্ত্র হয়ে থাকবে।' 'অ্যাপলজি চাইলেও যদি অর্ডার উইথড্র না করে? দত্ত হারামজাদাকে বিশ্বাস কী?' 'মামলায় ওই অ্যাপলজি আপনার এগেনস্টে যাবে। বনবিহারী-দার কথা মনে নেই?'

দত্তর মিনতিকে মনে হয়েছিল ভীষণ আন্তরিক, সুকুমারদের কথা মনে হয় দারুণ যুক্তিযুক্ত।

কলেজের বন্ধু হলেও দত্ত এখন বস। সুকুমাররা সহকর্মী। দোটানায় পড়ে যায়। দাম বেশি কিসের—কথার, না যুক্তির?

'আসলে স্ট্রাইকের শোধ তুলছে। তখন হেরে গেলেও—।' 'আমরাও ছাড়ব না। আমরাও লড়ব।' 'সুপ্রিম কোর্ট অব্দি যাব।' 'আমরা আপনার সাথে আছি দিবাকরবাবু।' 'বি স্টেডি কমরেড।'

সুকুমার কাঁধে হাত রাখে। চারপাশ থেকে সবাই ঘিরে দাঁড়ায়।

বুক ফুলে ওঠে। ওরা যখন পাশে আছে ভাবনা কিসের! ম্যানেজমেন্টের ঘাড়ে ধরে যারা তামাম অফিসের ডি-এ বাড়িয়ে নিয়েছে, সার্ভিস রুল বদলেছে, টেমপোরারিদের পার্মানেন্ট করেছে—একটা মানুষের চাকরী ফিরিয়ে আনা তাদের কাছে কী!

তবে লড়তে হবে। তা বাঁচতে গেলে লড়তে হবে না? লড়াই না করে বাঁচা যায়?

অফিস থেকে বেরোয় বীরের মত।

এ বরং শাপে বর হল। স্ট্রাইকের হুজ্জোতে দেহ মন বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছিল, বেমক্কা রেস্ট পাওয়া গেল—দিনকতক দিব্যি ঘুমিয়ে-বেড়িয়ে

কাটানো যাবে।

শনিবারের ম্যাটিনী শোয়ে সিনেমা দেখে। ব্ল্যাকে টিকিট কিনে। হিন্দি সিনেমা। সবচেয়ে সস্তার নেশা।

রেস্তঁরায় ভরপেট খেয়ে বউয়ের জন্যে একটা কবিরাজী কাটলেট ব্যাগে পোরে।

সাধ খাওয়াবার রেওয়াজ তো আজকাল নেই। কবিরাজী কাটলেট খাওয়ার সাধের কথা তো মুখ ফুটে বউ কদিন আগে বলেওছে।

এক ফাঁকে ছাদে নিয়ে যাবে। একেবারে তেতলার ছাদে।

বাঁ হাতে জাপ্টে ধরে ডান হাতে কাটলেট ভেঙে ভেঙে খাওয়াবে, নিজে খাওয়াবে, নিজে খাবে চুমু। একেক টুকরো কাটলেটে এক-একটি চুমো। তারপর—

হায়, কত প্লানই করেছিল!

দিবাকর লম্বা শ্বাস ছাড়ে।

পাল্টা ইউনিয়নের যে মুকুন্দদের পর ভাবত তারা পর্যন্ত আপন হয়ে গেল—আর যে নীহারকে সবচেয়ে আপন ভাবত সে হয়ে গেল পর।

অফিসে ঢোকার সময় দারোয়ান রোজকার মত নির্বিকার টুলে বসে কুঁচকি খামচালেও বেরোবার সময় চটপট উঠে সেলাম ঠুকেছে, দরদে চোখমুখ ছলছলিয়ে তুলেছে,—আর এদিকে নিজের মা ভাইবোনেরা—

দিবাকর শ্বাস ছাড়ে। লম্বা শ্বাস।

মায়ের দুর্ভাবনার তবু মানে বোঝা যায়। সেকেলে মানুষ, অতশত বোঝে না, ভবিষ্যত ভেবে নার্ভাস হয়ে পড়া সাজে। ভাই বোনগুলি না-হয় অবুঝ-নাবুঝ। ভাড়া মার যাওয়ার ভয় বাড়িওলার জাগতে পারে।

কিন্তু নীহার কী বলে ওদের সামিল হলো? ওদের একজন হয়ে গেল? নীহারের কি উচিত ছিল না—

আলো জ্বলতেই খিঁচিয়ে উঠছিল, সরোজিনীকে দেখে তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে শোয়।

'জামাকাপড় ছাড়িসনি বাবা! ওঠ, হাতে মুখে জল দে—'

'বিরক্ত কোরো না—যাও!'

'তুইই যদি ভেঙে পড়িস—!' কান্না চাপতে সরোজিনী হাঁসফাঁস করে।

'কে বলল আমি ভেঙে পড়েছি।' তড়াক করে উঠে বসে, 'তোমরা এমন

ভাব করছ যেন চুরিচামারি করে ধরা পড়ে গেছি।'

'সে কথা কে বলেছে বাবা।'

'মুখে বলছে না, ব্যবহারে বলছে। কোথায় তোমরা সিমপ্যাথি জানাবে, বিনা দোষে—'

'বিনা দোষে!' বারান্দা থেকে নীহার বলে ওঠে, 'ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট সেকরেটারির কিছু হলো না, ওর চাকরী গেল বিনা দোষে! ক্ষেপাও! আগবাড়িয়ে আরও লোক ক্ষেপাও।'

বউকে শোনাবার জন্মেই মাকে সামলে রেখে নালিশ পেশ করছিল, বউয়ের কথায় দিবাকর হতভম্ব হয়ে যায়।

কী বিষ গলায়! কী বিষ!

কে বলবে নির্মলের কাছে সে দুর্দান্ত লেকচার দেয় শুনে খুশিতে ডগমগ এই বউই সেদিন 'শোনাবে একবার তোমার বক্তিমে' বলে দুহাতে গলা পেঁচিয়ে শিশুয়ালী আব্দার ধরেছিল! স্বামীগরবে গরবিনী হয়ে উঠেছিল।

'আমার হয়েছে জালা! এত লোকের মরণ হয়, ভগবান কেন যে আমার—'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সরোজিনী চলে যাচ্ছিল, দিবাকর ডাকে। ব্যাগ থেকে নোটের তাড়া বের করে। থ্যাতলানো কাটলেটের গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে।

'তিন মাসের মাইনে—পঞ্চাশটা টাকা রাখলাম—নাও।'

'ও আমি কী করব?'

'যা করো! তিন মাস এখন আমার ধারে কাছে কেউ আসবে না। আমার চাকরী নিয়ে কারো মুখে যেন একটা কথাও না শুনি।'

'তুই কি ভেবেছিস আমি টাকার জন্মে—বৌমা চাকরি করে বলে মাথা কিনে রেখেছে—তুইও কি—'

'কাঁদুনে গেয়ো না। কাউকে চিনতে আমার বাকি নেই। চাকরি চলে গেছে বলে গুষ্টিশুদ্ধ যেভাবে—'

দাঁতে দাঁত ঘষে। অমানুষিক আক্রোশ আর অকথ্য অভিমানে দুই চোখ দিবাকরের ফেটে পড়তে চায়।

মাথাটা চৌচির হতে—

দিবাকর যত উত্তেজিত হয় সুকুমার বাড়ায় তত হাসির মাত্রা।

চটে গিয়ে দিবাকর বলে, 'হাসছেন কি মশায়। টিচার রিপ্রেজেনটেটিভ, এ বি টি এ-র অ্যাকটিভ মেম্বার হওয়া সত্ত্বেও ও কি না—'

'সমরবাবু তো ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ?'

'তার সাথে—'

'স্ট্রাইকের তিন দিন আগেই ভুম করে এক মাসের মেডিক্যাল লীভ নিয়ে নিলেন। আবার পনের দিনে স্ট্রাইক মিটে যেতে ষোল দিনের দিন মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে জয়েন করলেন। ব্যাপারটা সবাই বুঝল, কিন্তু কী আর করা যাবে। পাঁচজনকে নিয়ে চলতে হলে—'

'কিন্তু নীহার, মানে আমার স্ত্রী—'

'জানি। ওর কথা শুনেছি। মিলিট্যাণ্ট মহিলা। কিন্তু সকলের মিলিট্যান্সি তো সমান নয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সবাই চায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে কজন পারে ?'

'আমি যদি পারি ? সেটা আমার অপরাধ ?'

সুকুমার সায় দেয়।

'অপরাধ !'

'ওদের কাছে অপরাধ। আপনার লড়াইয়ের খেসারত যে ওদের দিতে হবে।'

খানিক গুম হয়ে থেকে দিবাকর বলে, 'তাহলে এ্যাদ্দিন ও যা বলে এসেছে—'

'আসল কথা হল মিলিট্যান্সিটা যাচাই হয় কথায় নয়, লড়াইয়ে। সেজন্যে চাই পলিটিক্যাল কনসাসনেস। এবং বাড়ির সবাইকে পলিটিক্যাল কনসাস না করে পলিটিকস করতে গেলে সংঘাত বাধবেই। পেটি বুর্জোয়াদের ট্রাজেডি হলো—'

মুখস্থ পার্টের মত সুকুমার কথা বলে যায়। ঝানু মাস্টারের মত বোঝায়।

অথচ মিটিংয়ে এই সুকুমারেরই তোতলামি চাড়া দেয়। তখন ডাক পড়ে দিবাকরের। দিবাকরের মত ক্লিয়ার আইডিয়া গলার মডুলেশন ভাষার জোর কার আছে! ক বছর আগের নামকরা ছাত্র-নেতা দিবাকরের মতো।

তা বাড়িতে মাস্টারি সুকুমার করতে পারে। বাড়িতে ছাত্রনেতাকে ছাত্র বানাতে পারে। আইবুড়ো তিন বোন। ইস্কুল কলেজে পড়ুয়া চার

ভাই। এঁদো গলির মধ্যে দুখানা ঘর। বালিখসা দেওয়ালের মত অভাবের ছাপ সংসারে প্রকট।

অথচ তাতে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। দারিদ্র্যের জন্যে লজ্জাশরম নেই। ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা নেই। ইউনিয়ন করার জন্যে বার তিনেক চাকরি খুইয়ে জেল খেটেও বেপরোয়া।

পলিটিক্যাল কনসাসনেস বাড়ির সবাইকে সমঝে দিয়েছে, এই সমাজে এভাবেই বাঁচতে হবে। খেয়ে না-খেয়ে আধপেটা খেয়ে। ছুটহাট জেলে গিয়ে, ছাঁটাই হয়ে। ফাইট টু ফিনিস।

এই সমাজটাকে বদলে না ফেলা অব্দি সাজানো গুছনো জীবন যাপন অসম্ভব।

পেটি বুর্জোয়া সেণ্টিমেণ্ট; পেটি বুর্জোয়া ধ্যান ধারণা—

সব অনর্থের মূল। জোরালো ঘাড় নেড়ে দিবাকর কবুল করে। সে যে আস্ত একটা পেটি বুর্জোয়া সুকুমার তা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিল। পেটি বুর্জোয়া যখন পেটি বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা তার থাকাও স্বাভাবিক রাতকানার রাতে না দেখতে পাওয়ার মতই স্বাভাবিক।

পেটি বুর্জোয়া ট্রাজেডির হাত থেকে সুতরাং তার রেহাই নেই।

'চলি।' দেহটাকে দিবাকরের দুর্বহ মনে হয়।

'আসুন।' সুকুমারও উঠে দাঁড়ায়। 'অমিয়র ড্রাফটটা কাল মহেশ-বাবুকে দিয়ে এসেছি, আজকালের মধ্যেই—'

'আপনি—আপনারা যখন ভার নিয়েছেন ও নিয়ে আমি আর ভাবছি না।' মুখে বলে বটে ভাবছি না কিন্তু ভাবনার চাপে বোধ বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যয়ে।

বাড়িতে যে বাঘা বিপ্লবী, সুকুমারের কাছে সে কিনা স্রেফ পেটি বুর্জোয়া!

সুকুমারদের নেতা জগৎ বোসের কাছেও তাহলে পেটি বুর্জোয়া? পার্ক-সার্কাসে পাঁচ ফ্ল্যাটওলা মালিক যে জগৎ বোস, শাঁসালো শ্বশুরের জামাই যে জগৎ বোস, কোনদিন হাইকোর্টে না গিয়ে দিব্যি পলিটিকস করে চলেছে যে ব্যারিস্টার জগৎ বোস। দিবাকরের থেকে ঢের ঢের বেশি সাজানো গুছনো জীবন যে জগৎ বোসের।

পেটি বুর্জোয়া যখন, সুকুমারের কাছে সমর ভটচাজ আর দিবাকর এক?

তিগ্রির তফাও হলে ও এক। একজন স্ট্রাইকের সময় মেডিক্যাল লীভ নিয়ে কেটে পড়লেও আরেকজন গেট-মিটিংয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভাঙলেও এক? একই টাকার এ পিঠ—ও পিঠ? সুকুমার আর জগৎ বোস যেমন?

মাথা গুলিয়ে যায়।

নীহারের তাহলে আর দোষ কি? টিচার রিপ্রেজেনটেটিভ এ বি টি এর অ্যাকটিভ মেম্বার হলেও, স্বামী আচমকা বেকার হয়ে গেলে ভেঙে সে পড়বেই তো। পেটি বুর্জোয়া যে।

সাত-সাতটা বছর প্রতীক্ষার পর যে মা হতে চলেছে, ছ মাস মেটার্নিটি লীভের তিন মাস মাইনে পাবে না বলে দু বছর ধরে যে যাবতীয় সাধ আহ্লাদ মুলতুবি রেখে মা হওয়ার খরচ খরচার টাকা জমাচ্ছে, এক বছর যে শাড়ি ব্লাউজ কেনেনি—

বউয়ের জন্যে মনটা দিবাকরের টনটনিয়ে ওঠে। নির্মলকে নিয়ে ওভাবে সেদিন খোঁচা দেওয়া ঠিক হয়নি। তাও সবার সামনে! ভাইটাকে দিদি কী ভালোবাসে জানে তো।

আফটার অল নির্মলেরও কোন বদ মতলব ছিল না। পাশাপাশি অফিস খবরটা শুনেছে, শুনে ভালো মনে করেই দিদিকে তা জানিয়েছে।

কংগ্রেসী হলেও ছেলেটা ভালো। তাই না শান্তার সাথে প্রেম করার সুযোগ দিয়েছে। প্রেমে পড়ে বিয়ে করলে দেনাপাওনার কথা উঠবে না বলে হলেও দিয়েছে তো। তবু কেন যে সে দিন—

দিবাকরের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে।

তার পরেও কেন গোঁ ধরে রইল? পাঁচদিন কেন নীহারের সাথে কথা বলল না? যেচে ভাব করল না? বাপের বাড়ি যেতে দিল কেন? শ্যামবাজার থেকে সাঁতরাগাছিতে মর্নিং স্কুল করা চাট্টিখানি কথা!

অভিমান? এও এক পেটি বুর্জোয়া সেন্টিমেন্ট। কোনো যুক্তি নেই এই অভিমানের। অর্থহীন এই অভিমানের জিদ।

জিদ! দত্ত ঠিকই বলেছিল, 'কেন জিদ করছিস দিবু। তুই অফিসের ডিসিপ্লিন ভেঙেছিস এটা তো ঠিক? দু-দুটো শো-কজ নোটিশের জবাবও দিসনি। একদিন তোর ফ্রেণ্ড ছিলাম, আজ আমাকে যাই মনে করিস, বিশ্বাস কর—তোর ভালোর জন্তেই—প্লিজ দিবু প্লিজ।

ডিসিপ্লিন ভাঙার যখন প্রমাণ আছে, শো-কজ নোটিশের জবাব না-দেওয়ায়

সেই প্রমাণকে যখন জোরদার করেছে—নামকা ওয়াস্তে রিগ্রেট করে একটা চিঠি দিতে নারাজ হওয়া তখন জিদ ছাড়া কী ?

কী হতো চিঠি দিলে ? সবাই ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। সকলের কাছে ছোট হয়ে যেত। সমর ভটচাজের মতো হয়ে যেত। এই তো ?

কিন্তু কদিন ? এক সময় সব থিতিয়ে আসত। সমর ভটচাজকে ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে সরাবার দাবি এরি মধ্যে মিইয়ে এসেছে। মার্কা মারা দালাল মুকুন্দর সাথেও সবাই আজ হেসে কথা বলছে।

কী হবে চিঠি দিলে ? হীরো বলে সবাই এখন মাথায় করে রেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

কিন্তু মামলায় যদি না জেতে ? মামলা যদি সুপরিম কোর্ট অব্দি যায় ? বছর বছর ধরে যদি মামলা চলে ?

সবাই চাঁদা তুলে সাহায্য করবে ? কদ্দিন করবে ?

খাদ্যের দাবি জানাতে গিয়ে গুলি খেয়ে একমাত্র রোজগেরে ছেলে শহীদ হয়ে গেলে শহীদের বাপের জন্যে দরদে পাড়া উথলে উঠেছিল। দামী খাটে চড়িয়ে মিছিল করে শহীদকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। শহীদের সাথে ফুলই পুড়েছিল কোন্-না শ-খানেক টাকার।

গলির মোড়ে শহীদ স্তম্ভ গেঁথেছিল। শহীদের বাপের জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিল।

কী খাতির শহীদের বাপের ! কী সম্মান !

আর সেই শহীদের বাপ আজ ছেলের শহীদ স্তম্ভের পাশে কাটা কাপড়ের পশরা সাজিয়ে বসেছে। শহীদের মা পরের বাড়ির রাঁধুনি হয়েছে। শহীদের ভাই ছুটো চায়ের দোকানের বয়। বোন হাফ-গেরস্থ।

হাওড়ার ট্রামে উঠেই লাফ দিয়ে দিবাকর নেমে পড়ে। কোনমতে টাল সামলে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ভবানীপুরের ছুটন্ত বাস ধরে।

ভেবেছিল বাড়িতে কিছু বলবে না। মানে এখনই বলবে না। আগে নীহারকে বলবে।

গা ধুয়ে জামাই সেজে শ্যামবাজারে যাবে। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে যাবে।

খবরটা দিয়ে নীহারকে নিয়ে আসবে। সেই ট্যাক্সিতেই নিয়ে আসবে।

ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে কোন রেস্তরাঁয় ঢুকবে। নীহারকে কবিরাজী কাটলেট খাওয়াবে গরমা গরম কবিরাজী কাটলেট।

সাধ খাওয়াবার রেওয়াজ তো আজকাল নেই। কবিরাজী কাটলেট খাওয়ার সাধের কথা তো মুখ ফুটে বউ কদিন আগে বলেছে।

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই দিবাকরের যেন কেমন কেমন লাগে। তাকে দেখামাত্র ত্তড়ি ঘড়ি সবাই সদর থেকে সরে পড়ল? এখনও তাকে ভয়। তার হাসি হাসি মুখ দেখেও ভয়?

'একি নির্মল! তুমি কখন এলে?'

'খানিক আগে।'

'যাচ্ছ কেন। শোন শোন—'

'আমার কাজ আছে জামাইবাবু।'

'আরে শোনোই না—খবর আছে।'

'জানি।' বাড়ি থেকে নির্মল বেরিয়ে যায়।

জানি! তার মানে আজও তার অফিসে গিয়েছিল? সেখানে জেনে এখানে জানিয়ে গেল?

রাসকেলটা এভাবে তার ওপর টেক্কা দিল!

ঘরে ঢুকেই ফোঁপানির শব্দে বারেক দিবাকর থমকে দাঁড়ায়।

তারপর 'নীহার! নীহার! তুমি এসেছ নীহার! বলে হামলে, গিয়ে বিছানায় পড়ছিল, 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—খবর্দার আমায় ছুঁয়োনা' বলে দেওয়ালের কাছে সরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে নীহার হু হু করে কেঁদে ওঠে।

দিবাকর যায় ঘাবড়ে।

'নীহার!'

'থুতু দেব, আমাকে ছুঁলে গায়ে থুতু দেব।'

থুতু দেবে? স্বামী ছুঁলে বউ গায়ে থুতু দেবে? কথাটা ঠিক ঠিক শুনেছে তো?

'নীহার!' দিবাকর কড়া গলায় বলে, 'কী যা তা বলছ।'

'যা তা!' হঠাৎ নীহার উঠে বসে। দিবাকরের দিকে সরাসরি তাকায়।

জলে-ভাসা মুখে আগুনের টুকরোর মত চোখের তারা দুটি তার ধক ধক করে। 'তুমি—তুমি—তুমি—' ফের লুটিয়ে পড়ে। বালিশটা আঁকড়ে ধরে। 'তোমার জন্তে আমি—' ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। 'কী ঘেন্না! কী ঘেন্না!'

ঘেন্না! স্বামীকে ঘেন্না!

গলা ফাটিয়ে দিবাকর কৈফিয়ত তলব করতে যাচ্ছিল, হাত ধরে শান্তা বলে, 'বাইরে এসো দাদা। বৌদির রেস্ট দরকার।'

'রেস্ট দরকার!'

দিবাকরকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে শান্তা হেঁসেলের দিকে চলে যায়।

ব্যাকুলভাবে দিবাকর শুধায় 'কেন রেস্ট দরকার? কী হয়েছে তোর বৌদির?'

'বৌমা—'

'কী হয়েছে ওর?'

'জানি না, আমি জানি না—আমি কিচ্ছু জানি না!' ভাঁড়ারের দরজায় সরোজিনী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

'মিনি, খোকন তোদের বৌদির কী হয়েছেরে?'

জবাব না দিয়ে পুবের ঘরের দরজায় চার ভাই-বোন জড়াজড়ি করে চেয়ে থাকে। অপলক চেয়ে থাকে।

'শান্তা—'

'বৌদি আজই নার্সিং হোম থেকে—'

'নার্সিং হোম থেকে!'

'সবাই আপত্তি করেছিল, কিন্তু বৌদি জোর করে—এ তুমি কী করলে দাদা! বৌদি তোমার জন্তে—' শান্তা ফুঁপিয়ে ওঠে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সরোজিনী।

ঘরের মধ্যে নীহার।

পুবের ঘরের দরজায় জড়াজড়ি করে দাঁড়ানো নাবালক চার ভাই বোনের একাকার মুখগুলির দিকে তাকিয়ে সরোজিনী শান্তা নীহারের একটানা কান্না শুনতে শুনতে হাঁটু দুটি আচমকা তুমড়ে আসে দিবাকরের।

ভালোবাসলে হাততালি দেয়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভালোবাসলে হাততালি দেয়
এমনি ওরা গাধা ;
বলে, 'তোমার বুকের ভিতর
ম্যাজিক দেখাও, ম্যাজিক—
দেবো আমরা হাজার টাকা চাঁদা !'

যদিও ভালবেসে আমার
মাথার চুল সাদা।

সড়ক ধরে

চিত্ত ঘোষ

যে যার সড়ক দিয়ে হেঁটে যায়, আসে
অভ্যেস রঙকরা খাঁচা, নানা পাখি ধরে
গাছগুলো থেমে আছে রাস্তার দুপাশে
একটুও জায়গা নেই কলকাতা সহরে।

হালফিল দিনকাল খুবই প্যাঁচালো এবং
ভীষণ ফেরেববাজ ধুরন্ধর হাওয়া
জলকাদা রাস্তা ভেঙে হাঁটতে বরং
ভালো লাগে। একটু সৎ স্বাভাবিক হওয়া।

প্রাচীন প্রখর শূন্যে দুচোখের দূর দৃষ্টি জেলে
উঁচু গোল আকাশের অন্ধকার, তারাপুঞ্জ দেখা
নির্জন সমুদ্রতীরে ফিরে আসবে দিনান্তের সেই বুড়ো জেলে
রক্তে যার রাত্রির ঘুমের মধ্যে বাদামী সিংহের স্বপ্ন দেখা।

দলছুট কোথায় যাবে ? পলাতক নিঃসঙ্গ ফেরার
ধরা পড়বে সময়ের ধূর্ত এক গোয়েন্দার হাতে
রাক্ষুসী এ সহরের সে-নির্মোকে জড়াবে আবার
নিদ্রাহীন রাত্রি কাটবে স্মৃতির করাতে।

খুপরি থেকে দেখলাম

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বেগনি শাড়ি পরে ঐ যে-মেয়েটা চলে গেলো রাস্তায়—ঐ যাকে আমার তেতলার খুপরি থেকে দেখলাম—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তাকে একদিন চিনতাম। কিন্তু জোর করো না, সঠিক বলতে পারবো না।

আমার ভাই কেবলি সব কেমন গুলিয়ে যায় আজ, তাই অমন করে আর এসো না, বলো না, একে চেনো, ওকে চেনো, তাকে চেনো ?

এত চেনার কী আছে এই বুড়ি শহরতলিতে, জানি না—সব এক, কী ভীষণ এক, নারীগুলোর সেই একই শূকরীর অন্তর, পুরুষগুলোও সমান, সবুজ একটা গাছ কোথাও নেই। কী আছে চেনার, চারিধারের প্রকাণ্ড পরিখার এই অতি পরিচিত সীমানায়।

অচেনার হাওয়া না লাগলে চেনায় পরিচয় জমে না বলেই আগে ঐ পরিখাটাকে সরাও, ভাঙো—এসো আমরা সকলে ভাঙি, পাতা ওল্টাই জীবনের, একটু সজীব সুস্থ প্রেম করি মানুষে-মানুষে, লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর ঘণ্টাটা বাজাও—তখন পরিখার ওপারে যে-আশ্চর্য স্নিগ্ধতার অরণ্য আছে, বা কে জানে কোন বহ্নিমান মরুভূমিই আছে, দেখা যাবে আমাদের চেনা সূর্যালোক সেখানে কোন রঙে পড়ে।

স্যাখো তো, ভেবে আমি এখনই আকুল, আমাদের চোখ সেদিন কী পাগল-পারা নদী, ছুটছে উধাও!

আজ নয়, তখন বন্ধু এসো এই খুপরিতে, আবার নতুন করে বলো, একে চেনো ওকে চেনো, তাকে চেনো ?—আমন্ত্রণ রইল।

সহযাত্রী অটল বিশ্বাস

কৃষ্ণ ধর

তার সঙ্গে কানামাছি খেলি প্রতিদিন
হৃদয়ের সহযাত্রী যার দৃঢ় বাহু অস্তিত্বকে
আগলে রাখে
সংশয়, সন্ত্রাস, ভয়, অবিশ্বাস, আগুনের
জতুগৃহ থেকে।

কখনো দ্বন্দ্বের ভিতরে পড়ি, কখনো চীৎকারে
উচ্চকিত হয়ে উঠি
কখনো নিজের ভায়ের মুখ দেখে ঘৃণা করতে শিখি
কখনো নিজেকে
সম্পূর্ণ অপরিচিত অন্য এক প্রতিবেশী অজ্ঞাত কুলশীল
স্বেচ্ছাচারী ভাবি।

কখনো নিজের নখের ঘায়ে ক্ষতস্থান থেকে
পিতৃপিতামহের রক্তপাত দেখি
বিচলিত হতে চায় হৃদয়ের, বুদ্ধির সহযাত্রী
বিশ্বস্ত চেতনা, বোধ···সত্তার অদ্বিতীয় সখা।
এই সর্বনাশে ছলনায়, প্রলোভনে, নিরাপত্তা লাভের ইচ্ছায়
নিজেরই চিবুক নেড়ে আয়নায়
প্রতিবিম্ব দেখি।

কেউ আর কাছে নেই শুধু এই আত্মবোধ ছাড়া
পলাতক এ সময়ে আমিই আমার রক্ষক
ডামাডোলে শুধু টিঁকে থাকে
যাকে নিয়ে দুর্ভাবনা যার সঙ্গে প্রতিদিন
কানামাছি খেলা
যাকে ঘিরে সত্তার আশ্রয়
হিরণ্যবাহুর মতো দীপ্তিমান অদ্বিতীয় সখা
পবিত্রতা অটল বিশ্বাস।

প্রতিযাত্রা

বিতোষ আচার্য

এবার উৎসের দিকে

প্রতিযাত্রা

কদমে কদমে রক্তাক্ত চাঁদের নুড়ি

উপত্যকা নিষ্কম্প, নিবাত

আর

সিক্ত অন্ত্যাজুটো জাতিস্মর :

নিয়ানডার্থাল মানুষের প্রদোষের ধূপছায়া

গম্ভীর গলায় শিঙা ফোঁকে

পৃথিবীর উজ্জ্বল গোলক কী আশ্চর্য সুন্দর, সুদূর

গুহা মুখ পাথরের পিঠে বৃষ্টি পতনের শব্দে

শরীরে রোমাঞ্চ লেগেছিল

সেই থেকে ঘর ছাড়া :

প্লাবনের গলাজল দুহাতে উজিয়ে

নিষ্ঠুর বাতাস রৌদ্র নখে নখে চিরে

জন্মনাড়ী হিঁচড়ে ছিঁড়ে রক্তাক্ত শরীরে

অনেক, অনেক দিন

এবার উৎসের দিকে প্রতিযাত্রা

সঙ্কট-সাগর-তীরে যে নামে নামুক

চাঁদের ওপিঠে যাক, অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকুক

রাতের পাখির মতো প্রহরে প্রহরে ডেকে

নির্জনতা সম্ভোগ করুক

বিধ্বস্ত বুকের মধ্যে ভূমিকম্প—

সিস্‌মোগ্রাফে কি পড়বে পৃথিবী ?

এবার উৎসের দিকে প্রতিযাত্রা ॥

ভগ্ন দেয়ালের পরপারে

শিবশম্ভু পাল

ভালোবাসা নিয়ে ঢের লেখালেখি করেছি, এবার
পৃথিবীর মানচিত্রে সংবেদনাময়
তীব্রদ্যুতি আলো ফেলব ভূখণ্ডের অন্তরঙ্গ বর্ণপরিচয়
জেনে জেনে তুলে ধরব মূর্তিখানি বৃষ্টিহীনতার।

আমার ইচ্ছার থেকে নক্ষত্র প্রমাণ দূরে পাশের বাড়ির
মুখরিত সংগঠন ভাঙাচোরা অথবা নির্মাণ
ব্রিগেডপ্যারেড ময়দান
মনে হয় আকাশের ওপারে স্লোগান দীপ্ত সুদূর মন্দির।

কে তুমি নিহিত আছো মজ্জায়, বিচূর্ণ করো বাঁধ
কবিতার শব্দগুলি ভেসে যাক জলস্রোতে আলোয় আঁধারে:
ভগ্ন দেয়ালের পরপারে
পাশের বাড়িকে যাব : ইচ্ছার সফল অনুবাদ॥

পূর্ণিমা আলোর আজ

শান্তিকুমার ঘোষ

জ্যোৎস্নার প্লাবন ছেপে
গুরু গুরু তরাইয়ের ডাক
পৌঁছয় গাঙেয় তটে। ছিঁড়ে বাহু-পাক,
সুখশয্যা ফেলে আমরা দাঁড়াবো উঠে—
মারবো ধনুকে টান।
আহীর ভৈঁরোয় সেধে তান।
দেবে বিপ্লবের পাখা মেলে জোড়া চক্রবাক।

পূর্ণিমা আলোর আজ এত মন্ত্রগুণ···
অ্যাসফল্ট জঙ্গলে ওই ধরলো আগুন।

জিন্দাবাদ

গোপাল হালদার

'হেমা, হেমা, হেমা'—

চেঁচামেচিটা কাছে এসে পড়ল। তিন চারটা মানুষ একেবারে সাত তাড়াতাড়ি ঘরের দুয়ারে এসে পড়ছে। সদু মাসী উঠে বসলেন। কান পেতে শুনলেন কাকে ডাকছে, রমা, না, হেমা?—হেমাকে; যাক্। দুয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু না, হেমা আবার কি করলে?...সদু মাসী ঘরের বাইরে গেলেন না, দুয়ার থেকে জবরদস্ত বাঙাল গলায় বল্লেন, কারে চাই?

—হেমা, হেমা কৈ?

সদু মাসী রমার মা—রমেন্দ্র লাল চৌধুরীর—রেলের ঠিকাদারের সাকরেদ—বুঝে-সুঝে কথা বলতে হয়। হেমাকে দিয়ে অবশ্য তত বুঝোবুঝি না করলেও চলে। কিন্তু কি জানি, কী এদের মতলব?

—এমন চীৎকার পাড়' ক্যান্?—বাবা, যেন ডাকাইত পড়্ছে।

—কাজ আছে যে মাসীমা, ভয়ানক 'আর্জেন্ট' কাজ।—একজন এগিয়ে এল।

—মধুটা বুঝি?—সে হেমার বন্ধু। সদুমাসী কিন্তু তবু ভুল করবেন না।

—কী 'আর্জেন্টো কাজটা' হেমার কাছে? আর, তোমরা কে? মধু বল্লে, আমি মধু, মাসীমা, মধুসূদন চক্কোত্তি—

—মধু! আইচ্ছা, তুই নয় মধু,—কিন্তু ওরা কে? এইগুলিরে তো চক্ষেও দেখি নাই আগে।

—ওরা আমাদের বন্ধু,—আমার, হেমার। পেয়ারা বাগানের ওদিককার।

—বন্ধু! 'বন্ধু' ক্যামন? নাম নাই? বাপের নাম নাই?

—আপনি কি তাদের চিন্বেন? হরিপদ দত্ত—তোর বাবার নাম কিরে? বিষ্ণুপদ দত্ত। কেষ্ট— কৃষ্ণ সেন। মতে বোস—মধু তাড়াতাড়ি

মু—৮

নাম বলে যায়। এবং বলে, কিন্তু আপনি চিনবেন কাকে? আর দেরী না করে বলুন তো—হেমা কোথায় ?

—তারে ক্যান চাই ?

মধু একটু খোশামোদ করে বল্‌লে,—দরকার যে মাসীমা, বেজায় দরকার।

—যাঃ। আমি জানি না।

—নিশ্চয় জানেন; বলুন।

—কমু না।

—কী জ্বালা। সর্বনাশ হবে যে—

ওদিকের অন্ধকার থেকে খালি গায়ে লুঙ্গি পরা একটি লোক এগিয়ে আসছিল; কাল্‌চে রঙ ঢেঙা মাঝারি গোছের। তারা দেখেনি। একেবারে তার গলা শুন্‌ল—কে মধুদা নাকি?

—এই যে হেমা! যাক্‌ বাঁচালি!

সদু মাসী দুয়ার থেকে এগিয়ে এলেন। হেমা ওরফে হেমেন্দ্রলাল চৌধুরীর কাঁধে একটু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলেন।

—পলা শীগ্‌গির পলা।

হেমা মাকে বাধা দিয়ে বললে,—কী যে করো তুমি, মা, থামো।

মাকে থামানো যাবে না জানত, বললে, কী হয়েছে মধুদা ?

—সাঙ্ঘাতিক আর্জেন্ট। কিছু খবর রাখিস্‌ না—বিকাল থেকে খোঁজা খুঁজি করছি—

—কী ব্যাপার? আমি দুদিন ধরে ক্যানিং-এ। এইতো এসেছি সন্ধ্যায়।

—ক্যানিং। ও "কাস্তেফৌজ" ওই-ই কর—জমি দখল করবি। ও-দিকে যে এখানে মানুষ বেদখল হয়ে যাচ্ছে, তার খোঁজও রাখিস্‌ না। নে, চট্‌ করে জামা কাপড় পরে নে।--

—কেন? কোথায় যেতে হবে।

—পেয়ারাবাগান।

হেমা কী যেন বুঝ্‌ল! কেন বল তো?

—ওদিকে চল, বলছি।

হেমাকে নিয়ে ওরা একটু সরে গেল—হাত পনের দূরে। সত্ন মাসী চিৎকার জুড়েছেন—যাইস্‌ না, যাইস্‌ না হেমা। একটা তো গেছে—তুই আর যাইস্‌ না। তুই যাইস্‌ না—ওই ডাকাইত গো লগে।—

হেমাকে মধু বললে.—ভেরি আর্জেণ্ট। ইংরেজিতে বলায় ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝা সম্ভব হলো। হেমাও গম্ভীর হয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলে।

—কী?

—ক্ষেপির বিয়ে।—

ক্রমে সহজ কথাটা জানা গেল—'ক্ষেপি' অর্থাৎ ছবিরাণী ভৌমিকের বিয়ে হচ্ছে। ন'টায় লগ্ন। খবরটা চেপে রেখে ছিল তার বাবা ও বাড়ির লোকজন। তারা জানেও বোধ হয়—হেমা এখানে নেই—আর এ সময়ে মেয়েটাকে পার করতে হবে।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে হেমা বল্‌লে—ক্ষেপি রাজী হলো?

—হতেও পারে। তবে খবরটা ওই-ই পাঠিয়েছে।

হেমা একবার স্থির হলো—কী জানিয়েছে। কোথায় বিয়ে হচ্ছে?

—তোদের কারও সঙ্গে?

—দূর। শুনেছি—ওদিকে গড়িয়ার একটা ছোকরা—কী একটা কাজও করে—কংগ্রেসী বা জনসঙ্ঘও হতে পারে। হেমা একটু দমে গেল। বল্‌লে—কাজ করে? তা হলে আর কী করবি?

মধু বল্‌লে, 'তাহলে কিছু করব না? চুপ করে থাকব নাকি? চাকরি করে বলে ক্ষেপির-ও মাথা কিনেছে নাকি? বেকার বলে আমাদের কোনো জোরও নেই?

হেমা সরাসরি উত্তর না দিয়ে বল্‌লে,—লগ্ন ন'টায় বল্‌লে না। এখন তো প্রায় সাতটা।

—তাইতো বল্‌ছি—জামা কাপড় পরে আয়। ট্যাক্সি আছে, পথে কথা হবে।

—ট্যাক্সি এনেছো—

—শুধু ট্যাক্সি; আমাদের জিনিসপত্তরও রেডি—

—লোকজন লাগবে—আমাদের ওদের নেব না?—'কাস্তেফৌজ'?

—বল্‌। দেরী করতে পারব না কিন্তু। ট্যাক্সি করে পিছনে আস্‌তে বল জয়েণ্ট এ্যাকশন। একটা লাল ব্যাজ এঁটে নেয় যেন। জায়গাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি আমরা।

বিদ্যুত গতিতে ঘরে ঢুকে গেল হেমা। সদুমাসী পিছনে পিছনে গাল পাড়তে পাড়তে তাকে আটকাতে গেলেন। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে বাঁশে ঘেরা বারান্দা কাম আটচালা থেকে ট্রাউজার আর বুশশার্ট পরে বেরিয়ে এল হেমা। মায়ের গাল কানেও তুল্‌লে না। এদিকে দু'তিনটি বন্ধুকে ডাক দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—পিছনে আয়—যত শিগগির পারিস্—হ্যাঁ হ্যাঁ, লাল ব্যাজ বলবি—সিকুল্ রেড্ গার্ডস্।

মধুদার সঙ্গে হেমা বেরিয়ে গেল—ট্যাক্সি প্রস্তুত। চলল।

বরপক্ষ সবে এসে বসেছে—বরযাত্রদের ডাক পড়বে। তার আগে চা ও সরবতের ব্যবস্থা হচ্ছে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ শোনা গেল একটা হৈ-হৈ 'যুক্তফ্রণ্ট জিন্দাবাদ', রেড ষ্টারস্ আপ্ আপ। বরপক্ষ উঁকি ঝুঁকি মারছে। কন্যাকর্তাদের দিকেই বোঝা গেল হল্লাটা।

—এ বিয়ে হবে না···আমরা হতে দেব না।

হতবুদ্ধি কন্যাকর্তা অখিল ভৌমিক বলেন—তোমরা—তোমরা কে ?

—আমরা লালফৌজ, আমরা রেড গার্ডস্।

—হাতুড়ি বাহিনী ? তা তোমাদের এখানে কী ? এখানে কারখানা-টারখানা নেই—এটা বিয়ে বাড়ি চাঁদা-টাদা চাও,—তা কাল এসো—

—বিয়েটা বন্ধ করুন—

—বিয়ে বন্ধ করব কেন ?

—কেন ? ক্ষেপি আমাদের মেম্বর।

—ক্ষেপি আবার কার মেম্বর ? আমি মেয়ের বাপ আমি জানি না, আর সে তোমাদের মেম্বর ?

—বাপের জানবার কী আছে ? যে মেম্বর সে মেম্বর, জিজ্ঞাস করুন ক্ষেপিকে।

—ভারি আমার দায়। মেম্বর নয় মেম্বার, তাতে বিয়ে হবে না তার ?

—হবে। তার আর আমাদের রেড গার্ডসদের মত না নিয়ে আপনারা তার বিয়ে দিতে পারবেন না।

—তোমাদের মত। তোমরা তার কে শুনি ?

—না, শক্ত হতে হলো। ভাবছিলাম ক্ষেপির বাপ। ভালো কথাতে বলব। আমরা কে জানতে চান্, জানাতে পারি—আমাকে তো চেনেন—মধু

চক্কোত্তি,—না, আমার বাবাকে চেনেন বললে হবে না। আমাকেই চিনবেন। আর এই আমাদের—দেখছেন তো আমাদের 'ব্যাজ'—এই লাল হাতুড়ি ব্যাজ্। হাতে বাঁধা লাল কাপড়টা দেখিয়ে বল্লে—না, আর কিছু দেখতে চান? বোমা, পিস্তল?

অখিল বাবুর মুখে কথা সর্‌ল না। যারা কাছাকাছি ছিল, তারা দুয়ে সরে পড়তে লাগ্‌ল। 'নকশালবাড়ী!' 'নকশালবাড়ী'! 'না,' 'চে গুয়েভারা'।" "না, মাও সে তুং।"

অখিলবাবু হাল না ছেড়ে বল্লেন,—ওসব কেন বল্‌ছ বাবা? বিয়ে-বাড়ি, লগ্ন হচ্ছে এ সব কী কথা। কী চাও, তাই বরং বলো।

—চাই, এ বিয়ে হবে না।

—বিয়ে হ-বে-না!—অখিলবাবু বিমূঢ় হয়ে আবৃত্তি করেন।

—হ্যাঁ।

—কেন?

—ক্ষেপির মত নেই।

অখিলবাবু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন—এ একটা কথা হলো বাবা। মেয়ের মত নেই বিয়েতে। একটা বিয়ে পেলে কোন্ মেয়ে বেঁচে না যায়। তোমাদের মেম্বর হোক্ না হোক্ আমি কিছু জানি না—আর তোমরা তার মত জানলে?

—আমরাই জানি। আর জানি বলেই তো বলছি—বিয়ে হবে না।

—এ কিন্তু লেহ্য কথা হলো না। মধুসূদন।—অখিলবাবু খুব আপ্যায়ন করে বললেন।

—বেশ, ডাকুন্ ক্ষেপিকে—জিজ্ঞাসা করুন আমাদের সামনে।

—সেকি! ও বিয়ের কনে! ওকে এখন সবাই সাজাচ্ছে—এখনি 'দান' বে। তাকে এখানে ডাকা যায়?

—খুব যায়। না হলে চলুন—আমরাই যাচ্ছি আপনার সঙ্গে—ক্ষেপির খে শুনবেন!

অখিলবাবুর তাতেও আপত্তি:—বিয়ের কনে। বরপক্ষ এসে গেছেন—সময় তোমরা কি সব ছেলেমানুষি করছ। ওদের কানে গেলে কী হবে, াবছো না।

—ভাবতে হবে না। ওদের আমরা সসম্মানে বিদায় করে দোব।

—কী বলছ? অখিলবাবু আবার একটু উষ্মা দেখাতে চাইলেন।

—যা বলছি তা শুনবেন? না, শুনবেন না?—ক্ষেপিকে ডাকুন—আচ্ছা চল্ তো নালু, তোর ছোড়্দিকে বল্‌গে—হেমাদা মধুদা ওরা এসে গিয়েছেন। আসছেন তারা।

অখিলবাবু বাধা দিতে গেলেন—মধু তাকে পথ দেখিয়ে বল্‌লে—চলুন—।

—কোথায়? ওখানে বিয়ের আসর—বাড়ির মধ্যে ক্ষেপিকে ওরা সাজাচ্ছে—অখিলবাবুর যত আপত্তি, কে শোনে?—অবশ্য বাড়ির ভেতরেও ততক্ষণে গোলমাল বেঁধে গিয়েছে। ক্ষেপির মা, ক্ষেপির দিদি—সবাই ভীত, তটস্থ! কি হবে এখন? এমন কাণ্ড, কে জান্‌ত? মেয়ের অমত—এমন কথা শুনেছে কেউ কোনো জন্মে? ক্ষেপির কিন্তু মোটেই তাতে কান নেই। হল্লাটা এগিয়ে আসছে বুঝতেই—সে দাঁড়িয়ে পড়েছে—

—মধুদা, এসে গিয়েছ?

মা-দিদি তার মুখ চেপে ধরতে গেল। সে সরিয়ে দিয়ে বলল—এখানে, আমি এখানে মধুদা। নিজেই আঙিনায় বেরিয়ে এল,আর তৎক্ষণাৎ চম্‌কে গেল—হেমাদা যে! তুমি এলে কি করে?

—সে পরে শুন্‌বি। নে এখন বলতো তুই এ বিয়েতে মত দিয়েছিস্?

—আমি কখখনো না।

মা, দিদি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—ওমা! এখনো সেই কথা! অখিলবাবু ক্ষেপে গেলেন—তবে সাজগোজ করছিলি কেন? বেশ—তো বালাগাছাও পরে নিয়েছিস্ মায়ের।

—মা দিদি পরিয়ে দিলে—আমি কি করব?

—আর তবে? মা-বাবা ঠিক করেছেন বিয়ে; তা সেই বিয়ে করবি না?

—না। বারবারই তো বলেছি—'না'। ওটা কি হাতের বালা, কানের দুল—জোর করে ধরে পরিয়ে দেবে।

—শুনছ হারামজাদির কথা—অখিলবাবু ক্রোধে গর্জে উঠলেন। মা মেয়ের মুখ চেপে ধরলেন,—লজ্জা সরমও নাই, কি বলিস্, কে শুনবে—বিয়ে বাড়ি।

—আর কারও শুনতে হবে না। এবার হেমা সর্দার হয়ে উঠ্‌ল। বলল এখন যা, ওসব বালা, দুল, শাড়ি খুলে ফেরৎ দিয়ে দে মাকে,

দিদিকে। আসুন, অখিলবাবু, এবার বরযাত্রদের বিদায় করে দিতে হবে—ওদের দেরী করানো কেন? ভদ্রলোকেরা সময় থাকতে মানে—মানে যাক্।—

অখিলবাবু বললেন—তুমি কে যে তোমার কথা মতো সব হবে।

—আমি কে তা ভালো করেই জানেন। তাই তো চুপে চুপে বিয়ে দিচ্ছিলেন।

যাক্ আপনার মেয়ের কথামতো যাতে এখন সব হয় তার ব্যবস্থা করুন। আপনি করতে না চান, আমরাই তার ব্যবস্থা করব। চলুন্। মেয়েদের সামনে বোমাবন্দুক ওসব বের করা ঠিক হবে না।

ভয়ে অখিলবাবুর মুখ সাদা হয়ে গেল। দেখতে না দেখতে ক্ষেপির বড়দি ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। মাও পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন চৌকাঠের ওপর। অখিল বাবুকে ফেলে ভেতরে যাবেন, না, ওখানেই থাক্‌বেন ঠিক করতে পারছেন না।

হেমা বল্‌লে, চলুন—

অখিলবাবু অসহায় ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগ্‌লেন, যাব?

গৃহিণী দুয়ারের চৌকাঠ থেকে এক পা এগিয়ে এসে বললেন—পাগল হয়েছ নাকি? তুমি ঘরে এস ওদের কাছে বোমা বন্দুক আছে। যা হয় ওরা করুক্ গে।

সুপরামর্শ, কিন্তু অখিলবাবুর তা গ্রহণ করা সম্ভব হল কই। হেমা ও মধু এগিয়ে বললে, চলুন। আমরা সঙ্গে থাকব। কিছু ভয় নেই। বর আর বরযাত্রদের আপনি একবার বলে দেবেন—'আমার মেয়ের বিয়ে হবে না। আপনারা যান্।' তারপরে যা করবার আমরা করব।

যাব? বলে একবার গৃহিণীর দিকে তাকালেন। তারপর উত্তর না পেয়ে দাঁড়ালেন, শুন্‌লেন। 'তবে কি পরাণটা দেবে নাকি?' এত বড় প্রবল অনুমোদনের পরে অবশ্য আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু দ্বিধা ও ভয় কি যায়? কি বলবেন তিনি বরকর্তা পঞ্চানন বাবুকে? আর এ-দিকে গুরুদাস বাবুও আছেন। তারই অফিসের লোক, পাত্র ঠিক করে দিয়েছেন।

'শহীদের মতো' অখিলবাবু চললেন। সামনে মধু ও হেমা, পিছনে মধুদের হাতুড়ি মার্কা রেড্ গার্ড।

বরকর্তারা ঠিক আঁচ করতে পারছিলেন না—গোলমালটা কিসের। একটু ক্ষুব্ধ তারা, 'কী ব্যাপার মশায়! অখিলবাবু সেই যে একবার প্রথম দেখা দিয়ে গিয়েছেন, আর তার দেখা নেই। কেমন ভদ্রলোক এরা।' দুয়ারের সামনে 'রেড্‌ষ্টার'। লাল তারা পরা ছেলেদের দেখে তারাও একটু চম্‌কে গেল। সঙ্গে দেখল অখিলবাবুকে। আর অমনি শুরু করল তাদের তারস্বরে প্রশ্ন ও ব্যঙ্গ। বেশ ভদ্রলোক মশায় আপনারা। সেই 'চা দিচ্ছি—সরবৎ দিচ্ছি' বলেই কেটে পড়লেন। আর টিকিও দেখবার জো নেই।

পিছন থেকে হেমা অখিলবাবুকে বল্‌লে, বলুন বলে দিন। অখিলবাবুর গলা আট কে যাচ্ছে—বলব?

—হ্যাঁ। দেরী করবেন না।

অখিলবাবু প্রাণপণে চেষ্টা করলেন, হ্যাঁ, এই দেখ্‌ছেন। সব—একটা বড় ইয়ে ঘটেছে—মানে, বিপদ, বিপদ

—কী বিপদ; বলুন না, বলুন।

মধুও বলছে বলুন। বরযাত্রিরা বলছে, বলুন না, বোবা হয়ে গেলেন কেন?

হায়রে অখিলবাবু ভাব্‌লেন, এদের কারও কি দয়া নেই? তিনি চোখে অন্ধকার দেখছেন। আরেকবার প্রাণপণ চেষ্টায় বল্‌লেন

—বিপদ, মানে বিপদ! অভাবণীয় বিপদ

—কী, কী বিপদ, তাই বলুন

—শেষ চেষ্টা—অখিলবাবুর। বিয়ে হতে পারবে না—বলে ফেল্‌লেন।

—বিয়ে হতে পারবে না! সে কি মশায়! কি হলো এর মধ্যে।

অখিলবাবু আর পারলেন না, আমি আর পারছি না, বলে ধপ্‌ করে বসে পড়্‌লেন। মাথায় হাত দিয়ে।

'ধরো, ধরো,' একটা কোলাহল উঠল। সবাই ব্যস্ত, বরকর্তা এগিয়ে এসে বল্‌লেন, সারাদিন বড্ড ষ্ট্রেন হয়েছে, একটু সুস্থ হোন্‌।

কেউ বল্‌লে, না হয় আরেকটা লগ্নও তো আছে রাত্রি তিনটায়।

মধু দেখল ব্যাপারটা ঠিক লাইনে যাচ্ছে না। বললে, আপনারা পথ ছাড়ুন—ওকে ও রকম করবেন না। ওর কথা শুনেছেন তো। এ বিয়ে হবে না। মেয়ের অমত।

একেবারে বজ্রপাত। এক মুহূর্ত সব নিস্তব্ধ, তারপরে আরম্ভ হলো বরযাত্রদের গর্জন।

—মেয়ের অমত্। তাজ্জব কথা। তুমি কে হে মেয়ের অত মত্ অমত্ শোনাচ্ছ।

ওঃ। 'আমি থ্রি পল্টনের ক্যাপটেন।' 'কোন্ পার্টি'? 'বুঝি তোমার সর্দারি কেন?' 'বুঝেছি, বুঝেছি 'পাড়ার দাদা'। কালচারাল রিভো-ল্যুশনারি। রেড-গার্ড (এচ্) মেয়ে লুঠ করবে একি গ্রাম পেয়েছে? মাছ লুঠ না জমি দখল?

মধু বুঝলে ব্যাপারটা এভাবে আর গড়াতে দিলে চলছে না। জোর গলায় বল্লে ওসব থামান! যা বলবার জ্যেঠামশায় বলে দিয়েছেন 'বিয়ে হবে না।' যান এখন কেটে পড়ুন, ভদ্রলোকের মতো বিদায় নিন্, ভদ্রলোকের পাড়ায় গোলমাল করবেন না।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কে বল্লে, তুমি কে চাঁদ! তোমার কথায় বিয়ে ঠিকও হয়নি, বিয়ে বন্ধও হবে না।

দেখুন তবে! একটা হুইসেল পড়ল।

—স্কোয়াড্, পজিশ্যান নাও! তারপর ফার্ষ্ট ওয়ার্নিং ব্ল্যাঙ্ক্।

দেখতে-না-দেখতে দুম্-দাম্ কয়েকটা বোমা ফাটল। হয়তো পিস্তলের শব্দ হল কি? ফাঁকা। কিন্তু হট্টগোল ধোঁয়া চারদিকে। বরসুদ্ধ বরযাত্রিরা ঘর থেকে পালিয়ে পথে গিয়ে দাঁড়াল। বরকর্তা পঞ্চাননবাবু পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগলেন, চলে এসো, চলে এসো গুণ্ডা পড়েছে। গুণ্ডা।

বেশ! এবার তবে বাড়ি যান। রাহা খরচ কাল পরশু আমরা পাঠিয়ে দেব গুরুদাসবাবুর হাতে।

অখিলবাবু উঠে এসেছিলেন। বরকর্তার কাছে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, না, না, আমাকে উদ্ধার করুন উদ্ধার করুন্।

—কে তুমি!

তারপর চিনতে পেরে বরকর্তা জ্বলে উঠলেন। রাস্কেল। এ গুণ্ডা দলের মেয়েকে আমার উপর চালান দিতে চাইছিলে? আচ্ছা আমরাও দেখে নোব।

অবশ্য তিনি আর দেরী করলেন না। বরকে নিয়ে গর্জাতে গর্জাতে চলে গেলেন। বরযাত্রিরা আগেই সরে পড়েছে।

কী যে ঘট্‌ল. ব্যাপারটা তখনো সবাই বুঝে উঠ্‌তে পারছে না। হেমাও না মধুও না। চারদিকে জট্‌লা। মেয়েরাও এবার ঘর থেকে বাইরে এসে পড়েছে।

নালু এসে বললে, মধুদা ছোড়দি তোমাকে হেমাদাকে ডাকছেন।

—ছোড়দি ক্ষেপি। হেমাকে ডেকে বল্‌লে-চল, শুনি ও আবার কী বলে।

হেমা বল্‌লে, তুমি যাও মধুদা। আমি বাড়ি চললাম। তোমাদের দলের মেয়ে, তোমরা এখন সাম্‌লে রেখো। ওরা পুলিশ নিয়ে আসতে পারে। গুণ্ডা নিয়েও আসতে পারে, তবে আজ রাত্তিরে মন্‌সাদের দলকে এখন এখনি খুঁজে পাবে না, তা ছাড়া, ওরা এখন 'যুক্তফ্রন্টে' ঢুকে পড়েছে। আর অন্য পাড়ার হয়ে তারা সহজে রাজী হবে না এগিয়ে আসতে। 'চোলাই'এর কারবাবটা সামলে রাখতে হবে তো।

—ক্ষেপি কেন ডাক্‌ছে, শুনবি না।

একবার দোমনা হলো হেমা। তারপর বলল, তুমি শোন। আমাদের যতটুকু করবার করলাম। দেখলে তো ওর মা-বাবাকে। এরপর ওকে তারা আস্ত রাখবে কি? তোমাদের গার্ডদের মেয়ে তুমি ঠিক করো। এ নিয়ে পার্টিতে-পার্টিতে দাঙ্গা ফ্যাসাদ বাঁধবে না হলে।

হেমা চলে গেল। ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে চলল। ক্ষেপিটার সাহস আছে। বেশি না হোক, কিছু সাহস আছে। বড়া পার্টিওয়ালী।

—আমাদের মাও গার্ডসদের সঙ্গে বনবে না। কিন্তু ও করবে কী? বাপ মা তো আর পড়াবে না। এখনো পড়ায় না। দুপুরে তেল সাবান কোম্পানির নমুনা নিয়ে ঘোরে। রাতে কমার্সের ক্লাস। এ করে কলেজে পড়া চলে, খাওয়া পরা চলে না। এবার যে বাপমা ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তারপর যাবে কোথায়? মেয়েদের তেমন আস্তানা কই? আর গাঁয়ে চলে যেতে পারে, কৃষকদের ঘরে ভাত জুটবে কাস্তে রেডগার্ডদের দলের হলে। সে ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারি। ওদের হাতুড়ি রেডগার্ডের বিপ্লব তো শহুরে বিপ্লব। শহরের কোনো একটা বন্ধু-বন্ধুনী টিচার কর্মচারীর বাড়ি যদি থাকতে পায়। মধুদাও ব্যবস্থা করতে পারে, তার সে সাধ্য আছে। সাধও আছে বোধ হয়।

সদুমাসী দেখেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, সময় হইল ? কোনখানে গেছিলি দিগ্বিজয়ে শুনি।

হেমার ভালো লাগল না। তোমার কাছে তার হিসাব দিতে হবে নাকি!

তা হবে কেন ? তুইতো লাট সাহেব! তবু তো ন-মাস ধইরা তো ঘরে বইসা খাস্!

খেঁাটা সত্য, তাই গায়ে লাগে! বেশ করছি! বলে হেমা তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে গেল!

পাড়ায় টিউব ওয়েলের জলে স্নান করে ঠাণ্ডা হয়ে এল! এবং দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল!

সদুমাসী ডাকলেন, ওঃ! খাইতে হইব না ?

—আমি খেয়ে এসেছি!

কথাটা মিথ্যা। কিন্তু হেমা মায়ের কথায় নড়ল না। সে এখন ঘুমাতে চায়। এত গোলমাল আর ভালো লাগে না। সদুমাসী অনেক বার ডাকলেন। তার, বাঙাল গলাও নরম হয়ে এল। কিছু হল না।

ঘুমটা ভালোই চেপে ধরেছিল। মধ্যরাতে কিন্তু তা ভেঙে গেল। আবার—হেমা, হেমা, হেমা—

আবার কারা ? মধুদারই তো গলা। হেমা বারান্দার ঝাঁপ খুলে বের হয়—আর পিছনেই দেখে মাও বেরিয়ে আস্ছেন ঘরের ভেতর থেকে।

মধু বলে, —একেবারে সময় নেই। ওঠ, এক্ষুনি।

—কোথায় ?

—ওখানে—পেয়ারাবাগান

—পেয়ারাবাগান ? এক মুহূর্ত মনে করতে চেষ্টা করে হেমা—তারপর জিজ্ঞাসা করে, আবার কি হল ?

—যেতে-যেতে শুন্বি।

—না, মধুদা। আমি আর পারব না। জানো—কিছু খাইনি রাত্রিতে। এসেই অমনি শুয়ে পড়েছি।

—চল্ খাইয়ে দোব। কিন্তু তুই না গেলে নয়।—

—অখিল জ্যেঠা-মশায় বেঁকে বসে আছেন। জ্যেঠাইমাও 'খুব তো বিয়ে পণ্ড করলে। এখন এ মেয়ের বিয়ে হবে কোথায়?' সে কী কাণ্ড —'তুমি বিয়ে করো, তুমি বিয়ে করো।' তুই তো বুঝিস্—কী অসম্ভব কথা। আমি বলি 'না—সে হয় না।' 'হয় না, তবে এবিয়ে ভাঙালে কেন? বিয়ে করবে না তবে মেয়েটাকে দিয়ে খেলাচ্ছ কেন?' তোমাদের তো অমনি সব কাজ—দিলেই পারতাম পুলিশে ধরিয়ে—'ওঃ। —মধু বুঝিয়ে বলল—তোকে তাই বলা হয়নি। তুই ও গেলি—অমনি থানা থেকে দারোগা জন ছয় সিপাহী নিয়ে হাজির।—'শান্তি ভঙ্গ', 'বিবাহ পণ্ড', 'আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা'—এমনি কত কী সব এজাহার দিয়েছে সেই বরকর্তা। আসামী হেমেন্দ্রলাল চৌধুরী, মধুসূদন চক্রবর্তী ইত্যাদি।

হেমা দাঁড়িয়ে উঠল—তারপর?

—তারপর আবার কি? বললাম: হেমেন্দ্রলাল চৌধুরী বলে কেউ নেই মশায় এ পাড়ায়। দেখুন জিজ্ঞাসা করে। আর মধুসূদন চক্রবর্তী —সেতো জানেনই আমি।—আমি কমিউনিস্ট থার্টি থ্রি পল্টনের ক্যাপটেন। কিছু হয়, বলে দিলাম 'কমিউনিস্ট'। কিছু করবার আগে আপনাদের হেড কোয়াটার্সে ফোন করুন,—আমাদের কালচারাল রিভোল্যুশনারি মিনিষ্টারের কাছে খবর করতে, না বুঝে সুঝে ওসব উটকো খবরে আমাদের ঘাটাবেন না।' দারোগা ভাবলে, তবু মিছিমিছি কেন গোলমালে যাব? - আমাদেরও তো জানে? বল্‌লে, আজকে তো লিখে দিই 'নট্ ফাউণ্ড'। কাল আপনাকে কোথায় পাব? একটা স্টেট্‌মেণ্ট্ চাই। আপনারও চাই। আর যা বললেন, তা হলে কালই ওই মিস্ ছবিরাণী ভৌমিকেরও একটা ষ্টেট্‌মেণ্ট চাই। না, না, অন্য কিছু নয়। শুধু মুখে ওর বলতে হবে—এ বিয়েতে ওর মত নেই। আর উনি মাইনর নন।' দারোগাকে বিদায় দিলাম। আরে, দূর তুই ভাবছিস্ দারোগা বুঝি জানে না আমরা ওসব পার্টির নই। খুব জানে। তবে আমাদেরও ঘাটাতে চাইল না। —কিন্তু এদিকে মুস্কিল। অখিল জ্যেঠামশাইকে তো ছাড়াতে পারি না। কিছুতেই আমাকে ছাড়বেন না। হাত-পা ধরেন—বলেন, তিনটার লগ্নটাতে হয়ে যাক্। রাজী হও।'

—তাই বুঝি। বরযাত্র যেতে হবে চলো—হেমা সচেষ্ট হেসে বলে।

মধু এক মুহূর্ত নির্বাক তাকিয়ে থাকে। তারপরে তড়াক করে দাঁড়িয়ে

ওঠে—স্টুপিড। তুই আমাকে কি ভেবেছিস্? বেইমান, না, সোয়াইন্?

—একটাও না। তুমি তোমাদের গুয়েভারা পল্টনের ক্যাপটেন। ছোটকাল থেকে ক্ষেপিদের সকলকার মধুদা। ইউনিয়নের সেক্রেটারি। চাকরিও করো। কারখানা ছোট। কিন্তু তুমি ছোট-খাটো কর্তা ওভারটাইম না ধরলেও পাঁচশ টাকা তোমার মাস মাইনে।

সে তোর থেকে আমি বেশি জানি আমার কি কত মাইনে তোর তা বোঝাতে হবে না। আমাকে যা বললি, বললি। তুই এমন বেইমান ভাবলি কি করে ক্ষেপিকে? চোখের সামনে দেখে এলি—বাপমায়ের মুখের ওপর বল্লে—'এ বিয়েতে আমার মত নেই।' কেন তা বলেছে? শালা, আমার থেকে তুই বেশি জানিস্। দুবছর ধরে প্রেম করেছিস; কথা হয়ে রয়েছে;—ভাবছিস্ আমি সব জানি না? ও যেই পাশ করলে, তুই হলি অম্‌নি ছাঁটাই। তা বলে কথা ফিরিয়ে দিতে হবে?

—কে বল্লে কথা হয়েছে? কোনো কথা হয় নি।

—হয়েছে। তুই বলেছিস্। ক্ষেপি বলেছে।

—ক্ষেপি বলেছে? কবে বল্লে সে?

—কবে নয়?—এই এক ঘণ্টা আগেও বলেছে।

—এক ঘণ্টা আগে—কেন?

—কেন, আবার কেন? তোর বদ্‌মায়েসিতো। তোর জন্যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে রইল। আর তুই একটা কথা না বলে চলে এলি।

—সে তো চুকে গিয়েছে। ওর মতের বিরুদ্ধে ওর বিয়ে হলো না—ব্যস্ আমি আবার কে—তারপর? তোমাদের পার্টির মেয়ে—তোমরা জানো।

—বটে। তুই আবার কে? এই রাতে পুলিশ গেল, এক ঘণ্টা আমাকে নিয়ে ওর মা বাবার জবরদস্তি। আমি উপায় না দেখে বল্লাম, 'বেশ ক্ষেপিকে ডাকুন্। আমার সাম্‌নে বলুক্—আমাকে বিয়ে করতে ওর অমত হবে না।' মেয়েটার কী লাঞ্ছনা ভাবতো। 'তবু শি. ইজ এ ব্রেভ গার্ল'।' বাবা চান, মা বলে ঠিক কথা বল্—মাথা নেড়ে ও জানায়, 'না।' তবু বাবা মা শুনবেন না। 'শেষে মুখ ফুটেই বললে, 'না!'—আমি তো মুক্তি পেলাম। কিন্তু ওর গতি কি হবে? বাপ-মা তো ওকে আস্ত রাখবেন না। বুদ্ধি মাথায় এসে গেল। ঠিক। আজ রাতেই একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাক্। বল্লাম, 'ছাখ ক্ষেপি, ওরা তোকে আজ বিয়ে না

দিয়ে ছাড়বে না। ওদের নাকি জাত যাবে। তা তুই যদি চাস্—তা হলে আমি একটা আস্ত পাত্র ধরে আনি ? ওর তো মুখ শুকিয়ে গেল—চোখে জল আসে-আসে। বল্‌লাম—ওই, মাও-মার্কা 'কাস্তে ফৌজ।' বললাম, 'তবে ছেলেটা ভালো।' ক্ষেপিটা 'না' বলতে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি নামটা পাড়লাম—'হেমা'। মেয়েটা একটুক্ষণ হাঁ করে রইল। তারপরে হেসে ফেল্‌ল—'যান্, আপনি কী যে বলেন।'

তারপরে একেবারে মুখ খুলে স্পষ্ট করেই বলতে হল—হাঁ, হেমেন্দ্রলাল চৌধুরী—বিয়ে করতে তার মত আছে—'হাঁ।'—কিন্তু?

কিন্তু কি ? পার্টিতে পার্টিতে আবার বাঁধবে না ?

—'না', আমরা এই বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট করে জয়েন্টএ্যাক্‌শন্ আরও দৃঢ় করে ফেলবো।

হেমা উঠে বস্‌ল—এ হয় না। আমার ইন্‌কাম্ নেই ; ঘর নেই, দুয়ার নেই—

মধু হেসে বল্‌লে—সে তো আরও ভালো কথা—আগেইতো ওরা কমিউনিস্টরা-ব্যবস্থা পথ দেখিয়ে দিয়েছে—দু বাড়িতে থাক্‌বি দু জনায়। ক্ষেপি বারান্দায়—আর তুই—ওই গাড়ী বারান্দায়।

হেমা না হেসে পারল না—'তোমার ঠাট্টা রাখো। জানো তো দাদাকে—রেলওয়েতে যাদের সাবধান করে তাও জানো—ওদের কাজ ওয়াগন ব্রেকিং। সে পয়সায় আমাদের সংসার এখন চলে। আর চলে দাদার যত খেয়াল। বৌদি নেই। দুটো বাচ্চা দেখেন মা। আমার বিয়ে করা ? বেকারের বিয়ে—ওযে কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়া।

মধু দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। হাত ধরে বল্‌লে, নে হয়েছে। এ লেক্‌চার কাল শুন্‌ব। বিয়ে করে তো আয় আগে। আমাদের একটা যুক্তফ্রন্ট হোক্। তারপরে দেখব কী করা যায়।

পারতে হবে।

তোমায় হুকুমে ?

আমার হুকুম—না হোক্, ক্ষেপির হুকুম! চল এখন!

মধু হেমাকে টেনে নিয়ে চল্‌ল। আর দুটি ছেলেকে পথে নিলে। এখানে আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন সত্যমাসী! বেরিয়ে এলেন!

কিছুতে না ! কিছুতে না। ওই বিয়াভাঙ্গা মাইয়ারে আমার ঘরে উঠ্‌তিও দিমু না। পিছার বাড়ি। পিছার বাড়ি।

ভোর হলে খবরটা রটে যেতে লাগল। কেমন করে। কিছু বোঝা গেল না। সত্য না মিথ্যা। কেউ বল্‌লে 'সত্নমাসীর' কথা তো। তবে সত্নমাসী সত্যই একটা ঝাঁটা টাঙিয়ে দিয়েছে দুয়ারের সামনে।

বিকালের দিকে একটা ট্যাক্সি থামল আর তাতে বরকনে হেমেন্দ্র লাল আর ছবিরাণী।

আগেই বোধ হয় এ পাড়ার মাও গার্ডস্‌রা তৈরী হয়েছিল। এখন হঠাৎ তাই শাঁখ বাজল। কে একজন মাসীমা বধূবরণ করতেও এগিয়ে এলেন।

টের বোধ হয় সত্নমাসীও পেয়েছিলেন। তিনি ঘর থেকে হুঙ্কার দিয়ে বেরুলেন। হাতে দেখাতে লাগলেন ঝাঁটাটা।

কিন্তু গোলমালে ঘুম ভেঙে গেছল রমেন চৌধুরীর। রাত জেগে এখন ঘুমুচ্ছে উঠে বাইরে এল। কি হচ্ছে মা ?

সত্নমাসী পাড়া ফাটিয়ে চীৎকার করছেন। 'নিজের নাই জাগা কুত্তী আনে বাঘা ?'

মধু এসে রমাদাকে কী বল্‌ল। রমাদা বল্‌লেন ওঃ। তারপর সামনে পথে দেখলেন ট্যাক্সি থেকে নেমে একটি মধুর দর্শন মেয়ে ঈষৎ নম্র কৌতুক দৃষ্টিতে রমেনের মাকে দেখছে।

হেমার বউ ? রমাদা এগিয়ে গেল।

এসো।

একটা একশ টাকার নোট বের করে রমেন মায়ের হাতে দিয়ে বললেন, থামো। যাও পাড়ার লোকদের মিষ্টি মুখ করাও।

একটা উৎসব পড়ে গেল, গানে বাজনায় ভাঙা রেকর্ডের কাংস্য কণ্ঠে। ঝাঁটা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে কে। দুটো ফ্লাগ হাতুড়ের ও কাস্তের। আসরও জমে উঠল দেখতে না দেখতে। কালচারাল রিভোল্যুশনে এ্যাকশন্‌। মধু ও তার সাকরেদদের এবার হেমার সাকরেদরা আপ্যায়ন করতে লেগে গেছে। এবারের মত ? ওদের. যুক্তফ্রন্ট এখন। অবশ্য পার্লামেন্টের যুক্তফ্রন্ট নয়, রিভোল্যুশনারি যুক্তফ্রন্ট্‌, আর, ইউ, এফ্‌। আসর জমজমাট। রাঙা উৎফুল্ল আর মল্ল বিগলিত ক্ষেপিকে প্রায় অচেনার

মতনই দেখা যায়। ওর মাথার ঘোমটায় হাতুড়ি ও কাস্তে এক সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। হেমার মুখেও হাসি একটু লজ্জার ভাবও। বুকে কাস্তের ওপর হাতুড়ি জুড়ে দেওয়া।

একজন বর্ষিয়সী এগিয়ে গিয়ে বউ-এর মুখ দেখে বললেন,—নাঃ সত্নদির বউভাগ্য আছে। ঠিক কেমন লক্ষ্মীর লাখান বউ হইছে। কি কও গো, সত্নদি ?

সত্নদিরও জিহ্বাটায় যেন ধার কমে যাচ্ছে। উত্তর দেবার সময় হলো না। কে অখিলবাবুকে নিয়ে এসেছেন। সত্নমাসী সহাস্যে সেদিকেই এগিয়ে গেলেন।

—আহেন বিয়াই মশায়, আহেন বিয়ইন্। দেখেন মানাইছে কেমন ? মধু ভাবে—আশ্চর্য, বাঙাল ভাষায়ও বৈবাহিক আপ্যায়ন করলে ভালোই শোনায়। কে জানে ভালোবাসার কথাও বোধ হয় এমনই শোনাবে।

—হ্যাঁ, মানিয়েছে। তবে—কথাটা শেষ করলেন না অখিলবাবু। বাড়ি-ঘরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মধু বুঝল। বললে : ওসব ভাববেন না। বলেছিতো কালই আপনাকে —"নগা নন্দীর লীভ্ ভ্যাকেন্সিতে দু'মাস লোক নিতে দিইনি। কালই হেমাকে সেখানে ঢুকিয়ে দোব। একবার তো ঢুকুক। দেখি কে ছাড়ায় তারপর।"

বেশি না হলেও একটু রাত হলো আসর ভাঙতে। 'কালচারাল রিভো-ল্যুশন জিন্দাবাদ !' মধুর বন্ধুরা বিদায় নিলে।

'কাস্তে-হাতুড়ি বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ্।" হেমার বন্ধুরাও জানালে।

'জিন্দাবাদ !' যেতে-যেতে মধু মুখ ফিরিয়ে সাড়া দিল। চোখের এক ফোঁটা জল ফেলল—'জিন্দাবাদ'।

সুতোর টানে

অমল দাশগুপ্ত

বিপত্তারণ সাধুখাঁ রোজকার মতো কমোডে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। সকালবেলা ঘণ্টাদুয়েক সময় তাঁকে এই ঘরটিতে কাটাতে হয়। বিপত্তারণ সাধুখাঁকে যাঁরা চেনেন তাঁদের পক্ষে অনুমান করা শক্ত নয় যে এতখানি সময় গভীর কোনো চিন্তা করে কাটিয়ে দেওয়াটাও তাঁর পক্ষে সময়ের একটা চূড়ান্ত অপব্যবহার হত। এমনিতেই মোটামুটি কর্মব্যস্ত একজন মানুষ দু-ঘণ্টায় যতটুকু কাজ করে, তিনি করেন তার অন্তত দশগুণ। অর্থাৎ তাঁর একদিনের বাঁচা দশদিনের বাঁচার সমান, বা দশজনের। কমোডে বসে থাকার দুটি ঘণ্টাতেও তাই তিনি কাজ করে থাকেন অন্তত বিশটি ঘণ্টার বা বিশজন পুরুষের। ফলে আয়োজনও করতে হয়েছে বেশ বড় রকমেরই। হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে একটি টেলিফোন, যার অন্য প্রান্তে তাঁর একান্ত-সচিব হাতে পেনসিল ও সামনে খোলা খাতা নিয়ে তটস্থ হয়ে অপেক্ষমান। পায়ায় চাকা লাগানো একটি সাইজমাফিক টেবিল, কাগজ পেনসিল কলম ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সমেত। তিন তাকের একটি র‍্যাক, যার একটিতে দিনের সংবাদপত্র, অন্য দুটিতে সাময়িক পত্রিকা ও কয়েকটি অভিধান। কমোডে বসার পরে মুখের ও চোখের অবস্থান যেখানে, তার বাঁয়ে খানিকটা পিছন ঘেঁষে একটা জোরাল বাতি, ডাইনে খানিকটা সামনে ঘেঁষে একটা মাইক্রোফোন—অফ অন সুইচ সমন্বিত।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বিপত্তারণ সাধুখাঁ আজ যেন একটু অস্থির। কমোডের ওপরেই যতটুকু সম্ভব নড়াচড়া করছেন। মনে হয় প্রত্যেকটি খবরের কাগজেই এমন একটা খবর চোখে পড়ছে যাতে তাঁর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হচ্ছে।

টেলিফোন তুললেন।

'আজকের কাগজ তোমার হাত হয়ে এসেছে তো?'

একান্ত-সচিবের জবাব: 'হ্যাঁ স্যার।'

'আজকের কাগজে সবচেয়ে জরুরি খবর কোনটি, তোমার মতে?'

'আজ্ঞে স্যার, দাগ দিয়েছি তো!'

বিপত্তারণ সাধুখাঁ বললেন, 'চীনের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন তৈরি করেছেন, এ-খবরটার গুরুত্ব কি এতই বেশি?'

একান্ত সচিব চুপ।

'খবরের কাগজ পড়তে হলেও ট্রেনিং থাকা দরকার—বুঝলে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আজকের কাগজে অন্তত পাঁচটি হত্যাকাণ্ডের খবর আছে—তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'সিনথেটিক ইনসুলিন তৈরি হয়েছে ভালো কথা। হবেই, হতই। এর পরে সিনথেটিক প্রোটিন, তারপরে সিনথেটিক লাইফ। তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কিন্তু ধরো, শুধু সিনথেটিক ইনসুলিন নয়, সিনথেটিক লাইফ তৈরির খবরই আজকের কাগজে পাওয়া যাচ্ছে, এইসঙ্গে এই পাঁচটি হত্যাকাণ্ডের খবর—তাহলে কোন খবরটির গুরুত্ব বেশি ধরতে হবে?'

'....'

'মানুষ মানুষকে খুন করছে, এর চেয়ে নোংরা দৃশ্য এই বিশ্বে আর কিছু হতে পারে না! এই নোংরা আগে সাফ করা দরকার—তাই না? তবেই তো বড়ো কাজ হবার মতো পরিবেশটি তৈরি হবে।' বলতে বলতে হাতে কলমে প্রমাণ উপস্থিত করবার জন্যেই হয়তো পিছনে হাত বাড়িয়ে হাতল ঘুরিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড তোড়ে জল বেরিয়ে এসে এতক্ষণের সমস্ত নোংরা সাফ করে নিয়ে গেল।

'হ্যাঁ স্যার।'

'আজ এই হবে আমার দিনের বাণীর বিষয়।'

খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে পায়ায় চাকা লাগানো টেবিলটা সামনে টেনে আনলেন। একটি স্ট্যাণ্ডে অনেকগুলো কলম সাজানো। প্রথমে তুললেন কালো। একটি হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকলেন। তারপরে হলদে। ফুসফুসের ছবি। তারপরে সবুজ। মাংসপেশীর। তারপরে নীল। মগজ। তারপরে বেগুনি। রক্তবাহী শিরা-উপশিরা। তারপরে লাল। তারপরে লাল। তারপরে লাল। রক্ত কই, রক্ত? আরো জোরে চাপ দিলেন। না, সাদা কাগজ তেমনি সাদা। রক্তের আভাসটুকুও নেই।

মাইকের সুইচ অন করে দিলেন।

'রক্ত কোথায়, রক্ত? মানুষের হৃৎপিণ্ড তাই কালো। যদিও হলুদ তাজা ফুসফুস, সবুজ তরুণ মাংসপেশী, নীল সম্ভাবনাপূর্ণ মগজ, বেগুনি সমর্থ শিরা-উপশিরা, কিন্তু রক্ত কোথায়—রক্ত? মানুষের হৃৎপিণ্ড তাই কালো। তাই কালো। তাই কালো। মানুষ তাই মানুষকে খুন করছে। কোথায় কে আছ, এগিয়ে এসো। লাল রক্ত তৈরি করার উৎসব আজ আমাদের।' মাইকের সুইচ অফ করে টেলিফোন তুললেন, 'শেষ লাইনটা ইরেজ করো।'

'আচ্ছা স্যার।'

জলের মধ্যে টুপ করে শব্দ হতেই সম্ভবত মনে পড়ে গেল, আবার বললেন, 'বলাকার সাঁইত্রিশ নম্বর কবিতাটি বার করে রেখো, কোটেশন চাই।'

'আচ্ছা স্যার'

'ইরেজ করেছ?'

'এই করছি।'

একটুখানি সময় দিলেন, তারপরে বললেন, 'মানুষের শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেকগুলো। দুটো পা, দুটো হাত, দুটো চোখ, দুটো কান ইত্যাদি। প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েই আলাদা আলাদা কাজ করা চলে। তাই বলে কি চোখ দিয়ে যখন দেখব কান দিয়ে শুনব না? মুখ দিয়ে খাব না? হাত দিয়ে তাক থেকে বই নামাবে না? যে-মানুষ একসঙ্গে যত বেশি কাজ করতে পারে সে-মানুষের জীবন ততো সার্থক। আমাকে দেখেও তো খানিকটা শিখতে পারো! আমি কি কখনো একটা কাজ নিয়ে থাকি? এই তো এখনই ছাখো, কতগুলো কাজ একসঙ্গে করছি।'

'হ্যাঁ স্যার।' সঙ্গে সঙ্গে আবার, 'ইরেজ হয়েছে স্যার।'

মাইকের সুইচ অন করলেন, 'লাল রক্ত তৈরি করার উপাসনা আজ আমাদের।' সুইস অফ করলেন, 'কবিতাটা বার করেছ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'শোনাও।'

লাউডস্পীকারে বিপত্তারণ সাধুখাঁর গলাতেই খুব মৃদু আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল: দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন ইত্যাদি ইত্যাদি। আবৃত্তি শুনতে শুনতে আরো দু'বার হাতল ঘোরালেন, দুটি সায়েন্স জার্নাল পড়া শেষ করলেন, তারপর টেলিফোন তুলে বললেন,

'দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, ওখান থেকে শুরু করো আর তোরে করিয়াছি জয়, ওখানে শেষ করো।'

তোরে করিয়াছি জয়, বলতে বলতে দম বন্ধ করে থেকে আর পেটের মাংসপেশীর সাহায্যে প্রচণ্ড একটা চাপ সৃষ্টি করে সত্যি সত্যিই জয় করলেন।

'হয়েছে স্যার।'

'পুরোটা একবার শোনাও তো।'

লাউডস্পীকারে আবার মৃদু গলার আওয়াজ: রক্ত কোথায়, রক্ত? ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্থির হয়ে বসে শুনলেন, তারপরে বললেন, 'ঠিক আছে, প্রচার করে দাও, আর ঘোষণা করো সভাগৃহে আমি সবাইকে ডেকেছি, ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে। সকাল আটটার সময়ে।'

বিপত্তারণ সাধুখাঁকে এখনো যাঁরা চিনতে পারেন নি তাঁদের অবগতির জন্যে দু-একটি কথা: বিপত্তারণ সাধুখাঁ বিজ্ঞানী গবেষক শিক্ষাগুরু ইত্যাদি ইত্যাদি সবই ঠিক কথা, বিপত্তারণ সাধুখাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হলে আস্ত একটি মহাভারতই হয়তো লিখতে হয়, তবুও বলা দরকার বিপত্তারণ সাধুখাঁ সব ছাড়িয়েও আরো কিছু, আমাদের এই গোরুর গাড়ির দেশে তিনি এক রকেট, আমাদের এই কড়া-গণ্ডার দেশে তিনি এক ইলেকট্রনিক কম্পিউটর, আমাদের এই অবতারের দেশে তিনি প্রকাণ্ড একটা মিসফিট। তবুও এই দেশটাকেই উদ্ধার করতে তিনি প্রাণপণে প্রয়াসী। কি ভাবে? তিনি চান এমন কতকগুলো ব্যক্তি-কেন্দ্রিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে যা দেশের মানুষকে অনুরূপ ভাবে ভাবিত করে তুলবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই দিনের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা। ছাত্রাবাসের ঘরে ঘরে আছে লাউডস্পীকার। ঠিক সূর্যোদয়ের মুহূর্তে প্রতিদিন বিপত্তারণ সাধুখাঁর তৎ-তৎ দিনের বাণী প্রচারিত হয়ে থাকে। এই বাণী শুনতে শুনতে ছাত্র ও শিক্ষকদের দিন শুরু।

আজ কিন্তু শুধু এই বাণীতেই শেষ নয়। তদুপরি সভাগৃহে জমায়েত। গুরুতর রকমের কিছু না ঘটলে এমনটি এই শিক্ষায়তনে সাধারণত ঘটে না। খানিকটা উৎকণ্ঠা-নিয়েই ছাত্র ও শিক্ষকরা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হল।

আটটা বাজতে টেপ-রেকর্ডারে আবার সেই দিনের বাণী: রক্ত কোথায়, রক্ত ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

পর্দা উঠতে আবছা মঞ্চ। দুটি মনুষ্যমূর্তি প্রচণ্ড লড়াই করছে। কিন্তু কেউ কাউকে কায়দা করতে পারছে না, কেননা কেউ কারও চেয়ে কম নয়। তবে লড়াইয়েও ক্লান্তি নেই, দেখে মনে হয় বাকি জীবনটা এমনি বিরামহীন লড়াই চালিয়ে যেতে পারে।

এমন সময়ে মঞ্চে তৃতীয় আরেকটি মনুষ্যমূর্তির আবির্ভাব। স্থির নিস্পন্দ। আবছা আলোয় কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, তবে সম্ভবত আরো একটি পর্দা উঠিয়ে এই তৃতীয় মূর্তিটির আবির্ভাব ঘটানো হল।

আলো বাড়ছে। লড়াই তেমনি একনাগাড়ে। আরো আলো। এবারে চিনতে ও বুঝতে পারা গেল। লড়াই করছে স্নতোয় বাঁধা দুটো পুতুল, স্নতোর টানে। তৃতীয় মূর্তিটি স্বয়ং বিপত্তারণ সাধুখাঁ। হাতে চকচকে একটা ছুরি। আলো বাড়তে বাড়তে তীব্র প্রখর হবার পরে যখন কোথাও আর কোনো অস্পষ্টতা নেই, বিপত্তারণ সাধুখাঁ ছুরি দিয়ে স্নতোটা কেটে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে লড়াই থেমে গেল। দুই মূর্তিই সঙ্গে সঙ্গে চিৎপটাং।

ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, হাতদুটো আলোর সামনে মেলে ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন, মনে হল দেখে নিচ্ছেন কোথাও রক্ত লেগে আছে কিনা। তারপরে হাতে হাত ঝেড়ে যেন পুরো দৃশ্যটাকে বাতিল করে দিলেন আর এসে দাঁড়ালেন মাইকের সামনে।

প্রকাণ্ড সভাগৃহ রুদ্ধশ্বাস, কেননা শ্বাসপ্রশ্বাসের যেটুকু শব্দ তাও এখন আর শোনা যাচ্ছে না। স্নতো কেটে দেওয়া পুতুলের মতোই মানুষগুলো নিস্পন্দ।

বিপত্তারণ সাধুখাঁ বলতে লাগলেন, 'আজ আমি তোমাদের কাছে একটা সঙ্কট ও সমস্যার কথা উপস্থিত করতে চাই। তোমরা যাতে আমার কথা ভালোভাবে বুঝতে পারো তাই তোমাদের এই দৃশ্যটা দেখিয়ে রাখলাম। আমি নিজে বড়ো বিচলিত বোধ করছি। তোমরা জানো, সকালবেলা দু-ঘণ্টা সময় নিজেকে আমি কোনো একটি গভীর চিন্তায় ব্যাপৃত রাখি। আজ আমার চিন্তা পর্যন্ত বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আজকের কাগজ তোমরা

দেখেছ নিশ্চয়ই। তোমাদের কি মনে হয়নি পুরো কাগজটা যেন রক্তমাখা? শুধু খুন আর হত্যার খবর? আজকের কাগজে পাঁচটি খবর আছে, লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে আরো হবে, আরো অনেক, হত্যাকাণ্ড দিনে দিনে বাড়তেই থাকবে। আমরা বিজ্ঞানীরা দেশের সঙ্কটের সময়ে চিরকালই গবেষণাগার ছেড়ে বাইরে এসেছি। আমাদের ক্ষমতা অনেক। আজকের এই সঙ্কটের দিনেও আমাদের চুপ করে থাকার অধিকার নেই। কী আমরা করতে পারি? যে-দৃশ্যটা তোমাদের দেখালাম তার মধ্যে সে-কথাটাই বোঝাতে চেয়েছি। মানুষদুটো লড়াই করছিল সুতোর টানে। তেমনি দেশের মানুষগুলো হানাহানি কাটাকাটি করছে পার্টির টানে। তারা ভুলে গিয়েছে স্বতন্ত্রভাবেই তারা মানুষ, তাদের শরীরে একই রক্ত আর সেই রক্তের রঙ লাল। সুতোটা কেটে দিতেই লড়াই থেমে গেল। তেমনি হানাহানি কাটাকাটি বন্ধ করবার জন্যেও সুতো কাটার প্রয়োজন আছে। মানুষের শরীরে আনতে হবে রক্তের প্রবাহ। মানুষকে জানতে দিতে হবে সব রক্তের রঙই লাল।'

থামলেন। টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে তাঁর এই ভাষণটি আরো দু-বার শোনানো হল। তারপরে আবার বলতে লাগলেন, 'দুটি কাজ করার আছে। এক, উপলব্ধি করা যে আমাদের শরীরে রক্ত প্রবহমান আর মানব নির্বিশেষে রক্তের রঙ লাল। দুই, পার্টির সূত্র ছিন্ন করা, যে-সূত্র মানুষকে করে তোলে ক্রীড়নক। প্রথম কাজটি আজ এই মুহূর্তেই শুরু করা যেতে পারে। আমরা সবাই মিলে আজ এখানে রক্তদান করব! সেই রক্ত জমা পড়বে ব্লাড ব্যাঙ্কে। আমরা দেখব আমাদের সবার রক্তই লাল। রক্তের বিনিময়ে আমাদের হাতে অর্থও আসবে। তখন শুরু করব সূত্র ছিন্ন করার কাজটি।'

হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। সভাগৃহে মিলিত স্বরে ঘোষণা শোনা গেল: 'আমরা প্রস্তুত!'

বিপত্তারণ সাধুখাঁ তখন অভয়দানের ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি তোমাদের কখনোই বলব না, শুধুহাতে ঝাঁপিয়ে পড়ো। হাতিয়ার অবশ্যই আমাদের চাই। দরকার হলে ইলেকট্রনিক কম্পিউটর পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করব। আর আমার তো মনে হয়, আমাদের তৎপরতার সামান্য দু-একটা প্রমাণ উপস্থিত করতে পারলেই অজস্র হাতিয়ার গিফ্‌ট হিসেবেই আমাদের হাতে

পৌঁছবে। আদর্শে ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী হও; আমার ওপরে আস্থা রাখো, সফল আমরা হবই, সাফল্যের পুরস্কার আমরা পাবই। তবে এসো, কাজে লাগি। লাল রক্ত তৈরি করার উৎসব আজ আমাদের।' একটু থেমে আবার বললেন, 'লাল রক্ত তৈরি করার উপাসনা আজ আমাদের।'

সভাগৃহে আলোর অভাব ছিল না। তবুও কেউ দেখতে পেল না বিপত্তারণ সাধুখাঁরও হাত-পা নড়ছে সুতোর টানে। চোখে দেখা যায় না এমন সুতো। বিপত্তারণ সাধুখাঁ সম্ভবত নিজেও এই সুতোর টানের কথা জানেন না। তবে পুরস্কার তিনি অবশ্যই পাবেন। হয়তো এমনকি ইলেকট্রনিক কম্পিউটর পর্যন্ত। হয়তো এমনকি—

একটি তুচ্ছ ঘটনার পটভূমি

মিহির সেন

মাথার ওপর ফ্যানটা বন্ধ হওয়ায় এতক্ষণে খেয়াল হয়, দু-কাপ চায়ের ওপর ঘণ্টাখানেক আড্ডা মেরেছে ওরা। শমীক সঙ্কুচিত। সেটা লুকোতেই বোধহয় গলায় বিরক্তি মেশানো গাম্ভীর্য আনে, আর দু-কাপ চা দেখি।

অজয় উঠে দাঁড়ায়, দূর। চল তার চেয়ে একটা সিনেমা দেখা যাক। বহুদিন সিনেমা দেখি না।

শমীক বেরিয়ে আসতে আসতে বলে কেন, টিউশনির ধাক্কায় সময় পাস না বুঝি?

—ভালোও লাগে না। ছবিগুলোই বাজে হয়, না, আমাদের মনটা পাল্টে গেছে, বুঝি না! যতক্ষণ বসে থাকি, যেন টর্চার।

শমীক হাসে, তাহলে আর সেধে শহীদ হতে যাচ্ছিস কেন? অজয় হাঁটতে হাঁটতেই শমীকের পাশ-পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে একটা বিড়ি ধরায়। ধুঁয়ো ছেড়ে বলে, তোর সঙ্গে এই এক যুগ পর এমন আচমকা দেখা হওয়াটা সেলিব্রেট করার জন্য।

তারপর একটু হেসে শমীকের চোখে চোখ রেখে স্বর নামিয়ে বলে, বহুদিন পর একটা জেনুইন আনন্দ ফিল্ করছি, জানিস? আবেগগুলো একেবারে মরচে পড়ে যায় নি মনে হচ্ছে। সেই পুরোনো দিনের মতো বেনিয়মের উলটো-পালটা কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

'সেই পুরোনো দিন' শব্দ কটা শমীককে একটা আলতো বিষণ্ণতায় আনে। বহুদিন পর অজয়ের সান্নিধ্য ওকে সেই পুরানো দিনের অনুভূতিতে নিয়ে গিয়েছিল। পায়ে পায়ে যন্ত্রণাদায়ক পাথর মাড়িয়ে চলা বর্তমান থেকে কখন যে সেই সহজ আন্তরিক দিনগুলোয় চলে গিয়েছিল খেয়াল ছিল না। শমীকের উচ্চারিত শব্দ কটা ঠিক এই মুহূর্তে তাই প্রত্যাশিত ছিল না যেন। ভালোবাসার কোনো আবেগঘন চরম শীর্ষ-মুহূর্তে এ যেন হঠাৎ মুখ ফুটে বলে ওঠা, জানো, আমরা না প্রেম করছি!

—আমাদের অনেক বয়স হয়ে গেল, না রে ?

শমীকও কি যেন ভাবছিল। এবার ফিরে অজয়ের চোখে এই আচমকা প্রশ্নটার হেতু খোঁজে। তারপর হেসে বলে, সব সময় খেয়াল থাকে না। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর দিকে যখন মন দিয়ে দেখবার সময় পাই, তখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেটা।

হঠাৎ মনে পড়ায় উৎসুক প্রশ্ন করে তারপর, ভালো কথা, তোর ছেলেপুলে কটি।

অজয় একটু হেসে বলে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বিজ্ঞাপনের পোস্টার।

শমীক বুঝেও প্রশ্ন করে, তুই ?

মাথা নাড়ে অজয়, একটি ছেলে একটি মেয়ে। তোর ?

শমীক হেসে বলে, গত বছর আদর্শচ্যুত হয়েছি। চার। আগের তিনটিই মেয়ে বলে তিনের পর একটা কমা বসানো ছিল। লাস্টটি ছেলে হওয়ায় চারের পর ফুলস্টপ বসিয়ে দিলাম।

অজয় তরল স্বরে বলে, ভালোই করেছিস। হিসেব দেখে তো মাথা ঘুরে যাবার যোগাড়। প্রতি দেড় সেকেণ্ডে নাকি পঞ্চাশ হাজার করে শিশু জন্মাচ্ছে দেশে।

সামান্য শ্লেষের সঙ্গে বলে শমীক, সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতির হিসেবটাও লক্ষ্য করছিস তো ? আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অগ্রগতির হিসেবটা !

কথা বলতে বলতে সিনেমা হলের সামনে এসে পড়েছিল ওরা। অজয় সেদিকে তাকিয়ে বলে, যাক বাবা, বাঁচিয়েছে। হাউস-ফুল।

অজয়ের স্বস্তিটা যে সাজানো নয়, বোঝে শমীক। অথচ তখনকার সিনেমায় আসার ইচ্ছেটাও কৃত্রিম নয়। মাঝে মাঝে কেন যেন এমন হয়। এই মুহূর্তের ইচ্ছেটা পর মুহূর্তে মরে যায়। অথচ কেন কে জানে, মনে মনে সেটা স্বীকার করতে অস্বস্তি বোধ করি আমরা। ইচ্ছেটা যুক্তিগ্রাহ্য কোনো কারণে নাকচ হয়ে গেলে যেন সসম্মান মুক্তি। শমীক মাঝে মাঝে ভাবত, এটা বুঝি একা ওরই এক মানসিক জটিলতা। নিজের মানসিকতার সপক্ষে একটা যুক্তি পেয়ে মনে মনে এবার স্বস্তি বোধ করে।

অজয় হলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। শমীকের দিকে তাকিয়ে বলে, অতঃ কিম্‌ ?

শমীক জবাব দেবার আগেই পেছন থেকে সরব সোল্লাসে একটা প্রচণ্ড

থাবা এসে পড়ে ওর ঘাড়ের ওপর, এই শুয়োর, চোখে কম দেখিস ? কানা ?

অজয় শমীক দুজনেই ফিরে তাকায়। পার্থ! চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে। কিন্তু হাসিতে সেই দশ বছর আগের পরিচয় বহন করছে।

শমীক খুশিতে বলে, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম বলতো ? রীতিমতো রি-ইউনিয়ন !

অজয় পার্থর পেছনে, সামান্য বিস্ময় এবং কিছুটা কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে, বউ ?

এতক্ষণে খেয়াল হয় পার্থর। সীমাকে ডেকে আলাপ করিয়ে দেয় ওদের সঙ্গে, তারপর একটা টাকা বের করে সীমার দিকে এগিয়ে ধরে বলে, একটি আবেদন আছে, আজের সন্ধ্যাটা এই দুই হারামজাদার অনারে আমাকে ছুটি দিতে হবে। তুমি বাড়ি চলে যাও।

সীমা আগে পার্থর এই বন্ধু দু-জনকে দেখে নি। স্বামীর অতীত রোমন্থনের মুখে উচ্চারিত অগণিত নামের ভেতর হয়তো নাম দুটো শুনে থাকতেও পারে, কিন্তু মনে নেই। তবু ওদের চোখ দেখেই বুঝেছিল, অতীতের ঘনিষ্ঠতায় ওরা এখনও কত উত্তপ্ত। হেসে বলল, কেন, আমি সঙ্গে থাকলে অসুবিধে হবে ?

পার্থ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ইমপসিবল ! আজ আমাদের তিনজনের মাঝখানে স্বয়ং ঈশ্বর এলেও বসতে দেবো না।

শমীক হালকা সুরে পাদপূরণ করল, অবশ্য ঈশ্বর নিজেই হয়তো ভয়ে আসবে না।

সীমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে ওরা পার্কে এসে বসে একটা আলো-আঁধারি ঝোপের পাশে। ছোটরা বাড়ি ফিরে গেছে। শীতের আমেজ পড়ে আসায় বুড়োরাও। তবু এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আড্ডা মারছে বেশ কিছু লোক। আধা-অন্ধকার খুঁজে বসেছে কিছু জোড়বাঁধা ছেলে মেয়ে। অথবা নরনারী।

কিন্তু বিশেষ করে এসব ওদের দ্রষ্টব্য ছিল না। দীর্ঘদিনের জমে থাকা অজস্র কথা ছিল ওদের। একদা অবিচ্ছেদ্য, অধুনা জীবনযুদ্ধে ছড়িয়ে পড়া হারিয়ে যাওয়া অনেকগুলো নামের অনুসন্ধানও। এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক অনেক জিজ্ঞাসা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ইত্যাদি প্রসঙ্গ পেরিয়ে একসময় অনুভব করে ওরা,

গুরুর সে উত্তাপ হারিয়েছে। সেই স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাস স্তিমিত। মনে মনে ওরা তিন জনই কোথায় যেন একটা ক্লান্তি বহন করছে। উদ্দেশ্যহীন বাঁচার একটা হতাশা। অথচ, আপাত বিচারে বৈষয়িক জীবনে ওরা যে পূর্ণ ব্যর্থ, তা নয়। একেবারে অসচ্ছল নয় আর্থিক বিচারে। তবু কোথায় যেন একটা হেরে যাওয়ার গ্লানি।

—তুই লেখাটা ছেড়ে দিলি কেন? এককালে তোকে দিয়েই আমরা সবচেয়ে বেশি আশা করেছিলাম।

অজয় একটা নতুন সিগারেট ধরায়। বিষণ্ণ সুরে বলে, কোথায় লিখব, কি লিখব বল?

শমীক বলে, কেন, লিখলে লেখার জায়গার অভাব কি? জানাশোনা তো কত কাগজ আছে।

অজয় বলে, পরিচিত কিছু সম্পাদক যে নেই, তা নয়। কিন্তু তাদের বিপদে ফেলতে না হলে যে ধরনের কবিতা লিখতে হয়, তা লিখে তৃপ্তি পাই না।

পার্থ আলতোভাবে বলে, কিন্তু তোর সব কবিতায় তো আর রাজনীতি থাকে না।

অজয় হাসে। সেখানেই তো আসল সমস্যা। আমার রাজনৈতিক পরিচয়টা তারা জানে বলেই অন্য কোনো কবিতা দিলে হয়তো ভাববে, আমি লেখা ছাপানোর জন্য কমপ্রোমাইজ করছি! সেটা বড় লজ্জার।

শমীক সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, চিপ সেন্টিমেণ্ট!

অজয় সোজা হয়ে বসে, উঁহু বিশ্বাসের আত্মাভিমান। আমি কবিতা লিখি। কবিতা লিখে গাড়ি-বাড়ির স্বপ্ন এদেশে কেউ দেখে না। এবং কবিতা লিখে কালেভাদ্রে যে ক-টা টাকা পাওয়া যায়, তা আমার প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই না, সুতরাং এই অবশিষ্ট অভিমানটুকু কোন দামে বিকোব? তার চেয়ে দিনে দুটো করে টিউশনি করছি, সে অনেক সম্মানজনক।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে। দূরে ছড়ানো আলোগুলো আলোর আভাস মাত্র।

অজয় ঘাসের ওপর আধশোয়া হয়ে একটা ঘাস টানতে টানতে বলল, সেদিন কোন একটা পত্রিকায় যেন পার্থর একটা গল্প পড়ছিলাম। এক বিধবার অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষার গল্প।

পার্থ কিছুটা জোর দিয়েই বলল, কিন্তু এটাও তো একটা বাস্তব সত্যি। জীবনের এ-সব সমস্যাগুলো বালিতে ঘাড় গুঁজে অস্বীকার করতে চাইলেই লুপ্ত হয়ে যায় না।

অনাহত সহজ স্বরে হেসে বলে অজয়, আমি কি নিন্দা করছি?

শমীক অস্বীকারের ভঙ্গীতে বলল, তোরা এত ফর্মাল হয়ে গেছিস কেন বল তো? তুই হয়তো ভুলে গেছিস অজয়, সেই ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের যুগে আমরা যখন 'ইস্তাহার' পত্রিকাটা বের করি, অমুপের রাজনৈতিক-বন্দী কবিদের নিয়ে লেখা একটা কবিতায় "রবীন্দ্র-সাথীরা কারাগারে" বলে একটা লাইন ছিল। তুই সেটা কাটিয়ে "সুকান্ত-সাথীরা" করিয়ে গিয়েছিলি।

অজয় এবারও সহজ স্বরে বলল, এখন ভাবলে হাসি পায়।

শমীক ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বলে, লজ্জা করে না?

অজয় এবার সামান্য গম্ভীর হয়ে বলে, না। কারণ ভুল করলেও তার পিছে সেদিন কোনো স্বার্থচিন্তা ছিল না, সেটা ছিল বিশ্বাসেরই ভুল। সময় মতো যা আমরা শুধরে নেবার চেষ্টা করেছিলাম।

শমীক কিছুটা রূঢ়ভাবেই বলল, সেই সংশোধনের চেহারাই কি পার্থর এই সব গল্প?

অজয় হেসে বলল, বিশেষ করে ও বেচারাকেই বা ধরছিস কেন? হাতের কাছে পাচ্ছিস বলে? যদি স্ক্যানই করতে হয়, তাহলে সেদিনের সব বিপ্লবী লেখকদেরই হালফিল পরিণতি আলোচ্য হওয়া উচিত।

পার্থ সমর্থনে জোর পায় যেন। বলে, নিশ্চয়ই। যারা ক্যাম্প চেঞ্জ করেছে তাদের চেহারাটা নাহয় পরিষ্কার। কিন্তু যারা এখনও ক্যাম্পে বিলং করছে বলে দাবি করছে, তাদের সব গতিবিধিই কি বৈপ্লবিক বলে তোদের ধারণা?

শমীক নির্দ্বিধায় জবাব দেয়, আদৌ না। প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও একই বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে থাকায় তাদের ভেতরের খবরাখবরও মাঝে মাঝে কানে আসে। জানি, তাদেরও অনেকেই আসলে নানা ধাঁধায় ঘুরছে। কেউ অর্থ, কেউ খ্যাতি, কেউ দেশভ্রমণের সুযোগসন্ধানে। কিন্তু সেটা যদি বুঝেই থাকি আমরা, আর অপছন্দ করি, তাহলে সেটা নিশ্চই নিজেদের সপক্ষে অজুহাত হতে পারে না।

পার্থ মন দিয়ে শুনছিল। নানা ধরনের প্রশ্ন ও দ্বিধায় অনেক দিন থেকেই

একটা অস্বস্তির ভেতর দিয়ে আসছে ও। পুরনো বন্ধুরা, যাদের সামনে নিজকে পরিপূর্ণভাবে অসঙ্কোচে খুলে ধরা যায়, তর্ক ঝগড়া মারামারি করেও সম্পর্কে চিড় ধরে না, তারা সব ছত্রখান হয়ে যাওয়ায়, অনেক অনুচ্চারিত প্রশ্নে নিজেকে অসহায়ভাবে বিদ্ধ বোধ করছিল বেশ কিছুদিন থেকে। আজ, আক্রান্ত হলেও, সেই সুযোগ পেয়ে খুশি হয় যেন।

শমীকের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিতে নিতে বলে, কিন্তু কোনো রকম অজুহাতের কথা বাদ দিলেও, একটা বিশ্বাসের প্রশ্নও আছে। যদি কেউ বলে, আমাদের সাহিত্য বিশ্বাস একপেশে? শ্রেণী পরিচয় বাদেও মানুষের একটা সুপরিচয় আছে। যে কোনো রকম যৌনানুভূতিও সেই পরিচয়ের অঙ্গীভূত?

অজয় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছিল। আকাশে চোখ রেখেই বলল, শিশু ভোলাচ্ছিস? সে কথা কে অস্বীকার করেছে?

পার্থ অজয়ের দিকে ফিরে বলে, তুই আমার গল্পটার—

অজয় বাধা দিয়ে বলল, পার্টিকুলারলি ও গল্পটা প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে চাইনি। আর খুব কিছু ভেবেও বলিনি। আমাদের পুরনো বন্ধুদের কাউকে হালের ডেকাডেন্সের স্রোতে গা ভাসাতে দেখলে এখনও কোথায় যেন একটা বেদনা বোধ করি বলেই বোধহয় বলেছিলাম।

পার্থ বলল, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবন যে একটা বিরাট ডেকাডেন্সের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সেটা অস্বীকার করিস?

অজয় আলতোভাবে বলে, না।

—সাহিত্যকে যদি বাস্তবের প্রতিচ্ছবি বলে মেনে নেই, তাহলে এই ডেকাডেন্সের ছবি সাহিত্যে আসবেই।

অজয় বলল, কিন্তু জলছবি আসবেনা।

শমীক এতক্ষণ শুনছিল, এবার সোজা হয়ে বসে বলল, তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দে পার্থ। এই ডেকাডেন্সটা ঈশ্বরপ্রদত্ত কিছু, না, এর পেছনে কিছু বাস্তব কার্যকরণ আছে বলে তোর বিশ্বাস?

পার্থ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, চিন্তাগুলোও সব বিকিয়ে দিয়েছি বলে ভাবছিস কেন?

শমীক কোনো রকম অনুতাপ বা সঙ্কোচ প্রকাশ না করেই বলল, বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে বিশ্বাস করিস যে, যেকোনো ডেকাডেন্সের পেছনে কিছু

সামাজিক কার্যকারণ আছে? এবং যে কার্যকারণ নিজেদের স্বার্থেই কিছু আড়াল স্বার্থপর গৃধ্নু জীবের সৃষ্ট এবং সন্তর্পণে লালিত? তাই যদি হয়, তাহলে প্রতিটি সচেতন লেখকের উচিত অবক্ষয়ের অন্ধকার ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকারে আড়াল স্বার্থ-বিদ্ধ হাতগুলোকেও পাঠকের সামনে এনে দেওয়া? সে প্রসঙ্গে তাদের সচেতন করা? এখন বাস্তবতার নামে অবক্ষয়ের ধ্বজা নিয়ে যারা অভিযান শুরু করেছে তারা কি তাই করছে, না, এই অন্ধকার ভাঙিয়ে খাচ্ছে?

পার্থ চুপ করে থাকে। এই প্রসঙ্গে ওর নিজের উত্তর এটাই। তবু পুরনো বন্ধুদের—যেকোনোরকম আক্রমণ বা কটাক্ষের সামনে সুযোগ পেলেই ও প্রশ্নটাকে একবার যাচাই করে নেয়। অবশ্য সেসব ক্ষেত্রেও প্রতিপক্ষকে পরাজিত দেখলে কেন যেন অকৃত্রিম স্বস্তি বোধ করতে পারে না। বরং একটা চাপা অস্বস্তি কাঁটার মতো কিছু ফালতু সমর্থন কুড়িয়ে আনল মনে হয়।

অজয় পার্থের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, অবশ্য এ-প্রসঙ্গে আর একটা কথাও ভাবার আছে। লেখকরাও স্বয়ম্ভু নয়, তাদেরও প্রেরণার একটা উৎস থাকা প্রয়োজন। এই ডেকাডেন্সের পাশাপাশি যদি সে-রকম কোনো রেজিস্টেন্সের দিক থাকত, তাহলে দেখতিস বেশ কিছু লেখক আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। যারা আজ উল্টোমুখো ঘোড়দৌড়ে যোগ দিয়েছে তাদের সবাই তো আর বেসিক্যালি অসৎ নয়। অনেকেই আছে যারা কিছু না বুঝেই স্রোতের মুখে নিজেকে ছেড়ে দেয়। সব যুগেই দেয়। আমাদের সময়েও বামমুখো স্রোতে তখন গা ভাসায় নি অনেকে?

পার্থ সামান্য আহতস্বরে বলল, আমার সপক্ষে কোনো সহানুভূতির প্রত্যাশা নিয়ে কিন্তু প্রসঙ্গটা তুলিনি আমি; তুই বোধহয় ভুল করেছিস অজয়। তাছাড়া, আমরা আর বয়সে কেউ শিশুও নই। আমরা সবাই যা করছি বা করছি না, তা সব কিছুই বেশ বুঝেই করছি।

শমীক এবার একটু লজ্জিতভাবে বলে, তোকে কিন্তু কেউ চার্জ করেনি পার্থ। একটা উপলক্ষ ধরে এটাকে একটা আত্মসমীক্ষাও বলতে পারিস। শুধু লেখা নিয়েই একটা লোকের জীবন নয়। ও ছাড়াও জীবনের বহু ব্যবহারিক দিক আছে। সে সব দিক দিয়েও, বা ধরো, সচেতন নাগরিক

হিসেবেও কি আমরা আমাদের সব কর্তব্য পালন করতে পারছি? স্বধর্মচ্যুত হচ্ছি না? পায়ে পায়ে পরাজয় মেনে নিচ্ছি না?

পার্থ অজয় দুজনেই বোঝে, শমীকও সাংবাদিক জীবিকার গ্লানির দিক ভেবেই এসব কথা বলছে। ব্যক্তিগত জীবনে যে শক্তিগুলিকে ও ঘৃণা করে, জীবনের পথ চলা শুরু হয়েছিল যাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে, ঘাড় গুঁজে আজ তাদেরই সেবা করতে হচ্ছে। এখনও চিন্তায়, বোধে যে শিবিরের সঙ্গে ওর শরিকানায় বিশ্বাস করে, জীবিকার জন্য দিনের পর দিন কলমের মুখে তাদেরই কবর খুঁড়ে যেতে হচ্ছে।

অজয় একসময় আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসে, দূর শালা, ভাবলাম একটু খিস্তি-খেউর করে আড্ডা মেরে ক্লান্তি দূর করে যাব, না, আবার ঘুরেফিরে সেই পুরনো গর্তে এসে পড়তে হল।

শমীক হেসে বলল, গর্ত প্রসঙ্গে একবার দৃষ্টি খুলে গেলে এই এক অশান্তি, বুঝলি? কখন শত্রুর জন্য গর্ত খুঁড়ছি, আর কখন, অজান্তে হলেও নিজেদের গর্ত খুঁড়ছি, সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারি আমরা। আর সেজন্য কখনও উল্লাস কখনও যন্ত্রণা বোধ করি।

নতুন একটা বিড়ি ধরিয়ে আলতোভাবে জিজ্ঞেস করে অজয়, সুবীরের সঙ্গে দেখাটেখা হয়?

শমীক ঘাসের ওপর শুতে শুতে বলল, ও এখন বিগ বস! মাসে কবার করে দিল্লী বোম্বে ফ্লাই করছে।

অজয় কৌতূহলে জিজ্ঞেস করল, প্রচণ্ড মদ খায় নাকি আজকাল?

শমীক হেসে বলল, হ্যাঁ, মকারান্ত সব নেশাগুলোই আছে শুনেছি। মায় মার্কস পর্যন্ত! মস্কো পিকিং কাউকেই নাকি এখন ও খাঁটি মার্কসিস্ট বলে বিশ্বাস করে না। ও দুটোই নাকি রিভিসনিজমের এপিঠ-ওপিঠ!

অজয় হঠাৎ মনে পড়ায় বল, কল্যাণের মতো একই যন্ত্রণায় ভুগছে তাহলে।

শমীক ঠিক বুঝতে পারে না। বলে, কেন? ও ব্যাটা তো আজকাল দু-হাতে লিখছে। আমি ইচ্ছে করেই পড়ি না আজকাল ওর লেখা, কিন্তু প্রচুর টাকা কামাচ্ছে নাকি?

অজয় বলল, হ্যাঁ। ওর লেখার চরিত্রগুলো সেদিক দিয়ে খুব বশংবদ।

প্রায় সব লেখাতেই নায়ক-নায়িকারা দু'পাতা না পেরোতেই নিজেদের উলঙ্গ করে ওর হাতে এসে উজাড় করে পয়সা ঢেলে দেয়।

—তা সুবীরের রেফারেন্সে কি বলছিলি বল?

অজয় কপট সহানুভূতির সঙ্গে বলল, হঠাৎ একদিন পথে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। রেস্টুরেণ্টে টেনে নিয়ে গেল। তারপর নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে এক সময়, ভারতবর্ষে এ-পর্যন্ত একটাও খাঁটি মার্কসিস্ট পার্টি জন্মাল না বলে নিদারুণ অনুশোচনা প্রকাশ করল। ওর কথা শুনে মনে হল যেন এক অধীর প্রতীক্ষায় আছে ও। সেরকম একটা পার্টি জন্মালেই ওর নায়ক-নায়িকারা আবার কাপড়-চোপর পরে হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

পার্থ যে অনেকক্ষণ চুপ করে আছে, ওরাও এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। পার্থর কথায় এতক্ষণে খেয়াল হল।

বেশ গভীর স্বরে বলল পার্থ, কল্যাণের রেফারেন্সে কিছু বলছি না। আই হেট হিম। কিন্তু পার্টিগত সমস্যাটাও আজ সৎবিশ্বাসী লেখকদের কাছে একটা কম বড় সমস্যা নয়। প্রথমত, তুই যদি আজ নিজের বিশ্বাসে স্থিত থাকতে চাস, তুই লেখার কাগজ পাবি না। অথচ, কিছু একটা না লিখতে পারলে লেখক বাঁচতে পারে না। তা সত্বেও কোনো লেখক যদি ধরে নেই, অদমিত থেকে বছরে একটি বা দুটি গল্পের বেশি লিখবে না, এবং বিশ্বাসের কাছাকাছি পত্রিকা ছাড়া লিখবে না, ঠিক করে, তাতেও তার সমস্যা মিটছে না। ধর, গল্পটা সংগ্রামী মানুষের গল্প, কিন্তু সে গল্পেরও মূল্যায়ন নির্ভর করবে, বহু বিভক্ত স্বশিবিরের কোন শিবিরের কাগজে লিখেছিস, তার ওপর। এ-ক্ষেত্রে তুই কি করবি?

অজয় আর শমীক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কি যেন চিন্তা করে। তারপর শমীক এক সময় বলে, শুধু সাহিত্য কেন, অন্যান্য বহু প্রসঙ্গেই নির্দিষ্ট শিবিরভুক্ত না অথচ মূল বিশ্বাসে শরিকানা আছে, এমন লোকদের কাছে এটা একটা অস্বস্তিকর সমস্যা। এ-সমস্যা তোর আমার অনেকেরই। আমিও ভাবি মাঝে মাঝে কথাটা, কিন্তু শিবিরভুক্ত নই বলেই কি আমাদের কিছু করণীয় থাকবে না?

অজয় বিষণ্ণ হেসে বলল, আসলে সেটাই আমাদের জীবনে একটা নির্মম সত্য। ভাবতে অস্বস্তি লাগলেও, সত্যিই আমাদের বোধহয় আর কিছু করণীয় নেই। আমরা হয়তো আত্মসমর্পণ করিনি, কিন্তু পলাতক সৈনিক।

হয়তো কথা প্রসঙ্গেই কথাটা আলতোভাবে বলেছিল অজয়, কিন্তু আচমকা যেন একটা উলঙ্গ সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে ওদের এক অস্বস্তিকর যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দেয়। জীবনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাময় বয়সটা যে-জলন্ত বিশ্বাসের পেছনে সংগ্রামে খরচ করে এসেছে, আজ পর্যন্ত মধ্যবয়সে এসে যেন সেই বিশ্বাসেই টান পড়েছে। না-পারছে নতুন শক্তি-সাহস সঞ্চয় করে নতুন করে এগিয়ে যেতে, না-পারছে পুরনো পিছুটানে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্থখ, প্রতিষ্ঠা গড়ে নিতে।

আশেপাশে যারা বসেছিল, তারা কখন যেন উঠে গেছে। যে-ঝোপটার পাশে বসে আছে ওরা, তার পাশের অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে। নাকি, এতক্ষণ দূরে হলেও জলছিল, এমন কোনো আলো নিভে গেছে। কেমন যেন ভার ভার লাগছে পরিবেশটা।

অজয় একসময় বলল, সত্যিই, চারদিকে লক্ষ্য করে দেখ। নিজেদের কেমন যেন রণক্ষেত্র থেকে ছত্রখান হয়ে বেরিয়ে আসা তিনজন পলাতক সৈনিকের মতো মনে হচ্ছে না? গোপন আশ্রয়ে বসে যারা পরবর্তী কর্তব্যের কথা ভাবছি। অথচ নৈরাশ্যে, ক্লান্তিতে গুছিয়ে ভাববার শক্তিও হারিয়েছি।

পার্থ একটু হেসে বলল, আমরা বোধহয় ঠিক পলাতক সৈনিকও নয়, বুঝলি? সৈনিকদেরও দুটো দল থাকে। একদল, সেনাপতির ভুল নির্দেশও অন্ধ আনুগত্যে মেনে নিয়ে জীবনপণ লড়াই করে মরে। অন্যদল, হয় আত্মসমর্পণে বা পলায়নে যার যার জীবনের নিরাপত্তা খুঁজে নেয়। আমরা এর কোনো দলেই নয়। না-পারছি অন্ধ আনুগত্যে সব নির্দেশ মেনে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে, না-পারছি আত্মসমর্পণ করতে। বোধে, বিশ্বাসে এখনও রণক্ষেত্রেই দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু নিরস্ত্র নির্বাক হয়ে।

অজয়, যেন হঠাৎ মনে পড়ায় বলল, কটা বাজে রে?

পার্থ ঘড়ি দেখে বলল, প্রায় দশটা। কোনখান দিয়ে সময় গড়িয়ে গেল বল তো? এতক্ষণ খেয়ালই করিনি।

অজয় আধশোয়া হয়েছিল, এবার হাত নেড়ে উঠে বসল। সেই শুরুর চটুল স্বরে বলল, ভদ্রমহোদয়গণ, চলুন এবার ওঠা যাক। যার যার অভ্যস্ত গুহায় স্ত্রীনামক প্রহরীগণ নিশ্চয়ই এতক্ষণ রসনাস্ত্র শানাতে শুরু করেছে। অতএব ওঠো বৎসগণ, বিনীত ছাগশিশুর মতো আমরা এইবার যার যার গুহাভিমুখে যাত্রা করি।

পার্থও সিগারেট প্যাকেট দেশলাই গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ, এতক্ষণে, গম্ভীর স্বরে বলল শমীক, দাঁড়া।

ওর স্বরে কেমন যেন আদেশের জোর। বলল, বস।

শমীকের স্বর যেন অপরিচিত। এতক্ষণের স্বরের সঙ্গে মিল নেই। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু যেন অবাক হয় অজয়। মনে মনে সামান্য চমকায়। সেই পুরনো দিনের দৃষ্টির একটা আবছা আভাস শমীকের চোখে। মিটিং-এ, মিছিলে, রাস্তার ব্যারিকেডের সামনে এই গভীর অকম্পিত দৃষ্টি অনেকদিন দেখেছে অজয়রা।

অজয় আর পার্থ আবার বসে। কিন্তু শমীক কোনো কথা বলে না। কি যেন ভাবছে মনে হয়। এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

তারপর একসময় বলল শমীক, আচ্ছা, আমাদের কি সত্যিই আর কিছু করার নেই ?

ওর স্বরের গোপন যন্ত্রণা, আকুতি স্পর্শ করে অজয়, পার্থকে। বহুদিন পর প্রশ্নটা যেন প্রত্যক্ষ একটা রূপ নিয়ে ওদের সামনে এসে জবাবদিহি চায়। এ-যেন এক মহাকালের আহ্বান।

অজয় স্তিমিত স্বরে বলে, আমরা সবাই বড় জড়িয়ে পড়েছি। এখন আমাদের প্রত্যেকের উপরই অনেকগুলো নির্ভরশীল মুখ।

পার্থ বলে, তাছাড়া, প্রত্যক্ষ রাজনীতি প্রসঙ্গেও আমাদের আজ অনেক জিজ্ঞাসা।

শমীক বলে, কিন্তু এ-সব প্রশ্নগুলো বাদ দিয়েও আমাদের কি কিছুই করার নেই ? অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অবক্ষয়ের তাণ্ডব দেখে যেতে হবে ? ভেবে দেখ না, যে-যার নিজের জায়গায় পা রেখেও এমন কিছু একটা করা যায় কিনা যাতে রাতদিন পালিয়ে যাবার পরাজয়ের গ্লানিতে ভুগতে না হয়। যাতে রাতে ঘুম না-আসা পর্যন্ত আজকের নিজের কাছে পুরনো দিনের নিজের ধিক্কার না শুনতে হয়।

এতক্ষণে অনুভব করে ওরা, ওদের আপাত বিচ্ছিন্নতার ভেতরও একই বেদনা, গ্লানি, ধিক্কার বহন করছে ওরা। হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে আরো অনেকেই। অলক্ষ্যে অপরিচিত অসংখ্যের সঙ্গে ওরা একই যন্ত্রণায় আবদ্ধও তাহলে !

মনে মনে এবার কিছুটা জোর পায় যেন। একটা গোপন আকুতি অনুভব

করে ভেতরে। তিনজনই একই প্রশ্নের ওপর হাত রেখে নিঃশব্দে ভেবে চলে তাই।

তারপর, বেশ কিছুক্ষণ পর শমীকই বলে, আচ্ছা, আমরা সবাই তো চাকরি করছি এখন ?

পার্থ আর অজয় শমীকের চোখে চোখ রাখে।

—এবং তা সত্ত্বেও আমরা গরীবই।

পার্থ ও শমীকের চোখে সম্মতি।

—মাসে খরচের টাকা থেকে আমরা, মানে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুরনো বন্ধুদের সবার কথা বলছি, যদি কিছু করে টাকা সরিয়ে নেই, তাতেও আমাদের দারিদ্র্য প্রায় একই থাকবে। না হয় সামান্য একটু বাড়বে।

অজয় আস্তে জিজ্ঞেস করে এবার, তারপর ?

শমীক বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা করে এবার, আমরা যদি একটা পত্রিকা বের করি ? নিজেদের কথা, নিজেদের বিশ্বাস তুলে ধরার চেষ্টা করি কোনোরকম কম্প্রমাইস না করে ?

অজয়-পার্থ নিঃশব্দে ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর পার্থ যেন বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটি রণকল্পনায় সায় দিচ্ছে এমন স্বরে বলে, কথাটা ভেবে দেখা যেতে পারে।

মাসদুয়েক পর বাঙলাদেশের অজস্র পত্রিকার ভীড়ে একটি ক্ষীণ কলেবর পত্রিকা ললাটে রক্তিম ঘোষণা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল—অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে, জীবনের সপক্ষে একটি প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা।

এবং, যথারীতি পত্রিকাটি বিভিন্ন স্টলের উজ্জ্বল-প্রচ্ছদ-বাণিজ্যিক পত্রিকার আড়ালে এক কোণে পড়ে থাকল। নেহাৎ পরিচিত পরিজন ছাড়া বোধহয় কেউ নেড়ে চেড়েও দেখল না সেটা।

মুনিয়া

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

এ-ট্রামটাতেও উঠতে পারলাম না। হাতের বোঁটায় গোটা গোটা মানুষ ফলেছে দরজার রডে। আমার হাত কোনো রকমে ছুঁয়েছিল রডটাকে, কিন্তু ছোঁওয়া লেগেই ট্রামটা ছুটতে শুরু করে দিল। আর ফুটবোর্ড-মুখো ত্রিশঙ্কু পা আমার আমায় শুইয়ে দিল ভূঁয়ে।

ধুলো আর লজ্জা ঝেড়ে উঠে পড়লাম। মাথার ওপর তোলা হাত আমার দিকে ঝুঁকিয়ে 'ছি ছি' শব্দে ট্রামটা চলে গেল। এমনি হয় প্রায় রোজই। কয়েকটা ট্রামের 'ছি ছি' আমায় শুনতেই হয়।

ট্রামের বিদায়ী হাতের ওপরে আকাশ। সেখানে আলো মরছে। একটু আগেও আকাশের চাঁদোয়া বোনা ছিল আলোর সুতো আর অন্ধকারের সুতো দিয়ে। এখন সেই টানা-পোড়েনে আলোর সুতোয় ঘাটতি পড়েছে।

মাটিতে লোকজনের ব্যস্ত দ্রুত পদক্ষেপ। আরো কয়েকটা ট্রাম আমায় প্রত্যাখ্যান করল।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। একটু পাশে এক তেঁতুল-পাতা মাপের ঘাসজমিতে দুটি লোক বসে বাদাম চিবোচ্ছে। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই ওদের।

সবারই বাড়ি ফিরে তো—রেশন, ছেলে পড়াও, মেয়ের শরীর খারাপ, কলের জল বন্ধ, বাজারে জিনিস আগুন, মেজপিসির মেয়ের বিয়েতে কী যে দিই, রেডিয়োর চিৎকার, ঝগড়া, কখনো কথা বন্ধ, কখনো কথার তোড়, কখনো আপাত-স্বাভাবিক কথাবার্তার আড়ালে অস্বাভাবিক নিঃসঙ্গতা, বিরক্তি, একঘেয়েমি।

তার চেয়ে এসো ভাই, বসি এই তেঁতুল-পাতা মাপের ঘাসজমিতে। বাদাম চিবোই। আর ঐ ট্রাম-বাস-লোকের ভীড়ে চোখ রেখে রেখে দুটো-একটা কথার বুড়বুড়ি কাটি। মাঝে মাঝে তাকাই আকাশে—যেখানে আলো মরছে। তারপরে যখন বুড়বুড়ি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে, কোনো কথা হাতড়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না, ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত লাগবে, আকাশের সব আলো মরে যাবে, তখন—চলো উঠি।

শেষ অবধি ট্রামও নেয় আমাকে। ধুঁকে ধুঁকে চলতেও থাকে। কখনো একেবারে মড়ার মতো পড়েও থাকে। পুনরুজ্জীবনের আশায় সুসিদ্ধ হই। সে-আশা নেই নিশ্চিত হই যখন, তখন নড়ে-চড়ে দু-পা এগিয়ে আবার 'ফ্রীজ শট' হয়ে থাকে। থামাটা যে চলার অঙ্গ, এ-কথা হাড়ে হাড়ে বুঝে আমি 'ফ্রীজ' থেকে বেরিয়ে আসি।

হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, এতক্ষণ যেন অভ্যেস বশে বাড়িমুখো ছিলাম। খুব তাড়া কী? কারণ আমারও তো—রেশন, ছেলে পড়াও, বাজারে জিনিস আগুন, এবং মেজপিসির মেয়ের বিয়ে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আমিও হয়তো তেঁতুল-পাতা মাপের জমিতে এসে বাদাম চিবোতে চিবোতে কথার বুড়বুড়ি কাটতাম।

কিন্তু এখন নেমে, যখন হাঁটাপথে বাড়িটা হঠাৎ অনেকটা দূর হয়ে গেল, তখন মনে হলো এখনই বাড়ি যাওয়াটা দরকার। তাড়াতাড়ি ফিরলে অন্তত একটু বিশ্রাম বা আরাম তো করা যায়। আর ছেলেকে একটু পড়ানোও তো দরকার। মেয়ের অসুস্থতা চিন্তার বিষয়। মেজপিসির মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়াটা খুবই কাম্য।

বাড়ি ফিরতে খুব ভালো লাগবে এমন একটা কিছুও কি আমার নেই! মনে পড়ল না। অভ্যেসে ফিরি। বাড়ি ফিরলে আমার স্ত্রী—এক কালের মনোহারিণী উমা—সেও অভ্যেসের জড়ত্ব ভেঙে দেবে না। আমি ভাঙতে গেলে দাম্পত্যকলহ হবে। তাই চালাক হয়ে বিবাদ এড়িয়ে প্রতিবেশীর কাছে শীতল সুনাম কিনছি।

তবু যত এগোতে থাকি, ততই কিন্তু মনে হয়, একটা কিছু ভালো খবর বাড়িতে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আর আমার পায়ের গতি বাড়তে থাকে। কী সে খবর—কিছুই জানি না। লটারি-টিকিট কিনি না, সুতরাং কী ভালো খবরই বা হতে পারে! ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট? মেয়ে মিস ক্যালকাটা? উমা ভেঙেছে তার অভ্যেসের শক্ত খোলাটা? চাকরির জায়গার যত অত্যাচার ইউনিয়ন করেও মেটানো যায় নি, তা হঠাৎ সুমীমাংসিত? ম্যাজিকে বিশ্বাসের দিন চলে গেছে আমার।

কিন্তু আমি তাড়াতাড়িই হাঁটছি। গতি কমাতে পারছি না। বাড়ির কাছে এসে মনে হলো—হয়তো কোনো চিঠি এসেছে। হ্যাঁ, এটা সম্ভব। কে লিখবে? কী লিখবে? মনে পড়ল না কোনো

নাম। আমি নামটা মনে মনে খুঁজতে লাগলাম। কে হতে পারে? সরস্বতী—শৈশব-কৈশোরের বন্ধু? কী লিখবে সরস্বতী? আজ আর কিছুই লেখা সম্ভব নয়। দরকারই বা কী! শুধু চিঠিটা এলেই আমার ভালো লাগবে। চিঠিতে থাক দু-একটি সাধারণ কথা: 'হঠাৎ তোমার কথা খুব মনে হচ্ছিল। ভালো আছ?' কিশোরী সরস্বতীর অনেকগুলো ছবি আমার মনের ওপর দিয়ে নূপুর পায়ে নাচতে নাচতে চলে গেল।

বন্ধুদের কেউ লিখতে পারে। শচীন। নাঃ! অথবা হঠাৎ বিদেশ ভ্রমণের জন্য কেউ আমন্ত্রণ জানাতে পারে। কে জানাবে? ছোট বেলা থেকেই আমার বিদেশ ভ্রমণের সাধ। অথবা অন্য কিছু—যা পড়তে পড়তে শীতল অভ্যেসগুলো শুকনো পাতার মতো ঝরে যাবে আমার গা থেকে। সারা গায়ে নতুন কিশলয়ের ঢল নামবে।

পাগল! কোথা থেকে আসবে চিঠি! কী সব ভাবছি আমি! অবশ্য এ-রকম আমার মাঝে মাঝে হয়। দু-চার দিন থাকে—জ্বরের মতো। তারপর চলে যায়। কখনো মাত্র একদিনের জন্যেও আসে। একবার এক বন্ধু শুনে বলেছিল—'ডাকঘর'-এর অমল হওয়ার চেষ্টা। সেই থেকে বাইরের কাউকে আর বলি না। 'ডাকঘর' পড়বার আগেই আমার এ-রোগ ছিল। কিন্তু এ-রোগ থেকে এখন আমার মুক্তি নেওয়া দরকার। বয়স হয়েছে আমার। বিবাহিত। ছেলেমেয়ে আছে। এখন এসব কী ছেলেমানুষি!

দোরের কাছে এসে তাও লেটার-বকসের দিকে তাকালাম। না, কোনো চিঠি নেই। যাক বাবা, বাঁচা গেল। কী সব ছেলেমানুষি যে বয়স্কদের মাথাতেও থাকে। কিন্তু এই বয়স্ক লোকটি ভেতরে কোথায় যেন চিনচিন করছে।

'একটা চিঠি এসেছে।' বলল উমা।

ধক করে উঠল বুকটা: 'কার চিঠি?'

উমা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মাঝে মাঝে আমার মুখে কী যেন ও দেখে! আমার বিরুদ্ধে কী যেন ওর একটা অভিযোগ আছে। কী অপরাধ আমার! তবে কি চিঠিটা সরস্বতীর? কিন্তু আজ এই মুহূর্তেই নয়। অন্য অনেক সময় ঐ দৃষ্টি উমার চোখে আমি দেখেছি।

'বাবার চিঠি।'

'কী লিখেছেন ?' আমার গলা কি উদাসীন শোনাল ?

'বাবার শরীর খারাপ।'

আমার চিঠি তাহলে আজ আসে নি। বিষণ্ণ চোখে উমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু কি বিরক্ত ও? আশা দিয়ে হতাশ করেছে! আমার এখন উদ্বেগ প্রকাশ করা দরকার। বলা উচিত: ও, তাই নাকি? কী মুস্কিল? এত বয়স? কী হয়েছে? কে দেখছেন? তুমি যাচ্ছ? কার সঙ্গে যাবে? আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাব। দেখি, পড়ি চিঠিটা!

কিন্তু একটা কথাও আমার মুখে এল না। আমি তেমন কিছু উদ্বেগ বোধ করছি না। তাহলে কেন আমায় এই ভণ্ডামি করতে হবে! বাইরে সব যায়গায় করতে হয়। ঘরেও করতে হবে? স্ত্রীর সঙ্গে? আমি পারব না। উমা, তোমারও স্বাধীনতা রইল। আমার বাবার অসুখে উদ্বেগ যদি সত্যি বোধ না করো, তবে ভান কোরো না যেন। কিন্তু ভান না করেও আবার তুমি পারবে না। আমি জানি।

'তোমার চা নিয়ে আসি।' উমা চলে গেল।

জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে বিরক্ত বিষণ্ণ ভাবটা যায় না।

'অসিতকাকু, তোমার একটা চিঠি।'

তাড়াতাড়ি চোখ তুলে দেখি—মুনিয়া। পাশের বাড়ির বাচ্চা মেয়ে। ফুটফুটে দেখতে। লালচে ফর্সা। পায়ে হাঁটে কি পাখায় ওড়ে বোঝা যায় না। আমার ঘরের কোণে বা বারান্দায় বহু সময় পুতুলের সংসার ছড়িয়ে আপন মনে বকর বকর করে।

'তুই পেলি কোথায় ?'

'পিওন ভুলে আমাদের বাড়ি দিয়ে গেছে।'

'দেখি, দেখি।'

হাতে নিয়ে দেখি—ইলেকট্রিকের বিল।

'অসিতকাকু, এটা তোমার সেই চিঠি ?'

মনে পড়ল, একবার জ্বরের ঘোরে মুনিয়াকে আমার 'চিঠি'র প্রত্যাশার কথা বলেছিলাম। ও অবিশ্বাস করে নি।

উমা চা দিয়ে গেছে। মুনিয়া একটু দূরে বসে তার খেলনা খুট্‌র-খুটুর করছে।

'অসিতকাকু, তোমার চিঠি কবে আসবে ?'

'আসবে না।'

'সে কি! তুমি যে বলেছিলে—আসবেই।'

'ভেবেছিলাম আসবে।'

'যদি চিঠিটা না আসবে, তবে চিঠিটা কোথায় গেল?'

'অ্যাঁ?'

'চিঠিটা তো ছাড়া হয়ে গেছে বলেছিলে। তাহলে?'

'হয়তো চিঠিটা এখন রাস্তায়।'

'পথ হারিয়ে ফেলেছে?'

'বোধহয়।'

একটা চিঠি আকাশ-বাতাস পাহাড়-অরণ্য দেশ-বিদেশের ওপর দিয়ে আসতে আসতে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। ছোট্ট একটা মুনিয়া পাখিরই মতো। পাহাড়ে অরণ্যে ধাক্কা খেয়ে অসহায় দিশেহারা। ছাইরঙের মুনিয়া নয়—আকাশে মিশে যায় নি। লাল মুনিয়া—ফুটফুটে। ঠোঁট লাল, ডানা লাল। পেটটা কালো। ওড়বার সময় লাল আভা ছড়াচ্ছে। উড়ছে—দিশেহারা।

'অসিতকাক।'

'উঁ।'

'চিঠিটা নিশ্চয়ই রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।'

'হ্যাঁ।'

'তুমি চিঠিটাকে খুঁজতে বেরোবে?'

'হ্যাঁ, বেরোতে হবে।'

পরদিন সকালে থলে হাতে বাজারে বেরোচ্ছি, দেখি মুনিয়া রাস্তার ধারের জানালায় একটা বই কোলে আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে আছে। আমাকে দেখে একটু হেসে বলল, 'অসিতকাকু, চিঠি খুঁজতে যাবে না?'

'যাব।'

বাজারে যে মাছওয়ালাটা প্রচণ্ড ঝগড়াটে, তার কাছ থেকে একটু মাছ কিনলাম। আজও লোকটা বেদম রেগে ছিল। রাগলে কাজচে

লাল দেখায় ওকে। ঐ রঙের আড়ালে আর কোনো রঙ আছে কিনা খুঁজলাম আমি।

খেয়েদেয়ে কাজে বেরোচ্ছি, দেখি মুনিয়া ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় ডাণ্ডাগুলি খেলছে। ও ছেলেদের খেলারও খেলুড়ে।

আমায় দেখে বলল, 'অসিতকাকু, চিঠি খুঁজো কিন্তু।'

'হ্যাঁ।'

বাসে ওঠবার সময় একটা লোকের পা মাড়িয়ে ফেললাম। লোকটা আমায় কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'চোখে দেখতে পান না?'

'সত্যি দেখতে পাই নি। সত্যি বলছি। মাফ করবেন।'

'মাফ? অ্যাঁ, বলি মাপ কিসের? পা মাড়াবেন, চোপাও করবেন!'

'না, মানে আমি চোপা করি নি। আমি শুধু বলছিলাম—'

'চোপা করছেন, আবার বলছেন— করছি না! এখনও তো করছেন। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে রক্ত বার করে দিচ্ছেন, আবার মেজাজও দেখাচ্ছেন?'

'আমি মেজাজ দেখাই নি মোটেই।'

'দেখাচ্ছেন না?'

'আপনিই বরং দেখাচ্ছেন।'

'ওরে ভোঁদা, মার তো লোকটাকে জোরে ধাক্কা।'

'না, না। ঝুলছি আমি।'

'কেন ঝুলছেন। যান, ট্যাকসি করে যান।' ধাক্কাটা মারলই। এ-ধাক্কায় টিকলেও পরের ধাক্কায় টিকবে না। তাই নিজেই লাফ মারলাম। হাত-পা কাটল, কিন্তু প্রাণ বাঁচল।

লোকটার মুখ দেখাচ্ছিল কালচে লাল —রক্ত জমে গেলে যেমন দেখায়। ঐ মুখটার আড়ালে হয়তো ওর আর-একটা মুখ ছিল। হয়তো সে-মুখটা ছিল সতেজ, হালকা লাল —সূর্য ওঠবার আগের আকাশের মতো, নতুন-গজানো কিশলয়ের মতো। সেই মুখ হয়তো বলছিল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'চিঠি খুঁজতে।'

'এই পথ দিয়ে চলে যান। হয়তো সুবিধে হবে।'

'ধন্যবাদ।'

'যদি চিঠি পান একবার দেখিয়ে যাবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

অফিসে ঢোকার মুখেই দারোয়ান খিঁচিয়ে উঠল : 'এ অসিতবাবু, আপনি তো বহুৎ গড়বড় করছেন।'

ওর কাছ থেকে একবার কয়েকটা টাকা ধার নিয়েছিলাম—শোধ দিতে পারি নি। ওর গলার স্বরটা আজ বড়ই অন্যরকম। ও আমায় অপমান করছে। ওর মুখটা কালচে লাল হয়ে আছে। ও-মুখের আড়ালে কি আর-একটা মুখ আছে?

'কী অসিতবাবু, বাত তো বলিয়ে।' ('কোথায় যাচ্ছেন?')

'হ্যা ভাই, এই মাসে নিশ্চয়ই দিয়ে দেবো।' ('আমি চিঠি খুঁজতে যাচ্ছি।')

'ইয়ে তো আপনি হর মাহিনাতেই বলছেন।' ('এই পথ দিয়ে যান।')

'না ভাই, এবার ঠিক দেবো।' ('ধন্যবাদ।')

'ইয়াদ রাখনা।' ('চিঠি পেলে দেখাবেন।')

অফিসে বড়বাবুর রক্তচক্ষু : 'কী অসিতবাবু, আপনার তো রোজই লেট মশাই।'

ঐ রক্তচক্ষুর আড়ালে অরুণ আলোর মতো দৃষ্টিটা কোথায়!

'কী, কথা বলছেন না যে!' ('কোথায় যাচ্ছ?')

'বাসে বড় ভীড়।' ('চিঠি খুঁজতে।')

'ওসব বাজে কথা রাখুন। রোজ এক কথা।' ('এই পথে যাও।')

'সত্যি বলছি।' ('ধন্যবাদ।')

'যান, নিজের সীটে যান।' ('চিঠি পেলে দেখাবে।')

দুপুরে সারা অফিস-পাড়া গর্জনে মুখর। কর্মচারীরা ভালো করে বাঁচতে চায়। আমিও ওদের সঙ্গে বেরোলাম। ওদের গর্জনে গলা মেলালাম। খাওয়ার মতো টাকা নিশ্চয়ই চাই। আর চাই চিঠিটা।

কলকাতার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালচে বাড়িগুলো গর্জনে কাঁপতে লাগল। দুলছে—ভূমিকম্পের সময়ের মতো। ঐ বাড়িগুলোর আড়ালে নতুন বাড়ি দেখছি যেন—সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাড়ি—নতুন চারাগাছের মতো।

বিকেল। বড়বাবু: 'সকালে একটু কড়া কথা বলে ফেলেছি।' ('চিঠি পেলেন?')

'না, না, ও কিছু নয়।' ('না, পাই নি।')

'কিছু মনে করবেন না।' ('পান নি! খুঁজে দেখুন, নিশ্চয়ই পাবেন।')

দারোয়ান: 'রাম রাম বাবু।' ('পেলেন।')

'রাম রাম।' ('না পাই নি।')

ট্রামের কণ্ডাকটার: 'টিকিট।' ('পেলেন?')

একজন যাত্রী: 'এখানে বসুন। চাপাচাপি করে হয়ে যাবে।' ('পেলেন?')

'বড় ভালো হোলো। পা টনটন করছিল।' ('পাই নি এখনও। পেয়ে যাব। হয়তো বাড়িতে এতক্ষণ এসে গেছে।')

মুনিয়া: 'অসিতবাবু, চিঠি পেয়েছ?'

'না রে। বাড়িতে আসে নি?'

'না তো।'

'তুই কী করে জানলি?'

'পিওন আসে নি। আমি তো জানলায় বসে।'

উমা: বাবার শরীর খারাপ। মেজপিসির মেয়ের বিয়ে। চালে বড় কাঁকর। চা নিয়ে আসি।'

রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম: কলকাতার প্রকাণ্ড কালচে বাড়িগুলো আর নতুন চারা গাছের মতো বাড়িগুলো প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কাধাক্কি করছে। মাঝে মাঝে তাতে আগুন জ্বলে উঠছে। একবার এক পক্ষ কাত হয়ে পড়ে, আর-একবার অন্যপক্ষ। প্রবল গর্জনও শুনি। যেন ঝড় বইছে। তার মধ্যে আমি আর মুনিয়া কী যেন খুঁজছি—ছোটবেলায় যেমন আমি আর সরস্বতী কালবৈশাখী সন্ধ্যায় আম কুড়োতে যেতাম।

মুনিয়া ডাকছে: 'অসিতকাকু, অসিতকাকু।'

চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

'অসিতকাকু, এই যে খবর-কাগজ।'

ছুটে বেরিয়ে চলে গেল মুনিয়া—তার ঝাঁকড়া চুল নাচিয়ে।

কাগজ: ছেলেধরা সন্দেহে একটি বুড়িকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে জনতা। এই নিয়ে বাইশজন আক্রান্ত হলো।

কাগজটা ভর্তি কঠিন কালচে লাল মুখ গিজগিজ করছে।

পুরনো কাগজের আরো অনেকগুলো কালো হরফ আমার মাথার মধ্যে

বীভৎস প্রেতনৃত্য করে : ফ্ল্যাশ। ফ্ল্যাশ। একজন তৃষ্ণার্ত হরিজনকে শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা পিটিয়ে খুন করেছে। ফ্ল্যাশ। ফ্ল্যাশ। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে মদ্যপানের পর দু-দল ছাত্র মারামারি করে। পরদিন এর জের হিসেবে কয়েক শো ছাত্র ইট ও লোহার রড নিয়ে মারামারি করে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফ্ল্যাশ। ফ্ল্যাশ। দুটি সহোদর বামপন্থী দলের প্রচণ্ড সংঘর্ষে তিনজন নিহত। ফ্ল্যাশ। ফ্ল্যাশ। টেলিপ্রিণ্টার চলতেই থাকে —আকাশ-বাতাস পাহাড়-অরণ্য দেশ-বিদেশ ভেদ করে চলে। ফ্ল্যাশ। ফ্ল্যাশ। 'অনেক দিন তোমায় দেখি না, কেমন আছ ?' 'আমি ভালো নেই সরস্বতী।' ফ্ল্যাশ। ফ্ল্যাশ। 'অসিতকাকু, চিঠি পেয়েছ ?' সেই সুন্দর চিঠিটা ?' 'না রে, বোধহয় আর পাব না।'

কাজে বেরোবার সময় খেলা ফেলে ডাণ্ডা হাতে মুনিয়া ছুটে এল। রোদে তার মুখ নতুন-গজানো কিশলয়ের মতো লাল। বলল, 'আজ চিঠি খুঁজবে ?'

'হ্যাঁ।'

আমায় নেবে সঙ্গে ?'

'আজ নয়।'

'তবে কবে !'

'তুই যখন বড় হবি, তখন।'

মুনিয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি সেই কবে বড় হব, তখন— !'

পথচারী। কনডাকটর। যাত্রী। 'কোথায় যাচ্ছেন ?' দারোয়ান। 'চিঠি খুঁজতে।' বড়বাবু। 'এই পথে যান।' ইউনিয়ন অফিস। 'ধন্যবাদ।' গর্জন। 'পেলে একবার দেখাবেন।'

গর্জন। 'পেলেন !' বড়বাবু। 'না, পাই নি।' দারোয়ান। যাত্রী। কনডাকটর। 'পেয়ে যাব।' পথচারী। 'হয়তো বাড়িতে এসে রয়েছে। জলদি, জলদি চলো।' উমা। মুনিয়া।

মেঘলা দিন। রাস্তায় হাঁটছি। হঠাৎ—'পকেটমার ! পকেটমার !' একটা ছেলেকে বহু লোক পেটাচ্ছে। মারবার লোক ক্রমেই বাড়ছে। ছেলেটা আগুনের খাঁচায় পোরা পতঙ্গের মতো একবার এদিক একবার ওদিক ছুটছে। আর ঘুঁসির দেওয়ালে নাক ঠুকে ঘুরে পড়ছে। গলগল করে রক্ত পড়ে তার ময়লা শার্ট ভিজে গেছে। হঠাৎ আমি এগিয়ে গেলাম। দু-হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে আগলাবার চেষ্টা করলাম। ছেলেটা সর্বাঙ্গে ছররা-বেঁধা ছোট

একটা রক্তে-ভেজা পাখির মতো কাঁপতে কাঁপতে আমার বুকে এল। আমার বুক রক্তে ভিজে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ও চুরি করলে ওকে পুলিশে দিন।'

'ওরে, এ-ব্যাটাও পকেটমারের লোক।'

'না, না। আমি পকেটমার নই।'

'তাহলে ওকে ঠেকাচ্ছ কেন বাবা?'

'ওকে শাস্তি দিন। কিন্তু খুন করবেন না।'

'ওরে, এই ধম্মপুত্তুরই আসল পকেটমার। মার। মার।'

চারিদিকে অগণ্য কালচে লাল মুখ। ভয়ঙ্কর। কঠিন দেওয়াল চারদিক থেকে এগোচ্ছে। সেই দেওয়ালে ঠকাঠক শব্দে মাথা ঠুকে আমায় আমার রক্তে ভিজিয়ে দিল। মুখ থুবড়ে পড়লাম রাস্তায়। মুখটায় বালি-কাদা। কে যেন আমার পা মুচড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে। এখন পারলে ওদের মাথাগুলো আমি ঐভাবে মুচড়ে ছিঁড়ে নিতাম। কিন্তু আমি বোধহয় মরে যাচ্ছি। মরার আতঙ্কে আমার দেহটা কুঁকড়ে গেল। কালচে লালের আড়ালে আমি যে আর-একটা মুখ দেখি, তা আর দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখে রক্ত। আমার মুখও বোধহয় এখন কালচে লাল।

হাসপাতাল।

'কেমন আছ?'

ধক করে উঠল বুকটা। না, সরস্বতী নয়। সে খবরই পায় নি।

'ভালো আছি, উমা।'

উমার ঠোঁট কাঁপছে। চোখের কোলে জল। বরাবর দেখছি, খুব সুখে বা খুব দুঃখে উমা নাড়া খায়, অভিভূত হয়। বাকি সময় শীতল খানিকটা অভ্যেস।

একদিন হাসপাতালে মুনিয়া এল। আমার খসখসে রুক্ষ হাতের মধ্যে তার কিশলয়ের মতো হাতটা নিলাম। ও বলল, 'অসিতকাকু, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?'

'না রে, আমার কোনো কষ্ট নেই।'

'তোমার পায়ে নাকি খুব লেগেছে! তুমি নাকি আর হাঁটতে পারবে না!'

'হ্যাঁ রে।'

'তোমার চোখে জল কেন, অসিতকাকু ?'

'একটা কষ্ট আমার আছে রে।'

'কী কষ্ট ?'

'একটা সময়—ঠিক কোন সময় তা এখন আর মনে নেই—আমি ভয় পেয়েছিলাম, আর আমার মুখটা কালচে লাল হয়ে গিয়েছিল।'

'ও হলে কী হয় ?'

'ভয় পেলে আর মুখটা কালচে লাল হয়ে গেলে চিঠি পাওয়া যায় না।'

'এখন তো তুমি ভয় পাচ্ছ না, আর মুখও অমন নেই।'

'না।'

'তা হলে ? তাহলে তো তুমি—'

'কিন্তু আমার পা !'

হঠাৎ থমকে গেল মুনিয়া। তারপর ভোরের আকাশের মতো তার মুখখানা একটু এগিয়ে আনল। বলল, 'আমি বড় হয়ে চিঠি খুঁজতে বেরোব—সেই সুন্দর চিঠি। পারব না আমি ?'

'হ্যাঁ, পারবি। পেলে আমায় একবার দেখাস।'

যান্ত্রিকতা, যন্ত্রণা ও হাল সাহিত্য

বীরেন্দ্র নিয়োগী

আমরা কেউই সমাজের ঊর্ধ্বে নই বা বাইরেও নই। সাহিত্যিকও নন। সাম্প্রতিক সাহিত্যিক সাম্প্রতিক সমাজেরই সন্তান। কথাটি ব্যাপক অর্থে সরলীকৃত সত্য। কিন্তু তবুও এ-উক্তি কিছুটা সীমাবদ্ধতা সহ বিচার্য।

এটা প্রায় সবারই জানা যে অর্থনীতি সব সমাজেরই মৌল বনিয়াদ আর শিল্পসাহিত্য এই মৌল বনিয়াদের উপরিতল। সুতরাং সেখানে সমাজের প্রাথমিক আর্থনীতিক কাঠামোর তথা রূপান্তরের এক-ধরনের প্রভাব গিয়ে পড়বেই। কিন্তু তাই বলে এটা ভাবাও ঠিক নয় যে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে একটা যান্ত্রিক সমীকরণ সকল সময়েই করা সম্ভব। সামাজিক অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিচেতনার মধ্যেকার সম্পর্ক এমন ধরনের প্রত্যক্ষ ও সরল যান্ত্রিকতার সূত্রে বাঁধা নয় যে সহজ আঙ্কিক নিয়মের সাহায্যে বলে দিতে পারা যাবে—সমাজ যেহেতু দু-ফুট বাঁয়ের দিকে বর্তমানে হেলেছে, সাহিত্যও এবার সমপরিমাণেই হেলবে; বা সমাজে যেহেতু দুর্নীতি-অবক্ষয় এই মুহূর্তে সোচ্চার, সুতরাং সাহিত্যও অধুনা অবক্ষয়বাদী হয়ে পড়বে।

চেতনা মূলত সমাজ-অস্তিত্ব-সৃষ্ট হয়েও পরবর্তী ধাপে নিজেকে কিছুটা মুক্ত করে নেয় এবং যদিও শেষাবধি সমাজের আর্থিক বিন্যাসই চেতনার চরম নিয়ামক, তবুও সমাজবিকাশের ছোট হিস্যাদার হিসাবে চেতনাও অস্তিত্বের পরিবেশের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতায় লিপ্ত হয় ও পরস্পরের পরিবর্তনে সহায়ক বা বিরোধী উভয় শক্তি হিসাবেই কাজ করতে পারে। এই অর্থে সাহিত্য-চেতনা স্বাধীন-সত্তা, যদিও সীমাবদ্ধ। সুতরাং সমাজ অস্থির, নীতিহীন এবং অনিশ্চিত হলে সাহিত্যকেও যে অনিশ্চয়তার দ্বারা ভারাক্রান্ত এবং নীতিহীন হতে হবে এমন কোনো ছক কাটা নিয়ম থাকতে পারে না। অথবা সমাজের সুস্থ বিকাশের কালেও যে পশ্চাৎবর্তী চেতনার প্রকাশ দেখা যাবে না, একথা বলাও সম্ভব নয়।

চেতনার এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা এবং মুক্তদৃষ্টির জন্তই আমরা অবক্ষয়ের কালেও সাহিত্যে অবক্ষয়-বিরোধী ধারণার প্রসার দেখি। ব্যক্তি-মানসের

উপর চরম পীড়নের কালে বিদ্রোহী চেতনার বিস্তৃতি লক্ষ্য করি।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জার্মানিতে এক সর্বগ্রাসী অবক্ষয় সমাজ-দেহের প্রায় সর্বস্তরে দেখা গিয়েছিল। সরকার রক্তলোলুপ, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি অস্তোন্মুখ, শিক্ষা অধঃপতিত; জীবনের সর্বস্তরে নীচতা এবং স্বার্থপরতার পঙ্কিল স্রোত। অথচ এর মধ্যেও কিন্তু তখন সে-দেশের সাহিত্যে এক নতুন জোয়ার দেখা গিয়েছিল। এই পচনশীল যুগেই গ্যেটে বৃহৎ মানবতার পক্ষে সোচ্চার জয়গান করে গিয়েছিলেন। সমাজ-জীবনে কোথাও আশা নেই, কিন্তু এই মহৎ সাহিত্যিক আশাকে বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরেছেন। জার-শাসিত রাশিয়ায় ঊনবিংশ শতকে যখন কৃত্রিমতা, শোষণ আর অবক্ষয় সর্বপরিব্যাপ্ত, তলস্তয়ের নিপুণ লেখনীতে তখন শুধু মানবাত্মার মহাক্রন্দনই ধ্বনিত হয় নি, বলিষ্ঠ মানবতার জয়গানও শোনা গিয়েছে।

কিছুকাল আগের বাঙলা সাহিত্যের দিকে চোখ ফেরালেও বোধহয় ঠিক একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাব। আমি চল্লিশের দশকের সাহিত্যের কথাই বলছি। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কালোছায়া পড়েছে বাঙলার আকাশে। সমাজ আকস্মিক ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ছে, লোলুপ ব্যবসায়ীর দল শকুনিবৃত্তির তাড়নায় উল্লসিত, দুর্নীতি ব্যাপক। কিন্তু তরুণ সাহিত্যিকদের এক ব্যাপক অংশ তখন কাব্যে, ছোটগল্পে এবং উপন্যাসে শুধু সামাজিক অবক্ষয়কেই চিত্রায়িত করে তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন নি। সেদিন তাঁদের রচনায় বিপুল বিদ্রোহ এই সামাজিক আর্থিক অবিচারের বিরুদ্ধে উপচে পড়েছিল। প্রগতিশীল সাহিত্যে সেদিন এসেছিল এক নতুন জোয়ার। অবক্ষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁরা কিন্তু অবক্ষয়িত হন নি।

আর, এইসব সাহিত্যকেই আমরা সৎ, মানবতাবাদী এবং প্রগতিশীল বলে জানি।

২

হালের বাঙলা সাহিত্যে কি আমরা এই একই ইতিহাস দেখছি? কিন্তু তার আগে হালের সমাজকে একটু দেখা উচিত।

অনস্বীকার্য, হালের সমাজ আরো জটিল এবং অস্থির। বিশ্ব-অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতার ঢেউ আমাদের সমাজতটে বারংবার আছড়ে পড়ছে। সমাজদেহের বিভিন্ন অংশে অবক্ষয়। আর্থিক কাঠামোর মৌল রূপান্তরের মুখে মূল্যবোধের পাত্রে বিষ উপচে পড়ছে। একদিকে মন্থরগতি পতন, অন্য

দিকে দ্রুতগতি ভাঙন—এরই দ্বন্দ্বাঘাতে অস্থিরতা, জটিলতা, আদর্শহীনতা এবং অনিশ্চয়তার প্লাবন ডেকেছে সমাজে। পরিকল্পনার দায়ভাগ বহন করছে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, কৃষক ও মজুরশ্রেণী ন্যূনতম জীবনযাত্রার হাস্যকর মানকেও বিপন্নভাবে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়ে। অথচ তারই পাশাপাশি জোয়ারের বেগে আসা আকস্মিক ফাঁপতি আয়ের সাহায্যে অত্যুচ্চ জীবনযাত্রার মান রচনা করে চলেছে পরিকল্পনার প্রসাদপুষ্ট উচ্চ আত্মভোগী ও বৃহৎ মুনাফাকারীর দল। ফলে একধরণের মূল্যবোধের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, চাকরীর সংখ্যা যৎকিঞ্চিৎ বাড়ছে বটে, কিন্তু বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সব জিনিসই পাওয়া যেতে পারে কিন্তু মূল্যস্তর উর্ধ্বগামী। আইন মূল্য-নিয়ন্ত্রণের কথা ঘোষণা করছে, কিন্তু গোপন খোলা বাজার আরো প্রসারণশীল। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার মন্থরগতি, অথচ মুনাফার এবং মূলধনকেন্দ্রীকতার হার সুউচ্চ। তরুণদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষালাভের সুযোগের ফলে তাদের প্রত্যাশার বিস্ফোরণ ঘটছে। অথচ প্রত্যাশা পূরণের পথ কণ্টকিত, সর্বক্ষেত্রে এক অদ্ভুত অসামঞ্জস্য এবং আপাতবিরোধ ক্রমবর্ধমান।

ফলে তরুণকুল ক্ষুব্ধ, মূল্যবোধ বিপর্যস্ত, সমাজ অসহিষ্ণু এবং কম্পমান। ক্ষোভ এবং অসহায়তা ক্রোধ এবং হতাশা বিপরীত আবেগ সমূহ সমাজ দেহকে নাড়া দিয়ে চলেছে।

সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্য এই পটভূমিতে লালিত হচ্ছে। এই পটভূমি থেকেই সাহিত্য তার ভাব এবং ধারণার রস আহরণ করছে। এবং সাহিত্য যদি বাস্তবধর্মী হয় তবে এ-কথাও সঠিক যে এই যুগ পরিবেশের সঙ্গে অবশ্যই সাহিত্যের সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে যেহেতু সমাজদেহে অবক্ষয়, হতাশা এবং নীতিহীনতা, তাই এ যুগের সাহিত্যও হবে সরাসরি অবক্ষয়ী, হতাশাবাদী, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, যৌনকাতর এবং নীতিহীন?

স্পষ্টতই তা হওয়া উচিত নয়। অন্তত সৎসাহিত্য তো নয়ই। কেননা সাহিত্য বাস্তব যুগবাতাবরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু সরাসরি জীবনের প্রতিবিম্ব নয়। সাহিত্য জীবন থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু ব্যাপ্তার্থে জীবনকেই নতুনভাবে গড়ে তোলার এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসী। এইখানেই চেতনার সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার সার্থক প্রকাশ। তাই পূর্বে বলেছি, সাহিত্যের পক্ষে ভাবাকাশ-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব এবং সেইজন্যই অবক্ষয়ীযুগে সাহিত্যও

অবক্ষয়ী হবে—এ আদৌ একটি সম্ভাব্য সত্য নয়। আর এখন একধাপ এগিয়ে বলি সাহিত্যভাত চেতনা বহুক্ষেত্রেই পশ্চাদ্‌মুখী যুগপরিবেশের বিরোধী হয় এবং তাই বর্তমানযুগ অবক্ষয়ী বলেই তার বিরুদ্ধে সাহিত্যিকের পক্ষে বিদ্রোহী এবং সংগ্রামী হওয়া সম্ভব এবং উচিতও।

৩

অথচ সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যের এক ব্যাপক অংশে আমরা শুধুই নীতিহীনতা, অবক্ষয়ী অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও ছটফট'নি, ধর্মীয় মরমীয়ানা এবং সর্বোপরি উচ্ছৃঙ্খল যৌনতাবোধের অসহ প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। সমাজে এ-সব-কিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে এটা স্বীকার্য ; তবু একমাত্র এগুলিই যদি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যে এবং পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে এই সব পিছুটানের মূল্যবোধেরই জয়গান করা হতে থাকে সোচ্চারে, তবে তাকে সৎসাহিত্য বলতে স্বভাবতই সঙ্কোচ জাগে।

এ-ব্যাপারে এস্টাবলিশমেণ্টভুক্ত এবং তার বিরোধী সাহিত্যিককুল—কারুর মধ্যেই খুব একটা প্রভেদ নেই। বরং প্রবীন এবং তরুণ কুলের মধ্যে অবক্ষয়কে ফোটানো নিয়ে যেন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলে এস্টাবলিশমেণ্ট তো প্রতিক্রিয়ার হাত ধরে ফেলেছেই, তরুণদেরও হাত দেখি যেন সেই দিকেই প্রসারিত।

এ-প্রবণতা ষাটের দশকে (দশক ভাগের সীমাবদ্ধ ব্যঞ্জনা ধরে নিয়ে) যেন একটু বেশি সোচ্চার। বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু, গৌরকিশোর ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ, এমনকি তারাশঙ্কর পর্যন্ত যে-পথে পা ফেলছেন, তা এই অবক্ষয় পুষ্টিরই দিকে।

সম্প্রতিকালের তারাশঙ্কর তাঁর অতীত মতেরই অসহায় শিকার। একদা সীমাবদ্ধ মানসিকতা নিয়েও তারাশঙ্কর অনুভব করেছিলেন পুরনো যুগ পাল্টে যায় ; সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় নতুন যুগের নতুন দাবির কাছে। সমাজের পরিবর্তনশীলতার ঐতিহাসিক অনস্বীকার্যতাকে সেদিন তিনি, বেদনার সঙ্গে হলেও, অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি এই ইতিহাসচেতনার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। অর্থনীতির পটভূমিতে ফেলে যুগের দ্বন্দ্বকে তিনি তখন দেখেছেন। কিন্তু আজ কি সকল দ্বন্দ্বের অবসানে যুগ একটা মহান ভারসাম্যের স্তরে এসে পৌঁছে গেছে। নাকি সরকারি

খেতাবের আশীর্বাদ-ধন্য হয়ে তিনি মহানির্বাণের স্তরে এসে উপনীত হয়েছেন। আজ তাঁর সাহিত্য সরকারী যোজনার বেসরকারী প্রশস্তির একধরণের ব্রোকার মাত্র। একথা বলতেও বুঝি আজ তাঁর দ্বিধা নেই যে দ্বন্দ্বের মধ্যে কোনো সত্য খুঁজবার প্রয়োজন নেই, ভগবানে আত্মসমর্পণই সব দ্বন্দ্ব নিরসনের চরম পন্থা। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলো এই দিকেরই ইঙ্গিতবহ। আরোগ্য নিকেতন, বিদিশা প্রভৃতি উপন্যাসগুলি এরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সাহিত্যে দ্বন্দ্ব এবং যুক্তিবাদকে বিসর্জন দিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদ এবং ঐশীলীলার প্রচারে যদি তারাশঙ্কর মুখর, তবে এরই উল্টো পিঠ যৌনতাবাদের প্রচারে বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসুদের দল উচ্চকিত। এবং এটা করা হচ্ছে আধুনিক মানসিকতা ও যুগযন্ত্রণা প্রকাশের দোহাই দিয়ে। কিছু ক্ষুব্ধ পীড়িত বা অসহায় ব্যক্তিমানসের সমস্যা কৃত্রিমভাবে ইউরোপের মাটি থেকে ধার করে নিয়ে এসে তার মধ্যে পুঁতে দেওয়া হচ্ছে যৌনতা প্রচারের বীজ। এবং তারপর লেবেল লাগিয়ে আধুনিক বলে চালান হচ্ছে। সমরেশ বসুর বিবর, প্রজাপতি, বুদ্ধদেব বসুর পাতাল থেকে আলাপ প্রভৃতি, বা গৌরকিশোর ঘোষের লোকটা—কতখানি যুগমানসকে চিত্রিত করেছে বলা শক্ত, কিন্তু যৌনতার ব্যভিচারী প্রকাশের দুঃসাহসিক রূপকেই যে এযুগে আধুনিক আখ্যা দেওয়া উচিত—এই ধারণা সৃষ্টিতেই এগুলি সচেতনভাবে প্রয়াসী। এঁরা সমাজদেহের বিকৃত আর্তিটাই দেখেন, বলিষ্ঠ সংগ্রামের ছবিটা এঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। রাজনৈতিক জগতের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এই দশকের মানুষ কি তীব্র সংগ্রাম করেছে এবং একটু একটু করে জয়লাভ করছে, তা তাঁদের দর্পণে ধরা পড়ে না এবং তাঁদের উদ্বুদ্ধও করেনা। কিন্তু কেন্দ্রীভূত শহরের কিছু উৎকেন্দ্রিক মানুষের বিকৃত মানসিকতাকেই সার্বজনীনতার চেহারা দিয়ে এবং তার সঙ্গে হয়তো সচেতন প্রচারের প্রয়োজনেই বৃহৎ পুঁজির দাসত্ব স্বীকার করে নিয়ে খুন ও রমণের মানসিকতাকে এঁরা ছড়িয়ে দিতে তৎপর হন। একে তুলে ধরেও যে এর বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা গড়ে তোলা যায়, তা তাঁদের মাথায় আসে না; কারো কারো ক্ষেত্রে বোধহয় সচেতনভাবেই আসে না।

কিন্তু তরুণকুলের এক ব্যাপক অংশও যদি এই একই মানসিকতার অনুরূপ শিকার হন তবে সেটাই হয়ে ওঠে দুঃখের কথা। অথচ আশ্চর্য, ঠিক সেটাই ঘটছে। অসহায়, নির্জন বা ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, বিদ্বিষ্ট বলে আজ যে তরুণ সাহিত্যিক দল নবযুগ-মানসিকতার প্রচারক বলে পরিচিত, তাঁরাও

মূলত সমাজদেহের অবক্ষয়কেই চরম এবং অপরিবর্তনীয় ভেবে সংগ্রামী মনোভাব ত্যাগ করে হয় গোটা সমাজকেই ব্যঙ্গ করেন ও আঘাত করতে চান সমস্ত অসহায়তা নিয়ে, নতুবা সরে এসে যৌনতাকেই একমাত্র আশ্রয় ভেবে নিয়ে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেন। পরোক্ষে এও প্রতিক্রিয়ারই ভজনামাত্র। এঁরা প্রতিকূল বিশ্বে ব্যক্তি-অসহায়তার তত্ত্বের দোহাই দেন অথবা সাম্প্রতিক কৃত্রিম পচাগলা সমাজ-জীবন ক্ষুধার পরিতৃপ্তির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ভেবে তাকে উপহাস, বিদ্রূপ, বা ব্যঙ্গে মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্তু কেউই শেষাবধি ব্যক্তিবিদ্রোহের নিঃসঙ্গ রূপ ছাড়া সার্বিক সামাজিক সংগ্রামের দিকটাকে তুলে ধরতে চান না। তাই এঁরাও এস্টাবলিশমেণ্টের চাটুকারই হোন আর তথাকথিত বিদ্রোহীই হোন, শেষ পর্যন্ত অবক্ষয়ের দোসর হয়ে প্রগতিশীল শক্তির বিরোধী ক্যাম্পেই অবস্থান করেন। নব্যতা বা তারুণ্যই প্রগতির মাপকাঠি নয় কখনো। এঁদেরও সং বা প্রগতিশীল সাহিত্যিক বলে অভিহিত করা তাই সম্ভব নয়। এঁরা হয়তো বলতে পারেন যে সমাজের বিপর্যস্ত চেতনার দ্বারা এঁরাও বিধ্বস্ত, অথবা আজ আর ব্যক্তি-স্তরের বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোনও বিদ্রোহ থাকতে পারে না। কিন্তু এর কোনোটাই সত্য নয়। সং সাহিত্যিক কখনো সমাজকে ফোটাতে গিয়ে সমাজের বিপর্যস্ত চেতনার দ্বারা জীর্ণ হয়ে যান না। বরং সাহিত্যের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে সৎ সাহিত্যিক সমাজের চেতনার গভীরে শিকড় চালিয়ে রস সংগ্রহ করেছেন যা শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে এবং অত্যাচারিত শ্রেণীর স্বপক্ষে হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং মানবসভ্যতার সোনালী ভবিষ্যতের আশাকেই পুষ্ট করেছে।

সুতরাং আজ যখন বাঙলা সাহিত্যে অবক্ষয়ের মোটা তুলির পোঁচ চড়ানো হচ্ছে, তখন তাকে সমাজোদ্ভব বলে নিশ্চিন্ত হওয়া নিছক যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া আর কিছু নয়। বা হয়তো আরো একটু বেশি—তা প্রতিক্রিয়ারই পথ।

তাই যখন সচেতন পাঠকসমাজ ক্রুদ্ধদের চীৎকারে হতচকিত হন, যৌনতার স্থূল অঙ্কনপ্রয়াস দেখে আতঙ্কিত হন এবং ফলে আধুনিক সাহিত্যের এক বিরাট ঢক্কানিনাদিত অংশকে অপাঠ্য ঘোষণা করতে ইচ্ছুক হন, তখন তাঁদের অনিচ্ছুক মানসিকতাকে 'আধুনিক' বলে উড়িয়ে

দেবার সম্পূর্ণ উপায় থাকে না। হয়তো এ-যুগের অনেক পাঠক যুগ-চেতনার সমান্তরালে হাঁটতে পারছেন না, বা কেউ কেউ হয়তো পিছিয়ে পড়া মধ্যযুগীয় মানসিকতার শিকার। কিন্তু এঁরাই তো আর পাঠক সমাজের সবটুকু নন। পাঠকদের প্রগতিশীল অংশ অবক্ষয়কে চেনেন এবং চেনেন বলেই তার বিরুদ্ধে ধিক্কার ও বিদ্রোহ দেখতে চান, কেননা জীবনেও তাঁরা এই বিদ্রোহেরই অংশীদার। কিন্তু তাঁদের প্রত্যাশা যখন ক্ষুণ্ণ হয় সাম্প্রতিক প্রলাপী সাহিত্যের ধাক্কায়, তখন তাঁদের অভিযোগ তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তাই সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে যদি পাঠক-লেখক বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবার উপক্রম ঘটে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র

অসীম রায়

গরমের রাত। কলোনির লোকজন সবাই ঘুমোয় নি। মাঝে মাঝে হাওয়া উঠে হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর তারই সঙ্গে রাস্তার পাশে চূড়ো করে জমানো পাঁকের গন্ধ আসে। ফেলুর মা রাতকানা। কিন্তু অন্ধকার তক্তাপোষের পাশে কুঁজো থেকে জল গড়াতে অসুবিধে হয় না। অন্যদিন জল গড়িয়ে মাজা বেঁকিয়ে সরে আসেন, কিন্তু আজ কিছু না ভেবেই পিঠটান করে উঠতেই শক্ত থলিটা পিঠে লাগে। বুঝতে পারেন না ওটা পেঁপের থলি না বোমার থলি। ফেলু দুটো থলিই দিয়েছিল সকালে। পায়খানার গায়ে যে পেঁপে গাছটা ঝুম ঝুম করছে পেঁপেতে তা থেকে পেঁপে পেড়ে থলি ভর্তি করে দাওয়ায় উঠে মা-কে ফেলু বলে 'ভালো কইরা দেইখ্যা লও। দুইডা দুইরকম। একটা বড়, একটা ছোটো। ভালো কইরা দেইখ্যা লও।'

ফেলুর মা এবার ঘুমোবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠিক এই সময় দরজায় ধাক্কা পড়ে। নাঃ, ফেলু না। ফেলু এসে ডাক দেয়। ফেলুর মার মনে হল পুলিশ। কিন্তু বাহির থেকে শান্ত গলায় হুকুম এল, 'আমি বেন্টু, দরজা খুলুন।'

ফেলুর মা ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে দরজা খুলে দেন। বাহিরে রাস্তার আলোয় নীল বুশশার্ট খাকি প্যান্ট পরা তিরিশ বছরের এক যুবককে দেখা যায়। রোগা ঢ্যাঙা ছেলেটা দু-পা এগিয়ে আসে। তারপর স্থির শান্ত গলায় বলে, 'আমি ফেলুকে খুন করেছি। পুলিশে জানালে বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।'

হাল্কা পায়ে মিলিয়ে যায় ছোকরা। ফেলুর মা-র পাশে তার ছোট ছেলে রতন। আতঙ্কে তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। ফেলুর মা অন্ধকারে ছুটে যান। অভ্যস্ত হাতে এক হেঁচকায় থলিটা নামিয়ে রতনের হাতে দিয়ে বলেন, 'আমার রক্ত যদি তর গায়ে থাকে তবে উয়ারে মার এহনই। কি! ভিরমি খাইয়া পড়লি? যা, দৌড়া!'

অন্ধকারেও টের পাওয়া যায় রতন কাঁপছে। চৌদ্দঘোড়া রিভলভার যে চালায়, অবলীলাক্রমে ছুটন্ত ট্যাক্সি থেকে পুলিশ অফিসারকে মেরে বছরের

পর বছর হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, যে থানায় ঢুকলে থানা অফিসার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন সেই মুকুটহীন রাজা বেণু বিশ্বাসের সামনে দাঁড়াতে হবে ভেবে তার জিভ শুকিয়ে যায়।

'বুঝছি। তরে দিয়া কিস্সু হইব না। আমার বি-কম পাশ ছাওয়াল রে! আমার ইস্কুল মাস্টার ছাওয়াল!'

এতক্ষণ পর ফেলুর মা কাঁদতে বসেন। অন্ধকারে মেঝেয় বসে বিলাপ করেন। আর সেই ভাঙা বাঙাল বিলাপ শুধু ফেলুর জন্য নয়, মূলত তাঁর শ্বশুরের ভিটের জন্যে। ষোলো-সতেরো বছর আগে হঠাৎ এক রাত্তিরে হুড়মুড় করে গহনা নৌকায় উঠে তাঁদের সেই পূর্ববাঙলা থেকে চলে আসার দিন, শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকার দিন, তারপর এই উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে কাদায় বৃষ্টিতে হোগলার নিচে বছরের পর বছরের অস্তিত্ব—এইসব মিলে মিশে এই বিলাপ। এই সবে পয়সার মুখ দেখছে তারা। ফেলু অনেক দিন যাবৎ এদিক ওদিক করে শেষ পর্যন্ত বেণুর সঙ্গে ভিড়েছিল। তাদের ঘরে মালগাড়ি এসেছে মা লক্ষ্মী হয়ে।

পাথরের মতো চৌকাটে বসেছিল রতন। ঘণ্টা খানেক বিলাপের পর তার মা উঠে আসেন।

'ছাখ, কি হইল। দাদাটার কি হইল একবার ছাখ, একবার খুইজ্যা দেখ।'

কিন্তু রতন নড়ে না, তার চোখ তখনও আতঙ্কে স্বাভাবিকতা পায় নি।

'তুই কি করস? অরে আমার ইস্কুল মাস্টার পোলা! তুই কি করস?'

এতক্ষণ পর ছেলেটা নড়ে চড়ে বসে। রতনের বয়স কুড়ি একুশ হবে। পাশের কলোনির হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে পড়ায়।

হঠাৎ খেপে উঠে, হাত দুটো মা-র সামনে নাচিয়ে বলে, 'ফেলু ফেলু ফেলু! আমি কিছু করি নি! পাঁচ টাকা দশ টাকা করে মাস মাস টিউশনি করলাম। ফেলুর মতো মালগাড়ি ভাঙার দলে নই বলে কি আমরা মানুষ নই?'

'তুই মাইয়ালোক। তুই পারস ফেলুর মতো বাড়ি বানাইতে?' ফেলুর মা পাকা মেঝেতে লাথি মারেন।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে রতন। তারপর নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে যায়।

লুঙ্গি ছেড়ে কালো প্যাণ্ট পরে। তারপর বাতায় গোঁজা ফেলুর বহু ব্যবহৃত সঙ্গীটাকে পায়ে বেঁধে নেয়।

'কই যাস?' বসা গলায় রতনের মা হাঁক দেন। রতন জবাব দেয় না।

তাদের নতুন টিনের চালে জ্যোৎস্না আটকে আছে। একটা বেঁটে নারকেল গাছ দুবছর হল ফল দিচ্ছে, সেটা হাওয়ায় মড়মড় করে ওঠে। রতনের মা বলেন, নারকেল গাছটাই তাদের ভাগ্য ফিরিয়েছে। যেবার তার জালি পড়ল গাছে, ঠিক সেই সপ্তাহেই ফেলু চার হাজার টাকার স্টিল রড ভাঙলে মালগাড়ি থেকে। রতন জানে এ সমৃদ্ধি তার সারাজীবনের আওতার বাইরে। তার একশো চল্লিশ টাকার মাইনেতে তাকে আরও চার-পাঁচটা বাড়ির মতো কাঁচা মেঝেয় কিংবা শান বাঁধানোর ব্যর্থ চেষ্টায় আরও কদাকার মেঝেতে শুয়ে দিন কাটাতে হত।

রতন বাড়ির বাইরে এসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। দাদার এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে তার গত কয়েক বছরের সমস্ত ভাবনাচিন্তা একেবারে ওলোটপালোট লাগে। পাশে দুখানা টিনের চালওয়ালা বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ। এখানেই বেণুর আড্ডা। দ্বিতীয় বাড়িটা দীপ্তি দাসের, বেণুর মৈত্রি। বেণু মাঝে মাঝে এ-বাড়ি আসে। রতন আঁচ করে দীপ্তিকে নিয়েই হয়তো গণ্ডগোল। বাড়িটার কাছে আসতেই আর-একবার থমকে দাঁড়ায়। দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো গরমের হাওয়া উঠে আসে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো। পাক খেতে খেতে শুকনো পাঁক মেশানো ধুলো রতনের নাকে মুখে ঝাপটা দেয়। এরপর একটা আধবোজা পুকুরের সহসা উপস্থিতি। সেই ঘোলো জলে চাঁদের আলো দেখে বুকের ভেতরটা রতনের একবার শিরশির করে ওঠে। জল ছেঁচলে বোধহয় দুটো মানুষের কঙ্কাল এখনও বেরোতে পারে। এরপর পাঁচ-ছখানা টালির বাড়ি। এরা কিছু করতে পারল না। কুড়ি বচ্ছর জিলিপি আর বাসি ছানার মিষ্টি করে কাটিয়ে গেল। কিন্তু এদের দু-তিনটে ছেলে ইতিমধ্যেই ফেলুর সাকরেদ হয়েছিল। পাকিস্তান থেকে চোরাই সুপুরি আর চাল এলে সেগুলো ছেনতাই করত। এ-বিজনেসটা ভারত-পাক যুদ্ধের আগ পর্যন্ত বেশ চালু ছিল। ট্রেন থেকে মেয়েদের দল যখন মাল পাচারে ব্যস্ত, তখন তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের নেতা ছিল ফেলু। তারপর ব্যবসাটা একদম ফেল পড়ে গেল। ফেলু ভিড়ল বেণুর দলে।

এবার বড় রাস্তা। দুটো লরি হু হু করে বেরিয়ে যায়। একটা কুকুর চাঁদের

দিকে চেয়ে বিলাপ করতে শুরু করে। রাস্তার দুধারে টালি-খাপরার সার বন্ধ দোকান। মোড়টায় এসে থমকে দাঁড়ায় রতন। ঠিক যা ভেবেছিল তাই। রামপ্রসাদ বসে আছে। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনে খাটা ড্রেন আর ছাইগাদার পাশে দুটো নতুন র‍্যালে সাইকেল তাদের শোভার প্রকাণ্ড বৈপরীত্যে ঝলমল করছে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় রামপ্রসাদের দৃষ্টি দোকানের ভেতরে নয়, রাস্তার দিকে। তার চোখ পাহারা দিচ্ছে দোকানের গায়ে চওড়া' গলি, থানায় যাবার গলি।

রতন ফেরে। সরু কাঁচা শুকনো কাদায় অসমান গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাশের কলোনিতে পড়ে। আবার বড় রাস্তা। গ্যারাজমুখী খালি বাস বেরিয়ে যায়। একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ডাকতে ডাকতে থামে। রতন রাস্তা পেরোয়। পেরিয়েই বন্ধ মাংসের দোকান। দোকানের পাশে ঘাসের এককোণে পাঁঠার রক্ত কালচে হয়ে জমে আছে। রিক্সা স্ট্যাণ্ডে এখনও সবাই ঘুমোয় নি। গাঁজার কলকে হাতে গোল হয়ে কয়েকটা মানুষ। একটা মিশমিশে কালো ঢ্যাঙা লোক কলকেতে সজোরে টান দেওয়ায় তার মুখের একপাশ আলো হয়ে ওঠে। সেই আলোকিত গালের দিকে সাবধানে এক নজর তাকায় রতন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হাঁটতে হাঁটতে পিঠ ঘেমে গেছে। থানার পেছনের গলি দিয়ে নিঃশব্দে বারান্দায় উঠে আসে রতন। শান্ত্রী ঢুলছিল চেয়ারে বসে বসে। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দুটো স্ট্যাবিং কেস চুকিয়ে বড়বাবু এই মিনিট পনেরো ফিরেছেন। ফ্যানের নিচে শার্ট খুলে গা এলিয়ে নিবিষ্ট মনে নাক খুঁটছেন, রতনকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

'কি ব্যাপার ? এত রাতে ? কটা বেজেছে জানেন ?'

'বেণু আমার দাদাকে খুন করেছে।'

ক্লান্তিতে বড়বাবু অজিত বিশ্বাসের হাই উঠছিল। মাঝপথে হাই বন্ধ হয়ে যায়। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন আগন্তুকের দিকে।

'বেণু এসেছিল, মাকে বলে গেল সে ফেলুকে খুন করেছে, বলে গেল, পুলিশে খবর দিলে ঘর জ্বলে যাবে।'

এবার ছোকরাকে চিনতে পারেন বড়বাবু। এ অঞ্চলের সমস্ত রাফ্‌দের তিনি মুখ চেনেন। রতন এ দলে নেই সে কথাও বিলক্ষণ জানেন।

রাত্তির দেড়টায় আবার একটা নতুন ঝামেলা পাকিয়ে উঠেছে ভেবে

খিঁচিয়ে উঠলেন। 'তা এসেছো কেন? ঘর যদি জ্বলে যাবে তবে এসেছো কেন?'

পাশে যে সাবইন্সপেক্টরটি সামনে লম্বা খাতার হলদে পাতা ভর্তি করছিল সে কলম থামিয়ে বললে, 'লিখে নেব স্যর?'

'তুমি তোমার কাজ করো।'

সে ছোকরাও বোধহয় এইটিই চাচ্ছিল। সে খাতা বন্ধ করে টেবিলের ওপর মাথা রেখে শোয়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ ওঠে।

অবসাদে পা টলছে রতনের। সামনের চেয়ারটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'বসতে পারি?'

'বিলক্ষণ! এখন হাতে ছুরি থাকলেও তাদের চা খাওয়াই। সিঙ্গাড়া চলবে?' বড়বাবুর গলায় চাপা ঠাট্টায় রতন চটে।

'একটা কিছু করুন। একটা লোক খুন হয়ে গেল আপনার চোখের সামনে।'

বড়বাবুর বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ। কুচকুচে কালো দীঘল পেশীস্বচ্ছল চেহারা। হাতে ঘাড়ে অতীতের ব্যায়ামচর্চার স্পষ্ট ইঙ্গিত। রতনের কথা শুনে বড়বাবু শরীরটা গুটিয়ে নেন। যেন প্রতিপক্ষের আক্রমণ রুখছেন।

'আমার চোখের সামনে?'

'আমি তো বলছি, আমার দাদাকে খুন করেছে। খুনী নিজে এসে বুক ফুলিয়ে বলে যাচ্ছে বাড়ির ওপর। আর তাই সহ্য করতে হবে আমাদের?'

'নিজের চোখে দেখেছো?'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে যায় রতন। তার কচি পাতলা গোঁফ আঁটা ছোট মুখখানায় আত্মবিশ্বাসের অভাব স্পষ্ট।

'আমি শুনেই দৌড়ে এসেছি থানায়।'

'বাঃ বেশ!' এতক্ষণের চাপা হাইটা এবার প্রবল প্রত্যয়ে ঠেলে ওঠে বড়বাবুর মুখ দিয়ে। দুবার তুড়িও দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'তার মানে আপনারা কিছু করবেন না?'

'না।

রতন উঠে পড়তে যাচ্ছিল। অজিত বিশ্বাস বললেন, 'বোসো বোসো। তোমার নাম রতন, না? ইস্কুল মাস্টার না? দেখেছো, সব খবর রাখি।'

চারমিনার সিগারেট ধরান বড়বাবু। রতনের দিকে খোলা প্যাকেটটা

ঠেলে দিয়ে বলেন, 'তুমি ভালো লোক। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে তো কোনো গণ্ডগোল নেই বাবা। তুমি এর মধ্যে আসছো কেন? কাল ইস্কুল বন্ধ?' নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে করতে বললেন।

'ফেলু আমার দাদা।' নীচু গলায় বলে রতন।

'তা তো নিশ্চয়।' আবার এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে শূন্যে তুড়ি দিয়ে ছাই ফেলেন বড়বাবু। 'তবে সেতো খুব ভালো লোক ছিল না, নিজেই বলো।'

ঠিক এই জায়গায় এলেই রতন এক প্রবল ব্যথায় অবসন্ন বোধ করে। দাদা গুণ্ডা একথা সে খুব ভালোভাবে জানে। কিন্তু তার আশা ছিল দাদা শোধরাবে। ফেলু বিয়েথাওয়ার কথাও ভাবছিল, সংসার পাতবার কথা ভাবছিল। রতনের আশা ছিল সে যদিও তর্ক করে তাকে শোধরাতে পারবে না, কিন্তু সময়ের চাপে অবস্থার গতিকে সে অন্য মোড় নেবে।

'গুণ্ডারা তো মারামারি করেই মরে।' অজিত বিশ্বাস সামনের খোলা লম্বা খাতাটা বন্ধ করেন। পুরনো তেলচিটে দেয়াল ঘড়িটায় ঘড়ঘড়ে দুটো বাজার শব্দ আসে। বোধহয় বড়বাবু তাল করছেন উঠবার।

মস্ত লম্বাচওড়া টেবিলটার ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে রতন বলল, 'বেণু দাসও তো গুণ্ডা।'

'হ্যাঁ গুণ্ডা। তবে গুণ্ডারা বড় হয়ে গেলে তারা আর গুণ্ডা থাকে না।'

'তারা কি হয়?'

'তারা? তারা তখন রাজা। আমরা তাদের হুকুম তামিল করি।' সুন্দর ঝকঝকে দাঁতের পাটি বার করে অজিত বিশ্বাস হাসেন।

রতন এবার সোজা হয়ে বসে। একটা প্রবল রাগ পাক খেয়ে তার গলা পর্যন্ত উঠে আসে।

'যদি গুণ্ডাদের সেলাম বাজান, তাহলে অত ঠাট করে কোমরে রিভলভার এঁটে ঘুরে বেড়ানোর কি দরকার?'

বড়বাবু রুমাল বের করে তাঁর গাল কপাল গলা ঘাড় আগাপাস্তালা মুছতে শুরু করেন। নিজের মনে বিড়বিড় করেন, 'আজকের ঘুমটাই শালা গেল!' তারপর রতনের দিকে চেয়ে বলেন, 'বলছি,' আবার একটা সিগারেট ধরান। চোখ বন্ধ করে ধোঁয়া ছাড়েন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে স্বগতোক্তির স্বরে বলতে থাকেন, 'আমি শিকদার নই ভাই। শিকদার জানো তো? কানুর গুলিতে মরল। তারপর মড়ার পর মেডেল পেল। আমি ভাই মরার পর মেডেল

পেতে চাই না। শিকদারের তুই ছেলের কি হয়েছে জানো? পুলিশ অফিসারের ছেলে। ওয়াগন ভাঙার ট্রেনিং পায় নি। এ অঞ্চলে যদি থাকত, তোমার দাদার দলে ভিড়ে যেত। আমরা ভাই ছাপোষা মানুষ, খেয়েপড়ে বাঁচতে চাই। বেণুকে অ্যারেস্ট করা কি আমার কাজ? বেণুকে কে পারে অ্যারেস্ট করতে? মিনিস্টার পারে? স্বয়ং ভগবানও পারবে না। ওঁরা ক্ষণজন্মা পুরুষ। এ অঞ্চলে যেখানেই যাবে সেখানেই বেণু। এই থানায় বসে বসে মা ঃরাতে সেই বেণুধ্বনি শুনছি আর কাঁপছি।'

'আপনারা এত অথর্ব, এত অসহায়?'

'হ্যাঁ স্যার। আমার যে হাত পা বেঁধে রেখেছেন স্যার। তাছাড়া....' হঠাৎ গলা খাটো করে বড়বাবু বলেন 'কানু তো আবার আসবে কবছর-পর।'

আবার একটা অসোয়াস্তি বমির মতো পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। রতন প্রায় চীৎকার করে বলে, 'সে লোকটার তো যাবজ্জীবন হয়েছে, তবে?'

'আবার তো ফিরবে।'

এবার তীক্ষ্ণ গলায় রতন বলে উঠল, 'আপনি কি বলছেন বড়বাবু? অতো বছর পরও আমাদের দেশের অবস্থা এমনিই থাকবে?'

বড়বাবুর প্রকৃতপক্ষে ঘুম ছুটে গেছে। চোখ ছুটো লাল হয়ে উঠলেও হাই উঠছে না বোধহয় ক্রমাগত সিগারেট খাওয়ার দরুণ। জুত করে চেয়ারে পা তুলে বসে জিজ্ঞেস করেন, এক একটা কলোনিতে ক-টা করে লোক আছে বলো তো?'

রতন বিরক্ত হয়ে বলে, 'এসব কথা কেন?'

বড়বাবু সে কথায় কান না দিয়ে বলে যান, 'এক-একটা কলোনিতে পাঁচ ছয় সাত হাজার লোক, এরা যখন এল তখন সুরুই করল তাদের জীবন জবর-দখল দিয়ে, বুঝলে? চাকরি নেই, ব্যবসা নেই, রাস্তা নেই, আলো নেই। সাপ মশা পাঁক। এখানে যদি ক্রাইম না হবে, কোথায় হবে? তার ওপর ঘরে ঘরে সোমত্থ মেয়ে—সবাই এক একটা বোমা। আরে ফেলুও তো মরল ঐ তোমাদের বাড়ির পাশের দীপ্তি দাসকে নিয়ে। মাঃ! আর কতো দেখব!' শেষ বাক্যটা এবার বিশাল হাইয়ে তলিয়ে যায়।

রতন চেঁচিয়ে ওঠে। এতক্ষণের রাগ, ক্ষোভ, অবসাদে সে ফেটে পড়ে,

'আপনার ওসব কচকচি ছাড়ুন বড়বাবু। দাদা রাস্তায় পড়ে আছে, আপনারা কিছু করবেন ?'

এবার চেয়ার থেকে পা নামিয়ে খাড়া হয়ে বসেন অজিত বিশ্বাস। চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি, তোমার মা, কোর্টে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে বেণু তোমাদের বলেছে সে খুন করেছে ফেলুকে ?'

বড়বাবুর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে রতনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাদের বাড়ির কাছেই সেই বেনো জলে চাঁদের আলো। আর সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়া শিরশির করে।

'তোমার মা পারবে ?'

রতন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

'তবে ? এতক্ষণ যে এত চেঁচামেচি করছিলে, এবার কি ? একটু সাহস দেখাও। ভয় কি! তুমি পার্টি করো না ? আমি সব খবর রাখি। যাও, তোমার দাদাদের কাছে যাও!' চাপা উল্লাসে চকমক করে বড়বাবুর চোখ।

'তাই যাব।'

'যাবে ? ভয় করবে না ? যে তোমাদের এত করেছে তাকে গুণ্ডা বলবে ? অ্যাঁ ?'

'আমাদের পার্টি গুণ্ডাকে প্রশ্রয় দেয় না।'

বড়বাবু উঠে পড়েন। 'বাড়ি যাও বাড়ি যাও। আজ রাতটা থাক। লাশ থাক ওখানে।....শেয়াল এক আধটা থাকতে পারে....ও কিছু হবে না। ভোরে গাড়ি যাবে।'

জড়ভরতের মতো রতন বসে থাকে। এতক্ষণ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মাঝখানে সে যেন আশ্রয় পেয়েছিল। এখন আশু কর্তব্য কি ভেবে পায় না। এখন-সে কি করবে ? ফেলুর লাশ বাড়ি নিয়ে আসবে, না.... কিন্তু অধীরদার বাড়ি এত রাতে ?

বড়বাবু উঠে পড়েন। ঘেমো শার্টটা শুকিয়েছে কিনা আলোর দিকে পরীক্ষা করেন। তারপর সেটা দলা পাকিয়ে তুলে নেন। বারান্দায় তাঁর গেঞ্জিপরা ফর্সা পিঠখানা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

এতক্ষণ যে সাব ইন্সপেক্টরটি কুঁই কুঁই করে সুরেলা নাক ডাকছিল, তাদের কথাবার্তার সঙ্গে তাল রেখে সে হঠাৎ উঠে বসে। চোখ কচলিয়ে

দুহাত শূন্যে তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে, 'যান, যান, ভোরে ট্রাক পাঠামু, যান!'

রাস্তায় নেমে রতন ঠোক্কর খায়। চাঁদ অস্ত গেছে। অন্ধকার আকাশে কয়েকটা অস্পষ্ট ম্লান তারা মিটমিট করছে। দিকভ্রষ্টের মতো হাঁটতে হাঁটতে প্রায় রামপ্রসাদের দোকানের গায়ে এসে উঠছিল। তারপর পেট্রোম্যাক্স আলোর গায়ে হাসির আওয়াজ উঠতেই তার তন্দ্রা কাটে। রতন পেছন ফেরে। এবার কাঁচা রাস্তাটা অন্ধকার। আবার আধবোজা পুকুর। বাজপড়া একটা নারকেল গাছের ডগা ঝুঁকে আছে জলের দিকে।

রতন দাঁড়িয়ে পড়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়। কাছে পিঠেই মদ চোলাইয়ের গোপন কারখানা। কাজ পুরোদমে চলছে। রতন লক্ষ্যভ্রষ্টের মতো হাঁটতে থাকে পাশের কলোনি দিয়ে। খেয়াল নেই একটা গলি ভুল করে তাদের ইস্কুলের গলিতে এসে পড়েছে। লম্বা টিনের চালের শূন্য দাওয়া অন্ধকার খাঁ খাঁ করে। পা ধরে গেছে রতনের। অন্ধকার দাওয়ায় এসে বসতেই একটা সাদা পাটকেলি বড় দেশী কুকুর তার কাছে এসে লেজ নাড়াতে থাকে। রতন অন্যমনস্কভাবে তাদের ইস্কুলের ভুলুয়া কুকুরটার মাথায় হাত বোলায়। কাল সকালেই ক্লাস ফাইভের অঙ্কের ক্লাস। বত্রিশ প্রশ্নমালার ঐকিক নিয়মের অঙ্ক। রতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে ওঠে। এবার আর সে ইতস্ততঃ করে না। সামনে যে দুটো রাস্তা বেরিয়েছে তার বাঁ-টা ধরে এগিয়ে সোজা সাদা একতলা বাড়িটার দাওয়ায় উঠে আসে।

রাস্তার গায়েই ঘরখানায় তক্তাপোষের এককোণে অধীর চ্যাটার্জি শুয়ে।

'অধীরদা অধীরদা, আমি রতন।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা ঝাড়ার শব্দ। 'দাঁড়াও, আলো জ্বালি।'

আলো জ্বেলে লুঙ্গি আঁটতে আঁটতে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন বছর পঞ্চান্ন বয়সের একজন লোক। গেঞ্জির ওপরে কণ্ঠার হাড় উঁচিয়ে আছে। চশমা ছাড়া বলেই চোখদুটো ঘোলাটে, দৃষ্টিহীন। ঘরে রতনকে ডেকে তক্তাপোষের কোণে বসতে বললেন। একেবারে নিরাভরণ ঘর। দেওয়ালে লেনিনের ছবি। বাড়িতে কাচা সাদা শার্ট আর ধুতি দেয়ালে টাঙানো। অধীর চ্যাটার্জি বিয়ে-থাওয়া করেন নি। আগে কলোনির

আরও ভেতরের দিকে ছিলেন। দশ বছর হলো বোনের বাড়িতে এই ঘরটায় বাস করছেন।

অধী দা আরও কয়েকবার গলা ঝাড়েন। নিজের মনে বিড়বিড় করেন, 'সর্দিটা এখনও ওঠে নি।'

'দাদাকে বেণু খুন করেছে।'

বহুদিনের অভ্যাসমতো বিড়ি ধরান অধীরদা। আস্তে আস্তে বলেন, 'বেনু এসেছিল?'

'হ্যাঁ। বাড়িতে এসে বলে গেছে।'

আবার কাশেন, গলা ঝাড়েন। 'সর্দ্দিটা এখনও যাচ্ছে না, বুঝেছো?' নিজের মনেই বলেন।

রতন হঠাৎ অধীর হয়ে বলে, 'আমাদের কি কোনো রাস্তা নেই অধীরদা? ঐ কানু আর বেণু এরাই যেরকম চালাবে তেমনি সব চলবে? লেনিন স্ট্যালিন মাও সে-তুঙ এর কি মানে আছে?'

এবার চশমার খাপটা বালিশের তলা থেকে বার করেন অধীরদা। গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। চশমা পরতেই শীর্ণ মুখে চোখদুটো জলজল করে উঠে।

'উত্তেজিত হয়ো না রতন। উত্তেজিত হয়ে কি করবে? তুমি তো আর বাইরের লোক নও। বাইরের লোকদের মতো কথা বোল না।'

কিন্তু এই শান্ত ধীর গলায় অস্থিরতা বোধ করে রতন। যা কোনো দিন সে স্বপ্নেও ভাবে নি ঠিক তাই করলে। ক্ষ্যাপার মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরকম ব্লাফ দিচ্ছেন কেন অধীরদা? বলুন খোলাখুলি, আপনারা বেণুর হাতের পুতুল। তাহলেই ব্যাপারটা চুকে যায়।'

'বেণু খুব খারাপ কাজ করছে। দেখা হলেই আমি তাকে বলব।'

'ব্যস, আপনার কর্তব্য চুকে গেল, না?'

বিড়িটা কয়েকবার শেষটান দিয়ে জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে ছুঁড়ে দেন। আবার ধীর গলায় বলেন, 'তুমি আজ যাও রতন। এখন যাও। লাশ বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করো। আমার ভোর পাঁচটায় গেট মিটিং আছে রসিকলালের ফ্যাক্টরিতে। একটা গোলমাল হতে পারে। আমি সেখান থেকে সোজা আসছি।'

'তার মানে আপনার দ্বারা কিস্‌সু হবে না, কিস্‌সু না,' ঠিক যেভাবে তার মা তাকে বলেছিলেন অবিকল সেই ভাবে রতন বলে।

'দ্যাখো রতন, বিশ বছর এখানে পড়ে আছি। কেউ আমাকে এভাবে কথ বলে নি' হঠাৎ তাঁর গলা চড়ে যায়, 'এই জলকাদায় বনবাদারে লাঠি হাতে দাঁড়াতে কে শিখিয়েছে? কোন শালা এখানে এসেছিল হামলা ঠেকাতে কোনো মিঞা আসে নি। আমি ব্লাফ দিচ্ছি, আমি বেণুর হাতে পুতুল? ও সব কথা বাইরে বোলো। খবরের কাগজে ফলাও করে লেখো। যারা আমাদের সম্পর্কে দিন রাত কুৎসা ঢালছে তাদের দলে ভেড়ো। এখানে কেন?' রতন চুপ করে থাকে। অধীরদা যা বললেন তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। এই কাদায় বাঁশ দরমা বেঁধে যেখানে কলোনি গড়ে উঠেছে সেখানেই অধীর চ্যাটার্জি তাঁর বরাভয়ের হাত প্রসারিত করেছেন। সরকার থেকে বাড়ির জন্য ঋণ, স্কুলের জন্য গ্রাণ্ট আদায় এ সমস্তের মূলেই তিনি।

'আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে অধীরদা', রতন মৃদুগলায় বললে, সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে দেয়, 'কিন্তু বেণুর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন না?'

'নাঃ! বেণুকে আমাদের দরকার।'

'যেমন আপনাদের প্রতিপক্ষের দরকার ছিল কানুকে। তাহলে কাগজে কাগজে যে লেখে আমাদের পার্টি গুণ্ডা পোষে তাই ঠিক ?'

'কাগজে আমি পেচ্ছাপ করি। আমাকে এত রাতে উত্তেজিত কোরো না রতন! তাহলে ব্যাপারটা বলি, শোনো। আমরা যাই করি না কেন, এসেম্‌ব্লি করি, ময়দান মিটিং করি, সবসময় আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আর অস্ত্র কারা ব্যবহার করবে? কলেজের অধ্যাপক সাহিত্যিক? যারা বোমার সামনে বোমা নিয়ে দাঁড়াতে পারে, দরকার হলে স্টেনগান চালাতে পারে তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে। ওসব রাশিয়া চীন, সব দেশেই এক অবস্থা। অস্ত্র ধরনেওয়ালা লোক চাই।'

লুঙ্গি আর গেঞ্জিপরা লোকটার চোখ জলজ্বল করে। নির্বাক রতনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অধীর চ্যাটার্জি বলেন, 'মনে আছে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা? যখন কানু দত্তের ভয়ে এ তল্লাট কাঁপত। লোকটা প্রকাশ্য দিবালোকে বাজারের মধ্যে মেয়েদের কাপড় টেনে খুলে উলঙ্গ করে দিয়েছিল পাঁচ টাকা বাজি জিতবার জন্যে। একটা লোক প্রতিবাদ করবার সাহস করে নি। ফ্যাক্টরি মালিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের কমরেডদের খুন করেছে

আর আমরা থানায় গেলে থানা অফিসার নাক খুঁটেছেন। সেই সব ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা এর মধ্যে ভুলে গেলে? তখন বেণু এগিয়ে এসেছিল রিভলভার হাতে। আমি সেকথাটা বেমালুম ভুলে যাব?'

'কিন্তু অধীরদা বেণু তো ডাকাত! তাহলে আমার কি হবে অধীরদা?' রতন হঠাৎ ডুকরিয়ে ওঠে। 'আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম হবে।। আমিও কি ভিড়ে যাব বেণুর দলে?'

অধীর চ্যাটার্জি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। 'শান্ত হও, রতন, শান্ত হও। এসব মিটে গেলে আর একদিন এসো তখন কথা হবে।'

'না, অধীরদা, আপনাকে বলতে হবে। আমাদের কি আর কোনো রাস্তা নেই? কোনো ভবিষ্যৎ নেই?'

আর একটা বিড়ির ডগায় ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ থেমে যান অধীরদা ধীরে ধীরে বলেন, 'আছে। যেদিন আরো লোকের চেতনা বাড়বে। তখন আর বেণুকে কোনো দরকার হবে না।'

'আপনি যে কবিতার মতো কথা বলছেন, অধীর-দা।'

রতনের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি চোখ এড়িয়ে যায় না অধীর-দার। বললেন, 'কবিতা? তাহলে তাই।'

'আমি যাই অধীর-দা।' হঠাৎ ভীষণ অসহায় লাগে রতনের গলা।

'আবার এসো।'

রাস্তায় বেরিয়ে রতন অন্ধকার ঘর থেকে গলা ঝাড়ার আওয়াজ পায়।

আবার রতন ঘুরপথ নেয়। ভোরের প্রথম লক্ষণ আকাশে। একটা তারা জলজল করে। আবার ইস্কুল, এটা মিডল প্রাইমারী। রতন মনে মনে হাসে। এত ঘন ঘন ইস্কুল কেন? এ কথাটা কোনদিন এমন তীক্ষ্ণ প্রশ্ন হয়ে ওঠেনি মনের মধ্যে। জনপদের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যালয়, কিন্তু কেন? রতন নিজেকে আর ফেলুকে দুই বিপরীত ধারা রূপে দেখতে পায়। রতন আর ফেলু, ইস্কুলে পড়ানো আর ওয়াগন ভাঙা, এই দুটোই রাস্তা। এ দুটো মূল্যবোধের কোনটা জয়ী হবে শেষ পর্যন্ত?

আবার দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া দিতে থাকে। একটু শীতল ভাব লাগে। একটা শিশুর কান্না শোনা যায় তারপর হাঁচির আওয়াজ। দরমার ঘরখানা থেকে হাঁচির আওয়াজ শুনতে শুনতে রতন মোড় ফেরে। সামনেই বাড়ি। দরজা খোলা। মা যেমন বসেছিলেন ঠায় তেমনি বসে আছেন। রতন

নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢোকে। মা একবার ফিরেও তাকান না। বোধহয় বসে বসে ঘুমোচ্ছেন। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তাদের প্রথম কলকাতা আগমনের দিনটা মনে পড়ে রতনের। শেয়ালদা স্টেশনে মানুষের পুঁটলি। চারদিক ভেজা, নাকপোড়া ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ। রিফিউজিদের মধ্যে বসন্ত লেগেছে। মস্ত বড় করে লাল শালুতে লেখা, 'বসন্তের টিকা নিন।' তার মধ্যেই তারা কুঁকড়ে শুয়েছিল পুরো দশ বারোটা দিন। 'হাট্‌কে হাট্‌কে' বলে ক্রমান্বয়ে কুলিদের হাঁক আর অহর্নিশি পদধ্বনি। প্রথম তিন চারটে রাত্তির রতন ঘুমোতে পারেনি। মাঝে মাঝে গায়ে টর্চ পড়েছে। চোরাই মালের জন্যে স্টেশনের এধার ওধার খানাতল্লাসী চলেছে। তখন বুঝতে পারে নি। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে শুনেছিল একটা কমবয়সী মেয়েকে নিয়ে হৈ হৈ। একজন বৃদ্ধ চেঁচাচ্ছে' 'ও মাগী আমার মেয়ে না!' তার মায়ের স্থাণু মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে তার কত কথাই মনে পড়ে। হঠাৎ গুলি খেলবার সময় ফেলুর চোট্টামির কথাও মনে আসে। তারপর ফেলুর চায়ের দোকান যেখানে ইয়ার বন্ধুদের খাওয়াতে খাওয়াতে সে ফেল মারল। তার সঙ্গে তার দাদার মেজাজের কোথাও একটা প্রবল অমিল ছিল কিন্তু এক প্রবল মমতাও বোধ করে দাদার জন্যে। ফেলু সব ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে লেবড়ে যেত। আত্মরক্ষার দরজাগুলো তার সবসময় বন্ধ হয়ে যেত। দাদা তাকে তার পথে অনেক ভিড়াবার চেষ্টা করেছিল। ছুরি খেলা শিখিয়েছিল। বলেছিল, 'তোর হবে, তোর কব্জিতে অসাধারণ জোর'। কিন্তু সে পথে রতন যায় নি। তবে না গিয়েই কি হয়েছে? রতন আর ভাবতে পারে না। ক্লান্তিতে তার মাথা ঝিমঝিম করে। আর ঠিক এই সময় দাওয়ায় হাল্কা পায়ের আওয়াজ আসে। সঙ্গে সঙ্গে রতন খাড়া হয়ে ওঠে। সামনেই বেণু দাঁড়িয়ে, মুখে হাসি।

'তোর দাদাকে শেয়ালে খাচ্ছে। নিয়ে আয়।'

রতন জড়ভরত। কোথায় জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

'রামপ্রসাদের বাড়ির গায়ে, দুটো গুলি বুকে দিয়েছি, একটা কপালে। কেউ জানতে পারলে তোকেও দেব।'

রতন ঝিমোয়। তার সমস্ত চিন্তাশক্তি তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে'। একবার ভাবলে এরকম ঝিমোতে ঝিমোতে রাতটা কাটিয়ে দিলে হয় না? বেণু কখন চলে গেছে। একলা একলা নাটকীয় ভাবে টেনে টেনে হঠাৎ বলে

ওঠে, 'যেদিন লোকের চেতনা বাড়বে তখন আর বেণুকে কোনো দরকার হবে না।'

বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে আসে রতন। দরজায় স্থাণু মূর্তিটা থেকে হাঁক আসে, 'কই যাস?'

রতনের কানে সে ডাক পৌঁছয় না।

হলদে রঙজ্বলা পাঁচিলের গায়ে এক চিলতে জমি। তার বুকে মানকচুর ঝোপ। কালচে সবুজ সতেজ চেটালো পাতাগুলোর দিকে রতন সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে। নিচেই ফেলু। বুকে শাদা শার্টের ওপর কালো জুটো রক্তের বৃত্ত। কপালে চুলেও রক্ত চাপ বেঁধে আছে।

রতন ফেলুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। ফেলুর ঠোঁটের কোণে তার বাল্য-কালের হাসি ফুটে উঠেছে, সেই যখন গুলি খেলায় চোরামি করে সে মজা পেত। রতন তার বুকের ওপর মাথাটা রাখতে গিয়ে আবার ভোরের আকাশখানা দেখে। আর সেই ভোরের আকাশের একটা তারা। দাদা বলে একবার ডাকবার ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু তার বাকশক্তি সে বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে। আবার মুখ তুলে আকাশটা দেখবার চেষ্টা করে। এবার চোখে পড়ে একখানা হাসিতে ভরা মুখ, বেণু ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসছে।

রতন আবার মুখ নীচু করে। তারপর আলগোছে পায়ের দিকে হাত বাড়ায়। কাঠের বাঁট শক্ত করে চেপে ধরে। বেণু কিন্তু হাসি থামায় নি। এখনও সে হাসছে। রতন সেই হাসির দিকে তার সমস্ত শরীরটা ছুড়ে দেয়।

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯৬৯-এ, গান্ধীজি ও লেনিনের শতবার্ষিকীর বছরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম অনেকেরই মনে পড়বে না। এ যুগের তরুণেরা রায়ের নামই হয়তো জানে না। কিন্তু ১৯২০ থেকে ১৯৩০, পূর্ণ এক দশক, রুশ কমিউনিস্ট নেতাদের বাদ দিলে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত ও খ্যাতিমান নেতা ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। কলকাতার কাছে, কোদালিয়া গ্রামে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এক ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়—আসল নাম নরেন্দ্রনাথ। ছেলেবেলাতেই তিনি বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দেন এবং ১৫ বছর বয়সেই দুবছর জেল খাটেন। ১৯১৫-তে বাঘা যতীনের নির্দেশে, অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তিনি চীনে এবং জাপানে যান। সেখান থেকে তিনি আসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকা প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করলে, গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি মেক্সিকোতে পালিয়ে যান এবং সেখানেই মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে তিনি মেক্সিকোর সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করেন ও কিছুদিনের মধ্যেই দলের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এই যুগ সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বহুবছর পরে মানবেন্দ্রনাথ লেখেন: ১

"কার্ল মার্কসের রচনাবলী পড়ার জন্য আমি তখন প্রায়ই যেতাম নিউ ইয়র্ক পাব্লিক লাইব্রেরীতে এবং সেই রচনাবলীর মধ্যেই খুঁজে পেলাম নতুন পথ। অল্প দিনের মধ্যেই আমি সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করলাম।....ইতিমধ্যে আমি রচনা করি একটি প্রবন্ধ—যার প্রতিপাদ্য ছিল যে ঔপনিবেশিকতাই যুদ্ধের মূল কারণ, সুতরাং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে, উপনিবেশগুলিকে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে হ'বে।....এর অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করল, আমি গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য পালিয়ে গেলাম মেক্সিকোতে। সেখানে স্পেনীয় ভাষা শিখে, আমার ইংরেজীতে রচিত প্রবন্ধটি স্পেনীয়তে

অনুবাদ করলাম। মেক্সিকো থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসনের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠির আকারে, এম. এন. রায়ের স্বাক্ষর নিয়ে প্রবন্ধটি ছাপান হলো—তার নাম হ'লো : "এল কামিনো পারা লা পাজ ডুরাডেরা ডেল্ মুণ্ডো"—স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথ।"

রুশ বিপ্লবের বছরখানেকের মধ্যেই মানবেন্দ্রনাথ নিজেকে মার্কসবাদী বলে ঘোষণা করেন ও তিনি যখন মেক্সিকোর সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক, ঐ দল তার বাৎসরিক সম্মেলন থেকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে অভিবাদন জানায়। ১৯১৮-১৯-এ রায় দুটি চটি বই লেখেন। প্রথমটি স্পেনীয় ভাষায় (১৯১৮) : "ভারতবর্ষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ"। ঐ বইটিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রায় ঘোষণা করেন : "ভারতবর্ষের বর্তমান দারিদ্র্য, অনৈক্য ও পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য দায়ী একমাত্র ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নীতি—বিভেদ সৃষ্টি কর, শাসন কর, শোষণ কর।" পরের বছর রায় প্রকাশ করেন একটি ইংরেজী চটি বই : "হাঙ্গার অ্যাণ্ড রেভল্যুশন ইন ইণ্ডিয়া" (১৯১৯)।

মেক্সিকোর সমাজতন্ত্রী দলের তৎকালীন বামপন্থী নেতা লিন্ গেল্, অবশ্য ১৯১৯-এর রায়কে কমিউনিস্ট বলে মানতে রাজী ছিলেন না। তাঁর পত্রিকাতে তিনি লেখেন : ২

"ভারতের স্বাধীনতার দৃঢ় প্রবক্তা হওয়া ছাড়া, অন্য কোন অর্থে রায়কে প্রগতিবাদী বলা যায় না....।"

মেক্সিকোর সমাজতন্ত্রী দলের সম্মেলনের সময়, রুশ বিপ্লবের মুখপাত্র হিসেবে, লেনিনের নির্দেশে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মিখাইল বোরোদিন। রায়ের সঙ্গে বোরোদিনের দ্রুত বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং বোরোদিনই রায়কে পরিপূর্ণ কমিউনিস্টে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেন। এ বিষয়ে রায় নিজেই লিখেছেন : ৩

"আমরা উভয়েই উভয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম। গোড়ার দিকে আমিই বেশী লাভবান হই। বোরোদিনই আমাকে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়ে, আমার হাতে ধরিয়ে দিল মার্কসবাদী জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি।"

বোরোদিনই, লেনিনের পক্ষ থেকে রায়কে আমন্ত্রণ জানালেন সোবিয়েৎ রুশে যেতে ও ভারতীয় বিপ্লবীদের হয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয়

কংগ্রেসে যোগ দিতে। রায় রাজী হয়ে গেলেন। মস্কো যাত্রার পূর্বাহ্ণে নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করে রায় লিখেছেন : ৪

"সশস্ত্র বিপ্লবে আমার বিশ্বাস তখনও অটুট ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী আমার মনকে অধিকার করেছিল বিপ্লব সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন এক বুদ্ধিদীপ্ত ধ্যানধারণা। আমি বুঝতে পারছিলাম যে সেই বিপ্লবী আদর্শবাদের প্রচার, অস্ত্র প্রচার করার চেয়েও ঢের বেশী জরুরী। এই নতুন বিশ্বাস নিয়েই, পৃথিবী ঘুরে আমি চল্লাম ভারতের পথে।"

মস্কো যাবার পথে রায় বার্লিনে কিছুদিন ছিলেন। সেখানে তাঁর দীর্ঘ আলাপ হয় ভারতীয় বিপ্লবী নেতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে। তাঁরাও তখন সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকছেন, কিন্তু কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাঁরা সেই মুহূর্তে যেতে রাজী ছিলেন না। জার্মান কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গেও রায়ের দেখা হয় এবং তাঁদের দুজন—হাইনরিখ্ ব্র্যাণ্ডলার ও আগস্ট থাইলমারের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুতা হয়—এক দশক পরে এই বন্ধুরা পরস্পরের দুর্দিনের সঙ্গী ছিলেন। সে কথা যথাসময়ে হ'বে।

১৯২০-তে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রামের রণনীতি রচনায় মানবেন্দ্রনাথ রায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের সামনে আলোচনার জন্য মূল খসড়া দলিলটি রচনা করেন স্বয়ং লেনিন, আর সংযোজনী দলিলটি রচনা করেন এম. এন. রায়। উপনিবেশ ও অর্ধপরাধীন দেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম ও অগ্রগামী বিপ্লবীদের নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন করা সম্বন্ধে উভয়েই একমত ছিলেন, কিন্তু বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্বন্ধে লেনিন ও রায়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। লেনিন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তাদের মৈত্রী স্থাপনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন।

মানবেন্দ্রনাথ, তাঁর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী অতীত থেকে, বুর্জোয়া সংস্কারপন্থী নেতাদের সম্বন্ধে মনে গভীর অবজ্ঞা পোষণ করতেন এবং তাই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তিনি তাচ্ছিল্যই করেন। লেনিনের খসড়া থীসিসে বলা হয় : ৫

"সমস্ত পরাধীন দেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহকে, কমিউনিস্ট পার্টিরা সক্রিয় সমর্থন জানাবে..."

আর তাঁর সংযোজনী থীসিসে মানবেন্দ্রনাথ লিখলেন ; ৬

"বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদীদের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে আর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃত শক্তি নিহিত নেই"।

অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের কাছে আজ একথা স্পষ্ট যে লেনিনের থীসিসটিই ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতিসমূহের ব্যাপকতম ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্টের সঠিক রণনীতি, আর তরুণ মানবেন্দ্রনাথের সংযোজনী থীসিসটি বহন করেছিল অধৈর্য অসহিষ্ণুতার ও অনভিজ্ঞতা প্রসূত সঙ্কীর্ণতার ছাপ। তথাপি জাপানী কমিউনিস্ট নেতা সেন কাতায়ামা ব্যতীত, প্রাচ্য জগতের প্রায় সমস্ত কমিউনিস্টই ১৯২০-তে লেনিনের বিরুদ্ধে রায়ের থীসিসকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাই কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের ধারাবিবরণীতে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে যে তাঁরা ৭

"সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত শক্তির ঐক্য গড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেনিনের যে সিদ্ধান্ত, তারই বিরুদ্ধে সমস্ত সমালোচনাকে পরিচালিত করেছিলেন।"

তবে কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকার বর্ণনা এখানেই থামিয়ে দিলে, তা হ'বে একপেশে ও ভ্রান্ত। সংযোজনী থীসিসের সমর্থনে রায় যে বক্তৃতা করেন, তা দীর্ঘদিন আমাদের পড়বার সুযোগ হয়নি। কিন্তু সম্প্রতিকালে সোবিয়েৎ গবেষকেরা তার থেকে অনেক উদ্ধৃতি আমাদের উপহার দিয়েছেন, যার থেকে আমরা দেখতে পাই যে পূর্বোক্ত সঙ্কীর্ণতা দোষ সত্ত্বেও, রায়ের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী কতখানি গভীর ছিল। যেমন সোবিয়েৎ ই[illegible] [illegible]াত্বিক পত্রিকায় রায়ের বক্তৃতার এই পুনর্মুদ্রিত অংশটি : ৮

"বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্র উপনিবেশসমূহ থেকে, প্রধানতঃ এশিয়া থেকেই তার সম্পদ ও আয় সংগ্রহ করে। তাই বিপ্লবী আন্দোলনেরও কর্তব্য, তার প্রধান কর্মক্ষেত্রকে ইউরোপ থেকে সরিয়ে প্রাচ্যজগতে স্থানান্তরিত করা এবং এই মূল থীসিস গ্রহণ করা যে প্রাচ্য জগতে কমিউনিজম্ বিজয়ী হ'লে তবেই বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের জয় ঘটবে।"

অল্পদিনের মধ্যেই রায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হ'লেন এবং ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট প্রচার সংগঠিত করার ও

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার ভার পেলেন। এই সময় রায়ের সম্পাদনায় পর পর অনেকগুলি পত্রিকা বের হয়, যথা "ভ্যানগার্ড", "অ্যাডভান্স-গার্ড", "ম্যাসেস্," "পিপলস্ ম্যাসেস্" ইত্যাদি। রায় বেশ কয়েকটি পুস্তিকাও লেখেন, যেমন তিনি ও অবনী মুখোপাধ্যায় একত্রে লেখেন : "ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন." তিনি একা লেখেন : "আফটারম্যাথ অফ নন-কোঅপারেশন" ইত্যাদি। ১৯২২-এ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে যে কমিউনিস্ট কর্মসূচীটি হাজারে হাজারে বিতরিত হয়, তারও যুগ্ম স্বাক্ষরকারী ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখোপাধ্যায়।

রায়ের লেখা তখনকার তরুণ বিপ্লবীদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। বাঙলাদেশের জীবিত প্রবীণ বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম, বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট সতীশ পাকড়াশী, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, এ বিষয়ে আমাদের বলেন যে ঃ

"বরিশালেই আমি প্রথম এম. এন. রায়ের সম্পাদিত 'ভ্যানগার্ড' পড়ি। রায় তাঁর পত্রিকার শত শত কপি বাঙলার বিপ্লবী নেতাদের পাঠিয়ে দিতেন, কিন্তু তাঁরা সেসব উল্টেও দেখতেন না। কিন্তু আমরা তরুণ বিপ্লবীরা 'ভ্যানগার্ডে' রায়ের লেখা সাগ্রহে পড়তাম। রায় চমৎকার লিখতেন এবং কমিউনিস্ট আদর্শের দিকে আমাদের টেনে আনার ব্যাপারে রায়ের অবদান অস্বীকার করা যায় না।"

১৯২২-এর ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই-এ এস. এ. ডাঙ্গেকে এবং কলকাতায়, স্বর্ণময়ী রোডের ঠিকানায় এ. আর. খাঁকে চিঠি লিখে রায় ভারতে প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে শারদীয় "কালান্তর"-এ আমি বিশদভাবে লিখেছি। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ডাঙ্গে, উসমানি, মুজফ্ফর আহমেদ ও নলিনী গুপ্তকে গ্রেপ্তার করে ও ১৯২৪-এর মার্চ মাসে সুরু করে প্রসিদ্ধ "কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা"। অনুপস্থিত মানবেন্দ্রনাথ হ'লেন মামলার প্রধান আসামী। বহুদিন পরে, ১৯৩২-এ যখন তাঁকে বোম্বাই-এ ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে, তখন কানপুর মামলার সমস্ত অভিযোগ পুনরায় তাঁর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করে, তাঁকে ৬ বৎসর কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে ততদিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের স্তালিনীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতভেদ হয়ে গেছে এবং তিনি তখন ভিন্ন পথের যাত্রী—সরকারী ও রক্ষণশীল কমিউনিস্ট ভাষ্যকারদের পরিচিত ভাষায় "রেনিগেড."।

১৯২১-এর ব্যর্থ বিপ্লবে ও জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ সম্বন্ধে রণকৌশলগত প্রশ্নে রায়ের ভূমিকাই তাঁর কমিন্টার্ন থেকে বহিষ্কৃত হবার মূল কারণ। সেই মতভেদ দীর্ঘতর-আলোচনার বিষয়বস্তু। এই প্রবন্ধে আমি শুধু তুলে ধরব, প্রামাণ্য দলিল থেকে, যে এম. এন. রায়ের প্রকৃত বক্তব্য ঠিক কি ছিল। ১৯২৭-এ যখন কুয়োমিনতাং দলের দক্ষিণপন্থী অংশ চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে বিপ্লবের প্রতি বেইমানি করতে উদ্যত, কমিউনিস্ট-কুয়োমিতাং যুক্তফ্রন্ট যখন ভাঙনের মুখে, চীনাবিপ্লবের সেই চরম দুর্দিনে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব মানবেন্দ্রনাথ রায়কে চীনে পাঠায়, হস্তক্ষেপ করে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতৃত্ব তখন দুটি মতে বিভক্ত ছিলেন। চেন তু শিউর নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে কোন প্রকারে যে কোন মূল্যে কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন মিখাইল বোরোদিন এবং কমিন্টার্ন নেতৃত্বের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ (যার প্রধান ছিলেন যোশেফ স্তালিন)। মানবেন্দ্রনাথ যদিও কমিন্টার্নের নেতৃত্বের প্রতিনিধি হিসেবেই চীনে এসেছিলেন, তথাপি চীনে বাস্তব পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষ করে, তিনি সেই সঙ্কটময় অবস্থাতেও চীনা বিপ্লবকে রক্ষা করার এক সৃজনশীল রণকৌশলের প্রস্তাব পেশ করেন।

১৯২৭-এর ৪ঠা মে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে রায় বলেন: ১০

"চীনা বিপ্লবের সামনে আজ দুটি দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। একটি হ'চ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পথে বিকাশেব রাস্তা...এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করলে চীনা বিপ্লব এখন পরাজিত হ'বে কারণ জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বও এখন চীনা বিপ্লবের পরাজয়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ চাইছে।

অন্য দৃষ্টিভঙ্গীটি হ'চ্ছে অ-ধনবাদী পথে বিকাশের রাস্তা....চীনে যে ধরণের বিপ্লব বিকশিত হ'তে চলেছে, তা মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। নতুন ধরণের বিপ্লব—ফলে তা জন্ম দেবে নতুন ধরণের রাষ্ট্র—একটি পাতি-বুর্জোয়া রাষ্ট্র, কিন্তু বিপ্লবী পাতি-বুর্জোয়া রাষ্ট্র।...এটা বিপ্লবী রাষ্ট্র হবে, কারণ এর চরিত্র হ'বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় বিপ্লবী সরকারে যোগ দেবে, কারণ সরকার হবে বিপ্লবী রাষ্ট্রের।....এই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো কৃষি বিপ্লবকে উৎসাহ দান করা, গ্রামের কৃষক ও সহরের পাতিবুর্জোয়া শক্তিদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রী রচনা করা, গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা

করা। এইভাবেই, অ-ধনবাদী বিকাশের পথ ধরে চীনা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং জাতীয় বিপ্লবকে রূপান্তরিত করতে হ'বে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রামে।"

খেয়াল রাখা দরকার যে মানবেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতাটি দেন ১৯২৭-এর ৪ঠা মে, অর্থাৎ মাও সে তুং তাঁর প্রসিদ্ধ "নিউ ডেমোক্রাসী" বই রচনার এক দশকেরও আগে, ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৬০-এর ঐতিহাসিক দলিল রচনার তিন যুগ পূর্বে। রায় তাঁর বক্তৃতায় সচেতন ছিলেন যে চীনা বিপ্লব সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এবং তাঁর সমাধানও সৃজনশীল মার্কসবাদী রণকৌশল। চীনা পার্টির নেতৃত্ব তখন তা মানতে পারেন নি, গ্রহণ করতে পারেন নি কমিণ্টার্নের তদানীন্তন স্তালিনীয় নেতৃত্ব। ফলে বন্ধ্যা রাজনীতির চোরাগলিতে বিপর্যস্ত হয়েছিল চীনা বিপ্লব, আর তার জন্য দায়ী করা হয়েছিল, অন্যান্যদের মধ্যে এম. এন. রায়কেও। রায় স্তালিনের অভিযোগের প্রতিবাদে বিশাল প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখেন "রেভল্যুশন অ্যাণ্ড কাউণ্টার রেভল্যুশন ইন চায়না", কিন্তু কে তাঁর কথা বিশ্বাস করবে? তিনি যে তখন "রেনিগেড্"।

রায় কমিণ্টার্ন থেকে বহিষ্কৃত হ'ন, জার্মানীর বিষয়ে তাঁর মতামতের জন্য। রায়ের মূল বক্তব্য ১৯২৯ থেকেই ছিল যে ইউরোপীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে এখন মূল বিপদ ফ্যাসীবাদ, সোশ্যাল ডেমোক্রাসী নয়। বরঞ্চ হিটলারের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে কমিউনিস্টদের উচিত সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট গড়তে উদ্যোগী হওয়া। একই মতের দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন প্রবীণ জার্মান কমিউনিস্ট নেতা ব্র্যাণ্ডলার ও থাইলমার—রায়ের পুরাণো বন্ধু। তাঁদের এই মতকে তৎকালীন কমিণ্টার্ন নেতৃত্ব "জঘন্য সুবিধাবাদ" বলে ধিক্কার দেন। কমিণ্টার্নের দলিল থেকেই সামান্য একটু উদ্ধৃতি দেব। মানবেন্দ্রনাথ রায় তখন একদিকে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট-সোশ্যাল ডেমোক্রাট যুক্তফ্রণ্টের রণকৌশলের প্রবক্তা হিসেবে থাইলমার-ব্র্যাণ্ডলার গোষ্ঠীকে সমর্থন করছেন, অপরদিকে গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও যুক্তফ্রণ্টের পরামর্শ দিচ্ছেন। কমিণ্টার্নের স্তালিনীয় নেতৃত্ব তখন ষষ্ঠ কংগ্রেসের সঙ্কীর্ণতাবাদী পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। তাঁরা তাই রায়কে প্রচণ্ড আক্রমণ করে লিখলেন: ১১

"মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আর আমরা কমরেড বলতে রাজী নই, কারণ তিনি এখন গান্ধীর কমরেড, তিনি এখন ব্র্যাণ্ডলার-থাইলমারের কমরেড।"

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পর অনেক পুরাণো মিথ্যা ও বিকৃতিই, আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ছে। খিড়কীর দরজা দিয়ে, কিছু কিছু আত্মসমালোচনাও হয়েছে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ও হয়তো আমাদের চোখে আর "রেনিগেড" নন। কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ পুনর্মূল্যায়ন আজও হয়নি। বাঙলাদেশের মার্কসবাদী ইতিহাস-গবেষকদের তরফ থেকে প্রথম, যৎসামান্য প্রচেষ্টা বলে এই প্রবন্ধটি পরিগণিত হ'লেই খুসী হ'ব তাছাড়া মানবেন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের খানিকটা ঋণশোধের প্রশ্নও বোধহয় আছে।

১। রায়, মানবেন্দ্রনাথ "মেমোয়ার্‌স্‌" অ্যালায়েড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৪।

২। গেল, লিন : "গেলস ম্যাগাজিন" সেপ্টেম্বর, ১৯১৯

৩। রায়, মানবেন্দ্রনাথ : "মেমোয়ার্স" অ্যালায়েড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৪
পৃঃ ৩১৯

৪। রায়, মানবেন্দ্রনাথ—ঐ, পৃঃ ২২০।

৫। লেনিন : কলোনীয় থীসিস, কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস., ১৯২০

৬। রায়, এম, এন : সংযোজনী থীসিস, ঐ

৭। ধারা বিবরণী, কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস, ১৯২০

৮। কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত এম. এন. রায়ের বক্তৃতার পুনর্মুদ্রণ—
কমিউনিষ্ট, নং ৫ ১৯৭৮ মস্কো

৯। পাকড়াশী, সতীশ : আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৯

১০। রায় মানবেন্দ্রনাথ : চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে বক্তৃতা, ৪ঠা মে ১৯২৭। মস্কো ১৯২৯—ইংরেজী অনুবাদঃ বার্কলী, ইউ, এস, এ ১৯৬৩
('এম এন রায়জ মিশন টু চায়না')

১১। 'ইম্প্রেকর,' ২১ আগষ্ট, ১৯২৯

দেশে দেশে বান্ধব

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শারদীয় সংখ্যা "পরিচয়"-এর জন্য লেখা না দিয়ে রেহাই নেই। তাই নিতান্ত তাড়াহুড়া সত্ত্বেও লিখতে বসা গেছে। এই তাড়াহুড়ার বিশেষ যে হেতু, তা থেকেই সংগ্রহ করছি প্রবন্ধের খোরাক। অনতিবিলম্বে যেতে হবে সোভিয়েত দেশে কাজাকৃস্তানের রাজধানী আল্‌মা-আটায় আয়োজিত লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক আলোচনায় যোগদানের আমন্ত্রণে। এবার নিয়ে ছ'বার যাওয়া হবে সোভিয়েট দেশে—যা ছিল কিছুকাল আগে পর্যন্ত একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার। মনে পড়ছে ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারী ফৌজ যখন হঠাৎ সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সোভিয়েতভূমি আক্রমণ এবং অধিকারের চেষ্টায়, তখন কলকাতায় আমরা কয়েকজন মিলে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠন করেছিলাম, যার বর্তমান ওয়ারিসান্ হলেন ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতি। ১৯৪২ সালে কথা হয়েছিল সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে কয়েকজনের ঐ দেশে যাওয়ার। পশ্চিম বাঙলার বর্তমান অ্যাড্‌ভোকেট-জেনারেল স্নেহাংশু আচার্য, সম্প্রতি সি-এস-আই-আর-এর প্রধান অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ডক্টর হুসায়ন জহীর এবং আমাকে সেজন্য প্রস্তুত হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সরকারী অনুমতি মেলে নি। (দেশ তখনও স্বাধীন নয়)। আর হয়তো সোভিয়েত পক্ষের যুদ্ধের তদানীন্তন পরিস্থিতিতে অসুবিধাও ছিল। আবার ১৯৫১ সালে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম সোভিয়েতে যাবার—দেশ তখন স্বাধীন। জহরলাল নেহরু তখন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু কমিউনিস্ট বলে পাসপোর্ট পাই নি। সুখের বিষয়, স্বনামধন্য সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সেবার গেছ্‌লেন এবং ফিরে মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখতে পেরেছিলেন। যাই হোক্, তারপর নানা ঘাটে অনেক জল বয়ে গেছে, সোভিয়েত এবং ভারতবর্ষ দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত বেড়েছে, অনেকটা সহজ হয়েছে, তাই একাধিকবার সেখানে গেছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা আজ নগণ্য নয়।

করলেখায় কি বলে জানা নেই, কিন্তু কপালে ভ্রমণযোগ নিতান্ত কম

ঘটে নি স্বীকার করতে হবে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় যখন শিশুপাঠ্য বইয়ে "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"—জাতীয় কবিতার মাথায় গ্রাম্য দৃশ্যের ধ্যাবড়া ছবি দেখেই শহুরে জীবনে কিছুটা দমবন্ধ অবস্থা থেকেই যেন সেই পাতার উপর আছড়ে পড়তে ইচ্ছা হতো। এখনও মনে আছে অল্প বয়সে যখন রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রায় শূন্য, তখন শুনতাম শিয়ালদহ থেকে হালিশহর (যেখানে আমাদের আদি বাস) হল ছাব্বিশ মাইল আর হাওড়া থেকে দেওঘর ২০৫ মাইল—দেওঘরের সঙ্গে আমাদের প্রায় যেন একটা পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল, মাঝে মাঝে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে দেখতাম বৈদ্যনাথ মন্দিরের নধরকান্তি মিষ্টভাষী পাণ্ডাদের। রেলে ক'বার এবং কতটা ঘোরা গেছে, তা ছিল তখনকার মনের উপজীব্য। পরে ছাত্রাবস্থায় কিছুটা সাবালক হওয়ার পর যাওয়া গেছে পুরী, কোনারক, চিল্‌কা, ওয়ালটেয়র, দার্জিলিং—তখন ভারতবর্ষের অনন্তপার মধুরিমার আস্বাদ কিছুটা মিলতে আরম্ভ হয়েছে, প্রশ্ন উঠেছে মনে—বেশি ভালো লেগেছে হিমালয়ের বিভূতি না সমুদ্রের উচ্ছল আত্মীয়তা? পরাধীনতার নিরন্তর বেদনা ছিল আমাদের তখনকার সাথী—বর্তমানকে প্রায় যেন অস্বীকার করতে চাইতাম অতীতের দিকে, কোনারকের সূর্যমন্দির তাই যেন অন্তরকে অভিভূত করেছিল, ভারতের সাধারণ মানুষের হাতে গড়া মূর্তি আর সৌধ বিশ্বের সৌন্দর্যকে নিথর প্রস্তরে অমন বিস্ময়করভাবে বন্দী এবং মুক্ত করে রেখেছে দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল। সে-গর্ব আজও মন থেকে যায় নি—পরবর্তীকালে "হিমবৎ সেতু পর্যন্তম্" "গঙ্গামৌক্তিকহারিণী" আমাদের এই দেশের এক থেকে অপর প্রান্তে যাবার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু কোনারকের মায়া এখনও কেমন যেন আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে।

অধ্যয়নপর্ব সাঙ্গ করার জন্য যেতে হয়েছে ইয়োরোপে—কিছুটা সভয়ে কারণ সাংসারিক অকর্মণ্যতা আর অতিরিক্ত আত্মসচেতনতার চাপে দিনযাপনের গ্লানি সততই আমাকে কিঞ্চিৎ বিব্রত করে রাখে। গিয়েছিলাম সরকারী বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে; লণ্ডন পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন অপর বৃত্তিধারী, উদ্ভিদ্‌বিদ্বান্ হেদায়তুল্লা, বর্ধমানে বাড়ি, হাসিখুসি সাদাসিধে মানুষ, আজ তিনি কোথায় ঠিক জানি না। ইংলণ্ড সম্বন্ধে মোহ আমাদের কালের আগেই শিক্ষিতমহলে কেটে গিয়েছিল; 'বিলেত দেশটা মাটির' এটা জানতাম আর সঙ্গে সঙ্গে মনে ছিল সেদিনকার জাত্যাভিমানের অন্তর্দাহ—ভুলতে পারি না

তখন বিদেশ যেতে হত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান পাসপোর্ট' নিয়ে, প্রায়-গান্ধীবাদী মনকে সর্বদাই যেন একটা অস্বস্তির বোঝা বইতে হতো। তবুও স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই ইয়োরোপের কাছে ঋণের কথা। কম বয়সে প্রাকৃতিক শোভা মনকে মাতাবার ক্ষমতা বিশেষভাবে রাখে, কিন্তু শুধু ইয়োরোপের বহুবিচিত্র নিসর্গসৌন্দর্যের কথাই ভাবছি না! ঢের বেশি ভাবছি মনের উপর ইয়োরোপের স্পর্শ যা অন্তত অনেকগুলো ব্যাপারে নূতন চেতনার অঞ্জনশলাকা দিয়ে চক্ষু উন্মীলিত করে দিয়েছিল। চিন্তা ও কর্মের যে প্রাণবন্ত প্রকাশ এদেশে দুর্লভ তার সাক্ষাৎ সেখানে পাওয়ার মূল্যকে ছোট করে দেখতে কখনও পারব না। ভারতবর্ষের গভীরে আমাদের সত্তার শিকড়, কিন্তু স্বীকার না করে গত্যন্তর নেই যে কিছুটা মান্ধাতাগন্ধী এদেশে তুরীয় মার্গে বিচরণশক্তি বিনা মুক্তির আস্বাদ অতি দুরূহ বস্তু। পুরো একটা বই না লিখলে ব্যাপারটা বোধগম্য করা হয়তো সম্ভব হয় না। কিন্তু এটা অযথার্থ নয় যে আমাদের মতো দেশ থেকে গিয়ে মনে হয় যে ইয়োরোপ যেখানে বরণীয় সেখানে এই মরজগতেই মানুষের মহিমা ও মুক্তি হলো তার একান্ত অভীপ্সা। শিল্পসাহিত্যের গরিমায় এবং সাধারণ সামাজিক সম্পর্কে বিশেষত নরনারীর সখ্যবন্ধনে যে সহজ, শোভন সাবলীলতা সেখানে সম্ভব, তাতে এই মুক্তিপ্রয়াসেরই প্রকাশ। প্রাচ্যজগতে ইয়োরোপীয় দানবিকতার অভিজ্ঞতা আমাদের মনে অপরিসীম তিক্ততা ও যন্ত্রণা এনে দিয়েছে বটে, কিন্তু ইয়োরোপের যে-ঐশ্বর্য তাকে জগজ্জয়ের পথে ঠেলেছে তার মধ্যে নিখাদ শ্রদ্ধার উপাদানেরও অভাব নেই।

প্রায় বছরপাঁচেক বিদেশে কাটিয়ে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের সস্নেহ আহ্বানে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলাম। মার্কস্‌বাদ সম্পর্কিত কয়েকখানা আমার বই কাস্টমস্‌ কর্তৃপক্ষ নির্বোধের মতো আটকেছিল বলে লণ্ডনের "নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান"-এ এক পত্র লিখেছিলাম (ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী প্রায় যাবার উপক্রম ঘটে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণনের হস্তক্ষেপে রেহাই পাই!)। তাতে বলি, 'ইংলণ্ডে জীবনের কয়েকটা সুখী বৎসর কাটিয়েছি, সে দেশের মানুষকে বন্ধু বলে ডেকেছি। সেদেশের দৃশ্যে চোখ জুড়িয়েছে। সেখানকার ধ্বনি কানে লেগে আছে। কিন্তু আমাদের এই দুই দেশের যে সম্পর্ক—তাকে ঘৃণা করি আমার কায়মনোবাক্যে যত ঘৃণা আছে তাই দিয়ে।' এরই সঙ্গে মনে পড়ছে আমার গুরুস্থানীয় সুহৃৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের কথা। প্রায় যেন স্বদেশের প্রতি অভিমানভরে চল্লিশ

বৎসরাধিক কাল তিনি বিলাতে প্রবাসী—দেশে ফিরতে চান্ অথচ চান্ না, একবার বলেন আমাকে যে এই বর্ণবিদ্বেষের দেশের পোকাগুলোও আমার অস্থি চর্মে সুখ দেবেনা কিন্তু দেশে ফিরে কাজটা কি ঠিক্ করব? এ দেশের প্রকৃতই একটা মায়াবী রূপ আছে—যা আমার মতো লোকেরও মনে ধাক্কা দিয়েছিল যখন ১৯৬৬ সালে, কানাডা থেকে ফেরার পথে ৩২ বৎসর বাদে ইংলণ্ডে ঢুকে বুকের মধ্যে একটু যেন মোচড় বোধ করেছিলাম যখন লণ্ডন বিমানবন্দর থেকে বাসে চড়ে আসার পথে দেখি সরু রাস্তা, জবর ট্র্যাফিক্, ছোট বসতবাড়ির ভিড়, মাঝে মাঝে ছোটখাট খেলার মাঠ—কেমন যেন মনে হয়েছিল বুঝি নিজের দেশেই ফিরে এলাম।

কলেজে পড়তে পড়তে বোধহয় চোখে পড়েছিল সুনীতি চাটুজ্জে মশায়ের একটা ছোট্ট লেখা—তিনি বলেছিলেন যে নিজের স্বদেশ ছাড়াও দু'একটা অপর দেশ সম্বন্ধে আত্মীয়তাবোধ স্বাভাবিক, যেমন বিপ্লবের তদানীন্তন পীঠক্ষেত্র হিসাবে ফ্রান্স কিম্বা পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাগুরু প্রাচীন গ্রীসকে আমরা ভারতীয়রা যদি একটা বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে দেখি তো তা সম্পূর্ণ সঙ্গত। বিলাত যাবার আগে থেকে প্রাচীন গ্রীস সম্বন্ধে প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম; এর জন্য বহু পরিমাণে দায়ী বোধ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের তুলনাহীন অধ্যাপক কুরুভিলা জ্যাকারিয়া, যিনি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশে এবং বি-এ অনার্সে আমাদের খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীস সম্বন্ধে গভীর জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত বলতে পারি যে আমাদের স্কুলের হেড পণ্ডিত মশায় বিজয় ভট্টাচার্য এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং কুরুভিলা জ্যাকারিয়া শিক্ষাদানব্যাপারে আমার কাছে এক অতুলন ত্রিমূর্তি, দেশবিদেশে যাঁদের জুড়ি কখনও দেখি নি। যাই হোক্, অক্সফোর্ডে হাজির হতে না হতেই খেয়াল হলো যেমন করে হোক্ যেতে হবে অ্যাথেন্স্-এ, 'পার্থেনন' অন্তত দেখতে হবে। নজরে এল 'টাইম্স্' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন—'হেলীনিক্ ট্রাভ্লার্স' গীল্ড্' এক দল নিয়ে যাবে গ্রীসে, তার নেতা হবেন বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক গিলবার্ট মরে (Murray), আর প্রাচীন গ্রীসে যুক্তরাষ্ট্র গঠনপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল প্রবন্ধ যে লিখে পাঠাবে তাকে বিনামূল্যে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনই নির্বুদ্ধি যে তখনই সবকাজ ফেলে ঐ প্রবন্ধ লিখতে লাগলাম, যদিও জানা উচিত ছিল যে ওদেশে ঐ বিষয়ে আমার চেয়ে সুনিপুণ ছাত্রের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না বলে অমন এক পারিতোষিক বাস্তবিকই ছিল আমার

নাগালের বাইরে। গ্রীসে যাওয়া আমার হলো না, আজ পর্যন্ত হয় নি—সেজন্য খেদও কিছুটা রয়ে গেছে ছোটখাট সান্ত্বনা শুধু এই যে লেখাটি দেশের একজন অধ্যাপকের নামে একটি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল এবং তার ফলে কিঞ্চিৎ গবেষণার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য হওয়ায় তাঁর চাকরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল। জ্ঞাতসারে এবং সানন্দেই আমি এই সামান্য সাহায্য তাঁকে করতে পেরেছিলাম। যদিও ন্যায়ের কঠোর বিচারে অন্যায়ই আমরা করেছিলাম।

ফ্রান্সে অবশ্য যেতে পেরেছি—ইংলণ্ড থেকে সেখানে যাওয়া অতি সহজসাধ্য। তাছাড়া প্যারিস না দেখে ফরাসী জীবনের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত না হয়ে ইয়োরোপ ঘুরে আসার মত বাতুলতা প্রায় নেই। অক্সফোর্ডে অধিষ্ঠানের ফলে লণ্ডনের সঙ্গে মোলাকাৎ খুব বেশি আমার হতো না, আর হলেও সচরাচর কুয়াসার ঘোমটা ভেদ করে গোম্‌ড়ামুখ তেমন ভালো লাগত না, অত বড় শহরে একাকিত্বের অনুভূতিও বোঝার মতো মনে হত। প্যারিসের চেহারা ছিল আলাদা, সেখানকার আকাশে বাতাসে ছড়ানো যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব আত্মীয়তার আবহাওয়া, অতি অল্প ফরাসী জ্ঞানের ফলে মাঝে মাঝে অসুবিধার সৃষ্টি হলেও তাকে গায়ে মাখার বালাই ছিল না। দেশের দক্ষিণে আল্‌প্‌স্‌ পর্বতমালার অদূরে গ্রনব্‌ল্‌ (Grenoble) শহরে মাসখানেক থেকেছি। বন্ধু হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে—যে ফরাসী পরিবারে ছিলাম তারা একবর্ণ ইংরাজী জান্‌ত না। স্বভাবত স্বল্পভাষী আমার পক্ষে সুবিধাই হয়েছিল তবে একটা সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম বাড়ির গিন্নীর কাছ থেকে—'Monsieur n'aime pas causer, mais quand il parle nous comprenous tout' অর্থাৎ আমি বেশি কথা বলতে ভালবাসি না তবে যখন কিছু বলি তখন তার সবটাই বুঝতে পারেন! বেপরোয়া হয়ে গড়গড় করে বলে যাওয়ার চেষ্টা বিনা অবশ্য বিদেশী ভাষায় বলার অভ্যাস কঠিন। সুতরাং সার্টিফিকেট প্রকৃতপক্ষে আমার সঙ্কোচবিহ্বল ব্যর্থতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড, ওয়েলস্‌-এর নানা অঞ্চলে ঘুরেছি, একাদিক্রমে বহুদিন থাকা অবশ্য হয়েছে প্রধানত অক্সফোর্ডে। তাই ঐ শ্রুতকীর্তি বিদ্যায়তন সম্বন্ধে মমতা জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ওদেশে আমাদের কাছে অনেক সময় যেন কিছুটা কৃত্রিম লাগে। কারণ কোন কোন অঞ্চল বাদে প্রাকৃতিক দৃশ্যও যেন সযত্নবিন্যস্ত, মানুষের হাত না

থাকলেও যেন মনে হয় বুঝি মানুষের হাত কোথাও আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক বর্ণনা করতে বসিনি, তা এই প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভবও নয়। তবে এটা ঠিক যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে ওদেশের বহিরাবরণের আড়ষ্টতা আমাদের চোখে একটু বেশি পরিমাণেই বিরস এমন কি রীতিমতো কটু মনে হওয়াও অস্বাভাবিক ছিল না। লণ্ডনের তো কথাই নেই, খাস্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়ন্ত্রিত 'লজিং হাউস্'-এও কদাচিৎ হলেও মাঝে মাঝে বর্ণবৈষম্যের সাক্ষাৎ মিলত। লণ্ডনে স্যুটকেস্ হাতে নিয়ে ঘর খুঁজতে গিয়ে প্রায় আমাদের সকলেই দেখেছি যে গৃহস্বামিনী পরম সৌজন্যে এবং স্মিতহাস্যে বললেন, ঘর খালি নেই। অথচ অনৃতকথন আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। বর্ণচেতনা ইংলণ্ডের তুলনায় ইয়োরোপের অন্যত্র কিছুটা কম; সাম্রাজ্যই এদিক থেকে ইংলণ্ডের কাল হয়েছে। কিন্তু এ-সত্ত্বেও সন্দেহ নেই সে-দেশে অগণিত নরনারী বর্ণ ব্যাপারে সুস্থ, সভ্য, মুক্ত মানসের অধিকারী। সন্দেহ নেই যে, বন্ধু বলে একবার গ্রহণ করলে সে দেশের মানুষ সম্পূর্ণ সততার সঙ্গেই তা করে থাকে। আর অক্সফোর্ডের মতো জায়গায় যে একটু ভাবে তার মনে শুধু সেখানকার অপরূপ নিসর্গশোভা দাগ কাটে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাতশো বছর ধরে একাগ্র জ্ঞানচর্চা পুরুষানুক্রমে চালিয়ে যাওয়ার ছবি ফুটে ওঠে। যাকে অক্স্ফোর্ডের অনুরাগীরা বলে জগতের সেরা রাস্তা সেই হাইস্ট্রীটে একাধিকবার দেখলাম স্বয়ং আইনস্টাইন্‌কে, চায়ের টেবিলে প্রায় যেন সমান-সমান কায়দায় দীপ্তিমান আলোচনা শুনলাম বিজ্ঞানী অধ্যাপক মিল্‌ন্-এর কিম্বা ইতিহাসবিদ্ অধ্যাপক ক্লার্কের—১৯২৯ সালে কেম্ব্রিজে, সম্ভবত ট্রিনিটি কিম্বা কিংস্ কলেজের উঠোনে দেখেছিলাম বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞানসাধক জে-জে-টম্‌সন্‌কে।

বিলাত যাবার আগে নরওয়ের লেখকদের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়েছিল—Hamsun, Johan Bojer তখন বাঙলাদেশে জনপ্রিয় যা নিয়ে 'শনিবারের চিঠি' তখনই ছিল বিরক্ত। নরওয়ে যাবার একটা ইচ্ছা তাই খুবই ছিল। আর গ্রীসের তুলনায় ইংলণ্ড থেকে ঢের বেশি কাছে বলে সেখানে যাওয়া এবং সমুদ্র যেখানে তার বাহু বিস্তার করে স্থলভূমিতে বিশাল জলাধারের মায়া সৃষ্টি করেছে, সেই 'ফিয়র্ড' ('fjord') কয়েকটা দেখা সম্ভব হয়েছিল। গরম দেশ থেকে গেছি বলে বিশেষত মন চাইত

শীতকালে বরফে ঢাকা সুইট্‌সরল্যাণ্ডের দৃশ্য দেখা—তাও সম্ভব হয়েছিল। গ্রীষ্মে নরওয়ে এবং গভীর শীতকালে সুইট্‌সরল্যাণ্ড যেতে পেরেছিলাম, ইংরেজী উভয় দেশেই খুব সহায়ক বলে সুবিধা ছিল, সুইট্‌সারল্যাণ্ডে একটু-আধটু জার্মান বলারও সুযোগ মিলেছিল। উভয় দেশেই মনে হয়েছে মানুষ মানুষের আত্মীয় তার গাত্রচর্মের বর্ণ যাই হোক না কেন—বন্ধুভাবে সকল মানুষ সর্বদেশে জীবনযাপন করতে না পারার তো কোনো কারণ নেই।

ইয়োরোপে অন্যান্য দেশে গেছি—ইতালী, বেলজিয়ম, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া (এখানে সোশ্যালিস্ট দেশগুলির কথা আপাতত বাদ রাখছি)—এবং সর্বত্রই মনে হয়েছে মানুষের একাত্মতার কথা। ১৯৩২ সালে গেছি জার্মানীর পুরোনো শহর হাইডেলবর্গে—যেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় আর তার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অসম্ভব-প্রকাণ্ড 'বিয়র'-এর জালা হলো বিশ্ববিখ্যাত—ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা হয়েছে এক বেকার শ্রমিকের সঙ্গে, যে নিয়ে গেছে তার বাসায়, আমায় ক'দিন অতিথি হিসাবে রাখলে কিছু রোজগার হবে আশা করে। পরে শুনেছি সে ধর্মে ইহুদী যদিও জাতিতে খাঁটি জার্মান—দেখেছি সেখানে এক গ্রীক ছাত্রকে—গরীবের সংসার—স্নান করতে চাইলাম যখন, তখন জড়ো-করা কয়লা সরিয়ে 'বাথ-টব' পরিষ্কার করে দিল। জার্মান অতি অল্প জানা থাকা সত্ত্বেও বাড়ির গিন্নীর কথার কিছু কম্‌তি ছিল না—এখনও মনে আছে কদিন পরে চলে যাবার সময় আমাকে বললেন, ইংলণ্ডে ফিরেই যেন তাঁকে আমার পৌঁছাবার খবর ("ankommen") পাঠাই। পরে ঐ পরিবারের কি হাল হয়েছিল জানিনা—শুনেছিলাম তারা সোশাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থক। হিটলার তখনও জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি—হিটলারীদের ছোট ছোট মিটিং সেখানে দেখেছি, বেশ মনে পড়ছে রাস্তার মাথায় ছোট্ট এক সভায় নাৎসি বক্তা আবেগ নিয়ে বলছে "Versuchen Sie einmal" ("আসুন আমরা একবার চেষ্টা করি....")। বহু বৎসর পরে, ১৯৬৭ সালে, সোশালিষ্ট পূর্ব জার্মানীতে গিয়ে মনে হয়েছে হাইডেলবার্গের কথা—ভেবেছি আবার জার্মানী এক হবে, মানবতার ভিত্তিতে, সকল তুচ্ছতা ও স্বার্থান্ধ নির্মমতাকে অতিক্রম করে। মানুষ তো সর্বদা প্রস্তুত, শুধু তাদের মরমে প্রবেশ করবে এমন কথা শোনাবার এবং তদনুসারে কাজে নামার লোকেরই তো আজও সর্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে অভাব।

সোশালিস্ট দেশগুলির কথা সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে বলব। সোভিয়েতের কর্মকাণ্ড চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য বারবার হয়েছে। পোলাণ্ড, পূর্ব-জার্মানী, হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া দেখেছি—মনোমুগ্ধকর অনেক কিছুই সেখানে দেখেছি। মোঙ্গোলিয়াতে যাওয়ার বিরল সুযোগ একবার সদ্ব্যবহার করতে

পেরেছি—যেন জাদুমন্ত্রে বহুবিশ্রুত দেশকে অতীতের কারাবাস থেকে সমুজ্জ্বল বর্তমানে সম-সুযোগের ভিত্তিতে নবজীবন সংগঠনের মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করা হয়েছে। মহাচীনে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম ১৯৫১ সালে—কিন্তু তখন ছিল আমাদের মতো ব্যক্তির পথে বহু অবান্তর বাধা—স্বাধীন ভারতের কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট দিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। সোশালিস্ট দুনিয়া সম্বন্ধে যা জেনেছি বা জেনেছি বলে অনুমান করি, তার কিয়দংশ হয়তো ভবিষ্যতে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব হবে না।

ধনিক জগতে মাথাপিছু রোজগারের বিচারে অগ্রগণ্য দুই দেশে যেতে পেরেছি—অস্ট্রেলিয়া (১৯৫৯) আর ক্যানাডা (১৯৬৬)। অস্ট্রেলিয়ার অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিকাংশে গিয়েছি পার্লামেণ্টারী দলের সদস্য হিসাবে—কোথাও কোথাও, বিশেষ করে প্রাকৃতিক শোভায় ভরপুর টাস্‌মানিয়া দ্বীপে দেখেছি হুবহু পঞ্চাশ বছর আগেকার ইংলণ্ডের ছবি। ক্যানাডা থেকে অভ্যাগত এম-পি'রা অসঙ্কোচে মন্তব্য করতেও ছাড়েননি—এসব পুরোনো ইংরেজ কেতা আজ অচল। হোটেলে 'সেণ্ট্রাল হীটিং' চাই, বাইরে যতই ঠাণ্ডা হোক্ ভিতরে গরম না হলেই নয়। নতুবা আমেরিকান মহাদেশ থেকে 'ট্যুরিষ্ট' আসতে চাইবে না! আমার চোখে চমৎকার লেগেছিল ঘরে 'ফায়ার-প্লেস'-এ আগুন, কোথাও কোথাও কাঠের আগুন (log-fire), যার চকমকিতে বসতে ভারি ভালো লেগেছিল। কিন্তু ধনবান মার্কিনী-বিচারে তা বুঝি বাতিল! যাই হোক, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশ, যেখানে একটু বিবেচক-ধরণের মানুষ যারা, তারা সে দেশের আদিবাসীদের প্রায় নির্ব্বংশ করে দেওয়া সম্বন্ধে খুবই অপ্রতিভ এবং যারা আজকের নতুন পৃথিবীকে জানতে চায়, তাদের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি ঐ একই মূলীভূত মানবিকতা, যার বন্ধনে গোটা দুনিয়াকে বেঁধে দেওয়াই তো হলো বর্তমানের যুগ-ধ্বনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণেরও অধিকার পাইনি, কারণ কমিউনিস্ট বলে যারা পরিচিত তাদের পক্ষে ওদেশে যেতে (এমন কি নামতে) হলে খাস্ ওয়াশিংটনে স্টেট্ ডিপার্টমেণ্টের বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন। সোশালিস্ট দেশগুলো সম্বন্ধে বুর্জোয়া দুনিয়ার অভিযোগ এই যে লৌহ যবনিকার পিছনে তাদের অবস্থান, সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর লঙ্ঘন কারও কর্ম নয়।

নিউইয়র্ক বিমানবন্দরের রৌপ্য যবনিকা দূর থেকে দেখেছি, তাকে ভেদ করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত থেকেছি। খুব বেশি অভাব বোধ করিনি, কারণ "Little Golden America" (হয়তো বহু পাঠকেরই Ilf এবং Petrov রচিত এই মনোরম গ্রন্থটি মনে পড়বে) আমাদের কাছে অপরিচিত নয়—দোষে গুণে মিলে আজ তার যা পরিস্থিতি তাকে কাটিয়ে সুষ্ঠু সভ্যতার স্তরে ঐ দেশের বহুগুণান্বিত অধিবাসীবৃন্দ অনতিদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই এগিয়ে যাবেন ভরসা রাখি।

লৌহ যবনিকার দ্বারে প্রথম নেমেছিলাম ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত দেশের তর্‌মিজ্ (Tarmiz) শহরে। কাবুলে ক'দিন কাটিয়ে আমাদের প্লেন গেল তাসখন্দে—মাঝে সীমান্ত শহর তর্‌মিজে কিছুক্ষণ স্থিতি। একটুও বাড়িয়ে বলছি না কিন্তু মনে হয়েছিল এ তো আমাদেরই দেশ—এমনকি ছোট্ট বিমানবন্দরের বে-বন্দোবস্তের মধ্যেও যেন আমাদের আল্‌গা-আল্‌সে দেশের হাওয়া কিছুটা ছিল। আর ভুলতে পারব না বিমানবন্দরের ছোট্ট রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় পরিচারিকাদের একান্ত সহজ আন্তরিকতার কথা—একেবারে পরম আত্মীয়ের মমতা নিয়ে তারা আমাদের ক'জন বিদেশীর আপ্যায়ন করেছিল, আর তার মধ্যে ছিল যেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব সৌহার্দ্যের স্পর্শ। জগতে কোথাও কোনো জবরদস্ত কমিউনিস্ট (বা অপর কোনো) পার্টি নেই যারা হুকুম জারি করে এমন সহজ, শোভন মানবিক ব্যবহার বিদেশীকে দেওয়াতে পারে। ইয়োরোপের নানা দেশে ঘুরে অন্তত সাধারণ পরিস্থিতিতে ব্যবহারের সততা এবং আন্তরিকতা সম্বন্ধে বিচার করার শক্তি হয়েছে। সোশালিস্ট দেশে, বিশেষ করে পূর্ব-ভূ-ভাগের সোশালিস্ট দেশে, প্রকৃতই যে 'দেশে দেশে বান্ধব' নীতি জীবনের অঙ্গ হয়েছে তা মনে করার কারণ পরে আরও অনেক খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু তার প্রথম সাক্ষাৎ পাই সোভিয়েত বিমানবন্দর তর্‌মিজ-এ।

ভারতবর্ষের অজর প্রার্থনা হলো—"সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু"—সকলে সবদেশে আনন্দ করুক। আসুক দেশে দেশে বান্ধব—অবসান হোক প্রাগৈতিহাসিক যুগের, ইতিহাস—মানুষের প্রকৃত ইতিহাস—আরম্ভ হোক্।

বেঁচে বত্তে থাকা

দেবেশ রায়

অফিসে এসে বিজিত কিছু ফালতু টাকা পেয়ে গেল।

ঘুষ নয়। বিজিতদের অফিসটাই এমন, ইচ্ছা থাকলেও ঘুষ নেবার উপায় নেই। নানা অফিসে চাকরি করে এমন নানা বন্ধুর কাছে বিজিত এমন অনেক গল্প শুনেছে যা থেকে মনে হয় ঘুষ নেবার লোকে কুলোচ্ছিল না বলেই ওদের চাকরি দেয়া। অফিসে বসে বিজিত-রা টাকা পয়সার হিসেব কষে লক্ষ লক্ষ টাকার। কিন্তু সে-সব হিসেব মাত্র, ঘুষটুষ দিয়ে দেয়ার পর, খরচ-খরচা হয়ে যাওয়ার পর কাগজের ওপর হিসেব। সেই লক্ষ লক্ষ টাকার হাজার হাজার অঙ্কগুলি যখন বিজিতদের অফিসের খাতা-পত্তরে এসে পৌঁছয় তখন তাদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। বিজিত্ত রা অঙ্কের কারবারি।

সুতরাং তা থেকে কোনো নতুন করে বাঁচা টাকা বিজিতের হাতে এসে ওঠে নি।

আসলে টাকাটা বিজিতেরই। বছর-তিন আগে তাদের চাকরির মাইনে-পত্তরের হার বদলে যায়। সেই নতুন হারের কোন্ কোঠায় বিজিত পড়বে তা নিয়ে বিজিতদের তখনকার কর্তা এক তর্ক তোলেন। ফলে বিজিতের বাড়তি টাকাটা আটকে যায়। গত বছর তিন ধরে বিজিতদের ইউনিয়ন ও বিজিতের পক্ষ থেকে বহু চিঠি-পত্র লেখার পর ও বিজিতদের কর্তার কর্তা দিল্লি থেকে এলে ইউনিয়ন তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর আর মাস দুই হলো বিজিতদের পুরোন কর্তা বদলি হয়ে নতুন কর্তা আসার পর— অবশেষে বিজিত তার সেই পুরোন টাকাটা হঠাৎ করে পেয়ে গেল। বছর-তিনের টাকা একসঙ্গে জমে ফুলে-ফেঁপে হাজার দুই হয়েছে।

টাকাটা যে অবশেষে পাওয়া যাবে তা নতুন কর্তা আসার পর পরই বোঝা গিয়েছিল। পুরোন কর্তাকে ছ-মাসের মধ্যে বার-চারেক ঘেরাওয়ের পর, তার মধ্যে বার-দুই আঠার ঘন্টার ওপর, নতুন কর্তা এসেছেন।

ঘেরাওয়ের অবিশ্যি অন্য কারণ ছিল, তবে বক্তৃতার সময় ইউনিয়নের নেতারা ঠারে ঠোরে বিজিতের বিষয়টাও তুলেছিলেন, যে কর্মচারীদের হকের পাওনা বছরের পর বছর ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। সে যাই হোক নতুন কর্তা প্রথমথেকেই কর্মচারীদের সঙ্গে একটু ভাব-ভালবাসা দেখান। এটা তার হাব-ভাবেই বোঝা গিয়েছিল পুরোন কর্তার সঙ্গে কর্মচারীদের নানারকম সংঘর্ষের ফলে প্রতিষ্ঠানের গায়ে যে ফোস্‌কা পড়েছে তার ওপর তিনি মলম লাগাতে চান। কর্মচারীদের অনেক দিনের কটি দাবি তিনি প্রথমে এসেই মেনে নেন। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নতুন নিযুক্ত হচ্ছেন না—এটা ইউনিয়নের একটা অভিযোগ ছিল। একজন নতুন কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন। তারপর-ই নতুন কর্তা বিজিতের টাকাটা পাইয়ে দিলেন।

টাকাটা যে পাওয়া যাচ্ছে, শিগগিরই, তা দিন-দুই আগে ওবড বাবু বলেছেন 'যে-রকম চিঠি-পত্র চলছে তোমার টাকা নিয়ে, দু-এক দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে'। বছর-তিন ধরে পড়ে থাকায় টাকাটার ওপর বিজিতের কোনো মালিকানা বোধ-ই ছিল না। আর পকেটে থমথম করার বদলে টাকাটা যখন চিঠি-পত্রের অঙ্ক হয়ে উঠেছিল, তখন থেকেই টাকাটা মরা। আরও অনেক চিঠি-পত্রের মতো বিজিত নিজের টাকার দাবি জানিয়েও চিঠি দিয়েছে। যতো চিঠি-পত্র লিখেছে, যতো দিন গেছে, ততো বেশি করে টাকাটা হাতের বাইরে, মনের বাইরে, ধারণার বাইরে চলে গেছে।

কর্তা অফিসে আসার ঘণ্টাখানেক পরে খবর এলো বিজিতকে ডাকছেন। বিজিত গেল। আগের কর্তা কর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন না, প্যাণ্টের ওপর কোট-টাই পরে আসতেন। নতুন কর্তা প্যাণ্টের ওপর বুশ শার্ট চাপিয়ে আসেন, দেখে চট করে কর্মচারীদের থেকে তাঁকে আলাদা করা যায় না। কর্মচারীরা ঘরে এলে কলম রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে কথা বলেন। কথা হয়তো দু এক মিনিটের বেশি বলেন না আর কাজের কথার বাইরেও বলেন না। কিন্তু একটু হেসে এমনভাবে কথাগুলি বলেন যেন গল্প-গাছা করছেন।

বিজিত ঘরে ঢুকলে কর্তা বললেন—"বসুন।" বিজিত বসলো। কর্তা একটু হেসে চুপ থাকলেন। তারপর হেসেই বললেন, হাত দুটো জড়াজড়ি করে মুখের কাছে তুলে—"আপনার পেমেণ্টের অর্ডার এসে গেছে, আজ টাকাটা নিয়ে যাবেন।" বিজিত কী জবাব দেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। একটু

চুপ থেকে কর্তা নিজেই বললেন—"একটু দেরি হয়ে গেল কিছু মনে করবেন না।" এবার বিজিত জবাব দিতে পারলো—"না, দেরি আর কোথায়, আপনি আসার পর থেকেই তো চেষ্টা করছেন।" "আপনাকে টাকাটা পাইয়ে দিতে পারলাম বলে আপনি বিশ্বাস করছেন চেষ্টা করেছি, আসলে আরো আগে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিছু মনে করবেন না, এখানে যেমন হেড অফিসেও তো তেমনি, এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে ফাইল যেতেই মাস পেরিয়ে যায়। আমরা যতোই চিঠি লিখি আর সই করি, যেতে তো হবে আপনাদের টেবিল দিয়ে, সেখানেই আটকে যায়, শেষে ডি-ও চিঠি লিখে—" কর্তা চোখ নামিয়ে টেবিলের ওপর থেকে লাল রঙের পেনশিলটা তুলে নিলেন। "ঠিক আছে, টাকাটা নিয়ে যাবেন" বলে কর্তা সোজা হয়ে বসলেন, তারপর টেবিলের ওপর মাথা নোয়াতে নোয়াতে বললেন—"সাবধানে যাবেন, দেখবেন, আবার যেন পকেটমার না হয়।" "আচ্ছা" বলে বিজিত আস্তে করে চেয়ার থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত যেতেই কর্তার গলা এলো, বিজিত ঘুরে দাঁড়ালো, "আসলে টাকাটা আপনার তখন-ই পাওয়া উচিত ছিল, আমাদের মধ্যেও তো ওল্ড স্কুলের লোক আছেন, তাঁদের কাছে নিয়ম-ই সব, আরে, মানুষের জন্যই তো নিয়ম, স্পিরিট অফ দি ল-টাই তো আসল কথা," বিজিতের একটা হাত দরজাতে দেয়া ছিল, "আচ্ছা" শুনে সে পেছন ফিরে দরজাটা খুললো।

বড়বাবু হাঁক দিয়ে বললেন—"বিজিত, অর্ডার এসে গেছে, টাকাটা আজই নিয়ে যেও।" কথাটা সবাই শুনলো। "তাহলে বিজিতবাবু এদ্দিনে জাতে উঠলেন।" "ভালোই হলো, এক্‌বার অনেকগুলো টাকা পেয়ে যাবেন, কিছু একটা প্ল্যান কষতে পারবেন।" "হ্যাঁ আর এই তিন বচ্ছর পেট শুকিয়ে রেখে—"। এই-সব নানা কথায় একটা অস্পষ্ট হাসি দিয়ে বিজিত নিজের টেবিলের দিকে চলে গেল। সবগুলো কথাই অবিশ্যি সত্যি। আর-সবার সঙ্গে যদি মাইনেটা বাড়তো তাহলে সবার মতো সে-ও একটা ছকে টাকাটা মাসিক খরচ করতে পারতো। আবার এখন এক থোকে টাকাটা পেয়েও ভালোই হলো, ভেবে-চিন্তে কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু যে-টাকাটা বছর-তিন আগে মাস মাইনের অংশ হিসেবে পাওয়ার কথা, সেটা তিন বছর পরে এক থোকে পাওয়ায় টাকাটার ওপর নিয়মিত খরচের বাধ্যবাধকতা যেন আর থাকলো না। বিজিতের হকের ষোল আনাটা ফালতু টাকার মতো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা হয়ে গেল। এতদিন বিজিত প্রতি মাসে তার বকেয়া টাকার

হিসেব কষেছে। আজ পর্যন্ত তার পাওনা এক হাজার আটশ তেষট্টি টাকা সাতাশ পয়সা। এই প্রতি মাসের হিসেবের কথা, টাকাটার ওপর তার হক নিজের কাছেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেন বিজিতের ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে তা পাই পয়সায় শোধ করতে হবে। কিন্তু এখন সমস্ত বকেয়া পাওনার সমষ্টি হিসেবে এই এক হাজার আটশ তেষট্টি টাকা সাতাশ পয়সা বিজিতের কাছে দুহাজারের চাইতে একশ ছত্রিশ টাকা তেয়াত্তর পয়সা কম মনে হলো। আর ক মাস যদি টাকাটা জমতো তাহলেই দুই হাজার পুরে যেতো। তিন বছর যখন বিজিত অপেক্ষায় থাকতে পেরেছে তখন আরো কটি মাস-ও কাটানো যেত। তাহলে পুরোপুরি দুই হাজার টাকা নিয়ে সে ফিরতে পারতো। সে যেন একশ ছত্রিশ টাকা তেয়াত্তর পয়সা ঠকেছে। আর ঠকার কথা ভাবতেই বা টাকাটা আরো বাড়তে পারতো ভাবতেই টাকাটার ওপর থেকে নিয়মিত রোজগারের ভারটা যেন আর থাকলোই না। বিজিতের হকের টাকা ফালতু টাকা হয়ে গেল। ঘুষের টাকার মতো-ই ফালতু।

টেবিলের ওপর ছায়া পড়তেই বিজিত চোখ তুলে দেখলো ইউনিয়নের এক নতুন পাণ্ডা একটা নতুন লেখা পোস্টার দুই হাতে মেলে ধরে হাসছে— "ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে সহকর্মী বিজিতবাবুর তিন বছরের বকেয়া টাকা দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছেন। সংগ্রামী অভিনন্দন। কর্মচারী ঐক্য জিন্দাবাদ"। লাইনের মধ্যে আঁটছিল না ফলে 'বিজিত'-এর পর পদবীর বদলে 'বাবু' এসেছে। বিজিত হাসলো। একজন মন্তব্য করলেন "নতুন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কথাটা লিখে দিলে পারতেন।" দূরের এক টেবিল থেকে ইউনিয়নের একজন নেতা বলে উঠলেন "ঐ রোগেই তো ছোট মাসিমার ঘোড়া হলো। এত ঠকেও শিখলেন না। এ কী কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার দাদা, এ-হচ্ছে পলিসির ব্যাপার", "তা পলিসিটা যে বদলেছে তাতে তো আপনায় আমার উপকার-ই হচ্ছে।" দূরের টেবিলের বক্তা এবার উঠে এলেন. "পলিসিটা বদলেছে কেন, আপনাদের নতুন কর্তা লোক ভালো বলে, নাকি পলিসি বদলেছে বলেই আপনাদের নতুন কর্তা ভালো মানুষটি সেজেছেন।"

"সে যাই হোক মানেটা তো একই, আমাদের উপকার" "ছাই, মালিকের উপকার, সেই সুবাদে আপনার উপকার"

সুবাদ যাই হোক উপকার তো বটেই ভাই। ওটা আর অস্বীকার করি

কী করে বলুন, আগের কর্তা বিজিতবাবুর টাকাটা আটকে দিলেন, এ-কর্তা পাইয়ে দিলেন'

"এ-কর্তা কি দয়া করে পাইয়ে দিলেন ? মালিক ঠিক করেছে দেব, এই কর্তার হাত দিয়ে পাইয়ে দিলেন, মালিক যদি ঠিক করতো দেব না তখন দেখতেন এই কর্তাই ফোঁস করছেন"

"তাহলে তো মানুষের দোষগুণের কথা ছেড়ে দিতে হয়। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না, আর অফিসার একজন ভালো একজন খারাপ হতে পারে না ?"

বিজিত এবার কথা বললো "উনি কিন্তু বললেন যে টাকাটা আমার তিন বছর আগেই পাওয়া উচিত ছিল"

"তার মানে ভাব দেখালেন ইনি ইচ্ছে করেই টাকাটা দিয়ে দিলেন, আগের কর্তা ইচ্ছে করেই টাকাটা দেন নি' এইটাই তো মশাই বিজনেস ম্যানেজমেণ্টের মডার্ন স্ট্র্যাটেজি"—

ইউনিয়নের নতুন পাণ্ডাটি এতক্ষণে দেয়ালে পোস্টারটি সেঁটে দিল। দেয়ালে আরো অনেক পোস্টার ছিল। তা থেকে নতুনতমটি এইটুকুতে শুধু আলাদা কালিটা নতুন, তখনো ভেজা ভেজা, চারপাশ থেকে বেশি উজ্জ্বল। সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখে ইউনিয়নের নেতা বললেন এই যে এত বড় বড় সব ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনিঙ সেণ্টার আর বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট খুলেছে সেখানে কি ঘোড়ার ঘাস কাটা হয়। ওদের সেদিনের সেমিনারে বক্তৃতা হয়েছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে যতোটা পারো পার্সন্যাল কর, সাধে কি দাদা টাই আর কোটের বদলে হাওয়াই শার্ট' ? অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে যতো পার্সন্যাল করবে ম্যানেজমেণ্ট ততো বেশি ইমপার্সন্যাল হবে ? এ-অফিসার ভাব দেখাবে ও-অফিসার করে নি, আমি করে দিলাম, ও-অফিসার ভাব দেখাবে সে-অফিসার করে দেয় নি, আমি করে দিলাম। অর্থাৎ সবটাই যেন অফিসারের মর্জির ওপর, অফিসার ভালো কি মন্দ তার ওপর ডিপেণ্ড করছে, ততো বেশি করে মালিক আড়ালে যেতে পারছে, ভাবটা যেন কোম্পানি তো দিতেই চায়, অফিসারই বাগড়া দেয়"

"ভাই যতো বক্তৃতাই দিন অফিসাররাও তো মানুষ, একজন থেকে আর একজন আলাদা হবে না ? ব্যবহার আলাদা হবে না ? সবই কি অত ষড়যন্ত্র করে হয় ?"

'দাদা অয়, অয়, Zানতি পার না, অফিসাররা মানুষ বটে, তাই কেউ বেগুন

ভাজা দিয়ে লুচি খায়, কেউ আলু ভাজা দিয়ে, কিন্তু ওরা একটা শ্রেণীর দালাল, সেই দালালিতে ওরা এক”

“সর্বনাশ, এর পরই তো নকশালবাড়ি বুঝিয়ে দেবেন। বাদ দিন। বিজিতবাবু যে টাকাটা পেয়েছেন সেটা তো মায়া নয়,—তাহলেই হলো। হার্ড ক্যাশ ছাড়া আর সব কিছুই মায়া—এটা আমি বুঝে গেছি, আমি দিব্বি গিলে বলছি আর কখনো কোনো অফিসারকে ভালো বলব না”

ইউনিয়নের নেতা ফিরতে ফিরতে বললেন—“আমি ইচ্ছে করেই কথাগুলো বললাম, দুদিন ধরে দেখছি, শুনছি, যেন বিজিতবাবুর টাকাটা এই অফিসার উদ্যোগ করে পাইয়ে দিলেন। এইসব করতে করতে যেদিন কারো গর্দান নেবে সেদিনও বলবেন আসলে অফিসারের কোনো দোষ নেই।”

“আচ্ছা, মানুষ ভালো হলে আপনাদের খুব অসুবিধে, না ?”

“মানুষের ভালোখারাপে কিছুই এসে যায় না দাদা। চেঞ্জ্‌ড্‌ পলিটিক্যাল সিচুয়েশনে মালিকপক্ষ তার এক্সপ্লয়টেশনের সিস্‌টেম্‌ পাল্‌টেছে, অফেনসিভের ধরণ পাল্‌টেছে আমরাও যদি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে না পারি তবে দাঁড়াতে পারবো না—”

“আর দাঁড়াতে হবে না, এবার শুয়ে পড়ুন গে। করি কেরানিগিরি, আর আপনারা সবসময় বোঝাচ্ছেন যেন আমরা মিলিটারি। অত যুদ্ধু যুদ্ধু করতে পারবো না মশাই। বউ রাগ করবে”

ইউনিয়ন নেতা একটু হেসে বিজিতের দিকে ফিরলেন—“একসঙ্গে তো অনেকগুলো টাকা পাবেন, ইউনিয়ন ফাণ্ডে কিছু দিয়ে যাবেন—

বিজিত হেসে ঘাড় হেলালো।

বেলা চারটে নাগাদ টাকাটা যখন সত্যিসত্যি বিজিত হাতে পেল তখনও টাকাটা তার নিজের মনে হলো না। নিভাঁজ একশ টাকার লম্বা লম্বা নোটগুলি ক্যাশিয়ারবাবু উল্টেপাল্টে চার কোণা দিয়ে চারবার গুনলেন। বিজিত ওভাবে গুনতে পারে না। সে একটা একটা করে নোট গুনে ভাঁজ করে ভেতরের পকেটে রেখে, ওপর দিয়ে একবার হাতিয়ে বোতামগুলো ভালো করে লাগালো। তারপর চলে যাবার জন্য ফিরেই ঘুরে দাঁড়ালো। বোতামগুলি খুলে ভেতরের পকেটে হাত দিয়ে দুই আঙুলে বুঝে একটা দশ টাকার নোট তুলে এনে বললো—“একটা নোট ভাঙিয়ে দিন—পাঁচ টাকায়।” ভাঙানি নোটের পাঁচ টাকার একটা

পাশ পকেটে ও আর একটা ভেতরের পকেটে রেখে বাইরে থেকে হাত দিয়ে বুঝে, একটু বেশি ফোলা, বোতামগুলি সযত্নে এঁটে, বিজিত এগিয়ে ইউনিয়নের নেতার সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচটি টাকা বাড়িয়ে দিল। ধন্যবাদ পেয়ে বড়বাবুর কাছে গিয়ে বললো "আমি আজ একটু আগে আগে বেরচ্ছি" "ও হ্যাঁ, যাও, সাবধানে যেও।" বিজিত টাকায় ফোলা পকেট নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

এতগুলো টাকা একসঙ্গে পকেটে নিয়ে বিজিত কোনোদিন অফিস থেকে বেরয়নি, তার কোনো সহকর্মীও বোধহয় কোনোদিন বেরয়নি। বেরোবার কথাও নয়। পূজোর আগে মাইনের দিনেই অ্যাডভান্স পেলে তাও বড়জোর হাজারের কাছাকাছি টাকা পকেটে থাকে। তবে মাইনে আর অ্যাডভান্স একদিনে তারা নিতে চায় না। ফলে এতগুলো টাকা পকেটে নিয়ে অফিস থেকে একা একা বেরিয়ে আসায় নানা ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

বরাবর দশটা নাগাদ উঠে পাঁচটা নাগাদ নেমে আসা যে সিঁড়ি দিয়ে চারটে নাগাদ সেটা অপরিচিত। হালকা পকেটে সিঁড়ি দিয়ে তরতরানোর বদলে ভারি বুক পকেটে পায়ে পায়ে নামতে নতুন। ভেতর দিকে ভারি বুক পকেটে জামার বাঁ দিকটা একটু ঝুলে যাওয়ায় নিজের জামা নিজের গায়ে পরে। অন্য অনেকের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামার বদলে একাএকা নামতে পায়ে পায়ে। সিঁড়ির শেষে রাস্তায় পড়ে চারপাশে লোকজনের ঠেলাঠেলির বদলে ফাঁকা রাস্তায়, গেটের পাশের পানওয়ালীকে ঝিমুতে দেখে নিজেকে বেকার।

একশ ছত্রিশ টাকা তিয়াত্তর পয়সা কম দুই হাজার টাকার ভারে বিজিতের নিজের চেহারা-চরিত্র নিজের কাছেই যেন পাল্টে যায়। টাকাটা ঠিক তার হৃৎপিণ্ডের ওপরের চামরাটা ছুঁয়ে আছে। বাইরের বুক পকেটের ওপর হাত দিয়ে বুঝতে ইচ্ছে করলো অতগুলো নোটের তলা থেকেও হৃৎপিণ্ডের ধ্বনিটা বোঝা যায় কি না। কিন্তু বুক পকেটে অমন করে হাত দিলে লোকে বুঝবে ভেতরের পকেটে টাকা ঠিক আছে কি না দেখছি। এতগুলো টাকা সামলানোর অভ্যেস নেই, সুতরাং ট্যাকসি না নেয়াই ভালো। টাকাটার সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো লোককে

জড়ালেই ব্যাপারটা আর আমার আয়ত্তে থাকবে না। এই রোদে এতোটা হেঁটে যাওয়া কষ্টকর। কিন্তু হাঁটাটাই সবচেয়ে নিরাপদ।

বিজিত বেশ চটপট হাসিখুশি চালাকচতুর ছোকরা। বছর ছ সাত হলো বিয়ে করেছে—তার আগে প্রেম এবং যে প্রেমিকা সে-ই স্ত্রী। অর্থাৎ অধ্যবসায় আছে, ধারাবাহিকতা আছে, সঙ্গতি আছে, বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। নিজেরই টাকার ভারে সে যখন এতো ভারি হয়ে যায় যে নিজেরই বুক পকেটে হাত দিতে পারে না বা ট্যাকসি নেওয়ার ভরসা পায় না অথচ হাঁটার সাবলীলতা হারিয়ে ফেলে তখন টাকাটা আর ভারটা আলাদা হয়ে যায়। যেন টাকাটা একজনের আর তার ভারটা বিজিতের শরীরের ওপর। হৃৎপিণ্ডটা তো বিজিতের অনেকবেশি নিজস্ব। সেই নিজস্ব ব্যাপারটার ওপর নিজস্ব হাত রাখা যাচ্ছে না যে টাকাটার জন্য, সেটা আর নিজের থাকে না।

অফিসার বলেছেন তিনি টাকাটা আদায় করে দিয়েছেন। কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি। নইলে গত তিনবছর পায়নি কেন। তার মানে অফিসার ইচ্ছে করলে না-ও দিতে পারতেন, অথচ দিয়েছেন।

ইউনিয়ন পোস্টার টাঙিয়েছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জয়। কথাটা তো খানিকটা ঠিক বটেই। সমবেত দাবির সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন তার কথাটাও বলেছে বৈ কি।

তার নিজের কিছু বলার নেই। এরপর থেকে মাসে মাসে এই টাকার হিসেবে যখন তার মাস-মাইনের নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটবে তখন সে ভাবতে পারে সারামাসের পরিশ্রমের জন্য টাকাটা পাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করে এতগুলো টাকা একসঙ্গে পেয়ে সে এ-হিসেবটা কিছুতেই মেলাতে পারছে না যে তারই এতোদিনের পরিশ্রম জমেজমে এতগুলো টাকা হয়েছে। নিজের মাস মাইনের টাকা জমেজমে কেমন ফালতু টাকা হয়ে গেছে।

রাস্তার ছায়া আর রোদের জাফরি কাটা। ট্রামগুলি খালি পেটে ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে বিনে কারণে যেন ফুঁসে চলছে। এক একটা বাসস্টপে হঠাৎ হঠাৎ দু একটা লোক আচমকা নেমে অপ্রস্তুত পায়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েও দোকানীর ভুরু দুটো ওপর দিকে টেনে তোলা, যেন ভাব জানছে কিন্তু চোখ খুলতে পারছে না। ফার্নিচারের দোকানের আয়নায়

আয়নায় এখনো চকিতে এক-একজনের ছায়া পড়ছে, ভিড়ের গাদাগাদি নেই একটা ডবল্ স্প্রিঙের খাটের ওপর চারইঞ্চি ডানলোপিলো দেয়া, বিছানায় গা দিলেই টেনে নিয়ে ডুবিয়ে দেবে, বাইরে থেকে দেখাই যাবে না, কেউ খুঁজে পাবে না, আর একটা ফুলসাইজ আয়না থাকবে পায়ের কাছে তাকালেই নিজেকে খুঁজে পাব। আমারতো কোনো দোকানে ঢুকতে বাধা নেই পকেটে কড়কড়ে টাকা আছে। আমাকে দেখে কি বিশ্বেস হবে যে ও-রকম একটা সওদা আমি করতে পারি। "ডাবল্ স্প্রিঙের খাট আছে।" "আছে" "দাম কতো পড়বে!" "কি রকম নেবেন, দেখে বলতে হবে, বসুন, এই পেছনেই গুদাম আছে, পকেটে টাকা আছে সুতরাং কোনো গলি খুঁজির মধ্যে ঢোকা চলবে না, থাক, দামটা বলুন, "পাঁচ ছশ থেকে হাজার বারোশ, বার্মাটিকের নিলে" "চার ইঞ্চি ডানলোপিলোর গদি?" "কতো বাই কতো ফুট?" "সাত বাই পাঁচ" "শ ছয়েক মতো হবে, আপনি বলুন, আমি প্রাইস লিস্ট দেখে বলছি"— তাহলে লোকটা আমাকে দেখে ভেবেছে আমি কিনতে পারি, ব্যাটা আহাম্মক, ব্যবসায় গণেশ ওল্টাবে—"ঠিক আছে পরে আসবো বলে বিজিত দোকান থেকে বের হলো। দোকানি এগিয়ে দিতে দরজা পর্যন্ত এলো আর লোকটাকে আরো বিশ্বাস করার জন্যই ঠিক পাশের সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা পানামা কিনে দড়ি থেকে ধরিয়ে "আচ্ছা বলি" বলে ধীরেসুস্থে আবার হাঁটা শুরু করলো। সে ফোরটুয়েন্টি নয় যে তড়িঘড়ি পালিয়ে যাবে। কিন্তু যে দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে দড়ি থেকে ধরায় সে কি ডবল্ স্প্রিঙের খাট আর ডানলোপিলো গদি কিনতে পারে। না-পারলেও দোকানি ভাবে পারে। ইউনিয়নের নেতা বলে দিয়েছে মানুষের ভালো খারাপে কিছুই যায় আসে না। তেমনি দোকানিদের ইউনিয়ন নিশ্চয়ই বলে দিয়েছে দোকানির বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছুই যায় আসে না। তুমি খদ্দের সাজতে চাও, ভালো। তুমি খদ্দের হতে চাও, ভালো। পকেটে যখন একশ ছত্রিশ টাকা তেয়াত্তর পয়সা কম দুই হাজার টাকা আছে তখন আমি খদ্দের সাজতেও পারি, খদ্দের হতেও পারি।

"দিস ইজ ইওর ব্যাঙ্ক, টু আস এভরি কাস্টমার ইজ এ ভি-আই-পি" ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন আমি ঐ ব্যাঙ্কে দুই হাজার টাকার ভি-আই-পি হতে

পারি, আজ পারি না, চারটে বেজে গেছে, এখন আর ব্যাঙ্কে টাকা জমা নেবে না। নতুন শার্ট, নতুন প্যাণ্ট। নতুন শাড়ি। রেডিও। কাঁচের বাসন। যা-কিছু ইচ্ছে আমি কিনতে পারি! আমার পকেটে এখন একশ ছত্রিশ টাকা তিয়াত্তর পয়সা কম দুই হাজার টাকার ক্রয় ক্ষমতা।

বিজিত শেয়ালদায় পৌঁছে দেখলো বাসায় যাবার একটা বাস ফাঁকা অপেক্ষা করছে। জানলার কাছে বসে বাঁ-কনুই জানালায় রেখে হাত দিয়ে পকেট ছুঁয়ে থাকা যেতে পারে ভেবে সে বাসে উঠলো।

অন্যান্য দিন থেকে এক ঘণ্টা আগে বাসার দিকে যেতে যেতে অফিস থেকে ফেরবার সময়ের ভাবটা আবার ফিরে এলো। মাত্র এক ঘণ্টার পরিস্থিতি কতো বদলে যেতে পারে। যদি অন্যান্য দিনের মতো সময়ে বিজিত বাড়ি ফিরতো তাহলে মনে হতে পারতো তার পরিশ্রমলব্ধ টাকা নিয়েই সে ফিরছে। কিন্তু এই অসময়ে ফেরায় তার মনে হচ্ছে টাকাটা তার নিজের না।

বাসার গলিতে একটা নীলরঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে। পাশ দিয়ে গলিতে পা দিয়েই তার স্বপ্নার কথা মনে পড়লো। স্বপ্নার জন্য কিছু একটা কিনে আনতে পারতো। কিন্তু ততক্ষণ স্বপ্নার কথা একবারের জন্যও মনে পড়ে নি। আর কী-ইবা কিনে আনতে পারতো? স্বপ্না কী ভালোবাসে? কী?

স্বপ্না কী ভালোবাসে তা বিজিতকে ভেবেচিন্তে বের করতে হয়, বা বানাতে হয়। স্বপ্নাকেও তেমনি করতে হয় নিশ্চয়—যখন স্বপ্নার দরকার পরে যায় বিজিত কী ভালবাসে। অথচ মাত্র কবছর আগে....। স্বপ্না জানে না এই গলিতে পা-দেবার আগে, ব্যালকনিটা চোখে পড়ার আগে বিজিতের একবারের জন্যও স্বপ্নার কথা মনে পড়ে না। বিজিতকে দেখবার আগে স্বপ্নার কি বিজিতকে মনে থাকে। অথচ মাত্র ক বছর আগে....।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বিজিত ঠিক করে বসে আজ সে স্বপ্নাকে নিয়ে ফুর্তি করতে বেরবে। স্বপ্নার যদি মুড থাকে ভালই। না-থাকলে সে মুড এনে দেবে। বেলা পড়লে গা ধুয়ে বেরবে। স্বপ্না যেখানে যেতে চায় যাবে। যা কিনতে চায় কিনবে। যা করতে চায় করবে।

কড়াতে হাত দিয়ে বিজিতের মনে পলো খরচ করতে গিয়ে হিসেব

কষতে স্বপ্নার বড় রাগ হতো। একশ ছত্রিশ টাকা: তিয়াত্তর পয়সা কম দুই হাজার টাকার ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে সে আজ স্বপ্নাকে নিয়ে ফুর্তি কিনতে বেরবে।

কড়াটাকে একবার নাড়িয়ে বিজিত তৈরী হয়ে নিল, যেন মঞ্চে প্রবেশ করছে। এতোটা রোদে এসে তার গা ঘামে ভিজে, মুখের ভেতরটা শুকনো, পা দুটো ব্যথা। পায়ের পাতা দুটো ধুলোয় নোংরা মনে হচ্ছে। ডায়মণ্ড হারবার যাওয়া যায় না ট্যাকসিতে? বালির মধ্যে খালি পায়ে ....। বিজিত আবার কড়া নাড়লো। টাকার কথাটা স্বপ্নাকে বলবে না। একেবারে সারপ্রাইজ দেবে। ভেতরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

দরজা খুলে, দরজা থেকে হাত না নামিয়েই স্বপ্না বললো "কী ব্যাপার?" এলোমেলো চুল স্বপ্নার কপালে গালে। ডান হাত দিয়ে সেগুলো স্বপ্না সরাতে গেলে বিজিত ভেতরে ঢুকলো। স্যাণ্ডেলটা খুলতে খুলতে বলল "চলে এলাম"।

দরজায় ছিটকিনি দিতে দিতে ঘাড় ঘুরিয়ে স্বপ্না বললা—"কেন" "শরীর খারাপ?" বিজিত ঘরের ভেতর যেতে যেতে বলল— আদিকালের বঙ্গনারী ছুটি বা নিদেন হাফছুটিও তো ভাবতে পারতে"—স্বপ্নাকে গায়ে হাত দিয়ে দেখতে দেবেনা। জামাটা টাঙ্গিয়ে রেখে, লুঙ্গি পরে বাথরুমের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, চট করে যাতে স্বপ্না গায়ে হাত দিতে না পারে। হ্যাঙ্গারে জামাটার বা দিকটা খুলে। বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে সে এসে সটান শুয়ে পড়লো। স্বপ্না ফ্যানের স্পিডটা বাড়িয়ে দিল। ঘরটা কেমন অপরিচিত ঠেকছে। সে যখন অফিসে যায় আর যখন অফিস থেকে ফেরে তখন ঘরে এতো আলো আসে না। প্রতিদিন এতো আলোতে স্বপ্না একাএকা থাকে।

"বলো না কী হয়েছে"—স্বপ্না জিজ্ঞেস করার ছুতোয় খাটের কাছে এগিয়ে এলো। স্বপ্না এখন আর চট করে কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখতে পারছে না।

"ধরো না ছুটি হয়ে গেছে, রবিবার সে কেন গো মা এত দেরি করে?"

"না, আমি তো দুপুরের রেডিয়ো শুনেছি, তেমন কিছু তো হয় নি"

"কোনো মন্ত্রীটন্ত্রী পটল তোলেনি বলছো?"

"কারো মারা যাওয়া নিয়ে রসিকতা ভালো নয়" গম্ভীর সুরে কথাকটি বলে ফেলে স্বপ্না বিজিতের কপালে হাত দেয়। বিজিত বলে "কপালে হাত দিলেই চোখ বুঁজে আসে কেন? কী? হলো তো, জ্বর হয় নি"

এবার বিছানার পাশে বসে দুহাত দিয়ে বিজিতের দুই ঘাড় ধরে ঝাঁকিয়ে স্বপ্না বললো "বলো না কী হয়েছে"

স্বপ্নার বাঁ হাতের চুড়িগুলো ডানহাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে বিজিত বললো—"চলে এলাম, চাকরি করতে করতে মনে হলো বড় বেশি চাকরি করছি, দশটা-পাঁচটা, দশটা-পাঁচটা, অথচ বাড়িতে আমার সুন্দরী প্রেমিকা। আমার কি অফিস পালাবার রাইট নেই ? অফিসপালানো প্রেমিকদের বার্থরাইট। যেমন ভাবা অমনি কাজ। পেনটা পকেটে ফেলে চেয়ার ছেড়ে গটগট করে বেরিয়ে এলাম, বড়বাবুর চোখের ওপর দিয়ে, বুড়ো নিশ্চয়ই ভেবেছে বাথরুম টাথরুমে গেছি"

"সত্যি বলছো ?"

"সত্যি কি মিথ্যে তাতো চোখের সম্মুখেই দেখতে পাচ্ছ। এখন আমার বড়বাবুর সামনে থাকার কথা, আছি আমার সুন্দরী প্রেমিকার সামনে"

"জ্বর আসে নি, তবে আসবে। যেরকম বাজে বকছো। কাল জিজ্ঞেস করলে কী বলবে ?"

"অফিসপালানো প্রেমিকদের বার্থরাইট"

"তুমি -তা আর প্রেমিক নও"—বিজিতের ঘাড় থেকে হাত দুটো তুলে নিয়ে সোজা হয়ে বসতে বসতে স্বপ্না বললো। বিজিত প্রমাদ গনলো। ব্যাপারটা বেলাইনে যেতে পারে। কিন্তু চট করে স্বপ্নাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানতে সঙ্কোচ হচ্ছে। খুব ভদ্রভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে স্বপ্না উঠে যেতে পারে। এখুনি একটা কথা বলা দরকার।

"বড়বাবু যদি আমার জবাব শুনে তোমার মতো বলেন তুমি তো আর প্রেমিক নও, তাহলে আমি বলবো আপনার বাড়িতে গিয়ে খবর নেবেন"

"ছিঃ, বড় ভালগার হয়ে যাচ্ছ দিন দিন" স্বপ্না উঠলো, "দাঁড়াও, চা করি" ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিজিত লজ্জা পেল। বলার আগে বোঝে নি। সত্যি ভালগার হয়ে গেছে। দিনে দিনে গেয়ো হয়ে যাচ্ছি। খোলশ খসে পড়ছে। এখন খদ্দের হয়ে গেছি। জীবনের কাছ থেকে একটু মজা, আরাম, ফুর্তি খরিদ করতে চাই, যতোটা ফাউ পাওয়া যায় মারতে চাই। বেকায়দায় প্রসঙ্গ চাপা দিতে অনায়াসে ভালগার। বিজিত ফ্যানের মাঝখানে জ্বলজ্বলে রুপালি চাকতির ভেতর নিজের দলাপাকানো চেহারার দিকে তাকিয়ে পড়ে রইল।

স্বপ্না পটে চা দিয়ে এলে উঠে বসলো "চলো আজ একটু ভ্রমণে বেরব"

"কোথায়?" স্বপ্না মোড়া টেনে নিয়ে বসলো। বাঁ দিক থেকে রোদের আভা এসে স্বপ্নার কানের পেছন দিয়ে গলা বেয়ে যাচ্ছে।

"এমনি যেখানে তোমার খুশি"

"তুমি বলবে বেড়াতে যাবে আর বলছো আমার খুশি"

"এই এদিক সেদিক, লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ—"

"ও সামাজিকতা? ও বিজনেসে নেই" চিনেবাদামের হাঁক শুনে স্বপ্না বললো "দাঁড়াও বাদাম কিনে আনি"—

দরজা খুলে স্বপ্না নিচে নেমে গেল। বিজিত পটের ঢাকনা খুলে চামচে দিয়ে নেড়ে নিজের জন্য চা ঢালতে লাগলো।

ঘরটা বড় বেশি সাজানো। কেমন পুতুল নাচ বা থিয়েটারের স্টেজ মনে হয়। স্বপ্নার এ-সব বাতিক ছিল। আমারও। বাতিক এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বরঞ্চ এখন অগোছালো ঘর দোর দেখলে অস্বস্তি হয়।

বাতাসে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো জামাটা দুলছে বাঁ-দিকে কাত হয়ে। অতগুলো দশটাকার নোট নেয়াতেই মোটা হয়ে গেছে। না নিয়েই বা উপায় কি। যদি দুই হাজার টাকা পুরো হতো তাহলে অত মোটা হতো না। নতুন কোনো রেকর্ড কিনবো। রেকর্ড প্লেয়ারটার ওপর একটা ফুলদানি। স্বপ্না নিশ্চয়ই আমি চলে গেলে শোনে। আমারই শোনা হয় না।

স্বপ্না ফেরার পথে একটা পিরিচ নিয়ে এলো। মোড়ায় বসে পিরিচটা বিছানার ওপর রেখে বাদাম খেতে লাগলো। বিজিত এদিকে পাশ ফিরলো। স্বপ্না বড় বেশি গোছানো। বিয়ের পর পর একটু অসুবিধেই হতো। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। স্বপ্না লুঙ্গি-পরা সইতে পারতো না। বাড়িতে পাজামা পাঞ্জাবি পরে থাকতে হতো। অবশেষে এক বার্মিজ লুঙ্গি যোগাড় করে তার শিল্পগুণ বুঝিয়ে....। স্বপ্না বাদাম খেতেও পিরিচ আনে।

স্বপ্না বাদাম ভাঙলো। বিজিত হাত বাড়ালো। দুটো দানার একটা বিজিতের হাতে দিয়ে একটা নিজের মুখে ফেললো। তারপর দুজন দুজনের দিকে তাকাতেই,—গড়ের মাঠের, গঙ্গা নদীর, দক্ষিণেশ্বরের, বিকেলের, এমনি করে, বিজিতের, শুয়ে থাকা, ঘামে, আর, বাদাম ভেঙে, স্বপ্নার, খাওয়ানো,—এক সঙ্গে হেসে উঠে স্বপ্না বিষম খেয়ে কেশে উঠলো। আঁচল চাপা দিয়ে কাশতে কাশতে মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ফুলদানী ঝন্‌ঝন্‌ ভেঙে যাওয়ার শব্দে দরজায় কড়া নড়ে। বিজিত দরজা খুলতে যায়। স্বপ্না কাশি থামাতে থাকে।

লবিতে ভারি জুতোর আওয়াজ তুলে কেউ যেন ঢুকলো। বসার শব্দ কানে আসে। ততক্ষণে কাশি থেমেছে। স্বপ্না আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছছিল, বিজিত ঘরে ঢুকে বললো "তোমার কাছে এসেছেন।" আঁচলটা দুহাতের মধ্যে মুঠো পাকিয়ে দ্রুত স্বপ্না প্রশ্ন হানে "আমার কাছে? কে?" বিজিত দু ঘাড় তুলে দুই হাত উল্টিয়ে বেরিয়ে যায়। মুঠো পাকানো আঁচলটা দিয়ে মুখটা

একবার মুছে, শাড়িটা একটু আধটু টেনে স্বপ্না পর্দা তুলে বেরিয়ে এসে বাঁহাতে পর্দাটা ধরেই ডান হাত কণ্ঠে দিয়ে বলে ওঠে ' দীনুদা—কবে এসেছো ?"

বিজিতই যেন এসেছে, একেবারে অকস্মাৎ স্বপ্নার বাড়িতে, এমনভাবে সে হাতের মুঠোয় হাত সামনে ঝুলিয়ে, স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে, পর্দা তোলা বাঁ-হাত পর্দা থেকে সরাতে পারে নি, ডান-হাত কণ্ঠায় দিয়ে 'আপনি?' রোজ স্বপ্নার বাড়িতে আসি। গলিতে ঢোকবার আগে স্বপ্নার কথা মনে পড়ে না।

স্বপ্না বিজিতের দিকে চেয়ে বললো 'তুমি চিনতে পারোনি? দীনুদা, দীননাথ মজুমদার, আমার পিসতুতো ভাই, বিয়ের সময়"—প্রতিনমস্কার করে বিজিত বললো, "ঠিক চিনতে, মানে, তখন তো, বসুন" দীননাথ ও বিজিত বসলো, স্বপ্না একটা চেয়ারের মাথা ধরে দাঁড়িয়ে বললো, "তারপর ? কী খবর, একেবারে কলকাতায় ?"

দীননাথের পরনে টেরিলিনের প্যান্ট-কোট টাইসহ। বোধহয় গরম লাগছিল, টাইটা একটু ঢিলে করতে করতে বললো "এই ব্যবসার কাজে, তোমার বাসা খুঁজতে একেবারে হয়রান, আমরা মফস্বলের মানুষ, কলকাতার রাস্তাঘাট-ও চিনি না"

"তা আমাকে একটা চিঠি দিলেই তো পারতে, আমি স্টেশনে থাকতাম"

"আমি একেবারে হঠাৎ চলে এসেছি, বাই রোডে।" বিজিতের পুরোন মুদ্রাদোষ মাথা চাড়া দিল, ইংরেজি বলছে, বাই রোডে, ইংরেজি-বাঙলা প্রিপজিশন-বিভক্তি সব "এখানে একটা কাজের টেণ্ডার দিতে"

"টেণ্ডার মানে কি, কাজই বা কি?" স্বপ্না শুধোয়।

"আমি তো কণ্ট্রাক্টরি করছি প্রায় দশ বছর হলো"

"তা করো, একটু চা করি" স্বপ্না রান্নাঘরের দিকে যেতে বিজিতকে অগত্যা বলতে হয় "আপনার কি কন্‌স্ট্রাক্‌শনের কাজ ?" "কন্‌স্ট্রাক্‌শন্ ডেস্ট্রাক্‌শন্ সব কাজই করি, যখন যা পাই, আগে টুকটাক করতাম, সিক্সটি-টু-র পর তো নর্থবেঙ্গল আর আসামে রাস্তাঘাট সব কাজ প্রচুর হয়েছে, তখন জয় মা তারা বলে সর্বস্ব দিয়ে লেগে গেলাম, তো লাগ্‌তো লাগ্ ভেলকি লাগলো, তারপর সিক্সটি-ফাইভে পাকিস্তান ওয়ারের টাইমে আরো কাজ হলো" দীননাথ আবার টাইয়ে হাত দিতে বিজিতের মনে হলো তার খুব গরম লাগছে, লাগবারই কথাত যে-গরম পড়েছে, তার মধ্যে আবার ধড়াচূড়া, ভেতরে নিয়ে যাবে কিনা ভাবতে মনে হলো সবাইকে শোবার ঘরে নিতে স্বপ্নার খুব আপত্তি। টেবল ফ্যানটা আনবার জন্য উঠলো।

ঘরে স্বপ্নাকে জিজ্ঞেস করলো—"কে ?" "আমাদের পিসতুতো ভাইদের কী রকম আত্মীয় হয়, আমাদের বাড়িতে খুব আসা যাওয়া ছিল"

"ফ্যানটা নিয়ে যাই, ওঁর খুব গরম লাগছে, প্যান্ট-কোট পরে এসেছেন তো? বাই রোডে—" নিরীহ মুখে বিজিত বললো। মুখে হাসি নিয়ে স্বপ্না চোখ পাকিয়ে উঠলো।

"না, না ফ্যানের কি দরকার ছিল ?" দীননাথ আপত্তি করলো। বিজিত প্লাগ লাগাতে লাগাতে বললো "না, খুব গরম পড়েছে তো, আপনি কোটটা খুলে বসুন না"

"না, ঠিক আছে"। স্বপ্না এই সংলাপ শুনে প্রমাদ গুনলো। বিজিত কি আবার লেগপুলিঙ শুরু করলো নাকি। না, আজকাল তো সে-সব একেবারেই নেই।

বিজিত আবার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলো "মিষ্টি-টিষ্টি কিছু নিয়ে আসি!" স্বপ্না চায়ের জল নামাতে নামাতে বললো, "থাক না, আবার বেরবে কি ?" "তা কি হয় ? ভদ্রলোক এসেছেন" "বা বা তোমার ভদ্রতাজ্ঞান তো ষোল আনা, আমি আবার ভাবছিলাম লেগপুলিঙ না শুরু কর" "কী যে বলো, কী আনবো," "আনো কিছু, এখন বিস্কুট-চা দিচ্ছি, বসবে তো কিছুক্ষণ, পরে মিষ্টি দেব"

বিজিত প্রথম ভাবতো স্বপ্না কি একটু আপস্টার্ট ? এই সব আতিথেয়তা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিল। কোথাও সন্দেস রসগোল্লার সঙ্গে চা দিলে কিছুই ছুঁতো না, পরে বলতো, খেতে দিতে জানে না, খাবো কেন। এতো রকমের ডিস আর গ্লাশ আর চামচ ইত্যাদি কিনতো—বিজিতের একটু অস্বস্তি হতো। এখন বিজিতেরও অভ্যাস হয়ে গেছে।

গলির মোড়ে একটা শাদা গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। সেটার পাশ কাটিয়ে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে বিজিত যখন ফিরলো তখন ঘরে সন্ধ্যা, দেয়াল আলোটা জ্বালানো। বিজিত প্যাকেটটা ভেতরে রেখে এসে বসতে স্বপ্না বললো "দীনুদা নেমন্তন্ন করছে নর্থ-বেঙ্গলে যেতে, পাহাড়-গগুার-ফ্লাড সব নাকি দেখিয়ে দেবে ?"

"ফ্লাডও বুঝি ওঁর কথা শোনে ?" স্বপ্না না হেসে পারে না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বিজিত পুরোন ফর্মে। একটু হেসে দীননাথ বললো "তা একটু শোনে বই কি, ধরুন এই বর্ষাতে সাড়ে বারো লাখ টাকার কাজ করলাম, এম্ব্যাঙ্কমেন্ট, তিস্তার, তা যদি কোথাও একটু লখীন্দরের বাসরের ছিদ্র রেখে দি কোনো শালা এঞ্জিনিয়ারের বাবা ধরতে পারবে না, ব্যস, তাহলে তো সামনের বছর আবার দু কোটি টাকার কাজ।" "ওরে বাবা তুমি কি ও-রকম ফাঁক রেখে কলকাতায় পালিয়ে এসেছ, বাঁধ টাধ ভাঙলে আবার গিয়ে কণ্ট্রাক্টারি করবে ?" "না না, উনি বললেন কি না তাই বলছি। কে দেখতে যাচ্ছে মশাই ? আমি সিক্সটি-থ্রিতে পনের ষোল হাজার ফুট অল্‌টিচিউডে স্নো লাইনে, রাস্তা বানিয়েছি। ওখানে তো জম্মে গাড়ি যাবে না। কবে আবার চীনারা আক্রমণ করবে তখন গাড়ি চলবে। তা ততোদিন যদি ঐ রাস্তা টেকে তাহলে আমরা খাবো কি ? কতো স্পেসিফিকেশনের বহর। সব ফাইল-পত্তর নিয়ে গিয়ে মিলিটারির অফিসারকে বললাম—কি ভাবে কাজ করবো বলো। সে ব্যাটা বললো

তোমার যে-ভাবে খুশি করো, তোমার লাভ তোমার, আমার বখরা আমার। ব্যস আমিও মাটির ওপর পিচ ঢেলে দিলাম। মিলিটারি এমার্জেন্সির কাজ, অডিটও নেই, ইনস্পেক্শনও নেই, আরে লাভতো মশাই মিলিটারি কণ্ট্রাক্টে,"

স্বপ্না উঠে গেল। এরপর মিষ্টি দেবে। বিজিত অগত্যা বললো "আপনার তো বেশ রোম্যান্টিক কাজ, ষোল হাজার ফিট উঁচুতে আবার তিস্তা নদীতে আবার কলকাতায়"

"টাকা যেখানে আমরা সেখানে, আর এই কণ্ট্রাক্টর জাত মশাই, পাহাড় বলুন পাহাড়, নদী বলুন নদী, জঙ্গল বলুন জঙ্গল যেখানে ফেলবেন ঠিক টাকা তুলে নিয়ে নিয়ে আসবে" দীননাথ ক্যাপস্টান সিগারেট একটা দিল বিজিতকে, বিজিত নমস্কার করে বললো "আমি বড় একটা খাই না"

ট্রে-তে করে মিষ্টি আর সরবত নিয়ে এলো স্বপ্না। রাখতে দীননাথ বলে উঠলো "এ-সব আনলে কেন, চলো না একটু বেরই, চলুন না"

"আচ্ছা, খাও তো" স্বপ্না বসলো। দীননাথ ট্রেটার দিকে তাকিয়ে বললো "বাঃ ভারি সুন্দর তো সেটটা। সত্যি স্বপ্না, তোমাদের টেষ্টই আলাদা। কী সুন্দর সেটটা কিনেছ। বিজিত সেটটা দেখলো। "কী সুন্দর ঘরটা সাজিয়েছ" বিজিত ঘরটা দেখলো "আরে এ-সব হচ্ছে টেষ্টের ব্যাপার। তোমার বৌদির কি কোনো টেষ্ট আছে। গাদা গাদা টাকা দি আর গাদা গাদা গয়না বানায়। কতো বলি আজকালকার দিনে একটু সভ্য ভব্য হও। তা কে কার কথায় কান দেয়। তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, একটু শিখিয়ে দিও। মেয়েটাকে দার্জিলিঙে কনভেণ্টে দিয়েছি, ও-যদি কিছু শেখে।"

দীননাথ ট্রে থেকে চামচ দিয়ে ভেঙে মিষ্টি খেতে লাগলো। বিজিত দীননাথের কথা অনুযায়ী ট্রে, ডিস, গ্লাশ, চামচ, ঘরের বাতি ও পর্দা দেখে তারিফ করলো স্বপ্নার। যেন বিজিত দীননাথকে পথ দেখিয়ে স্বপ্নার বাড়িতে নিয়ে এসেছে, স্বপ্না বা দীননাথের সঙ্গে তার ঐটুকুই সম্পর্ক যেন—তারিফ করার মতো এমন একটা দূরত্বে পৌঁছে গেছে বিজিত।

দীননাথ এক ঢোক জল খেয়ে বললো "কী ব্যাপার, তোমরা রেডি হও, চলো একটু বেড়িয়ে আসি"

স্বপ্না বললো "কোথায় যাবো? তার চেয়ে তুমি কলকাতা শহরটা একটু দেখে নাও, থাক তো মফঃস্বলে" "আরে সে জন্যই তো তোমাদের যেতে বলছি। এলামই যখন একটু কলকাতাটা দেখিয়ে দাও, আজকাল নাকি পার্কস্ট্রীটে সব রেষ্টুরেণ্ট হয়েছে কতো কায়দার, চুল কাটার সেলুন হয়েছে আর আমি কি শেষে ভীমনাগের সন্দেশ আর স্টার থিয়েটারের নাটক দেখে ফিরবো?"

হঠাৎ বিজিতের মনে পড়ে গেল তার তো আজ স্বপ্নার সঙ্গে ফূর্তি

করার কথা। স্বপ্না তো কিছুতেই বেরবে না। এই সুযোগে যদি বেরনো যায় তাহলে বাবা দীননাথ বিদায় নিলে স্বপ্নাকে নিয়ে...। সে বলে উঠল "চলো না কেন, এতো করে যখন বলছেন" "তুমি যাও না, আমার ভাল লাগছে না"

দীননাথ বলল "আরে ওঠো, ওঠো, দেখবে বেরলেই ভালো লাগবে। যাও গেট রেডি। এদ্দিন পর এলাম। সবাই মিলে একটু আমোদ ফূর্তি করা যাক। যান মশাই, তৈরি হয়ে নিন।"

"তুমি যাও" বিজিত বললো। স্বপ্না চেয়ার ছেড়ে ভেতরে গেল।

বিজিত এতোক্ষণে দীননাথের প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞতা বোধ করল। আজকের সমস্ত দিকটাই বেশ সাজানো গোছানো, ভাল রিহার্সেল দেয়া নাটকের মতো, চলছে। স্বপ্নাকে নিয়ে ফূর্তি করতে বেরবার যে পরিকল্পনা মনে মনে ছকছিল তা স্বপ্না নিমেষে উড়িয়ে দিতে পারত যদি বলত "ভাল লাগছে না, যাব না।" আর স্বপ্না তা বলতই। বেড়াতে যাওয়াটা আর অভ্যেসের মধ্যে নেই। খানিকটা জল ঢকঢক খেয়ে দীননাথ বলল—"আমরা বনজঙ্গল পাহাড় পর্বত করে বেড়াই মশাই, কলকাতায় এলে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। কোনদিন তো কলকাতায় থাকি নি, মাঝেমধ্যে এসেছি। তা-ও কম। কিছুই দেখি নি। এখন একটু দেখতে ইচ্ছে করে"

"কলকাতায় কী আর দেখবেন?"

"মানে লাইফ আর কি, কলকাতার লাইফ, পার্কস্ট্রিট, বালিগঞ্জ, যোধপুর পার্ক, নিউআলিপুর কতো কি হয়েছে, সেই লাইফটা আর কি"

"নিউআলিপুরে বা যোধপুর পার্কে একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলুন, তখন আপনাকে আর লাইফ দেখতে হবে না, লাইফই আপনাকে দেখবে।"

"তুমি এসো" ভেতর থেকে স্বপ্নার ডাক এলো। বিজিত উঠলো। স্বপ্না জামার পেছনের হুক লাগাচ্ছিল থুতনি দিয়ে হুকের সামনে আঁচল চেপে, চোখ উঁচিয়ে বিজিতকে বলল, "লাগিয়ে দাও তো" বিজিত স্বপ্নার হুক লাগিয়ে দিয়ে পেছন থেকে তার কোমর বেষ্টন করে ধরল। সেই বেষ্টনীর ভেতর চট করে ঘুরে গিয়ে স্বপ্না চোখ পাকিয়ে বলল— "কী হচ্ছে, কী ভাববে?" স্বপ্নার গায়ে পাউডারের আর নতুন জামার সুগন্ধ। বিজিত ঠোঁট এগিয়ে দিল। স্বপ্না একটা হাত তুলে বিজিতের ঠোঁট চাপা দিয়ে হাসিমুখে একটু দাঁড়িয়ে থাকতেই বাতাসে স্বপ্নার আঁচলটা খসে বিজিতের হাতের ওপর পড়ল। বহু বহু দিন এমন করে....।

স্বপ্না হাসি মুখে গেঞ্জির ওপর বিজিতের গলায় একটা চুমু দিল। তারপর বিজিতের বুকের ওপর ছোট কিল মেরে বলল "যাও"।

বিজিত স্বপ্নাকে ছেড়ে দিল। উৎসবের আমোদের ফুর্তির হাওয়া বইছে। জমবে। বাবা দীননাথকে ধন্যবাদ। স্বপ্না একটা প্যান্ট আর শার্ট বের করে দিল।

ওরা যখন বাইরে বেরল তখন সন্ধ্যা ঘন। পাশের পেট্রল পাম্পে নানা

রকমের আলো। এ-ফুটে ও-ফুটে বাচ্চাদের গলার আওয়াজ। একটা বাতাস দিচ্ছিল। স্বপ্না একটা সিল্ক বাতিকের শাড়ি পরেছে। চুল এলো খোঁপার মতো করে।"

গলির মোড়ে একটা মেরুন রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেটার পাশ কাটিয়ে বেরতে গেলে দীননাথ তার দরজায় হাত দিয়ে বলল—"এসো, আসুন।

. "ও বাবা তুমি একেবারে রথ নিয়ে এসেছ যে"

গাড়ির পেছনে দরজা খুলতে খুলতে দীননাথ বলল "গেল বছরে ফ্লাডটা আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। নইলে মিলিটারি এমার্জেন্সির কাজ-কর্ম সিক্সটি সিক্স সেভেনের পর তো প্রায় এক রকম বন্ধ।" স্বপ্না বিজিত ভেতরে ঢোকবার পর দীননাথ ঘুরে গিয়ে সামনের সিটে বসতে বসতে বলল, "আগে একটা জিপ ছিল, সেটা তো সব সময় সাইটে সাইটেই ঘোরে, তাই গেল বছর এটি কিনলাম। পার্সন্যাল ইউজের জন্য"—দীননাথ গাড়িতে স্টার্ট দিল। সেই ঘর্ ঘর্ আওয়াজের মধ্যে বিজিত জিজ্ঞাসা করল "এটাতেই বাই রোডে এসেছেন?" দীননাথ 'হ্যাঁ' বলল' পেছন থেকে কানের পাশের মাংসের কুঞ্চন দেখে বোঝা গেল। হেসে স্বপ্না বিজিতের হাতে একটা চিমটি কাটে। দীননাথ শুধোয়—"কোথায় যাব বলো"

স্বপ্না বিজিতকে বলল "উনি কলকাতার লাইফ দেখতে চান, তা সে তো তুমি ভালো জানো"

"ঘর থেকেই বেরই না আর আমি ভালো জানি"

'একটু ঘোরাঘুরি করে কোথাও বসে একটু চা টা খাওয়া যাবে"—তাহলে চলো রেডরোড ধরে একটু গাড়ি হাঁকিয়ে, গঙ্গার পাড়ে একটু বসে কোথাও যাওয়া যাবে"—স্বপ্না বাতলালো—"তাহলে গাড়ি ঘোরাই?"

"দরকার কি এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে"—স্বপ্না। তোমার কোটটা একটু খোলো, বাঙালের মতো এই গরমে কোট পরে এসেছ কেন?"

রাস্তার পাশে গাড়িটা দাঁড় করাল দীননাথ। গাড়িটা ঘরঘর করে কাঁপতে লাগল। কোটটা পেছনে ঠেলে দিতেই স্বপ্না খুলে নিল। আবার গাড়িটা চালাতে চালাতে দীননাথ বলল "আমরা কী করে জানব কোথায় কী পরতে হবে। ভাবলাম কলকাতা শহর, সব সাহেব সুবোদের কারবার, কোটপ্যান্ট না পরলেই নয়" গাড়িটা দীননাথ ভালোই চালায়। কোটটা ভাঁজ করে স্বপ্না দীননাথের সামনে ঝুলিয়ে দিল। কোট ছাড়া ধবধবে ফর্সা শার্টের হাতায় ঢাকা কব্জিতে দীননাথ যখন গাড়ি ঘোরাচ্ছে, গিয়ার দিচ্ছে, পা চালানোয় শরীরে একটু কাঁপুনি লাগছে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাড়ি আসছে কি না দেখছে, ষ্টিয়ারিঙের চাকার ওপর দশটা আঙুল মেলে দিচ্ছে, হাত বের করে সিগন্যাল দিচ্ছে তখন দীননাথকে কখন একসময় থেকে পুরোদস্তুর নায়েক মনে হচ্ছিল। কলকাতায়

সন্ধ্যা এসে গিয়েছিল। আলোর প্রপাতে আকাশ অবলুপ্ত আর মানুষজন নিজেদের আলোর বৃত্তের চারপাশে পাক খায় আর স্বপ্না ডাইনে, বাঁয়ে, সোজা বলে বলে দীননাথকে নির্দেশ দেয় আর দীননাথ গাড়ি চালায়। কখন একটি সময়ে এই গাড়ি তার তিন আরোহী নিয়ে যেন একটা উদ্দেশ্য পেয়ে গিয়েছিল, তাদের যেন কোথাও যাবার জায়গা আছে। বিজিতের পেছনের পকেটে টাকার বাণ্ডিলটা সব সময় শরীরে লেগে থাকা সত্বেও সে-ও এক সময় ভুলেই গেল স্বপ্নাকে ঘর থেকে বের করার জন্য দীননাথ ছুতোমাত্র ছিল।

পথ বাতলাবার জন্য ঠিক দীননাথের ঘাড়ের পেছনে সিটের মাথায় দুদিক থেকে হাত দুটো আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে রেখে স্বপ্না তারওপর থুতনি রেখেছিল। বিজিত পেছনের সিটে হেলান দিয়ে যেন প্রায় অন্ধকারে পড়েছিল। হাওয়ায় আঁচল উড়ে যায় তাই স্বপ্না বাঁ বাহুর নিচ দিয়ে সেটা কোলে টেনে রেখেছে। বিজিত স্বপ্নার চোখের নিচ থেকে ওপরটুকু দেখতে পাচ্ছে—আলো যেখানে ক্ষণে ক্ষণে পিছলোয়।

চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু দিয়ে ধর্মতলার মোড়ে পৌঁছে গাড়ি লাল আলোতে দাঁড়াতেই চার পাশের আলোর ঢেউ ক্ষণে ক্ষণে এসে গাড়ির ভেতরের অন্ধকারে ভাঙে, গাড়ির সামনের পাশের কাচগুলোয় হাজার হাজার হয় আর স্বপ্নার কপালে চুলে শাড়িতে, সামনে দীননাথের ধবধবে শাদা জামায় অবাস্তব বেগনি আলোর একটা ভিত তৈরি হয়। বিজিত এতো সেঁদিয়ে বসে যে সেখানে আলো পৌঁছচ্ছিল না। চারপাশে শব্দ আর আলো আর মানুষ। যেন শব্দে আর আলোয় ডুবিয়ে মানুষ জনকে ছেড়ে দেয়। দূরে ময়দানে পাক খাওয়া গাড়িগুলির লাল সাদা আলোর ঘূর্ণমান সারি। যেন সারাটা কলকাতা কোন আদিবাসী নাচ নাচছে।

ঘাড় একটুখানি ঘুরিয়ে দীননাথ খুব মৃদু গলায় শুধলো, "সোজা?" মৃদুতর গলায় স্বপ্না 'হ্যাঁ' বলতেই চমকানো সবুজের ধাক্কায় গাড়ি ছুটে ধর্মতলা পেরিয়ে ময়দানের অন্ধকারে, আলোয় নৃত্যে, ঝাঁপ দিল। মৃদুতম গলায় স্বপ্না ডাইন বলতেই গাড়ি গঙ্গার দিকে মুখ করে ছুটলো, তারপর মাতালের মতো পাক খেতে খেতে পাক খেতে খেতে রেড রোডে মুখ থুবড়ে পড়ল। বাতলাবার মতো আর পথ নেই।

এবার ফূর্তি আর ফূর্তি। বিজিত সামনের সিটের মাথা ধরে এগিয়ে এসে বলল "তুমি একটু গাড়ি চালাও না, দেখ ভুলে গেছ কিনা"

"আরে তুমি চালাতে পার না-কি? এসো এসো।"

'বহুদিন আগে, শিখছিলাম"---এতক্ষণে স্বপ্না পেছনের সিটে হেলান দিল।

বিজিত বলল, "যাওনা, একটু চালিয়ে দেখ"

"এসো এসো" দীননাথ গাড়ির গতি শ্লথ করে, পথের পাশে দাঁড় করায় স্বপ্না মুখ বাড়িয়ে দুপাশের গাড়ি দেখে, দরজা খোলে, ভারী ধাতব

আওয়াজে দরজা বন্ধ হয়ে যায়, স্বপ্না গাড়ির গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে সামনে এগোয় ও পেছন থেকে তীব্র হর্নের আওয়াজে আলোর স্রোত চুলের মূল ও ভেতরের জামার বাগুটা পর্যন্ত স্বপ্নাকে উদ্ঘাটিত করেই অন্ধকারে ফেলে দেয়, এ-গাড়ির হেডলাইট স্বপ্নার পা থেকে মাথার দিকে বিচ্ছুরিত, সামনে বহুদূর পর্যন্ত স্বপ্নার ছায়া রাস্তায় লম্বা, পেছন থেকে একটা নিঃশব্দ তীব্রতায় সে ছায়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই ছায়া লোপাট, স্বপ্না সামনের সিটের বাঁ দিকের দরজা খুলে ভেতরে সেধোয়। দীননাথ ডানদিকের দরজার সঙ্গে আরো লেপ্টে গিয়ে স্বপ্নাকে জায়গা দেয়, স্বপ্না ষ্টিয়ারিঙ ধরে। আমি শুধু ষ্টিয়ারিঙ ধরছি তুমি পা চালাও --

একটুখানি শব্দ করে গাড়ি ফের চলে। স্বপ্না রাস্তার পাশ দিয়ে চালাচ্ছে। গাড়ির স্পিড বেশি নয়, সামান্য। যেন রাস্তা শুকতে শুকতে এগচ্ছে, "বাঃ তুমি তো বেশ চালাও"—দীননাথ। "অতো ভয়ে ভয়ে চালাচ্ছ কেন"---পেছন থেকে বিজিত। "হ্যাঁ, তোমাদের নিয়ে শেষে একটা অ্যাকসিডেণ্ট করি আর কি" "আমরা তোমাকে অ্যাকসিডেণ্টের অনুমতি দিলাম"—বিজিত বলে সিটে হেলান দিল। আচমকা স্পিড একটু বাড়িয়ে দিল দীননাথ। দীননাথের বাম হাতটা আলগা করে ষ্টিয়ারিঙের কাছে ঝুলছে, দু একবার ষ্টিয়ারিঙটা ধরেও ফেলছে, স্বপ্না বললো "ভয় পেও না ষ্টিয়ারিঙ ফসকাবে না", স্পিড হঠাৎ করে দীননাথ বাড়িয়ে দিতেই স্বপ্না সোজা হয়ে শক্ত হাতে ষ্টিয়ারিঙ ধরলো দীননাথ হো হো করে হেসে স্পিডটা কমিয়ে দিল। দীননাথ মজা করছে আনাড়ি স্বপ্নাকে নিয়ে! তখনও দীননাথের ডান বাহুমূল জানলার খাঁজে, কোণাকুণি করে বসে আছে, বিজিত তার মুখের অনেকখানি দেখতে পাচ্ছে দীননাথ কখনো স্বপ্নার হাতের দিকে, কখনো মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বিজিত জানে এখন স্বপ্নার গলাটা খুব টানটান আর চিবুকের মাঝখানের গর্তটায় আলোছায়া। "স্পিড দাও স্বপ্না, কাছেই কোনো জাহাজে ভোঁ বাজলো আর পেছন থেকে হুড়মুড় করে একটার পর একটা আলোর ঢেউ স্বপ্নার গাড়িকে পরম্পরাগত অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে যায় আর স্বপ্নার আর দীননাথের মুখচোখ কয়েক মুহূর্ত মাত্র আলোকিত হয়ে ওঠে, "স্পিড দাও"—স্বপ্না পাশ দিয়ে একটা গাড়ি বেরিয়ে যেতেই একটা গানের কাটা ভাঙা ছেঁড়া যেন রক্তাক্ত, টুকরো এসে এ-গাড়ির গায় লাগে, "স্পিড দাও", এখন আর ময়দানে পাক খাওয়া গাড়িগুলোর আদিবাসী নৃত্য দেখা যায় না, বোধ হয় এ গাড়িও সেই নৃত্যের সারিতে "স্পিড দাও" আর নাচের বাঁশি বাজে বাতাস কেটে বেরিয়ে যাওয়া গাড়িগুলির শিষের মতো শব্দে "মেয়েদের মতো গাড়ি চালাও কেন?" বলে হঠাৎ একধাক্কায় দীননাথের ওপর উঠে দীননাথের দুই পায়ের ওপর নিজের দুই পা চাপিয়ে স্বপ্না অ্যাকসিলেটার চাপ দেয় আর গাড়িটা হঠাৎ ছুটে বেরতে থাকে, দীননাথ দরজার সঙ্গে আরো লেপটে যাবার জায়গা পায় না স্বপ্নার কনুই তার বুকে

গুতো মারে, ষ্টিয়ারিঙের ওপর স্বপ্না একটু ঝুঁকে যায়, আর একটার পর একটা গাড়িকে পেছন থেকে আলোয় বর্শার গেঁথে অন্ধকারে ছুঁড়ে দিতে দিতে স্বপ্না আরো দূর অন্ধকারের দিকে ছুটতে থাকে।

বিজিত আরো বেশি অন্ধকারে সেঁধিয়ে আছে। সে যে এ-গাড়ির একজন যাত্রী একা একা পেছনের সিটে বসে সে নিজেই সেটা ভুলে যাচ্ছিল। দীননাথ তার বাঁ হাতটাকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছে। সেটা রাখবার জায়গা না পেয়ে সে সিটের মাথায় ঘাড়ের পাশ দিয়ে লম্বা করে দিল। সে ড্রাইভিঙ সিটে বসে আছে। তার দুই পা এখনো ক্লাচ এ্যাকসিলরেটরে। অথচ তার হাতে ষ্টিয়ারিঙ নেই আর স্বপ্না নির্দয়ভাবে তার পা মাড়িয়ে এ্যাকসিলরেটরে চাপ দিচ্ছে। পাটাকে সরিয়ে নেবার মতো উদ্যোগও দীননাথের আর অবশিষ্ট নেই। অথচ স্বপ্না তার শরীরের সঙ্গে লেপটে। স্বপ্নার সঙ্গে তার হাত পা জড়াজড়ি। গাড়ি চালানোর একটা অংশের কাজ সেই করছিল। হঠাৎ করে তার পা মাড়িয়ে স্পিড বাড়িয়ে স্বপ্না এমন একটা অবস্থা তৈরি করেছে যেখানে কেউই আর কারো সঙ্গে কোন যোগাযোগ বোধ করছে না।

একটা জায়গায় মোড় পেয়ে স্বপ্না স্পিড একটু কমিয়ে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে আবার উল্টোমুখে চলা শুরু করল। পেছন থেকে বিজিতের হঠাৎ কথায় একই সঙ্গে দীননাথ আর স্বপ্না চমকে উঠল "কী ব্যাপার, ফিরলে যে, এটুকুতেই দম শেষ"

গাড়ির গতি আরো শ্লথ হয়ে এলো। স্বপ্না কিছু না বলে পা উঠিয়ে ষ্টিয়ারিঙ থেকে হাত সরিয়ে নিল, গাড়িটা একটা টাল খেতেই দীননাথ ষ্টিয়ারিঙে হাত দিল, স্বপ্না সরে গিয়ে সিটে হেলান দিল। তারপর সামনের দিকে তাকিয়েই বলল "তুমি কী আমার দম পরীক্ষা করছিলে নাকি ?"

"তা নয়, তবে হঠাৎ এমন দম নিলে যে আমি ভাবলাম বুঝি নিরুদ্দেশ যাত্রা, তা দেখলাম, না, নিরুদ্দেশ যাত্রা এক রাস্তার মোড়েই শেষ"—পেছন থেকে টেনেটেনে বিজিত বলল, যেন গর্তের ভেতর থেকে। "হঠাৎ মনে পড়ে গেল কিনা যে তুমি পেছনে বসে আছ তাই নিরুদ্দেশ যাত্রায় অরুচি ধরে গেল"

"দুর্ভাগ্য। আমি আবার তোমার হাতে নিরুদ্দেশ যাত্রার সৌভাগ্যে পুলকিত হচ্ছিলাম"

"গলায় কলসি বেঁধে সাঁতার কাটতে নামব এমন বোকা আমি নই"

"তাও ভালো, আমি আবার ভাবলাম কলসির বাঁধন বোধহয় আলগা হওয়ার কোন সুযোগ এসেছে"

গাড়ি চলছিল। তখন গাড়িটা যেন আপনগতিতে চলছে। দূরের আলোর বিন্দুগুলি ক্রমশ কাছে আসছে।

"সে-সুযোগ আর পেলাম কোথায়। পেছন থেকে কেমন টান পেলাম তাই গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিলাম, ফিরে যখন আসতেই হবে বেশিদূর গিয়ে

আর লাভ কি?" নিজের দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে, বাঁ হাতটা জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল; স্বপ্না একটা হাই তুলল। ডান হাতের ধাক্কায় তারই ভাঁজ করা দীননাথের কোটটা সিটের মাথা থেকে পেছনে বিজিতের পায়ের কাছে দুই হাত ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। বিজিত কোটটা তুললো না।

স্বপ্না দীননাথকে বলল "এখন কোথায় যাবে? "চলো কোথাও বসা যাক, কোনো রেষ্টুরেণ্টে"

'পার্কষ্ট্রিট"—বিজিত বলল।

রেড রোডে অস্পষ্ট আলোর রাজ্য থেকে ওরা পার্কষ্ট্রিটে ঢুকতে আলোর ধাক্কায় কেমন হকচকিয়ে গেল। দুই হাতে চোখ ঢেকে স্বপ্না বলল—"ইস, কী আলো!" দীননাথ আপ্লুত চোখে চারপাশে তাকিয়ে গদ্‌গদস্বরে বলল, "হ্যাঁ এই তো কলকাতা, এ দেখেও সুখ, কোথায় কোন পাহাড়ে বনেজঙ্গলে ঘুরেই জীবন কাটল; বুঝলেন বিজিতবাবু, আসলে লাইফ হচ্ছে কলকাতায়, কলকাতায় না আসলে জীবন বৃথা"

"একটা সার্টিফিকেট দিয়ে যান, মনুমেণ্টে টাঙিয়ে দেব"—বিজিত।

"না ঠাট্টা নয়"—দীননাথ।

'ব্যস, এখানেই দাঁড়ান, কী বলো, এটাতেই যাই?' বিজিত।

'আমি তো দীননাথের মতই, একেবারে আনাড়ি, তুমিও যে খুব অভিজ্ঞ তা তো জানি না'—স্বপ্না।

'আরে টাকা থাকলে আবার আনাড়ি কি বেয়ারাকে বকশীস দিলেই সব কিছু আপসে আপ হয়ে যাবে"—দীননাথ খুব আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে আস্তে করে পা বাড়াল।

ভেতরে স্তিমিত আলোতে তারা অনেকটা শান্তি বোধ করলো। যেন রেড রোডের পরিবেশটা আবার ফিরে এলো। বিজিত দরজায় দাঁড়িয়ে ফাঁকা টেবিলের জন্য তারপাশে তাকাতেই একজন আগিয়ে এসে ওপরে যেতে অনুরোধ জানায়। তাকে অনুসরণ করে ওরা তিনজন এতটুকু একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে।

ওপরের যে টেবিলটাতে ওরা, সেটা রেলিঙেব পাশেই। নিচের ঘরটাতে মৃদু আলো। কারোই কোনো কথা শুনা যাচ্ছে না—একটা চাপা মৃদু গুঞ্জন ছাড়া। খুব চাপা রবে একটা বিদেশী বাদ্য চলছে। এদের তিনজনের কেউই ইংরাজি বাদ্য বোঝে টোঝে না ফলে এদের কাছে বাজনাটা শোনাচ্ছিল যেন বাইরে বৃষ্টিতে কোথাও একটা প্রাকৃতিক ধ্বনি অনিয়মিত উঠছে।

একটু ধাতস্থ হলে স্পষ্ট হলো চাপা মৃদু গুঞ্জন আর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আরো কতগুলি আওয়াজ এই ঘরের ভেতর সক্রিয়। কাঁচের জিনিষপত্রের ভঙ্গুর সটান কঠিনতার, সাবধানে নাড়াচাড়া করায় ধ্বনির মৃত্যুর। আর তরল জলরব। অনুচ্ছ্বাসিত। যেন অন্তরালে নির্ঝর। মানুষের উদ্‌গত হাসির মতো।

বিদেশি বাদ্যধ্বনি থামল। বিচ্ছুরিত আলোয় একটা ছোট.

পরিসরের অনুচ্চ মঞ্চে একটি মেয়ে মাইকের সামনে দাঁড়াল। খুব চাপা গলায় কথা বলার মতো ঘনিষ্ঠতায় সে গান শুরু করে। বেয়ারা এসে তিনটি গ্লাশ রেখে যায়, আর এক তাড়া কেক-প্যাসট্রি। "এখানে এসে কি আর কেউ স্কোয়াশ খায়?" বিজিত গেলাশ টানতে টানতে বলল। গানটা দু এক লাইন হতেই গিটারের তার যেন গানের তাল লয় সবার কাছে ধরিয়ে দিল। গায়ে আঁচল জড়িয়ে স্বপ্না নিচের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। গায়ে আঁচল জড়ানোর জন্যই যেন সে একটু বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট। চাপা তরল ধ্বনিতে কেউ হাসে। গানের খুব দ্রুত তাল এতোক্ষণে যেন সবার কাছে ধরা পড়ে। গায়িকার ওপরে মৃদু অথচ স্পষ্ট একটা আলো। মেয়েটি হাসছে তার গানের তালের সঙ্গে তাল রেখে। দীননাথ গ্লাশ টেনে নেয়। না তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে স্বপ্না। গানের তালে তালে গ্লাশে আঙুলের বাজনা বাজে। স্বপ্না। গানের সুর আরো একটু উঁচুতে। দু একটা পায়ের মৃদু তাল। দীননাথ চুমুক দেয়, ঠক করে তাল অনুযায়ী গেলাশ নামিয়ে রাখে বিজিত। নিচে কোনো কোণা থেকে দু তিনবার মাত্র তালে তালে হাততালি। সঙ্গে চাপা হাসি। গানটার মুখটা তখন তালের মাথায় বার বার ফিরে ফিরে। ঐ মুখটাতেই সব তাল এসে মিলছে। গায়িকা দু তিনটি কলি একসঙ্গে উচ্চরবে গেয়ে মুখে ফিরতেই দু তিনটি ধ্বনি নানা জায়গা থেকে কোরাস অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ কেউ দেখা দিচ্ছে না। অথচ কাউকে চেনা যাচ্ছে না। স্বপ্না চামচেটা তুলে নিল। গেলাশের গায়ে চামচে দিয়ে তাল দিতে লাগল। গান তখন দ্রুততম লয়ে। নতুন দু তিনটি কলিতে বার বার ঘোরাফেরা করে মুখে ফিরে আসার তালের আকাঙ্ক্ষাটাকে গায়িকা নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে লালন করছে। অথচ সমস্ত গানটা এতো চাপা। যেন কেউ একা ঘরে গাইছে। কতোগুলো মানুষ একসঙ্গে কতো বড় ঘরে। অথচ গানটা যেন সবাই আপনমনে গাইছে। আপনমনে টেবিলের ওপর আঙুলের টোকা। আপনমনে কার্পেটের ওপর জুতোর টোকা। আপনমনে গেলাশে চামচের টোকা। আপনমনে হাততালি। আপনমনে কোরাসে গেয়ে ওঠা। কিন্তু কখনোই এ-সব কিছু একসঙ্গে ঘটে না। কখনোই সমস্ত ঘরের চাপা অস্পষ্ট মৃদু আলোয় ঘেরা জীবন আহত হয় না। কখনোই কাউকে আর একজনের দিকে হাত বাড়াতে হয় না।

স্বপ্না আপনমনে পা নাচাচ্ছিল, কেউ যদি তাকে হাত ধরে তোলে তাহলে নেচে ফেলবে।

গান শেষ হতেই আবার সেই ধ্বনিপুঞ্জ। কাচের জিনিসপত্রের ভঙ্গুর সটান কঠিনতার। সাবধানে নাড়াচাড়া করায় ধ্বনির মৃত্যু। আর তরল জলরব। যেন অন্তরালে নির্ঝর। বেয়ারা এসে সেলাম দিতেই দীননাথ "দুটো বড় হুইসকি, একটা জিন" বলতে বলতে বিজিতের দিকে সিগারেট

আগিয়ে দেয়। দেশলাইয়ের আলোতে দুটো মুখের ঘনিষ্ঠতা পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে আবার অন্ধকারে মিশে যেতেই স্বপ্না বলল, "আমাকে একটা সিগারেট দাও" দীননাথ ফিরে চাইতেই স্বপ্না কানে কানে কথা বলার মতো করে বলল "আমার জন্য জিন বলতে পারলে আর সিগারেট দিতে পারবে না ?

দীননাথ সিগারেট বাড়িয়ে দিল। ঠোঁটে নিয়ে দীননাথের হাতের শিখা বাঁচানো দুই আঁজলা নিজের হাতে নিয়ে নত হয়ে স্বপ্না গলা, চিবুক, নাকের ডগা আর চোখের পাতা আলোকিত করে সোজা হয়েই কেশে ফেলে। আঁচল দিয়ে কাশি মুছে সে আবার সিগারেট ঠোঁটে দেয়। আবার কেশে ফেলে বিজিতকে বলে—"এই বাঙ্গালটা আমাদের কাছে কলকাতার লাইফ দেখতে চায়, আর তুমি দেখাতে পারছ না ?

"এই তো দেখাচ্ছি"—বিজিত চেয়ারে এলিয়ে থাকে।

স্বপ্না সিগারেটটা প্রায় আস্তই অ্যাশট্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে বিজিতের ঘাড়ে হাত দিয়ে শুধোল—"কী দেখাচ্ছ ?"

"এই তো"

"এই তো কী"

"তুমি সিগারেটটা একটানও খেতে পারলে না"

"দীননাথ দেখেছে ?"

"দীননাথ, বাবা, দেখেছ ?" বিজিত

"কি ?"—দীননাথ।

"স্বপ্না সিগারেট একটানও খেতে পারলো না"

"অথচ ধরালাম"—

বেয়ারা এসে ট্রে রাখল। দীননাথ সেদিকে তাকিয়ে খুক করে হাসল। জানো, আমরা যখন দূরের কোনো সাইটে যাই তখন বোতলের জন্য একটা আলাদা বেতের ঝুড়ি থাকে। দীননাথ গেলাশগুলোতে সোডা ঢালে। তারপর হাতে ধরে আগিয়ে দেয়। মাঝখানে টেবিল, টেবিলের ওপর কতকগুলি বোতল আর গ্লাস, তিনটি চেয়ার, তিনজনের হাতে তিনটি গেলাস, যেন কোনো দৈববাণীর জন্য তারা অপেক্ষা করে আছে, সেটি হলেই পান করবে।

মঞ্চে তখন এক যুবা ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিল। ব্যাঞ্জোর অতগুলো তারের সমবেত ধ্বনিও যেন ওই ঘরের কাচের জিনিসের ভঙ্গুর কঠিনতার, সাবধানের নাড়াচাড়া করায় ধ্বনির মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিল না। ঝড়ের মুখে পাখির মতো ব্যাঞ্জোর বাজনাটা থরথরায়।

বাঁ হাতে গ্লাশ ধরে ডানহাতে বিজিতের ঘাড় ধরে স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল "বিজিত, দীননাথকে কী দেখাচ্ছ ?"

"ক্যালকাটা লাইফ"

"কী দেখাচ্ছ"

'এই এই কী'

'তুমি কেমন মদের গ্লাশ হাতে নিতে পার'

'অথচ চুমুক দিতে পারি না'

দীননাথ গ্লাশের আড়াল থেকে বলল—'এরই নাম ক্যালকাটা লাইফ, না? আমরা ওখানে বারো চোদ্দ হাজার ফুট পাহাড়ের ওপরে চামড়ার পোশাক পরে কাঁপতে কাঁপতে বোতলের পর বোতল ভাঙি আর খোলা জীপ চালাই আর যুঁইফুলের মতো বরফ পড়ে। বা বাঘ, হাতি, গণ্ডারের জঙ্গলে গিয়ে বনস্পতির গায়ে ঠুকে বোতল ভাঙি। আর এখানে ঢুকুঢুকু এক চামচ খেলে কি খেলে না, নেশা—'

'ওখানে যে অত বোতল ভাঙো নেশা হয়?' বিজিত শুধোয়।

'নেশা হলো কি না হলো তা বোঝার সময় আছে? ঐ হাজার হাজার ফুট ওপরে বা নদীর ভেতরে যখন কয়েকলক্ষ বোল্ডার ফেলেছি''

"বা ফেলছো না"—স্বপ্না।

"ফেলছি মানেই ফেলছি না, নইলে টাকা আসবে কোত্থেকে"—দীননাথ। বিজিত হঠাৎ পেছনের পকেটে হাত দিয়ে টাকা ছোঁয়।

"দীননাথ তোমার অনেক টাকা, না?" স্বপ্না।

"কী আর এমন"

"তবু—"

"তা বলতে পারো"

"তোমার বউ টাকা দিয়ে শুধু গয়না বানায়?"

"আর বোলো না"

"কী করে টাকা খরচ করতে হয়, জানেই না?"

"একেবারে না"

"কী করে টাকা বানাতে হয়, তুমি তা জান?"

"তা জানি"

"বলো না একটু"

"বাঁধে ফাঁক রাখতে হয়, যেখান দিয়ে জল ঢোকে। এক বর্ষা, দুই বর্ষা, তিন বর্ষা যায়। তারপর একদিন ভাঙে। মানুষজন ভাসে। মরে। ক্ষেতখামার ভাসে। বাড়িঘর ভাসে। তারপর আবার আমরা বাঁধ বাঁধি। আবার ফাঁক রাখি। এক বর্ষা, দুই বর্ষা, তিন বর্ষা যায়।"

"যতো জল ঢোকে, তোমার ততো টাকা বাড়ে?"

"তা বলতে পার—"

"আরো বলো"

"রাস্তায় পাথর বালির বদলে মাটি দিতে হয়। একবছর যায়, দু বছর যায়। এক বর্ষা যায়, দু বর্ষা যায়। তারপর পাহাড়ে ধস নামে। পথ

ভেঙে যায়। তারপর আবার আমরা পথ বানাই। আবার মাটি দিয়ে মাটি ঢাকি''

'যতো ধস, তোমার ততো টাকা?'

'তা বলতে পার'

'পাহাড়ের ধস আর নদীর বন্যার মালিক তুমি। পাহাড় তোমার ওপর টাকার ধস নামায়। নদী তোমার ঘরে টাকায় বান আনে। আর তোমার বউ টাকা দিয়ে শুধু গয়না বানায়?'

বিজিত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল "চলো।" দীননাথ দাঁড়িয়ে পড়ে। স্বপ্না গ্লাশ হাতেই উঠে দাঁড়ায়। পাশাপাশি টেবিল থেকে দুচারজন তার দিকে নাকি তার হাতের টইটম্বুর গ্লাশের দিকে তাকালে ঢক ঢক করে সবটা গলায় ঢেলে ফেলা ছাড়া কিছু করার থাকে না। গেলার সময় চোখ মুখে কোঁচকানো বা মুখে আঁচল চাপা দেবার মতো অবকাশও স্বপ্নার থাকে না। যেন দীননাথের টাকার স্বাস্থ্যপান করে, মুখবিবর, কণ্ঠনালী, পাকস্থলী ভরে সম্পূর্ণ অপরিচিত অভিজ্ঞতা ঠেসে হাসতে হাসতে স্বপ্নাকে বেরতে হলো।

রাস্তায় তখন পায়ে হাঁটা মানুষের সংখ্যা খুব কমে এসেছে। গাড়ির দরজা বন্ধ করতেই একটি বাচ্চা ছেলে চাকার তলা থেকে উঠে এসে হাত পাতে। গাড়ি স্টার্টের শব্দ ওঠে। নিজেদের কানেই একটু বেশি ঠেকে। দুলে দুলে হুস করে বেরতেই একটা মানুষ মোড় নিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়। গাড়ি ডাইনে বেঁকে চৌরঙ্গী রোডে পড়ে। দূরে লাল নীল হলুদ সবুজ আলোয় আলোয় রাত্রি। দু একটা ট্রাম বাস পাগলের মতো গতিতে সেই আলোর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসছে। মানুষরা ফুটপাথে বা দেয়াল ঘেঁষে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। গাড়ি খুব জোরে ছুটছিল।

স্বপ্না পেছনের সিটের কোণায় এলিয়ে পড়ে। সেখান থেকে শব্দ এলো—

'বিজিত, ইহাকে কি কয়?'

'কাহাকে?' 'এই আলোকমালা সৌধমালাকে', 'কলিকাতা', 'দীননাথ কী দেখতে চেয়েছিল?' 'ক্যালকাটা লাইফ', 'তুমি দেখিয়েছ?' 'হ্যাঁ, 'কী দেখালে?' 'এ-ই।' 'এ-ই কি?' 'তুমি কেমন গ্লাশ শেষ করতে পারো', "চলো, আরো দেখাই', 'কে দেখাবে?' 'তুমি আর আমি', 'কী দেখাবে? "ক্যালকাটা লাইফ, "না। লাইফ ইন্ ক্যালকাটা,'' 'না। সাউন্‌লি ক্যালকাটা'' "না। উই ক্যালক্যাটান্‌স্ "না। কাম ক্যালক্যাটা, 'কে দেখবে? "তুমি আর আমি", "কে দেখবে", "দীননাথ" "দীননাথ" "বলো—" 'তুমি দেখবে? আমরা দেখাবো?" "দেখছি তো, দেখবো—" "দীননাথ, তোমার ধন আর তোমার বন্যায় মানুষ মারা যায় না?" "যায়, অনেক" "স্বামী-স্ত্রী" মারা যায়? "যায়, স্বামীর হাত থেকে স্ত্রী খসে যায়—' "মা বাচ্চা মারা যায়?" "যায়, মায়ের বুক থেকে বাচ্চা খসে যায়—''

"তারপর ভেসে যায়—" "তারপর চাপা পড়ে"—"তারপর দীননাথ বাঁধ দেয় আর পথ বানায়"

গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। স্বপ্না তাকিয়ে বলল, "এ কী এ তো সেই বাসার গলি—" তারপর দরজা খুলে একটা পা বাড়িয়ে বলল, "দীননাথ আসবেনা?" গাড়ি গরজাচ্ছিল। দীননাথ হেঁচকি তুলে হাসল। অপর দিকের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে চমকে স্বপ্না দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

দীননাথের একটুখানি হাসিসহ গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে গেল।

স্বপ্না বিজিত গলিতে ঢুকলো। তারপর কোলাপসিবল গেট গলিয়ে অন্ধকার সিঁড়িতে। প্রথমে বিজিত। পেছনে স্বপ্না। স্বপ্না জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করল "দীননাথের বন্যা আর ধসে কী হয়?"

"আমার হাত থেকে তুমি খসে যাও"

"আমি খসে যাচ্ছি, ভেসে যাচ্ছি"

"যাও, দীননাথের বন্যা এসেছে। ধস নেমেছে"

"ধস আর বন্যায় দীননাথের কী হয়"

"টাকা হয়"

'"দীননাথটা একটা আস্ত গাধা, ওর পাহাড়ে জঙ্গলে থাকাই ভালো" —বিজিত।

"আবার আমার কাছে এসেছে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে"

'সারাটা সন্ধ্যা একসঙ্গে থাকলে, অথচ তোমার দিকে একটু হাত বাড়াল না'

'আমি তো আর পাহাড় বা বন্যা নই যে হাত বাড়াবে'

'আমি ভেবেছিলাম, রাতে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারব'

'আমি ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে দীননাথের একটা ডুয়েল হয়ে যাবে'

'ওর কোনো সেক্স নেই' 'দীননাথ নিউটার জেণ্ডার' 'পাহাড় নিউটার জেণ্ডার', 'বন্যা নিউটার জেণ্ডার,' 'টাকা নিউটার জেণ্ডার' "দীননাথ নিউটার জেণ্ডার সারাটা সন্ধ্যা বৃথা গেল—কোনো হিংসা হলো না

'সারাটা রাত বৃথা যাবে—কোনো রসদ হলো না'

'বেটা দীননাথ গাড়ি চালায় যেন কতো মোড়ল'

'বেটার ঘাড়ের ওপর চেপে গাড়ি চালালাম ওর কোনো তাপ উত্তাপ নেই'

'তুমি তখন ভুলে গিয়েছিলে আমি আছি'

একটুও ভুলি নি, তুমি ইচ্ছে করে আমাকে সামনের সিটে পাঠালে

'তুমি ইচ্ছে করে গাড়ি চালাবার নাম করে অত লদগা লদগি করলে

'ও কাঠের সঙ্গে কোনো পিরিত হয় না বিজিত'

'তুমি ভেবেছিলে আমার ঈর্ষা হবে, হিংসে হবে'

'ভেবেছিলাম, কিন্তু দীননাথের সঙ্গে কোনো ঈর্ষা হয় না আর তোমারও ঈর্ষা করার ক্ষমতা নেই'

'তোমার কি ধারণা আমিও নিউটার জেণ্ডার'

'পুরো। দীননাথ আর বিজিতে কোনো তফাৎ নেই'

'সাবধান স্বপ্না, আমি রেগে যেতে পারি'

'মিছিমিছি আর চেষ্টা করো না, তোমার রাগ হবে না'

'ভীষণ রাগ হবে'

'হবে না।'

'আমারও হবে না। হবে না'

'কেন হবে না স্বপ্না। আমাদের রাগ ঘৃণা হিংসা কোথায় গেল'

'দীননাথের বন্যায় ভেসে গেল, ধসে চাপা পড়লো'

'দীননাথের বন্যায় কী হয়'

'রাগ ঘৃণা হিংসা ভেসে যায় চাপা পড়ে'

'আর কি হয়'

'দীননাথের টাকা হয়', 'টাকা দিয়ে দীননাথের বৌ কী ক'রে গয়না বানায়' 'দীননাথ কী করে, কলকাতায়' 'ফূর্তি কেনে, দীননাথকে দেখাবে না?' 'কী?' 'ক্যালকাটা লাইফ', 'লাইফ ইন ক্যালকাটা', 'সাডনলি ক্যালকাটা'

'কাম ক্যালকাটা' বিজিত ফ্ল্যাটের দরজা খোলে। পেছন থেকে স্বপ্না এসে দরজায় দাঁড়ায়। ভেতরটা অন্ধকার। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় তাদের শোবার ঘরের পরদা জানলার ওপারে পেট্রল পাম্পের আলো। স্বপ্না জড়িত স্বরে বলল 'কিছু একটা হোক', বিজিত ফিসফিস করে শুধোয় 'কতো?'

'কতোক্ষণ?' 'সারারাত', 'একশ', 'না, পঞ্চাশ'

'চলো'—দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকারে তারা শোবার ঘরে ঢোকে। অন্ধকারেই বিজিত স্বপ্নাকে জড়িয়ে ধরে খাটের উপর ফেলতেই স্বপ্না বিজিতের গায়ের উপর বিছানার ওপর গলগল্ বমি করে দেয়। সারা ঘর মদের টক গন্ধে ভরে যায়। বিজিত স্বপ্নাকে জড়িয়ে ধরা হাত একটুও শিথিল করে না। একটা হাত দিয়ে পেছনের পকেট থেকে টাকার পাঁজাটা বের করে ছড়িয়ে দেয়।

তারপর তারা দুজন টক গন্ধে আমোদিত সুসজ্জিত সেই ঘরে বমির মধ্যে টাকার মধ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকলো। কোনো এক-সময় ঘুমিয়েও পড়লো বা। কাল সূর্যোদয়ের পর বমি চাটতে আসা মাছির দল মুখে ঠোঁটে সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের ঘুম ভাঙাবে।

এখন অন্ধকারে মাছিরা ঘুমোচ্ছে!

হো চি মিন

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

হো চি মিন নামে যে ছিলেন
তিনি মারা গেলেন।

তখন, বাঙলাদেশে রেস্তোঁরায় ভিড়
ফুটপাথে চলমান লোক
বাজারে হিসাব, যুক্তফ্রণ্টে চিড়
তাই নিয়ে হর্ষ, ক্ষোভ, শোক
কিংবা, আলু আর পটলের দাম
অনেক কিছুর সাথে যদি ভালো লাগে
তবে ভিয়েতনাম!

হো চি মিন নামে যে ছিলেন
সংবাদে প্রকাশ
তিনি মারা গেলেন।

আর তারই কাছাকাছি এ বাঙলার গ্রামে ও শহরে
স্বত্ব ও স্বামীত্ব নিয়ে দুই ভাই
ঝগড়া করে মরে,
কেউ আজ কারো চেয়ে এতটুকু কমে
রাজি নয়,
প্রত্যেকেই ছুরি খুলে ধরে,
সব চেয়ে বিস্ময়,
হো এখানে প্রতিদিন মরে।

এ সংবাদ
সংবাদই যে নয়!

সময়ের হাতে

ধনঞ্জয় দাশ

অস্থির এই সময়ের হাত
ভাঙছে ছাখো শতাব্দীর সিঁড়ি
ভেঙে পড়ছে গম্বুজ-খিলান,
কোন ত্রিকালজ্ঞ তুমি এখনো করছো ধ্যান
কৌম-স্বপ্নে জাদুমন্ত্র
ভগ্নস্তূপে পেতে এক মায়াবিনী সিঁড়ি !

দেখছো না সময় ছুটছে, দ্রুতগতি
দ্রুততর অশ্ব-খুরে
কিংবা ঐ মজুত জ্বালানী বুকে নিয়ে
রকেটের মতো ক্ষিপ্রতায়,
দেখছো না মুঠোয় বাঁধা পৃথিবীর আয়ু
কাঁপছে দ্রুত, মিনিটে-কাঁটায়।

দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে, অস্থির সময়
ছাখো ভাঙছে সবুজ বনানী, মাঠ
পরিচিত জনপদ, হাঁসের আবাদ
ছাখো, ছাখো, দ্রুততালে ক্ষয়ে যাচ্ছে
স্মৃতিময় সব মুখ, ভালোবাসা
ঘোমটা খুলছে কুমারী আকাশ।

অস্থির সময় ভাঙছে সব কিছু
সময়ের হাতে নড়ছে শতাব্দীর সিঁড়ি,
ভাঙছে সংঘ, মৃত প্রতিষ্ঠান,
অথচ এখনো তুমি ত্রিকালজ্ঞ সেজে করে যাচ্ছো ধ্যান
কৌম-স্বপ্নে জাদুমন্ত্র
অগ্নিকুণ্ডে পেতে সেই মায়াবিনী সিঁড়ি।

কালা জনম

স্বদেশ সেন

রায় কালা তুই কাদের বিটি-ছা, আয় ডাইনি মাঠে দাঁড়কাক
তুই ডাক দপ করে আণ্ডরা জ্বালানো, শিমুল পোড়ানো ও হোয় রে!
ওই যে গাই যাচ্ছে মাঠকে মাঠ এই ভুখা বলদ চাটছে কুজানদী,
নাড়ীর উপাস যেমন খড়ে পচন জ্বলছে বেদন যেমন দুখ জোনাক
পোড়া কপাল বোহে একটা মহুল নদী কবে বলবে, বিটি মুখটা খোল্
বহালে তিন ফসল, হা মিতিন চাঁদ, চাড়াল আশা তোর কালাজনম।
সুখের তিনকাল গ্যাখ্ হড়কে গেলেন
কেঁদু পাতায় তুই রেত তুই রেত-শিশির।
ভয় একটা মৃত্যু, হাল-বলদ মুখে চিতা, হা-কাল নদী
তুই কি বেওয়া কি বারমুখ্যা? মুখটা তোল মিতিন।
সিংভূমে শাল কি পাত কুড়ায়? মারে এক আকাল?
দেয়না খোপার ফুল?
চোখের জল কি বাঁশ বেউড়? শরধনু কি নষ্টা চাঁদ?

তুই ডাক মাঝিন্ আণ্ডর জ্বালানো শিমুল পোড়ানো ওহোয় রে!

এই সব যাওয়া আসা

তরুণ সেন

ঝুলমাখা লণ্ঠনের মতো সব প্রৌঢ়দের চোখের ভিতর
মাঝে মাঝে চলে যাই—দেখে আসি দূর পল্লীগ্রাম
উঠোনে শশার ক্ষেত, গুরুঝির ডগায় মনিয়া,
তরতাজা ঘাসের কথা মনে রেখে ফিরে আসি বাঁধানো সড়কে
মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায় হাওয়ার বদল।

কবরখানায় গিয়ে ফলকের নামও পড়ি না,
যখন ভীষণভাবে পায়ে মাথা খোঁড়ে মাটি গুটিকয় ফুল
রেখে আসতেই হয়, মৃতের সৎকারে যে রকম
প্রথমেই মনে পড়ে ধূপ,
আমি পুরনো দেয়াল থেকে দেয়ালের দিকে যেতে যেতে
চেয়ে দেখি কোনখানে মাথা তোলে বৃক্ষদের বীজ,
কিশোরী শরীরে কিন্তু নরকের ছিঁটে ফোটা গন্ধও থাকেনা
উঠোনের পাখি দেখা যে রকম অসুস্থ শিশুর
এই সব চুপে যাওয়া আসা কেউ চোখ তুলে খেয়াল করে না।

বীক্ষণ

মানস রায়চৌধুরী

যেন মুঠি ধরে রাখে অনন্ত লাগাম
অন্ধকার দূর অন্ধকারে
সূর্যের প্রতীচ্য ঘোড়সওয়ার।
হায় দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ছন্দ, ইলোরা অজন্তা
শেষ রাত্রে ট্রেণ ছেড়ে গেছে
বিচ্ছিন্ন সরাইখানা, দুচোখে হিরণ
নীল, পাংশু ফিরোজা অভ্রান্ত
অনন্তের তুলি ও আঙুল শ্বাসরোধী।
যেন থেমে আছে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ক্ষয়, ভঙ্গুর অজন্তা।
ভ্রাম্যমানতার কাছে এ' এক রূপের
নির্ভুল দংশন, গ্রাস করে
পৃথিবীর ধমনী-চাঞ্চল্য—
বিন্দু বিন্দু ঝরে যায় অমোঘ সঙ্কেতে
দেওয়ালের স্পর্ধিত অতনু
সোনালী মেরুন জটিলতা
শেষবার তুলে ওঠে হৃৎপিণ্ডে নিঃশ্বসিত ইলোরা, অজন্তা।

আবাঙলাদেশে অনন্য চেতনায়

শুভ বসু

আবাঙলাদেশ যৌবন সাধে জাগনমাতাল অশান্ত
বুকের মধ্যে এমন কাঁপন তখন তেমন কে জানত
দিগ্বিদিকে ছাপিয়ে এল পাগল বাউল বৃষ্টি ধারা
তালতমালে এখন তুমি নান্যপূর্বা স্বয়ম্বরা।

ঘুম আসে না দুচোখ জুড়ে রাতে
শঙ্কাহরণ উতল বজ্রপাতে
যেন বসন্ত ছড়াল জ্যোৎস্নাতে
প্লাবন-স্রোতে দুরগ সাম্পান—
আকাশ জাগে বাতাস জাগে যোজনব্যাপী সাগর জুড়ে বান।

দক্ষিণতটে উতাল জীবন যেন চুলগুলি ঝড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
কেন্দুবিল্বে বোলপুরে রাঢ়ে যেন বা স্তনের শান্তি
বরেন্দ্র জুড়ে গুরু নিতম্ব, স্বচ্ছ জঙ্ঘা কাঞ্চনজঙ্ঘায়
তরাই জড়িয়ে যেন বা আদিম সে অন্ধকার, কান্তি।

লুটতে আসে রাজা দালাল ফড়ে
এমন মোহন শরীর, তাইতো ঘোরে
আনাচ কানাচ, তাই বখরা বিবাদ চোরে চোরে।
সূর্য্য রথে সজ্ঞ আসে, লক্ষ বর্মে প্রতিজ্ঞা, সেই আশা
দেখব বলেই দুয়ার খুলে বাইরে পথে আসা।

স্বপ্ন জুড়ে সপ্তডিঙা চূর্ণির কল্লোল
সারা চেতন সমস্তক্ষণ কী দোল দিচ্ছে দোল।

শিয়াল

সত্যপ্রিয় ঘোষ

শিয়াল ধারে-কাছেই আছে, কুত্তার দল তার গন্ধ পেয়েছে। আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। মাসীর হুকুম আজ শালাকে ধরতেই হবে। শালাকে আজ দো দস্তি ঢাক প্যাঁচ কষিয়ে চিৎ করে ফেলে চুঁস রদ্দা পট্টি ঘেস্তা মেরে চোখে জোনাকি পোকা ওড়াতে হবে।

'আরে ঐ তো শ্লা'—করালীকণ্ঠে বিকট শব্দ বেরিয়ে এল বোয়ালের গলা চিরে। সঙ্গে সঙ্গে ছর্‌রা গুলির মতো ছুটে চলল এক ঝাঁক ছেলে-মেয়ের দঙ্গল, মদের দোকানের সামনের ড্রামের আড়ালে দেখা গেছে শিয়ালের মাথাটা।

টের পেয়ে শিয়ালও আড়াল ছেড়ে ছুটেছে খাল বরাবর।

'সা-রা-রা-রা-রা ধর ধর ধর ধর ধর—'

সে এক অপূর্ব দৃশ্য! বারো-তেরো বছরের লেংটি-পরা হাড্ডিসার একটা ছোকরা, নাম তার শিয়াল, ছুটছে ক্যানাল রোডের ওপর দিয়ে ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে প্রাণের দায়ে, আর তাকে তাড়া করে চলেছে আট-দশটি ছেলে-মেয়ে, বয়স তাদের আট-নয় থেকে পনেরো-ষোলো হবে হয়তো, চেহারা দেখলেই মালুম হয় সবাই ওরা আস্তাকুড়ের জীব। দুপুরবেলার এ সময়টা নির্বিবাদে গোল্লাছুট খেলতে পারার মতোই রাস্তাটা ফাঁকা বটে তখন।

কী ছুটছে মাইরী শিয়াল, এই জন্যেই তো তোকে দলে চাই শ্লা, কামাল কামাল কিয়া শিয়াল—ইত্যাদি রব উঠতে লাগল পেছনের দঙ্গলের এক-একজনের মুখে যারা কিছু পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু কুত্তার সঙ্গে পারবে কেন শিয়াল, সবাইকে টেক্কা দিয়ে ছুটতে পারে বলে মাসী তাকে আদর করে কুত্তা-সোনা বলে ডাকে, মাসীর পরে সেই হলো দলের সর্দার, তো তার সঙ্গে ছুটে পারবে কেন শিয়াল।

কুত্তা পাই-পাই ছুটে শিয়ালকে প্রায় ধরে ফেলেছিল এমন সময় একটা ঘাড় ভাঙা মরা শকুনের গায়ে লেগে পা হড়কে পড়ে যেতেই কুত্তা লাফ দিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরল!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পিছিয়ে পড়া দলটার সবাই এসে পড়ল, ঘিরে ফেলল সবাই হাতের মুঠোয় পাওয়া শিকারটাকে। মাসীও এসে গেল, দলের একচ্ছত্র নেত্রী হলেও ছেলেদের সকলের সঙ্গে ছুটে সে পারবে কেন। এসেই সে এক ঝটকায় সব কটাকে সরিয়ে দিয়ে কুত্তার কবল থেকে জিম্মা নিল অপরাধীর। শিয়ালের চুলের মুঠি ধরে পেল্লায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মোক্ষম একটা ঝাপড় কষাল তার মাথায়। শিয়াল ঘুরে পড়ে গেল। গর্ত বের করা পিচের রাস্তার জল-কাদার মধ্যে কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটল। একটা পা শিয়ালের বুকের ওপর চড়িয়ে দিয়ে পঞ্চদশী মাসী সাক্ষাৎ চামুণ্ডামূর্তিতে গর্জন করল, 'হার মান বে শ্লা।'

বেগতিক দেখে শিয়াল উলটে গিয়ে মাসীর পায়ে মাথা গুঁজে আত্মসমর্পণ করল। পদানত শত্রুর প্রতি দয়া জাগল বুঝি-বা, এক ধমকে সৈন্য-সামন্তের হল্লা থামিয়ে দিয়ে মাসী চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল শিয়ালকে।

'বোল ঠিক সে হারামীর বাচ্চা, হামরা সাথ মিলবি?'

'চুল ছোড় মাসী, বহুত লাগছে।'

চুল ছেড়ে মাসী কান ধরল শিয়ালের, 'ইবার বোল।'

'হামি তো তুদের সাথ হী আছি মাসী, মারপিট করচিস ক্যানে?'

'ফির শ্লা বেইমানী কা বাত! বোল, অভী বোল ঠিক সে, বোল হামরা সাথ ইমানদারি সে কাজকাম করবি। কেঁও বে শ্লা, আঁ? ইতনা তেল হো গিয়া তুঁহার!'

মুক্তি পাবার জন্য শিয়াল বহুবার কবুল করল যা তাকে বলতে বলা হল। কিন্তু তার স্বীকৃতিতে এরা বিশ্বাসী নয়, সুতরাং শাস্তির পর্ব সহজে মিটল না। শিয়ালের অপরাধ হল সে কাজকাম করে না, হাতের টিপ আছে ভালো, লাফাতে ছুটতে পারে ভালো, তবু মাসীর নেত্রীত্বে দল সাজিয়ে সবাই যখন লোকো শেডে কয়লা চুরি করতে যায় সে কেন যাবে না তাদের সঙ্গে? রেলের পার্সেল আর গুডস্ ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ি থেকে হাতসাফাই করে মাল পাচার করতে কেন সে সাহায্য করবে না? কেন সে বোমা মেরে মেরে চাল গম চিনির বস্তা ফাঁসিয়ে রুজি-রোজগারে তাদের সঙ্গে মিলবে না। কত কানা-খোঁড়া-হাবা পর্যন্ত এ-দলে নাড়া বেঁধে দল ভারী করছে, সর্দারদের হুকুম মতো ঠিকমতো কাজ হাসিল করতে পারলে কাঁচা পয়সাও মাঝে মাঝে হাতে পাচ্ছে, ভিক্ষে আর নেড়ীকুত্তার মতো ডাস্টবিনের খাবারের পেছন না

ছুটেও মাঝে মধ্যে খেতেও পাচ্ছে। কিন্তু শিয়াল? চুরি বিছায় যে সে একটি ভুঁড়োশেয়াল, সবরকম দুষ্টমির সে যে একটি হাঁড়ি বিশেষ সে পরিচয় শেয়ালদা ষ্টেশন এলাকার হা-ঘরে আওয়ারা মহলে কারো কি জানতে বাকি আছে। তবু সে কোন হাঙ্গামা হুজ্জতে যাবে না, রাস্তার নর্দমা আর ডাষ্টবিন থেকে, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া লোকের ফেলে দেওয়া খাবার তুলে খেয়ে, বাজারের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ধূলিকাদার খাদ্য গিলে গিলে সে দিন কাটাবে। এ দলের পাল্লায় পড়ে শিয়াল দু-চারবার ঐসব কাজে যায়নি এমন নয় কিন্তু তার মতির ঠিক নেই। প্রায়ই সে দলছুট হয়ে যায়, বিগড়ে গিয়ে আবার সে দিনরাত বিনা পরিশ্রমে খাবার খুঁজে বেড়ায়।

বিনা পরিশ্রমে অমন খানেওয়ালা শেয়ালদা ষ্টেশন এলাকায় একা শিয়ালই আছে এমন নয়, এবং এমনি ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বেশ ভারী। মাসীর দল তাদের থেকে ছেলেমেয়ে টানবার চেষ্টা চালিয়ে চালিয়ে কঠিন জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার স্বাভাবিক চেষ্টাটি চালিয়ে যায় আর কি।

'মাসী, শিয়ালের হাতটা পোড়াইয়া দিমু?'—বলল ওল্লা উল্লুকের মতো হেসে।

মাসী ঝাটা হাতে ওল্লাকে একটা ঝটকা মেরে বলল হেসে, 'তু শ্লা নিজের হাত পুড়িয়েছিস, তাই সব কো হাত পুড়াতে চাস। বাঙাল শ্লা!' তারপর শিয়ালকে ফের একটা রদ্দা মেরে ধমকি দিয়ে বলল, 'আরে বোল ঠিক সে, হারামি কা লাইন ছাড়বি, কি মিলবি হামরা সাথ।'

'জরুর মিলব মাসী, সাচ বাত বলছি, কান পাকড়ে বলছি'—বলে শিয়াল দুই হাতে নিজের কান ধরল।

'ঐ সে হোবে না'—মাসী বলল, 'মাটি ছুঁয়ে বল। তুর গা থেকে খুন ঝরছে, খুন ছুয়ে বল।

শিয়াল তখন নিজের হাঁটুর রক্ত হাতে মেখে বলল, 'এই কসম খাচ্ছি মাসী। কিন্তু কুত্তাকে বলে দে ও খালি খালি হামাকে ধোলাই না দেয়।'

তুম্বার মতো মুখ ফুলিয়ে কুত্তা বলল, 'কুত্তা শিয়ালকে খাবে না তো দুনিয়া উলটে যাবে রে শ্লা। মাসী হামার নাম দিয়েছে কুত্তা। ঐ দিন থেকে হামার নাম কুত্তা, জান ভী কুত্তা, কাম ভী কুত্তা। কেও বে মাসী?'

'সাচ।'—মাসী একথায় পূর্ণ সমর্থন দিয়ে ফের শিয়ালের দিকে ভাঁটার

মতো চোখ ঘুরিয়ে বলল, ফির কভী বেইমানী করেচিস তো তুকে ঐ খালের জলে পুঁতে দিব, সমঝা ? অভী শেড মে চল, কয়লা নিতে হোবে।'

হই হই করতে করতে দঙ্গলটা ছুটল লোকো শেডে হানা দিতে।

ইতিহাসেব ছাত্ররা আসে না কিন্তু আর্ট স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা মাঝে মাঝে আসে এখানেও, শেয়ালদা স্টেশনের এই চত্বরে, আনাচে-কানাচে তারা বসে যায়, বিচিত্র অবাস্তব সব প্রাণী এখানে বাস করে বলে তাদের বাস্তব ছবি দেখে দেখে কালো রেখায় ফুটিয়ে নিয়ে যায়। ইতিহাসের ছাত্রদের চৈতন্য জাগানোর জন্ত তাদের রেখায় রঙে এইটে ফোটে কি-না কে জানে যে মহানগরীর বুকে এই স্টেশন এলাকা এক নিখুঁত প্রদর্শনশালা যেখানে গুহামানব থেকে শুরু করে ক্রমবিবর্তনের ধাপে ধাপে মানুষের যে ক্রমোন্নত রূপ দেখা গেছে, বহুদিন চলো যারা ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে তাদের প্রায় প্রতিটি প্রজাতির কিছু কিছু জ্যান্ত নিদর্শন এই চক্রবত উদ্‌বর্তিত কলকোলাহলের কুম্ভীপাকে নিত্য প্রদর্শিত হয়ে চলেছে।

সেদিনও শিল্পীরা এসেছিল। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তন্ময় হয়ে ধর্ষিত জীবনের কলঙ্ক তারা কালোরেখায় ফুটিয়ে নিচ্ছিল।

এমন সময় ইতিহাসের এক পর্বের নায়ক-নায়িকারা যেন রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হবার জন্তই এক বিচিত্র দৃশ্যের অভিনয়ে দৃশ্যমান হল।

প্রথমে অন্তরালে আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল। পাথুরে দেয়ালে অবরুদ্ধ যন্ত্রণাবিদ্ধ তরুণ বালক বালিকাদের নিস্ফল সেই চিৎকারের অনুরণন বহু দূর প্রসারিত হয়েছিল, শুনে উন্মাদনা আসে বটে। আকৃষ্ট দর্শকেরা দেখল স্টেশনের পুলিস-হাজতের আলো-নেভানো বিষাক্ত বায়ুর গর্ভে কিলবিল করছে কতকগুলি মানবক। এমন দৃশ্যে দর্শকেরা নিষ্ক্রিয় নীরব থাকল না, খুদে খুদে ঐ ভয়ংকর অপরাধীদের দেখে তাদের মুখে মুখে বিচারের বাণী উচ্চারিত হলো : ইস, গোল্লায় গেছে দেশটা ! এই বয়সেই এই ! ছ্যা ছ্যা ! চঞ্চল দর্শককুলের অস্থির আবর্তে কেউ কেউ ঐটুকু দেখেই উৎক্ষিপ্ত হলো, কেউ কেউ আরো এগিয়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করল।

জানা গেল ঐ বালকবালিকারা সকলেই চোর। শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবনে ঐ বাচ্চাগুলি এক একটি বিভীষিকা। কয়লা চুরি করে ওরা জাতীয়

আর্থনীতিক কাঠামোতে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে। সভ্যতার অঙ্গ কুরে কুরে খাবার জন্য ওরা নোংরা জীবাণুর ঝাড়।

কিন্তু ভয় নেই, শান্তিরক্ষকরা আছে। ভীমকায় পুলিস অফিসারের বিঘূর্ণিত চক্ষুদ্বয় এবং উৎক্ষিপ্ত কণ্ঠের দাপটে খুদে অপরাধীরা কেঁপে কেঁপে উঠলেও শান্তিপ্রিয় সভ্য নাগরিকেরা অবশ্যই আশ্বস্ত হচ্ছিল।

অন্ধকার থেকে প্ল্যাটফর্মের আলোয় অপরাধীদের বের করে এনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করানো হলো। প্রত্যেকের হাতে, কাঁখে বা মাথায় ছোট এক বস্তা কয়লা, হাতে নাতে ওদের ধরা হয়েছে তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে এটা দরকার।

'এই শুয়ারের বাচ্চারা!'—অফিসার বেত আস্ফালন করে উটের মতো মুখ উঁচু করে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'কয়লা মাথায় নিতে বললাম না?'

এক লহমায় হুকুম তামিল হলো, সকলের মাথায় উঠে গেল কয়লার বস্তা। বয়সে ওরা অর্বাচীন হলে হবে কি, এই দৃশ্যের অভিনয় করে করে ওরা এরই মধ্যে প্রাচীন হতে চলল যে। জনগণের বিশেষ অনুরোধ যেমন বিখ্যাত নাট্যসম্প্রদায়কে বিখ্যাত নাটকের অভিনয় মাঝে মাঝে দেখাতে হয়, তেমনি আইন শৃঙ্খলার প্রহরীদের বিশেষ চাপে শান্তিরক্ষকদেরও এই চোর-পুলিস শীর্ষক অভিনয় মাঝে-মধ্যেই দেখাতে হয় কিনা। কুশীলবেরা সব তৈরী।

সকলের আগে দাঁড় করানো হয়েছে মাসীকে। সে যে সর্দারণী এই দলের। দেবী চৌধুরাণীর উত্তর-স্বাধীনতা সংস্করণ, বড়ো বিপজ্জনক সে। কোন মুহূর্তে কী সর্বনাশ করে দেবে, কে জানে তাই তার কোমরে দড়ি। তার ডেপুটি কুত্তার কোমরেও দড়ি।

'কুইক মার্চ'—নেপালী জমাদার তাদের নিয়ে চলল আদালতে।

ঝকঝকে প্ল্যাটফর্মে তখন রওনা হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে জেল্লাদার দার্জিলিং মেল। ফিটফাট নরনারীর জৌলুসে মেল-ট্রেনের মহিমা সম্যক সজ্জিত। টিপটাপ পোশাকে প্ল্যাটফর্ম ভোজনালয়ের খানসামার দল ন্যাপকিন ঢাকা ট্রের তলায় চপ-কাটলেট-মাটন-চিকেনকারি ইত্যাদি টুকটুক করে নিয়ে গিয়ে তুলছে এ-কামরায় সে-কামরায়। ছুরি-কাটা-চামচের ধাতব আওয়াজ কান পেতে থাকলে সেই কোলাহলেও শোনা যায়।

অন্তত শুনতে যাদের পাওয়া দরকার তারা ঠিকই শোনে। বিনা পরিশ্রমে খানেওয়ালা কিলবিলে শিশু বাহিনীকে অন্তত সেই শব্দব্রহ্ম আয়ত্ত করতে হয়।

শব্দ অনুসরণে লক্ষ্যবেধ এদেশের সনাতন সংস্কার যে। উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ মানুষাকৃতি কিশোর-কিশোরী চিল-শকুন-কাকের মতো হন্তে হয়ে ফিরছে শব্দ ভেদী কান খাড়া করে। ছুড়ে দেওয়া এক টুকরো রুটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা প্রাণী। ভুক্ত অর্ধভুক্ত খাদ্যের প্লেটগুলিকে খানসামার দল প্ল্যাটফর্মের এক পাশে এনে রাখবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কামড়া-কামড়ি লেগে যাচ্ছে। খস খসে লক লকে জিভগুলো বাটিগুলোর ঝোলের শেষ চিহ্নটুকুকেও আত্মসাৎ করছে। মাংসের হাড়ের টুকরোগুলোতে যে কত রস আছে তা জানতে হলে একবার এদের দিকে নজর দেওয়া দরকার। খানসামারা ওদের লাঠি নিয়ে তাড়া করে বেড়ায় কারণ রক্তবীজের ঝাড় এই জানোয়ারগুলির বিষাক্ত লালাসিক্ত জিহ্বার লেহনে খাবারের ডিশগুলি এমনি ভাবে দূষিত হচ্ছে তা স্বাস্থ্য সচেতন বোনাফাইডি যাত্রীদের অনেকেরই দৃষ্টি এড়ায় না. স্টেশনের কমপ্লেনবুকে এ-বিষয়ে বেশ কয়েকবার যথাযোগ্য মন্তব্য করা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথোচিত শাস্তিও বিধান করেছেন, কিন্তু ট্র্যাডিশন! সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

আর এরই মধ্যে দিয়ে মার্চ করে চলেছে মাসীর বাহিনী। মাসীর জট পাকানো রুক্ষ চুলের গোছা সর্বদা রবার দিয়ে আটকানো থাকে, সিপাইদের টানাটানিতে তার রবারের টুকরোটা পড়ে গেছে বলেই হয়তো দামাল চুল দিয়ে সে মুখের লজ্জা অনেকখানি ঢেকেছে। তার কামিজটাও তার র‍্যাংক নির্দেশ করে বই কি, ছেঁড়া ফাটা থিকথিকে হলে হয় কি, অনেকটা যেন প্রাচীনকালের গ্রীক সেনাপতিদের জামার মতো বেশ ঢিলেঢালা, ফ্রকটা তার হাঁটুর নিচেও বেশ খানিকটা লজ্জা নিবারণ করছে। আর একটু অন্ততম হলেই বেশ জোব্বা বলা যেত।

মাসীর পেছনেই ছিল লইটা, যেতে যেতে সহসা অস্ফুটে বলল সে, 'মাসী মাসী, ঐ যে শিয়াল!' শিয়াল তখন তিন-চারজনের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করছে প্ল্যাটফর্মের পাশে রাখা খাবারের একটা ট্রেতে গড়িয়ে পড়া মাংসের ঝোল চুক চুক করে খেতে। একটা রোয়া ওঠা কুকুর অদূরে অপেক্ষমান তার ভাগটুকু পাবার জন্যে, কিন্তু অন্য ভাগীদারদের পরাক্রম দেখে আর এগোতে সাহসে কুলোচ্ছে না। মাসী যেতে যেতে একটু সরে গিয়ে মোক্ষম একটা লাথি কষাল শিয়ালের মাথায়। শিয়াল উল্টে পড়ল, কিন্তু যেই দেখল মাসীকে অমনি ছিটকে বেশ খানিকটা তফাতে চলে গেল। নিরাপদ দূরত্বে

গিয়ে ফিরে তাকিয়ে মাসীর দলের অবস্থাটা বুঝে নিয়ে সে নষ্টামির প্রবৃত্তি সামলাতে পারল না।

'কী রে কুত্তা!'—কোমরে দড়ি বাঁধা মাথায় কয়লার বস্তা কুত্তার কাছা-গিয়ে শিয়াল বলে উঠল, 'সাদি করতে যাচ্চিস নাকি বে!'

কুত্তার দাঁত মুখ ঝিকিয়ে উঠল, শিয়ালকে তখন ধরতে পারলে সে ওকে ছিঁড়ে কামড়ে ওর রক্তমাংস চিবিয়ে খেত। প্রাণপণ মুখবিকৃতি করে একটা ভেংচি কেটেই আপাতত কুত্তাকে চলে যেতে হল।

শিয়াল কয়েক পা ওদের পেছনে পেছনে হাততালি দিতে দিতে চলল। শেষে জমাদার যখন তাকেও ধরতে এল, সে এক ছুটে পালিয়ে গিয়ে মিশল আবার স্টেশনের ভিড়ে।

বৈশাখের দগ্ধ দুপুর। প্রচণ্ড রোদে রাস্তার পিচ গলছে। শুকনো হাওয়া ফুটছে গায়ে আগুনের হলকার মতো। বারোমেসে রাস্তার জীবগুলোও একটু ছায়ার খোঁজে কে কোথায় মাথা গুঁজেছে তার ঠিক নেই।

মালগুদামের এক ঘুপচিতে পা ছড়িয়ে বসে শিয়াল আপন মনে বিড়ি টানছে। এইটে চোখে পড়তেই লইটা পা টিপে টিপে পেছন থেকে এসে তার চুলের মুঠি ধরল।

এক ঝটকায় চুল ছাড়িয়ে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে শিয়াল লইটাকে দেখে হেসে ফেলল।

'খুব রোয়াব হয়েচে বে রণ্ডী অাঁ!' —পা ফাঁক করে মস্তানী ভঙ্গিতে বলল শিয়াল, 'মারব শ্লা এক কালাজং বুঝবি ঠেলা।'

'দাঁড়া মাসীকে ডাকি'—ন্যাকপেকে নিরীহ মেয়ে লইটা একটুও না ঘাবড়ে ফুঁসে উঠে বলল।

শিয়াল ঘাবড়ে গিয়ে তখন আপসের রাস্তা ধরল। তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে একটা আস্ত বিড়ি বের করে লইটার সামনে ধরল। লইটা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে একবার আস্ত বিড়িটার দিকে একবার শিয়ালের পরনের প্যাণ্টের দিকে তাকাতে লাগল। শিয়াল ব্যাপারটা বুঝে গর্বে ফুলে উঠল, পকেটওয়ালা প্যাণ্ট সে পরে আছে, সেই পকেট একটুও ছেঁড়া না, তাতে বিড়ি রাখা যায়, উপরন্তু সে পকেট থেকে একটা আস্ত বিড়ি বের করতে পেরেছে। লইটার আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে শিয়াল তার মুখে বিড়িটা গুঁজে দিল।

লইটা কিছুটা খুশী হয়ে বলল, 'কাঁহা সে পেলি রে ?'

'হামরা সাথ থাক তুই'—শিয়াল দেঁতো হেসে বলল, 'তুই ভী পাবি।'

'কাঁহা সে ?'—ফিসফিসিয়ে বলল লইটা।

'উঁহা সে'—রহস্য করে শিয়াল আকাশের দিকে আঙুল দেখাল।

লইটা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসল। ঘেয়ো নরম জেলির মতো ঠোঁট উলটে সে বলল, 'আগুন দে!'

তাইতো! পৌরুষে ঘা লাগল শিয়ালের, আগুন তো তার নেই। 'দাঁড়া, তুই ইখানেই দাঁড়া, আগুন আনছি'—বলে শিয়াল লইটার মুখ থেকে বিড়িটা টেনে নিয়ে একছুটে চলে গেল মালগুদামের মধ্যে এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই সেটা ধরিয়ে ফের এল ছুটতে ছুটতে। নিজে এক মোক্ষম টান মেরে বিড়িটা লইটাকে দিয়ে একমুখ ধোঁয়া নাক দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে শিয়াল আত্মকৃতিত্বে উদ্ভাসিত হলো।

'তুই যে বাবু সেজেচিস'—বিড়ি টানতে টানতে বলল লইটা, 'চুলে তেল ভী মেখেছিস। তেল ভী উধার সে গিরা ?'—বলে লইটা আকাশটা দেখিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

শিয়ালও হাসল প্রাণ খুলে। লইটার পিঙ্গলবর্ণ রুক্ষ চুলের গোছা দেখে মায়া লাগল তার। সে লইটার হাত ধরে বলল, 'চল তু। তোর চুলে ভী তেল লাগাব। চল বে। চল না।' —বলে শিয়াল লইটাকে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে চলল একদিকে।

যেতে যেতে গুডস অফিস প্ল্যাটফর্মের ওপর দেখা হয়ে গেল রকেট আর ওল্লার সঙ্গে। ওরা তখন গুলি খেলছে। লইটাকে হাত ধরে নিয়ে চলেছে শিয়াল এই দৃশ্যে ওরা অবাক হলো। ওরাও মাসীর দলে এবং পুনরায় দল ছুট শিয়ালকে তারা অতি ঘৃণার চোখে দেখে। তাই ওর সঙ্গে লইটার এত ভাব দেখে ওরা গুলি তুলে একটা লড়াইয়ের জন্য রুখে দাঁড়াল। বিশেষ করে রকেট।

'মাসীরে কিন্তু কইয়া দিমু লইটা'—ওল্লা বলল, 'তুই শিয়ালের হাত ধরছ। আমি আর কিছু বুঝি না, না ?'

কিশোরী ওল্লা লইটার চোখে প্রেমের লক্ষণ ফুটতে দেখেছিল নাকি ?

শিয়াল বিপদ বুঝে পকেট থেকে আরো দুটো বিড়ি বের করে ওদের দুজনের সামনে ধরল। আগে ভয়ে ভয়ে সে একটা বিড়ি রকেটের দাঁতের ফাঁকে

করা গেল না।

আগুন সম্পূর্ণ নিভবার পরে ওয়াগনের তিন কোণে দুই কিশোরী আর এক কিশোরের কুণ্ডলী পাকানো মৃতদেহ পাওয়া গেল।

পুলিশের লোকেরা শিয়ালকে নিয়ে চলে গেল।

•

অবশ্য পরের দিনই ছাড়া পেল শিয়াল। কারণ এই দুর্ঘটনার সে অপরাধী বলে কোন প্রমাণ নাকি পাওয়া যায়নি। তাছাড়া সে বালক, উপরন্তু ত্রিভুবনে কোথাও তার কোন আত্মীয় নেই। কেউ জানে না কে তার বাবা কে তার মা, কে কবে তার নামকরণ করেছিল তাও কেউ জানে না। তাই তাকে নিয়ে আইন শৃঙ্খলার প্রহরীরা অতিরিক্ত মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেন নি।

ছাড়া পেয়ে শিয়াল দিন কতক খুব কাঁদল একা একা। আহার সন্ধানেও তার তেমন উৎসাহ যেন নেই। কী যেন সে ভাবে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

মাসীর দলও এখন তাকে আর ঘাটাতে ইচ্ছুক নয়। সকলেরই কেমন ধারণা হয়েছে ওকে দানোয় পেয়েছে, ওর কাছে গেলে সকলেরই বিপদ হবে।

কিন্তু কিছুদিন বাদে ঝুড়ি আর চিমটা হাতে মাসীর দল চলেছিল রেল লাইন বরাবর লোকো শেডের দিকে, হঠাৎ দেখা গেল পেছন পেছন চলেছে শিয়াল, তার হাতেও একটা ঝুড়ি, অন্য হাতে চিমটা। মাসীর নজর পড়তেই মাসী ওর কাছে এসে ধমকে বলল, 'কী বে শ্লা, তু আসচিস ক্যানে হামাদের সাথ?'

'তুদের সাথ হামাকে চলতে দে মাসী'—অনুনয় করল শিয়াল।

মাসী ওর মুখের দিকে স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে কী যেন দেখল। শেষে বলল, 'ফির বেইমানি করবি তো?'

'করব না মাসী। বিশ্‌ওয়াশ রাখ।' শিয়ালের চোখে জল।

'আচ্ছা চল'—মাসী ওকে মেনে নিল।

ফর হুম দ্য বেল টোলস

রাম বসু

দাঁড়াও একটু
এলাম বলে
গায়ে জামাটা গলিয়ে নি
না, থাক গে
আবরণে কি লাভ !
মৌন
আমি যাচ্চি।

বাইরে হাওয়া রোদ অনেক ভিজে ভিজে চোখ
ভিতরে সর্ট সার্কিট, লাইন পুড়ে গেছে।

ফর হুম দ্য বেল টোলস ?
ইট্ টোলস ফর দী।

দেখছি পলাশ ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে
নদীর সব বকগুলো মালা হতে মিলিয়ে গেল
এতগুলো পায়ের শব্দ এক সঙ্গে বাইরে !
দাঁড়াও এখুনি যাচ্ছি
যাচ্ছি অণুর নৃত্যে প্রাণবেদনায়

অপরিমিত মৌন, ললাট
অতীতের মতো ভবিষ্যতের দিকে
গাছে পরিণত ফলের মতো
তীব্র, যন্ত্রণায় স্বাদু, বিপরীতের টানে অনন্য
আমি একদিন যে নারীকে ভালবেসেছিলাম, তার মতো
শিল্প ;
যাচ্ছি।

ফর হুম দ্য বেল টোলস ?
ইট টোলস ফর দী।

একটু দাঁড়াও
মাটিকে একবার প্রণাম করে নি
আমি বহুবার তাকে কলুষিত করেছি যে
ভীরুতায়, দীনতায়, বহুবার
একবার প্রণাম করে হারিয়ে যাবো
দিগন্তের বিরাট জটিল তেল-রঙ ছবির ক্যানভাসে।

ফর হুম দ্য বেল টোলস
ইট টোলস ফর দী।

ইতিহাসের জন্যে

ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি

যখন নির্বাচন হ'য়ে গেল
কার কোথা স্থান
স্বর্গে কিংবা নরকে,
হিসেবনিকেশ
হ'ল শেষ
সন্তের, চোরের,
সেই সন ১৯১৬—
মনে আছে ভাল—
ফিট্‌ফাট বাবু্ সব পিঠটান দিল
পেত্রোগ্রাদ থেকে ॥ (১৯১৬)

অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন

পুনর্বাসন

শঙ্খ ঘোষ

যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ঘাসপাথর
সরীসৃপ
ভাঙা মন্দির
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
নির্বাসন
কথামালা
একলা সূর্যাস্ত
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ধ্বস
তীরবল্লম
ভিটেমাটি
সমস্ত একসঙ্গে কেঁপে ওঠে পশ্চিমমুখে
স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল
ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়
এক-পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন।

যা কিছু আমার চারপাশে আছে
শেয়ালদা

ভরদুপুর
উলকি দেয়াল

যা কিছু আমার চারপাশে আছে
কানাগলি
শ্লোগান
মনুমেণ্ট
যা কিছু আমার চারপাশে আছে
শরশয্যা
অন্ধ প্রহর
লালগঙ্গা
সমস্ত একসঙ্গে ঘিরে ধরে মজ্জার অন্ধকার
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজে জলতরঙ্গ
চূড়োয় শূন্য তুলে ধরে হাওড়া ব্রিজ
পায়ের নিচে গড়িয়ে যায় আবহমান।

যা কিছু আমার চারপাশে ঝর্ণা
উড়ন্ত চুল
উদোম পথ
ঝোড়ো মশাল
যা কিছু আমার চারপাশে স্বচ্ছ
ভোরের শব্দ
স্নাত শরীর
শ্মশানশিব
যা কিছু আমার চারপাশে মৃত্যু
একেক দিন
হাজার দিন
জন্মদিন
সমস্ত একসঙ্গে ঘুরে আসে স্মৃতির হাতে
অল্প আলোয় বসেথাকা পথভিখারী
যা ছিল আর যা আছে দুই পাথর ঠুকে
জ্বালিয়ে নেয় প্রতিদিনের পুনর্বাসন।

প্রকৃতি যেখানে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কখনো গতির কভু বিরামের সতর্কীকরণঃ
চব্বিশ পরগণা থেকে ছাতা কুঁধে কেউ আসে, কেউবা নিখোঁজ
হয়ে ঝরে যায়, একদিন তারও খুলি
শাদা হয়ে গড়পারে পড়ে থাকে, ছত্রিশ মাইল দূরে সমুদ্রের
তলা থেকে একদিন আরো কিছু বুঝে নিতে হয়,
যেন লক্ষ মশালের আগে এক আয়কর ভবন
ঘুমিয়ে রয়েছে, তাকে গুড়বার আদেশ দিয়ে রাজা
সদরে এলেন।

আজ এই সব বিষয়বিষয়ী
পেঁয়াজের প্রত্যেকটি পরত থেকে ক্রমিক শূন্যতা বুঝে নেয়,
মহকুমা জয় ক'রে এইবার চৌরাশী পরগণা
ফের করায়ত্ত হবে, এমন সময়....
সামনে পিছনে বড়ো কোলাহল,
ভিতরে বাহিরে চলে কারসাজি পরিবর্তনের,
অথবা পরিবর্তন বলে আর কিছু নেই,
কেবলই শরীর থেকে অশরীর সূক্ষ্ম জীবাণু
গর্ত করে নেয়, যাকে প্রজননবোধে
আয়ব্যয় করে যেতে হয়, আর প্রকৃতি যেখানে
এ-সবেরও উর্ধে, তারই কাছে
গতি ও স্থিতির মর্মে সঁপে দেওয়া ভালো
নিলামের বাড়ি।
বলুন তাহলে কেন ও-বাড়ির চাঁদ উঠে আসে
এই ফাঁকা ঝুল বারান্দায়!

রুমাল হীন

তুষার চট্টোপাধ্যায়

সময়ের গা বেয়ে
ঝরে যাচ্ছে অনুর্বর রক্ত।

নূতন মন্দিরে বাজছে
পুরানো ঘণ্টার ধ্বনি
বিপ্লবের যাবতীয় চড়াই-উৎরাই
যেন ওঠা নামা করছে
টিটাগড় ও পাথরপ্রতিমার পথে।

গলায় রুমাল বেঁধে—
আমি প্রগতির জন্য লড়ছি ;

চোখে রুমাল বেঁধে—
আমি প্রতিক্রিয়াকে রুখছি ;
রুমাল ছাড়া বুঝে নিচ্ছি
মানুষের ভালোনাম ও ডাকনামের মানে
খুঁজে পেলাম না আজো।

মানুষের লাঠি
মানুষেরই মাথায় আঘাত করে।
গলায় রুমাল বেঁধে—মিছিলে হেঁটে
চোখে রুমাল বেঁধে—লাঠি ঘুরিয়ে
আমি এখন রুমালহীন
পথে-পথে খুঁজে ফিরছি—
ভালোনাম ও ডাকনামের
যথাযথ মানে।

প্রকৃতির কাছে ফেরো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতির কাছে ফেরো, মানুষ যেভাবে
　　ঘাস খায় রোজ, কিছু শস্তা ব'লে, স্বাস্থ্যকর ব'লে
তুমিও সেভাবে ফেরো ঘাসের গুচ্ছের
　　ভিতরে পা মেলে ব'সো, লোভে-তাপে সবুজ নরম
　　　　করো ঘাস, নুন খাও
অবশ্য পৃথিবী ভারি নোনা—
রক্তে অশ্রুজলে আর হাড়ে-চুনে যথেষ্ট আমিষ !

প্রকৃতির কাছে ফেরো, মানুষ যেভাবে
　　শূন্য ভালোবাসা থেকে কাছে ফেরে সম্পূর্ণ কলসে—
তৃষ্ণা থাকা ভালো, কিন্তু তাতে যদি সমুদ্র শুকায়
　　কিছুতেই ভালো নয় ; কিংবা হিংস্র টুঁটি টিপে-ধরা
　　এসব, ঘটনা আজো পৃথিবীতে ঘটে আখছারই।
যে বলে বিরুদ্ধে তার, সে বিষণ্ণ বিশ্বাসঘাতক
　　শাস্তি তার মৃত্যু, মানে রক্তখাওয়া, তপ্ত মাংস খাওয়া...
অথচ, যা পুষ্টি ঘাসে, শান্তি ও সন্ন্যাস বিসর্জন
　　জানে তা সকলে, শুধু কাজ করে পেতে খাদ্যবিষ !

ছিলো অশ্রু, ঘামের রেখায়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে তুলে ধরো ছুরিকার কাছে।

মাখনে ফলার মতো বিঁধে যাক,
কীট হয়ে ফলের আমূলে,
দরোজায় চিড় খাবে
এরকম অধীরতা—গন্ধকের সফলতা চাই।

ছুঁয়ে ছুঁয়ে নয়, গেঁথে তোলো।
যেমন কত্থক, যতিস্বরমের
অনায়াস ভঙ্গিমায় অথচ নিবিড় পরিশ্রমে
প্রতি পদপাতে
জেগে ওঠে দেবদাসী দ্রাবিড়-অঙ্গন সু-দক্ষিণী মন্ত্রপাঠ
পাদপ্রদীপের সহাস্য আড়ালে ঢেকে
আর্তি, অভিনিবেশের দাবি
কুলগুরুদের দ্বারে দ্বারে উঞ্ছবৃত্তি,
অশ্রু, ঘামের রেখার কাছে এসে মিশে যাওয়া,
ভয়—সুবিপুল জাগরণ, তেমনই আয়াসে, রুদ্ধশ্বাসে
দ্বার থেকে দ্বারান্তর পেরিয়ে পেরিয়ে
শতাব্দী-কুশল-শ্রমে
সব কিছু গেঁথে বিঁধে সমর্থ সক্ষম বিগ্রহ-প্রতিম অবস্থিতি।

শান্ত হও। সংহত গুঞ্জন চাই।
গাণ্ডীবের ছিলাটানে আবেগের তার বেঁধে
অকস্মাৎ তোলো ঝনঝন,
নিদ্রা ছিঁড়ে যাক, ক্রমে গাঢ় হোক অসম্ভব হোক
বিপুল টঙ্কার,
বটচারা-চিড় খাক প্রাসাদে প্রাসাদে,
জাগুক পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের প্রণয়ী শহর,
ক্ষয়ক্ষতি ঈর্ষার উপরে
মুহূর্তে উঠুক বেজে চাঁদের বাঁকানো শিঙা
বাতাসের চণ্ডাল ফুৎকারে,
কেবল জয়ের জন্য যুদ্ধ হোক,
এখানে ওখানে থাক অবহেলা হয়ে কিছু ক্ষত—
যেখানে হঠাৎ হাত লেগে গেলে সারাবেলা শোণিতে সরোদ

সমর্পণ, বুকে বুক নয়,
দরোজায় টাল খাবে
এ রকম অধীরতা—গন্ধকের সফলতা চাই।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

দুয়ারে বাতাস এলে কে আর পেরেছে বাধা দিতে ?
বাতাস মানেতো সেই সবচেয়ে পুরনো পথিক—
ফুলেরা শুকায়ে গেলে গন্ধ যার গলায় দুলিয়ে দিয়ে যায়
পথ ভুলে গেলে নদী হাতছানি দিয়ে যারে ডাকে।
বাতাস মানেতো সেই লাল সিঁড়ি, পা ফেলে পাহাড় বেয়ে ওঠা
গলা ছেড়ে গেয়ে-ওঠা গান—
পৃথিবীর সমস্ত বাগান
মাদলের তালে তালে উঁচু হয় হৃদয় সমান।

এরকম দিনগুলি চিরকাল চেয়েছিল অবিরাম বুকে থেকে যেতে
মানুষের দুয়ারে দুয়ারে
হাঁক দিয়ে বলেছে, এখন জেগে থাকা প্রধান নিয়ম,
দুদণ্ড ঘুমের ফাঁকে মাঠ থেকে জ্যোৎস্না চুরি হয়ে যেতে পারে,
খুন হয়ে যেতে পারে ডাকবাক্সে উৎপন্ন গোলাপ।
ওধারে প্রলাপ
ছাড়খার করে দিতে ছুটে আসে দুই হাতে মথিত আকাশ।
এতো পূর্বাভাস—
আঘাতে দ্বিগুণ ঝর্ণা, দুয়ারে বাতাস।

অন্ধকারের রাজাকে

মৃণাল বসু চৌধুরী

প্রতিরোধহীন   হাতের আঙুলে ম্লান
বিবর্ণ গোলাপ দেখে শুদ্ধতম বিশ্বাসের রঙ মুছে মুছে
অনায়াস উচ্চতায় দিগন্ত আড়াল করে
নক্ষত্রের যৌবনের স্তম্ভগুলি ভেঙে ভেঙে ভেঙে
হাতের মুঠোয় তুমি   কি লুকোতে চাও   ভালোবাসা কিম্বা ভবিষ্যৎ
যা কেবল বেলাশেষে প্রগাঢ় বেদনা নিয়ে
বিন্দুর বৃত্তের পরিধির সহস্র বিস্তারে রক্তপাতে রেখে যাবে
অন্ধকার—তোমার নিয়তি।

বোধন না-লাগতেই ভাসানের উদ্বোধন, তবু

সত্য গুহ

দুরন্ত কারবাইড দিয়ে অকালে শরৎকাল হলো
বকের দোসর সেই কাশফুল, কলকে ফুলের মদ পান করা ভোর
পানসীর পেখমের মতো মেঘ উড়ে যায় আকাশগঙ্গায়
কার্নিশে টাঙানো লাল শালু   সমবেত আকুল প্রার্থনা

কিছুটা সোনার জন্যে, কিছুটা নারীর জন্যে, যুদ্ধজয়ের জন্যে কিছুটা তোমাকে
আরোগ্যের জন্যে, নিছক
বেঁচে থাকবারই জন্যে প্রার্থনা করে যেতে হবে—ঐতিহ্য এটাই
এ ছাড়া আনন্দ কি কঠিন আস্তর করা শানের শহরে
পাখীদের বাড়বাড়ি ভালোবাসা খুজে যাচ্ছ, ভাল,
এ এমন জায়গা এলে নেশা হয় খুব আর এ জন্যেই থাক হয়ে যাবে দেখেশুনে
ইডেনবাগানে ঘাস, ঘাটলা দেয়া দীঘি
ফুলের আসবাবপত্র, নিজেকে বানিয়ে তোলা পরী পরী মেয়েছেলে, তুমি
দিশাহারা হয়ে যেতে পারো, উৎসবে মেতে উঠতে পারা
তিতা হয়ে উঠবেই সমস্ত খানিক বাদে,—এখানের চরিত্র এটাই
বোধন না-লাগতেই ভাসানের উদ্বোধন শিশিরের জলে
শিউলির শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে
কখন যে বেলা পড়ে যায়
বুঝতেই সন্ধ্যে হয়, জ্যোৎস্নার হিম তাপ পুড়ে
এখানে কণ্ঠনালী ছিড়ে ডেকে যাওয়া
পিউ কাহা পিউ কাহা পিউ কাহা পিউ—আর এটাই সঙ্গীত
নিজের অস্তিত্ব নিয়ে হাহাকার করাটাই সম্বল এখানে

দশের পল্লীর পুণ্য ঐতিহ্যমণ্ডিত আয়োজন

বালিকার কাছ থেকে ভালোবাসা শিখে লোকালয়ে
প্রসূতির জন্যে শাদা এ্যাম্বুলেন্স ডেকে দেয়া, পাড়ায় আগুন লাগলে
বালতিতে বালতিতে
জল ঢেলে ছাই ধুয়ে সুন্দরী কাঠের খুটি টেনে নিয়ে আসা
হৈ হৈ করে মরা-মানুষ শ্মশানে নিয়ে খানিক বৈরাগী হয়ে যাওয়া
এসে কি মহত্তর লাভ হোলো ঘাসে—এ জিজ্ঞাসা
জিজ্ঞাসাই, সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আর গায়ে জ্বালা ধরলেই
মানুষকে জন্তু হতে দেখে
কখনো বা ভিত ভেঙে পড়ে; কখনো বা সমবেত আকুল প্রার্থনা
মানুষ-এর মানুষীর, দুরন্ত কারবাইড দিয়ে অকালে শরৎকাল
স্বাধীনতা মনে করে ময়দানে উড়ে যায় পাখী ॥

হো চি মিন

শঙ্কর চক্রবর্তী

এক

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সাগরমেখলা একটি দেশ, যার নদী-পাহাড় অরণ্যানী শোভিত সমগ্র প্রকৃতি জুড়ে শান্তি ও সৌন্দর্যের এক মূর্ছনা সমগ্র হৃদয়কে যেন আচ্ছন্ন করে তোলে। মরকতমণির মত উজ্জ্বল সেই দেশটির নাম ভিয়েতনাম। ভিয়েতনাম আজ শুধু একটি দেশের নাম নয়। আমাদের সমগ্র চেতনা, আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার সমগ্র আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই একটি শব্দের মধ্যে।

সেই ভিয়েতনামের একটি মানুষ হো চি মিন। ভিয়েতনামের মানুষের কাছে যিনি হলেন হো খুড়ো। আর গোটা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মনে যিনি এক অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসন গ্রহণ করে বসেছিলেন। এ বছর গত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে দীর্ঘ রোগভোগের পর এই মানুষটির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর জীবনের একটি আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রইল। ভিয়েতনামের মাটিতে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও অত্যাচারের সর্বশেষ নিদর্শনটুকু নিশ্চিহ্ন অবস্থায় তিনি দেখে যেতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর যে নেতৃত্ব এতদিন ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামকে আলোকবর্তিকার মতো পথ নির্দেশ করেছে, সেই মহান স্মৃতি এই মুক্তিসংগ্রামকে এক বজ্রকঠিন দৃঢ়তায় আরো মহীয়ান করে তুলবে।

দুই

হো চি মিন-এর জীবনের প্রথম নাম ছিল নগুয়েন ভ্যান্ থান্। ১৮৯০ সালের ১৯শে মে মধ্য ভিয়েতনামের নঘে আন্ প্রদেশের কিম লিয়েন গ্রামে তাঁর জন্ম।

হো চি মিন-এর জন্মের প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল আগেই ভিয়েতনাম ফ্রান্সের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা ভিয়েতনাম জুড়ে যে টুকরো টুকরো আন্দোলন চলছিল, হো অল্পবয়সেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ভিয়েতনামের তখনকার রাজধানী হুয়ে শহরে একটি প্রাইমারী স্কুলে হো কিছুদিন পড়াশুনো করেন কিন্তু ফরাসী গোয়েন্দা পুলিশের চোখে ক্রমাগত ধুলো দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল বলে সেকেণ্ডারি স্কুলের পাঠক্রমটা আর শেষ করে উঠতে পারেন নি।

ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক তীব্র ঘৃণায় হো ধিকি ধিকি

করে জলছেন কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দেশের মাটিতে থেকে বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারবেন না। একটি প্রাইমারি স্কুলে কিছুদিন চাকরী করার পর হো একুশ বছর বয়সে, একটি ফরাসী জাহাজে পাচকের সহকারীর কাজ নিয়ে দেশ ছাড়লেন। জাহাজে তিনি এক নাম নিয়েছিলেন--'বা।'

জাহাজের চাকরী নিয়ে হো কত দেশের বন্দরে বন্দরে ঘুরলেন। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলোতে সাধারণ মানুষের ওপর ফরাসী অত্যাচারের কত ঘৃণ্য নমুনা তাঁর চোখে পড়ল। আমেরিকাতেও তিনি গিয়েছিলেন। সেখানে ড্যানিয়েল ডিলিওনের অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ঘটে।

দু-বছর জাহাজে চাকরী নিয়ে বিভিন্ন দেশে ঘোরাঘুরির পর হো ১৯১৩ সালে লণ্ডনে এসে বসবাস শুরু করলেন। ভিয়েতনামের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্টকে এই সময়ে জীবিকানির্বাহের জন্যে কখনো বিদ্যালয়ে বরফ পরিষ্কারের কাজ করতে হয়েছে, কখনো মাটির তলায় অন্ধকার ঘরে বয়লারে কয়লা ঠেলবার কাজ করতে হয়েছে, আবার এক সময়ে লণ্ডনের অভিজাত কার্লটন হোটেলে খাবারের বাসনপত্র পরিষ্কারের কাজও নিতে হয়েছে। কোন কারণে হোটেলের প্রধান পাচকের হোর ওপর খানিকটা দুর্বলতা জন্মায়। তিনি হোকে কেক তৈরি করতে শেখান। ফলে চাকরীতে উন্নতি হয়ে হো কিছু বেশি টাকা রোজগারের সুযোগ পান।

হো প্রতিদিন সকালে কাজে যাবার আগে এবং কাজ থেকে ফিরে এসে গভীর রাত অবধি লণ্ডনের হাইড পার্কে বই, খাতা নিয়ে বসে ইংরেজী ভাষা শিখতেন এবং ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের ইতিহাস অধ্যয়ন করতেন। এই পড়াশুনো পরবর্তীকালে তাঁর অনেক কাজে লেগেছিল। এ সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবধর্মী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হোর যোগাযোগ ঘটে।

হো প্রায় ছ-বছর লণ্ডনে বাস করেছিলেন। লাজুক ও স্পর্শকাতর এই মানুষটি নিজের মনের প্রেরণায় ও তাগিদে এই সময় থেকেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন।

তিন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগেই হো ১৯১৭ সালে প্যারিসে এলেন। এখানে এসে তিনি নিজের নাম নিলেন নগুয়েন আলি কুয়োক বা দেশভক্ত নগুয়েন। জীবিকা নির্বাহের জন্যে কখনো ছবি আঁকা, কখনো ফটোগ্রাফারের ষ্টুডিওতে সহকারীর কাজ করে চললেন।

১৯১৯ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে শান্তি সম্মেলন বসতে চলেছে। হো প্যারিসে ভিয়েতনামের দেশভক্তদের

এক সংগঠন গড়ে তুললেন এবং এই সংগঠনের তরফ থেকে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সম্পর্কে আট-দফা দাবী সম্বলিত এক আবেদন ভার্সাই শান্তি সম্মেলনে পেশ করলেন। তাঁর দেশে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অত্যাচারের ছবি জ্বলন্ত ভাষায় এই আবেদনের মধ্যে ধরা পড়েছিল।

যদি ভার্সাই সাম্মেলনের চুক্তিপত্রের ওপর হোর আট-দফা দাবীর কোন প্রতিফলন ধরা পড়েনি কিন্তু এই একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে হো প্যারিসের বহু মানুষের কাছে বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলোর নেতাদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণীর অন্যতম নেতা চার্লস লঙ্গুয়েত (কার্ল মার্কসের জামাতা) লো পপুলেয়ার' নামে একটি কাগজের সম্পাদনা করতেন। প্যারিসের এই একটি মাত্র কাগজেই হোর আট-দফা দাবী ছাপা হয়েছিল।

ভিয়েতনামের ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের অত্যাচারের ছবি ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরবার জন্যে লঙ্গুয়েত হোকে তাঁর কাগজে লিখতে বললেন। হোর মস্ত অসুবিধে—তিনি ফরাসী ভাষাতে ভাল করে লিখতে পারেন না, আবার সাংবাদিকতা বৃত্তিটাও তাঁর ভাল করে শেখা হয় নি। এই দুটো ব্যাপারেই তিনি মস্ত সাহায্য পেলেন ফ্রান্সের প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়নের মুখপত্র 'লা ভি উভরিয়ের'-এর (শ্রমিকদের জীবন) সম্পাদক কনমুসিয়ুর কাছ থেকে। তিনি হোকে প্রায় হাতে ধরে প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক হবার শিক্ষা দেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হো ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'লুমানিতে' কাগজে প্রবন্ধ ও ছোট গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। এর পরে লিখলেন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ওপর বিস্তৃত তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ Accusations against French Coloniaeism' এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমনের ভঙ্গীতে লেখা শ্লেষাত্মক নাটক 'The Bamboo Dragon.' প্যারিসের সাহিত্য মহলে নাটকটি উচ্চ প্রশংসিত হল। ফরাসী সরকার যদিও নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন কিন্তু প্যারিসের প্রগতিশীল ক্লাবগুলো গোপনে নাটকটির বহু অভিনয় করেছিলেন।

হো ধীরে ধীরে ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির গভীর সংস্পর্শে আসেন এবং পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা মার্সেল কাশাঁ, ভেইলাঁ-কুতুরিয়ে, ব্লুম এবং অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় গড়ে উঠল।

হো প্যারিসে যদিও অসাধারণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছিলেন, তাহলেও এরমধ্যেই অল্পখরচায় যখনই সুযোগ পেতেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে জনসাধারণের জীবন এবং শ্রমিক-শ্রেণীর সংগঠনগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করতেন।

চার

হো ছিলেন তখনকার ফরাসী সোশ্যালিষ্ট পার্টির একমাত্র ভিয়েতনামী সদস্য। ফরাসী সোশ্যালিষ্টরা তখন প্রায় সবাই ছিলেন মার্কসবাদী। পার্টি বা

ট্রেড ইউনিয়ন কি, সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদই বা কি, এ সম্বন্ধে হোর কিন্তু তখনো পর্যন্ত কোন ধারণাই গড়ে ওঠেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের অক্টোবর বিপ্লবকে তিনি সমর্থন করেন বটে, কিন্তু সেটা প্রধানতঃ আবেগসঞ্জাত, তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে তিনি তখনো উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি। লেনিনের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, কিন্তু তখনো পযন্ত তিনি লেনিনের কোন বই পড়েন নি। হো সোশ্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন এইজন্যে যে সেখানে সবাই তাঁর প্রতি এবং উপনিবেশগুলোর নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থনকে জ্ঞাপন করত।

ফরাসী সোশ্যালিষ্ট পার্টির শাখাগুলোতে তখন এই নিয়ে তুমুল আলোচনা চলেছে যে ঐ পার্টি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে থাকবে না লেনিনের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত হবে অথবা সম্পূর্ণ নতুন এক আড়াই আন্তর্জাতিককেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হো সব আলোচনাগুলোতেই অংশগ্রহণ করেন। একটা প্রশ্নের উত্তর হো কারো কাছ থেকই পান না। প্রশ্নটি ছিল, কোন্ আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক দেশগুলোর জনগণের সংগ্রামের পক্ষ সমর্থন করছে? হোর দু-একজন কমরেড বন্ধু শুধু তাঁকে বলেছিলেন যে দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় আন্তর্জাতিকই সেটা করছে এবং লেনিনের 'Thesis on the national and colonial questions' লেখাটি তারা তাঁকে পড়তে দিলেন।

প্রথমে লেখাটির বহু রাজনৈতিক শব্দের অর্থ হো বুঝে উঠতে পারেন নি। কিন্তু বার বার পড়ে হো লেখাটির মূল বক্তব্যকে ধরতে পারেন। হো বলেছেন, লেখাটি তাঁর মধ্যে এক বিরাট আবেগ, উৎসাহ, স্বচ্ছতা এবং আত্মনির্ভরতাকে সঞ্চার করেছিল। তিনি আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেললেন। যেন এক বিরাট জনসভাকে সম্বোধন করছেন, এইভাবে নিজের ঘরের মধ্যেই চীৎকার করে বলে উঠলেন, "বন্ধুগণ, আমরা যা চাই তা হচ্ছে এই, এই হচ্ছে আমাদের মুক্তির পথ।"

এক বিরাট পরিবর্তন এল হোর ভেতরে। সভাগুলোতে তিনি আর নীরব শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করতেন না। এরপর থেকে হো লেনিন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপক্ষে বলিষ্ঠভাবে নিজের বক্তব্যকে রাখতে শুরু করলেন। হো বলেছেন, প্রথমে সাম্যবাদ নয়, স্বদেশপ্রেমই লেনিন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ওপর তাঁর আস্থাকে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অধ্যয়ন এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে একমাত্র সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদই সমগ্র পৃথিবী জুড়ে নিপীড়িত মানুষ এবং শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ এবং দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে।

১৯২০ সালে ফ্রান্সের তুর শহরের সম্মেলনে, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগদানের প্রশ্নে সোশ্যালিষ্ট পার্টি যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে

গেল, তখন তাঁর বামপন্থী অংশের সঙ্গে বেরিয়ে এসে হো ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন করলেন।

উপনিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে হো এখন সকলের কাছেই একজন বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। ফরাসী উপনিবেশগুলোর বিভিন্ন নেতা ও কর্মীদের নিয়ে হো ১৯২১ সালে প্যারিসে League of colonial countries নামে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন এবং এই সংগঠনের মুখপত্ররূপে 'লা পারিয়া' নামে একটি কাগজ তাঁর সম্পাদনায় ১৯২২ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করল। ফরাসী সরকার যদিও ইন্দোচীনে এই কাগজটির প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন কিন্তু ফরাসী জাহাজগুলোর ভিয়েতনামী নাবিকেরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাগজটিকে গোপনে ছড়িয়ে দিতেন।

পাঁচ

১৯২৩ সালের জুন মাসে মস্কোতে আন্তর্জাতিক কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের অন্যতম-রূপে হো এলেন মস্কোতে। হো আন্তর্জাতিক কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্যরূপে নির্বাচিত হলেন। মস্কোতে তিনি রুশভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন এবং সদ্যপ্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যের শ্রমিকদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপ্লবী কর্মনীতি ও সংগঠনপদ্ধতি সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন।

প্রাভদায় তাঁর কিছু রচনাও এসময়ে প্রকাশিত হয়।

লেনিনের সঙ্গে হোর দেখা হয় নি। ১৯২৪ সালে লেনিনের সমাধি-অনুষ্ঠানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে হো পরিচিত হন।

১৯২৫ সালের গোড়াতে বোরোদিন চীনের প্রথম প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট সুন-ইয়াত-সেনের রাজনৈতিক পরামর্শদাতারূপে চীনের ক্যাণ্টন শহরে আসেন। হো বোরোদিনের দোভাষীরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পঁচিশ বছরের ওপর নিজের দেশ থেকে বহুদূরে কাটিয়ে এতদিন বাদে হো দেশের কাছাকাছি এসেছেন। দেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্যে তাঁর করণীয় কাজ এখনো কত বাকি রয়েছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছিল, হো বুঝতে পেরেছিলেন এই আন্দোলনের ভেতর দিয়েই একদিন ভিয়েতনামে মুক্তি-সংগ্রাম জয়যুক্ত হবার পথ উন্মুক্ত হবে। তাই তিনি একদিকে যেমন ঐ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন, তেমনি চীনে বসবাসকারী ভিয়েতনামীদের নিয়ে ১৯২৫ সালের জুন মাসে ক্যাণ্টনে League of Revolutionary Vietnamese Youth' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। চীনের হোয়ামপোয়া মিলিটারী অ্যাকাডেমি চিয়াং-কাই-শেক ও চৌ-এন-লাইয়ের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের বিপ্লবীদের এক শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠল। এই সব বিপ্লবীদের হো আবার ভিয়েতনামের বিভিন্ন কেন্দ্রে মুক্তিসংগ্রামের দায়িত্ব অর্পণ করে পাঠাতেন।

১৯২৭ সালে চিয়াং চীনের জাতীয় বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

করে কমিউনিষ্টদের ওপর এক নৃশংস আক্রমণ শুরু করল। বোরোদিনের সঙ্গে হো কোনরকমভাবে পালিয়ে মস্কোয় ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঘটনাচক্রে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট সংগঠন ত্রিধাবিভক্ত হয়ে বসল। হো বুঝতে পারলেন, এভাবে ঘটনাচক্র চলতে থাকলে মুক্তি-সংগ্রামের মেরুদণ্ডই দুর্বল হয়ে পড়বে। তিনি তখন শ্যামদেশে রয়েছেন। কখনো কৃষক, কখনো বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা রাস্তায় সিগারেট বিক্রেতার ছদ্মবেশে তিনি ঘুরে বেড়ান। হো শ্যামদেশে ভিয়েতনামীদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়লেন এবং 'লুমানিতে' নামে একটি কাগজ প্রকাশ করে সীমান্ত ডিঙিয়ে ভিয়েতনামের বিপ্লবী কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। এই কাগজটি ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের কি বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করত, তা একটি ঘটনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। উত্তর ভিয়েতনামের ভিন প্রদেশের ফরাসী শাসক হোর অনুপস্থিতিতেই ১৯২৯ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে এক বিধান জারী করেছিল।

১৯৩০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশে এবং হোর অনুপ্রেরণায় ভিয়েতনামের ত্রিধাবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা চীনের কোয়াংসি প্রদেশের রাজধানী কোয়েইলিন শহরে মিলিত হলেন এবং হোর নেতৃত্বে এই বিভিন্ন দলগুলো একত্রিত হয়ে ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তুললেন। এই একটি ঘটনা থেকেই ভিয়েতনামের সমগ্র জনসাধারণের ওপর হোর অপরিসীম প্রভাব ও নেতৃত্বের পরিচয় আমরা লাভ করি।

ছয়

চিয়াং-এর বিশ্বাসঘাতকতার পর হো হংকং শহরকেই তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। এখানকার ইংরেজ শাসক ১৯৩৩ সালে, হো সোভিয়েত ইউনিয়নের এজেন্টরূপে কাজ করছেন, এই অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বসলেন। ইংরেজ সরকারের মতলবটা ছিল একটা বিচারের প্রহসন করে হোকে চীনের সীমান্ত ডিঙিয়ে চিয়াং-এর হাতে তুলে দেবেন। ব্যাপারটা এভাবে ঘটলে হোর মৃত্যু ছিল অবধারিত। কেননা, চিয়াং চীন জুড়ে তখনো তার কমিউনিস্ট হত্যার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

লোস্‌বি নামে একজন ইংরেজ আইনজীবী হোকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন। ইংরেজ সরকারের পরিকল্পনাটা ছিল হোকে শেষপর্যন্ত ফরাসীদের হাতে তুলে দেয়া। তাহলেও তাঁর প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা ছিল। লোস্‌বি ও তাঁর স্ত্রী শেষপর্যন্ত নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হোকে কারাগার থেকে লুকিয়ে বের করে চীনের মূল ভূখণ্ডে তাঁদের এক বন্ধুর বাড়িতে এনে তুললেন। এখানে হো এক ধনী চীনা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে কিছুদিন বাস করে নিজের সম্পূর্ণ ভগ্ন স্বাস্থ্যকে সারিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন।

ইতিমধ্যে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ঘটনাস্রোত দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল। ইয়োরোপে যেমন হিটলারের ফ্যাসীবাদী চক্রের অভ্যুত্থান হয়েছিল, তেমনি জাপানেও সাম্রাজ্যবাদী চক্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদী

শাসন সমগ্র ইন্দোচীনকে ফরাসীদের হাত থেকে কেড়ে নিল।

হো জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনকে জোরালোভাবে গড়ে তোলবার জন্য ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী দলকে সম্মিলিত করে ১৯৪১ সালের ১৯শে মে ভিয়েতমিন বা 'দি লিগ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফর ভিয়েতনাম' নামে এক সংগঠন গড়ে তুললেন। হো সংগঠনের সেক্রেটারী-জেনারেলরূপে নির্বাচিত হলেন।

ভিয়েতনামের মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শেকড়টাকে চিরকালের মত উপড়ে ফেলতে হবে—ভিয়েতমিন সংগঠনের এই হলো প্রধান কর্মসূচী। তার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল বিরাট গেরিলা সেনাবাহিনী গড়ে তোলার।

ইতিমধ্যে চীনে জাপানী সামরিক অভিযানের অগ্রগতিকে রোখবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি এবং চিয়াং-এর মধ্যে একটা বোঝাবুঝি গড়ে উঠেছিল। ভিয়েতমিন সংগঠনের সঙ্গেও ইতিমধ্যে জাপানীদের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। এই সংগ্রামের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য হো ঠিক করলেন, চিয়াং-এর সঙ্গে কথা বলবেন। হো ইতিমধ্যে অনেকবারই নাম পালটেছেন। ইংরেজ, ফরাসী এবং কুয়োমিনটাং গোয়েন্দা পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য হো শেষবারের মত নাম পালটে হো চি মিন বা জ্ঞানী পুরুষ নাম গ্রহণ করলেন।

চিয়াং-এর সঙ্গে দেখা করা আর হোর ভাগ্যে জুটল না। উত্তর ভিয়েতনাম থেকে চীনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই কুয়োমিনটাং পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল এবং আঠার মাস অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে তাঁকে জেলে পুড়ে রাখল। অসাধারণ মানসিক শক্তিবলেই হো মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি দুরন্ত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তার চেয়েও এক মর্মান্তিক যন্ত্রণায় তিনি বিদ্ধ হতে থাকলেন। ভিয়েতনামে বহুপ্রতীক্ষিত মুক্তিসংগ্রাম যখন শুরু হয়েছে এবং তাঁর নেতৃত্বের প্রয়োজনটাও যখন সর্বাধিক, তখনই দেশের মাটি থেকে তিনি দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

হো জেল থেকে যখন ছাড়া পেলেন, তখন তিনি প্রায় মৃত্যুশয্যায়। খানিকটা সুস্থ হয়েই তিনি এসে মিলিত হলেন ভিয়েতনামে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে। জাপানীদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম চূড়ান্তগতিতে এগিয়ে চলল। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভিয়েতমিন সংগঠনের গেরিলা সেনাবাহিনীর নায়ক গিয়াপ প্রায় সমগ্র ভিয়েতনাম থেকে জাপানী সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করলেন।

সাত

১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর হো চি মিন সমগ্র ভিয়েতনামকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করলেন। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি সমগ্র ভিয়েতনাম জুড়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অনুষ্ঠান করলেন। নির্বাচনের পর ভিয়েতনামের মানুষ হো চি মিনকে তাদের প্রেসিডেন্টরূপে বরণ করে নিলেন।

হো চি মিন ভেবেছিলেন, ভিয়েতনামের মাটি থেকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শেকড়টাকে উপড়ে ফেলার পুরস্কারস্বরূপ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভিয়েতনামের

স্বাধীনতাকে মেনে নেবে। কিন্তু তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না। ফরাসীরা আবার এল। আবার লড়াই শুরু হল। কিন্তু হো চি মিন চাইছিলেন শান্তি। লড়াই অনেকদিন হয়েছে। দেশের ভাঙ্গা অর্থনীতিকে আবার গড়ে তুলতে হবে। হো প্যারিসে ফ্রান্সের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। কিন্তু আলোচনা সফল হল না। শুরু হল সর্বাত্মক লড়াই। সে লড়াই চলল ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ সাল এবং শেষ হল দিয়েন বিয়েন ফু'তে ফরাসী সামরিক বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।

জেনিভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। আমেরিকার সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামে আবির্ভূত হয়ে তাদের তাঁবেদার সরকারকে দিয়ে জেনিভা সম্মেলনের প্রতিটি চুক্তিকে লংঘন করাল। শান্তিপূর্ণভাবে ভিয়েতনামের সমস্যার সমাধান হবে, হো চি মিনের এই আকাঙ্ক্ষা আবারও ব্যর্থ হল।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে জাতীয় মুক্তফ্রন্ট অনেকগুলো বছর ধরে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়ছেন এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক বিরাট অংশের ওপর নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। উত্তর ভিয়েতনামের ওপর কয়েক বছর ধরে নৃশংসভাবে একটানা বিমান আক্রমণ চালিয়েও আমেরিকার সরকার সেখানকার মানুষের প্রতিরোধের দৃঢ়তাকে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি।

হো চি মিন একবার প্রখ্যাতনামা অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক উইলফ্রেড বার্চেটকে বলেছিলেন, আমেরিকান বোমাবর্ষণকে ধন্যবাদ। আমার দেশের প্রতিটি মানুষ যে পরিমাণ কাজ করতে সক্ষম, এই বোমাবর্ষণের ফলে তারা তার চেয়েও পাঁচগুণ বেশি কাজ করছেন।

বার্চেট প্রশ্ন করেছিলেন হো চি মিনকে, আমেরিকার সরকার দশ হাজার মাইল দূর থেকে এসে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ চালিয়েছে ভিয়েতনামের ওপর, তাসত্ত্বেও তিনি কেন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে ভিয়েতনামে স্বেচ্ছাসৈন্য পাঠাতে বলছেন না। হো চি মিন বলেছিলেন—তিনি চান না, সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথীরা এসে ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের জন্যে আত্মত্যাগ করেন। তাদের অন্য যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুই তাঁরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে পাচ্ছেন। ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম চালাবার সামর্থ তাঁদের নিজেদেরই রয়েছে। শুধু আজকে নয়, প্রয়োজন হলে এই মুক্তিসংগ্রাম তাঁরা আরো কুড়ি বছর, পঞ্চাশ বছর ধরে চালিয়ে যাবেন। এ মুক্তিসংগ্রামে জয় তাঁদের অনিবার্য।

ভিয়েতনামের মানুষের কাছে দুটি সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হল—দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। এই দুটিকে রক্ষার জন্যে এই কোমলপ্রাণের এবং পরম শান্তিপ্রিয় মানুষগুলো যে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে তাদের মুক্তিসংগ্রামকে চালিয়ে যাচ্ছেন, হো খুড়োর অনন্যসাধারণ নেতৃত্ব এতদিন সে সংগ্রামে তাদের পথ দেখিয়েছে। ভিয়েতনামের মানুষ কোনদিন তাদের হো খুড়োকে ভুলতে পারবে না। আমরা ভুলতে পারব না আমাদের হো চি মিনকে।

বিপরীতদিকে, সমতলে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ভাবি সেই অশঙ্ক দিনের কথা ; যখন আকাশে দিগ্‌বিদিক
দুন্দুভির ভিতর পৃথিবী মানুষের কাছে নেমে আসবে এক
অমেয় সিঞ্চন।
ধুলো ধুলো পিচরাস্তার ওপরেও এতো ধুলো যে পায়ের গতি
বোঝা যায় না ; যায়না বোঝা পথিক এলো না গেলো,
ভাবি কবে ভিজে যাবে মাটি ; আমি নতজানুর অধিক নিচু
পরীক্ষা করবো চলাচল ; যে পথ শস্যের দিকে
তার পিছনে পিছনে লোভী কুকুরের মতো পাঠাবো আমার
শব্দসাধ। রে রে করে মাথার উপরে
শরীরের শেষ উত্তরীয় ঘোরাতে ঘোরাতে আমি
নগ্ন বলবো "আকাশ বহুদিন চোখের বর্ষায়
শুকনো ধুলোর পথ ভিজিয়েছি, কাণ্ডজ্ঞানহীন
দেবদারুর মতন উত্থানের সমস্ত সবুজ
সামাজিক পার্বনে আনুষ্ঠানিক ব্যবহার করতে দিয়েছি,
প্রতি উৎসবের শেষে গরু এসে খেয়ে গেছে পাতার কঙ্কাল ;
তবু দূর থেকে পিচে পা ডুবিয়ে নিশ্চল দেখেছি
আর প্রতিটি বছর উর্ধে উর্ধে আরো নীল উর্ধে
পালিয়ে কেবলি মেঘে উঠে যেতে চেয়েছি মানুষ থেকে দূরে
অথচ মানুষেরই জন্য। তারপর একদা কোনো
মধ্যনিশীথের চুপ অন্ধকারে শিকড়ের জন্য মন কেমন করলে
আশ্বিনের শেষ শিশিরের মতো শান্ত নেমে আসবো মাটিতে,
সূর্য ফিরে আসবার আগেই আরেকবার ভাববো প্রস্থান পথ
কবে পথিকের গতি থেকে স্থায়ী হয়ে উঠবে, কবে
নতজানু হলেই যুধিষ্ঠিরের পার্বত্য পদচিহ্নের পিছনে
কুকুরের চতুষ্পদ ধৈর্য দেখে আমি
আমার সমস্ত মর্তপ্রয়াসের ইচ্ছা
বিপরীত দিকে, অর্থাৎ কিনা সমতলে
ফেরাতে পারবো।

একবার আমাকে

রত্নেশ্বর হাজরা

আমাকে আমার পুত্র হতে দাও আমাকে আমার সন্তান হতে
আমি সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে মুকুট নামিয়ে রাখবো ধুলোয়
দুহাত প্রসারিত করে ভিক্ষা চাইবো কস্তুরী লাগানো রুমাল
ফেলে দেবো
পথের ধারে বাঘছালের আসন পড়ে থাকবে চাইলেই বিলিয়ে দেবো
কণ্ঠহার পিতামহর দেওয়া তরবারি তার রণকৌশল একবার
আমাকে আমার জন্ম হতে দিলে আমি কার্পেট তুলে ফেলে
ঘাস বিছিয়ে দেবো রাস্তায় প্রখর গ্রীষ্মেও জলের কাছে
যাবো না একবার আমাকে আমার ভবিষ্যৎ হতে দিলে আমি
মৃত্যুর কাছে স্বপ্ন ফেরি করে আসবো রক্তমাংসের পরিপূর্ণ
নারীর আবরণ সরিয়ে বলবো দাও হৃৎপিণ্ড ভিক্ষা দাও
মৌমাছির পাখায় বেঁধে ছেড়ে দেবো ফালগুন চৈত্রের তিলক্ষেতে
নিশিন্দাঝোপের পাশের রাস্তায় শিমুল ফেটে তুলো উড়বে
বাঘছালের আসন পড়ে থাকবে আমার কস্তুরী লাগানো রুমাল
কণ্ঠহারের পাশাপাশি পিতামহর দেওয়া তরবারি বর্ম এবং
রণকৌশল আমি মাথা থেকে মুকুট নামিয়ে দেবো আমাকে
আমার মৃত্যুর কাছে স্বপ্ন ফেরি করে আসতে দাও—

দুরন্ত সময় জুড়ে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

পান্থনিবাস খুঁজে পথে পথে ধূসর গোধূলি
জাগর রাত্রির রূপ মনের দর্পণে ভেসে ওঠে।

অথচ সকলি আছে সংসারের স্তিমিত আলোকে
মনুষ্যবসতিহীন মরুভূমি দেখিনি কখনো সন্ধ্যার নীরব তারা
সৌরলোক স্পন্দিত সময়ে জটায়ু নিহত হলে
প্রতিবেশী দুয়ারের কঠিন অর্গল ভেঙে যায়।

উল্কাপতনের শব্দে জাগরিত স্তব্ধ বনভূমি পথের দু'পাশে পথ
বলদর্পী বাতাসের মল্লভূমি মেতে ওঠে প্রচণ্ড উল্লাসে,
পান্থশালার দরজা খুলে যায়—
ছড়ানো সূর্যের পথ ভরা কোটালের বানে উথাল পাথাল ঢেউ তোলে

অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কোথায় কি যেন দ্রুত ঘটে যাচ্ছে ঘটে যায় দ্রুত
লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে ঘটে যায়
ইতিহাস ধুলো ঝেড়ে হাঁটে ভিন্ন ইতিহাস পথের উদ্দেশে
শব্দে বা নিঃশব্দে হেঁটে যায়
আমরা ক্রমশ বৃদ্ধ হয়ে পড়ি দিনে দিনে পরিবর্তমান
পৃথিবী চলেছে কোন পথে—
জেনে নিয়ে রক্তস্রোত সেই পথে চালনার প্রয়োজন বুঝি
আমাদের প্রবীণতা চোখের মণিতে সূর্য জ্বেলে দেয়
মস্তিষ্কে বয়স জানায় স্থিরতা মানে মৃত্যু
মানে বার্ধক্যের কঠিন শাসন মৃত্যুরই দ্বিতীয় নাম
রক্তের নদীতে শীত ঋতু
নেমে এলে এইসব পাখিরা পালাবে সেই দেশে
যেখানে হিমেলঋতু জ্বলন্ত সূর্যের ভয়ে সত্রাসে পালায়

কোথায় কি যেন দ্রুত ঘটে যাচ্ছে ঘটে যায় দ্রুত
লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে ঘটে যায়
ইতিহাস খুলে রেখে পুরনো পোষাক শিরস্ত্রাণ
পরিচিত পৃথিবীর সীমান্ত পেরিয়ে হেঁটে যায়
আমি জরাভারে পঙ্গু প্রবীণ যযাতি অভিশাপে
ক্রমাগ্রসরণ থেকে সরে থাকি অথর্ব সিংহের
মতন জ্বলন্ত ক্রোধ বুকে চেপে ক্রমমৃত্যু অব্যর্থ নিয়তি
জেনেছি বলেই এই সীমান্তের এপারে শ্মশান
সাজিয়ে প্রতীক্ষা করি বুঝি এই সীমান্ত পেরিয়ে
কাহারা ছুটেছে কিসে ঘটে যাচ্ছে চতুষ্পার্শ্বে অসম্ভব দ্রুত
লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে ঘটে যায় শব্দে বা নিঃশব্দে ঘটে যায়
রক্তের নদীতে কার জাগরণ? কাহাদের শৃঙ্খলিত শব
ভেসে যায় অন্ধকার সমুদ্রের দিকে?
ওরা কী পিতা? না পিতামহ? না কী অন্ধ প্রতিবেশি?
রাজা? না রাজপুত্র? না কী শ্রেষ্ঠীপুত্র? কাহাদের শব
ভেসে যায় পাশাপাশি অন্ধকার সমুদ্রের দিকে? আমার অথর্ব লাশ
পড়ে আছে উহাদের শরীরের পাশে······ চিনতে পারি

অধিকার

গণেশ বসু

কে যায়, কে কে হাঁকে, কে আমার এ ভাঙা বুকে
ইলিশগন্ধার গঙ্গা পদ্মা মেঘনায়
দাঁড়ে দাঁড়ে কে হাসে, কে জোয়ারে ভাঁটিতে নোনা কষে,
স্বপ্ন ভাঙা স্বপ্নবোনা রক্তে জ্বলা রক্তে আঁকা ধানের চূড়ায়
কে যায়, কে কে হাসে, কে আমার বাঙলার ঠোঁটে
ভায়োলেট ফুলে ফুলে কচুরিপানার।
কাঁদে কারা আর্তনাদে চলার বলার ঘুমে দৌড়ঝাঁপ প্রতিটি চিন্তার
কে গায়, কে কে ছেড়ে, কে একে একে কাঠগোলাপের ঝুঁটি
বিক্ষোভের বশে।
বিপুল শিমুল ফাটে পৃথিবীতে সূর্যের ভিতরে

ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধ ফোঁসে সময় সময়
পাহাড়ে পাহাড়ে মেঘের চূড়ায়
হাতে হাতে বুকের উত্তাপে পাশাপাশি
হাঁটে পাশাপাশি ব্যর্থতার শিরায় শিরায় ফুল যন্ত্রণার ছড়ে
পাশাপাশি
বড়ো কাছে, কলজের এধার ওধার চোখের মণিতে।
মাঝে মাঝে তাই ছুটে আসে মাঝে মাঝে তাই মনে হয়
উত্তরের ভালোবাসা ঃ দক্ষিণের
ভালোবাসা গিরিচূড়া ঃ প্রান্তরের
ভালোবাসা বড়ো বেশি স্মৃতির উজ্জ্বল।

স্বপ্ন আশ্চর্য ফসল চোখে তার এক স্বপ্ন
চোরাবালি কেটে কেটে নক্সা তোলে গাঁথে,
পাঁচিল, পাঁচিল ভেঙে রুপোলি স্রোতের ধ্বনি আনে
রাতেদিনে আনন্দবিষাদে ভালোবাসা এবং ঘৃণায়, রোদ্দুরেবর্ষণে।
চোখের সামনে আজ ফুলে ওঠে অশ্রুপাত চূড়ায় চূড়ায়
আমার মায়ের দুঃখ অন্ধকারে অনাহারে, কিংবদন্তী ? আসে
মানুষের বিপুল মিছিল আকাশ পাতাল ক্রোধ
দিন বদলের,
হাওয়া বদলের ঝাপটে দাপটে
হাতে-হাত একালের অজস্র কঙ্কাল,

দাঁতে দাঁত আবিশ্ব যৌবন
চুরমার,　　চুরমার আদালত শোষণের, মানুষ মারার
ইঁদুরের কল সব, ঘেরাটোপ, স্বপ্ন
যৌবনের ক্ষোভে ক্ষোভে, পায়ে পায়ে, চিৎকারে চিৎকারে
লড়াই, লড়াই চলে বোধের গভীরে আর মুক্তি সেনাদের
মর্টারের দুরন্ত ঝুমুর।　　দুঃখের ভাঁজে ভাঁজে কেরোসিন,
চাবুকেরসিকে সিকে　　রক্তের উত্তাপ মেপে যায়,
মাপে গ্রাম, শহরের নদীর আয়নায়
লাল পতাকার গানে　　ভরাবুকে
সূর্যোদয়ে ভালোবাসা
আমার সমস্ত শ্রম আনন্দ বিষাদ
দামাল উদ্ধার হো-চি-মিন
রক্তাক্ত কবিতা
সংঘর্ষে বিনয়ে শিল্প জয় পরাজয়ে
অস্তিত্বের স্বাদ

অধিকার
বীজের বিধ্বস্ত মুখ খুলে দিতে ক্রমশ আকাশে
অধিকার…………অধিকার।

বোঝাপড়া এখুনি দরকার

তুলসী মুখোপাধ্যায়

বস্তুত পৃথিবীর সঙ্গে আমার যাহোক একটা
বোঝাপড়া হওয়া এখুনি দরকার
জীবন কি একটা সখের ভ্রমণ—যখন খুশি ফিরতি ট্রেনে চেপে
কিংবা খেয়ালমাফিক নেমে পড়লুম পরের স্টেশনে
জীবন অর্থে আমি বুঝেছি জীবনেরই ক্রম উন্মোচন
জীবন অর্থে আমি বুঝেছি ভালোবাসার অবাধ বিস্তার
অতএব পুরো পরমায়ু থেকে যাবো বলেই পৃথিবীতে আমি এসেছি
অথচ চোরাবালুতে তো আর ঘর-সংসার সাজানো যায় না—
মরীচিকার কাছে আবার জলভিক্ষা।

বস্তুত পৃথিবীর সঙ্গে আমার যাহোক একটা
বোঝাপড়া হওয়া এখুনি দরকার।

ইদানীং শস্যের ক্ষেতে এলেই দেখতে পাই দুর্ভিক্ষের ছায়া
দমকল ভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই
শুনতে পাই 'আগুন আগুন'
পুলিশের পাগড়ী দেখলেই বুঝতে পারি চোরডাকাতের বিজ্ঞাপন
শান্তি সম্মেলনে গেলে মনে হয়
তৈরী হচ্ছে আর একটা মহাযুদ্ধের খসড়া
চব্বিশঘন্টা এরকম মৃত্যু-সংবাদে
যেকোনো মুর্তে আমি ক্ষেপে যেতে পারি
যে কোনো মুহূর্তে আমিও মৃত্যুর খোরাক হতে পারি
অথচ পুরো পরমায়ু থেকে যাবো বলেই আমি পৃথিবীতে এসেছি।

বস্তুত পৃথিবীর সঙ্গে আমার যা হোক একটা
বোঝাপড়া হওয়া এখুনি দরকার।

চতুর্দিকে বিস্ফোরণে

অনন্ত দাশ

প্রখর উত্তাপে যেন আদগ্ধ শরীর
বনস্থলী পুড়ে যাচ্ছে, উল্কাপিণ্ডে ভরে যায় ঘর
কোমল কুঁড়ির গর্ভে জীবন-যন্ত্রণা

এক একটি ঋতু-এলে
হাতের তালুতে নৌকা দুলে যায়,
নিঃসঙ্গ হৃদয় ঘিরে
হাড়গিলে অন্ধকার, হা হা শূন্য বাতাসের খাঁড়ি
বিশাল ব্যাদিত মুখে ডুবে যাচ্ছে অনন্ত সময়

অসংখ্য নদীর চরে মুছে যায় অশ্রুরেখা
জন্ম ও জলের বৃত্তে ছয়ঋতু ছায়া ফেলে
দিগন্তের বাঁকাপথে ধাবমান দ্রুত অশ্ব
জটিল ধাঁধাঁর চোখে চেয়ে আছে কৈশোর-আকাশ

দুঃশাসনী-ঝড়ে পথভ্রষ্ট পারাবতগুলি
বহুদূরে উড়ে যায়, বুকের গভীরে
উদ্ভিদের মাথাচাড়া—
পাড় ভেঙে যেন এক স্রোতের জাঙাল ছুটে আসে
চতুর্দিক বিস্ফোরণে
পেশল মাটিতে জাগে জীবন-যন্ত্রণা।

বাস্তবের মোহানার দিকে

শুভাশিস্ গোস্বামী

তত্ত্বের বাঁধ ভেঙে দাও।
বাঁধভাঙা প্লাবনে খরকুটো আবর্জনা যা আসে আসুক।
যা ভাসে ভাসুক কল্পনার পর্দায়—
সত্য-মিথ্যার কোন ছবি।

আকাশ তোলপাড় ক'রে বজ্রনির্ঘোষ,
তবুও বুকের মধ্যে গুরুগুরু বাজে না কখনও।
এ কেমন নির্বেদ!
এ কেমন তাম্বুলচর্বিত দিবানিদ্রার বিলাস।

তথ্যের নিবিড় আশ্লেষে,
মুখরুচি বাক্যের চর্বিত চর্বণে
আর নয় বেলোয়ারি বৈঠকি আলাপ।

স্রোতস্বিনী হতে হবে আমাদের মন।
তত্ত্বের উৎস থেকে ছুটে চলে যেতে হবে
বাস্তবের মোহানার দিকে।

অন্য নাম

পরেশ মণ্ডল

হাত দিয়ে আর ছুঁই না কিছু
মন দিয়ে ছুঁই মনের অন্তরাল
চমকে গেলে দিগন্তটা।
বুক পেতে নিই সমস্ত জঞ্জাল।

ত্রিভুজ আঁকা পথের ওপর অশ্বখুরের ধ্বনি
ধ্বনির মধ্যে প্রথম নামান্তর
দিগ্বিজয়ী আগন্তুকের
চোখের তারায় রহস্যময় স্বর।

ইচ্ছার টানে

তরুণ সান্যাল

আমারি ইচ্ছার টানে আসে যায় দিন ও যন্ত্রণা
      আমারি ইচ্ছায় অন্ধকার
সারাবেলা পথান্তর সারারাত শিকল ঝঞ্চনা
      আউষ্ণীষ সূর্যে দীপাধার

ভালোবাসা, কার হাতে রেখে যাব, কে-সে দুঃখ সুখে
      সময়-বা দুঃসময়ে প্রিয়
চলে যাই ছেঁড়া মুখ ক্রুদ্ধ দিনরাত্রির চাবুকে
      কাফন কাঁধে, না, উত্তরীয়

এ দেশ সে দেশে ঢের পালাবদলের জয়-জয়
      ঝুঁকে কাঁটা তুলছি ছেঁড়া পায়ে
ধুলাঝড়ে, দাঁতে বালি, হে সময় ওহে দুঃসময়
      তুমি নৌকা তুমি মাঝি নায়ে

এমন বুকের মধ্যে ছিল মণিমাণিক্যের জ্বালা
      কই আমি কখনো জানিনি
অথচ আমারি হাতে বিষফুল গাঁথে জয়মালা
      দুঃখে সুখী, 'ঋণমুক্ত, ঋণী'॥

ভারতের মুক্তি আন্দোলন ও মুসলিম সমাজ

শান্তিময় রায়

গত ১৩৭৬ সালের ভাদ্র (শারদীয়) সংখ্যা 'পরিচয়ে' 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। গত শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বিশ শতকের তৃতীয়দশক পর্যন্ত, ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে, বিশেষভাবে সশস্ত্র লড়াইয়ে ভারতের মুসলিম সমাজের অবদান নিয়ে ঐ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনামূলক রচনাটি লেখা হয়েছিল। কিন্তু রচনাটির শত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সহৃদয় পাঠক মহল যে ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন, তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আর, তাঁদেরই প্রেরণায়, এই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গণআন্দোলনের পর্যায়ে, মুসলিম সমাজের অবদান এ রচনাটির আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গত বলে নিতে চাই, মুসলিম ধর্মাবলম্বী যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, প্রাণপাত করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম সমাজের একজন বলে নিজেদের মনে করে, আন্দোলনের কোন মুসলিম সম্প্রদায়ের বিপ্লবী অবদান আছে ভেবে নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। ব্যাপক গণআন্দোলনের মধ্যে ধর্মনির্বিশেষে তাঁরা যোগদান করে ভারত-বাসী এবং নিপীড়িত দুনিয়ার অন্যতম মানুষ হিসাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণ করেছিলেন। তাঁরা ছাড়াও, মুসলিম জাহান, বা মুসলিম সমাজের মানুষ বলে নিজেকে মনে করে, অনেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী গণ-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, হঠাৎ মুসলিমদের আলাদা করে ধরে নিয়ে কেন এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনা হচ্ছে! আমার এ বিষয়ে বিনীত প্রতিবেদন মাত্র দুটি। প্রথমত এক ধরণের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু কিছু ঐতিহাসিক, বা ইতিহাস লেখক ভাবতে ও দেখাতে অভ্যস্ত যে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলিমদের কোনও সদর্থক ভূমিকাই ছিলনা। বরং তাঁরা নাকি মুক্তি আন্দোলনের পরিপন্থী ছিলেন। 'হিন্দু' ইতিহাসকারদের এমন উক্তি সমালোচনা করা তো দূরের কথা, বামপন্থী ও সমাজবাদী বলে কথিত বহু নেতা ও রাজনৈতিক কর্মীর মধ্যেও এমন মনোভাব বিদ্যমান। এমন মনোভাব এক

ধরণের মনগড়া বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁরা গড়ে তোলেন, এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলিমদের 'হিন্দু' ইতিহাস লেখকদের প্রচারিত তথাকথিত নঞর্থক ভূমিকাকে তাঁরাও অনিবার্য বলে মনে করে নিয়ে বস্তুবাদী ইতিহাস চর্চার তৃষ্ণা মেটান। অন্যদিকে, মুসলিম ইতিহাসকারদের মধ্যেও এক ধরনের মানুষ আছেন, যাঁরা জেগে ঘুমোন. অথবা সজ্ঞানে ইতিহাসকে বিকৃত করে দেখতে ও দেখাতে চান। এই সব সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-প্রসূত রচনার ফলে, ১৯৪৭ সালের পর মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে—কি ভারত কি পাকিস্তানে—যে তরুণ বড় হয়ে উঠল, তার কাছে মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী মুসলিম সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কোন পরিচয়ই জানা হলো না। ভারতে মুসলিমতরুণ জানলো তার সমাজের লোকজন ইংরেজদের তলপিবাহক ছিল। পাকিস্তানে জানলো, সাম্প্রদায়িক আন্দোলনভিত্তিক গদী দখলের জন্য সংগ্রামই মুসলিমদের সাচ্চা 'কওমী' লড়াই। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকদের একপেশে বিচার বিশ্লেষণের ফলেই এই ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। আর এই ভ্রান্ত ধারণা কি ভাবে ভারতীয়তা বোধে জনচিত্তে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তার সারবত্তা আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন গবেষকরা উপলব্ধি করতে সুরু করেছেন।

ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনে যে কয়েকটি ধারা মিলিত হয়েছিল—তার পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন আছে : ক) সশস্ত্র সংগ্রামের ওয়াহাবী ও অগ্নিযুগের বিপ্লববাদ, খ) সাংবিধানিক জাতীয় আন্দোলন (১৮৮৫-১৯১৮), গ) জাতীয় গণআন্দোলন (১৯২১-১৯৪২), ঘ) বিপ্লবী গণ আন্দোলন, (১৯১৮-৪৭)। আমার প্রথম প্রবন্ধে ওয়াহাবী ও অগ্নিযুগের বিপ্লববাদী সংগ্রামের—মুসলিম সমাজের ভূমিকার আলোচনা করেছি। সাংবিধানিক জাতীয় আন্দোলনের যুগ আরম্ভ হলো কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সাল থেকে। ১৯২১ সালের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যে আন্দোলনের পদ্ধতি (form) ছিল প্রধানত আবেদন-নিবেদন (১)। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কংগ্রেস সংগঠনের সীমানার বাইরে—জনসাধারন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই সংগ্রামের ধারক ছিল বিপ্লববাদীরা। অবশ্য এই সংগ্রাম থেকে কংগ্রেস শক্তি সঞ্চয় করেছিল। এই সাংবিধানিক জাতীয় আন্দোলনের যুগের মুসলিম সমাজের উদীয়মান বুদ্ধিজীবীরাও জাতীয় আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন—রাজনারায়ন বসুর হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও সৈয়দ আহমেদের, মুসলিম জাতীয়তাবাদ সত্ত্বেও (২)। বদরুদ্দিন তায়েবজি

ও রহিমতুল্লাসিয়ানীর মতো মুসলিম সমাজপতি কংগ্রেসের সেবার্থে অগ্রণী হন এবং সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। মৌলানা সিবলি নোয়ানির মতো বহু মুসলিম ধর্মবেত্তা ও মুসলিম ধর্মগুরু কংগ্রেসকে সমর্থন করতে কুণ্ঠিত হননি। কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতি তায়েবজি বোম্বাই প্রদেশেও আঞ্জুমান-ই ইসলামের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। "তিনি তাঁহার ভাষণে ভারতের কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের পক্ষে জাতির আশার প্রদীপ এই জাতীয় মহাসভা হইতে দূরে থাকা যে অযৌক্তিক তাহা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া প্রদর্শন করেন"। রক্ষণশীল ও ইংরেজ প্রেমিক মুসলিমগণ কংগ্রেসে যোগদানের বিপক্ষে যে সতেরো দফা যুক্তি খাড়া করেন, কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি রূপে রহিমতুল্লাসিয়ানী তার প্রত্যেকটি যোগ্যতার সঙ্গে খণ্ডন করেন (৩)। এ ছাড়া মীর হুমায়ুন কারমারের মতো ধনী মুসলিম মাদ্রাজ অধিবেশনের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। বোম্বাই এর আলি মহম্মদ ভীমজির ন্যায় প্রভাবশালী মুসলমানব্যবসায়ী গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আল্লামা সিবলি নোয়ানি ব্যতীত মৌলানা রসিদ আহ্‌মদ গঙ্গোই, মৌলানা লুৎফুল্লা, মোল্লা মহম্মদ সুরাজের ন্যায় প্রসিদ্ধ ধর্মবেত্তাগণও জাতীয় কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেস পরিচালিত সাংবিধানিক জাতীয় আন্দোলনের যুগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের আকার ধারণ করে। মুসলিম জনসাধারণকে হিন্দুরাষ্ট্রনায়কদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার ঢাকার নবাব সলিমুল্লার শরণাপন্ন হন। তাঁর প্ররোচনায় ও 'প্রচার ভ্রমণে'—পূর্ববঙ্গে (কুমিল্লা) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুই একটি অপ্রীতিকর ঘটনা সত্ত্বেও বাঙলার মুসলিম নায়কদের অনেকেই এই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে ঢাকার নবাববাড়ির অপর শরিক খাজা আতিকুল্লার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন— I may tell you at once that it is incorrect that the Mussalmans of East Bengal are in favour of partition of Bengal. Real fact is that it is only a few leading Mahamedans who for their own purpose support the measure" সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নবাব

আমীর হোসেনও সরকারের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার যৌক্তিকতা অস্বীকার করে বিবৃতি দেন।

১৯০৫, ৭ই আগস্ট তারিখে কলকাতা টাউন হলে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে যে বিরাট সভার আয়োজন করা হয়—সেখানে মূল প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন মৌলবী হাসিবুদ্দিন আহ্‌মদ। "মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক সুবক্তা পার্কে পার্কে বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণকে স্বদেশী কার্যে যোগদান করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে থাকেন। এদের মধ্যে ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল, মৌলবী আবুল কাসেম, আবুল হোসেন, দেদার বক্স, দীন মহম্মদ, ডাক্তার গফুর, লিয়াকৎ হোসেন, ইসমাইল সিরাজী, আবদুল হালিম গজনবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য (৫)"।

ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল—বরিশাল রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের সভাপতিত্ব করার সময়—প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক উৎপীড়নের সম্মুখীন হন। মৌলবী ইসমাইল সিরাজী অগ্নিস্রাবী ভাষণে সারাদেশ আলোড়িত করেন (৬)। "অ্যান্টিপার্টিশন ফণ্ড" নামক এক ধন ভাণ্ডার স্থাপন করা হলে—মুসলিম নেতাগণ এই আবেদনে স্বাক্ষর করেন।

"১৯০৫ সালের ৬ই আগস্টের সভার পর বাঙলার মফঃস্বলে যখন ছাত্র জাগরণ দেখা দেয়—তখন আবদুল আহ্‌ম্মদ ইউসুফ জাইএর নেতৃত্বে বহরমপুরে এক উদ্দীপনাময় ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ হয়—।" (৭)

আমার পূর্বেকার প্রবন্ধে ১৯০৭ সালের পর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মৌলবী আবুল কালাম আজাদের আবির্ভাবের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে দিয়েছিলাম। ১৯১৮ সালের যুদ্ধান্ত ও বলশেভিক বিপ্লব ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তাৎপর্যময় সন্ধিক্ষণ। ১৯২১ সালের গান্ধীজী ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে মুক্তি আন্দোলনে এক প্লাবন দেখা দিয়েছিল। মুসলিম জনসমাজের এক বিশিষ্ট অংশ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে দৈহিক নির্যাতন ও কারাবরণ করেন। বাঙলাদেশের মুসলিম জননায়কদের মধ্যে যাঁরা সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মৌলানা আক্রাম খাঁ ও পাবনার ইসমাইল সিরাজী (৮), মৈমনসিংহের গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ, মৌলভী বোকাই নগরী, মৌলভী ফুলপুরী, জননায়ক চাঁদমিঞা, কুমিল্লার আসরাফউদ্দিন আহম্মদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা গ্রহণ করেন(৯)। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার বিপ্লববাদী আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও এই সময় কয়েকজন মুসলিম জননায়কের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, যেমন—ডাঃ এম-এ আন্সারী, ডাঃ সফিউদ্দিন কিচলু, ডাঃ আসফ আলী, হজরৎ মোহানী, লাহোরের ডাঃ আলম, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের—খাঁন আবদুল গফুর খাঁন প্রভৃতি (১০)। "কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ও ছিলেন। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা পণ্ডিতদিগের অন্যতম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং দিল্লীর ডাঃ আন্সারী ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে যে নব চেতনার উন্মেষ হইয়াছিল, ইহাদের সকলেই ছিলেন তার প্রতিভূ (১১)।"

"১৯২১ সালে জনগণের নিকট আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের (মৌলানা মহম্মদ ও মৌলানা সৌকৎ আলী) ভূমিকা ছিল অনন্য। ইহা সম্ভব হইয়াছিল কতকটা তাঁহাদের নিজেদের কার্য্যাবলী ও মহাযুদ্ধের সময় নির্য্যাতন ভোগের জন্য—কতকটা মুসলমানদিগের মধ্যে নব জাগরণের জন্য—তবে বেশীর ভাগই তাঁহাদের পক্ষে মহাত্মার প্রচারের ফলে। তাঁহাদের মহাত্মার দক্ষিণ ও বাম হস্তরূপে মনে করা হইত। তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া মহাত্মা সারাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং ইহা স্পষ্ট স্মরণ আছে যে, তখনকার দিনে যখনই 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' এরূপ জনপ্রিয় ধ্বনি শুনা যাইত তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে এই ধ্বনিও শুনা গিয়াছে—'আলি ভাই-ও কি জয়'।"(১২)

যুক্ত প্রদেশের প্রভাবশালী নেতা মৌলানা হজরৎ মোহানী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন — "আমেদাবাদ কংগ্রেসে কৌতূহলপ্রদ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল—হজরৎ মোহানী এই মর্মে—একটি প্রস্তাব আনিলেন যে প্রজাতন্ত্র (ভারত যুক্তরাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া গঠনতন্ত্রের নির্দিষ্ট হওয়া উচিৎ। তাঁহার বাগ্মিতা শ্রোতাদের এরূপ উদ্দীপ্ত করিয়াছিল এবং শ্রোতাদের পক্ষ হইতে যে রকম সাড়া পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে মনে হইয়াছিল যে, বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবে (১৩)।" কিন্তু মহাত্মার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিরোধিতায় প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া যায়"।

১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বার বার হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯২৫ সালে জুনমাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে এই ঐক্য প্রচেষ্টা নিদারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সময় সাইমন কমি-

শন বয়কটের সারা ভারত ব্যাপী আন্দোলনে সর্বপ্রথম কংগ্রেসের ও শ্রমিক ছাত্র নেতাদের সঙ্গে মুসলীম লীগও সমর্থন জানায়। ১৯২৭ সালে কলকাতায় ঐক্য সম্মেলনে মহম্মদ আলি জিন্নাহর ১৪ দফার মূল দাবিগুলি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত (১৭) হলে জাতীয় বিপ্লব ১৯৪৭ সালে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় ভারত উপমহাদেশের এই জটিল সমস্যা হিসেবে সৃষ্টি হতো না।

এতদসত্ত্বেও পাঞ্জাবের জননায়ক ডাঃ আলম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে পরিক্রমা আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে মৈমনসিংহ সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিরূপে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা বর্তমান লেখকের স্মৃতিপটে জাগরিত আছে : "We must fight British Imperialism with all our might but before that we must fight communalism everywhere and always." এই তেজস্বী মহাপ্রাণ পাঞ্জাবী দেশপ্রেমিক সেদিন বাঙলার যুবচিত্তে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেন।

১৯২৮ সালের নেহেরু রিপোর্ট মুসলীম লীগ নেতাদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। এই সময় জাতীয় নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহের অভাবেই জাতীয় ঐক্য সম্ভাবনা দূরে চলে যায়। ১৯৩০ সালে এপ্রিল মাসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আবার আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলনে খিলাফৎ কর্মীরা অনেকেই যোগদানে বিরত থাকেন, আবার অনেকে বিপুল সংখ্যায় যোগদানও করেন। মুসলীম লীগ তখনো তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। কোন পরিপূর্ণ সমাজবিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গী এই আন্দোলনে না থাকায় এক বৎসরের মধ্যেই এই সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে পড়ে। একই সময়ে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে (কুমিল্লা, মৈমনসিংহ, ছাপড়া, বালিয়া, আজমগড়) সামন্তবিরোধী আন্দোলন দানাবেধে ওঠে। বোম্বাই, শোলাপুর, মাদ্রাজ, কলকাতার শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘট ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে।

ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ১৯৩২ সালে এক নূতন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার (Communal award) বিষাক্ত তীর ছুঁড়লেন। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দল ও নেতৃবৃন্দ এইবার জাতিকে আরো অনৈক্যের দিকে ঠেলে দিলেন। কংগ্রেস নেতাদের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ডাঃ আলম ও ডাঃ আনসারীর মতো প্রথম সারির নেতারাও নিষ্ক্রিয়

হয়ে পড়লেন। দেশে তখন এক নিদারুণ হতাশা। জাতীয় কংগ্রেসের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে গণ-আন্দোলনকে পরিচালিত করার যুগ শেষ হলো (১৫)।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরেই ১৯৩২ সালে গান্ধীজী কারারুদ্ধ হন। আইন অমান্য আন্দোলনের এই খানেই অকালমৃত্যু হয়। বাঙলাদেশে তখন চরম দমননীতি; বিপ্লববাদীরা সব কারাগারে ও দ্বীপান্তরে। ভারতের অন্যান্য জেলেও রাজনৈতিক বন্দীরা কারা যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। জাতির এই নিদারুণ দুঃসময়েও অনেক মুসলিম জননায়ক কংগ্রেসের সঙ্গে বা বাইরে থেকে জাতীয় সংগ্রামের অংশীদার হন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'খোদাই খিদমতগার' বা লাল কোর্তা আন্দোলনের প্রধান নায়ক খাঁন আবদুল গফুর খাঁন ও তাঁর ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেব সমস্ত পাঠান জাতিকে জাতীয় সংগ্রামের দিকে নিয়ে আসেন। একদিকে দুর্ধর্ষ আফ্রিদিদের রোমাঞ্চর ব্রিটিশ বিরোধী অভিযান দিনের পর দিন ব্রিটিশ সেনা বাহিনীকে বারবার পর্যুদস্ত করছিল অন্যদিকে ছিল অসম সাহসী শান্ত ধীর স্থির দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এই লালকোর্তাধারী স্বাধীনতাকামী পাঠান সংগ্রামীরা। মুসলীম লীগের প্রভাব এখানে ছিল নগণ্য। সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননায়ক গফুর খাঁন ১৯১৯ সালে রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন সংগঠিত করেন এবং এই কারণে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। মুক্তি লাভের পর তিনি পেশোয়ারে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন যার শাখা সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই কাজের জন্য সরকার তাঁকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কারামুক্তির পর তিনি পূর্ণোদ্যমে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং ১৯২৯ সালে বিখ্যাত খোদাই খিদমৎগার বা লালকোর্তা দল সংগঠিত করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করেন।

এই সম্পর্কে পরলোকগত বিখ্যাত মুসলিম জননেতা আবুল হায়াৎ যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। "It was a wonderful achievement of Khan Abdul Ghaffar Khan and his party to have converted the temperamentally violent Pathans into a non-violent army of freedom fighters. The tremendous sacrifices made by the members of the party set a glorious example to the people in general and to the Mussalmans in particular. Thousands and

thousands of Muslims courted arrest during the Non-co-operation movement under the leadership of the Khudai Khidmatgars in collaboration with the Jamiat-i-ulema, Majlisi Ahrar National Muslim Party and the Shia Conference. These filled the quota of the Mussalmans in the total of jail going population of the country in the cause of Indian freedom."(১৭)

১৯১৯ সালে মুসলিম রাজনীতিতে মোড় ঘুরলো। এই সময়ে **জামিয়াৎ-উলেমা** নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯২০ সালে এক সম্মিলনে সদ্য কারামুক্ত শেখ-উল-হিন্দ-দেওবন্দের মৌলানা মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণের এক প্রস্তাব পাশ হয়। 'With a view to non-co-operating with the Government the Jamiat-i-ulema calls upon the Muslims to give up titles conferred by the Government, hony. post office memberships of the legislatives as well as administrative and Police services under the Government. It also calls upon the Mussalmans to boycott British goods as well as education imparted in schools and colleges under the supervision of the Government. In this connection a Fatwa delineating the instructions contained in the resolution over the signature of 500 well known ulema of the time was issued. The Fatwa was, forthwith confiscated by the Government. As a protest against the confiscation the Jamiat ulema started satyagraha.(১৮)

জামিয়াতের অন্ত একজন প্রধাননেতা মৌলানা হুসেন আমেদ মদনী এই সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় তাঁদের দলের নীতি ঘোষণা করেন।

"We have made it clear to the Congress high command that we have only one demand ; viz after India becomes free Mussalmans of India should be given free hand in the management of their own religious affairs. In the meantime we would ungrudgingly and wholeheartedly go on supporting the Congress in its movement for the freedom of the country.''

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জামিয়াত এই নীতি অনুযায়ী হাজার হাজার সভ্যকে সংগ্রামে প্রেরণ করেন।

মজলিসি আরহত নামে একটি মুসলিম সংগঠন ১৯২৯ সালে পাঞ্জাবে স্থাপিত হয়। চৌধুরী আফজল হক ছিলেন এঁদের নেতা। এঁরা মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। **"We want such freedom in the country in which the poor people may live in peace and contentment"**। এদের আর একজন নেতা মৌলানা হাবিবর রহমান লুধিয়ানী বলেন "ধনিকদের সরকারের পরিবর্তে আমরা সর্বহারাদের সরকার চাই"। সাহেবজাদা ফজলুল হোসেন মুসলিমদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের উদাত্ত আহ্বান জানান। ১৯৪০ সালে দিল্লীতে মুসলিমদের প্রাদেশিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় (১৯)—

"This conference of the Majlisi Arhat reiterates its firm resolve that the chief aim and object of the Majlis will be the attainment of full and complete independence of India which will cure the ills what the people are suffering from and will all help protect the rights and interests of the Mussalmans of India." নবাব আলি খান-এর প্রতিষ্ঠাতা। সৈয়দ ওয়াহিব হোসেন-এর নেতৃত্বে এরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন।

লখনৌতে ১৯২৯ সালে নিখিলভারত শিয়া কনফারেন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমদের সংগঠনগুলির মধ্যে **জাতীয়তাবাদী মুসলিম পার্টি'র** নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ সালে জুলাই মাসে এলাহাবাদে এই পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "মুসলিমদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরিত করা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা, সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবের উর্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে যোগদান করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতির শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি সাধন করা।"

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই দলের সভাপতি; ডাঃ এম-এ আনসারী কোষাধ্যক্ষ ও তাসাদ্দুক আহাম্মদ খাঁন সেরওয়ানী সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই পার্টির সভ্যদের মধ্যে প্রায় বার হাজার কর্মী কারাবরণ করে। (২[illegible]) [illegible] মলীগের প্রবল প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও এই দল, বাঙলা বিহার [illegible] উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বহু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের [illegible]

বাঙলাদেশে 'কৃষক প্রজা'পার্টি' কর্মীরা প্রধানত জাতীয়তাবাদী মুসলিম পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো। এদের মধ্যে ছিলেন বাঙলার জনপ্রিয় জননেতা ফজলুল হক, ফরিদপুরের তমিজউদ্দিন খাঁন, লালমিঞা—ইনি ১৯২১ ও ১৯৩০ সালে অমান্য আন্দোলনে বারবার কারাবরণ করেন; বর্ধমানের মঃ আবুল কাশিম, জাহেদালী সাহেব ও শ্রদ্ধেয় জননেতা আবুল হায়াৎ বারবার জাতীয় সংগ্রামে কারানির্যাতন ভোগ করেছেন। আবুল হায়াৎ সারা ভারত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মৈমনসিংহের মৌলানা ভাসান আলি, মৌলভী তৈয়ব আলী, হামিদ মিঞা, গিয়াসুদ্দিন পাঠান, যশোহরের বাগ্মীশ্রেষ্ঠ জালালুদ্দিনহামে মী, ও পাবনার আসাদুল্লা সিরাজী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, আবুহোসেন সরকার, আবুল মনসুর আহমেদ, রেজাউল করিম, আবদুল জিলানী, আবদুল ওদুদ, বাঙলার সংগ্রামী জননেতাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। পাটনার বিখ্যাত ব্যারিস্টার মোজহারল হক, বিহারের জনপ্রিয় নেতা সৈয়দ মামুদ, ও সুফী দাউদী, যুক্তপ্রদেশের আনসার হারবানী ও বিখ্যাত নেতা রফি আহমেদ কিদোয়াই, মিঞা ইব্রাহিম, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মজিব, আসামের ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ প্রভৃতি মুসলিম সমাজের চিন্তাশীল জননেতা ও কর্মীরা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একাংশের অবজ্ঞা ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রতি আপোষমূলক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও বার বার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

১৯৩৮এর দিকে উত্তর ভারতে আল্লামা মাশরিকীর নেতৃত্বে থাকসার দল গঠিত হয়েছিল। এই দলের ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। সম্প্রতি অধ্যাপক অমলেন্দু দে এ সম্পর্কে এক তথ্য সমন্বিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। কলকাতার ধর্মতলার রাস্তায় রসিদালী দিবসের বিক্ষোভে আবদুস সালাম নামে এক যুবক, লেখকের সম্মুখেই নির্ভীক ভাবে মৃত্যুবরণ করে

১৯৩৫ সালে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে তিনটি লক্ষণীয় ঘটনার সূত্রপাত হয়। প্রথমতঃ বামপন্থী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী গণআন্দোলন স্বাধীনভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি সমূহের মিলিত সংগ্রামী মোর্চায় পরিণত করার প্রয়াস দেখা দেয়। তৃতীয়ত, মুসলিম সাম্প্রাদায়িকতাবাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

১৯১৮ সালের বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নূতন বাতাস সঞ্চারিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়। ১৯২১ সালের আহমেদাবাদ কংগ্রেসে কমিউনিস্ট

ইস্তাহারে নূতন পথের ইঙ্গিত জানানো হয়। ১৯২১ সালে গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে একদিকে গণ আন্দোলনের সিংহদ্বার খুলে যায়। চৌড়ি চৌড়ায় অপরদিকে গণবিক্ষোভে মর্মাহত হয়ে গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় বিপ্লবী সংগ্রামীরা গণ বিপ্লবের পথে পা বাড়ালেন। পথ অস্পষ্ট বিপদ সঙ্কুল ও দুর্গম হলেও ভারতের মুষ্টিমেয় মুক্তিকামী বিপ্লবী সেদিন শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে লেগে যান। ১৯২৩ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গোপনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৫ সালে স্থাপিত হয় কৃষক ও শ্রমিক পার্টি। বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলনে সব চেয়ে বড় দুইটি সমস্যা এই গণবিপ্লবীরা নূতনভাবে সমাধানের পথ নির্দেশ দিলেন। প্রথমত, পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জন্য জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। সাম্প্রদায়িকতার বিষ এর মধ্যেই জাতীয় অর্ধাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে, একমাত্র ধর্ম ও সম্প্রদায় বিমুক্ত শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ব্যাপক শক্তিশালী জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম। এর ক্ষীণ ধারা ১৯২৩ সাল থেকে সঞ্চারিত হয়ে ১৯৩৫ সালের পর এক খরস্রোতা দুর্জয় প্রবাহের মত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নবীন জোয়ার বহন করে নিয়ে আসে। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে পণ্ডিত জহরলাল জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ফ্যাসীবাদের বিপদের কথা বলেন। কংগ্রেসের মধ্যে তিনি সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণবিপ্লবে বিশ্বাসী সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের এবং সুভাষ চন্দ্রের মত জাতীয় বিপ্লবী শক্তি এবং সংগ্রামী মুসলিম দলগুলিকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানালেন। ১৯৩৭ সালে হরিপুরা ও ১৯৩৮ সালে ত্রিপুরী, ১৯৩৯ সালে রামগড়কংগ্রেস এ অধ্যায়ের শেষ। এরপর থেকে জাতীয় বিপ্লববাদী সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের বাইরে ফরোয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন ও ১৯৪০ সালে দেশ থেকে অন্তর্ধানের পর বিদেশে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রেখে গেলেন। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অনেক মুসলীম দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মৌলভী আসরাফউদ্দিন আহমেদের নাম অতি সহজেই মনে আসে।

তাছাড়া সীমান্তপ্রদেশের আকবর শাহ তাঁর দুর্গম পথের সহযাত্রী হবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন (২৩)। আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যেও তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সহকর্মীদের মধ্যে মেজর জেনারেল শাহানাওয়াজ ও কর্ণেল হবিবুর রহমান ছিলেন।

কর্ণেল হবিবুর রহমান তাঁর সঙ্গেই শহীদ হবার সম্মান লাভ করেছেন। এ ছাড়া ছিলেন কর্ণেল রসিদ আলি, কর্ণেল এস-এম-ইশাক। অন্যান্য মুসলিম শহীদদের মধ্যে ছিলেন লেঃ আসরফি মণ্ডল, শ্রীআবু হোসেন, শ্রীহাসিম, শ্রীইয়ুফ, লেঃ এস-এম-আলি, আবদুল আজিজ, আমির হায়াৎ, আবদুর রেজাক, আলি আকবর, আলি মোহম্মদ, আলি শান, আলতাপ হোসেন, আতা মোহম্মদ, আহম্মদ খান, এ বি-মির্জা আয়ুব খাঁন, এস আখতার আলি, আমাদউল্লা, আবদুর রহমান খাঁন প্রভৃতি ১০০ জন মুসলিম বীর শহীদ হন।(২৫)

বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র একদিক থেকে অনন্য। নিজে একান্ত ধর্মপ্রবণ হয়েও ধর্মকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিঘ্ন হতে কখনো দেন নি।(২৫) আজাদ হিন্দ মুক্তি ফৌজের ব্যবস্থাপনার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার মহান ঐতিহ্য তিনি রেখে গিয়েছেন। মুসলিম সমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্য সম্পর্কে যে তিনি কতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন নীচের উদ্ধৃতির মধ্যেই তার সাক্ষাৎ মিলবে।

"ব্রিটিশের অভিসন্ধি মূলক প্রচার এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে যে ভারতীয় মুসলমানেরা স্বাধীনতা আন্দোলনবিরোধী। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক মুসলমান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হইতেছেন আজাদ যিনি স্বয়ং একজন মুসলমান। ভারতীয় মুসলমানদের একটা বিরাট অংশই ব্রিটিশ বিদ্বেষী এবং ভারতের মুক্তিই তাহাদের কাম্য। মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সমর্থক কয়েকটি দল আছে, এই দলগুলি ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত সাম্প্রদায়িক দল কিন্তু এই দলগুলিকে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক বলিয়া গণনা করা চলিবেনা। ১৮৫৭ সালের মহান বিপ্লব জাতীয় ঐক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুসলমান বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ হইয়াছিল সকল. শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লোকই সে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। তখন হইতেই ভারতীয় মুসলমানগণও অন্যান্য ভারতবাসীর ন্যায় ভারত মাতৃকারই সন্তান এবং তাঁহাদের স্বার্থও অভিন্ন। বর্তমানে ভারতে মুসলমান সমস্যা ব্রিটিশের সৃষ্ট কৃত্রিম সমস্যা, আয়ার্ল্যাণ্ডের আলষ্টার সমস্যা ও প্যালেষ্টাইনের ইহুদী সমস্যার অনুরূপ। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে এই সমস্যাও অন্তর্হিত হইবে।"(২৬)

সর্বশেষে বিপ্লবী গণআন্দোলনকারীদের মধ্যে মুসলিম বিপ্লবীদের উল্লেখ করেই আমার এই নিবন্ধ শেষ করব। প্রথমেই বলেছি এই গণবিপ্লবীরা আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা সাম্প্রদায়িক চিন্তার উর্ধে। কোন সম্প্রদায় ভুক্ত

সংগ্রামী বিপ্লবী হিসেবে এঁদের উল্লেখ করে এদের আদর্শ নিষ্ঠার প্রতি অসম্মান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। নেহাতই শক্তিমান ও প্রভাবশালী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বাদী 'ইতিহাসে'র পণ্ডিত ব্যক্তিদের মুসলিম বিরোধিতা যে কত অসার ও মিথ্যা সেটা প্রমাণ করার জন্যই অসংখ্য বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামীদের মধ্যে কয়েকজনের কথা আমাকে উল্লেখ করতে হচ্ছে বলে আমি লজ্জিত। তবুও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই খুবই-সংক্ষিপ্ত উল্লেখেরও প্রয়োজন আছে। এই নিয়ে এক বিরাট গ্রন্থ হয়তো লেখা হবে কোন দিন।

বিশ শতকে যে সব মুসলিম বুদ্ধিজীবী গণবিপ্লবের ভাবধারায় শ্রমিক কৃষক যুবক ও ছাত্রদের সংগঠিত করতে চাইলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন মহাপ্রাণ মুসলিম যুবকের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন মোজাফফর আহমেদ ২৭), নজরুল ইসলাম, ওয়াহাবী বিদ্রোহী মৌলভী ফৈইজুদ্দিনের বংশধর আবদার রেজা খাঁন।

এদের সঙ্গে একে একে জড়ো হলেন কুতুবুদ্দীন আহমেদ, মহম্মদ আবুল হোসেন। মোজাফফার আহেমদের সঙ্গে আবদুল হালিম ২৮ বছর বয়সে যোগ দেন। তারপর হলো কৃষক শ্রমিক দল—। উত্তর প্রদেশে সত্যভকত ও সৌকৎ ওসমানী ছোট দল গঠন করলেন ; বম্বেতে শ্রীপাদ ডাঙ্গে ও মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার প্রায় একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সাম্যবাদী গোষ্ঠিগুলি গড়ে তোলেন। ১৯৩৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নূতন করে সংগঠিত হলো।—১৯৩৫ সালে পঞ্চম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মোর্চ্চা গঠনে—ব্যাপকতর সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রামে—গণবিপ্লবীদের আত্মনিয়োগ করতে বলা হয়। বলা বাহুল্য সাম্যবাদের প্রতি মুসলিমদের একটা স্বাভাবিক সহজাত সহানুভূতি বা ঝোঁক ছিল।

ত্রিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সারাভারত কৃষক সভা গঠিত হলো। বর্ধমানের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে যারা এই গণবিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা হচ্ছেন—টেমরিয়ার সম্ভ্রান্ত মোল্লা পরিবারের সৈয়দ শাহিদুল্লা ও আবুল মনসুর হাবিবুল্লা। এদের সঙ্গেই নাম করতে হয় প্রবীন নেতৃদ্বয় আবদুল্লা রসুল ও মহাপ্রাণ আবুল হায়াৎ। ১৯২২এ জাতীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এঁরা কৃষক আন্দোলন আসেন ও পরে ১৯৩৮ সালে এঁরা সারাভারত কৃষক আন্দোলনের প্রথম সারিতে এসে পড়েন। মোজাফর আহমেদ, আবদুর রেজাখাঁর ও আবদুল হালিমের এরা ছিলেন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। এর

কিছুদিন পরে এলেন সামশুল হুদা ও আবদুল মোমিন। এঁরা ১৯২৭ সালেও শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে কারা মুক্তির পর শ্রমিক আন্দোলনের এঁরা দুইজনই অন্যতম প্রধান সংগঠক হলেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত মুসলিম ছাত্র নেতা দিল্লীর কে আহমেদ ছিল বি-পি-এস এফ-এর সভাপতি, বিশ্বনাথ মুখার্জী তখন সম্পাদক। উত্তর প্রদেশে কয়েক-জন উজ্জ্বল বুদ্ধিজীবী বিলেত থেকে কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী শ্রমিক ও যুবসংগঠনে ও জাতীয় কংগ্রেসের কাজে লেগে গেলেন। এদের মধ্যে ছিলেন—ডাঃ কে আশ্রাফ, ডাঃ জেড আহমেদ, হাজরা বেগম, ডাঃ সাজ্জাদ জাহির (বন্নুভাই) পাঞ্জাবে এলেন মিঞাইফতিকার উদ্দীন। আলি আমেদ ও বোম্বাই-এর সমাজতান্ত্রিক নেতা ইউসুফ মেহের আলী এরা সবাই ছিলেন সে যুগের বিশিষ্ট যুবনেতা। সবাই বারবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।

উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ জননেতা ডাঃ মামুদ জাভর ছিলেন এক অসা-ধারণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। উত্তর প্রদেশে মুসলিম এ্যারিস্টোক্রেসির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা কমিউনিস্ট পার্টির মারফৎ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। পাটনার ছাত্র নেতাদের মধ্যে আলি আসরফ ও আলি আমজাদ অসাধারণ সংগঠক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দিল্লীর ছাত্র নেতা ছিল—মহম্মদ ফারুকি। কারা যন্ত্রণা এঁদের বিপ্লবী চেতনাকে দমন করতে পারেনি। হায়দারবাদে বিপ্লবী কবি মাখদুম মহীউদ্দীন অন্ধ্রের জাতীয় জীবনে বিপ্লবী নেতা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাঙলা দেশেও এই সময়ে আর একজন মুসলিম যুবকবি গোলাম কুদ্দুস ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাশ্মীরের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে ছিলেন মহম্মদ সাদিক আলি। আমীর হাইদার ১৯২৬ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ইন্টার-ন্যাশনালে যোগদান করার সম্মান লাভ করেন। ১৯৩২ সালে মাদ্রাজে ও পরে কারামুক্তির পর সারা ভারত কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন। জীবনের বহু বছর তাঁর নির্বাসন ও কারাগারে নিঃশেষ হয়েছে।

মুসলিম শ্রমিক ও কৃষক নেতাদের সংখ্যা অগণিত। এ প্রসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ইয়াকুব মোহম্মদের নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। তিনি অসাধারণ শ্রমিক সংগঠক ছিলেন। তাঁর অগ্রবর্তী হলেন মহম্মদ ইসমাইল ও মহম্মদ ফারুকী। মহম্মদ ইসমাইল ১৯৩৪ সালে শ্রমিক সংগঠকরূপে কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। মহম্মদ চতুরালি এঁদের পরে ১৯৩৯এ পার্টিতে আসেন। এঁদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বহুদিন শ্রমিক-দের মধ্যে সংগোপনে কাজ করতে হয়। কৃষক সংগঠকদের মধ্যে হাজি দানেশ ও মক্লেশ্বর রহমান ও সুজাত আলী মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। একজন উত্তরবঙ্গে ও অন্য দুই জন নোয়াখালী ও কুমিল্লাতে কৃষক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সৈয়দ ইলিয়াস জাতীয়তাবাদী মুসলিম পরিবার থেকে কমিউনিস্টদের প্রভাবে এসে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের নায়ক হয়ে পড়েন। রাজনীতিক কাজের জন্য বারবার তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।

এই সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনে যে সব অগণিত মুসলিম শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত নেতা আত্মদান করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করার কাজে গবেষকদের হাত দেওয়ার সময় এসেছে। স্থানাভাবে এখানে সামান্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি মহম্মদ জমীরুদ্দীন ১৯৩৮ সালে কুষ্টিয়া শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন। জমীরুদ্দিন গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দেন। কমরেড ইউসুফ ডকমজদুর নেতা ছিলেন। গোলাম শরীফ (১৯৪২) চট্টগ্রামে ডক শ্রমিক সংগঠক। কমরেড সামজুদ্দীন ত্রেকোনা গোপন পার্টি গড়ার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রমে যক্ষারোগেপ্রাণ দেন। কমিউনিষ্ট কর্মী মোলতাব আলি ও ওয়ালি নেওয়াজের সহকর্মী কমরেড আমিন। খড়গপুরের রেলশ্রমিকদের প্রিয় নেতা ছিলেন ; ১৯৪০ সালে কারারুদ্ধ হন ও ১৯৪২ সালের ২রা আগষ্ট খড়গপুরে যে বিরাট ফ্যাসিষ্ট বিরোধী জন সমাবেশ হয় তিনি তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কমরেড আহম্মদ বরিশালের মুলাদির জনপ্রিয় কিষাণ সংগঠক। কমরেড আলি মাহমুদ বীরভুমের মারগ্রামের কমিউনিস্ট ছাত্র নেতা ছিলেন। কমরেড আবদুল আজিজ মুন্সী ঢাকার প্রিয় কৃষক কর্মী ও কমিউনিস্ট পার্টি'র সভা—। ত্রিপুরার কমরেড আয়ুব আলি ; গাইবান্ধার কমরেড মরাদজুমান ; চুঁচুরার কমরেড গোলাম হোসেন (১৯৪৪) ; ত্রিপুরার মৌলভী ছিদ্দীক রহমান ; কিশোরগঞ্জের কমরেড সিরাজুল হক ; রাজশাহীর কমরেড নাদের হুসেন চৌধুরী (১৯৪৫) ; খুলনার কমরেড রজলেব সেখ, কোলকাতার মহম্মদ হারিস ও

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৪
কার্ত্তিক ১৩৭৬

সূচিপত্র

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৪
কার্তিক । ১৩৭৬

'চতুরঙ্গ'র নিমিত্ত ঃ
আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের সূচনা

কার্তিক লাহিড়ী

"১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে বা তার কাছাকাছি কোনোসময়ে মানবচরিত্র বদলে গেছে"—ভার্জিনিয়া উলফ-এর এ-উক্তি তর্কসাপেক্ষ, যেহেতু এমন দিনক্ষণ দেখে মানবচরিত্র বদলায় কিনা তা যে-কোনো তীক্ষ্ণধী সমালোচকের পক্ষে বলা দুঃসাধ্য ; বস্তুত সাহিত্যজগতে সেই সময় যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উক্তিটির উদ্দেশ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাকালে ও যুদ্ধ চলাকালে মার্সেল প্রুস্ত ('রিমেমব্রেন্স অব থিংস পাস্ট'-এর প্রথম দুইখণ্ড ১৯১৩ সালে প্রকাশিত), ডরোথি রিচার্ডসন ('পিলগ্রিমেজ'-এর প্রথম খণ্ড ১৯১৫ সালে প্রকাশিত), ও জেমস জয়স-এর ('এ পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ংম্যান' ১৯১৬ সালে প্রকাশিত) উপন্যাসে ফরাসী ও ইংরেজী উপন্যাসে আধুনিকতার সূত্রপাত। এটা আনন্দ ও বিস্ময়ের কথা যে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি প্রায় ঐ সময়ে রচিত (পুস্তকাকারে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত, 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩২১), এবং প্রকরণের ভিন্নতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার পথে এঁদের সহযাত্রী। চেতনাপ্রবাহ বা স্মৃতিচারণের অতিমন্থর বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি 'চতুরঙ্গ'-এ অনুসৃত নয়, অথচ ঘটনামূলক বা তথাকথিত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণমূলক উপন্যাসের ব্যবহৃত রীতির মানদণ্ডে উপন্যাসটি "সর্বাপেক্ষা আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত" ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা') রূপে বিবেচিত, এবং সেই সূত্র অনুযায়ী এ-শ্রেণীর "উপন্যাসের অসম্পূর্ণতা ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইহাদের শিথিলগ্রথিত আকস্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে প্রাচুর্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্থিবহুল জটিলতার মধ্যে দুই একটি রঙিন ও সূক্ষ্ম সূত্রকে পৃথক-করণের চেষ্টা খুব তীব্রভাবেই আমাদের চোখে পড়ে।" (ঐ, পৃঃ ১৪২)। চোখে পড়া স্বাভাবিক, কারণ 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাস নির্দিষ্টির

প্রাক্তন ধারণার অনুরূপ বা অনুবর্তী নয়। ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের আখ্যানের সুবলয়িত রূপ অথবা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের চরিত্র-বিকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষিত সমগ্রতা আলোচ্য উপন্যাসে অনুপস্থিত, এবং উভয় পদ্ধতির মিশ্রণজাত আপোষমূলক শরৎচন্দ্রীয় কৌশলের সন্ধান এ-ক্ষেত্রে হাস্যকর। তাই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন, যে-পদ্ধতি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে লক্ষণীয়। 'চতুরঙ্গ'র গল্পাংশ অতি সামান্য, শুধু কাহিনীতে উপন্যাসের মৌল সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়, সেজন্য কাহিনীর সারাংশ প্রস্তুত করা কৈশোরক প্রচেষ্টার সামিল। আবার চরিত্র-চিত্রই ধারাবাহিকতার পরিবর্তে উল্লম্ফনের দৃষ্টান্ত, যেজন্য চরিত্র-বিকাশের ন্যায় অনুসারে উপন্যাসটির সমগ্রতা বিচারে আকস্মিকতা অতর্কিততার সন্ধান পাওয়া সহজ। বস্তুত, উপন্যাসটির সংহতি একটি নকশার টানে, শ্রীবিলাসের কথায় "জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নকশা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফর্মাসের নয়—তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।" এই ভিতরে বাহিরে বেদনার জালে "রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি"র বিষয়টি উপন্যাসের মূল উপজীব্য এবং নকশাটি ভাব-বস্তুর টানেই রচিত। ভাববস্তুর বিবর্তন ও বিকাশের চিত্র ঔপন্যাসিকের অনন্ত লক্ষ ব'লে উপন্যস্ত নায়ক-নায়িকা মাঝারি গোছের ভদ্র নরনারী নয়, আত্ম-সচেতনতাও সেই সূত্রে আত্মসনাক্তকরণ ও সাযুজ্যলাভের আকুতিতে অগ্নিগর্ভ। শচীশ ও দামিনীর বর্ণনায় সে-ইঙ্গিত স্পষ্ট :

ক] "শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে, তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা, তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম ;…"

খ] "দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকিমিকি করিয়া উঠিতেছে।"

শচীশ আত্মসচেতন, কিন্তু অতি-আত্মমগ্নও বটে। শচীশের পুরনো বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার বা আত্মসনাক্তকরণের আকুতি সক্রিয়তার (অর্থাৎ বাস্তবের রূপময় পটে স্থাপিত ক'রে) মাধ্যমে রূপায়িত নয় ব'লে শচীশ প্রায়শ সময় নিষ্ক্রিয়রূপে প্রতিভাত। অথচ এই নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও তার সজাগ

নস্কতা অত্যন্ত স্পষ্ট। আশৈশব বুদ্ধিবাদী আবহাওয়ায় লালিতপালিত শচীশের রসসাগরে নিমজ্জন নিশ্চয়ই ভাবালুতার পরিচয়, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও তার সচেতনতা সম্মোহিত নয়, "জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়াছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ... জ্যাঠামশায় মৃত্যুর পর তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে,...এ-দুটো ব্যাপারই সেই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়ের কাণ্ড, এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।" দামিনীও আত্মসচেতন, কিন্তু সে সক্রিয়, অন্তত রবীন্দ্রনাথ দামিনী চরিত্রকে নানা ঘটনাময় পটে স্থাপিত ক'রে দামিনীর আলেখ্য রচনায় মনোযোগী। এই দুই আত্মসচেতন পুরুষ ও নারীর এক ভাববৃত্ত পরিক্রমান্তে অন্য ভাববৃত্ত পরিক্রমার বিবরণ 'চতুরঙ্গ'-এ প্রদর্শিত, অথচ বৃত্তান্তরের কারণ বা কৈফিয়ৎ লেখকের সচেতন প্রযত্নেই অ-বিশ্লেষিত, সামান্য তুচ্ছ সংবাদের মতোই রূপান্তরের ইঙ্গিত পরিবেশিত।

"এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। 'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ' 'দামিনী' ও শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।" চার অংশ, কিন্তু বিভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন নয়, প্রতি অংশ সমগ্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সজীবতায় যুক্ত, যেজন্য জ্যাঠামশায়-বৃত্তান্ত আপাতদৃষ্টিতে "অনাবশ্যক রূপে পল্লবিত" মনে হলেও উপন্যাসের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায়, কারণ শচীশের প্রাতিস্বিকতা ও আত্মসচেতনতার জন্ম জ্যাঠামশায়ের শিক্ষায়। জ্যাঠামশায় নাস্তিক তো বটেই, উপরন্তু সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস ও আস্তিক্যের উপর তাঁর দুরন্ত অনীহা, এজন্য "আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।" বস্তুত এই আত্মবিশ্বাসের জন্য তাঁর সঙ্গে শচীশের সম্পর্ক বয়োজ্যেষ্ঠ বয়োকনিষ্ঠের নয়, একান্ত বন্ধুত্বের। বন্ধুত্বের জন্যই শচীশের "লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি" এবং সমস্ত সংস্কারের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলে শচীশ তাই প্রাতিস্বিক ও আত্মসচেতন। ফলে শচীশের আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল, তাই পরিবারের তথাকথিত ও স্থূল মর্যাদা লঙ্ঘন করে ননীকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হওয়ায় সে দ্বন্দ্বমুক্ত, এবং এই স্বীকারের মধ্যে শচীশ আত্মজিজ্ঞাসার পরীক্ষায় অতি সহজে উত্তীর্ণ। অর্থাৎ শচীশের আত্মসচেতনতা ও আত্মসনাক্তকরণের জন্য 'জ্যাঠামশায়' অধ্যায় একান্ত প্রয়োজনীয়, আবার জীবন-সামগ্র্য সন্ধানে জ্যাঠামশায়ের নিপুণ বুদ্ধি ও যুক্তিচর্চা সব নয়—এই বোধ তার পরবর্তী ভাববৃত্তে প্রবেশের জন্য আবশ্যক, কারণ আত্মজিজ্ঞাসার কথা কর্ম সোদির করতে অক্ষম হ'লে নিজের খণ্ডিত অস্তিত্ব মাথা চাড়া দেয়।

স্বাভাবিক, তার ফল যে বিপজ্জনক—জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর তার রসসাগর-নিমজ্জনে সে দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল। বস্তুত জ্যাঠামশায়ের শুষ্ক বুদ্ধিবৃত্তির অধ্যায়টির অসারতা ননীবালাকে কেন্দ্র করেই প্রমাণিত, এবং জ্যাঠামশায় আশীর্বাদে সিকি পয়সা বিশ্বাস না করলেও "ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে" উক্তির মধ্যে জ্যাঠামশায়ের রূপান্তরমুখী চিত্রটি বোধহয় লভ্য। এরপর নাস্তিক্য জগৎ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক আস্তিক্য জগতে প্রবি শচীশের ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ার আলেখ্য চিত্রিত। সব না মানার পর এবার সব মানার পালা; এই না-মানার পালা থেকে সব মানার পালার শুরু জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর। শচীশ প্রথম বৃত্তে পরাশ্রয়ী ব'লে তার জীবনের এমন পরিবর্তন সম্ভব, অবশ্য এ-পরিবর্তন ঐ চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিকও, কারণ নিছক বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে খণ্ডিত সত্তার যন্ত্রণা অসহ, এই খণ্ডিত সত্তার তাড়নায় তার বিশ্বাসের আশ্রয় লীলানন্দ স্বামী। কিন্তু অরূপে প্রতি বিশ্বাস ও শচীশের স্বীয় বিশ্বাসভূমি দৃঢ় নয়, তাই দামিনীর উপস্থিতি তার কাছে শরীরী, ব্যক্তিত্বের সাবয়ব উপস্থিতি; কারণ "সে নারী মৃত্যু কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক।" ফলে রূপের সঙ্গে রূপকের সংঘ অনিবার্য, এবং স্বাভাবিকভাবেই "রূপকের পাত্রটা মাটির উপরে কাত হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে।" এরপর পুনরায় শচীশের মতবদল, এবা "সমস্তই মানিয়া লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল।" অথচ এই শান্ত হয়ে বসার মধ্যে কতখানি যন্ত্রণা লুকনো সে-কথা উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে প্রসারিত। বস্তুত, দামিনী-শচীশের সম্পর্কের উত্থান পতনে শচীশের অজস্র সংগ্রামের বিবরণ অতি সূক্ষ্মতায় বিরল ইঙ্গিতে প্রকাশি ক'রে লেখক তার মর্মান্তিক দাহনের চিত্র তীক্ষ্ণ করায় প্রয়াসী। দামিনী আকর্ষণ বাড়ার অনুপাতে শচীশের চিত্তনিরোধ ও সংযমের প্রাচীর ততই দৃ হয়ে ওঠা আশ্চর্যের নয়, কারণ ঈষৎ দুর্বলতায় তার চারিত্র্য বনিয়াদ চূর্ণ বিচূ হতে নিমেষমাত্রই প্রয়োজন। তাই এ-দৃঢ়তা আসলে আত্মপ্রবঞ্চনার ছদ্মবে কারণ লীলানন্দ স্বামীর আশ্রয় পরিত্যাগ করে নিজের দাঁড়াবার জায়গা সম্বন্ধে সে নিশ্চিত নয়, অথচ লীলানন্দ স্বামীর বন্ধন নিগড়ের মতো দুর্মোচ্য অ অসহ শচীশের কাছে, অতএব মুক্তি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোনো বিশ্বাসের ভি যেখানে দৃঢ় নয়, সেখানে অরূপে আত্মসমর্পণ প্রত্যাশিত। তাই দামিনী শেষ চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য এই সজীব সম্পর্ক ছিন্ন করা দরকার, এবং তখ

অরূপের মধ্যে আত্মনিমজ্জন অনিবার্য ও একমাত্র পথ। অবশ্য এ-বিশ্বাসের ভিত সুপ্রোথিত কিনা—সে প্রশ্ন ওঠার আগেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

একটি স্থির নিশ্চিত অবলম্বনের ভিত্তি ধ্বসে যাওয়ার পর আর-একটি পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে প্রস্থানের জন্য শচীশের আপ্রাণপ্রয়াস। এই প্রয়াসেই লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব বরণ, রূপ-অরূপের সংঘর্ষে দ্বিধাদীর্ণ হওয়া, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় কালযাপন, অতঃপর সেই বন্ধনহীনতার মধ্যে আত্মসমর্পণে একটি কথা স্পষ্ট যে, এ-পথপরিক্রমায় হারানো বিশ্বাস অন্বেষণের চিত্রই মূল ও মুখ্য। শ্রীবিলাসের কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাবে শচীশের উক্তি—"একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিষটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপর নিজের দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না।"—বিশেষ অর্থবহ। কারণ এ-উক্তিতে শচীশের কয়েকটি বিষয় সুপরিস্ফুট। তন্মধ্যে রূপান্তর সম্পর্কে সচেতনতা, বিশ্বাসের ভিত্তি ধ্বসে যাওয়ার জন্য আত্মবিশ্বাসে সংশয় ও আশ্রয় বা বিশ্বাস লাভের আকুতি উল্লেখ্য। আত্মবিশ্বাস সংশয়সিক্ত হ'লে আত্মসমর্পণের তাগিদ ও তাড়না স্বাভাবিক, এবং এর ফলেই শচীশ ক্রমেই আত্মসচেতনতার নৈতিক দিক আত্মকেন্দ্রিকতার পথে যাত্রী। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে চাষাড় মুসলমানদের সংস্পর্শে সে সজীব, অন্তত তখন জনবিচ্ছিন্ন হওয়া শচীশের পক্ষে সাধ্যাতীত, কারণ সে পরোক্ষভাবে হলেও জনের সঙ্গে যুক্ত জ্যাঠামশায়ের মাধ্যমে। কিন্তু রসসাগরে নিমজ্জনের পর থেকে আবিষ্ট শচীশ ক্রমে ক্রমে জনবিচ্ছিন্ন ব'লে শামুকের মতো চিত্তনিরোধের প্রাকার তৈরি করায় ব্যগ্র, অবশেষে সেই প্রাকার ধ্বসে পড়ার মুখে বাধ্য হয়ে অস্পষ্ট আধ্যাত্মিকতায় আত্মবলিদান নিয়তির প্রতিহিংসা গ্রহণের মতো নির্মম হলেও স্বাভাবিক। আসলে শচীশের মতো পুরুষের এই পরিণতি অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত, কারণ তার আত্মসচেতনতার মধ্যে যে খণ্ডতা বিদ্যমান—তা আমাদের দেশের তথাকথিত রেনেসাঁসের দায়ভাগ। আমাদের নব জাগরণে ব্যক্তির উন্মেষ যে আত্মসচেতনতায়, সেই আত্মসচেতনতায় আবেগের প্রকোপও কম নয়, ফলে আমাদের আত্মসচেতনতায় নেতির প্রাবল্য স্বাভাবিক। এই নেতি একদিকে প্রখর আত্মকেন্দ্রিকতায়, অন্যদিকে ভাবালুতায় প্রসারিত, কারণ পরাধীন দেশের নবজাগরণ এই নেতির আবহাওয়ায় লালিত-পালিত,

অবশ্য স্বাধীন দেশের নবজাগরণে আত্মসচেতনতায় নেতির প্রভাব পড়ে সামাজিক পটকে অস্বীকারের জন্য। আর সামাজিক পটকে অস্বীকারের কোনো প্রশ্নই নেই আমাদের, যেহেতু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জন্মসূত্রেই ছিন্নমূল, ফলে আমাদের ব্যক্তিত্ব-উন্মেষ ও তার প্রসার—আত্মসচেতনতা—সীমাবদ্ধ ঐতিহাসিক কারণে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই শচীশের আত্মসচেতনতা বিচার্য। এই সীমাবদ্ধতাই আমাদের যাবতীয় স্ববিরোধিতা ও দুর্বলতার উৎস। অদ্যাপি, এই বিশ শতকের পরার্ধেও, মননদীপ্ত আধুনিক বঙ্গ সন্তানও কী এই সীমাবদ্ধতায় বন্দী নয়? শচীশের আত্মসমর্পণ আমাদের অনভিপ্রেত হ'লেও শচীশের আত্মানুসন্ধান ও আত্মজিজ্ঞাসার অন্বেষণ আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য, সেদিক থেকে সে আমাদের আধুনিকতার প্রতিভূস্থানীয় পুরুষ।

দামিনীর পথপরিক্রমার সূচনা ও সমাপ্তিতে অতৃপ্তি প্রকট। স্বামীর সঙ্গে অ-বনিবনা যেমন অ-সুখের, মৃত্যুর সময় "সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই" উক্তিটি তেমনি অ-পরিতোষের। এই দুই অপরিতৃপ্তির মধ্যস্থলে স্থাপিত দামিনীর চিত্র নিশ্চয়ই সুখের নয়, আর এ-যন্ত্রণা যখন ব্যক্তিত্বের সচেতনতা জাত, তখন সে-চিত্র নিশ্চিতরূপে বিদ্রোহের। সেই বিদ্রোহের ভূমিকায় অবতীর্ণ দামিনী তাই বাঙলা সাহিত্যে অদ্যাপি তুলনা রহিত। এবং দামিনীর আলেখ্য সক্রিয়তায় উজ্জ্বল ব'লেই সে সজীব প্রাণবন্ত। স্বামীর সঙ্গে দামিনীর মনোমালিন্যের সূত্রপাত লীলানন্দ স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে। স্বামী নিবৃত্তি মার্গের যাত্রী, দামিনীর বৈষয়িকতার প্রতি আকর্ষণ স্বামীর কাপুরুষতার প্রতিক্রিয়া, ফলে স্বামীর গুরুভক্তি আদায়ের চেষ্টা দামিনীর কাছে অসহ্য, এবং "স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তি সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।" দামিনীর আবির্ভাব উপন্যাসে এই সময়। গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি নেই, তাই গুরুর স্নেহ এবং অনুগ্রহ তার কাছে দুর্বিসহ, ফলে পদে পদে বিদ্রোহ ঘোষণা দামিনীর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু শচীশের আবির্ভাবের পর অন্তঃশীলার মতো পরিবর্তনের স্রোত নিঃশব্দে দামিনীর হৃদয়ে কলতান তোলে, তখন দামিনী অন্তরের তাগিদে শচীশের জন্য গুরুর সান্নিধ্যলাভে উৎসাহী, এ-আকাঙ্ক্ষারই চরম প্রকাশ গুহার অভ্যন্তরে। অথচ শচীশের নিষ্ঠুর পদাঘাতে পুনরায় সে বিদ্রোহী দামিনীতে রূপান্তরিত, এবং সেই সময় শ্রীবিলাসই তার আহত অভিমানের অবলম্বন। যদিচ দামিনীর শচীশের প্রতি এই আপাত ঔদাস্য

শচীশের অন্তরদাহিকা শক্তি। এই দাহনের শেষ অবস্থা দামিনীর শচীশকে গুরু রূপে বরণের মধ্যে, এবং নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার পর শচীশের কাছে দামিনীর উচ্ছ্বাসে। এরপর সেই বন্ধন কাটাকাটির পালা, এবং, শচীশের অন্তর্ধানের পর শ্রীবিলাস "যে একটা কিছু, দামিনী এতদিন সে কথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই,…এবারে তার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেই টুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা।" কিন্তু শ্রীবিলাসকে গ্রহণ করেই কি তার শান্তি? উত্তর নঞর্থক, যেহেতু শ্রীবিলাস তার তুলনায় সাধারণ মানুষ। দামিনীর ভাববৃত্তে শচীশই প্রধান, কারণ রূপের সঙ্গে অরূপের সংঘর্ষ শচীশ-দামিনী-কেন্দ্রিক, এবং এ-সংঘর্ষ উভয়ের তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ থেকে উত্থিত, যদিচ দামিনীর সমস্ত সংগ্রাম অরূপের বিরুদ্ধে, এবং শচীশের কাছে আত্মনিবেদনের মধ্যেও রূপের স্পর্শ বর্তমান, অন্তত সেই স্পর্শের ঈষৎ আভাস তো নিশ্চয়ই, কারণ এই আত্মদানে বুকের আঘাতটির অবদান তুচ্ছ নয়, দামিনীর ভাষায় "এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশ মণি।" শচীশ দামিনীর আপন সত্তারই প্রতিরূপ। হয়তো শচীশ তার অন্বিষ্ট হারানো মূল্যবোধের প্রতীক ব'লেই সময় সময় দামিনীর মধ্যে ভক্তির আতিশয্য লক্ষণীয়, কিন্তু শচীশের উপস্থিতি সাবয়ব এবং প্রচণ্ড মূর্ত—এ-বোধ দামিনীর মধ্যে সর্বদা জাগ্রত, শ্রীবিলাসের কথার উত্তরে তার উক্তি—"আমি যে স্ত্রী জাত। এই শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া, গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজেদের কীর্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।"—সজাগ মনেরই পরিচয়, যে-মন আইডিয়ায় উদ্দীপ্ত হলেও ভাবালু নয়, বরং মনোযোগের প্রাখর্যে সচেতন। তাই এমন মনের পক্ষে স্বাভাবিক শচীশের নাগাল পাওয়ার জন্য দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু শচীশ ক্রমে আত্মসর্বস্ব হতে থাকলে তার চারপাশে নির্মিত চিত্ত-নিরোধের প্রাচীরে দামিনীর আকাঙ্ক্ষার শর প্রতিহত ও প্রত্যাবৃত্ত হতে বাধ্য এবং তখন শ্রীবিলাসের দিকে মুখ তোলা দামিনীর পক্ষে স্বাভাবিক। 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর বিহারীর প্রতি আকর্ষণের উৎসস্থল দমদমের বাগানে চড়িভাতির ঘটনাটি। সেই সময় বিহারীর প্রশ্নোত্তরে স্মৃতিচারণায় বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের প্রথম টান অনুভূত, পরবর্তী সময় বিহারীর "মন বুঝিয়াছিল, এ-নারী খেলা করিবার মত নহে, ইহাকে উপেক্ষা করা যায় না।" দামিনীর

জীবনে অনুরূপ ঘটনার উদাহরণ শ্রীবিলাসের কাছে ছেলেবেলার কথা, পাড়াপড়শির কথা প্রভৃতি স্মৃতিরোমন্থনে লভ্য, অবশ্য দামিনীর ব্যক্তিত্ব এই স্মৃতিচারণায় প্রথম উদ্বুদ্ধ নয়। শ্রীবিলাসের চোখে দামিনী নিঃসন্দেহে ব্যক্তিত্বময়ী, কিন্তু বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অগাধ শ্রদ্ধা—তেমন শ্রদ্ধার নিদর্শন দামিনীর ক্ষেত্রে অতি অস্পষ্ট, প্রায় অনুপস্থিত। তাই বিনোদ-বিহারীর কাহিনী ব্যক্তিত্বের আত্মসচেতনতার সংঘর্ষে তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত, কিন্তু বিনোদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা প্রবল ব'লেই বিনোদ শেষ অবধি ভিক্টোরীয় সুনীতিদ্বারা আক্রান্ত। বিনোদিনীর আত্মসচেতনতায় পরিবেশের অবদান নেহাৎ তুচ্ছ নয়, চড়িভাতির ঘটনা ছাড়াও মহেন্দ্রর নির্জীবতা তার আত্মসচেতনা জাগ্রত করার সহায়, তাই তার ব্যক্তিত্বে আবেগের চাপ ও সংস্কারের প্রভাব অধিক কার্যকরী, সেজন্য বিনোদের পক্ষে বিহারীর সঙ্গে (বিধবা ব'লেই) বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কল্পনাতীত, এবং এইখানেই দামিনীর জয়। বিধবা হয়েও সে সংস্কারমুক্ত, এমনকি গুরুবাদ অস্বীকারের দুঃসাহস চেতনার স্পর্ধায় অর্জিত। তাই দামিনী সময় সময় আত্মসমর্পণের ইচ্ছায় পরাস্ত হ'লেও দৈব কৃপালাভের আশায় উদাসীন। কারণ সে আত্ম-পরিচয়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে উদগ্রীব। সেজন্য বিলাসের মতো মাঝারি ধরনের ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘরবাঁধার সঙ্কল্প সমস্ত দিক থেকে দামিনীর পক্ষে ট্র্যাজিক। শচীশ-দামিনীর আদর্শ, তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ ও প্রেম, অথচ সেই আইডিয়া মানুষের নাগালের বাইরের জিনিস, ফলে এত বেদনা ও যন্ত্রণা। এই ট্র্যাজেডি পরিবেশ বা বহিঃশক্তির ক্রিয়া নয়, দামিনীর অস্তিত্বের মূলেই নিহিত। এর ফলে সে আত্মসচেতন, তাই আত্মপরিচয় ও আত্মসনাক্তকরণের জন্য এত হাহাকার, এবং এখানেই সে আধুনিক ব্যক্তি, কেবল নারী নয়। আর এজন্যই সে নিজে বিপন্ন, সমস্ত জীবন (নিজের সত্তার প্রতিরূপ দেখার পর) অতৃপ্তি ও অতুষ্টির দাবানলে প্রজ্বলিত এবং হাহাকারে মরুর মতো ধূ ধূ। দামিনীর প্রতীক তাৎপর্য এখানেই অনুসন্ধেয়, যার অপূর্ব প্রকাশ বিষ্ণু দে-র অনবদ্য 'দামিনী' কবিতায় লভ্য:

> "সেদিন সমুদ্র ফু'লে ফু'লে হল উন্মুখর মাঘী পূর্ণিমায়
> সেদিন দামিনী বুঝি বলেছিল :—মিটিল না সাধ।
> পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়,

প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ,
সেদিন দামিনী, সমুদ্রের তীরে।

"আমার জীবনে তুমি প্রায় বুঝি প্রত্যহই ঝুলন-পূর্ণিমা,
মাঘী বা ফাল্গুনী কিংবা বৈশাখী রাস বা কোজাগরী,
এমনকি অমাবস্যা নিরাকার তোমারই প্রতিমা।
আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বাহু—আন্দোলিত দিবস-যামিনী,
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে॥"

ভাববৃত্তের পটে এই দুই আধুনিক নর-নারীর মনের রিলিফ-মানচিত্র আঁকাই লেখকের উদ্দেশ্য, সেই অঙ্কন কর্মে লেখকের পদ্ধতি রেখাচিত্র অঙ্কনের সদৃশ, অনেকটা চৈনিক রীতির নিকটবর্তী। দামিনী স্থির সৌদামিনীতে রূপান্তরিত শচীশের টানে, শচীশও সে-টানে নির্লিপ্ত নয়, দামিনী ও শচীশের নতুন সম্পর্ক মাত্র দুটি চিত্রে প্রকাশিত :

ক] "শচীশের বসিবার ঘরে চীনামাটির ফলকের উপর লীলানন্দ স্বামীর ধ্যানমূর্তির একটি ফোটোগ্রাফ ছিল। একদিন সে দেখিল তাহা ভাঙিয়া মেঝের উপর টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া আছে। শচীশ ভাবিল, তার পোষা বিড়ালটা এই কাণ্ড করিয়াছে। মাঝে মাঝে আরও এমন উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল যা বন্য বিড়ালেরও অসাধ্য।"

খ] "একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন, এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেঝের উপর মাথা ঠুকিতেছে, এবং বলিতেছে, 'পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।' ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।"

এই দুই চিত্রে নিঃসন্দেহে শচীশ-দামিনীর অ-ধরা অথচ মূর্ত জটিল সম্পর্কটি প্রকাশিত, কিন্তু প্রথম চিত্রটির প্রতীকী ব্যঞ্জনা (বিড়াল) শেষ বাক্যে

বিস্মিত, বরং দ্বিতীয় চিত্রে দামিনীর মেঝের উপর মাথা ঠোকা ও শচীশের ছুটে পালানোর মধ্যে শরীরের উপস্থিতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই শারীরিক সমস্যা ও শচীশের সঙ্কট অতিক্রমের চেষ্টা গুহার দৃশ্যে প্রতীকের স্তরে উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথের সংযত লিপিকুশলতায় :

"সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো—তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল, সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু, তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্তকাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই—সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে, সে নিঃশব্দে কাঁদে।

"ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনমতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখি, হয়তো বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহিরে কিম্বা বাহির হইতে ভিতরে ঝপ্ ঝপ্ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

"মনে করিলাম, বাহিরে গিয়া শুইব। কোন্ দিকে যে গুহার দ্বার তা ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি মারিয়া একদিকে চলিতে চেষ্টা করিয়া মাথা ঠেকিয়া গেল, আর একদিকে মাথা ঠুকিলাম, আর একদিকে একটা ছোটো গর্তের মধ্যে পড়িলাম—সেখানে গুহার ফাটল চোঁয়ানো জল জমিয়া আছে।

"শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল, সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। ···

"তারপর কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। ···মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই—তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!

"ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম। ···অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?"

প্রথম অনুচ্ছেদের সেই আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তুটি মানুষেরই জান্তব সত্তা, এবং শেষ অনুচ্ছেদে সেই চাপা কান্না যে দামিনীর, এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই, আর এ-দুই প্রান্তের মধ্যস্থিত শচীশের সংযম ভাঙা ও সংযম ফিরে পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টার ব্যঞ্জনা বিধৃত, কিন্তু এই প্রয়াস চিত্রণে যে-উপমা চিত্রকল্প ব্যবহৃত—সেই উপমা চিত্রকল্পগুলি অসংলগ্নরূপে উপস্থাপিত (আদিম জন্তুর পর বাদুড়ের মতো পাখির ডানা ঝাপটানো, তার হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠা, তারপর গুহার অন্ধকারে পথ হাতড়িয়ে ফেরা, দালানিকে কবলের গ্রাস হওয়া, সাপের মতো জন্তুর পা জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি), অথচ অসংলগ্নতাগুলি এক বিশেষ তাৎপর্যে অবশেষে সংহত হওয়ায় সমস্ত চিত্রটি প্রতীকী, এবং আধুনিক প্রতীকরীতির আত্মীয়স্থানীয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রতীকে অবচেতনার রহস্য সন্ধানে বিশেষ উৎসাহী, কারণ তাঁদের ধারণা এই সব প্রতীকেই মানুষের অবচেতন মন সহসা ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত। উপরিউক্ত চিত্রেও কি শচীশের মগ্নচৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত নয়? আর এইখানে রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত পদ্ধতি আধুনিক। প্রতীক ব্যঞ্জনা অবশ্য আরও সার্থক নিম্নলিখিত অংশে যদিও এস্থলে উপমা চিত্রকল্পগুলি উপরের উদাহরণ অপেক্ষা সংলগ্ন ও সন্নিহিত।

"চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে; জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে। যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ায় সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

"কোন্‌দিকে যাইব ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখির

পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সামনের জলটি একেবারে নীলেনীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা কালো ডানার ঝলক দিতেছে। কিছুদূরে চখাচখির দল ভারী গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরাপুরি মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দামিনী পাড়ির উপর দাঁড়াইতে তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া গেল।"

উদ্ধৃতির প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের চিত্র দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত; প্রতীপ দুটি চিত্র দুই প্রতীপ মনোভাবের প্রকাশ, একদিকে দামিনীর ব্যর্থতা, অন্য দিকে শচীশের মনের গভীর প্রশান্তি, অবশ্য শচীশ-দামিনীর পূর্বাপর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি মনোভাব বিচার্য। দামিনীর ব্যর্থতা, কারণ তখন সে তৃষ্ণায় কাতর, কিন্তু সেই তৃষ্ণার দরখাস্ত যার কাছে উপস্থাপিত, সে তখন অরূপের রাজ্যে স্বেচ্ছানির্বাসিত অথবা সেই রাজ্যে প্রস্থানই তার নিয়তি। একদিকে দয়াহীন তপ্ত আকাশ, অন্যদিকে জলটি একেবারে নীলেনীল। কিন্তু এই প্রতীক ব্যঞ্জনা দামিনী ও শচীশের একটি পরিণতি লাভেরই ব্যঞ্জনা-দ্যোতক, সেজন্য প্রথম প্রতীকের মতো এই চিত্রটির ব্যঞ্জনা গভীর নয়।

আসলে এইসব প্রচেষ্টার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আমরা এই প্রমাণে সচেষ্ট যে ঔপন্যাসিক তাঁর বিষয়বস্তু ও রূপায়ণ সম্পর্কে অতি সচেতন, যেজন্য পদ্ধতি নির্বাচনে তিনি গতানুগতিকতার নিশ্চিত ভূমি পরিত্যাগ ক'রে এক অনিশ্চিত প্রকরণে বক্তব্য রূপায়ণে তৎপর। তাই ভাষার শুদ্ধতা বা বক্তব্য অনুযায়ী ভাষা নির্বাচনে ঔপন্যাসিকের প্রাণান্ত প্রয়াস। উপমা, চিত্রকল্প, কথনো কদাচ প্রতীক ব্যবহার তাই উপন্যাসটির প্রকরণের জন্যই প্রয়োজন, এবং উপন্যাসের ভাষা যে সংহত অথচ কবিত্বময় তারও কারণ ঔপন্যাসিকের সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিকতার প্রণালী নির্বাচন। এই সাঙ্কেতিক প্রণালীর জন্যই এক-একটি ভাব-বৃত্তের সমাপ্তি আত্মহননের ঘটনায়। ননীবালার আত্মহত্যা, জগমোহনের মৃত্যু (যদিও প্লেগ রোগে জগমোহনের মৃত্যু, তবু এ-মৃত্যু জগমোহনের স্বেচ্ছায় প্রাণহননের সামিল), এবং নবীনের স্ত্রীর বিষপানে মৃত্যু বহির্ঘটনার উদাহরণ, কিন্তু মৃত্যুগুলি ইচ্ছামৃত্যু ব'লেই ঘটনাগুলির সংযোজনা লেখকের আশ্চর্য সচেতনতার পরিচয়। এক-একটি ভাববৃত্ত এক-একটি আত্মসচেতন ব্যক্তির মনের চিত্র, সেই মনের মানচিত্রে এক-একটি ছকভাঙার বিবরণ লিপিবদ্ধ, বিচ্ছেদ-বিন্দুরূপে আত্মহননের ঘটনাগুলি সেই ভাববৃত্তের অন্তঃসারশূন্যতা

প্রকাশে প্রায় প্রতীকে পরিণত—ননীবালার মৃত্যুতে জগমোহনের ছক, জগমোহনের মৃত্যুতে শচীশের নাস্তিক্যবুদ্ধির ছক এবং নবীনের স্ত্রীর মৃত্যুতে আশ্রমের ছক সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, যদিও এই ছকগুলির ভাঙা-গড়া মনেরই ব্যাপার, এবং একটা একটা ভাববৃত্ত মনের মধ্যে ভেঙে পড়ার পরই আত্মহননের দৃশ্য-গুলি সংযুক্ত। আর মৃত্যুগুলি এক-একটি ছকের প্রান্তবিন্দু ব'লে বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে যাওয়ার কৈফিয়ৎ অপ্রয়োজনীয়। এই অ-প্রয়োজনের জন্যই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রকরণ পূর্বপ্রচলিত উপন্যাসের প্রকরণ থেকে পৃথক। আধুনিক উপন্যাসে বিষয়বস্তুর ও ভাবের রূপায়ণ মুখ্য, সেজন্য আধুনিক উপন্যাসে ঘটনা বা চরিত্রের চাপ সৃষ্টির চেয়ে মানস পরিমণ্ডল সৃষ্টির আগ্রহ বেশি। সেই নিরিখে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে অবলম্বিত পদ্ধতি নিঃসন্দেহে নতুন ও আধুনিক।

অথচ এই প্রণালী নির্বাচন এ-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শুভফলদায়িনী নয়। আধুনিক উপমা, চিত্রকল্প ও প্রতীক প্রয়োগেও 'চতুরঙ্গ'-র ফলশ্রুতি প্রতীকোৎসারী নয়। গুহার প্রতীকটি বিচ্ছিন্নভাবে অনবদ্য রচনাকৌশলের পরিচয়, কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে প্রতীকটি শচীশের জীবনের রূপকার্থ মাত্র—শচীশের রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্বের ভূমিকা ও ব্যাখ্যাস্বরূপ। অথচ সমগ্র উপন্যাসের প্রতীক তাৎপর্য লাভের সম্ভাবনা নেহাৎ হেসে উড়িয়ে দেবার বিষয় নয়, কারণ "এই নাট্যের মুখ্যপাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত।" শচীশ সচেতন, তদুপরি আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রে আপন সত্তা আবিষ্কারের একজন অন্বেষক, অথচ জ্যাঠা-মশায়ের মৃত্যুর পর তার বিশ্বাস সংশয়ে সংশয়ে জর্জরিত, কোনও নতুন বন্ধন বা সম্পর্ক স্থাপনে তাই সে এত ভীত। এজন্য দামিনীর সম্পর্কে তার ভয় তুলনারহিত, যেহেতু দামিনীর আকর্ষণ দুর্নিবার, যে কোনও মুহূর্তে প্রলয়ঙ্করী। ডায়েরিতে অবশ্য সেই আকর্ষণ ও আকর্ষণ-জয়ের যুদ্ধ অনবদ্য ভাষায় প্রকাশিত, কিন্তু এ-প্রকাশ তাৎক্ষণিক, কারণ সবকিছু সম্পর্কে তখন শচীশের সংশয় অতিমাত্রার, তাই তার অবলম্বন একমাত্র আত্মবিশ্লেষণ ও সেই আত্মবিশ্লেষণই তার একমাত্র মুক্তিদাতা, অথচ মুক্তি সম্পর্কে শচীশের ধারণা অস্পষ্ট ব'লেই দামিনীকে অস্বীকার অনিবার্য, যদিও এ-অস্বীকারে যে মুক্তি তা শচীশের অক্ষম দুর্বল মনের পরিচয়। এই দ্বন্দ্বমথিত ক্ষতবিক্ষত আত্মমগ্ন ব্যক্তির আলেখ্য অঙ্কনের জন্য প্রয়োজন দুঃসাহসিক অন্তর্মুখীনতার অভিযান। কারণ যেখানে ঘটনা বা চারিত্র্যবিবরণ মূল নয়, সেখানে চেতন-অবচেতনের আলো-আঁধারি সংলগ্ন-অসংলগ্ন চিত্রেই উদ্ভাসিত আত্মসচেতন ও আত্মসনাক্তকারী ব্যক্তির যন্ত্রণা—বিশেষত যে-ব্যক্তির ক্রিয়া-কলাপের সবটাই আত্মগত। জেমস জয়স-এর 'ইউলিসিস' উপন্যাস এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং প্রকরণের উপযুক্ত ব্যবহারে উপন্যাসটি বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কিন্তু এ-পদ্ধতিতে মনের অতলে ডুব দিয়ে আহৃত রত্ন নিশ্চয়ই রবীন্দ্রমানসের নিকট সাদর অভ্যর্থনার বিষয় এবং অতিরিক্ত বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর অনীহাও প্রবল।

আধুনিকতার আবরণহীন অলজ্জ প্রকাশ তাঁর অমার্জিত সুরুচির পরিপন্থী, এবং এমন আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বিরূপ, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধ।

অবশ্য শচীশের শুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষার চিত্রঅঙ্কন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকরণেও সম্ভব, হয়তো সেই প্রকরণ কিছু ধ্রুপদী, অর্থাৎ শুদ্ধতার প্রতিপক্ষ শক্তিগুলির সঙ্গে সংগ্রামের চিত্র অঙ্কন, কিন্তু এ-পদ্ধতিতেও সামাজিক পটে চরিত্রের সাযুজ্য ও বিযুজ্যের প্রশ্নেও বাস্তবের অলজ্জ অসংকোচ প্রকাশের সম্ভাবনা কম নয়; অথচ রবীন্দ্রমানসে এই স্থূল অথচ সত্য প্রকাশের সময় অতি অল্পই, টমাস মান-এর 'দ্য ম্যাজিক ম্যাউণ্টেন' বা 'ডক্টর ফাউস্টাস' বা 'হোলি সিনার'-এ এ-পদ্ধতি নব বিন্যাসে সচেতন চরিত্রের ঘনিষ্ঠতায় দেশ-কালের প্রতীকে পরিণত। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে এই উভয় প্রকার পদ্ধতি পরিত্যক্ত, অথচ মগ্নচৈতন্যে স্নান করতে রবীন্দ্রনাথ ভীত নন, সে-প্রমাণ তাঁর অনবদ্য অজস্র চিত্রাবলী। বস্তুত পদ্ধতি নির্বাচনের বিষয়টি রবীন্দ্রমানস বিচারণায় অন্তর্গত এবং "একথা স্বাজাত্যাভিমানেও না মেনে লাভ নেই যে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে একটি সবল মার্জিত মনের পরিচয়টাই মুখ্য, সে মনে ঝঞ্ঝার চেয়ে শান্তির মর্যাদাই বেশি। কিন্তু এই ঝঞ্ঝার চেয়ে শান্তির টান, তাঁর পরবর্তীদের যাই হোক তাঁর কাছে মোটেই একটা অগভীর অভ্যাস ছিল না। এই অমৃতের বিশ্বাস ছিল তাঁর সমগ্র স্বভাবের গভীরে, এই বিশ্বাস তাঁর কাছে একান্ত সত্য ছিল, এতেই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের আর মানসের মহিমা।" (বিষ্ণু দে: 'এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য', পৃঃ ২৪)

তথাপি জীবনের অতৃপ্তি ও হাহাকারের প্রতীক-ব্যঞ্জনায় দামিনী উজ্জ্বল, এবং দামিনীকে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ করানো রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিকতার পরিচয়, দামিনীর যেটুকু দুর্বলতা তা শচীশের দুর্বলতার প্রভাব ও স্পর্শ, কিন্তু আমরা আশ্বস্ত এজন্য যে, দামিনীর আলেখ্য চিত্রণ অন্তত রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির প্রকাশ। এমনকি আধুনিক যুগের জন-বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সঙ্গে শচীশ সময় সময় তুলনীয়, সে কেবল আত্মবিশ্বে নিজেকে সংলগ্ন ও সন্নিবিষ্ট করার প্রয়াসে সক্রিয়। গোরাও আত্মসচেতন, কিন্তু দেশ ও জনসাধারণের সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপনের চেষ্টাই সেখানে মূল ও মুখ্য লক্ষ্য। শচীশের তেমন দায় নেই, হয়তো এজন্য শচীশের আত্মসমর্পণ তত তীব্র তীক্ষ্ণ ট্র্যাজিক নয়, কারণ তার আত্মবিশ্বে বৃহত্তর সমাজপট প্রায় অনুপস্থিত। শচীশের পরিণতি যুগ ও জীবনের ট্র্যাজেডির মহৎস্পর্শ রঞ্জিত না হলেও 'চতুরঙ্গ' আত্মসচেতনতার জিজ্ঞাসায় আত্মসনাক্তকরণের ঈপ্সায় ও রূপায়ণের বিশিষ্টতায় নিশ্চয়ই স্মরণীয় উপন্যাস, এবং প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের পথিকৃৎ, সে-বিষয়ে দ্বিমত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

শিল্প-সাহিত্যে ঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই দিক

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

শীতকালের সকাল। সায়গনের পথে পথে ব্যস্ততার ভিড়। তীরের বেগে ভেসে এলো বিকট একটা শব্দ। একটা স্কুটার। সুন্দরী এক তরুণী, ঝকঝকে সাজগোজ, চমক লাগানো বেগে স্কুটার চালিয়ে এসে নামল সবচেয়ে ব্যস্ত ব্রিজটার মুখে। নেমেই ঠেলে ফেলে দিল স্কুটারটা পথের ধারে। ছুটে চলে গেল ব্রিজটার ঠিক মাঝখানে। লাফ দিয়ে উঠল ব্রিজের উঁচু রেলিং-এর ওপর। তারপর···কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। কয়েক মুহূর্ত। ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের মধ্যে। একটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে থেমে গেল ট্রাফিকের গতি। কয়েক সেকেণ্ড সবাই হতবাক। বিস্ময়ে স্তব্ধ। তারপরই হৈ চৈ পড়ে গেল। জনাকয়েক তরুণ, জনাদুই পুলিশ তড়িৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। উদ্ধার করে নিয়ে এলো সুন্দরী সেই তরুণীকে। ব্রিজের ওপর নদীর দু-ধারে পথে পথে তখন অজস্র মানুষের ভিড়। মেয়েটি উঠে এলো। আবার ব্রিজের ঠিক মাঝখানে। স্তব্ধ মানুষের ভিড় থেকে কেউ কুশল জিজ্ঞাসা করার আগেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে চীৎকার করে উঠল: "আমার কোথাও লেগেছে কিনা জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। তাকিয়ে দেখুন আমার ঠোঁটের দিকে। এত কাণ্ড যে ঘটে গেল, তবু আমার ঠোঁটের রঙ কি একটুও এদিক-ওদিক হয়েছে? হয়নি। হতেই পারে না। কারণ এ লিপস্টিক···কোম্পানির তৈরি। আপনাদের প্রেয়সী এবং গৃহিণীদেরও···।" এতক্ষণে লোকে বুঝল ব্যাপারটা একটা লিপস্টিক কোম্পানির চমকদার বিজ্ঞাপন বই কিছু নয়। যে যার কাজে চলল আবার।

চমকদার আর চটকদার এই বিজ্ঞাপনীয় বিকৃতি শুধু লিপস্টিক আর পনীরের বাজারেই সীমাবদ্ধ রাখেনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের কর্তারা এবং তাদের মার্কিন প্রভুরা। চিরায়ত ভিয়েতনামের আত্মাকে জর্জরিত করে করে, ভেতরে-বাইরে তাকে পুরোপুরি ইয়াংকি ধাঁচে গড়ে তোলার জন্যে প্রচেষ্টার অন্ত নেই কোনো ক্ষেত্রেই। সে-প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় আর তীব্র বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কেন না ওরাও জানে, শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব যেমন

করে মানুষের মনের অন্দরমহলকে স্পর্শ করতে পারে, পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নূতনের আসন রচনা করতে পারে—তেমনটি আর কিছুই পারে না। ভিয়েতনামের মানুষের জীবন ও মুক্তিসংগ্রামের দুর্বার স্রোতকে ক্ষীণ ও গতিহীন করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ওরা মানুষের দৃষ্টিকে টেনে ধরতে চায় অন্য কোথাও। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে সংস্কৃতিকে অস্ত্র করতে চায় ওরা। কামান, বন্দুক, বিষাক্ত গ্যাস, বোমারু বিমানের মতোই সংস্কৃতিকে মারণাস্ত্রে পরিণত করার লালসায় ওদের ক্লান্তি নেই। এর জন্যে ছলেরও অভাব ঘটেনি ওদের। ভিয়েতনামের দুর্ভাগ্য, বিশ্বের জীবনপ্রেমিক-সংস্কৃতি-প্রেমিকদের দুর্ভাগ্য, কয়েকটি ডলারের জন্যে নিজের আত্মাকে খাঁচায় পুরে বাজারে গিয়ে দাঁড়াতে রাজি, এমন কবি-সাহিত্যিকও পেয়ে গেছে ওরা কিছু সংখ্যায়।

সরকারী প্রসাদধন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা আর বইয়ের পাতা ঘাঁটলেই চোখে পড়বে, সেখানে চিরকালের ভিয়েতনামের ঠাঁই নেই। ভিয়েতনামের মানুষের সকাল বিকেল অভিজ্ঞতার কোনো প্রতিফলন ঘটে না সেখানে। বিশ্বের হাট উজাড় করে সেখানে এনে হাজির করা হয়েছে জীবন-বিমুখ, সংগ্রামবিমুখ, প্রগতিবিমুখ সংস্কৃতির কারবারীদের। কোয়েসলার কিংবা কামুর মতো সূক্ষ্ম কাজের কারিগর থেকে আরম্ভ করে ম্যাকার্থিবাদের মতো মোটা হাতের মেঠো কাজের কাজী, কেউ বাদ নেই। কোথাও এই মহাজনের দল সশরীরে, কোথাও এঁদেরই ভিয়েতনামী সংস্করণ কেউ একজন। আর হরেক রকম সংস্করণে জেমস বণ্ড ও অরণ্যদেব-সাহিত্যের ছড়াছড়ি, যার প্রতি দু-পাতায় তিনটি খুন, চারটি বলাৎকার আর অন্তত একটি সমকাম কাহিনী।

এর জন্যে অর্থের অভাব হয়নি কোনোদিনই। অজস্র ব্যয়ে কেনা হয়েছে এবং এখনো হয় এক-একজন সাহিত্যিক-সাংবাদিককে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আপন কাজের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে নিজেকে আর পাঠকদের একটা বুঝ দেবার চেষ্টা করেন। কারো কারো আবার ওই ভান-টুকুও নেই। দ্বিতীয় দলেরই একজন হলেন "লেখক" নগুয়েন্ মান্ কোন্। 'ব্যাচ্ খোআ' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি গলা খুলেই বলে দিলেন:

"কমিউনিস্ট-বিরোধী লেখা দেওয়ার জন্যে একটি রাজনীতি ও সমাজ-বিষয়ক পত্রিকা আমাকে মাসে বিশ হাজার পিয়েস্ত্রা করে দিয়ে থাকেন। শিল্পের জন্যে

প্রেমে পাগল হয়ে আমি লিখি না। আমি লিখি স্রেফ আমার রুটি রোজগারের জন্যে।" (বাচ্ খোআ, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৬২)

মাসে বিশ হাজার পিয়েস্ত্রা! এমন প্রলোভনের হাতছানি এড়িয়ে চলা ক-জনের সাধ্যে কুলোয়! কুলোয়। ভিয়েতনামের বেশিরভাগ মানুষই ও-হাতছানিতে সাড়া দেননি। তবু কেউ কেউ দিয়েছেন বই কি! সাধারণ একজন লেখককে যে-দর দেওয়া হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি দাম পান ফরাসী-বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন এমন "লেখক"রা। তাঁরা তাঁদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আজকের সংগ্রামের "অপ্রয়োজনীয়তা এবং ক্ষতিকর" দিকের কথা অনেক বেশি 'বিশ্বাসযোগ্য' করে উপস্থিত করতে পারেন বলেই তাঁদের বাজারদর চড়া। এমনি ধরনেরই একজন "সাহিত্যিক" চু তু। সায়গনে তাঁর নামডাকের অন্ত নেই। পত্রিকায় পত্রিকায় তাঁর ছবি, প্রশস্তি, বাণী। রীতিমতো চড়াদরের সাহিত্যিকে পরিণত করা হয়েছে তাঁকে। তিনি সরাসরি "কমিউনিস্টরা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, অতএব ওদের বিশ্বাস কোরো না"—এমন কথা বলেন না। তাঁর উপন্যাসের নায়করা ঘোষণা করে: "মাতৃভূমি, ন্যায়, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, প্রেম—এ-সবই বঞ্চনার অন্য নাম। আমি জেনে গেছি টাকাই হল সার কথা।" হা কপাল! উপন্যাসটির নাম দেখছি 'জীবন'। চু তু-র অন্য একটি উপন্যাস: 'ঝন্‌ঝা'। তার নায়ক সরবে ঘোষণা করে: "আমাদের মহত্তম আদর্শ হল আত্মস্বার্থ।" 'প্রেম' তাঁর অন্য একটি উপন্যাসের নাম। এর নায়কের জীবনবোধের ঘোষণা: "সৎ নাগরিক! উঃ! যত্তোসব বাজে কথা। সততার অনুভূতি একটা অস্বাভাবিক মানসিকতা। ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে ওইসব ন্যাকামি।"

তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে দিয়েই চু তু দেখাতে চেয়েছেন মানুষের মৌলিক চরিত্রের ভিত্তিই হল নীচতা, বঞ্চনা, ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভ, যৌনবৃত্তি এবং বিশ্বাসঘাতকতা। তবু মানুষই তাঁর চিন্তার সঙ্গী, উপন্যাসের নায়ক। কেন? একটি গম্ভীর প্রবন্ধের বইয়ে তিনি এর উত্তর দিয়েছেন:

"মানুষ যে আমাদের মুগ্ধ করে, আমাদের দূষিত করে, জীবন যে এমন আনন্দময়—তার কারণই হলো মানুষ জানে কেমন করে ঘৃণা করতে হয়, কেমন করে ঠকাতে হয়, বঞ্চনা করতে হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়। মানুষ যদি নীতিবাগীশদের মান্য করে চলতে আরম্ভ করত, লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি নিয়ম-বাঁধা নিজীব ব্যক্তি হয়ে যেত—একটি মিনিটও আসে চলে না, পড়ে

চলে না—তবে জীবনটা কি ভীষণ একঘেয়েই না হয়ে দাঁড়াত।”

এমনি যাঁর জীবনদর্শন, সেই চু ভু সম্পর্কে সায়গনের পত্র-পত্রিকায় প্রশস্তি অন্ত নেই। তাঁর চরিত্রগুলি যত বেশি বিকৃতি, জীবনবিমুখ আর মুক্তি সংগ্রামের বিরোধী, তত বেশি ইঞ্চি জায়গা তিনি পান পত্রিকার সাহিত্য ক্রোড়পত্রে। যত বেশি করে তিনি কমিউনিস্টদের প্রতি ঘৃণার আক্রোশ উঠেন, তত বেশি পিয়েস্ত্রা আসে তাঁর পকেটে এক-একটি লেখার জন্যে। সমাজকে, সমাজের মনকে, বিশেষ করে তারুণ্যকে বিষে বিষে নীল করে সংগ্রামে সারি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলাই এই সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, কেউ কেউ যে এর শিকার হয়ে যায় না এমন নয় সমাজের অসুস্থ তলপেট থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে পুঁজ-রক্ত। আনন্দে অস্থির হয় ইয়াংকি প্রভুরা আর তাদের পুতুলনাচের পুতুলের দল। ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে আসল ভিয়েতনামের আত্মা। একটি স্কুলের ছেলে তার ডায়েরিতে লিখেছে :

“কালরাত্রের খানকী, তোকে ধন্যবাদ! কি মজাতেই না কেটেছে কালকের রাতটা!

“১৩০ পিয়েস্ত্রা খরচ হয়েছে কাল। আমি আর তিনজন ছেলে কাল সারারাত শুয়ে ছিলাম তার সঙ্গে। শুধু স্কুলের বাড়িটা, বেনচিগুলো আর মাস্টারমশায়ের টেবিল কাল রাত্রে আমাদের প্রেম করার সাক্ষী। সারারাত ধরে আমরা ওর পেছনে সেঁটে থেকেছি, মাদী কুত্তার পেছনে কুত্তার মতো। আমরা ভোর চারটেয় শীতের রাত্রের শেষে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এলাম।”

কিশোর সাহিত্যের দিকচিহ্ন হিসাবে স্কুলের এই ছাত্রটির ডায়েরির এমনি কয়েকটি পাতা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে ১৯৬৫ সালের ১০ই মে তারিখে প্রকাশিত ‘চিনলুআন’ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাতে। এরপর আর প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করার প্রয়োজন থাকে কি, চু ভু-র দল তাদের ইয়াংকি প্রভুদের পরিকল্পনা অনুসারে কি খেলা খেলছে? কি তাদের উদ্দেশ্য! এইভাবেই ওরা কমিউনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে ‘মুক্ত ভিয়েতনাম’ গড়ছে। ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক সত্তাকে পাহারা দিচ্ছে। ‘ভিয়েতকং’দের অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে।

সরস্বতীর আশীর্বাদকে বেশ্যার বৃত্তিতে পরিণত করার পর অনুতাপের অনলে [illegible] কেউ কেউ বিদ্রোহ করেন। কিন্তু তখন [illegible] বেশি [illegible]। ফিরে

আসার সময় থাকে না। হারিয়ে যান তাঁরা। এমনি তিনজন সাহিত্যিকের যৌথ বিবৃতির একটি অংশে বলা হয়েছে :

"আমরা ভান করতাম যে কলম হাতে আমরা সংগ্রাম করছি স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের জন্যে, মানুষের মুক্তির জন্যে। কিন্তু বছরের পর বছর একটুকরো রুটির জন্যে আর আমাদের কাপুরুষতার কারণে আসলে আমরা চোখ বন্ধ করে থেকেছি। আকণ্ঠ পান করেছি নোওংরা জল। আমাদের আত্মাকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করিয়েছি। সত্যের প্রতি, আমাদের জনগণের প্রতি, বিশ্বাসঘাতকতা করেছি আমরা।"

"স্বাধীন" দক্ষিণ ভিয়েতনামে এমনই "শিল্পীর স্বাধীনতা।" "মুক্তি আর গণতন্ত্রের" ইয়াংকি সাধকরা ভিয়েতনামের মানুষকে ভেতরে-বাইরে শূন্যতায় হারিয়ে দিয়ে নরকের গভীরে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু ভিয়েতনামের মানুষ এই অসাধারণ চক্রান্ত সম্পর্কে একটুও অ-চেতন নয়। তাই মুক্তির সংগ্রাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত।

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা বন্দুক হাতে লড়েন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুদ্ধেও তাঁদের ক্লান্তি নেই, উদাসীনতা তো নেই-ই। দক্ষিণ ভিয়েতনামের ইয়াংকি ম্যাপটা যেমন ছোট হয়ে আসছে ক্রমাগত, সংস্কৃতিক্ষেত্রের যুদ্ধেও তাদের পরাজয় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সায়গনের একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'থোই লুআন'-এর স্তম্ভে এই পরাজয়ের স্বীকারোক্তিই প্রতিধ্বনিত:

"ধরুন, আপনি উপনিবেশবাদ-বিরোধী কথা বলতে চান। আপনি 'প্রতিরোধযুদ্ধ' সম্পর্কে লিখলেন। হা কপাল! বিপদ আপনার ঘাড়ের ওপর। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে, আপনি কমিউনিস্টদের প্রশস্তি গাইছেন। হয়তো খানিকটা ক্ষতিপূরণের মনোভাব নিয়েই আপনি ফরাসী সংস্থাগুলিতে শ্রমিক-আন্দোলন সম্পর্কে লিখলেন। আবার বিপদ! এবারে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি শ্রেণীসংগ্রামের জয়গান গাইছেন। তখন আপনি ঠিক করলেন, সামন্তবাদের বিরুদ্ধেই আপনার লেখনী চালনা করবেন। খামারের মেয়েদের কথা লিখলেন আপনি। যেসব জমিদারের দল তাদের ইজ্জত কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সেইসব মেয়েদের ঘৃণার কথা ব্যক্ত করলেন আপনি। আর যায় কোথায়! এ-ও যে শ্রেণীসংগ্রামে উৎসাহ দেওয়া। আপনার হাতে তাহলে রইল একমাত্র কমিউনিজম-বিরোধিতা। সেখানেও দুটো বাধা। দুটোই পর্বতপ্রমাণ। প্রথমত, ওইসব লিখে আপনি

পাঠক জোটাতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্টদের দুষ্কর্ম দেখার সুযোগ যেহেতু আপনার ঘটেনি, আপনি তো বিশ্বাসযোগ্যভাবে তাদের দুষ্কর্মের বর্ণনা করে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ঘৃণা জাগাতে পারবেন না।"

প্রাণের প্লাবনে সৃজনের সৌরভে

এ হল দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক বিশ্বের কাহিনী। কিন্তু এর চেয়ে প্রবলতর সত্য সেখানকার আর-এক বিশ্ব। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তাঞ্চলের মানুষ সেখানে মৃত্যুকে দু-হাতে ঠেলে, দুঃখকে দু-পায়ে দ'লে এক হাতে রাইফেল নিয়ে অন্য হাতে শিল্প-সংস্কৃতির সাধনা করছে। সংগ্রাম-মৃত্যু-রক্ত-আত্মত্যাগ আর বন-কাদায় মাখামাখি হয়ে সংস্কৃতি সেখানে স্পার্টাকাস-এর মতো দৃঢ়, মেকং-এর মতোই বেগবতী আর সৃজনশীল।

কেমন করে এমনটি ঘটে, ঘটা সম্ভব হয়? তত্ত্বের প্রয়োজন নেই। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক বরং। সায়গনের কাছেই মাইল পনেরর মধ্যে একটি জেলার নাম কুচি। মুক্তিফৌজ মুক্ত করেছে জেলাটি। কয়েক মাস অপেক্ষা করার পর ইয়াংকিরা সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুচি-র কয়েকটি গ্রামের ওপর। নানা আকারের কামান নিয়ে এল তারা। ১০৫ মিলিমিটার থেকে ২০৩ মিলিমিটার পর্যন্ত, কিছুই বাদ গেল না। দু-লক্ষের ওপর গোলা বর্ষিত হল ছোট্ট গ্রামকটির ওপর। কয়েক শত বি-৫২ বিমান ঝাঁক বেঁধে এসে বোমা ফেলতে লাগল। একটি বাড়ি, এমনকি একটি গাছও আস্ত রইল না কোনো গ্রামে। গ্রামের মানুষ কিন্তু অটল। এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ল না তারা। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে, সুড়ঙ্গ তৈরি করে সবাই মিলে আশ্রয় নিল তার ভেতরে। চালিয়ে গেল লড়াই। হটিয়ে দিল ইয়াংকিদের দখলদার ফৌজকে। এই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও কিন্তু শিল্পিরা কিংবা শিল্পের কাজকর্ম উধাও হয়নি। প্রথম গোলাটি এসে আছড়ে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির সিনেমার কলাকৌশলীরা, মুক্ত-শিল্প-সংস্থার দলবল। তাঁদের সঙ্গে এলেন দেশজোড়া খ্যাতির অধিকারী কবি-সাহিত্যিকরাও। এলেন বিশ্ব-বিখ্যাত কবি গিয়াং নাম, এলেন মুক্ত-শিল্পী-সমিতির সভাপতি হুয়েন মিন দিয়েং। দুটি কাজ তাঁদের। যাঁরা লড়াই করছেন, তাঁদের কাছ থেকে শেখা। তাঁদের কথা, অভিজ্ঞতা, আবেগ, অনুভূতিকে চয়ন করে শিল্প-সাহিত্যের

প্রাণ-মন্দিরে ঠাঁই দেওয়া। অন্য কাজ—গানে, কবিতায়, নাটকে সংগ্রামীদের উৎসাহ দেওয়া, উদ্দীপ্ত করা।

একটি সন্ধ্যা : একটি নাটক

সাহিত্যিক-শিল্পিরা এসে মুক্তিসৈনিকদের উৎসাহ দিচ্ছেন, দৃশ্যটা শুধু এমনি নয়। শিল্পীও সৈনিক, সৈনিকও শিল্পী হয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত, পালাক্রমে। পশ্চিম দেশের সাংবাদিক বার্চেট গিয়েছিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামে। সারা দেশ ঘুরে ঘুরে তিনি একেবারে সায়গনের দোরগোড়ায় এসে হাজির। সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল এক সান্ধ্যবাসরে। মুক্তিসেনার একটি অ-নামী শিল্পী সংস্থা গান গাইবে, নাটক করবে। অনুষ্ঠানটি যেখানে, তার মাইল আড়াই দূরেই ইয়াংকি গোলন্দাজদের একটি বড় ঘাঁটি। বার্চেট সেখানে পৌঁছে অবাক। অবিরত গোলাবর্ষণ, যুদ্ধ, অভাব, দূরত্ব—সব কিছু তুচ্ছ করে হাজার হাজার মানুষ সেখানে এসে হাজির। খোদ সায়গন থেকেও এসেছে অনেকে। বার্চেটের জন্যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তিনি ভেবেছিলেন, সেনাবাহিনীর শিল্পিদল তো ; হয় কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে নাচগান করবে, নয়তো বড়জোর মোটা অক্ষরের গরম গরম প্রচার নাটক চলবে। হায় রে, সব কটি গানই হল প্রাচীন ভিয়েতনামের লোকগাথা অথবা দেশপ্রেমের গান। আর হল জনাদুই বিখ্যাত মার্কিন লোকসঙ্গীত শিল্পীর গান। তারপর নাটক। কি নাটক? শেকস্‌পীয়রের 'হ্যামলেট'। নাটক শুরু হওয়ার আগে মুক্তিফৌজের উর্দিপরা একটি তরুণী এসে "হুকুম" দিয়ে গেল, নাটক হাজার ভালো লাগলেও কেউ যেন হাততালি না দেয়। হাততালির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ইয়াংকিরা গোলাবর্ষণ করতে পারে। অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে মাইল আড়াই দূরে ইয়াংকি গোলন্দাজদের বড় একটি ঘাঁটি। নাটক শুরু হল। প্রথম দৃশ্য থেকেই দারুণ জমে গেল। গাছের সারির মাঝখানে, মাটিতে বসে, হাজার হাজার দর্শক হাঁ করে যেন গিলছে। বার্চেট অভিভূত। কিন্তু আবেগের বান রুখবে কোন হুকুম? একটি দৃশ্যের পর হাজার মানুষ অকস্মাৎ আবেগে তুমুল হাততালি দিয়ে উঠল। আর যায় কোথায়? কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুরু হল গোলাবর্ষণ। গুম্ গুম্ শব্দে শেক্স্‌পীয়ার ভেসে গেলেন। সমস্ত মানুষ ছুটে চলল ট্রেঞ্চে! দর্শকরা নিজেরাই সারা বিকেল খুঁড়েছে এইসব ট্রেঞ্চ। বার্চেটকেও নিয়ে যাওয়া

হল একটা ট্রেঞ্চে। তিনি ফিসফিস করে তাঁর গাইডকে বললেন :

"ইস্, এমন জমেছিল! অনুষ্ঠানটা ভেঙে গেল তো ?"

তরুণীটি বৃদ্ধার গাম্ভীর্য নিয়ে উত্তর দিল :

"দেখা যাক।"

আধ ঘণ্টা কাটল। দেখা গেল আবার শুরু হয়েছে নাটক। যে-দৃশ্যের পর গোলাবর্ষণ, তার পরের দৃশ্য থেকেই শুরু হল। হাজার হাজার মানুষ আবার হাঁ করে গিলতে থাকল নিঃশব্দে। যেন কিছুই হয়নি।

সকলের জন্য তিনটি কাজ

মুক্ত-শিল্প-সংস্থা আর মুক্ত-শিল্পী-সমিতির সদস্যরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলছেন বছরভর। সঙ্গে তাঁদের বাজনা, সিনেক্যামেরা, কাগজ-কলম আর রাইফেল। নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে আছেন তাঁরা। গেরিলাদেরও সঙ্গ নিচ্ছেন। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে আর চাষের মাঠে, কিংবা কারখানায়। যখন চাষের কাজ শেষ, কারখানা বন্ধ কিংবা যুদ্ধে বিরতি—তখন তাঁরা চাষীদের জমায়েতে, মজুরদের সামনে অথবা সৈনিকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গান গাইছেন, আবৃত্তি করছেন, গল্প শোনাচ্ছেন, অভিনয় করছেন। বাকি সময়ে যুদ্ধের সরবরাহের কাজে, আহতের শুশ্রূষায় কিংবা সৈনিকদের পোশাক তৈরিতে ব্যস্ত তাঁরা।

হো চি মিনের নির্দেশে শিল্পীদের কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রত্যেকের জন্যে অবশ্য করণীয় তিনটি কাজ স্থির করে দিয়েছেন। যখন যেখানে থাকবে, তিনটি কাজ তোমাকে করতেই হবে। ট্রেঞ্চ খুঁড়তে হবে আশ্রয়ের জন্যে, ফসল ফলাতে হবে খাদ্যের জন্যে। অন্তত যাঁরা ফসল ফলাচ্ছেন তাঁদের সাহায্য করতে হবে। এবং আপনাপন পেশার কাজ করতে হবে। এ-নির্দেশ প্রত্যেকের জন্যেই। শিল্পিরাও বাদ নন। এইভাবেই কাটে সেখানকার শিল্পী-সাহিত্যিকের দিন-মাস-বছর। এইভাবেই গড়ে ওঠে সেখানকার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি।

বুলেট থেকে ব্যালাড

অসংখ্য কবিতা-গান-নাটক-গল্প-উপন্যাসের জন্ম হয়েছে একেবারে

যুদ্ধক্ষেত্রের আগুন-ঝলসানো মাটিতে। হুয়েন মিন সিয়েং তাঁর বিখ্যাত গান 'চলো পথে নামি' রচনা করেছিলেন যুদ্ধতপ্ত কুচি-তে। ওই কুচি-তে বসেই নুগুয়েন ভু রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত তিনটি স্কেচ 'জমি' 'জল' এবং 'বসন্ত'। লড়াই চালিয়ে যাওয়ার এবং বিজয় অর্জনের বিশ্বাসে দৃঢ় মানুষের কথা তিনি বলেছেন স্কেচ তিনটিতে। নুগুয়েন ভু কুচি-তে পরিচিত হয়েছিলেন এক যুবতীর সঙ্গে। তিনি তাঁর গ্রামের অন্য মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে রাইফেল হাতে ঘিরে ফেলেছিলেন ইয়াংকিদের একটি ব্রিগেডকে। তারপর নিশ্চিহ্ন করেছিলেন ব্রিগেডটিকে। এই যুবতীকেই দেখা যাবে নুগুয়েন ভু-র বহুপঠিত ও বহুভাষায় অনূদিত উপন্যাস 'গেরিলা মেয়েটি'র পাতায় পাতায় বিকশিত হতে।

সংগ্রামের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় সাহিত্য। আবার সেই সাহিত্যই লালন করে, দীক্ষিত করে সংগ্রামকে। নুগুয়েন ভু-র 'জমি'র জন্ম কুচি-র যুদ্ধক্ষেত্রে। কয়েকবছর পরে বেন্‌সুক্-এ 'জমি'কে আমরা দেখতে পাই অন্য এক ভূমিকায়। 'অপারেশন সেডার ফল্‌স্'-এর কর্মসূচী অনুযায়ী ইয়াংকিরা আর তাদের তাঁবেদার সেনাবাহিনী বেন্‌সুক্ শহরটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ট্যাংক বুলডোজার সবকিছু ব্যবহার করে। শহরবাসীরা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে লড়াই চালিয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ এক রক্তাক্ত সংগ্রামের পর আবার মুক্ত করে বেন্‌সুক্‌কে। এই সংগ্রামের নানা স্তরে, জয়-পরাজয়ের মুহূর্তগুলিতে কুচি-র সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ স্কেচ 'জমি' বারবার অভিনীত হয়। বারবার সে-অভিনয় সংগ্রামীদের পরাজয়ের বিষাদকে দূর করে দেয়, বিজয়ের উৎসাহকে প্রদীপ্ত করে। এর চেয়ে বড় সম্মান আর পুরস্কার একটি শিল্পকর্মের, একজন শিল্পীর, আর কি হতে পারে?

কিন্তু দর্শকরা শুধু দেখেই খুশী নন। শ্রোতারা নেহাত শুনেই তৃপ্ত নন। তাঁরাও কিছু করতে চান। দক্ষিণে ভিয়েতনামের প্রতিটি মুক্ত শহরে, স্বাধীন গ্রামে তাই অসংখ্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্থা গড়ে উঠেছে। তাঁরা নাটক-কবিতা-গল্প-উপন্যাস লেখেন, অভিনয় করেন। ছবি আঁকেন, গাছে গাছে ছবি টাঙিয়ে প্রদর্শনী করেন। গান রচনা করেন, সুর দেন। কারখানার মজুর, খামারের চাষী, সেনাবাহিনীর সদস্যদের মুখে মুখে ফেরে সে-গান। এ-এক মহাবিস্ময়। তীব্র যুদ্ধ, পায়ে পায়ে মৃত্যু। অথচ সৃষ্টির এক মহাউল্লাসে অস্থির [illegible] একটি জাতি। বিস্ময়কর সব উদাহরণ হাতের কাছে। কিন্তু

একটিমাত্র উল্লেখ করব। লংগান প্রদেশের একটি ছোট্ট গ্রাম। ইয়াংকিরা তাদের 'প্যাসিফিকেশন' কর্মসূচী নিয়েছে। কাজেই গ্রামটির ওপর প্রায়ই বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে, গোলা ছোঁড়া হচ্ছে, সেনাবাহিনী এসে হানা দিচ্ছে অতর্কিতে। গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ করছে দাঁতে দাঁত দিয়ে। এই অবস্থাতে সেখানে গড়ে উঠল তিনটি শিল্প-সংস্থা। একটি বড়দের, দুটি শিশুদের। এদের স্লোগান হল—মাটি আমাদের মঞ্চ: কেরোসিন আমাদের আলো। লড়াই যখন সমানে চলছে, গ্রামের মানুষ যখন জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে, কিংবা ইয়াংকিদের হাতে বন্দী হয়েছে গোটা গ্রাম—তখনও বন্ধ থাকেনি এদের অনুষ্ঠান। মোট ১৬৪টি অনুষ্ঠান হয়েছে লড়াইয়ের কয়েকমাসে, তার ভেতর ৭৬টি স্থানীয় শিল্পীদের রচনার ভিত্তিতে। —এ-স্রোত স্তব্ধ করবে কে?

কয়েকটি ফুল : কয়েকজন মালি

এইভাবেই গড়ে উঠছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের গণসাহিত্য, গণশিল্প। ভিয়েতনামের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা বলেন এইটেই ভিয়েতনামের ঐতিহ্য। হো চি মিনের কাহিনী যাঁরা ভালো করে জানেন না, তাঁরাও জানেন সেখানকার সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে সেরা সৈনিকটি আবার সবচেয়ে সেরা কবিদেরও একজন। এই ঐতিহ্যের ধারায়, এই পরিবেশে আর শিক্ষায়, মুক্ত ভিয়েতনামের শিল্পিরা তাঁদের সংগ্রাম আর সৃষ্টির কাজ করে চলেছেন। এ-দুটি তাঁদের কাছে একই বৃন্তে দুটি ফুলের মতো, একই স্রোতে দুটি ঢেউয়ের মতো।

গিয়াং নাম

গিয়াং নাম-এর নাম ভিয়েতনামের ঘরে ঘরে আদৃত। ভিয়েতনামের বাইরেও তাঁর সাহিত্যকৃতির খ্যাতি সুপরিচিত। ষোল বছর বয়সে তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দেন। সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন তিনভাবে। একদিকে জীবিকার জন্যে, অন্যদিকে মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে কঠিন সংগ্রাম। সেই সঙ্গে সাহিত্যের জন্যে যুদ্ধ। পিওনের কাজ করেছেন তিনি, রিক্সা চালিয়েছেন, রবারের বনে মজুরের কাজ করেছেন, দোকানের খাতা লিখেছেন। কি-না করেছেন বেঁচে থাকার জন্যে। এরই সঙ্গে সঙ্গে গণসংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। আবার কবিতাও লিখেছেন। তিনি যখন ইয়াংকিদের হাতে লড়াই করেছেন, তখন তাঁর স্ত্রী এবং পাঁচ বছরের সন্তানকে ইয়াংকিরা ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করেছে, জেলে পুরেছে। কিন্তু গিয়াং

ভেঙে পড়ার বদলে জলে উঠেছেন ক্রোধে, ঘৃণায়, প্রতিজ্ঞায়। সেই ক্রোধ-ঘৃণা-প্রতিজ্ঞা তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে যেমন পরিস্ফুট, তেমনি প্রকাশিত তাঁর রাইফেলের প্রতিটি নির্ভুল নিশানাতে। কুচি এলাকায় ছুটে গেছেন তিনি। রাইফেল আর কলম চালিয়েছেন একসঙ্গে। লিখেছেন তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 'অগ্নিক্ষরা মাটি'। তারপর ছুটেছেন দা নাং-এ। কুয়াং নাম প্রদেশের মানুষ তখন অবরোধ করেছেন দা নাং। অবরোধ সংগ্রামে অংশ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন অসংখ্য কবিতা, গল্প। তারপর আবার ফিরে গেছেন লংগান-এ। পত্রিকা চালিয়েছেন। সেই সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন ভিয়েতনামের প্রাচীন কবিতাবলী যা তাঁকে সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করে রাখবে। গিয়াং নাম-এর একটি কবিতার কয়েকটি লাইন :

আমার দেশকে / আমার মাতৃভূমিকে / আমি আজও ভালোবাসি / কারণ,/ এই দেশের প্রতি মুঠো মাটিতে / মিশে আছে / আমাদের পাশের বাড়ির / সেই মেয়েটির / রক্ত আর মাংস এবং··· / সেই মেয়েটি, যাকে আমি / ভালোবাসি। / সময়ের কিংবা মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে / যাকে / আমি ভালোবাসি।

নগুয়েন চি ত্রাং

'প্রত্যেকের জন্যে তিনটি কাজ' কর্মসূচী অনুযায়ী ত্রাং চলে গেলেন পাহাড়ী গ্রামে। সেখানে মাটি কঠোর, জলের অভাব। নুন পাওয়া যায় না বললেই চলে। তবু যা হোক করে গুছিয়ে বসেছেন ত্রাং, এমন সময়ে শুরু হল ইয়াংকিদের বিমান হানা। টেঞ্চ খুঁড়ে সবাই মিলে আশ্রয় নিলেন সেখানে। শুরু হল রাইফেল হাতে নিয়ে উড়ো জাহাজের সঙ্গে লড়াই। এইরকম একটা পরিবেশে তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মাক্ গাঁয়ের চিঠি।' পাহাড়ী মানুষের মন, হৃদয়, প্রেম আর সংগ্রামের ছবি। এতে তিনি দেখালেন, কেমন করে শুধু রাইফেল হাতে নিয়ে পাহাড়ী মানুষগুলো রুখে দিল ইয়াংকিদের বিমান আক্রমণ। এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাঁর উপন্যাসের তরুণ নায়ক নাত্। স্বপ্ন তার দুই চোখে। মমতা তার প্রতি রক্তবিন্দুতে। পাহাড়ের একটা খাঁজে রাইফেল হাতে... "নাত্ মাটিতে পড়ে, সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে। হঠাৎ তার ক্ষেতে আগুন জলতে আরম্ভ করল। লাফ দিয়ে উঠল নাত্। ব্যথায় আর রাগে

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সে। তার দু-চোখ বন্ধ হয়ে গেল। এতো গরম কেন? চোখ মেলে তাকাল নাত্। তার ক্ষেতের ফসল পুড়ছে। কাসাভা, ভুট্টা। চিট্‌পিট্ শব্দ হচ্ছে, দাউ দাউ করে জলছে। অসহায়ের মতো নাত্ তাকাল চারপাশে। একটা কিছু খুঁজছে। কিচ্ছু নেই। সব শূন্য। তারপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল হাতের রাইফেলের নলের ওপর। নলের মাথায় মাছিটার ওপর। স্বপ্নের মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গিয়েং-এর মুখখানা। তরুণী, মিষ্টি মুখ। নতুন মা হয়েছে। বাচ্চাটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে পাহাড়ী পথে ছুটছে গিয়েং। ভয়ে, আতঙ্কে তার চোখদুটো বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। তার মাথার ওপর ঘুরছে ইয়াংকিদের একটি উড়োজাহাজ। ক্রমাগত মেশিন-গানের গুলি। গিয়েং পালাতে চাইছে। দৌড়চ্ছে। মাথার ওপর এসে পড়েছে উড়োজাহাজটা। একটা চীৎকার। বুকটা ফেটে গেল। গিয়েং পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল নিচে, গভীর অন্ধকার খাদের মধ্যে। বুকে তার তখনো দু-মাসের বাচ্চাটা।··· নাত্ কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। সব ঝাপসা লাগছে। শহর থেকে আসা সেই ছেলেটির কথা মনে পড়ছে। '···পদাতিক বাহিনীর জন্যে আছে আমাদের ফাঁদ। বিমানহানার বিরুদ্ধে আমাদের রাইফেলই ব্যবহার করতে হবে।' রাইফেল···গিয়েং···ইয়াংকি বিমান···। নাত্-এর মাথার ওপর গুড়গুড় শব্দে ভেসে উঠল একটি উড়ো-জাহাজ। নাত্ দুই হাতে তুলে নিল রাইফেল। গিয়েং, তার কানের কাছে গিয়েং, ফিস্‌ফিস্ করছে: 'চালাও, নাত্, গুলি চালাও, এইটেই সেই উড়ো-জাহাজটা। চালাও, নাত্, চালাও···'।"

আন্‌হ্ ডুক্

একদিকে সৃজনশীল শ্রম, অন্যদিকে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—তাদের সংগ্রামে, আনন্দে ও বেদনায়—একাত্ম হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ভিয়েত-নামের সাহিত্যিকরা এক সীমাহীন সম্পদশালী বাস্তবতার অন্তরের স্পর্শ পেয়েছেন। আন্‌হ্ ডুক-এর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'হন্ দাত্' তারই স্বাক্ষর। ১৯৬৫ সালে উপন্যাসটি 'নগুয়েন দিন্ চিউ সাহিত্য পুরস্কার' পায়। মেকং ব-দ্বীপে কঠিন জীবন যাপন করার সময় রাইফেল হাতে নিয়ে গেরিলাদের সহযোগি-তায় ব্যস্ত থাকার অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে ডুক এই উপন্যাসটি লেখেন। হন্

দাত, একটি গ্রামের নাম। ছোট্ট এই গ্রামটি মুক্ত ভিয়েতনাম থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পরও দিনের পর দিন লড়াই চালিয়ে যায় কুখ্যাত ন্গো দিন দিয়েম-এর সেনাবাহিনীর সঙ্গে। তাদের বীরত্ব আর আত্মত্যাগের ছবি এই উপন্যাস। এই উপন্যাসে তুক্ এমন কয়েকটি আশ্চর্য চরিত্রকে প্রাণ দিয়েছেন, বিশ্বসাহিত্যের আসরে যারা অনায়াসেই স্থান করে নিতে পারে।

মেকং ব-দ্বীপের স্থানীয় একটি সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনার ভার ছিল তুক্-এর ওপর। স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রবন্ধও লিখতে হত তাঁকে। ছাপাখানার দেখাশোনার কাজ থেকে আরম্ভ করে বাঁশ থেকে কাগজ তৈরি পর্যন্ত সবই করতে হত তাঁকে। এর ওপরে ছিল প্রতিদিন বোমাবর্ষণ। ফলে প্রায়ই তাঁকে ছাপাখানা সরিয়ে নিয়ে যেতে হত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এতসবের মধ্যে যখনই তিনি সময় পেতেন, বসে যেতেন কাগজ-কলম নিয়ে। দশ বছর বয়স থেকেই বোমা আর যুদ্ধের আগুনের মধ্যে বেঁচে থাকার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছে তাঁকে। এই জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে যখন প্রকাশিত হল তাঁর উপন্যাস, কয়েকমাসের মধ্যে এক লক্ষ কপির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেল। বেআইনী পথে চালান হয়ে খোদ সায়গনেও বিক্রি হল হাজার হাজার কপি। তারপর হানয় দায়িত্ব নিল। ছাপা হল লক্ষ লক্ষ কপি। অনূদিত হল বিশ্বের নানা ভাষায়। আজও সে-উপন্যাস গেরিলাদের ছোট্ট ঝোলায় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে ঠাঁই পায়।

ন্গুয়েন তুক্ থুআন

সায়গন কর্তৃপক্ষের জেলখানা আর বন্দীশিবিরে থুআনকে কাটাতে হয় নারকীয় ছটি বছর। মাকিন "পরামর্শদাতারা" এইসময়ে প্রতিদিন তাঁর ওপর নানা ধরনের নতুন নতুন নিপীড়নের "পরীক্ষা-নিরীক্ষা" চালায়। নিজের আদর্শ ত্যাগ করে, একটি কাগজে সই করে তিনি জানিয়ে দিন-যে এরপর থেকে "ভদ্রজীবন" যাপন করবেন—এই ছিল তাদের দাবি। তাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে স্থূল শারীরিক পীড়ন থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম মানসিক অত্যাচার পর্যন্ত কোনো কিছুর প্রয়োগই বাদ যায়নি।

১৯৬৩ সালে সায়গনে সরকার পরিবর্তনের সুযোগে তিনি অত্যাচারের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর বহু-পঠিত 'বিজয়ী' গ্রন্থে এই ছ-বছরের অভিজ্ঞতায় বর্ণনা দেন। অসাধারণ তাঁর

বর্ণনাকৌশল। একটি নরকের বীভৎস চিত্র আর কয়েকটি মানুষ কিভাবে শুধুমাত্র মনের জোর আর বিপ্লবী আদর্শকে সম্বল করে সংগ্রাম করে যাচ্ছে সেই নারকীয় বীভৎসতার বিরুদ্ধে, দীর্ঘ গ্রন্থটির এই হল উপজীব্য। নানা চরিত্রের ভিড়। সবল, দুর্বল, বীর, কাপুরুষ সবাই আছে এতে। আর আছে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হওয়ার দৃঢ় আশাবাদ আর বিশ্বাস। এমন ধরনের গ্রন্থ, এমন অনবদ্য সাহিত্যশৈলীতে সমৃদ্ধ হয়ে বছর বছর লিখিত হয় না।

আরো অনেকের কথাই বলতে ইচ্ছে হয়। 'কৃসানু বন্' এর লেখক ন্‌গুয়েন ফং থান কারো চেয়ে কম প্রসিদ্ধ নন—যেমন তাঁর সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, তেমনি তাঁর কলমের জোর। বিশিষ্ট কবি ফ্যান মিন দাও। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হয় তাঁকেও। কবিতা লিখে যান সেই অবস্থাতেও। মাসের পর মাস তাঁকে কাটাতে হয় শুধু গাছের পাতা আর বুনো শিকড় খেয়ে। তবু এই সময়ে লেখা তাঁর কবিতাগুলিই সেরা বলে সমাদৃত। অসীম আশাবাদ প্রতিটি কবিতার প্রধান সুর। জনগণ এবং সংগ্রামীদের মন-হৃদয়-বোধ-বৃত্তি সেগুলির উপজীব্য। এঁরা কেউ একলা নন। মুক্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্বত্রই আছেন এঁরা। এঁরা অসংখ্য। এঁরা সীমাহীন, অন্তহীন।

চিরকালের ভিয়েতনাম নতুন করে জন্ম নিচ্ছে প্রতিনিয়ত বিপ্লবের জঠর থেকে। তারই সন্তান এইসব কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর দল। কাজেই, এঁদের শিল্পকর্মে কোথাও অবসাদ নেই, হতাশা নেই। বিকৃতির কোনো ঠাঁই এখানে নেই। ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন আগুনে তেতে ওঠা শক্ত মাটিতে। দাঁড়িয়ে আছেন জলে ডুবে থাকা ভিজে জমির ওপর। সেই আগুনে আর জলে দিনরাতই সজীব প্রাণের তাথৈ তাথৈ। সাহিত্যে-শিল্পেও তাই প্রাণের দুরন্ত স্পর্শ। ওঁদের সংস্কৃতিতে জড়ের স্থান কোথায়, গলিত শবের গন্ধ আসবে কেমন করে? ওদেশের শিল্পিদের যে একহাতে অর্জুনের গাণ্ডীব, অন্য হাতে সরস্বতীর বীণা।

ছাগল

অশোককুমার সেনগুপ্ত

ধরম বুকলেপ্টা করে ধবধবে সাদা বেড়াল বাচ্চার মতো ছানাটাকে নিয়ে ঘরে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলেছিল, বাবাগো, চাঁদির বিটা হনছেক। গর্ভের সুতোকাটা আঠার মতো লালা এবং ছিটেফোঁটা রক্তবিন্দু তার কালো বুকে পেটের কিয়দংশে লেগে চকচক করছিল। ছানাটার মাতৃগর্ভ থেকে ছিনিয়ে আনা গোলাপী কিঞ্চিৎ মোটা এবং দীর্ঘ শিকড় দোল খাচ্ছিল, ধরমের নোংরা প্যান্টের সঙ্গে একটা চিটিয়েও গিয়েছিল। ছানাটা নীরব। প্রসব-ক্লান্তা চাঁদি রক্ত ঝরাতে ঝরাতে অতি ক্ষীণস্বর ম্যা ম্যা ম্যা বিলম্বিতলয়ে পিছন পিছন ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিপুল আগ্রহে এগিয়ে আসছিল। তখনই ভুবন চাঁদি ধরম এবং নবজাত ছানাটার উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে খেঁকিয়ে উঠেছিল, নামা। নামা। ছিঃ ছিঃ ছুঁড়া ছা ট মেরে দিলেক হে। ততক্ষণে ধরম নামিয়ে ফেলেছে। দুটা হাতের তালু ঘষছে। চটচটে আঠা। তার উজ্জ্বল আনন্দিত চোখে বিস্ময়। দশ বছরের কালো রোগাটে গালফোলা মুখে নাকের ডগায় উত্তেজনার পরিশ্রমের বিন্দু বিন্দু ঘাম। তখন খৈ খৈ বৈশাখের বিকেলবেলা। তবে ঝড় জল বজ্রাঘাত, সূর্যপ্রদীপ নিভিয়ে প্রকৃতির অমিত বিক্রমে যুদ্ধ নেই। আকাশ-বাতাস আশ্চর্য স্থির শান্ত। যেন চাঁদির মতোই অদ্ভুত ক্লান্ত। মরা রোদ সামনেকার খেলকদমের বিশাল গাছে বিকেলের টিয়াদের জটলা, ঘরের কালো হয়ে যাওয়া খড়ের চালে কাকের ডাক, অনেকদূরে একটা বাছুরের হাম্বা রব এবং তার সঙ্গে এধার ওধার থেকে আসা উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ ধুলোমাখা খোকাখুকি, পাড়ার উৎসাহী রমণীরা এবং ভুবনের সহধর্মিনী কাঁখে সর্বশেষ ঈশ্বরের দান রিকেটগ্রস্ত কন্যাসন্তান নিয়ে, আমি জানতাম, আজি হবেক···ই বাবা ছা হল নাকি গো···পাঁঠা না পাঁঠি বটেক······তেলকালি লাগিন দাও···শুন, ঠাণ্ডা জল দিস না। বট পাতা খাওয়াবি ··মাগীর বিয়েন খি ঢেক খিদে লো ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ ভুবনের উঠোনে উৎসবের আবহাওয়া এনে দিয়েছিল। তখনই ধরম বাবাকে সেই রক্ত এবং গর্ভের লালা মাখা শরীর দিয়ে জড়িয়ে বলে উঠেছিল, বাবাগো, ইকে তুমি বিচবে নাই। ই আমার খুকা বটেক।

এখন শরৎ। চতুর্দিকে পুজোর রঙ। আকাশ পরিচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে লালমাটি মাখানো এবং খড়ি দেওয়ার সোঁদা একটা গন্ধ দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। অগণন শস্যক্ষেত্রেও সবুজের বিপুল সমারোহ। সবুজতায় ঈষৎ ফ্যাকাশেভাবে ধানের শীষ বুকের দুধের ভারে নুয়ে নুয়ে পড়ে। বর্ষার টালটমাল জলে পুকুর ডোবা এখনও থৈ থৈ। পথের কাদা শুকিয়ে গরুর গাড়ির চাকায় বর্ষায় কুমোরের মাটির মতো যে হয়ে উঠেছিল, তা অসংখ্য নালার আকৃতি, উঁচু নিচু, পেঁজা তুলোর মতো, অথচ কঠিন শক্ত। সব গোলা শূন্য। আগামী ফসলের জন্যে তীব্র পিপাসায় চাষী সকাল-বিকাল শস্যক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ায়। চালের দাম শীর্ষবিন্দুতে। হা-অন্নের ছবি এখন অধিকাংশ সরল কালো পাংশু মুখগুলিতে, শুকনো ঠোঁটে, চোখে। ইতিমধ্যে সুখী—ভুবনের সহধর্মিনী, ধরমের জননী, ষষ্ঠতমা রিকেটগ্রস্ত কন্যাসন্তানকে যার স্বামী কোল থেকে ছিনিয়ে কাঁদরের ভেজা মাটির অন্ধকার গর্তে দিয়ে এসেছে—সে শোক, ওগো ই কি হল গো বুক ফাটা কান্না, একবেলা ভাত মুখে না-দেওয়া বিস্মৃত হয়ে স্বাভাবিক জৈবিক নিয়মে গর্ভের অন্ধকারে আবার একজনকে স্থান দিয়েছে। ভুবনের মুখ আরও দুঃখী হয়েছে। পরাণের বাপ, যে বেটার ভাত পেত না, ভিক্ষে করত, সে রাতে চালচাপা পড়ে মাটি হয়েছে। কুমুদ দু-কানা যৌবনের বান নিয়ে বিধবা হয়ে এসে এখন পাকুড়তলায় সন্ধ্যেবেলাতে ভবা বাগদীর মেজছেলের হাত ধরে খিলখিলিয়ে হাসে, ই বাবা এতেক লাজ কেনে গো তুমার। হায় হায় মাটির আশে এসে খালি মাটি দেখলে, মেয়েমানুষ দেখলে নাই। কানাই বিহারে বর্ষায় ধান চালান দিয়ে সিগারেট ফোঁকে, ট্রানজিস্টারে বাজায়, ও মেরে নয়না। এবং ধরম তার খুকার মসৃণ পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, অ আমার খুকা, ধান উঠুক—তা বাদে তুর জামা দুব। গয়না দুব।

ধরম পেটে ভিজে ভাত, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা পুরে পাঁজরার নিচেটাকে ঈষৎ ফুলিয়ে ঘর থেকে বের হল। এখন গাঢ় মধ্যাহ্ন। গ্রীষ্মের মতো দাহ। আকাশের উঠোনে সূর্য দাউ দাউ করছে কাঁচা কয়লার উনুনের মতো। বাতাস রোদপোড়া। ওদিকে একটা ডাহুক ডাকছে। ঘুঘুচ্চো ঘুঘুচ্চো করে একটা ঘুঘু সামনেকার আতাগাছের একটা কাকের সঙ্গে তর্কে মেতেছে। তার ভাইবোনগুলো, সংখ্যায় বর্তমানে যারা পাঁচ, কাদামাটি নিয়ে উঠোনে খেলছে। গোটা কয়েক ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব কটিই ভুবনের ছাগল।

পালুনি নিয়ে তার সংসার স্ফীত। জন্মনিয়ন্ত্রণ নয় জন্মবৃদ্ধিই তার ব্যবসার ধর্ম। বামুনঘর থেকে—সদাবা মুন, ওই যে উঁচুপাড়ায় থাকে—খালি গায়ে নামাবলি উড়িয়ে ফুলবেলপাতা ঠাকুরের মাথায় চড়িয়ে বলে, ধর্মকর্ম গেল হে দেশ থেকেন, দেবতাকে বিশেস নাই, সে বলেছিল, ভুবন এই পাঁঠি ট পালুনি লাও। ছা হলে আধা ভাগ। পেথমকার আমি, পরের ট তুমি। তা বাদে পাঁঠা-পাঁঠি যা হয়। তা ভুবনের ভাগ্যে পাঁঠি হয়েছে। সেই সূত্রপাত। এখন কালো সাদা খয়েরী রঙের অনেকগুলি ছাগ ছাগী ভুবনের সন্তানগুলির মতো খায় দায়, মলত্যাগ করে ম্যা ম্যা করে, কুঁই কুঁই করে। পাশাপাশি দু-খানি ঘর। এক ঘরে গাদাগাদি করে ভুবন, অন্য ঘরে গাদাগাদি করে ছাগকুল নিশিযাপন করে। এবং প্রত্যূষে উভয় ঘরই খালি হয়ে যায়। উভয় ঘরেরই একমাত্র কর্তা ভুবন। বয়স চল্লিশোত্তীর্ণ, কাঁচাপাকা চুল, ঈষৎ লম্বাটে মুখ, কণ্ঠার হাড় বের হয়ে থাকে, প্রত্যেকটি শিরা উগ্র হয়ে প্রকটিত, উঁচু দাঁত, সব সময় লাল ছোপ পড়া সেই দাঁত খিঁচিয়েই থাকে। অসম্ভব রাগী। ছাগল-গুলোর মতোই সন্তানদের উপর লাথিবর্ষণ করে, শালার জাত মেরে দিলেক হে। অাঁ ভগমান, বুকের তলাতে খালি একটা থলে দিন-ছে? শালার থলে কুনু কালে ভরে না। তা সত্যিই ভরে না। থলে ভরাতে ভুবন ক্লান্ত বিপন্ন এবং ক্ষয়প্রাপ্ত। দেহ মন সব যেন নিয়ত ঘষা খায়। ভুবন ঈশ্বরকে অভিশাপ দেয়।

ধরম ঘরের দাওয়ার দিকে একবার তাকাল। উনুনশালে ধোঁয়া উঠছে। ভুষের ধোঁয়া, ভুষগুলো না জ্বললে কেমন যেন কালো হয়ে পুড়ে যায়। ওদিকে আবার ঝোপের পাশে কুমুদপিসীর ঘরের ভেতর থেকে পুঁটিমাছ ভাজার অাঁশটে নিবিড় গন্ধ ঝলক ঝলক বাতাসময়। ধরম গোঁফের কাছটা নাকের ফুটোয় ঠেকিয়ে গন্ধটা টানল। কুমুদপিসি দিন কয়েক সন্ধ্যেবেলা অাঁচল বিছিয়ে সুর করে কাঁদত। এখন পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে হাসে। চারদিকে খড়ের চাল, মাটির ঘর, কালিপড়া হাঁড়ি, ছাইয়ের গাদা, অাঁকড়ের ঝোপ, চড়াইয়ের কিচির মিচির, রোদ, ছায়া। ওদিকে বিন্দাখুড়ো গলা লম্বা করে টিনের ফাঁকে দেখছে। কানাইদার ঘর বন্ধ। এখন কানাইদা বাবুলোক। ঘরে গান বাজে। সিগারেট খায়, জামা পরে। খালি গায়ে কানাইদা জনের কাজ করত। তারপর ধান চালান দিতে থাকল বিহারে। আয়েসবাস, সন্ধ্যেবেলাতে তখন ঘরে কি হাসি, মদের ভকভকে গন্ধ। কানাইদা

বাবাকে বলত, খাও গো ভুবনদা, একটুস খাও। তেতো লয়, সিউড়ীর মাল বটেক। পরাণদার বাপের ঘরটা এখনও হুমড়ি খেয়ে আছে। মাটির দেওয়াল নুয়ে মোমবাত্তির মতো গলছে। বাঁশগুলো লোকে পোড়াল। খড় গরু। পরাণদা এসে গাল দিয়েছিল। ধরম একটুকরো বাঁশ কুড়িয়ে এনেছিল। কি ভয়। পরাণদা কোমরে হাত দিয়ে বলেছিল, যে হারামজাদা হারামজাদীরা নিনছেক, বাপের পারা তারা ঘরচাপা পড়বেক। ধরম ঘাড়ের উপর খড় নেওয়া অবস্থায় ঘামে জবজবে শরীরে বাঁশের টুকরোটা সন্ধ্যেবেলায় ছুঁড়ে দিয়েছিল।

ধরম ছোট ছায়া ফেলে এগিয়ে চলল। ঘরের পিছনেই ডোবা। পাড়ে তালগাছ। ডোবার ঘাটে মা এখন উবু হয়ে বসে কড়াই মাজছে। জলে কড়াইয়ের কালি ভাসছে। ওধারে একটা বক চুপচাপ বসে। মায়ের শরীর দুলছে। ঘষ ঘষ ঘষ। ওদিক থেকে মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে মুচিবৌ—অ ধরমের মা, কড়াই মাজছ বিলাতে। মা চোখ তুলে তাকাল। মুখে ঘাম। মাথায় ঘোমটা নেই। শুকনো বাদামী চুল, সিঁথিটায় সিঁদুর ছড়ানো, দু-পাশের চুল খাওয়া। কান খালি, হাতে পিতলের চুড়ি। ফোলা ফোলা চোখ মুখ হাত পা। মা এবার ফুলছে। চোখ হলদেটে, ঠোঁট ফ্যাকাশে। কুথা ধান নিন চললে মুচিবৌ—বলতে ধরমের উপর চোখ পড়ল এখন। ধরম নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে যেন। অথচ চোখ খুকাকে খুঁজছে। চারিদিকে সামনে ধানক্ষেত। সবুজ ধানের ঢেউ। বামুনঘর যাব দিদি বলে বৌ ধরমকে দেখল। মা বলল, আ বাবা ধরম, মুচিবৌয়ের সাথে একবার যাস কেনে, উ লাউশাক দিবেক। বাড়া ঝাল খেতে মুন হচ্ছেক। মুচিবৌ হাসল, অরুচি। ধরম মা বৌ থেকে চোখ সরাল। ডোবার ঘোলা জলে একটা মাছ লাফাল। চিল বসল তালের পাতায়। খর খর শব্দ। ধরম বলল, এখুন যেতে পারব নাই। খুকাকে খুঁজতে হবেক। মুচিবৌ বিস্মিত সপ্রশ্ন চোখে চাইতেই মা কোমর ভাঙতে উঠে দাঁড়াল। গায়ের কাপড় ভেজাহাতে নাড়ল চাড়ল না, ঢাকা দিল না, বুক পেটের ফোলা মসৃণ কালো চামড়ায় ছিটেফোঁটা জল। মুখে গর্বের হাসি নিয়ে, আর বলো না বৌ, খুকা হচ্ছেক ওই সাদা ছা ট। পাঁঠা বটেক। বিটা আমার প্যাটে করে খালি দিন্ নিন্ ঘুরে। তা উদ্দি-লেগে [illegible] খালি হল না উ ট। ভুরাজের লুক [illegible] উর বাপ বলছেক, [illegible] ছেলে খেয়েছেক, [illegible]; উ ট পাঁঠাই হোক, বলে মা ধরমের দিকে

তাকাল। মুচিবৌ খুব উৎসাহী হলো না। লাউশাক আনতে পাঠিন দিও—বলে চলতে শুরু করল। মা আবার বসল। খড়ের নুড়ি দিয়ে ঘষর ঘষর আওয়াজ, তার সঙ্গে গলার স্বর নামিয়ে নিচু মুখে—অ বাপ ধরম, ছাগলগুলার দিকে নজর রাখিস। অ, বাপ কুথা গেল তুর? হ্যাঁ রে, লাউশাক আনতে যা কেনে তু—বলে চলল। ততক্ষণে ধরম পাশের উঁচুপাড়ের কালোপুকুরে উঠে পড়েছে। হাঁড়িফেলায় দাঁড়িয়ে দেখছে, ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। খুকা কোথায় লুকাল? বড় চালাক। তার মুখে সুখের হাসির বিচ্ছুরণ। খুকা ধানের ক্ষেতের ভিতরে ঢুকে ইঁদুরের মতো দাঁত দিয়ে কুটুস কুটুস খায়। জাগালির চোখ পড়ে না। খুকা—বলে চিৎকার করে উঠলে সবুজ সমুদ্রের ভিতর থেকে ম্যা ম্যা করতে করতে ছুটে বেরিয়ে আসে। ধরম বুকে করে দে ছুট। ল্যাঠি হাতে জাগালি—এই হারামজাদা, বাপের ধান খাওয়াচ্ছিস। ই তুর বাপের জমি বটেক। ধর ত বিটাকে।—বলে ধানক্ষেতের ভেজা আলের কাদা প্যাচ-প্যাচানির মধ্যে ছুটে হাঁটু অব্দি কাদা মাখামাখি করে দাঁড়িয়ে পড়ে। গলা উঁচু করে খিস্তি দেয়। আর ধরম তখন ভাঙা ঘরে কি পুকুর-ডোবার গাবায় খুকাকে কোলে বসিয়ে চুমু খায়। বলে, মাঠে নামবে নাই খুকা। ধরতে পারলে উরা মারবেক। তুমাকে খুয়াড়ে ঢুকিন দিবেক। খুকা বুকের পেটের ভিতর থেকে ম্যা করে যেন অভিমানের স্বর বের করে। লাল মুখ নাড়ায়, গলা লম্বা করে। কোলের উপর সরু সরু চারপায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। অয় দেখ—ধরম বলে, আবার যাবার লেগে লাফাচ্ছেক। ই পাশে ঘরে আমি বটপাতা এনে রেখেছি।

অরে খুকা। হাঁ বড় করে লাল ছোপপড়া দাঁত বার করে আলজিভ দেখিয়ে ধরম সামনেকার ধানক্ষেতগুলোর দিকে চিৎকার ছুঁড়ে মারল। একবার, তারপর বার কয়েক। খুকার সাড়া নেই। চতুর্দিকে রোদ জ্বলছে, বাতাসে ঢেউ। কালো পুকুরের ও-ঘাটে চান করছে মেয়েমানুষ, একটা ময়না ঠোঁট ডুবিয়ে জল খাচ্ছে, একটা বাছুর আবার ঘাস চিবুচ্ছে। গা এবার জ্বলছে। রোদের তাত সর্বাঙ্গে। ছেঁড়া প্যান্টের ভিতর ঘাম। একটা ঢেকুর উঠল। পেঁয়াজের গন্ধ। বাপ আজ সকালেই খয়েরী খাসি বিক্রি করেছে। খুকাকে তার সঙ্গে দিল নাকি? সদা ভয়, বুক দুরু দুরু, অ আমার খুকা। ধরম কালো পুকুরের উঁচুপাড়ের শুকনো ঘাসে পা ঘষল। পিঁপড়ের সার। লাফিয়ে সরল ও। একটা পা তুলে শরীর বেঁকিয়ে একটা

পিঁপড়ের মরণপণ চামড়া ধরাটাকে ঘষে ধুলো করে দিল। শালা। বাপকে বিশ্বাস নাই। দাঁত বার করে হাসে, লাথি ছোঁড়ে, হাটে ছাগল বিক্রি করে। ধরম যেন পাড়ের উপর থেকে একটা খড়্গের দ্রুত নেমে আসা, লাল টকটকে রক্তস্রোত, মুণ্ডহীন দেহের ছটফটানি দেখতে পাচ্ছিল। সেই যে কালো খাসিটা, বাপ বলত সোনা, বটপাতা খাওয়াত, তাকে নিয়ে কি হাঙ্গামা। পাঁচ সের হবেক—বলে বাপ। উরা বলে, চার সেরের বেশি হবে না। তা কাটাছাঁটা হলো। ভুঁড়ি বাদ, চামড়া বাদ, মুড়ো বাদ, পাক্কা পাঁচসের। বাপের তখন কি হাসি। উরুতে চাপড় বসিয়ে বলেছিল, আরে বাপু, কতদিন উকে কুলে নিন্‌ছি আমি। উ ট আমাব পিয়ারের ছা ছিল যে। তা উর কতটো মাংস হবেক তা জানব নাই? খলখল শিয়ালের মতো হাসি। মুখে পেঁয়াজের গন্ধ, মাথায় তাত, দুচোখে অন্বেষণ—খুকা রে। এখন ধরম পাড়ের উপর দাঁড়াতে পারছিল না। পা যেন টলছিল। খুকা রে—ডাকাটা আর দুঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বার হয়ে এই থিকথিকে মধ্যাহ্নে ছুটে বেড়াচ্ছিল না। বুকের ভিতর গুড়গুড় গুড়গুড়।

অয় ছুঁড়া! নীল লুঙ্গি, ধবধবে সাদা গেঞ্জি, লম্বাটে মুখ, কালো রোগা চেহারা, পান খাওয়া লাল ঠোঁটে বিড়ি নিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে এসে ভ্রূ কুঁচকে বলল, তু কার বিটা বটিস? অঁ। আচমকা ডাকে ধরমের বুকের ভিতর থরথরানি। ফোলা গালে এখন ঘাম। চেনা চেনা তবু অচেনা মুখ। পদাই বাবুর মতো মুখটা। ও পাড়ার পদাই কাকা। পদাই কাকা বামুন ঘরে চাষ করে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে তাদের ঘরে। কাকী বর্ষায় মরেছে। এখন ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে। ঘরে এসে বলে, সুখে আছ ভুবনদা। তুমি ঢেক সুখে আছ। ধরম মানুষটার ছায়ার দিকে চোখ রেখে বলল, আমি ভুবনের বিটা বটি। যেন বেত খেয়ে তিড়িং করে চিংড়িমাছের মতো লাফিয়ে ওঠে মানুষটা, দেখ দেখিন, চিনতে পারি নাই। তা বাপ কুথা, তুর বাপ কুথা রে ছুঁড়া? জানি নাই—বলে ধরম ছায়া থেকে মুখ সরাল। জলের ভিতর থেকে একটা পানকৌড়ি উঠে ফড়ফড় করে কালো দেহ নিয়ে উড়ে গেল। ওদিকে বাছুর গাবায় ঘাস খাচ্ছে। ধানক্ষেতে বাতাসের ঢেউ। চতুর্দিক আলোয় আলোকময়। আকাশে পেঁজা তুলোর মতো ছাড়াছাড়া মেঘ। ওদিকে পাখির ওড়াউড়ি, একটা ঘুঘু ডাকছে, তালগাছে পাতার খরর খরর। পুকুর-ঘাটে জলে দাপাচ্ছে একটা ন্যাংটো ছেলে। পাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে

কাত্তধোপা। পিঠে বিরাট পোঁটলা। মানুষটা ছোট ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে। বলল, কি করছিস তু। জলের দিকে চোখ রেখে ধরম বলল, কুছু না। মুখে একটা শব্দ তুলল মানুষটা। বিড়ির টানের হুসহুস শব্দের চেয়ে জোড়াল। মাথা নাচিয়ে বলল, তা রোদের বিলা ? ধরম এবার মানুষটার মুখ দেখল, মুখের পাতায় হাসির ছড়াছড়ি। ফিক ফিক করে বেরুচ্ছে না, স্থির হয়ে আছে। মুখে ঘাম। চেহারা পদাইকাকার মতো। তফাত—মানুষটা বাবুবাবু। ধরম বুঝল না কেন তার এত খোঁজ। খুকা কুথা গেল ? কুথা ? হ্যাঁ গ, তুমি খুকাকে দেখেছ ? ফোলা গালের মুখটা নেড়ে কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে বুকের ভিতর থেকে সে ওইসব শব্দের হুড় হুড় করে আসায় শ্রান্ত বিপর্যস্ত। পেঁয়াজের গন্ধ মুখ থেকে ভকভকিয়ে বের হয়ে আসছে। বমি বমি ভাব। পেঁয়াজের মিষ্টি গন্ধ নেই এখন, দাঁতের ফাঁকে মুখের লালায় যেন পচন ধরেছে। বলল, খুশি, তাই দাঁড়িন আছি। অাঁ—করে মানুষটা যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে তাকাল। ধরমের মুখে শব্দ নেই, চোখ নেই। অনেকটা দূরে কে যেন কাকে হাঁক পেড়ে ডাকছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে শব্দের রেশ ছুটে আসছে। পাড়ার লাল কুকুরটা পাড়ের ওইদিকে এইমাত্র পায়চারি করতে এল। নিমের ডালে সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে কে যেন আসছে। বটপাতা পাড়তে হবে। খুকার মুখ, ধবধবে সাদা চেহারা, ম্যা ম্যা ডাক ধরমের বুকের ভিতর চোখের ভিতর আবার চলাফেরা করতে থাকল। কুলপাতা খুব ভালোবাসে খুকা। বটপাতা খেয়ে অরুচি। কুথা কুলপাতা ? মুনুর মা বলে, এই ছুঁড়া, তু গাছ মুড়িন দিলি যে রে ? নাম নাম। অাঁ, ছাগলের লেগে কে কুলপাতা লেয় রে ? এখন চাপতে দেয় না গাছে। বলে, নাই। দেখ কেনে পাত নাই গাছে। তা অ ধরম, বাপ আমার, ডুমোর এনে দিস কেনে বুন থেকে। ধরম বলে, পাত দাও, ডুমোর দুব। এ-গাঁয়ে ডুমুর গাছ নেই। অনেকটা দূরে ওই যে ধানক্ষেত, তারপর তালগাছওয়ালা পুকুর, সেটা পার হয়ে বন। ছোট শালের বন, তার মধ্যে ডুমুর গাছ আছে একটা। গাছময় বড় বড় পিঁপড়ে। কুটুস কুটুস কামড়ায়। গুঁড়িতে, পাতায় পাতায়. ডুমুরের ফাঁকে, মসৃণ সবুজ গায়ে, যেন রাজত্ব তাদের। ধরম খুকার জন্যে যায়। কিন্তু কোথায় খুকা ? না তাত, না সামনের মানুষ. না একটানা দাঁড়িয়ে থাকা —কিছুতেই ধরম ক্লান্ত ক্ষুব্ধ নয়। খুকা রে—বুকের ভিতর একটা ডাকের আকুল আগ্রহের ছলাৎ ছলাৎ শুধু। মানুষটা বলল. তা, নাম কি বটেক তুর ?

ধরম বড় বড় চোখ মেলে বলল—ধরম। ওধার থেকে ন্যাঙটো ছোটভাই একটা ছুটতে ছুটতে এসে বলল, অ দাদা, খুকা যি ঘরে রইছেক রে। ধরমের বুকের ভিতর থেকে স্বস্তির শ্বাস পড়ল. আপুনি কে বটেন গো। মানুষটা ঘাম ভেজা মুখে শরীর দুলিয়ে বলল, চিনবি নাই রে ছুঁড়া। তুর বাপ চিনে। তারপরই ভোজবাজীর মতো উধাও। ধরম রোদ, জল, ধানক্ষেত, সবুজ ধান, আকাশ, বাছুর এবং ইতি উতি চেনা মানুষের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পা পা হাঁটতে থাকল।

সন্ধ্যার ঝাপসায় আবার সেই মানুষ দেখল ঘরে। ধরম উঠোনে এক চিলতে চটের এক ছেঁড়া থলেতে চিৎপাত। চোখ আকাশে। চতুর্দিকে অজস্র শব্দ। বাঁশের ঝাড়ে পাখিদের ডানার ঝটপট, কাকের চিৎকার, চড়ুইদের কিচিরমিচি। ওধারে কানাইয়ের ঘরের ট্রানজিস্টারের ঝমঝম বাজনা গান। কুমুদপিসির ঘরে লম্ফের আলোয় কোমরে হাত দিয়ে কুমুদপিসি শরীর দুলিয়ে ভবার মাকে হাঁ মুখ করে কি বোঝাচ্ছে, শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কার যেন হাঁক। অশথতলার পাশ দিয়ে চড়া সুর ধরে কে যেন গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। শুধু দীর্ঘ একটা টান, কথা শোনা যাচ্ছে না। কাদের গরু ঘরে ফেরেনি, আবছা অন্ধকারে গলা দীর্ঘ করে ভয়কাতর একটা আওয়াজ এবং তার মধ্যে ভুবনের পাশে বসে মানুষটার শয়তানের হাসিযোগে—তা তুমার বি বেটা বটেক, তা জানব কেমুন করে হে। তো দেখে বুঝলাম। বেশ তেজী বটেক। তুমার বিটা।—এখনও মুখে বিড়ি. গায়ে ধবধবে সাদা জামা, লুঙ্গি। দাওয়ায় পা গুটিয়ে বাবুর মতো বসে। কেমন যেন বেমানান, মা লম্ফের লালচে আলো ছড়ানো দাওয়ায়, বাবার কোমরে জড়ানো এক চিলতে লালচে কাপড়, রুক্ষ চুল, খোঁগখোঁচা দাড়ি-গোঁফ, ছেঁড়া কাঁথা, মাটির ভেজা দাওয়া, ছড়িয়ে থাকা কালো রোগা দেহের সব ভাইবোনের মাঝখানে বাবুবাবু চেহারার মানুষটা। বাবার মুখেও হুসহুস বিড়ি। কালো আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। তবু চতুর্দিকে অন্ধকারের ছড়াছড়ি। খুব তীব্র নয় অন্ধকার। সবেমাত্র কালো চাদরখানা পড়ছে পৃথিবীর ওপর। ঐ আকাশে চাঁদ ওঠে। ধরম নক্ষত্রের দিকে চোখ রেখে কিছুকাল চাঁদের ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়ল। কে কেন জানে কখনও গোল চাঁদ, কখনও হেঁসোর মতো, কখনও কাস্তের মতো চাঁদ হয়। চতুর্দিকে আলো ঝলমল করে। জ্যোৎস্না। একবার চোখ ঘুরিয়ে মানুষটার মুখ দেখতে হলো। বাপ বলল, তাহালে তুমি সুখেই আছ নাকি হে। ওপাশ থেকে ওঘরে ঘেঁষাঘেঁষি করা

ছাগলের মধ্যে কোনটা যেন চাপ খাওয়া শব্দ করল। বাপ বলল, ওগো দেখ, ছাগল চিঁচাচ্ছেক কেনে! মানুষটা বলল, সুখ। ইখানে সুখ কুথা ভাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলল জোরে। বলল, শুনিস নাই একতারা নিয়ে গুপীবাবাজী বলত—নাই, হিথায় সুখ ত নাই ভাই, সুখের লেগে ছুটাছুটি জীবন চলে যায়। শব্দ করে তারপর হাসল, তা তুমার আর সুখের ভাবনা কি হে ভুবন। তুমি খারাপ কুথা আছ? ছাগল বিচছ, চাষ করছ, ভাত খেছ। কিন্তুক আমরা···। মানুষটা থামল। ভুবন কথা বলল না। হাঁ করে চেয়ে রইল মানুষটার দিকে। শহরের মানুষ এখন। আসানসোল। যেন তেন শহর নয়। কয়লা, ভোঁ ভাঁ গাড়ি, বাবুবাবু মানুষ, ট্রেন, কারখানা, ঘটাং ঘটাং শব্দ। ভুবনের মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে। অমন মানুষ তার ঘরে চেঁড়া চটে বসে। বুকটা যেন আপনা আপনি ফুলছে। এককালে বন্ধু ছিল, কিন্তু এখন! সেকালের কথা যাক। এককালে তার যৌবন ছিল, এখন? কাল চলে যায়। অন্য কাল আসে। তখন সব আলাদা, সব আলাদা। জীবন যৌবন সুখ দুঃখ সব রঙ বদলায়, চেহারা পালটায়। ভুবন এতকাল পরে যেন টের পেল তার যৌবন গিয়েছে, বয়স হয়েছে। সামনের মানুষ বাবু চেহারা সুখী মুখ বুকের ভিতর ফিস ফিস করে বলে দিল—ওহে ভুবন, তুমি সুখ কি জানলে নাই। ইপাশে তুমার যি গরুর গাড়িটো ঘর ঢুকল হে। ভুবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমরা ত খারাপ নাই। মানুষটা এবার খলখলিয়ে হাসল, শহরে এখন খাওয়া-দাওয়া বড কষ্ট হে। খালি পয়সা, আর কুছু নাই। ভুবন লুফে নিল কথাটা। কানের পাশে পয়সার আওয়াজ ঝনঝন করছে যেন। খালি পয়সা, খালি পয়সা। ভুবন বলল, তা আমাকে নিন চল কেনে। মানুষটা একটু থামল। তারপর বলল, তুমাকে লয়। আমি তুমার ধরম বিটাকে নিন যাব ঠিক করেছি। সুখী এতক্ষণ নীরবে শুনছিল, এখন বড় বড় বিস্ময়ের চোখ তুলে ঘাড় লম্বা করল, ছানা নিয়ে ঘোরা মুরগীর আচমকা কোনো শব্দ পাওয়ার মতো। ধরম দ্রুত ঘাড় ঘোরাল। বুক দপ দপ করছে। ভুবন এটা যেন ইয়ার্কি এমন বলে ফেলল, উ ত ছুট্টু ছেলে বটেক। মানুষটা প্রস্তুত হয়েই ছিল। বলল, ছুটু কুথা হে? বেশ ডাগর হনছেক। এখুন থেকে গেলে ভাল হবেক। মাস মাস তুমার টাকা আসবেক। ভাবনা কি বটেক? তুমার ত ছেলেপিলের ভাবনা নাই। একটা কাছে না থাকলে কি ক্ষেতি হবেক? বুঝলে কি না ভুবন, আমি তুমার বিটাকে দিখার পর ঠায় ভাবছিলাম

উ কথাটো। তুমার ভাল হবেক। আমার কাছে থাকবেক, ভয়-ভাবনা কুছু নাই। ভুবন নীরব। ধরমের বুক ঠকঠক করছে, চোখে জ্বালা। ওদিকে অন্ধকার আরও ঘন। অনেক ডাক—মানুষের গরুর পাখির বাতাসের—থিতিয়ে আসছে। আকাশের নক্ষত্রেরা আরও উজ্জ্বল হচ্ছে। খোলার খইয়ের মতো একটার পর একটা হয়ে সারা আকাশময় দ্রুত বাড়ছে। ধরমের চোখ সেই দিকে। গা জ্বলছে এবার। চাপ চাপ হয়ে ঘাম। বাতাস নেই। সে উপুড় হয়ে লম্ফের লালচে আলোয় বাপ মা এবং মানুষটার অন্ধকার-ডোবা মুখের এখানে ওখানে আলোর ছিটেফোঁটা পড়ার দিকে একবার তাকাল। ভুবন এ-সময় বলল, আমি ভেবেছিলম—একটুস ডাগর হলে উকে চাষে নামিন দুব। মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, উতে কুছু হবেক নাই। ভুবন সাড়া দিল না। কানের পাশে পয়সা ঝনঝন বাজছে। কারখানা ধোঁয়া পয়সা। ভুবন বলল, ঠিক আছেক, উকে তুমার হাতে দিলম। মানুষটা বলল, কাল উকে নিন যাব। সুখী ওপাশ থেকে এতক্ষণে বলে উঠল, কাল! মানুষটা পকেটে হাত ভরে দুখানা দশ টাকার নোট বার করে বলল, লাও। এক মাসের আগাম টাকা নিনলাও।

মানুষটা চলে যাবার সময় ঘরের মধ্যে আশ্চর্য নীরবতা ঢেলে দিয়ে গেল। ভুবনের ঘামে ভেজা মুঠোর ভেতর দুখানা দশ টাকার নোট। আকাশে আরও কিছু নক্ষত্র। চতুর্দিকে অদ্ভুত নীরবতা। কানাইয়ের ট্রানজিস্টার ঘরের মধ্যে এখনও কুঁই কুঁই করছে। রাশি রাশি অন্ধকার আতাঝোপে আঁকড়-ঝোপে মাটির ঘরগুলোর ওপর বাঁশঝাড়ে হুড়হুড় করে পড়ছে। এ-সময় ধরম উপুড় হয়ে ছেঁড়াচটের থলেতে মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছে। ঘাম জবজব বুক ধকধক। মাঠঘাট, ধানক্ষেত, ভেজা মাটি, খেজুর গাছ, কুলপাতা, বটতলার ছায়া, ভিজে ভাত, পেঁয়াজ এবং খুকা রে—এখন ধরমের বুকের মধ্যে রক্তের ভিতর মস্তিষ্কের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বিপুল আলোড়ন তুলে গাঢ় কান্না এনে দিয়েছে। ওদিকে সুখী—আমি ছেলা দুব নাই। পুল করতে ছেলের মাথা লাগে—বলে একটু থেমে পায়ে পায়ে স্বামীর কাছে এগিয়ে এসে বলছে, শুন নাই, তুমি শুন নাই পুল করতে ছেলার মাথা লাগে। হেই মাগো, তুমি কেমুন করে টাকা লিলে গো। আঁ। ভুবনের হাতের মুঠোয় টাকা। মাস মাস টাকা আসার স্বপ্ন, কারখানা, ধোঁয়া, বাবুবাবু চেহারা, পয়সার ঝনঝন। বলল, তুর কি মাথাটো খারাপ হনছেক নাকি? পুল করতে ছেলার মাথা

লাগে। সি সব দিন নাই। এখুন গমমেট উসব মানে না। আগে মানত। তখুন সাঁকো বাঁধতে মাথা লাগত। বিটাবিটি চুরি হত। ইত চিনা মানুষ। যাক কেনে বিটা। একট গেলে তুর ক্ষেতি কি! ভুবন উঠোনে বারান্দায় অন্যান্য সন্তানদের চটের থলেতে পড়ে থাকা দেখল। তারপর সুখীর দিকে তাকাল। সুখী কবে যেন একটা সন্তানের জন্ম দেবে। ভুবনের ঠিক হিসাব নেই। রাখে না। ও ঘরের খয়েরী পাঁঠি. সাদা পাঁঠি, চাঁদি ইত্যাদি ছাগীকুল কখন সন্তান দেবে এর হিসেব মোটামুটি জানা। ঘরে এখন কুলুচ্ছে না। গায়ে গায়ে থাকে সব ছাগলগুলো। তার জন্যে আজকাল রাতেও শব্দ করে। সকালবেলায় মলমূত্রে ভরিয়ে দেয় ঘর। ভেতর থেকে একটা ঝাঁঝাল গন্ধ বের হয়। বিটার ছাগল খুকাকে খাসি করা হয়নি। এদিকে সময় হয়ে আসছে। গায়ে বোটকা গন্ধ ছড়াবে। ভুবন ভেবে রেখেছে খুব শীঘ্র ওকে বিক্রি করা হবে। এই পূজোতেই। মায়ের থানে বলি হবে। ততদিনে পাঁঠা ওটা ছাড়া আরও দুটো আছে। পূজোর সময়ই দাম। মানত রাখতে নোট খসাতে লোকে কসুর করে না। তখন ঘর কিছু খালি হবে। আবার কিছু ছাগশিশু কুঁই কুঁই করবে।—একটা গেলে ক্ষেতি কি, নিজে একবার—বলে সুখী ফোঁপায়—তুমি কি মানুষ লও গো? অঁা, অমন কথা তুমি বলতে পারলে। জিভট তুমার পুড়ে গেল নাই। অঁা, মায়া দয়া বুকে কুছু নাই—বলে মাথার চুল এলিয়ে দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ রাখল। পিঠ ওঠানামা করতে থাকল, মাথা কাঁপছে। খুব জোরে নয়, শুধু শরীরে ফোঁপানির তালে তালে আলোড়ন। ভুবন—সাধে বলে মেয়েমানুষ—বলে এখন কোমর থেকে বিড়ি বের করে ধরাল। সুখীর আর কোনো শব্দ নেই। রুদ্ধ কান্না, শরীরের আলোড়নে যে-শব্দ আসছে—তা ভাঙাভাঙা অস্পষ্ট এবং ভুবনের কাছে অর্থহীন। ধরমের ওদিকে কোনো শব্দ নেই। শুধু ফোঁপানির শব্দ। উপুড় হয়ে ছেঁড়া চটের ভিতর ঢুকছে। উপরের আকাশে খইয়ের মতো ফুটছে নক্ষত্র। অন্ধকার আরও ঘন। চতুষ্পার্শ নীরবতায় ডুবে। সারা গাঁয়ের উপর নিশীথের চাদর বিছানো। এখনও চাঁদ নেই। সূর্য পূবের গর্ভে। আলো অনেক অনেক দূরে। শুধু ফোঁপানি কান্না সহযোগে—ছেলের মাথাতে পুল হবেক···। বাবা গো আমাকে বিচবে নাই, আমি যাব নাই, অরে অ খুকা তুকে ছেড়ে যাব নাই। ই গাঁ মাঠ···মেয়েমানুষের বড় মায়া। দু-ঘরের দুটো সংসার। একটো থেকে একটো গেল। টাকা আসবেক···তুমার বিটা দেখে ভাবলম একট গেলে ক্ষেতি কি···এই ঘরে উঠোনে অন্ধকারে বাতাসে পাকে পাকে জড়িয়ে একটা জটিল আবর্ত তৈরি করে ফেলল। এবং এক সময় ভুবন তার উরুতে চাপড়ে দিয়ে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে বলে উঠল, শালা, আমার বিটা বটেক, আমি জানি নাই উর কত দাম হবেক? ভুবনের মুঠোর ভেতর নোট দুখানা ভিজতে লাগল।

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবী

ইলিয়া এ্যাগ্রানভ্স্কি

সোবিয়েতের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কারিগরী বিদ্যালয়গুলি থেকে এ বছর পনের লক্ষেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রী স্নাতক হয়েছেন। বিভিন্ন কলেজের ও বিশেষিত শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির স্নাতক সংখ্যা মাত্র এক বছরেই একলক্ষ আশি হাজারের অধিক হয়েছে। কিন্তু এই অগ্রগতি কোনো অর্থেই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। এই শরতে বিশ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক এবং বৃত্তি-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে। (তাছাড়া কারিগরী বিদ্যালয়গুলিতে বাইশ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী নাম লিখিয়েছে।) নতুন নতুন শিক্ষায়তন খোলার বিজ্ঞপ্তি আজ সারা সোবিয়েতের পত্র-পত্রিকা জুড়ে। ভল্গা-র কুইবিসেভ-এ, উত্তর ওশেটিয়া-র ওর্দজনিকিৎসে-তে, বাইলো রাশিয়া-র গোমেল শহরে এবং সাইবেরিয়ার ক্যাস্নোয়ারস্-এ চারটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় সোবিয়েতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতচল্লিশটি। তাছাড়া অস্ত্রাখানের শ্যাখ্তি-তে নতুন শিক্ষায়তন খোলা হলে এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে আটশো। সাইবেরিয়াতে ও দূরপ্রাচ্যে অনেকগুলি কারিগরী বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে। এর ফলে কারিগরী বিদ্যালয়ের সংখ্যা চার হাজারেরও অধিক হয়ে উঠেছে।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭০—এই পাঁচ বছরে সত্তর লক্ষ বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসছেন। জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় ১৯৬৫র শেষাশেষি যে-এক কোটি কুড়ি লক্ষ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হয়েছেন, এ-সংখ্যা তার সঙ্গে যুক্ত হবে।

১৯৭০ সালে বিদ্যালয়ে দশ বৎসর শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার পরিণতির কথা চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে সোবিয়েতে বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষণের সুযোগ কতখানি রয়েছে। জারের আমলে শতকরা একজনেরও এ-ধরনের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল না। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, সমগ্র সোবিয়েতের সক্ষম নাগরিকদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশের বেশি নর-নারী বৃত্তিগতভাবে বুদ্ধিজীবী।

বর্তমানে এঁদের সংখ্যা তিন কোটির উর্ধ্বে, এর ফলে বোঝা যায় যে সোবিয়েত সমাজে কায়িক শ্রমজীবী মানুষদের পরেই বৃত্তিগতভাবে এঁদের স্থান। তাছাড়া এঁদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৬৭র মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা ২·৪ গুণ এবং বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে উভয় শ্রেণীর বৃদ্ধির মাপ প্রায় সমান সমান। যদিও বর্তমান সময় পর্যন্ত মানসিক ও কায়িক শ্রমজীবীদের সংখ্যাগত আনুপাতিক হার ১:৪, তবুও আশা করা যায় যে, শীঘ্রই প্রথমোক্ত শ্রেণীর অনুকূলে এই সংখ্যাতত্ত্বের পরিবর্তন ঘটবে। অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উৎসবে এল. আই. ব্রেজনেভ সমাজে বুদ্ধিজীবীদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনের নানাবিধ সমস্যার ব্যাপক ভাবে সমাধানের কাজে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বাড়বে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশ শ্রমজীবীদের কাছাকাছি সামিল হচ্ছেন। গত জুন মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মূল দলিলে বলা হয়েছে, "একালে, বিজ্ঞান যখন সরাসরি উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে—বুদ্ধিজীবীরা ততই মজুরি ও বেতনভোগী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁদের সামাজিক স্বার্থ শ্রমজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ছে, তাঁদের সৃজনশীল আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষভাবে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে।"

যেসব দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ী হয়েছে, সেখানে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকদের আত্মীয়তা বিশেষভাবে গভীর। সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে চিন্তাবিদদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠছে।

১৮৯৯ সালেই মহান লেনিন 'বুদ্ধিজীবী-শ্রমিক'—এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এঁদের দু-বছরের মধ্যে ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। ক্ষমতা দখলের পর রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকেরা এ-সম্পর্কে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ফলে শ্রমিকদের অসংখ্য নানাজাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র গঠিত হতে লাগল। কলেজ ও

কারিগরী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীহিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া হল শ্রমিক, কৃষক ও তাদের ছেলেমেয়েদের। তাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য অগণিত নৈশবিদ্যালয় ও পত্রযোগে শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নির্মিত হল। এভাবেই সংগঠিত হল লেনিন-কথিত বুদ্ধিজীবী-শ্রমিকদের এক বিরাট বাহিনী। তাই সোবিয়েতে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন অথচ সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী বলতে কিছু নেই।

সমাজতাত্ত্বিকেরা পেরুভুরাল্‌স্‌ক্‌-এর অন্তর্গত নোভোক্রুব্‌নি কারখানার ১২৬৩ জন ইঞ্জিনিয়ার ও টেক্‌নিসিয়ানদের কাছ থেকে এই সমীক্ষার মারফৎ জানতে পেরেছিলেন যে তাঁদের মধ্যে শতকরা বিয়াল্লিশ, বত্রিশ ও ছাব্বিশজন এসেছেন যথাক্রমে শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের ঘর থেকে। আর-একটি উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯৬৮ সালে যেসব যুবক-যুবতী কলেজে ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা উনচল্লিশজন শ্রমিক অথবা শ্রমিকের ছেলেমেয়ে এবং শতকরা ষোলজন কৃষি-সমবায়িকের সদস্য বা কৃষকের সন্তান। এই সমীক্ষা কেবল দিবা-বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সোবিয়েতের ছাত্র-ছাত্রী মোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশি নৈশবিভাগে এবং জীবিকা বজায় রেখে পত্রযোগে পড়াশোনা করেন।

সোবিয়েত ইউনিয়নে সাম্প্রতিক গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রস্তুতি-বিভাগ খোলা হচ্ছে। এই বিভাগে সেই-সব অগ্রবর্তী শ্রমিক ও কৃষকদের গ্রহণ করা হবে, যাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। এর ফলে স্বভাবতই শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে সোবিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকদের মাঝখানের ফারাক ক্রমশ কমিয়ে আনা হচ্ছে। এবং এভাবেই দেশময় সংগঠিত হচ্ছে হাজারে হাজারে উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী শ্রমিক।

অবশ্য এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে সোবিয়েত সমাজে পেশাদার বুদ্ধিজীবীদের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকেরা শিক্ষাগতভাবে সম্পূর্ণ যোগ্য না হয়ে উঠছেন, মানসিক ও কায়িক শ্রমের ভেদরেখা দূর না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তাদের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। লেনিন বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে সাম্যবাদী সমাজের চূড়ান্ততম বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীরা একটি বিশেষ শ্রেণী হিসেবে থেকে যাবে।

বস্তুগত উৎপাদনে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে সোবিয়েত ইউনিয়ন বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের উপযোগিতা সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠছে। বর্তমান বিশেষজ্ঞদের শতকরা আট ভাগের কিছু বেশি মানুষ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫র মধ্যে এই সংখ্যা আড়াই গুণ বেড়েছে এবং ঐ একই সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বেড়েছে ৪·৩ গুণ। বর্তমানে সোবিয়েতে আট-লক্ষ গবেষণাবিদ আছেন। এঁরা সংখ্যায় পৃথিবীর মোট গবেষণাবিদদের এক চতুর্থাংশ।

সঙ্গতভাবেই দেখা যায় যে বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই উৎপাদন ও কারিগরী বিদ্যা, বিভিন্ন শিল্পায়তনের গবেষণা-পরিকল্পনা, উন্নয়ন-প্রকল্প, রাষ্ট্রায়ত্ত ও যৌথ খামারের সঙ্গে যুক্ত। ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা বর্তমানে কুড়ি লক্ষেরও অধিক।

জার-শাসিত রাশিয়াতে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা একান্ত ন্যূন হলেও এঁরা প্রায় সকলেই নিছক ছিলেন শহরের লোক। ১৯১৪ সালে সারা দেশে যে একশো পাঁচটি কলেজ ছিল, তার অধিকাংশই স্থাপিত হয়েছিল রাশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলের একুশটি শহরকে কেন্দ্র করে। বাইলোরাশিয়া, আজেরবাইজান, আর্মেনিয়া, মোল্দাভিয়া, উজ্বেকিস্থান, তুর্ক্মেনিস্থান, তাজিকিস্থান, কিরঘিজিয়া ও কাজাকস্থান-এ একটিও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। বর্তমানে উচ্চতর শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিনশো পঞ্চাশটি কেন্দ্রে—এক কথায় সমস্ত অঞ্চলে ও স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলিতে। ওপরে যে-অঞ্চলগুলির নামোল্লেখ হয়েছে, এখন সেখানে সাতলক্ষ উনআশি হাজার শিক্ষার্থী একশো ছাপ্পান্নটি বিদ্যালয় থেকে পাঠ গ্রহণ করছেন।

পুরনো আমলের রাশিয়ায় সমাজের একান্ত অভিজাত স্তরের গুটিকয়েক মহিলা ছাড়া অন্য কোনো রমণীর সামনে কলেজে শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল না। বর্তমানে যে-সমস্ত বিশেষজ্ঞ উচ্চতর এবং / অথবা মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপনান্তে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা আটান্নজন হচ্ছেন মহিলা।

এইসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে সুদীর্ঘকাল সাধারণ মানুষের সামনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে-দরজা বন্ধ ছিল, তা আজ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়েছে

এবং সোবিয়েতের সমস্ত নবনারীর সামনে উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। সংবিধানে শিক্ষার যে মৌলিক অধিকার স্বীকৃত, সমাজ ও জাতি ও রাজ্য-নির্বিশেষে নাগরিকেরা আজ বাস্তবে সেই অধিকারকে উপলব্ধি করতে পারছেন।

ধনতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজে বুদ্ধিজীবীদের সাধারণভাবে পণ্য হিসাবে বা নিলাম দরে ক্রয় করা হয়। সোভিয়েতে শিক্ষক, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষি-বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, অভিনেতা, লেখক ও শিল্পীদের স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্রের। মার্কস ও এঙ্গেলস সঠিকভাবেই উক্তি করেছিলেন যে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় চিকিৎসক, আইনজীবী, লেখক ও বিজ্ঞানীদের তাঁদের সুমহান কর্তব্য থেকে সরিয়ে নিয়ে ভাড়াটে দালাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রায় এক শতক অতিক্রান্ত হয়েছে, বুদ্ধিজীবীদের কাঞ্চন-কৌলীন্য কিছু হয়তো বেড়েছে। কিন্তু আদতে বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এখনও বাণিজ্যিক লেনদেনের স্তরেই রয়ে গেছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে বুদ্ধিজীবী ও তাঁদের সৃজনশীল কর্মধারার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এই দুই সুমহান চিন্তাবিদ তাঁদের দূরদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি ও দোদুল্যমানতা কাটিয়ে বুদ্ধিজীবীরা যতই শ্রমজীবী মানুষের সারিতে এসে দাঁড়াবেন এবং তাঁদের সৃজনী চেতনাকে শ্রমিকদের কর্মশক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিগন্ত ততই উজ্জ্বল ও উন্মুক্ত হয়ে উঠবে।

অনুবাদক : অমিতাভ দাশগুপ্ত

'পরিচয়' পত্রিকার জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত এই নিবন্ধটি আমরা নভেম্বর বিপ্লবের স্মারক হিসেবে প্রকাশ করলাম। —সম্পাদক

আলেখ্য : ২১
বিষ্ণু দে

গ্রামীন লাবণ্যে পুষ্ট, মৃত্তিকা-মেদুর
কান্তি তার। সেও বুঝি মেনে নেবে হার
কোম্পানির পত্তনীতে নিওন্-লীলায় ?

নীরক্ত কি ? দেখা শক্ত, বুঝি যতদূর,
নেনেছে, যেমন মানে, উড়ন্ত হাওয়ার
আবেগে কবন্ধ ছাদে উদ্ভিজ্জ লীলায়
অশ্বথ পিপুলচারা ভাঙে পলেস্তারা।

তেমনি এ সুভদ্রা কন্যা প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বে
জয়বিন্দু এঁকে দেবে ঘন শ্যাম মুখে
আসমুদ্র পৃথিবীর বাষ্পে বাষ্পে সুখে
মেঘের ডম্বরে নম্র তেজে স্থির চিত্তে।

সপ্তরথী ভাসে, বেঁচে ওঠে সর্বহারা ॥

অধমর্ণ
সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

এখনো রক্তের ঋণ শোধ হয়নি,
মহাজন
আজো পথে ঘাটে
তাগাদায় চমকে দেয়
মনে পড়ে
দেনা শোধ হয়নি এখনো,
অপরাধে লজ্জিত নয়ন

কিছু রক্ত ঢেলে দিই
তারপর
হিসেব মেলাই
দেখি
কত বাকি,
আরো কত রক্ত দিতে বাকি।

এখনো রক্তের ঋণ শোধ হয়নি

জটিল পথের বাঁকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতবাক
অধমর্ণ আমি
আমাকে রক্তের ঋণ কড়ায় গণ্ডায়
শোধ করে যেতে হবে
যাতে
দিন সুস্থ হয়
যাতে
রৌদ্র ফিরে পায়
আবার সোনালী রঙ, যাতে
শিশু বড় হয়,
তাই
জমার নির্মম ঘরে
ওয়াসিলে স্পষ্ট দাগগুলি
প্রশ্ন করে
আর কত দিতে হবে
আরো কত রক্ত দিতে বাকি।

আমার প্রকৃতি

আলোক সরকার

প্রতিটি প্রকল্পের ভিতর রহস্যময় বিদ্যুৎ—আমাব সত্তার
ভিতরে চলে ভাঙাচোরা জাগে নতুন দ্বীপ।
আঁধারময় পথে-পথে ছড়িয়ে পড়ে শিউলি, অপরিজ্ঞাত অন্ধকার
নৌকো আনে বিশাল অলৌকিক বাতায়ন।

এইরকম অভিজ্ঞতা বারেবারেই আসে। জন্মে আমার নির্মাণ
সূর্যালোকের-প্রতিপক্ষ তুচ্ছ ক'রে প্রকৃতি।
আমি স্পষ্ট টের পাই হীরকজলা প্রস্তুতি, জ্যোতির্ময় অনুধ্যান
আমার সত্তার রূপান্তরিত বিভা, প্রথম ঊষার জাগরণ।

প্রতিটি প্রকল্পের ভিতর রহস্যময় বিদ্যুৎ তাই আমার নির্মাণ
অপরিসীম হেমন্ত অপেক্ষমান স্তব্ধতা ;
জাগে আমার প্রকৃতি পড়ন্তবেলার ছায়া বাঁশবনের অন্তর্লীন
রহস্যময় বিদ্যুৎ দেখায় সরুপথ গ্রামসীমার নীমিলতা।

আগুন

প্রভাকর মাঝি

ঠাণ্ডায় কালিয়ে-যাওয়া চামড়াটা
একটু সেঁকে নেবার জন্যে ওরা আগুন খুঁজছিল।
প্রমিথিউসের চুরি-করা সেই স্বর্গীয় সম্পদ,
যা নাকি কুঁকড়ে-যাওয়া শরীরকে আবার ওম করে রাখতে পারে।
বাইরে উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে ষড় করে
শীতের হাঙরমুখো দানোটা এদিকে রে রে করে উঠছে।
ওহো, একটু আগুন!
আকাশের অগ্নি-গোলকের কাছে,
আগুনের চারদিকে গোল-হয়ে-বসে-থাকা সুখী মানুষের কাছে,

ওরা আগুন চাইছিল।
জোর করে ছিনিয়ে-নেওয়া নয়,
নিয়ম-মাফিক আবেদন। নিবেদন। প্রার্থনা। স্তব।
"বাবুমশাই, একটু আগুন : মা-জননি একটু আগুন।"
কিন্তু না। .লূপে কম্বলে সোনায় সোয়েটারে
লেপ্টেথাকা উষ্ণতা একটু নড়ে চড়ে বসল মাত্র।
স্বর্গ তরল হয়ে গলল না,
ঈশ্বর করুণায় টলল না :
আগুন দেবে কে ?
হঠাৎ মরা মাছের চোখে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল :
সবটুকু শক্তি সংহত হয়ে
কোলাপ্সিবল গেটে দমাদ্দম আঘাত।
আঘাতের পর আঘাত।
আরো জোরে, আরো জোরে...

ইতিমধ্যে ওদের কালিয়ে-যাওয়া চামড়ায়
আগুন ধরে গেছে।

সকাল : মুখোমুখী

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

শব্দেরা আড়াল করে সব।
অনুষঙ্গ। স্মৃতির দেয়াল।

মুক্তবেণী আনগ্ন সকাল
হাওয়ার উজ্জ্বল করতালি
রৌদ্রচূড়া সবুজ উৎসব
উদ্ভাসিত জলের দেওয়ালি
শব্দেরা আড়াল করে সব।

অনুষঙ্গ, ভাঙো অন্তরাল
স্মৃতিকূপে কেন রক্ত ঢালি!
সকালের নগ্ন অনুভব
শিরাস্নায়ু ভরে যায় সব
কাছে আসে সমস্ত আকাশ
আমাদের মুক্ত ইতিহাস
ঘটেনি যা, কোথাও, কখনো।

আলো এই প্রথম বিস্ময়
প্রবাহিত, প্রসারিত হাওয়া।
গান গাওয়া, শুধু গান গাওয়া
পথে, ঘাসে, প্রগাঢ় পাতায়
মানুষেরা গান গেয়ে যায়
পৃথিবীর চোখ মেলে চাওয়া।

নগ্নদেহে একাকার হাওয়া
দুই চোখ মজ্জিত আকাশে
শরীরের সঞ্চিত তিমির
সকালের আলো হয়ে আসে।

সময়ের পাশে কিছুক্ষণ, পাগলের মতো

কালীকৃষ্ণ গুহ

বৃষ্টির দিনে রাস্তায় পরিচয়হীন মৃতদেহ শোয়ানো থাকে

সেখানে
সময় দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, পাগলের মতো, তারপর

সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়।

এইটুকু মাত্র কথা, বাকি কথাগুলি জানি না, জানতে চাই না, যবে
দিগন্ত অথবা বজ্রের মতো স্পষ্ট হবে তুমি, সেইদিন
জানতে চাইব।

সারাদিন বৃষ্টি হলে বজ্র শুধু দিতে বলে আমাদের—
আমরা তো জীবন দিয়েছি, জীবনের বীজ
অন্ধকারে ছড়িয়ে দিয়েছি, তবু

কোন দান ?

বৃষ্টির দিনে রাস্তায় পরিচয়হীন মৃতদেহ শোয়ানো থাকে, স্তব্ধ
যেখানে
সময়ের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের ভাষা
ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে

কিছুক্ষণ, পাগলের মতো।

শব্দ আমার অনুভব

বঙ্কিম মাহাতো

শব্দ যদি অনুভব শব্দ আমার শেষ পারানির কড়ি
তৃষ্ণা যদি খেয়া হয় তৃষ্ণা আমার বৈতরণীর তরী।
শব্দ এবং তৃষ্ণা আমার কবিতা আমার জীবন নিরন্তর
শব্দ এবং তৃষ্ণা আমার ভালোবাসার ঝড়।

বুকের মধ্যে মহাকালের উথালপাথাল নৃত্যধারার তাল
বোধের মধ্যে অগ্নিপুঞ্জ দারুণদাহে জ্বালায় শিখা লাল ;
ভালোবাসার কথা এবং ভালোবাসার গভীর ইচ্ছেগুলো
শব্দ এবং তৃষ্ণা সহ যন্ত্রণায় ওড়ায় রাঙা ধুলো।

অগ্নিশিখার দারুণ দাহে পিপাসার্ত্ত মৃত্যু পরম সুখ
ক্লান্ত পাহাড় শব্দহীন ভরেছে ছাখো মগ্ন আমার বুক
তৃষ্ণা চিরকালের খেয়া তৃষ্ণা কুটিল বৈতরণীর তরী
শব্দ আমার অনুভব শব্দ আমার শেষ পারানির কড়ি।

যাই বলতেই

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

যাই বলতেই যায় না যাওয়া
বিভোল হাতে যায় না মোছা
উজল স্মৃতি
রক্তে আজও ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ
লবণ স্বাদ
বুনো পাখির চোখের নেশা
হৃদয় ছুঁয়ে বইছে স্রোত মেঘনা নদী
কালো মেয়ের বিষাদ অশ্রু
অনুরাগের দীঘল আঁখি
পেরিয়ে সীমা যতই যাই
যায় না ভোলা
ভাসছে আজও চোখের পরে
ধলেশ্বরীর রূপের আলো
কূলপ্লাবী সে কীর্তিনাশা
পদ্মা নদী
বাজছে কানে দূরের শব্দ করুণ সুর
সোনাই দিহি ভাতার মারি
চলন বিল
সোনার খনি নিটোল কথা
যাই বলতেই যায় না যাওয়া
দূরে যেতেই হাতছানিতে কাছে ডাকে
রূপশালী সেই রাজার কন্যা রূপকথার
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
চেতনা ছুঁয়ে বাঙলা দেশ।

শেখ আব্দুল জব্বার-এর কবিতা

শেখ আব্দুল জব্বার-এর অকালমৃত্যু আমাদের কাছে বেদনাদায়ক ঘটনা। হুগলি জেলার কোনো এক গ্রামের চাষী-পরিবারের সন্তান শেখ আব্দুল জব্বার দু-চোখে কবিতার নয়নাঞ্জন মেখে বাঙলার প্রগতি-সংস্কৃতি-আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। তাঁর স্বল্প পরিসর কবি-জীবনে অনেক কবিতাই তিনি লিখেছেন। 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠাতেও তাঁর কবিতা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের হাতে যে তিনটি কবিতা এসেছে, তা প্রকাশ করার মধ্য দিয়েই শেখ আব্দুল জব্বার-এর কবি-প্রতিভার প্রতি আমরা পুনর্বার সম্মান প্রদর্শন করছি।

সম্পাদক : পরিচয়

কলস্বর

মহাপৃথিবীর অভিযাত্রী

প্রবল কণ্ঠস্বরে বেগবান আমাদের অস্তিত্ব প্রপাত ;
রেণু মহারেণু জীবাশ্মের ঊর্ণজালে জটিল কুটিল আলোজ্বালা
শতকের মহাশতকের অন্ধ ও উজ্জ্বল গলিপথে
ব্যাপ্ত কত প্রাণবাতাসের হাহাকার
তাদের সময়পথে কত সুকুমার আত্মলীন কাব্যের শবযাত্রা
হৃদয়ের আধোগলা,
মড়কের, বন্ধ্যা মহামড়কের চিহ্ন হয়ে হাঁটে ;
সৌন্দর্যের পচনশীল হৃদয় কর্পূর ও কাফন মোড়কে
স্বাস্থ্যকর ও উপেক্ষণীয় নয়
মুমূর্ষু মানবেরা যে ব্যবধানেই গড়ে নব নব ঊষা।

জোনাকি ও নক্ষত্রের আদিম কৃষক
কর্ষিত শস্যের শীষে সোনা হয়ে ওঠে
প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিকে চষে বেড়াবার ইচ্ছা।
আলোর পোকার প্রিয় নেশায়

জন্মান্তর খুলে খুলে
অনাগত ইতিহাস বিকাশ সন্ধানে
লুপ্ত ও অনাবৃত নগরের মহানগরের তোরণে
আমরাই উৎসারিত স্বপ্নের প্রপাত
আদিম আলোর মতো তার শঙ্খ ভোরে সমুদ্রবিহারে
কুয়াশায় জ্যোতিষ্কলোকের পথে আমাদের দীপ্ত কণ্ঠস্বর
ঊর্ধ্বদৃষ্টি কৃসিদক্ষ হাত।

মহাপৃথিবীর অভিযাত্রীর মুখ আমাদেরই
মুখের আদল।

উৎক্রান্তি

হেমন্ত অশ্রুর মতো শ্যামল মেঘের দেহ অবিরাম ঝরে গেলে পরে
উপ্ত নদীর স্রোতে রূপ নেয়, রূপান্তরের ঢের রূপকের ভিড়
জমে উঠে চারিদিকে, ঘেটু বাকসের বনে থরথর কেতকী নিবিড়
কদমের গন্ধ মেখে, আপন প্রকাশ খোঁজে বনানীর নীলবাস পরে।
তখন প্রাণের হাসি পাতার সোনায় জ্বলে-উজ্জ্বল অক্ষর
লেখার প্রত্যাশা জাগে প্রকৃতিরও ক্লান্ত মনে, আমাদের মতন উন্মুখ
হয়ে ওঠে, অবিনাশী কোনো কিছু রেখে যেতে নিত্যের স্বাক্ষর
হোক তা ভাস্কর্য শিল্প মূঢ় প্রেম বোধহীন মায়াময় সুখ।

যেন কোন বলাকারা ডেকে গেছে দূরে—চিহ্নপরিচয়হীন কোন দেশ থেকে
যেখানে আলোকহীন অন্ধকারহীন মহাদেশ, যার স্বপ্নে চোখ ভরে রেখে
নিমিষের ভাগী হয়ে তবুও মানুষ অমৃতের পুত্র হতে চায়—
তাই তার সবকিছু প্রাচীন ধূলার পথে ধূলা হয়ে যায় নাই আজো।

২৮.৫.৬১

তিমির থেকে আলোকের প্রার্থনা

চতুর্দিকে অন্ধকার, নক্ষত্র তিমির
সময়ের অদ্ভুত নারকী অরণ্যে আমি উর্ধ্ববাহু
আলোকপ্রসূন
কোমশুদ্ধ উন্মীলন চেয়ে
রক্তের মহান ইচ্ছায় প্রস্ফুট অধিরাজ, আমার সৌন্দর্য সত্তা
নাগালের অদৃশ্য সুদূর বাইরে কোথায় নন্দিত উৎসব শুনে
অবাধ ফোটার লগ্ন সময়ের যন্ত্রণার কণ্টকে ভীষণ দীর্ণ
হেমন্ত-অস্থির।

দিগন্ত আচ্ছন্ন কেন সপ্তর্ষির হে দিব্য বিভাস
মুখর বাঙ্ময় আলো আজো স্পৃষ্ট, নতজানু হবে
তিমির সাম্রাজ্যের রুদ্ধতার ঘেরে ?
নশ্বরতার এই নব্য প্রার্থনার নবীন গুঞ্জন তুলে
দিব্য দর্পিতের মতো
সংবর্তের গানে খুলে দিগম্বর জটা
মুখর দুর্বার ধারায় বাজিয়ে প্রহত কণ্ঠ প্রস্তুতির সুস্থ মহিমায়
কখনও কি আমার রক্তের ফুল মহান ইচ্ছার ফুল
আদিগন্ত পাঁপড়ির সৌন্দর্যে বিশাল পৃথিবীর, মানুষের
উত্তরাধিকারীদের হবে না'ক আরাধিত নক্ষত্র সম্পদ !

নভ-নিখিলের গর্ভ রক্তাক্ত জন্মের পথ কখন ধরবে খুলে
সময়ের মহাযন্ত্রণায়।

পুস্তক-পরিচয়

চিঠিপত্র ৭ম, ৮ম ও ৯ম। সঙ্গীতচিন্তা। রূপান্তর। কবির ভণিতা। রবীন্দ্রনাথ-এণ্ড্রুজ পত্রাবলী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সন্ধ্যাসঙ্গীত। Mahatma Gandhi। The Cooperative Principles :— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক : বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথ এত যা লিখেছেন, সম্ভবত আমরা এক জীবনে তা পড়ে উঠতেও পারব না—অন্তত আমার সন্দেহ নেই যে আমি পারছি না। নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে আছে; শুনেছি সেদিনের 'প্রবাসী'র 'সঙ্কলন'-এ অন্তর্ভুক্ত অনেক লেখাও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত, মার্জিত। অন্যত্র এমন আরও লেখা আছে। সেসব লেখা বাছাই করা, যাচাই করা দুঃসাধ্য কর্ম; সম্ভবত এখনো আরম্ভ হয়নি। প্রধান গ্রন্থগুলিকে যথাযথ সম্পাদনার কাজ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ সার্থক ভাবে করেছেন। সংস্করণ থেকে সংস্করণে নব নব প্রাসঙ্গিক বিষয় যোজনায়, পুরনো বিষয়ের পুনঃপরীক্ষায় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন প্রমুখ গ্রন্থনবিভাগের সম্পাদকগণ (নিজেদের নাম যতই তাঁরা গোপন করতে সচেষ্ট হোন) বাঙলা সাহিত্যে সম্পাদনবিদ্যার পথ রচনা করে চলেছেন। আর দু-এক জনকে মাত্র এ-পথে এরূপ দায়িত্ব পালনে যত্নপর দেখেছি। রবীন্দ্রসাহিত্যের সযত্ন সম্পাদন এই কর্মনাশা কালে বাঙালির একটা আশার কথা। এবং সম্পাদনবিদ্যার যে-সাফল্য আমরা এই সূত্রে দেখতে পাই, তারও পরিচয় স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি লেখা বেশি নয়, 'দি চাইল্ড'ই বোধহয় ও-ভাষায় তাঁর একমাত্র মৌলিক সৃষ্টি। কবিতা ও গানের কবিকৃত ইংরাজি অনুবাদ কোথাও কোথাও চমৎকার, আবার কোথাও কোথাও তৃপ্তিদায়ক নয়। ইংরাজিতে ভাষান্তরিত 'Mahatma Gandhi' ও 'The cooperative Movement' কবির রূপান্তর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি গুণীলোকদের তা চেষ্টার ফল। বিদেশীয় পাঠকদের পক্ষে তা প্রয়োজন মেটাবে, সম্পাদনায়ও তা প্রয়োজনীয়।

সম্ভবত বিদেশীয়দের নিকট রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে চিঠিপত্র কম লেখেননি —মিস র‍্যাটবোন বা য়োনি নোগুচুর নিকট লেখা চিঠিপত্র সে-পর্যায়ে পড়ে না। বিদেশীয়দের নিকট লেখা অনেক চিঠিই হয়তো যথার্থ চিঠি নয়, স্বচ্ছন্দ

আলাপ অপেক্ষা আলোচনার ও যুক্তিবিচারের নৈর্ব্যক্তিক ছাপই তাতে বেশি থাকবার কথা, যেন জানা কথাই রবীন্দ্রনাথের মতামত বিদেশীয় মনস্বী-সমাজে বিচার্য হবে। এণ্ডরুজ ও পিয়ারসনের মতো বন্ধুর নিকট লেখা চিঠি কিন্তু ব্যতিক্রম। অনায়াস স্বচ্ছ সৌহার্দ্যেই তা লেখা, আর তেমনি সহজভাবেই প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কবির অকুণ্ঠিত মতামতের প্রকাশ। ১৯১৩ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত ইংরাজি চিঠিগুলি বাছাই করে 'Letters to a friend' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছিল ; তা ছাড়াও নিশ্চয়ই আরও পত্র আছে। তার বিষয়-ভার ও সহজ আলাপন-ভঙ্গী এই দুই মনস্বীর চিৎসম্পদেরও যেমন প্রমাণ, তেমনি রবীন্দ্রজীবনীর ও সমকালীন নানা ঘটনার স্বচ্ছন্দ আলোচনায় তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। পত্রাবলীতে শুধু সেই ইংরাজি চিঠিগুলই ভাষান্তরিত হয়নি। পিয়ারসনকে লেখা তাঁর চিঠিরও অনুবাদ আছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্যপক্ষে এণ্ডরুজের লেখা চিঠিগুলিরও অনুবাদ, তাঁর মায়ের নিকট লেখা কয়টি চিঠি এবং আনুষঙ্গিক বহু তথ্য। প্রথমেই শ্রীযুক্ত মলিনা রায়ের অনুবাদ-কৃতিত্বের প্রশংসা করতে হয়। বাঙলা পাঠে মূলের ভাব ও রসের স্বাদ পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। অনুবাদের পরেই প্রশংসা করতে হয় নিপুণ সম্পাদনার। আর সেই সঙ্গে চিত্রাবলীরও। বাঙালি পাঠক কৃতজ্ঞ বোধ করবেন এই গ্রন্থের জন্য।

এ-প্রসঙ্গেই বলতে পারি যদিই বা রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত ও প্রকাশিত লেখা সবই কেউ পড়ে থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁর লিখিত চিঠিপত্র সব কেউ পড়েননি। কারণ সব তা সংগৃহীতও হয়নি। যা সংগৃহীত হয়েছে, তারও বড়ো অংশই এখনো মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়নি। মাত্র ১০খণ্ড এখন অবধি প্রকাশিত হয়েছে। আর শুনেছি আনুমানিক আরও দশ-পনের খণ্ডে সংগৃহীত পত্রাদির প্রকাশ সম্পূর্ণ হতে পারে। যখন 'ছিন্নপত্র'র কথা মনে করি, এবং 'ছিন্নপত্রাবলী'রও কথা, তখন স্বীকার না করে পারি না—রবীন্দ্রনাথের সেইসব চিঠি-পত্র প্রকাশিত না হতে কে বলতে পারে—তার রবীন্দ্রপরিচয় সম্পূর্ণ হয়েছে? সেদিক থেকে ৮ম খণ্ড (প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত) ও ৯ম খণ্ডের (প্রধানত হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত ২৬৪ খানা চিঠি) পরে ১০ম খণ্ড (দীনেশ-চন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথের পত্রবিনিময়) বিস্ময়োৎপাদক নয়। অবশ্য সাহিত্যেতিহাসে আবশ্যকীয়, মূল্যবানও। দীনেশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। শুধু ব্যক্তিগত বা সাহিত্যগত

তথ্যের জন্যই এগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। নিতান্ত অজ্ঞাত না হলেও প্রাসঙ্গিক নানা কথারও মূল্য অশেষ—যেমন ৩২ নং পত্রের (নভেম্বর, ১৯০৫এ লিখিত) 'স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসের গুটিকয়েক সূত্র।' আজও এ-সূত্রে আমাদের পলিটিক্যাল কর্তারা জ্ঞাত আছেন কিনা জানি না; অন্তত অনেকেরই যে তা অজ্ঞাত, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই তা জানি। বলা বাহুল্য, 'চিঠিপত্র'র মূল্য শুধু এ-জন্য না, শুধু 'রবীন্দ্রজীবনী'র উপাদান হিসাবেও নয়। নবম খণ্ডের পাঠক মাত্রই জানেন, ইন্দিরাদেবীকে লিখিত 'ছিন্নপত্র' যেমন বাঙলাদেশের ও রবীন্দ্রসাহিত্যের অমূল্যকীর্তি, নবম খণ্ডের হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত 'চিঠিপত্র'ও তেমনি বাঙালি-মানসের ও বাঙালি-জীবনের দ্বন্দ্ব-মিলনাত্মক বিচারের এক অসামান্য পরিচয়। চিন্তাশীল, শ্রদ্ধাশীল সকল মানুষই এই দুই ভিন্নআচারের এবং (সম্ভবত) অভিন্ন প্রকৃতির মানুষের কাছে মাথা নত না করে পারেন না। সম্পাদকের নিকটও কৃতজ্ঞতা বোধ করতে হয়—যদিও সাহিত্যতথ্যসন্ধানীদের কোনো কোনো নাম-বর্জনে আপত্তি আছে। আর বিশেষ করে আমরা সম্পাদন-বিদ্যারই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র নানখণ্ডে কবি তাঁর কাব্যের যে 'সূচনা'-সমূহ লিখেছিলেন, "পাঠকের ব্যবহার সৌকর্যার্থে" তা একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছে 'কবির ভণিতায়'। আর বেদ ধম্মপদ থেকে শিখভজন পর্যন্ত নানা ভারতীয় ভাষায় লেখা অধ্যাত্ম ও নানা খণ্ডবাণীর যেসব অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো করেছেন, তা একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছে 'রূপান্তর'-এ। এই দুই গ্রন্থেরই মূল্য "ব্যবহার সৌকর্যের" মূল্য, সম্পাদন-সৌকর্যেই তা লভ্য হতে পারে, এবং হয়েছেও।

'সংগীত চিন্তা'ও সংকলন। রবীন্দ্রনাথের নিজের ও-বিষয়ে ছোটবড় নানা লেখা, দিলীপকুমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে 'সুর ও সংগতি' বিষয়ে সুবিখ্যাত পত্রালাপ—এসবের সঙ্গে সমগ্র রবীন্দ্রগদ্য-সাহিত্য মন্থন করে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-বিষয়ক উক্তি, মত, মন্তব্য, নানা প্রশ্নের উত্তরে (যেমন 'জনগণমন অধিনায়ক' রচনা) কবির চিঠি এবং বাঙলা 'বাউলের গান' প্রভৃতি লেখা ছাড়াও রলাঁ, আইনস্টাইন, এচ্‌-জি-ওয়েলস্ প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় কথাবার্তা যুক্ত করেছেন। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এই সংকলন গ্রন্থখানি সঙ্গীতজিজ্ঞাসায় অপরিহার্য। সঙ্গীত-রসিক ও সঙ্গীত-বৈজ্ঞানিকরাই এর যথার্থ মূল্য নির্ধারণের অধিকারী।

গৌড়জনরা এই সুধাপানে বঞ্চিত হলেন না—এইটিই আমাদের লাভ। স্বভাবতই বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ও সম্পাদকগণ সকলের ধন্যবাদার্হ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিবনাথ শাস্ত্রী। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী
প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রমথ চৌধুরী
গল্প সংগ্রহ। প্রমথ চৌধুরী
প্রকাশক : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ করে তাঁর প্রবন্ধ ও গল্প সংগ্রহের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, শতবার্ষিকী আয়োজন নইলে অসম্পূর্ণ থাকত। বলা বাহুল্য, 'পুস্তক-পরিচয়'-এ এইসব লেখার পরিচয়-দান এখন নিরর্থক; সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ হিসাবে যা ইতিপূর্বে গ্রাহ্য, সম্পাদকরা দিয়েছেন তার সুদক্ষ সুদর্শন ও প্রয়োজনীয় প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ লিখিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ক লেখার সঙ্কলন সম্বন্ধেও এ-কথাই সত্য। কিন্তু সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখিত 'শিবনাথ শাস্ত্রী' গ্রন্থখানি আরও পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে। শাস্ত্রীমহাশয় এক জ্যোতিষ্মান পুরুষকার। শিক্ষায় দীক্ষায় ধর্মসংস্কারে, স্বাধীনতার জ্বলন্ত সাধনায় যে-মানুষ জীবনে 'অভীঃ' এই মন্ত্রটিকে মূর্ত করেছেন, তিনি তেমনি এক পুরুষ। শৈলীরও তিনি এক সুনিপুণ শিল্পী। তাঁর 'আত্মচরিত'-এর পরেও তাঁর আদর্শানুপ্রাণিত আরও কয়েকজন মানুষের (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁদেরই একজন) লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি ও চরিত্রালেখ্য একসঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করবার সুযোগ এই ছোট সঙ্কলন গ্রন্থখানিতে লাভ করা গেল।

গোপাল হালদার

স্বাগনের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য। বার্ণিক রায়। দি পোস্ট গ্রাজুয়েট বুক মার্ট। সাড়ে আট টাকা
রবীন্দ্রনাথের কালান্তর। রবীন্দ্রনাথ মাইতি। তপতী পাবলিশার্স। চার টাকা রবীন্দ্রপরিচয়। সারদারঞ্জন পণ্ডিত ও ক্ষিতীশ গুপ্ত। জাহ্নবী সাহিত্য মন্দির। চার টাকা

রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় আমাদের উৎসাহ স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-নাথের জীবিতকালে তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত এবং আজ পর্যন্ত নিত্যনূতন গ্রন্থপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই ধারা অব্যাহত আছে।

স্বাভাবিক নিয়মেই রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত, এবং সমালোচনাকর্মে অধ্যাপকসমাজের তৎপরতা কার্যকারণ সম্পর্কেই তাৎপর্যপূর্ণ। তবু সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আঠাশ বছর পরেও অতৃপ্ত বোধ করেন, পাঠযোগ্য রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনার অভাবে। তথ্যসঙ্কলনে কাজ কিছুটা এগিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শোচনীয় অপারগতা রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করেছে। সঙ্গত কারণেই আজকের দিনে কারো মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ মহামানব বা ঋষি হলেও আধুনিক সাহিত্য ও সমাজচিন্তার জগতে তাঁর কোনো স্থান নেই। বিশ্ববিদ্যালয়েব তাড়না এবং অধ্যাপকদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা আমাদের কতটা ক্ষতি করেছে, তা এখন ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনেব জন্য নয়, স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ও বিতর্কের প্রয়াস যে-গ্রন্থে পাই, সংখ্যায় স্বল্প হলেও সেইসব গ্রন্থকারের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা আজকের দিনে তাই অনেক বেড়ে যায়।

'স্বাগনের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য' গ্রন্থটি রচনার জন্য শ্রীবার্ণিক রায়কে অভিনন্দন জানাই একাধিক কারণে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনার সূচনা করলেন তিনি। দ্বিতীয়ত, গীতিনাট্য বিচারের প্রয়োজনে তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের সুর, গীতিনাট্যে ছন্দ তাল লয় এবং গীতিনাট্যের মঞ্চশিল্প ও অভিনয় প্রসঙ্গগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনার সাহায্যে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তৃতীয়ত, গ্রন্থের অন্যতম প্রতিপাদ্য আমাদের কাছে সমর্থনীয় মনে হয়েছে, "রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের রূপগঠন আমাদের দেশীয় রীতিতে বিন্যস্ত নয়। ...রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের আলোচনার বিচারেও দেখা যায় যে দেশীয় পদাবলী কথকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসাদৃশ্য আকস্মিকভাবে এসেছে, কিন্তু প্রকৃত সত্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্ত্যরীতি, অপেরা বা ম্যাজিকাল ড্রামা।" রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য নিয়ে আলোচনার এই সূত্রপাতে আশা করা যায়, ভবিষ্যতে সঙ্গীত, মঞ্চ ও অভিনয়, এবং সাহিত্যমূল্য নিয়ে আরও অনেকে আলোচনা করবেন। শ্রীবার্ণিক রায় কোনো শেষ কথা বলেননি, তিনি আমাদের মনে অনেকগুলি জিজ্ঞাসা জাগিয়ে দিয়েছেন, এবং গ্রন্থটির সার্থকতা সেখানেই।

রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে আলোচনার সবচেয়ে বড় সুবিধা, তিনি নিজেই নিজের গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন অনেক সময়ে, আমাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধারও তিনি সৃষ্টি করেছেন এই একই কারণে—পাঠকের স্বাধীনতাকে তিনি খর্ব করেছেন। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথের তিনটি গীতিনাট্য—'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা'। গীতিনাট্যগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যাখ্যা আমরা এতবার শুনেছি যে, অন্য কোনোভাবে এগুলিকে ব্যাখ্যা করা ধৃষ্টতা মনে হতে পারে। অথচ সার্থক শিল্পকর্ম প্রত্যেক যুগকালে পাঠকের কাছে নূতনতর আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়, সুতরাং তাকে নূতনতরভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। শ্রীবার্ণিক রায় রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলির নূতন কোনো ব্যাখ্যা দিতে প্রণোদিত হননি। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে লেখকের কিছু বক্তব্য আছে, কিন্তু তাও নৃত্যের ভঙ্গি সম্বন্ধে—নৃত্যনাট্যের সঙ্গে গীতিনাট্যের সম্পর্ক তাঁর আলোচনায় স্পষ্ট হলো না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে দীর্ঘ অনুবাদ-অংশের উপযোগিতাও ঠিক বোঝা গেল না।

গ্রন্থের নাম 'হ্বাগনের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য'। 'নিবেদন'-অংশে লেখক জানিয়েছেন, "স্বাভাবিক ও সহজ বলেই তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে হ্বাগনের-এর (১৮১৩-৮৩) গীতিনাট্যই রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের মূল ভাববীজ বিস্তার করেছে।" কিন্তু সমগ্র গ্রন্থটি বারবার পড়েও লেখকের দাবি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া গেল না। পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও ম্যুজিকাল ড্রামা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল, কিন্তু হ্বাগনের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আমরা জানি না। সম্প্রতি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যাবতীয় রচনার সংকলন 'সঙ্গীত-চিন্তা' গ্রন্থে পাশ্চাত্ত্যসঙ্গীত ও সুরকারদের সম্বন্ধে তাঁর অনেক মন্তব্য পাওয়া যায়, কিন্তু হ্বাগনের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অবশ্যই সচেতনভাবে না হলেও, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের উপর হ্বাগনের-এর প্রভাব পড়তে পারে—অন্তত সম্ভাব্যতার দিক দিয়েও তা বিচার্য। লেখক যদি তা দেখাতে সক্ষম হতেন, তাহলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতুম। গ্রন্থের মধ্যে কয়েকস্থানে হ্বাগনের-এর প্রভাবের কথা বলা হয়েছে: পৃষ্ঠা ৫, ২১, ৬৬। কিন্তু এই প্রভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে লেখক

নিজেই অনিশ্চিত। একমাত্র 'মায়ার খেলা' প্রসঙ্গে হ্বাগনের-এর *Tannhauser*-এর সঙ্গে একটা তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু লেখক নিজেই বলেছেন, এই "সাদৃশ্য আকস্মিক চমৎকারিত্ব আনে"...."তবে মৃত্যুতে প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক দার্শনিকতার সান্ত্বনা রবীন্দ্রনাথে নেই।"

গ্রন্থটির তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য'-এ তিনটি গীতিনাট্যের বিশ্লেষণ, বাকি সমগ্র গ্রন্থটি এরই ভূমিকা বা পরিশিষ্টমাত্র। বিচ্ছিন্নভাবেই গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ—'পাশ্চাত্ত্য অপেরা, গীতিনাট্য ও হ্বাগনের।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য বিচারের সঙ্গে এই পরিচ্ছেদের কোনো সম্পর্ক নেই। তথ্যগত দিক থেকেও এই পরিচ্ছেদে এমন কোনো নূতন সংবাদ দেওয়া হয়নি, যা সাধারণ পাঠকের অজানা। এবং আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, হ্বাগনের-এর গীতিনাট্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্যের কথা লেখক উল্লেখমাত্র করার প্রয়োজন মনে করেননি। সম্ভবত হ্বাগনের-ভক্তদের উদ্দেশে বার্নাড শ-র তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তি আমাদের মনে পড়বে—"There are people who cannot bear to be told that their hero was associated with a famous Anarchist in a rebellion ; that he was proclaimed as 'wanted' by the police ; that he wrote revolutionary pamphlets ; and that his picture of Niblunghome under the reign of Alberic is a poetic vision of unregulated industrial capitalism as it was made known in Germany in the middle of the nineteenth century by Engels' Condition of the Labouring Classes in England." *(The perfect Wagnarite*, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, ১৯০১)

হ্বাগনের ও রবীন্দ্রনাথের তুলনা অসম্ভব নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের সঙ্গে তার যোগ নিতান্ত বহিরঙ্গ। বরং রবীন্দ্রনাথের শেষ-পর্বের রূপকনাটক এবং বিশেষত নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশদ তুলনা আশা করেছিলুম। হয়তো অনেকেই জানেন, হ্বাগনের-এর অসামান্য সৃষ্টি *The Victors*-এর উৎস চণ্ডালিকা-আখ্যান। হ্বাগনের কাহিনীটি পেয়েছিলেন বুরনুফ্-এর *Introduction a l' Histoire du Buddhisme Indien* (পৃঃ ২০৫) থেকে। রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The*

Sanskrit Buddhist Literature (পৃঃ ২২৩-২৪) থেকে চণ্ডালিকার কাহিনী নিয়ে তাঁর নৃত্যনাট্যটি রচনা করেন। একই বিষয় দুজন গীতি-নাট্যকারকে আকর্ষণ করেছে এবং একই কাহিনী দুজনের হাতে কতখানি ভিন্নরূপ গ্রহণ করেছে তা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ আছে। আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে হ্বাগনের ও রবীন্দ্রনাথের তুলনার দিকটি নিয়ে শ্রীবার্ণিক রায় আরও চিন্তা করবেন, এবং কিছু নূতন আলোকপাত করতে সক্ষম হবেন।

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাইতি প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথের কালান্তর' গ্রন্থের নামকরণটিও বিভ্রান্তিকর। 'কালান্তর' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন আছে, যে-গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধের নাম 'কালান্তর'। অধ্যাপক মাইতি সমগ্র গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থের বা প্রবন্ধের কোথাও নামোল্লেখ মাত্র করেননি, আলোচনা তো দূরের কথা। অন্যদিকে গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম কয়েকবার করা হয়েছে বটে, কিন্তু গ্রন্থের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ নন। এ-অবস্থায় গ্রন্থের নামকরণ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে, তা বোঝা অসাধ্য। গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা'য় লেখক গ্রন্থরচনার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, "রবীন্দ্র-নাথের 'কালান্তর' নামক গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে এই গ্রন্থটি ১৯৬২ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রচিত হয়।...কিন্তু তাহার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে মূল গ্রন্থটির কাজ আরম্ভ করা সম্ভব না হওয়ায় বন্ধুবরের পূর্ব পরামর্শ মত বর্তমানে ইহা প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইলাম।" কিন্তু তাহলে বর্তমান গ্রন্থের নামকরণ হওয়া উচিত ছিল 'রবীন্দ্রনাথের কালান্তরের ভূমিকা'। অবশ্য লেখক 'উপক্রমণিকা' অংশে অথবা গ্রন্থের মধ্যে কোথাও রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর'-এর সঙ্গে বর্তমান 'ভূমিকা'-গ্রন্থটির যোগ কোথায় তা বলেননি। তিনি তার পরিবর্তে 'চৈতন্যপরিকর' নামে থিসিস-গ্রন্থ সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন করেছেন।

'রবীন্দ্রনাথের কালান্তর' গ্রন্থটি পড়বার পর দেখা গেল, তার প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ ('পূর্বসূত্র' এবং 'পূর্বানুবৃত্তি') রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত; বাকি চারটি পরিচ্ছেদ যথাক্রমে—"সমাজের মূল দ্বন্দ্ব ও সামাজিক

অগ্রগতি', 'উনবিংশ শতকে বাঙালী সমাজে ধর্মনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অগ্রগতি', 'উনবিংশ শতকে বাঙালী সমাজের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অগ্রগতি', 'উনবিংশ শতকে বাঙালী সমাজের শিক্ষানৈতিক দ্বন্দ্ব ও অগ্রগতি'। রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বিংশ শতাব্দীর কালান্তর সূচিত করেছে, এবং সেই প্রবন্ধগুলির ভূমিকা হিসাবে বর্তমান শতাব্দীর কোনো বিশ্লেষণ গ্রন্থে স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে বলেই বোধহয় গ্রন্থকার উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-মনের বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থের বিচার সম্ভব কি না, সে-সম্বন্ধে মতান্তরের অবকাশ থাকলেও, উনবিংশ শতাব্দী সম্বন্ধে লেখকের কি বক্তব্য তা শোনা যাক।

লেখক গ্রন্থের মধ্যে অর্থনীতির কিছু কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যেমন উৎপাদিকা শক্তি, পালিকা শক্তি, উৎপাদন-সম্পর্ক, ধনতন্ত্র, শ্রেণীস্বার্থ ইত্যাদি। ফলে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি তিনি গ্রহণ করেছেন, এমন প্রত্যাশা নিয়ে গ্রন্থটি পড়া শুরু করি। কিন্তু লেখকের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মৌলিক, এবং তিনি অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের কোনো নিয়ম মানতেই প্রস্তুত নন। ফলে গ্রন্থটি পড়বার সময়ে পদে পদে বিভ্রান্তি ঘটে। শেষ পর্যন্ত ধারণা জন্মায় যে, লেখক কোনো ঐতিহাসিক সত্য প্রতিপাদন করতে ইচ্ছুক নন, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর একটি নূতন ব্যাখ্যা দিতে চান।

গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তবাক্যগুলি এবার উপস্থিত করা যাক—১। "দ্বন্দ্বমূলক দুইটি শক্তির মধ্যে একটিকে (উৎপাদন-সম্পর্কমূলক শক্তিকে) আমরা কিছুটা স্থূল বা শিথিলভাবেই বিধায়ক শক্তি এবং অন্যটিকে (সাংস্কৃতিক কাঠামোজাত শক্তিকে) তাহারই পালক বা ধারক শক্তি হিসাবে নামকরণ করিয়া লইতে পারি। প্রথমটির বিশেষ প্রকাশ ঘটিয়াছিল দ্বারকানাথের মধ্যে। কিন্তু ধারক বা পালকশক্তিও অভ্যন্তরে থাকিয়া সক্রিয় ছিল। হঠাৎ একদিন দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয়।"...."দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে পূর্ববর্তী ধারায়, অর্থাৎ বিধায়ক শক্তির প্রবল ঘূর্ণায় বেগবান করিতেছিলেন। কিন্তু অলকা তাঁহাকে ধারক বা সংরক্ষক শক্তির অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।" ২। "তারপর সে দেশের (পাশ্চাত্ত্য) কতিপয় চতুর ব্যক্তি...স্বীয় দেশভূমিতে উৎপাদন-

সম্পর্কের একটি স্বার্থ প্রভাবিত রূপ হিসাবে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।"....
"উৎপাদন সম্পর্কজনিত প্রাচীন বিধায়ক হিসাবে ধনতন্ত্র এবং তাহা হইতে উদ্ভূত প্রাচীন পালক বা প্রতিক্রিয়া শক্তি হিসাবে ধর্মতন্ত্র এই উভয়ের শক্তি-দ্বন্দ্বের মন্থনোদ্ভূত অমৃত ফলই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা উপলব্ধি করিবার পূর্বে তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে একটু দৃষ্টিনিক্ষেপ করা প্রয়োজন।" ৩। "বস্তুত, অলক্ষ্যোপচিত শক্তির মহামুক্তি-প্রদাত্রী বলিয়াই প্রতিভা এমন অসাধারণ বলিয়া গণ্য হয়; আপাতবিচ্ছিন্ন সূত্রে অনমুস্যূত ঘটনা-পারম্পর্যের উদ্ভাসমান ফলের নামই অঘটন। সেই ঘটিয়া উঠিবার মধ্যেই রবীন্দ্রপ্রতিভার মহিমা ও প্রধান সার্থকতা। দৃঢ়তার সঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে যে, ঐ ঘটিয়া উঠা কোনও নিছক যান্ত্রিক (mechanical) ক্রিয়া নহে।" ৪। "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ছিলেন ধনতান্ত্রিক বিধায়ক শক্তি ও তৎসৃষ্ট বা তদুদ্ভূত ধর্মতাত্ত্বিক ধারক-শক্তি, এই উভয়েরই দ্বন্দ্ব-সমুত্থিত একটি অমৃত ফল বিশেষ। তাই তাঁহার যাত্রাপথও এমন মহিমময়। কিন্তু আসলে সেই পথ অসৎ হইতে সৎ-এর পথ হইলেও অসত্য হইতে সত্যের পথ নয়।"

গ্রন্থের মূল চারটি পরিচ্ছেদ থেকে লেখকের চারটি সিদ্ধান্তবাক্য উদ্ধার করা হলো। পাঠক নিজেই এগুলির সত্যতা বিচারে সক্ষম হবেন। গ্রন্থের দুরূহ-ভাষা সম্বন্ধে লেখক নিজেই 'উপক্রমণিকা' অংশে দোষ স্বীকার করে রেখেছেন, তবে আমাদের মনে হয় প্রয়োজনবোধে এটুকু কষ্ট স্বীকার পাঠকের কর্তব্য।

'রবীন্দ্রপরিচয়' গ্রন্থটি একটি বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রকাশিত হয়েছে; ভূমিকায় শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীক্ষিতীশ গুপ্ত জানিয়েছেন, "সর্বতোমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন অনেক অনুসন্ধিৎসু আছেন, যাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু জানতে চান। যেমন ঠাকুর বংশের আদি স্থান কোথায়, কি ভাবে তাঁরা কলকাতায় এলেন, প্রিন্স দ্বারকানাথের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পুরুষদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁদের বিভিন্ন কর্মধারা।" শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত লিখিত 'রবীন্দ্রকথা' নামে গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদটি এই প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে লেখা, এবং সেদিক দিয়ে সার্থক। 'ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ'-এর পরিচয় দানের জন্য আরও কয়েকটি পুরানো স্মৃতিকথা-জাতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, যেমন শান্তা দেবীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', সি. এফ. এণ্ড্রুজ-এর 'কবি', এবং কবিপত্নী সম্বন্ধে একটি রচনা। (শেষোক্ত প্রবন্ধটির

নাম ও লেখক-পরিচয়, দুর্ভাগ্যক্রমে দপ্তরির অনবধানতার ফলে দুটি পৃষ্ঠা বাদ যাওয়ার, অজানা থেকে গেছে। প্রসঙ্গত জানাই, গ্রন্থটির' কোনো সূচীপত্র নেই, এবং পৃষ্ঠার উপরেও রচনার নাম দেওয়া নেই।) গ্রন্থের শেষ রচনা একটি দু-পৃষ্ঠার প্রবন্ধ; শ্রীজয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়ের 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি'। এটি ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস নয়—রবীন্দ্রনাথের দেখা ও বাস করা ঠাকুরবাড়ির পরিচয় নয়—আসলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বর্তমান যে-সংগ্রহশালা করা হয়েছে, তার বিবরণ। জানি না, সাধারণ পাঠকের দিকে তাকিয়েই বোধহয় প্রবন্ধটি গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'রবীন্দ্রপরিচয়' গ্রন্থের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ 'রবীন্দ্রজীবনের ঘটনা ও রচনাপঞ্জী'। 'রেডি রেফারেন্স' হিসাবে এই অংশটি যেকোনো পাঠকেরই কাজ লাগবে।

এই পর্যন্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্য বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সম্পাদকদ্বয় (যদিও গ্রন্থকার হিসাবেই তাঁদের নাম প্রচ্ছদে ও নামপত্রে ছাপা হয়েছে, কোথাও সম্পাদনার কথা বলা হয়নি) ভূমিকায় আরও জানিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথ কবি আর তাঁর জীবন সাহিত্যময় জীবন। তাই রবীন্দ্রজীবন-কথার আলোচনায় তাঁর সাহিত্যচর্চার বিষয় আপনি এসে পড়ে। সে-কথা মনে রেখে কবির সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট অধ্যায়গুলি বিশেষজ্ঞ লেখকদের দিয়ে লেখানো হয়েছে।" এই জাতীয় রচনার মধ্যে একমাত্র বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ' ছাড়া অন্য কোনো প্রবন্ধই বিশেষজ্ঞতার পরিচয় বহন করে না। যেমন, ক্ষিতীশ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি' (আকারে দেড় পৃষ্ঠারও কম), প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথ ও শিশুসাহিত্য', গোপালচন্দ্র রায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ', কৃষ্ণ ধরের 'মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ', বিনয় রায় ও সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তোমারি তুলনা তুমি' এবং প্রফুল্ল চন্দের 'বিদেশে রবীন্দ্রনাথ'। প্রমথ চৌধুরীর 'শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ' বিশেষজ্ঞতার পরিচায়ক না হলেও, অধুনা বিস্মৃত এই রচনাটির পুনরুদ্ধার প্রশংসাযোগ্য। অন্য প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে এ-কথাও বলা চলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধের দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণের যৌক্তিকতাও বোঝা গেল না। প্রবন্ধ দুটি প্রত্যুত্তরমূলক রচনা—সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি সঙ্গে না থাকলে প্রত্যুত্তরগুলির কোনো মূল্য থাকে না। তাছাড়া "সাধারণ মানুষের অনুসন্ধিৎসা"র পক্ষে এই প্রবন্ধদুটির প্রয়োজন আছে কি?

সবশুদ্ধ মিলিয়ে 'রবীন্দ্রপরিচয়' গ্রন্থটিতে পরিকল্পনার অভাবই প্রকট হয়েছে। আশা করা যায়, পরবর্তী সংস্করণে সম্পাদকদ্বয় এ-বিষয়ে আর-একটু সতর্ক হবেন।

অলোক রায়

নভেম্বর বিপ্লবের বাহান্নতম বার্ষিকী

নেভা নদীতে নোঙর করা যুদ্ধ জাহাজ অরোরা থেকে শীত প্রাসাদের উপর যে দিন প্রথম গোলাটি ফেটে পড়েছিল, তারপর বাহান্ন বছর পার হয়ে গেল। সেই গোলাবর্ষণের বজ্র নির্ঘোষ, বিশ্বে শোষণাশ্রয়ী পরগাছা ব্যবস্থার ভিত ভেঙে দিল। শীত প্রাসাদ যেন প্রতীক। সেণ্ট পিতর্সবুর্গে নিরঙ্কুশ বর্বর সামন্ততান্ত্রিক শাসনের প্রতিনিধি জার-এর শীত কালীন ব্যসন প্রাসাদটি, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর পুঁজিপতিদের শাসন কেন্দ্র পেট্রগ্রাদের শীত প্রাসাদ। শোষণের চিতাবাঘ রাজকীয় সেণ্ট পিতর্সবুর্গ নাম বদলে 'গণতন্ত্রী' পেট্রগ্রাদ নাম নিলেও যে গায়ের চাকা চাকা দাগ বদলায় না, অরোরার ক্রুদ্ধ কামান গর্জন সেই ভোল পাল্টানো রূপের বিরুদ্ধে বিপ্লবী হুঙ্কার। এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯১৭ সালের সাতুই নভেম্বর শোষণের অবসান ঘটলো রুষদেশে। বিপ্লবের সংগঠন, সমাজের অগ্রণীশ্রেণী-শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টি পৃথিবীতে নতুন ব্যবস্থার পত্তন ঘটালেন। নেতৃত্ব দিলেন বিশ্বের সর্বকালের বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। আর এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শ্রমিক চিরকালের জন্য শোষণমুক্ত হলো সে দেশে। দারিদ্র্য, কূপমণ্ডূকতা, সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকের দীর্ঘকালীন সংগ্রাম জয়ী হলো। জার শাসনের শিকলে বাঁধা জাতিগুলির মুক্তি এলো। শ্রমিকমুক্তির লড়াই জাতিসমূহের মুক্তির সংগ্রামকে জয়ী করলো। গড়ে উঠলো সোভিয়েত মহারাষ্ট্র, মহাজাতি সমবায়, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র।

গত বাহান্ন বছরে বিশ্বের ইতিহাসে সোবিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবী অবদান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র বিশ্ব-পরিমণ্ডলে একদিকে যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকের শোষণবিরোধী আন্দোলনকে ভরসা দিয়েছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনের দাপটে কণ্ঠরুদ্ধ, ক্লিষ্ট দরিদ্র উপনিবেশগুলির মানুষকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে শক্তি দিয়েছে। রুষ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্রে ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অসংখ্য যোদ্ধা আশ্রয় পেয়েছেন, ভরসা পেয়েছেন, নতুন আদর্শে

দীক্ষিতও হয়েছেন। লেনিন প্রবর্তিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের উপনিবেশগুলি সম্পর্কে অভয়বাণী পৌঁছলো দেশে দেশে: উপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তিলড়াইয়ের সঙ্গে উন্নত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। উপনিবেশের মানুষের মুক্তি ছাড়া ধনীদেশের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অসম্ভব। একদিকে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধি, অন্যদিকে মূলধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট, পৃথিবীর সমস্ত শোষিত মানুষের সামনে নতুন জীবনের পথ নির্দেশ করেছে। মুমূর্ষু পুঁজিবাদ, একচেটিয়া তাৎপর্যে যার অন্য নাম সাম্রাজ্যবাদ, দেশে দেশে মানুষের রক্তপান করে, মহাযুদ্ধের তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে শক্তি পেতে চেয়েছে। রুশ মহাবিপ্লবের পর পৃথিবী প্রবেশ করেছে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের যুগে। সমাজতন্ত্রের যুগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোবিয়েত এবং, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও উপনিবেশের মানুষদের জঘন্য শত্রু দস্তুর নরমাংসাশী সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করেছে ফ্যাসীবাদ বিরোধী জনতার সংগ্রাম, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে জনতার জয়, লালফৌজের বিজয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিজয় পতাকা উড্ডীন হলো। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে মানুষ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হলো। বহু পদানত দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জয়ী হলো—কোথাও-বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শক্তিশালী হলো, বিজয়ের পথে পা বাড়াল। ভারতও স্বাধীন হলো। স্বাধীন ভারতেরও প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন মহা-সোভিয়েতের লাল ফৌজ। নভেম্বর বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সন্তান, বিশ্বমুক্তির সর্বত্যাগী সেনানীরা নিজেদের রক্ত দিয়ে, মহাসোভিয়েতের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীবন্ধন রচনা করেছেন। যে বন্ধন ছেঁড়বার নয়।

এ-বছর মহান লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী বছর। মহাসোভিয়েত শিক্ষা নিয়েছে লেনিনের কাছে। লেনিনবাদের কাছে। পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদের যুগে, সমাজতন্ত্রের বিকাশ ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদের অন্যনাম লেনিনবাদ। মার্কসের তত্ত্বকে সৃজনশীল তাৎপর্যে লেনিন সমৃদ্ধ করেছিলেন। মার্কস-এঙ্গেলস প্রাক-একচেটিয়া মূলধনের সর্বব্যাপ্ত শাসনের যুগ দেখে গিয়েছিলেন। বিশ্বজুড়ে তখনও 'মূলধন-তন্ত্রের' 'শান্তিপূর্ণ' বিস্তার এবং সহজভাবে ক্রমবিকাশের স্তর। পুরনো ধরনের পুঁজিবাদ উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকেই সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপে একচেটিয়া

মূলধনতন্ত্রের এলোমেলো, ধ্বংসাত্মক ও অসম বিকাশে নিজের নাভিশ্বাস ডেকে এনেছে। বাজার, মূলধন রপ্তানি ইত্যাদির জন্য সংঘর্ষ, পারস্পরিক অসম বিকাশের তাৎপর্যে মূলধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের অবস্থার সৃজন ঘটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চস্তর-মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তায় লেনিনের এই ব্যাখ্যা নতুন অবদান। আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, লেনিন তাই সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের অগ্রণী ভূমিকাবিধৃত ঔপনিবেশিক জাতিগুলি ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ ফ্রন্টগঠনের তত্ত্ব দেন।

দ্বিতীয়ত, লেনিন সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব-তত্ত্বের প্রয়োগগত বিশিষ্টতা প্রমাণ করেন। মূলধনের বিরুদ্ধে শ্রমের বিজয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য লেনিন সোভিয়েত-রূপী সরকার আবিষ্কার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর তত্ত্বেরও উদ্‌গাতা। আর এই শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব যে সর্বোচ্চ ধরনের গণতন্ত্র, সংখ্যা গরিষ্ঠের (শোষিতের) গণতন্ত্র, পুঁজিবাদী সংখ্যালঘিষ্টের (শোষকের) গণতন্ত্রের একেবারে বিপরীত এটাও লেনিন দেখিয়ে দেন।

তৃতীয়ত, লেনিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রদ্বারা ঘেরা থাকলেও, একটি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার তত্ত্ব দেন। আর, এ পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্বেরও তিনি প্রবক্তা। ট্রটস্কীবাদী বিশ্ববিপ্লব, চিরায়ত বিপ্লব, একদেশে সমাজতন্ত্র বিকাশের বিরুদ্ধে মত এবং বিপ্লব রপ্তানি করার তত্ত্বও তিনি খণ্ডন করেন। চতুর্থত, লেনিন, বিপ্লবী অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর প্রাধান্য, বিপ্লবে কোথাও নেতৃত্ব দান, কোথাও ফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগের বিষয়ে তত্ত্ব দেন। এবং লেনিনবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী নামে-স্বাধীন বা পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্র, বিরোধী—শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে 'তত্ত্বগত পরিপ্রেক্ষিতে' বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব—জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব গড়ে ওঠে। পূর্ব ইউরোপের জনগণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, চীন কোরিয়া ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক রিপাবলিক প্রভৃতির সমাজতন্ত্রে বিকাশের অভিজ্ঞতায় ঐ তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিশেষভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়া (ও মুৎসুদ্দী) পুঁজি এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ঐ দেশগুলিতে অন্যান্য শোষিত শ্রেণীগুলি মেনে নেওয়াতেই জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আবার, যে সদ্য স্বাধীন অনুন্নত দেশে শাসন ক্ষমতায় পুঁজিপতি শ্রেণী রয়ে গেছে, অথচ একচেটিয়া পুঁজি—সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে, দেশের 'স্বদেশী' পুঁজিপতি, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে রক্তশূন্য করতে আগ্রহী সেখানে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে, অ-ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক বিকাশে দেশকে সমাজতন্ত্রে নিয়ে যাবার বিপ্লবী অবস্থাকে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী' অবস্থা বলা হয়। সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে এই বিপ্লব 'জাতীয়' বিপ্লব এবং সামন্ততন্ত্র বা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের বিরুদ্ধে এই বিপ্লব 'গণতান্ত্রিক' বিপ্লব। এখানেও শ্রমিকশ্রেণীর বিশিষ্ট ভূমিকা। শ্রমিকশ্রেণী উদ্যোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজিও সামন্ততন্ত্রের অবশেষের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট রচনা করে এবং পুঁজিপতিদের রাষ্ট্রশক্তি থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্ততন্ত্রী প্রতিনিধিদের হটিয়ে দিয়ে শ্রমিক-কৃষক এবং সাম্রাজ্যবাদ-একচেটিয়া পুজিবিরোধী গণতন্ত্রী স্বদেশী পুজিপতিদের যৌথ ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে। ভারতের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই লেনিনবাদী চিন্তার বিকাশও লেনিনেরই অবদান।

পঞ্চমত, লেনিন জাতীয় এবং ঔপনিবেশের প্রশ্নে নতুন অবদান রাখেন। মার্কস এঙ্গেলস তাঁদের জীবৎকালে আয়রল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, চীন, মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলি, পোলাণ্ড, হাঙ্গারি প্রভৃতি দেশের আলোচনাপ্রসঙ্গে জাতীয় ও উপনিবেশের সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করেন। সাম্রাজ্যবাদের যুগে লেনিন, মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাকে একটি সুবিন্যস্ত রূপ দেন। জাতীয় ও উপনিবেশের প্রশ্নগুলিকে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ করার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর সম্বন্ধ করেন। আর, সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে, ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে জাতীয় এবং উপনিবেশের প্রশ্ন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রশ্নের একটি বিশেষ অংশ। এবং ভারতের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব লেনিনবাদী তত্ত্বের একটি বিশিষ্ট ও বাস্তব প্রয়োগ।

ষষ্ঠত, লেনিন দিয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী—রাজনৈতিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ব। মার্কস-এঙ্গেলস অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী রাজনৈতিক পার্টির কথা বলেছেন। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাপ্রসঙ্গে নির্দেশ করেন যে শ্রমিকদের অন্যবিধ সংগঠন প্রভৃতির (যেমন ট্রেড

ইউনিয়ান, কো-অপারেটিভ, সরকারী সংস্থা) ঊর্ধ্বে এই পার্টি, ঐ অন্যবিধ সংগঠনগুলিতে পার্টির কাজ হলো সাধারণীকরণসহ নির্দেশনা। এবং পার্টি'র নেতৃত্বেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কার্যকরী হতে পারে। 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে'র প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টি অন্য পার্টির সঙ্গে নেতৃত্ব ভাগাভাগি করে নেবে না। কেননা, সমাজতন্ত্র গঠনের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর একটি মাত্রই পার্টি থাকে। এবং লেনিনের মতে, সমস্ত প্রকার পিছুটান ও আক্রমনের বিরুদ্ধে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলাসম্পন্ন পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে পারে। গত বছর চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভ্রান্তি, এই পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্ব বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের তাৎপর্যেই দেখা দিয়ে—সমাজতন্ত্রের মূল ধরেই টান দিয়েছিল। বলা যেতে পারে, অসংখ্য বিষয়সহ উপরোক্ত ছটি বিষয়ে লেনিন মার্কস এঙ্গেলসের তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। লেনিনবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

লেনিন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে লেনিনবাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাভিত্তিক ঐক্যের তাৎপর্যে সংগঠিত করেছিলেন। সেই সোভিয়েত দেশ বিপ্লবোত্তর গৃহযুদ্ধ, নয়া-আর্থনীতিক নীতি, আর্থনীতিক পরিকল্পনা, কৃষিযৌথকরণ, মহান দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা—পার হয়ে এখন কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় ব্রতী। মানুষ প্রয়োজনের জগত থেকে স্বাধীনতার জগতে উত্তীর্ণ হতে চলেছে সেখানে। শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যেমন পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সামনে সঙ্কটমুক্ত আর্থনীতিক বিকাশের দিশা রেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে সদ্যস্বাধীন অনুন্নত দেশগুলিকে আর্থনীতিক ও কারিগরী সাহায্য দিয়ে, অ-মূলধনতান্ত্রিক বিকাশের রাস্তায় এনে দাঁড় করাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মূলধন রপ্তানী এবং বাজার দখল না করে বেঁচে থাকতে পারে না, সোভিয়েতের শান্তিপূর্ণ আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা, নরমাংসলোভী সেই পুঁজিবাদের মুখের গ্রাস সরিয়ে দিচ্ছে এবং একদা দুর্বল ও পশ্চাদপদ ব্যবস্থায় স্বাধীন আর্থনীতিক বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি করে লেনিনবাদী জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের সমাধান এনে দিতে সহায়তা করছে। আবার ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র, রসদসম্ভার। শক্তি দিচ্ছে আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার মুক্তি আন্দোলনকারীদের। নয়া-ঔপনিবেশিক চাপ থেকে সদ্যস্বাধীন

দেশগুলিকে আর্থনীতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছে সোভিয়েত ভূমি। বিশ্বের প্রতিটি শোষিত মানুষের কাছে তাই সে নেতা, আদর্শস্থানীয়, সহানুভূতিশীল, ভ্রাতৃপ্রতিম।

ভারতের বর্তমান রাজনীতিতেও সোভিয়েত মহাবিপ্লবের ছাপ পড়েছে। ভারতের শোষিত মানুষ মুক্তির লক্ষ্যে ব্রতী হয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট রচনা করতে চায়। ভারতের শাসক দল জাতীয় কংগ্রেস, পুঁজিপতিদের দল। ভারতে পুঁজিপতিদের একাংশ, একচেটিয়া পুঁজির মালিক। তারা সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় সঙ্গী। তারা সামন্ততন্ত্রের অবশেষ রক্ষায় ব্রতী। গণতন্ত্রের অনেকগুলি নীতি প্রচার করা হয়ে থাকে যথা, বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকার, প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র, ধর্ম ও বর্ণ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রচরিত্র, পরিকল্পনার মাধ্যমে দারিদ্রের নিরাকরণ, ভূমির ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ, একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রণ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পররাষ্ট্র নীতি। অথচ ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এই অভিব্যক্তিকেও চূর্ণ করার উপাদানই জোরালো হয়ে উঠছে। এর সাম্প্রতিক প্রমাণ, যেমন একদিকে 'সিণ্ডিকেটে'র লোক দিয়ে রাষ্ট্রপতিপদ দখল করে, দুরাচারী একনায়কতা প্রবর্তনের অপচেষ্টা, অন্যদিকে আমেদাবাদে দাঙ্গার মত জঘন্য ঘটনা ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক জাতীয় সংহতিকে বিঘ্নিত করা। এগুলি রোগ নয়। একচেটিয়া পুঁজির জনবিরোধী রোগের 'সিমটম' মাত্র। কংগ্রেসের ঘরেবাইরে সেই গণতন্ত্রবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি, সামন্ততন্ত্রের সেবাদাস—অন্ধকারের শক্তি সিণ্ডিকেট জনসজ্ঞ স্বতন্ত্র দল। বাইশ বছর ধরে গণআন্দোলনের চাপ কংগ্রেসের মূল ধসিয়ে দিয়েছে। এখন তার ঘরের মধ্যে একচেটিয়া ও 'স্বদেশী' বুর্জোয়াদের বিরোধ তিক্ত রূপ নিয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদের মুখপাত্র 'সিণ্ডিকেট' পন্থীরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর দলের প্রাথমিক সভ্যপদ কেড়ে নেওয়ার পর এ দ্বন্দ্ব তীব্রতম সঙ্কটে রূপান্তর নিয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে, একচেটিয়া পুঁজির ধনভাণ্ডার ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ, মোরারজী দেশাই-এর হাত থেকে অর্থদপ্তর কেড়ে নেওয়া—এ সমস্তই একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে স্বদেশী বুর্জোয়াদের কিছুটা জঙ্গী মনোভাবের স্মারক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি'র কষ্টিপাথরে বিচার করে বুঝেছিলেন কংগ্রেসে ভাঙন আসন্ন।

এবং সে জন্য দ্রুত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে তাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঐ ফ্রন্টের শক্তির প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ, কেরেলায় সুষ্ঠুভাবে ধরা পড়লো। অন্যান্য রাজ্যেও কংগ্রেসের উপরে চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে একাংশ বেরিয়ে গিয়ে যারা পালটা পার্টি তৈরি করেছিলেন কংগ্রেসের এই অন্তর্বিরোধকে তাঁরা আদৌ পাত্তা দেননি। কমিউনিস্ট পার্টির ঐ বিষয়ে মনোভাবকে তাঁরা ভ্রষ্টতা শোধনবাদ প্রভৃতি বলে জিগির তুলেছিলেন। এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টিকেও শোধনবাদী বলতে তাঁরা ছাড়েন নি। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁরা তখন চীনা রাজনীতির মতান্ধতাকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন। চীন যখন তাঁদেরও নয়া শোধনবাদী আখ্যা দিল তখন তাঁরা মুক্তি খুজলেন প্রতিহিংসাপ্রবণ দলবাজির সঙ্কীর্ণতাবাদী ভ্রষ্টাচারে। যুক্তফ্রণ্টের রাজনীতি বিষয়ে তাঁদের মত ছিল অবৈজ্ঞানিক। তাঁদের তত্ত্বমত তাঁদের পার্টির নিরঙ্কুশ প্রভাব যদি না থাকে যুক্তফ্রণ্ট রচনায় তাঁরা দায়িত্ব নেবেন না। এ সেই 'টয়লাস ফ্রণ্ট' করার এক ট্রটস্কীবাদী বকলম মাত্র এমন কি জনগণতন্ত্র বিষয়ে তাঁদের অবৈজ্ঞানিক ধারণা এ-ধরণের চিন্তায় রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, মতান্ধতা ও সঙ্কীর্ণতার সৃজন ঘটিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি অবিলম্বে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে কার্যকরী করতে হবে' বলে যাঁরা সংসদীয় সংগ্রামকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে চাইলেন, আজ তাঁরাই যুক্তফ্রণ্ট নয়, পার্টির স্বার্থে প্রশাসনকে কাজে লাগাবার কাজে সবচেয়ে আগ বাড়িয়ে তৈরি। দপ্তরের দামে তাঁরা বিপ্লবী। এমন কি দরিদ্র কৃষক-শ্রমিককে হত্যা করা, কিংবা ইউনিয়ন দখলের নামে অগণতান্ত্রিক আক্রমণ—সবই সেই বিপ্লবী নামাবলীর আড়ালে চলেছে, যুক্তফ্রণ্ট যে জাতীয় গণতন্ত্রী বিপ্লব আনছে এ কথা তাঁরা বুঝেও বোঝেন না। অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেও তত্ত্ব প্রয়োগের মতান্ধতা ও ভ্রান্তিবিলাসে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে উঠতে চান না। অন্তত নেতৃত্ব কর্মীদের সামনে একটা তত্ত্বের ধোঁয়াটে আবরণ রেখে দিতে সচেষ্ট। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রণধ্বনির যাথার্থ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ইন্দিরা গান্ধীকে আজ আগ বাড়িয়ে সমর্থন করছেন। অর্থাৎ সিণ্ডিকেট এদের মতে এখন দারুণ রক্ষণশীল, দারুণ প্রতিক্রিয়াশীল। অথচ কিছুদিন আগেই এঁরাই দু'গোষ্ঠিকেই একই বিষয়ে বর্ণচোরা ভেদ বলে প্রচার করছিলেন।

লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনে দেখা গেল সিণ্ডিকেট-জনসংঘ স্বতন্ত্র আঁতাত। একথা কমিউনিস্ট পার্টি আগেই বলেছিলেন। এবং স্বদেশী বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতা আছে বলে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বেও কংগ্রেসকে তাঁরা ব্লাঙ্ক চেকও দেননি। বলেছেন, কর্মসূচীর ভিত্তিতে তাঁরা ইন্দিরা গান্ধী সরকারকে সমর্থন বা অসমর্থন করবেন। জনহিতকর আইন পাশ করার সময় পাশে থাকব, কিন্তু জনবিরোধী আইন যেমন প্রিভেনটিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট পাশ করতে এলে বিষম বিরোধ বাধবে। সেখানে কোন সমঝোতা নেই। অর্থাৎ লেনিনবাদী পন্থায় শত্রু-মিত্র চিনতে যেন ভুল না হয়। জাতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতা বিষয়ে সচেতন থেকে. গণউদ্যোগ গড়ে তুলে জাতীয় গণতন্ত্রের রণধ্বনিকে জয়যুক্ত করতে হবে।

মহান রুষ বিপ্লবের কাছে এ শিক্ষাও কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার বলে, স্বদেশ ও বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত বুঝে তাকে যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগ নিতে হয়। কেরেলার জনগণের দীর্ঘদিনের ঈপ্সাকে ভ্রান্ত রাজনীতিতে বানচাল করতে চেয়েছে যখন পাল্টা কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন ফ্রণ্ট বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী শাসনের খপ্পরে কেরেলাকে পড়তে দেননি। একদিকে কংগ্রেস ভাঙছে—অতি দক্ষিণের শক্তি। তেমনি অন্যদিকে অতিবাম-ট্রটস্কীবাদী সুবিধাবাদী রাজনীতিও ভাঙতে বাধ্য। সঙ্কীর্ণতার কূপমণ্ডুকতা ত্যাগ করে যথার্থ 'মার্কসবাদী'রা যে বাস্তবের দর্পণে রাজনৈতিক অবস্থার মুখ দেখতে পেয়ে, দ্রুত সৃজনশীল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের রণধ্বনিতে সামিল হবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এও মহান রুষ বিপ্লবের শিক্ষা।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক। দীর্ঘজীবী হোক নভেম্বর বিপ্লব।

শুভব্রত রায়

গু গা বা বা

ছবিটি মুক্তি পাওয়ার প্রায় মাসখানেক আগে বড় রাস্তার মোড়ের নানা রঙের নানা ঢঙের পোস্টারের ভিড়ে হঠাৎ একটিতে চোখ আটকে গেল। সবুজ আর লালে, উপর থেকে নিচে সাজানো চারটি অক্ষর—গু-গা-বা-বা। বিজ্ঞাপন নিশ্চয়। কিসের বিজ্ঞাপন? মানে কি কথাটার?

বুঝলাম। সেদিন থেকে আর অনর্থক 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এতগুলো কথা বলি না। ছবিটি নিয়ে তো সর্বত্রই আলোচনার তুফান ওঠে। অতগুলো কথা দিয়ে নামোল্লেখ মোটেই সুবিধের নয়। আর শুধু গুপী গাইন...বলে ছেড়ে দেওয়াও আমার ন্যায্য মনে হয় না। গু গা বা বা বলতে ভালো, শুনতে ভালো, শিশুসুলভ মজাদারও।

প্রচারে আর-এক চমক। তারকা নয়, প্রযোজক পরিবেশক বা কাহিনীকার নয়, পরিচালকের নামে—'সত্যজিৎ রায়ের ছবি।'

পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনাটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করতে সত্যজিৎ রায় যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন, তাতে গল্প-কথাটির হৃদয়গ্রাহিতা তিনি বহুগুণে বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। ছোটদের জন্য রূপকথা বা কল্পনার 'চলচ্চিত্র' আমাদের আদৌ ছিল না। কিন্তু প্রথমেই যেটি পেলাম, সেটি মহৎ শিল্প। সাহিত্যে শুধু ভাষার গুণে যা সুখপাঠ্য ছিল, তাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করতে স্বভাবতই নাটকীয়তা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবতারণা করতে হয়েছে, বাড়াতে হয়েছে। ভালো রাজার দেশের সুখ-শান্তি-শস্য-সম্পদের বিপরীতে মন্দ রাজার দেশের অনাহার-অত্যাচার-যুদ্ধলিপ্সা ইত্যাদির উপস্থাপনা করতে হয়েছে। কিন্তু এ-ছবির বক্তব্য নিয়ে অনেক গবেষণা শোনা যায়। অনেকে যুগোপযোগী, যুদ্ধবিরোধী, বিশ্বশান্তির বাণী ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ছবিটিতে পাই—হাল্লার রাজা এবং শুণ্ডীর রাজা ভাই। তাদের কুড়ি বছর পরে মিলন হলো। হাল্লার রাজা ছিল সরল ভালোমানুষ। শয়তানরা (মন্ত্রী যাদুকর ইত্যাদি) তাকে ধরে নিয়ে ওষুধ খাইয়ে, তাকে দিয়ে ...."কী

না করিয়েছে।" বর্তমানের রাজনীতির সঙ্গে এর কী কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়? হিংসা অত্যাচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে শিল্প-সংস্কৃতি জয়ী হবে—মূল সাহিত্যের এই থীমই চলচ্চিত্রেও বিধৃত এবং এই থীম চিরকালীন সত্য। এর মধ্যে বর্তমান রাজনীতি খুঁজে পাই না—দরকারও দেখি না।

ভালো রাজার দেশের প্রজারা মূক কেন...এ-নিয়েও প্রশ্ন জেগেছে। চিত্রে পাই— মন্ত্রীর উক্তি — প্রজারা কি চায়, তা যদি জানতে পারা না যায়, তাহলে কী তাদের চাওয়া থেকে বঞ্চিত করা চলে? অর্থাৎ অত্যাচারী শাসক নিজের ভোগের পাহাড় গড়ে তোলে প্রজাদের বঞ্চনা করে। এ-ও চিরকালীন সত্য। এরই সমর্থনে হাল্লার মন্ত্রী সেনাপতির অপরিমিত আহার এবং প্রজাদের অনাহার ক্লিষ্টতা। দ্বিতীয়ত, শুণ্ডীর সবাই মূক, সভাগায়কও মূক—এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাগায়ক নিয়োগের জন্য গানের বাজীর অবতারণা করে গুপী-বাঘার রাজদরবারে নিযুক্ত হবার ঘটনাকে যুক্তিগ্রাহ্য করা হয়েছে।

পশুপাখি আর রঙ্গচিত্রের পাশে পাশে পরিচয়লিপি চলতে চলতে "গুপী-নাথের গানের বড় শখ"...এর পরেই উল্টো করে তানপুরা কাঁধে একখানা হাত বাড়ানো গুপীর নিশ্চল চিত্র। এই বিশেষ ভঙ্গিমায় নায়কের নিশ্চল চিত্রের প্রথম উপস্থাপনায় যে-হাস্যরসের সূচনা, সেটি শেষদৃশ্য পর্যন্ত অব্যাহত। গুপী ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে চলতে আরম্ভ করে..."তুমি চাষা আমি ওস্তাদ খাসা।" শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কৌতুকপ্রদ সংলাপের মাধুর্যও রক্ষিত। বটতলায় তানপুরা প্রাপ্তির ব্যখ্যায় "বল্লেন....তামাক সেজে দে, দ্যালাম...তা দ্যালাম ...তাও দ্যালাম" শুনতে শুনতে হাসির হররায় হল ফেটে পড়ে। "তার পর কানডা কসে মলে দিলেন" "তোমার কান" "আমারও এডারও। বল্লেন যন্ত্রের সুর যন্ত্রের কানে তোমার সুর তোমার কানে।" বাঘার মুখের "আমি তখনই বুঝেছিলাম, তিনডে বর যথেষ্ট নয়।" রাজদরবারে "না ব্যবস্থা ভালোই", "ভূতেরা এত ভালো ঘি পায় কোথায়," এর জবাবে "গরুর ভূতের দুধের থেকে" অংশটির রসবোধ তো অতুলনীয়।

বৃহদাকার ঠ্যাং খেতে খেতে হাল্লার মন্ত্রীর "তোমরা সব সময় খাইখাই করো কেন বলো তো"। অনেক দর্শকেরই মুখে মুখে ফিরেছে। শুণ্ডীতে কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতিই নেই শুনে হাল্লার মন্ত্রী অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করে যে "তবে লোকগুলো করে কী? ঘোড়ার ঘাস কাটে?" জবাবে দূত বলে "আজ্ঞে

অথও নাই।" শুণ্ডীর রাজার "তাম্রকূট সেবনে আমার অভ্যাস নাই।" হাল্লার রাজার "রাজকন্যা কি কম পড়িতেছে ?" ইত্যাদি অজস্র রসালো সংলাপে চিত্রটি ভরপুর। শ্রীরায় বিষয়ানুগ সংলাপ রচনার আর-একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এখানেও তিনি অদ্বিতীয়। এই 'মিউজিক্যাল ফ্যান্টাসি'তে সঙ্গীত নিয়েও কম হাস্যরস সৃষ্টি হয়নি। লাঠির ছায়া দিয়ে ভৈরবীর প্রহরনির্দেশ আর ছায়া ইচ্ছে করে এগিয়ে দিয়ে বেসুরো গান বন্ধ করায় রাগসঙ্গীত নিয়ে এক সুন্দর কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে। এরকম মজার আরও নমুনা পাই যখন আমলকীর রাজা বলে "তৃতীয় সুর ষষ্ঠসুর দুয়ে মিলে কী হয় ?" শুণ্ডীর দরবারের পথে ওস্তাদ পালকিতেই রেওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে আর বাঁয়া তবলা গলায় বাঁধা অবস্থায় সঙ্গত করতে করতে পাশে পাশে দৌড়চ্ছে তবলচি। দরবারে বাজীর সময় অতি স্থূলকায় গায়কের কণ্ঠে মিহি মেয়েলী সুর আর খ্যাংরাকাঠির মতো গায়কের গম্ভীর দরাজ গলা—এমন হিউমারবোধ চলচ্চিত্রে এর আগে দেখিনি।

মহৎ শিল্পীসুলভ পরিমিতিবোধ শ্রীরায়ের অতি তীক্ষ্ণ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বোধ করছি এ-ছবিতে একাধিকবার তার অভাব ঘটেছে। বটতলার হেঁপোরুগীর অতিদীর্ঘায়িত অবস্থান ও সংলাপ রসহানিকর হয়েছে। হাল্লার মন্ত্রীর শিশুসুলভ বাচনভঙ্গীপূর্ণ সংলাপ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে বোকাটের পর্যায়ে পড়েছে। বরফির ক্রিয়াকলাপও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে একঘেয়ে হয়েছে। শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু শিল্পহানি ঘটলে দর্শক সহৃদয় বিচার করে না।

দৃশ্যরচনায় নৈপুণ্যও সর্বত্র বিদ্যমান। গুপীর গান শুনে আমলকীর রাজা ঘুম ভেঙে উঠে বজ্রকণ্ঠে হাঁক পাড়ে—ত্রস্ততায় প্রহরীর হুমড়ি খেয়ে পড়া, রাজার রাগের চোটে জোব্বা তুলে কাছা আঁটা ইত্যাদিতে প্রাণখোলা হাসির রোল বয়ে যায়।

গুপীকে গাধার পিঠে চড়িয়ে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ায় দৃশ্যটির শুরু হয় আমলকীর রাজার আদেশের সঙ্গে ঢোলে বলিদানের বাজনা দিয়ে। ঘটনার হৃদয়হীনতা ঐ বাজেই পরিষ্কার বলা হয়ে যায়। ঘোষকের বিকট ঢেঁড়া পিটানো। গ্রামবাসীর চিৎকার, বটতলার বুড়োদের মুখের ক্লোজআপ, ক্যামেরা নিচুতে রেখে গ্রামবাসীদের মুখগুলি দেখানো, একটু উপর

থেকে শুধু পা-গুলি দেখানো এবং এ-অংশের অতি দ্রুতগতি গুপীর নির্বাসনের নিষ্ঠুরতাকে অতি সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে।

গুপীর বনে ঢোকার সময় গা ছমছম করা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে টপটপ শব্দ শোনার পর শব্দটির উৎস দেখা যায়—ঢোলের উপর জলের ফোঁটা, পাশে বাঘা। দর্শক বুঝে নেয়—বাঘারও একই দশা। ঐ পরিবেশে হঠাৎ দেখা হওয়ায় পরস্পরের সম্পর্কে সন্দেহ, ভয় ও তার নিরসন চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে গুপী-বাঘার মূকাভিনয়ে। একজনের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী আর-একজন হুবহু নকল করছে—দৃশ্যটিতে শ্রীরায় শিশু মানসিকতার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্কের চমৎকার স্বাক্ষর রেখেছেন।

কিন্তু এ-দৃশ্যের দৃশ্যপটের প্রশংসা করা যায় না। জঙ্গলের চিহ্ন নেই, শুধু কিছু বাঁশঝাড়, তা-ও ছাড়া ছাড়া। এমন ফাঁকা জায়গায় বাঘের আগমন এবং গুপী-বাঘাকে না দেখে বাঘের ফিরে যাওয়া ছোটদেরও খাপছাড়া লেগেছে। ছোটরা প্রশ্ন করেছে—বাঘ ওদের খেল না কেন!

ভূতের নৃত্য এবং ভূতের রাজার উপস্থাপনার পূর্ণ অংশটিই আলোক-চিত্র, যন্ত্রসঙ্গীত এবং শব্দ ও যন্ত্রের প্রয়োগকৌশলের সমন্বয়ে রচিত আতঙ্ক-উত্তেজনা সৃষ্টির একটি সার্থক নিদর্শন। নেগেটিভে ভূত দেখানো অভিনব না হলেও অব্যর্থ। তদুপরি ভূতদের মুখগুলিকে অস্পষ্ট কিম্ভূত করেছেন ফটোগ্রাফির কৌশলে। নাচের সঙ্গে মৃদঙ্গ, একতারা, খঞ্জনী, ঘণ্টা ও আর-একটি যন্ত্রের সমন্বয়ে নাচটি জমজমাট হয়ে উঠেছে। ভূতের রাজার আনুনাসিক সংলাপ ও তার দ্রুত প্রক্ষেপণ পরিবেশকে সম্পূর্ণ ভৌতিক করে তুলেছে। এ-সংলাপ শ্রীরায় কৃত। এখানে ত্রুটি হয়েছে সংলাপ প্রক্ষেপণের অতি দ্রুততায়, যার ফলে গান শুনিয়ে খুশি করতে পারার বর চাওয়ার উত্তরে ভূতের সংলাপের "সব কাজ থেমে যাবে, থেমে যাবে, থেমে যাবে" এই অতি প্রয়োজনীয় অংশটি স্পষ্ট ধরতে পারা যায়নি। এতে গান শুনে সবাই নিশ্চল হয়ে যাচ্ছে কেন তা বুঝতে দর্শকের অসুবিধা হয়েছে।

মজার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছোটদের (বড়দেরও) সব চেয়ে খুশি করেছে খাবারের দৃশ্যগুলি। রুপোর বাসন, কাঁসার বাসনে মাছ-মাংস-পোলাও, শ্বেতপাথরের বাসনে লুচি-মিঠাই-মণ্ডার প্রাচুর্য, আর তা খেতে খেতে গুপী-বাঘার নিস্পৃহ ভাব যেমন অনাবিল আনন্দ যোগায় তেমনই তা শিল্পসম্মত। দেশের নাম ভুল করে বরফের দেশে গিয়ে শীতে কষ্ট পাওয়া, শীতবস্ত্রে

ঘোড়াই হয়ে আবার নাম ভুল করে মরুভূমিতে উপস্থিত হয়ে গরমে ছটফট করার দৃশ্য দেখে হাসি সম্বরণ করা দায়। শুণ্ডীর দরবারের দরজার সামনে অগণিত জুতোর সারি দেখিয়েই পরের শট বাঘার নাগরা জোড়া দরবারে, বাঘার ঢোলের উপর। বাঘা কলার খোসা ফেলে ঘরের ভিতরের ফোয়ারায়, রাজাকে দেখেই তামাক-বিষয়ে ভোল পাল্টায়। মজার দৃশ্য কত যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার হিসাব দিতে গেলে অন্ত পাওয়া ভার।

ঘটনার বিন্যাসে হাল্লার রাজার রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাতের অধ্যায়টি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। ঐ নাচ-গানও একঘেয়ে লেগেছে। বরফির ভূমিকাও অতিরিক্ত টানা হওয়াতে ভালো লাগে না।

দৃশ্য সজ্জায় মোষের শিং দিয়ে শট শুরু করে হাল্লার প্রাসাদের নিচু, স্বল্পালোকিত, জটিল গঠন, জেলের কুঠুরি, শুণ্ডীর রাজ্যের দোকান-পাট, রাজ-দরবারের অতি শুভ্রতার মাঝে কালোতে মেঝের ঝালর, দেয়ালের হরিণ-হাতি-ঘোড়া-ময়ূর-প্রজাপতির চিত্র অতি মনোরম। রাজাসনের সামনের কালো প্রজাপতিই আবার শেষ দৃশ্যে রঙিন লালে রূপান্তরিত। গুপীর বাড়ির বাখারির দরজাও ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই।

সাজসজ্জায় সর্বাগ্রে নজর পড়ে বরফির সজ্জার বরফিগুলিতে। কালো আলখাল্লার উপরে সাদা বরফি, চশমার গঠন বরফি, মাথার টুপিতে বরফি—দেখতে বেশ লাগে। আমলকির রাজার প্রথমেই দেখি মোটা মোটা আঙুলে মোটামোটা আংটি, তারপর তার চিত্র-বিচিত্র গাত্রাবরণ। হাল্লার রাজার বাঘের ছাল, টাইট মিলিটারি পোশাক, শুণ্ডীর রাজার ধবধবে সাদা পোশাক, হাল্লার মন্ত্রীর আড়ভাবে কালো ডোরাকাটা জোব্বা ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

এ-চিত্রে সঙ্গীতের সব শাখায় সত্যজিৎ রায় তাঁর অনন্যতার প্রমাণ রেখেছেন। টাইটেল-মিউজিক রচনায় গুপীর গানগুলির সুরের অংশ বিশেষ মিলিয়েছেন। বিষয়ানুগ কথা এবং কথা অনুযায়ী সুরসৃষ্টি কতদূর সার্থক হতে পারে—গুপীর গানগুলিতে তার উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপিত। প্রায় প্রতিটি গানের এ-কলি সে-কলি সবার মুখে মুখে ফিরছে। বিশেষ করে "দেখো রে" "ও মন্ত্রী মশাই" আর "তোমারে সেলাম।" একদিকে দরবারের গানের টুকরোগুলি ও "দেখো রে" গানটিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, অপরদিকে

অন্যান্য গানগুলি লোকসঙ্গীত ও ছাড়া-গানের সুর সমদক্ষতায় বিধৃত। ভূতের নৃত্যের বিমোহনকারী যন্ত্রসঙ্গীতের তুলনা নেই। বরফির আজানের সুরটিও বেশ শ্রুতিমধুর। আবহসঙ্গীতে গুপীর নির্বাসন-দৃশ্যে ঢোলে বলির বাদ্য, বাঘার ঢোলের উপর জলের ফোঁটা পড়ার শব্দ, রাজকন্যা লাভের আশায় বাঘার আনন্দপ্রকাশে যন্ত্রসঙ্গীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুষঙ্গ-শব্দে চমক লাগায় গুপীর বাবার তানপুরার গায়ে চাঁটি মারার শব্দ, কুশপুত্তলীর গায়ে ঝোলানো ঘন্টিগুলির শব্দ, কারাপ্রহরীর গালে বসার আগে মশার গুনগুনানি। সরগম "তৃতীয় সুর ষষ্ঠ সুর মিলে', গাধা", "সা সা সা সাগারে বাঘারে ভাগারে"র মতো শিশুসুলভ মজা করা থেকে কঠিন রাগসঙ্গীত পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে।

বরফির যাদুকরী কার্যকলাপ এবং ভূতের চেহারার বিকৃতিতে ট্রিক ফটোগ্রাফির ব্যবহার ছাড়াও ভোরের কুয়াশা, শায়িত গুপী-বাঘার উপর রাত্রির অন্ধকার নেমে আসা, ঘুমের আগে বাঘার চোখে ছাদে রাজকন্যার চেহারা ভেসে ওঠা ইত্যাদিতে প্রত্যাশিত মুন্সীয়ানা বর্তমান। গুপীর নির্বাসন-দৃশ্যের বিশেষত্ব পূর্বেই উল্লেখিত।

মূল রচনার থেকে গুপী-বাঘার চরিত্র উল্টে দেয়া হয়েছে। হয়তো মানানসই অভিনেতার প্রয়োজনে। সরল আনন্দোচ্ছল গুপীর ভূমিকায় শ্রীতপেন চট্টোপাধ্যায় এবং চতুর কৌতুককর চরিত্রে বাঘার ভূমিকায় শ্রীরবি ঘোষ অনবদ্য অভিনয় করেছেন। শ্রীরায় অবিশ্যি এ-পরিবর্তন সম্পর্কে পত্রান্তরে বলেছেন যে গাইয়েরা সাধারণতই সরল ভালোমানুষ হয়। দুটি চরিত্রই অতি দুরূহ। কারণ একচুল সীমা অতিক্রম করলে বিরক্তিকর ছ্যাবলামো হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দুজন অভিনেতাই শক্ত হাতে সংযম রেখে চরিত্র দুটিকে অবিস্মরণীয় করেছেন। তপেন চট্টোপাধ্যায়ের বাচনভঙ্গী, মুখ-চোখের অভিব্যক্তি, চরম সাবলীল স্বচ্ছন্দ অঙ্গসঞ্চালন বিস্ময়কর। প্রথম সুর লাভের আনন্দের অভিব্যক্তি-গানের সহযোগী অঙ্গভঙ্গীতে জড়তা হীনতা অভূতপূর্ব। ছকেবাঁধা চরিত্র আর তার আনুষঙ্গিক মুদ্রাদোষের বেড়াজাল এড়িয়ে তিনি একজন সত্যকারের নায়ক হোন এই আশা করি। রবি ঘোষ দক্ষ অভিনেতা। কিন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য তাঁর অতুলনীয় কৌতুক-চরিত্র-অভিনয়-ক্ষমতা, তাঁর রস-বোধ মাত্রাবোধের সার্থক ব্যবহার করার মতো চিত্রপরিচালকের সাক্ষাৎ মেলে

না। ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহারে শিল্পীর তৃপ্তি তো আছেই, দর্শকও রসাপ্লুত হয়। বাঘ দেখে রবি ঘোষের একচোখে ভয় পাওয়া আর-এক চোখে ভয় দেখানোর ছবি, "দেখেছি ঠিক দেখেছি কিনা জানিনা"—রবি ঘোষের পক্ষেই সম্ভব বিশ্বাস করি। তপেন চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

এ-ছবির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ছবি দেখে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে 'গু গা বা বা'তে 'ছোটদের মজার ছবি' ছাড়া খুব তাৎপর্যপূর্ণ কিছু আছে মনে হয় না। কিন্তু যত সময় বয়ে যায়, ততই যেন এর শৈল্পিক গুণগুলি মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। এরই নাম বোধহয় মহৎ শিল্প।

মিন্টু রায়

পর পর দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় এবং তার মধ্যে মধ্যে একটি যুগ্ম-সংখ্যা থাকায় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর সমালোচনা প্রকাশে অত্যধিক বিলম্ব ঘটল। তথাপি পাঠক-মাত্রেই স্বীকার করবেন 'গু গা বা বা'র সম্পর্কে আলোচনা এত তাড়াতাড়িই শেষ হবার নয়। —সম্পাদক

'থিয়েটার ইউনিট'এর জন্মভূমি

ইদানীং বাঙলা নাট্যআন্দোলনের জগতে যাঁরা রাজনীতি বা সমাজ-সচেতন বক্তব্য নিয়ে হাজির হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে গ্রামবাঙলা এবং কৃষিজীবী মানুষের কথা নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরার একটা ঝোঁক আবার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে দেশের জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশ গ্রামে বসবাস করেন এবং কোনো না কোনো ভাবে জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষিকর্মের সঙ্গে জড়িত, সেই দেশের নাট্যকর্মীদের এই প্রয়াস (যদিও তাঁদের দর্শক মূলতই শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ) নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এক কথায় শহুরে মধ্যবিত্ত ও গ্রামীন সমাজের মধ্যে নাট্যকলার মাধ্যমে এই যে সেতু-বন্ধনের প্রয়াস—বাঙলা নাট্যআন্দোলনের ক্ষেত্রে একে এক ইতিবাচক উপাদান বলা চলতে পারে।

কিন্তু অভিজ্ঞতার তারতম্যের ফলে এই ধরনের নাট্যকর্মের মধ্যে ইতিমধ্যেই দুটো ঝোঁক দেখা যাচ্ছে: ১ গ্রামীন সমাজ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার দরুন জীবননিষ্ঠ নাট্যকর্ম, এবং: ২ গ্রাম সম্পর্কে অস্বচ্ছ জ্ঞানসঞ্জাত এক ধরনের বাস্তববিচ্ছিন্ন নাট্যকর্ম—যার প্রতিটি চরিত্রই প্রায় অমূর্ত এক রূপের অধিকারী এবং যা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক শ্লোগানবাজীতেই শেষ হয়ে যায়, শিল্পকর্মের স্তরে উত্তীর্ণ হয় না। শহুরে নাট্যকর্মীদের পক্ষে অবশ্যই গ্রাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া বেশ আয়াসসাধ্য ব্যাপার এবং সম্ভবতই সে-কথা মাথায় ছিল বলেই 'থিয়েটার ইউনিট' গোষ্ঠী তাঁদের নতুন নাটক 'জন্মভূমি' এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশনা করার চেষ্টা করেছেন, যাকে বলা যেতে পারে—শহুরে মানুষের গ্রামদর্শন। জনৈক লেখক এসেছেন গ্রাম পরিদর্শনে। স্থানীয় একজন শিক্ষকের (যিনি আবার রাজনৈতিক কর্মীও বটেন) সাহায্যে গ্রামীন সমাজ, তার কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার অন্তর্বিরোধ, কৃষকদের সংগ্রাম, সরকারী আমলাতন্ত্র এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে তিনি শহরে ফিরে যাচ্ছেন এবং যাওয়ার সময়ে কথা দিয়ে যাচ্ছেন—শহরে ফিরে এদের কথা তিনি সবাইকে

জানাবেন। লেখকের পরিশ্রম এবং উদ্দেশ্য দুই-ই সাধু, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ দর্শকদের হতাশার কারণ হলো নাটকটি সুলিখিত নয়। নাট্যকারের উদ্দেশ্য নিশ্চয় সৎ এবং নিজেকে গ্রামীন মানুষের সরাসরি মুখপাত্র হিসাবে দাবি করার অহমিকাও তাঁর নেই—যার জন্য এই ভিন্ন দৃষ্টিকোণের উপস্থাপনা। কিন্তু মুস্কিল হলো এই দৃষ্টিকোণকে তিনি সমস্তক্ষণ ধরে রাখতে পারেননি। ফলে নাটক হয়ে উঠেছে কখনো রিপোর্টাজধর্মী, কখনো বা সাদামাটা গল্পের মেজাজে বলা এবং সব মিলিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি—যা এককভাবে হয়তো অনেকের ভালো লাগতে পারে, কিন্তু চরিত্রের বিচারে ভিন্নমুখী।

একটি প্রশ্ন ধরা যাক। এ-নাটকের নায়ক কে? লেখক, শিক্ষক, প্রাণ-কৃষ্ণ, বি ডি ও অথবা বাদল? স্পষ্টতই এদের কেউই নয়। তবে? যদি কেউ বলেন যে সংগ্রামী কৃষকেরাই এর নায়ক, তাহলেও আমি মানতে রাজি নই। কারণ কৃষকদের সংগ্রামী ভূমিকা এখানে দু-একজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমায়িত। সামগ্রিক ভাবে সে-ভূমিকা অত্যন্ত কম ক্ষেত্রেই উপস্থিত এবং তাও নাটকের প্রায় সমাপ্তির সময়ে। শিক্ষকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন আছে। প্রথম দিকে দেখা গেল তিনি সূত্রধারের কাজ করছেন, পরের দিকে তিনিই আবার কাহিনীর মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। আবার তিনিই যদি সূত্রধার হন, তবে গায়কের ভূমিকাই বা কি? সূত্রধারের ভূমিকা তো গায়কও কিছুটা পালন করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে বি ডি ও-র ঘরের দৃশ্যটি বেশ ভালো, কিন্তু গোটা নাটকের সুরের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। এই ধরনের অসঙ্গতি খুঁজলে আরো পাওয়া যাবে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ও অভিনয়ে এর স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। প্রযোজনা কোথাও লিরিক্যাল মেজাজ আনে, কোথাও বা স্যাটায়ারের। কিন্তু এই সমস্ত আপাত অসঙ্গতি সত্ত্বেও নাটকটি যে উপভোগ্য হয়েছে, তার কারণ আগেই উল্লেখ করেছি—শহর ও গ্রামের মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্য নাট্যকার ও প্রযোজকের (এক্ষেত্রে একই ব্যক্তি) আন্তরিক ও সৎ প্রয়াস। ফর্মের পরীক্ষার বিচারে তিনি হয়তো উৎরোননি। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। তাছাড়া গোটা নাটকে একটা মোটামুটি গতিবেগ ধরে রাখা এবং মাঝে মাঝে চমকপ্রদ মুহূর্ত সৃষ্টি করার কৃতিত্বও তিনি অর্জন করেছেন।

অভিনয়ের বিচারে অনেকেই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু সার্বিক একটা অভিনয়রীতি কিছু বেরিয়ে আসেনি। অর্থাৎ যে-যার মতো ভালো অভিনয় করেছেন এবং সেই জন্যই দলগত অভিনয় কিঞ্চিৎ দুর্বল। প্রাণকৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীমন্টু ঘোষের অভিনয় অত্যন্ত সজীব এবং অভিনয়ে ও গানে মাটির কাছাকাছি মানুষের সঠিক চরিত্ররূপটি তিনি দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। শক্তিশালী অভিনয় করেছেন হাজী সাহেবের ভূমিকার শিল্পী, যদিও কখনো কখনো বাড়াবাড়ির ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। শেখর চট্টোপাধ্যায়ের বি ডি ও-র ভূমিকা যথোচিত ব্যক্তিত্বে রূপায়িত। অন্যান্য যাঁরা ভালো অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন লেখক, বাদল, জব্বর ও বেগমের ভূমিকার শিল্পিরা। অভিনয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন ডাক্তারের ভূমিকার শিল্পী। আলোক, মঞ্চস্থাপনা ও সঙ্গীতের ব্যবহার সুষ্ঠু, বিশেষত সঙ্গীত। একটি স্মারকপুস্তিকার অভাবে অনেক শিল্পী ও কলাকুশলীর পরিচয় অজানা থেকে গেল। 'থিয়েটার ইউনিট' গোষ্ঠী আশা করি ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন।

সব শেষে বলি, সার্বিক সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও 'জন্মভূমি' আমাদের আশান্বিত করেছে। আমরা বিশ্বাস করি 'থিয়েটার ইউনিট' ভবিষ্যতে আরও শিল্পোত্তীর্ণ প্রযোজনা নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হবেন।

স্বর্ণেন্দু রায়চৌধুরী

'তরুণ অপেরা' প্রযোজিত 'লেনিন পালা'

যাত্রা আজ মর্যাদা পেয়েছে। গ্রামের সামিয়ানার নিচ থেকে উঠে এসেছে মঞ্চে; হ্যাজাকের মৃদু আলোকধারা থেকে এসে দাঁড়িয়েছে নাগরিক প্রেক্ষাগৃহের উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের সামনে। কাহিনী, বিষয়বস্তু ও পালা রচনার ক্ষেত্রে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। তাই ধর্মের জয় : অধর্মের পরাজয় জাতীয় সরল নীতিকথার রূপায়ণ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী আর কাল্পনিক চরিত্র-মিশ্রণে অতি-নাটকীয় ঐতিহাসিক গল্প-কথন থেকে প্রগতি ও আধুনিকতার দিকে আজকের যাত্রা-পালা পা বাড়িয়েছে। 'রাইফেল', 'হিটলার', 'জলন্ত বারুদ', 'রাজা রামমোহন', 'লেনিন' যাত্রাভিনয় আজ দর্শকচিত্তে তীব্রতর আবেদন জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতবর্ষে লেনিন-জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সম্ভবত বাঙলাদেশেই প্রথম লেনিন ও অক্টোবর বিপ্লব অবলম্বনে নাটক, নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়েছে। সম্প্রতি 'মহাজাতি সদন'-এ অভিনীত হল 'তরুণ অপেরা'র 'লেনিন' পালা। 'তরুণ অপেরা' ইতিপূর্বে 'হিটলার', 'রাজা রামমোহন' অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছেন। 'লেনিন' পালা তাঁদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সর্বহারাশ্রেণীর যে-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তার উদ্গাতা ও সংগঠক ছিল বলশেভিক পার্টি আর নেতা ছিলেন মহানায়ক লেনিন। রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনগণ আর সামরিক বাহিনীর সাহায্যে বলশেভিক পার্টি লেনিনের নেতৃত্বে সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে জারতন্ত্র নির্মূল করে সর্বহারাশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দিতে পেরেছিলেন। এই ইতিহাসকে মোটামুটি রূপ দিতে চেয়েছেন শ্রীশম্ভু বাগ। ইতিহাসকে বিকৃত না করে বা খুব একটা

অতিরঞ্জিত না করে যে-দক্ষতার সঙ্গে তিনি লেনিন ও অক্টোবর বিপ্লবকে আসরে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন, তাতে প্রমাণিত হয়, শ্রীশম্ভু বাগ একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পালা-রচয়িতা। তবে নামকরণের দিক থেকে পালার নাম 'লেনিন' না হয়ে 'অক্টোবর-বিপ্লব' অথবা 'শীতপ্রাসাদ-দখল' দিলে ভালো হত। কারণ লেনিনের সম্পূর্ণ জীবনী এখানে তুলে ধরা হয়নি, তাঁর কর্মবহুল জীবনের একটা অংশ মাত্র এই যাত্রা-পালায় দেখা গেছে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর মেনশেভিক ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে কেরেনেস্কি যখন সামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করেছে এবং লেনিন কার্যত প্রায় অজ্ঞাতবাস থেকে বিপ্লব সংগঠিত করছেন—সেখান থেকে পালা শুরু হয়েছে। শীতপ্রাসাদ দখলের পর নাটকের যবনিকা টানা হয়েছে। ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে এসেছেন লেনিন, ক্রুপস্কায়া, লেনিনের ভগ্নি, স্তালিন, ট্রটস্কি প্রমুখ; এসেছে কেরেনেস্কি প্রভৃতি। লেনিনকে উপস্থিত করা হয়েছে একজন ব্যক্তিত্বশীল নেতা, রাজনীতিজ্ঞ, বিপ্লবী এবং মানুষ হিসাবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাল্পনিক চরিত্রও এসে গেছে—যাত্রায় যা কোনোক্রমেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তবু পালা-রচনার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা চোখে পড়ে। ক্রুপস্কায়া শুধু লেনিনের স্ত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন লেনিনের সহকর্মী, একান্ত সচিব, একজন বিপ্লবী। কিন্তু পালাকার চরিত্রটির ওপর অবিচার করেছেন। এখানে ক্রুপস্কায়া থেকে কাল্পনিক চরিত্র শাসা পালার পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়, অধিক শক্তিশালী।

অতি-বিপ্লবী ট্রটস্কির সঙ্গে স্তালিনের বিতর্ক সর্বদা লেনিনের উপস্থিতিতেই দেখানো হয়েছে—সেটা অবিশ্বাস্য। শীতপ্রাসাদ আক্রমণ পালার আসল বিষয়বস্তু। অথচ আক্রমণের চরম মুহূর্ত নাটকে অনুপস্থিত।

তবুও পরিচালক শ্রীঅমর ভট্টাচার্য অতি-কৃতিত্বের সঙ্গে 'লেনিন'কে একটি সফল পালারূপে পরিবেশন করেছেন। যাত্রাজগতের অন্যতম প্রতিভাধর অভিনেতা শ্রীশান্তিগোপাল লেনিনের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করেছেন। লেনিন-চরিত্রের বিভিন্ন দিক ব্যক্তিত্বসহ যেভাবে তিনি তুলে ধরেছেন—তাতে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার আসনে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে পরিচালক অমর ভট্টাচার্য কেরেনেস্কির ভূমিকায় যথার্থ চরিত্রচিত্রণ করতে পেরেছেন। তাছাড়া ট্রটস্কি, শাসা, বুবৎশেভ প্রভৃতি প্রাণবন্ত।

গানই হল যাত্রার প্রাণ। এখনো লোকমুখে যাত্রাভিনয়কে 'যাত্রাগান' বলা হয়। যাত্রার 'বিবেক' একটি অতি প্রয়োজনীয় চরিত্র। এখানে খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেই বিবেকের কাজ চালানো হয়েছে এক বলশেভিককে দিয়ে—সে হচ্ছে প্যাভেল। সে সর্বহারাদের মধ্যে চারণ-কবি। কিন্তু যাত্রার নিজস্ব গানের ঢঙকে এঁরা পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে-গানগুলো না হয়েছে-গণগীতি, না-আধুনিক, না-লোকগীতি অথবা অপেরা। ফলে গানের দিকটা কিঞ্চিৎ দুর্বল। তাছাড়া 'আন্তর্জাতিক' গানটি নির্ভুল গাওয়া হয়নি। শাসার ভূমিকায় শ্রীমতী বর্ণালী নাচে-গানে-অভিনয়ে অপূর্ব। কোন শিল্পী কোন শিল্পী থেকে নিকৃষ্ট—তা বলা মুস্কিল।

কিঞ্চিৎ দোষত্রুটি বাদ দিলে মানতেই হয় 'লেনিন' পালা 'তরুণ অপেরা'র এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি। 'তরুণ অপেরা'র এই অবদান যাত্রাজগতকে প্রগতির পথে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেল। লেনিন শতবর্ষে এই 'লেনিন' পালা বাঙলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অভিনীত হোক, গ্রামের মানুষ লেনিন আর অক্টোবর বিপ্লবকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করুন-এঁদের যাত্রা জয়যুক্ত হোক—এই কামনা করি।

অহীন ভৌমিক

পাঠকগোষ্ঠী

সবিনয় নিবেদন,

....শ্রীবিধুভূষণ বসু সম্বন্ধে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' (পৃ. ১২৫৩)-এ "বেত মেরে কি মা ভুলাবি" গানটির রচয়িতা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। গানটির অতি দীর্ঘ প্রথম পংক্তি "মা যায় যেন জীবন চলে" ইত্যাদি। এই গানের ২০শ পংক্তি "আমায় বেত মেরে কি ভুলাবে, আমি কি মার সেই ছেলে" ইত্যাদি। গানটি রচিত ১৩১২ সালে বরিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্সের পর। গানটি পাবেন হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মাতৃবন্দনা' বইয়ের ৮৭ পৃষ্ঠায়। ইনি কি 'লক্ষ্মীমা', 'জ্যাঠাইমা' প্রভৃতি অনেক বইয়ের লেখক নন? 'পাপিষ্ঠ,' 'বনমালা' ১৩১০ সালে লেখা। প্রবন্ধলেখক যেন আর একটু অনুসন্ধান ক'রে এই লেখক সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেন।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

বোলপুর

১৯।৭।৬৯

...জ্যৈষ্ঠে নজরুলের লেখাটা ছাপিয়ে ভালো করেছ। লোকে জানত নজরুল পশ্চিমের কেতাব পড়ে নি। তারা বুঝুক, নজরুল শুধু পড়ে নি, বুঝেওছে।...

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

২৪।৭।৬৯

সবিনয় নিবেদন,

'এস. ওয়াজেদ আলী এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধটি সম্পর্কে শ্রীসুকুমার মিত্রের চিঠিটি ('পরিচয়', চৈত্র ১৩৭৫) পড়লাম।

তাঁর প্রথম অভিযোগ প্রসঙ্গে: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর 'বসন্তকুমারী' আমি আজও দেখিনি; এবং নাটকটির একাধিক সংস্করণ হয়েছিল বা হয়নি, এসব সংবাদও আমার অজ্ঞাত।

পাঠটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম অনেক বছর আগে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে। যতদূর মনে পড়ছে, গ্রন্থটির টাইটেল-পেজ ছিল। কিন্তু আমার প্রয়োজন তখন ভিন্নতর ছিল, তাই সংস্করণের প্রতি লক্ষ্য রাখিনি। গ্রন্থাগারে নাটকটির আর কোনো কপি বা সংস্করণ ছিল কিনা, তাও জানি না।

বিদ্যাবিনোদের পরিবার ও তাঁর গ্রন্থাগারের সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগের অভাব ঘটায় গ্রন্থটি পুনরুদ্ধারে তথা তথ্য-বিনিময়ে শ্রীমিত্রকে এই মুহূর্তে সাহায্য করতে পারছি না বলে আন্তরিক দুঃখিত।

শ্রীমিত্রের দ্বিতীয় অভিযোগ প্রসঙ্গে: রুদ্র আচার্যকে ধন্যবাদ। তাঁর পত্র-লেখার (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬) পর 'এস. ওয়াজেদ আলী'র নাম-প্রসঙ্গে আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধহয় আর নেই।

বিলম্বিত উত্তরের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

নমস্কার অন্তে—

গুরুদাস ভট্টাচার্য
১০।৭।৬৯

মহাশয়,

'পরিচয়'-এর আষাঢ় ১৩৭৬ সংখ্যায় অরুণ সেন কর্তৃক সংকলিত বিষ্ণু দে র রচনাপঞ্জী প্রকাশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমার সন্ধানে আরও কয়েকটি লেখা রয়েছে যেগুলি অরুণ সেনের সংকলিত রচনাপঞ্জীতে উল্লিখিত হয়নি।

১. The Writer and Crisis.

মৌলানা আজাদ কলেজ পত্রিকা (১৯৬২-৬৩)-য় প্রকাশিত।

প্রবন্ধটির পাদটীকায় লেখা আছে: "Originally written for Seminar's symposium on the writer at bay, now, in India."

"The writer at bay! My first reaction was, of course, negative. I felt like murmuring: but the writer has been always at bay. Has there ever been a serious writer who did not have to face a crisis—or even a series of crises?"

২. উক্ত পত্রিকায় বাঙলা অংশে বিষ্ণু দে-কৃত দান্তের চারটি কবিতার অনুবাদ রয়েছে। তুমি দি মিরেই পেন্সিয়ের (১৩); নেল্লি অকি

পোর্তা লা ফিয়া দয়া আমোরে (২১) ; গিদো কাভালকান্তি-কে : বাল্লাতা : পের উশ গিরলান্দেত্তা। যতদূর জানি, অনুবাদ চারটি কোনো গ্রন্থে এখনও পর্যন্ত বোধহয় সঙ্কলিত হয়নি।

৩. রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস, পাউণ্ড :

'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা', তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৬৫তে প্রকাশিত। সম্ভবত ইয়েটস-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে পঠিত। প্রবন্ধটির মধ্যে ইয়েটস-এর 'মোহিনী চ্যাটার্জি' কবিতাটির একটি অনবদ্য অনুবাদ রয়েছে।

৪. ১৩৬৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ (বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র ওপর বিষ্ণু দে একটি পরিচায়ক-প্রবন্ধ (review article) লিখেছিলেন। উক্ত সংখ্যার কপিটি হাতের কাছে না থাকায় খানিকটা আন্দাজে সালটা বসালাম। আপনারাই দেখে নিয়ে ঠিক সালটি বলতে পারবেন। এই প্রবন্ধটিও কোথাও সঙ্কলিত হয়নি।

খোঁজ করলে আরও এ-রকম কয়েকটি ইংরেজি-বাঙলা-প্রবন্ধ বা অনুবাদ-কবিতার সন্ধান মিলবে। প্রসঙ্গত, 'পরিচয়'-এর 'শেক্সপীয়র সংখ্যা'য় (১৯৬৪) প্রকাশিত ও 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা'য় সঙ্কলিত 'শেক্সপিঅর ও বাংলা' প্রবন্ধটির সঙ্গে সাহিত্য অকাদেমি-কর্তৃক প্রকাশিত 'ওথেলো' (অনুবাদক : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়)-র ভূমিকার কিছু গৌণ পাঠভেদ আছে।

অভিনন্দনসহ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
২৬।৮।৬৯

মহাশয়,

আষাঢ় সংখ্যা 'পরিচয়'-এ ডঃ মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখাটি পড়তে পড়তে আমিও খানিকটা স্মৃতিচারী হয়ে উঠলাম। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় গিয়ে অধ্যাপক অজিত গুহ (বাঙলা ভাষা-আন্দোলনের এই অন্যতম নায়ক গত ১২ই নভেম্বর কুমিল্লা শহরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন), আর অধ্যাপিকা ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমকে পাকড়াও করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, যেসব সাহিত্যিক, সাংবাদিক আর গবেষক

রাজনৈতিক ভাষা-আন্দোলন করে আর তার ফলশ্রুতি হিসাবে বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রিক মর্যাদা আদায় করে আত্মসন্তুষ্টির মগ্নচূড়ায় বসে না থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঙলা ভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে গঠনমূলকভাবে ভাষা-আন্দোলন করে যাচ্ছেন, সে-সব সংগ্রামী কর্মীদের চাক্ষুষ করি, তাঁদের সঙ্গে কথা বলি। ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম উদ্‌গাতা অধ্যাপক গুহ এবং অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম আমার মনোগত ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করলেন। তার ফলে একদিন সকালে গিয়ে হাজির হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ব্যারাকে (প্রসঙ্গত বলি—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা এবং ভাষাতত্ত্ব বিভাগটি কোনো অর্থেই কলকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তর-বঙ্গ বা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের সঙ্গে তুলনীয় নয়। বাঙলা ভাষা-আন্দোলন এবং পূর্ব-পাকিস্তানের আত্মস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার ভূমিকার সুবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগটি অত্যন্ত সম্মানিত বিভাগ। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব কিংবা ইরাজি অথবা ইতিহাস বিভাগের চেয়ে এই বিভাগের সম্মান কিছু কম নয়। ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম হওয়া মুনীর চৌধুরী বাঙলা ভাষাতত্ত্বের গবেষক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ান)। প্রথমেই গেলাম বিভাগের প্রধান ডঃ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সঙ্গে দেখা করতে। হাই সাহেব রাজনৈতিক ভাষা-আন্দোলনের শরিক থাকলেও যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন গঠনমূলক ভাষা-আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন। মনে আছে, কুশল প্রশ্নাদি দিয়ে শুরু করে হাই সাহেব তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপক এবং পরে সহকর্মী অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসু হন। তখন দু-বছর হল আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেও আমি যেহেতু বাঙলা বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ছিলাম না সেহেতু অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসার কোনো সুযোগ আমার হয়নি। অতএব হাই সাহেবের প্রশ্নে আমায় নিরুত্তর থাকতে হয়েছিল।

না, আমি স্মৃতিচারণ করব না, কারণ স্মৃতির ভাঁড়ারে আমার খুদ-কুঁড়োর চেয়ে বেশি কিছু নেই। পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধিকারের আন্দোলনে বাঙলা ভাষার ভূমিকা, পাকিস্তানী বাঙালীর বাঙলাভাষা চর্চায় সংরাগ এবং ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙলা একাডেমি ও

এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তানের ছাত্র-অধ্যাপক-গবেষকদের বিস্ময়কর অবদান আমার মতন সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে যে-প্রশ্ন রেখেছে—সেই প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজার জন্যই এই চিঠি লেখা।

যে-দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম, রাষ্ট্রের জন্মের কাল থেকেই ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী পাকিস্তান এক-জাতিক রাষ্ট্র। সেই এক-জাতি একটি বিশিষ্ট অর্থাৎ ইসলামধর্মভিত্তিক জাতি। কিন্তু দেখা গেল মূল পাকিস্তান খণ্ড থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব-বাঙলার মুসলমান মনেপ্রাণে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও—ভাষায়, আচার-ব্যবহারে, বেশবাসে, খাদ্যাখাদ্যে, ঐতিহ্যে অনেকটা আলাদা এবং বাঙলা ভাষাভাষী হিসাবে সেই মুসলমান বাঙালী হিসাবেও পরিচিত হতে চায়। এক ভারতীয় মুসলমান এক পাকিস্তানী জাতি এবং তারা সবাই এক পাকিস্তানী সমাজভুক্ত—এই তত্ত্বকে কার্যকরী করার জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং আদর্শবাদী মোল্লাশাহী যতই নানান রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লাগলেন, ততই বাঙালী মুসলমান তাঁর বাঙালিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন, পশ্চিম-পাকিস্তানী ব্যবসায়ী আর পুঁজির কল্যাণে পূর্ব-বঙ্গের মুসলমান যত শোষিত এবং পশ্চিম-পাকিস্তানী কবলিত রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা পূর্ব-বঙ্গের মুসলমান যত শাসিত হতে থাকলেন, বাঙালী মুসলমান ততই তার বাঙালিত্ব রক্ষায় তৎপর হতে লাগলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলা কালে বাঙালী মুসলমানের মুসলিম আইডেনটিটি প্রতিষ্ঠার তাগিদই ছিল মুখ্য তাগিদ। প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব-বঙ্গের বাঙালী মুসলমানের বাঙালী আইডেনটিটি রক্ষার দায়ই হল মুখ্য তাগিদ। সেই বাঙালী আইডেনটিটির সবচেয়ে বড় ঐক্যসূত্র, সবচেয়ে বাস্তব সিম্বল (symbol) হল বাঙলা ভাষা। অতএব বাঙালী মুসলমানের স্বাধিকার-আকাঙ্ক্ষা রূপ পেল বাঙলা ভাষাকে ঘিরে। কিন্তু বাঙলা ভাষা তো বাঙালী হিন্দুরও ভাষা। বাঙালী আইডেনটিটির প্রধানতম চারিত্র লক্ষণ হিসাবে যদি বাঙলা ভাষাকে একমাত্র ঐক্যসূত্র বলে তুলে ধরা হয়, তাহলে বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের পার্থক্য রক্ষার কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ সে-যুক্তি অস্বীকার করলে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুক্তিকেই অস্বীকার করা হয়। অতএব বাঙালী আইডেনটিটির সঙ্গে মুসলিম আইডেনটিটি রক্ষার দায়টাও

কম দায় নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমানের বাঙলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও এই দুই আনুগত্যের টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করা যায় তাঁরা এই দুই আপাতবিরোধী আনুগত্যের সাযুজ্য বিধানের জন্য কি সচেতনভাবে সচেষ্ট।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় আবদুল হাই সাহেবের 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব'-র ভূমিকায় প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, বাঙলাদেশে এবং বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এতাবৎকাল পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বের আলোচনা এক সনাতন ধারা ধরে (অর্থাৎ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা Comparative Linguistics) চলে আসছে। পাশ্চাত্ত্যের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা সেই ধারা পরিত্যাগ করে যে-বিজ্ঞানসম্মত নতুন ধারায় গবেষণাদি করছেন, বাঙলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় সেই বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বের (Descriptive Linguistics) নিয়মাবলী প্রবর্তনের ব্যাপারে ডঃ হাই পথিকৃতের সম্মান দাবি করতে পারেন।

খুবই সত্যি কথা ডঃ হাই-ই বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বের রীতিপ্রকরণ অনুসরণ করে বাঙলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা প্রথম করেন। এও সত্যি কথা যে, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেনের পরিচালনায় এতাবৎকাল পর্যন্ত বাঙলা ভাষা সম্পর্কিত গবেষণা যে-ধারায় পরিচালিত হয়ে এসেছে, তাতে গবেষক-মন কখনো তুলনামূলক বা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের গণ্ডীর বাইরে যেতে পারেনি। তবু বলব, এ-প্রসঙ্গে বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্ব তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চেয়ে বেশি বিজ্ঞানসম্মত কিনা বা পাশ্চাত্ত্যের সব ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রাই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বকে ছেড়ে বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বকে অপরিহার্য বৈজ্ঞানিক রীতি বলে গ্রহণ করেছেন কিনা—এসব প্রশ্ন অবান্তর এবং তর্কাতীতও নয়।

কথা হল, ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বকেই একমাত্র পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের যে-সব ভাষাবিদ্‌রা সরাসরিভাবে পথিকৃৎ ডঃ মুহম্মদ হাই-এর ছাত্র নন তাঁরাও এই রীতিকে অবিসম্বাদী বৈজ্ঞানিক রীতি বলে মেনে নিয়েছেন। এমনকি বৃদ্ধ বয়সে আচার্য শহীদুল্লাহ্-ও উপভাষার অভিধান (dialectal dictionary) সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে কার্যত বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বের অগ্রাধিকার মেনে নিয়েছিলেন। পূর্ব-বাঙলায়

ভাষাতত্ত্ব গবেষকদের মধ্যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে আস্থাবান লোক যে শুধু নেই তা নয়, গবেষকদের মধ্যে ঐতিহাসিক-ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে প্রায় একটা অবৈজ্ঞানিক বীতশ্রদ্ধা ও উষ্মা রয়েছে। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্ব তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের তুলনায় অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত, তবু প্রশ্ন থেকে যায়—পাকিস্তানী বাঙালী মুসলমানের বাঙলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বকে অগ্রাধিকার দান তার বিজ্ঞানমনস্কতার ফলশ্রুতি মাত্র, না অন্য কারণও কিছু আছে। একথা আমরা জানি যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর বিজ্ঞানের ব্যবহার সমান তালে চলে না। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনের উপর বিজ্ঞানের ব্যবহার নির্ভর করে।

এবার দেখা যেতে পারে কোন ও কি ধরনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান বাঙলা ভাষাতত্ত্ব-চর্চায় বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বকে আশ্রয় করে তুলনামূলক বা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বকে পরিত্যাগ করেছেন।

আগেই বলেছি, পাকিস্তানী বাঙালী মুসলমান, নিজেকে পাকিস্তানী, মুসলমান এবং বাঙালী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। পাকিস্তানী মুসলমান সত্তা তাঁকে এযাবৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার যে-সুযোগ দিয়েছে, অবিভক্ত বাঙলায় বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সে-প্রতিষ্ঠা পাওয়া তাঁর পক্ষে দুষ্কর হতো। বাঙালী হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা চান, কারণ তিনি পশ্চিম-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তানীদের শোষণ, শাসন এবং চাপানো জীবনধারণ প্রণালী থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর নিজের মতন করে তাঁর সংস্কৃতিকে গড়তে চান। সেখানে বাঙলা ভাষা পূর্ববঙ্গের মুসলমানের কাছে সবচেয়ে বড়ো ঐক্যসূত্র। কিন্তু সেই ঐক্যসূত্রে তিনি ভারতীয় বাঙালীদের সঙ্গেও যুক্ত। আবার ভারতীয় বাঙালীর সঙ্গে যদি তাঁর ঐক্যসূত্রকে বড়ো করে তোলা হয়, তাহলে তাঁর পাকিস্তানী সত্তা খাটো হয়ে পড়ে। সুতরাং পাকিস্তানী বাঙালী যে ভারতীয় এবং বিশেষ করে হিন্দু বাঙালীর চেয়ে খানিকটা আলাদা সেটা পাকিস্তানী বাঙালীর দেখানো একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। পাকিস্তানী বাঙালী শুধু যে ধর্মবিশ্বাসে আলাদা—তা নয়। ধর্মের কারণে তার আচার, ব্যবহার, খাদ্যাখাদ্য, বেশবাস, এমন কি তার ব্যবহৃত বাঙলা ভাষাও হিন্দুর ভাষার চেয়ে খানিকটা

আলাদা—এটা দেখানো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। আমার ধারণা, এই প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই পাকিস্তানী বাঙলা ভাষাবিদ্‌রা বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বকে একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

তুলনামূলক বা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব সাধারণত লিখিত ভাষাকেই আশ্রয় করে, লিখিত ভাষার (মানে কথ্যভাষার) মূল্যায়ন করে, বিভিন্ন যুগের লিখিত ভাষার তুলনা করে ভাষার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে এবং লিখিত ভাষা ঔপপত্তিক সূত্রে অন্য যে লিখিত ভাষার সঙ্গে যুক্ত তার সঙ্গে তুলনা করে প্রথমোক্ত লিখিত ভাষার বা তার কোনো কথ্য উপভাষার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল নৃতাত্ত্বিকদের হাতে। (অবশ্য আজকের বর্ণনাত্মক ভাষাবিদ্‌রা বলবেন, আদি বর্ণনাত্মক ভাষাতাত্ত্বিক অষ্টাধ্যায়ী রচয়িতা পাণিনি স্বয়ং। কথাটা হয়তো ঠিকই! কারণ পাণিনির কাছে তুলনীয় আদি ভাষা বা তার ব্যাকরণ ইত্যাদি কিছুই ছিল না। পাণিনি একটি একক, অতুলনীয় এবং অনন্য ভাষার ব্যাকরণ রচনা করতে বসেছিলেন। কিন্তু তিনি আজকের বর্ণনাত্মক ভাষাতাত্ত্বিকের মতন সচেতন বর্ণনাত্মক ভাষাবিদ্ ছিলেন না।) আমেরিকান নৃতাত্ত্বিকরা আদিবাসীদের অলিখিত কথ্যভাষার পরিচয় নিতে গিয়ে যখন দেখলেন যে তাঁরা সেই তখন-শোনা-ভাষাকে পূর্বের কোনো বা অপর কোনো ভাষার সঙ্গে তুলনা করতে পারছেন না, তখন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাঁরা বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্ব সৃষ্টিতে মন দিলেন।

বাঙালী মুসলমান ভাষাবিদ্‌রা দেখলেন লিখিত বাঙলা ভাষা ঔপপত্তিক সূত্রে হিন্দুর দেবভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কিত। লিখিত বাঙলা ভাষা প্রধানত রূপ পেয়েছে সংস্কৃতিবান বর্ণহিন্দুর লেখার মধ্য দিয়ে। আবার সেই উচ্চকোটির বর্ণহিন্দুর ভাষা প্রভাবিত করেছে বাঙলার কথ্য উপভাষাগুলিকে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব তার পদ্ধতি-প্রকরণ দিয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপকে, সংস্কৃতিবান বর্ণহিন্দু সৃষ্ট রূপকে, আর উচ্চকোটির বর্ণহিন্দুর ভাষার রূপকেই বাঙলা ভাষার প্রধানতম রূপ ধরে নিয়েই, সেই রূপের মানদণ্ডে বাঙলা ভাষার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে চেয়েছে।

অথচ বাঙলা ভাষার অন্য একটা রূপও আছে, সেটা তার লৌকিক রূপ,

কথ্য রূপ, দেশজ রূপ। যে-রূপটা সংস্কৃতের সঙ্গে বা উচ্চমার্গের শহুরে লোকের লিখিত বা কথ্য রূপের সঙ্গে বা পূর্বস্থিত কোনো রূপের সঙ্গে আত্যন্তিক ভাবে সম্পর্কিত নয়। গ্রাম-বাঙলার আপামর জনসাধারণ সেই সব লৌকিক, দেশজ, কথ্য বাঙলায় যোগাযোগ করে থাকেন। সেই জনসাধারণের (অবিভক্ত বাঙলার) বৃহত্তম অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আর মুসলিমদের অধিকাংশই আবার একান্ত লৌকিক, খেটে খাওয়া মানুষ (মুসলিম উচ্চকোটির লোকদের অধিকাংশই বাঙলাদেশের বাসিন্দা হয়েও উর্দু, আরবী-ফার্সী ভাষাভাষী ছিলেন)। সেই জনসাধারণের কথ্য বাঙলা হিন্দু-সংস্কৃতির সংস্কৃতভাষাদ্বারা তুলনায় অনেক অস্পৃষ্ট। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব তার পদ্ধতি-প্রকরণ দিয়ে বাঙলা ভাষার সেই সব লৌকিক, দেশজ এবং কথ্যরূপের প্রতি পূর্ণ সুবিচার করতে অসমর্থ। অথচ ঐ সব রূপের যদি পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করা যায়, তবে দেখানো যেতে পারে—হিন্দু-সংস্কৃতির সংস্কৃতজ রূপ ছাড়াও বাঙলা ভাষার অন্য নিজস্ব লৌকিক এবং দেশজ রূপ আছে। যে-রূপসৃষ্টিতে গ্রাম-বাঙলার আপামর মুসলিম জনসাধারণের অবদান সংস্কৃতিবান বর্ণহিন্দুর চেয়ে কিছু কম নয়। বরঞ্চ আধুনিক বাঙলা কথ্য ভাষায়, জীবন্ত ভাষায় সেই সব দেশজ রূপের অবদানই সবচেয়ে বেশি। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এই প্রত্যয়কে প্রমাণসিদ্ধ করতে পারে না। পারে বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্ব। সেই কারণেই বোধহয় পূর্ব-পাকিস্তানবাসী বাঙালী মুসলমান ভাষাবিদ্‌রা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পরিহার করে বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছেন। বিজ্ঞানমনস্কতা সে-ঝোঁকের অন্যতম কারণ হলেও মুখ্য কারণ বা একমাত্র কারণ নয়।

আমার এ-অনুমান যে মনগড়া নয়, তার স্বপক্ষে একটু প্রমাণ দাখিল করার আছে। পাকিস্তানে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা সবচেয়ে বেশি হয়েছে লৌকিক ভাষাকে কেন্দ্র করে, উপ-ভাষা নিয়ে এবং কথ্য-ভাষার বিষয়ে। উপ-ভাষার অভিধান (dialectal dictionary) তার অন্যতম ফসল। ডঃ মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর সারা জীবন ধরে কথ্য-ভাষার ধ্বনি-বিজ্ঞান (phonology) নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। লোকসাহিত্য, লোককথা, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি কথ্য-ঐতিহ্য (oral tradition) নিয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা, ভাষাতত্ত্ব আর সমাজতত্ত্ব বিভাগে বিস্তারিত ও গভীর গবেষণা চলেছে। সাহিত্যের ইতিহাস-

সম্পর্কিত আলোচনা সবচেয়ে বেশি হয় গ্রীয়ারসন বর্ণিত তথাকথিত মুসলমানী বাঙলায় রচিত সাহিত্য এবং সে-সবের রচয়িতাদের নিয়ে আর তাদের ভাষা নিয়ে।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা পাকিস্তানের উর্দু ভাষাভাষী শাসক সম্প্রদায়ের জোর করে বাঙলাভাষায় উর্দু, আরবী, ফারসী শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়ে বাঙলাভাষার মুসলমানী বা পাকিস্তানীকরণ নীতিকে প্রতিহত করেছেন। তাঁরা বলছেন, বাঙলা ভাষা হিন্দুর ভাষা মাত্র নয়, সংস্কৃত ভাষার কনিষ্ঠা ভগ্নী মাত্র নয়। বাঙলা ভাষার অন্যতম একটা রূপ আছে—সে-রূপ কথ্য রূপ, জীবন্ত রূপ, সচল রূপ। সে-রূপ লৌকিক রূপ থেকে আগত। বাঙালী মুসলমান জনসাধারণ, আপামর বাঙালী হিন্দু জনসাধারণের সঙ্গেই এই রূপের স্রষ্টা।

সংবরণ রায়

ভাষা-আন্দোলনের নায়ক ও মনস্বী অধ্যাপক অজিত গুহ-র আকস্মিক জীবনাবসানে আমরা শোকার্ত। পূর্ব-বাঙলার শোকার্ত মানুষদের হাতে হাত রেখে আমরা তাঁর উজ্জ্বল স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। যে-বিশ্ববোধের পরিপ্রেক্ষিত পূর্ব-বাঙলার মাতৃভাষার আন্দোলনকে সঠিক তাৎপর্য দিয়েছিল—আমাদের জাতীয় জীবনের এই ঐতিহাসিক সন্ধিলগ্নে সেটি আমরা আরও একবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

—সম্পাদক, পরিচয়

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ ১৩৭৬

সূচিপত্র

বিশ্বরঞ্জন দে

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

মস্কো থেকে প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা

এই জনপ্রিয় পত্রিকাটি ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দুতেও প্রকাশিত হচ্ছে। সোভিয়েত দেশ ও তার জনগণের জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবে এই পত্রিকাটি।

উপহার—

প্রত্যেক গ্রাহককে একখানা করে ১৯৭০ সালের বহুবর্ণরঞ্জিত ১২ পৃষ্ঠার ক্যালেণ্ডার দেওয়া হবে। ক্যালেণ্ডার-সংখ্যা সীমিত। এখনই গ্রাহক হোন।

চাঁদার হার—

১ বৎসর	...	..	৭·০০
২ বৎসর	...	...	১১·০০
৩ বৎসর	...	...	১৪·০০
প্রতি সংখ্যা	...	...	০০·৭৫

প্রতিযোগিতা—

৫০ জন থেকে ২৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহকারীকে রাশিয়ান কাঠের পুতুল

২৫১ জন থেকে ৪০০ জন গ্রাহক সংগ্রহকারীকে এলার্ম ঘড়ি

৪০১ জন থেকে ৮০০ জন গ্রাহক সংগ্রহকারীকে বৈদ্যুতিক ক্ষুর

৮০১ জন থেকে ১৫০০ জন গ্রাহক সংগ্রহকারীকে হাতঘড়ি

১৫০১ জন থেকে ২৫০০ জন গ্রাহক সংগ্রহকারীকে ক্যামেরা

২৫০০ জনের অধিক জন গ্রাহক সংগ্রহকারীকে ট্রানসিসটার রেডিও

সংগ্রহকারীরা নিজস্ব পুরস্কার ছাড়াও ১৯৭০ সালের একটি ডায়েরি পাবেন।

পত্রিকা না পেলে, অথবা কোনো গোলযোগ হলে অথবা ঠিকানার পরিবর্তন হলে, সংশ্লিষ্ট এজেন্টকে লিখুন।

—অনুমোদিত এজেন্সি—

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ	**ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ**
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট	১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-১২	কলকাতা-১২

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ ।১৩৭৬

উন্নয়নের প্রস্তাব

জান টিনবারজেন

১. ধনী ও দরিদ্র দেশ

ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে কল্যাণগত বৈপরীত্য কিছুদিন ধরে সারা দুনিয়ায় রাজনীতিকদের চিন্তা জাগিয়ে তুলেছে। উন্নত দেশগুলি সম্প্রতি শৈলীগতভাবে আগের চেয়েও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। অথচ আফ্রিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি জীবনযাত্রার মান কায়ক্লেশে মাত্র কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। অধ্যাপক এল. জে. জিমারমান বিশ্বের তেরটি অঞ্চল, তিনটি তারিখ—১৯১৩, ১৩২৩ ও ১৯৫৭ ধরে তুলনা করে অবস্থার একটি ব্যাপক রূপরেখা দিয়েছেন। যে কোন সংখ্যাতাত্ত্বিকই বলবেন, এমনধারা তুলনা আসলে মোটামুটি একটা আভাস আনে মাত্র। অবশ্য গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্যও খুব কম নয়। তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার দিয়ে আলোচনার গৌরচন্দ্রিকা করা যাক। তাঁর দেওয়া সংখ্যাগুলি দেখলেই স্পষ্ট হবে (১ম সারণী দেখুন) ১৯৫৩ সালের মূল্যমান অনুযায়ী ঐ সময়সীমায় পশ্চিমী ও কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত দেশগুলিতে মাথাপিছু আয় কী বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত দেশগুলিতে এই বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। দেখা যাচ্ছে, ঐ একই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাধারণভাবে জড়ত্ব এসেছে। চীনের অবস্থা এখন অবশ্য আর তেমন নয়। ভারতেও ১৯৫০ সাল থেকে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তার কিছুদিন পরই ভারতে আবার কিছুটা জড়ত্ব দেখা দিয়েছে।

সারণী ১। ১৯১৩—৫৭ বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চলের মাথাপিছু ডলার হিসাবে বছরের আয় (১৯৫৩ সালের ক্রয় ক্ষমতা) অনুযায়ী

	১৯১৩	১৯২৯	১৯৫৭
উত্তর আমেরিকা	৯১৭	১২৪৩	১৮৬৮
উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপ	৪৫৪	৫২৮	৭৯০
সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৬২	১৭৮	৭৫০
দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ	২০০	১৮৯	৩৬০
লাতিন আমেরিকা	১৭০	১৯৬	৩০০
জাপান	৮২	১৫২	২৪০
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৬৯	৬৮	৬৭
চীন	৫০	৫০	৬১

[**উৎস :** L.J. Zimmerman : Armo en rijko landen, 1959 pp 29, 31]

সংখ্যাগুলি অবশ্যই মোটামুটি ধরনের হতে বাধ্য। নানাদেশের দামের তরিতফাৎ নিয়ে সামঞ্জস্যবিধান করা হয়নি। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের এতখানি উর্ধ্বগ স্যূচক নজরে পড়ছে। তা সত্ত্বেও ধরা পড়েছে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় প্রথমত মাথাপিছু আয়ের বিচারে দরিদ্র দেশগুলি কি নিদারুন পিছিয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবধান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। উদাহরণ দিয়ে বলি, ইয়োরোপীয় আর্থনীতিক গোষ্ঠীর সদস্য দেশগুলির মাথাপিছু আয় প্রতিবছর মোটামুটি তিন শতাংশ হারে গত দশ বছর ধরে বেড়েই চলেছে। সে ক্ষেত্রে ভারতে ঐ একই সময়ে প্রতি বছর মাথাপিছু আয় মাত্র দেড় শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. অনুন্নত দেশগুলির সাধারণচিহ্ন

মাথাপিছু কম আয়ের দেশগুলি একে অন্যের চেয়ে আবার ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে অনেকখানি আলাদা। যেমন, কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের মাত্রা কম, কোথাও বা বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মাত্রা খুবই বেশি। কোনো অঞ্চল উঁচু, কোনো অঞ্চল বেশ নিচু। অনুন্নত দেশগুলির কোনোটিতে জনবসতি বিরল, কোথাও বা আবার ঘনবসতি। লাতিন আমেরিকার উচ্চবর্গের মানুষজন ইয়োরোপীয় বংশসম্ভূত, আবার এ-অঞ্চলে গরিষ্ঠাংশ মানুষ আমেরিকার আদিবাসীদের বংশধর। উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী, আবার

ভারতের হিন্দুধর্মাবলম্বীদেরই সংখ্যাধিক্য। আফ্রিকা ও এশিয়া নানা জাতি-গোষ্ঠী দ্বারা অধ্যুষিত। ১৮৫০ সালে দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো দেশ উপনিবেশ ছিল, অথচ ১৯৩০ সালে আফ্রিকার অধিকাংশ এবং এশিয়ার বিপুল অংশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই এশিয়া ঔপনিবেশিকতা মুক্ত হয়। কিন্তু ১৯৫০-এর কিছু পরে আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকতা মুক্তি শুরু হয়।

এতদসত্ত্বেও, এই 'দরিদ্র দেশগুলি'তে মূলত সামাজিক ও আর্থনীতিক কিছু কিছু সাধারণ চিহ্ন চোখে পড়ে। এদেশগুলির জলবায়ু সাধারণত উষ্ণমণ্ডলীয় এবং এদেশগুলির মাথাপিছু আয়ের হিসাব বাদ দিলেও—অবশ্য তাতেও ঢের তারতম্য আছে—দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষই কৃষি ও খনিতে কাজ করে। এ-দুটিকেই প্রাথমিক শিল্প বলা যেতে পারে। ফলে, অধিকাংশ উৎপাদনের উৎসই প্রাকৃতিক সম্পদ। উন্নততর দেশগুলির তুলনায় এ-সব দেশে কৃৎকৌশল এবং আর্থনীতিক শিক্ষার মান নিচু, সাধারণ স্বাস্থ্যের মানও খুব নিচু—নানা ধরনের ব্যাধির প্রাদুর্ভাব—মৃত্যুর হার খুবই বেশি, এবং সম্ভাব্য আয়ুর গড়পড়তা প্রায় ৪৫ বছর। তুলনায় ধনীদেশে গড় আয়ুর সম্ভাব্যতা ৭০ বছর। স্বল্পকালীন লাভের আশায় এ-সব দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। প্রায়ই ফাটকার তাৎপর্যে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খারাপ অর্থে প্রয়োগ করলে যে মানে দাঁড়ায়, সেই ব্যাপারেরই রাজত্ব। যদিও মাথাপিছু আয় অনেক কম, তা সত্ত্বেও উন্নত দেশের তুলনায় এ-সব দেশের আয় অনেকখানি অসমভাবে বণ্টিত। জাতি সংঘের উৎস থেকে পাওয়া সংখ্যা অনুযায়ী অনেকগুলি চিহ্ন দ্বিতীয় সারণীতে দেওয়া হলো।

সারণী ২। বার্ষিক মাথাপিছু বিভিন্ন আয়ের (১৯৫৫—৬০) বিভিন্ন দেশগোষ্ঠীর আর্থনীতিক ও সামাজিক কিছু দিক

দেশগোষ্ঠী	ডলারের হিসাবে মাথা পিছু আয়	সম্ভাব্য আয়ু	চিকিৎসক পিছু জনসংখ্যা	জনগণের নিরক্ষরতার শতাংশ	কৃষি থেকে জাতীয় আয়ের শতাংশ
১	>—১০০০	৭১	৮৮৫	২	১১
২	৫৭৬—১০০০	৬৮	৯৪৪	৬	১১
৩	৩৫১—৫৭৫	৬৫	১৭২১	১৯	১৫
৪	২০১—৩৫০	৫৭	৩১৩৫	৩০	৩০
৫	১০০—২০০	৫০	৫১৮৫	৪৯	৩৩
৬	<—১০০	৪৫	১২৪৫০	৭১	৪১

[উৎস : United Nations, Report on the World Social Situation, New York 1961]

দ্বিতীয় সারণী থেকে স্বতই স্পষ্ট যে প্রতিটি বিষয়ের তলায় সংখ্যা দেখেই বলা যায় ঐ প্রতিটি বিষয়ই কেমন মাথাপিছু আয়ের উপর নির্ভরশীল।

যে-দিকগুলির আমি উল্লেখ করেছি, সে-সবগুলিই পরস্পরের সঙ্গে কার্যকারণ তাৎপর্যে সম্পর্কিত। যেখানে আয় কম, আয়ের অধিকাংশটাই কৃষিজাত উৎপাদনের উপরে ব্যয়িত হয়। বিশেষভাবে গরম দেশে ঐ কৃষিজাত পণ্যইতো জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আবার, যেখানে শিক্ষার মান নিচু, জনসাধারণের উৎপাদিকা সামর্থ্য সেখানে মূলত প্রকৃতি থেকেই জোগান পাওয়া যায়। যে-দেশে মাথাপিছু আয় কম, সে-দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যপ্রযত্নের দরুন ব্যয়ের সামর্থ্যও কম, দেশের মানুষ দূরপ্রসারী চিন্তাতেও অনভ্যস্ত। ফলে, দ্রুত লাভের জন্যই যা কিছু কাজকর্ম। কেবলমাত্র টিকে থাকাটাই দরিদ্রদেশে নানা অন্যায়ের কারণ। কিছু কিছু লোক যে দারুন ধনী, তার কারণ স্বল্প জোগানের দাক্ষিণ্যে কেবল তাদের মালিকানাতেই বাস্তব জ্ঞান বা মূলধন অথবা দুই-ই রয়ে গেছে।

যদিও এসব বিষয়ই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, তা হলেও কোন দেশের দারিদ্র্যের জন্যে কোন বিষয়টিই দায়ী, আপাত দৃষ্টিতে সে-কথা বলা যায় না।

৩. আর্থনীতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়

ইতিমধ্যে, উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যেকার ফারাক বুঝতে হলে, উন্নত দেশগুলির ব্যাপার অনুন্নত দেশের আগে ভালো করে বুঝে নেওয়া ভালো। উন্নত দেশগুলিতে আজ যেমন প্রাচুর্য দেখা যায়, তার প্রতিতুলনায় প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাসে জীবন ও মৃত্যুর সীমান্তে কেবল টিকে থাকাটাই অনেকখানি স্বাভাবিক ঘটনা। যদিও প্রত্যক্ষভাবে ধনীদেশগুলির সম্পদ বিপুল জ্ঞান ও বিশাল পরিমাণ মূলধনের অধিকারের তাৎপর্যেই গড়ে উঠেছে, সে-সবও আসলে অন্যবিধ বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল। সে-বিষয়গুলিও ভাগ করে দেখানো যায়—সক্রিয়ভাবে কর্মে নিযুক্ত করার মতো পরিবেশ রচনা এবং মানবিক উপকরণ। এ কথা ঠিক, আজকের দিনের আধুনিক উন্নত সমাজে যথাযথভাবে কাজ চালাতে গেলে, কোনো কোনো বিশেষ মানবিক গুণের প্রয়োজনীয়তাটুকু অস্বীকার করা যায় না। এ-ধরনের সমাজে স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য ব্যবহারগত উৎপাদন পদ্ধতি এবং একসঙ্গে বহু ব্যক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ। এসব কারণে যেসব গুণ প্রয়োজনীয়, সেগুলি হলো: উন্নত সমাজে জনগণের বিপুল হারে বস্তুগত কল্যাণের প্রতি মনস্কতা; কৃৎকৌশল

ও নতুন আবিষ্কারের প্রতি ঝোঁক; দূরদৃষ্টি এবং ঝুঁকি নেবার ইচ্ছা; ধৈর্য; অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতা এবং কিছু নিয়ম মেনে চলা।

সহজ ভাবেই বোঝা যায়—এ-পাঁচটি গুণ নানা কারণে খুবই প্রয়োজন। প্রথমটি তো চালিকাশক্তি স্বরূপ। বিভিন্ন ধরনের কৃৎকৌশলগত সহায়তা আধুনিক শিল্পের সব সময়ই প্রয়োজন এবং সেগুলির উন্নয়নও সব সময়ই দরকার—এটাই দ্বিতীয় গুণ। উৎপাদনের জন্য মূলধনীদ্রব্য অনেকখানি সময় নেয়—ফলে তৃতীয় গুণটি অপরিহার্য। ফলাফল তো বহু সময় হতাশাব্যঞ্জক হতে পারে—এজন্য চতুর্থ গুণটি আবশ্যক। পঞ্চমত, সুপরিচালিত উৎপাদন-পদ্ধতিতে নিরবচ্ছিন্ন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। আর, এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, উন্নতি সহজসাধ্য করতে হলে উল্লিখিত গুণগুলির বিপরীত দোষগুলিকে সম্পূর্ণ জয় করতে হবে। বিপরীত দোষগুলি বলতে কি বুঝব? বস্তুগত অবস্থার উন্নতিতে নিস্পৃহ, উন্নততর কৃৎকৌশল ও রুটিন মাফিক কাজকর্মে বিতৃষ্ণা, দূরদৃষ্টিহীনতা এবং অনিশ্চয়তা বিষয়ে ভীতি, উদ্দীপনাহীনতা এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। তা হলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে পড়ে, উন্নত সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় মানবিকগুণগুলি কি লোকজন আত্মস্থ করতে পারে এবং সেগুলি কি পরিবেশের সাহায্যে গড়ে তোলা যায়? এ-বিষয়ে চলতি মত হলো, মানুষের পক্ষে অনেকখানিই শিখে ফেলা সম্ভব—আর, এক প্রজন্মে না হলেও কয়েক প্রজন্মে তো বটেই। মানুষের জ্ঞান-আহরণের ব্যাপারটাও তো বিশেষ ভাবে পরিবেশ-প্রভাবিত। নাতিশীতোষ্ণ বা শীতের পরিবেশ মানুষকে সম্ভবত অনেকখানি কর্মোদ্দীপ্ত রাখতে পারে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, ঋতুগত পরিবর্তন অথবা মন্দ বা ভালো কৃষি-উৎপাদনের ফলে যেমন আপেক্ষিক সম্পদের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে—এমন সব ব্যাপার মানুষকে আগে থেকেই পরিকল্পনামনস্ক করে তুলতে পারে। বিদেশী আধিপত্য তার সুযোগ ও উন্নতির প্রেরণা কেড়ে নেয় বলে তার শিক্ষাদীক্ষার ক্ষমতার উপরেও তা প্রভাব আনতে পারে। যদি তার প্রভাব খুব বেশি বা 'অকিঞ্চিৎকর' না হয়ে ওঠে—টয়েনবির 'চ্যালেঞ্জ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে এসব কথা তো বলাই চলে—ঐ 'চ্যালেঞ্জ' যদি খুবই বেশি চাপ সৃষ্টি করে, তার ফল নিরাশাজনক ব্যাপার ঘটাবে। এ-বিষয়ে আমরা বলতে পারি না কোন 'চ্যালেঞ্জ' খুব বেশি জোরালো আর কোন 'চ্যালেঞ্জ'ই বা খুবই 'অকিঞ্চিৎকর'। আসলে আমরা আর্থনীতিক উন্নয়নের বহুবিধ মূলকারণই জানি না। ফলে সচেতন কোনো উন্নয়নমূলক নীতি সুনিশ্চিত ভাবে বেছে

নেওয়া যায় না। সে-কারণে, কিছুক্ষণের জন্য বিদেশী কিছু উদাহরণের উপরে নির্ভর করা যাক। আর, এ কাজ করার সময় আলাদা আলাদা দিক ও পরিবেশের ব্যাপারে আমরা মন দেবার প্রচেষ্টা চালাব।

৪. উন্নয়নের ইচ্ছা

গত দশ-বিশ বছরে দরিদ্র দেশগুলি আর্থনীতিকভাবে উন্নয়নের জন্য লক্ষণীয়ভাবে ঈপ্সা প্রকাশ করেছে। অবশ্য ঐসব দেশের সরকারগুলিই প্রাথমিকভাবে ঐ ইচ্ছা দেখিয়েছে। বিভিন্ন স্তরের লোকজনও যে অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, সেটা চোখে পড়ার মতো।

এরা যে উন্নতির ইচ্ছা দেখাবে—সেটাই তো স্বাভাবিক। এদের অধিকাংশই এমন দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেন যে, যার জন্তে শারীরিক কষ্টেরও কোনো সীমা নেই। যারা অসুস্থ বা ক্ষুধার্ত নয়, তাদেরও অবস্থা "অন্ত ভক্ষ্য ধনুর্গুণ"-এর মতো। অধিকাংশের পক্ষে কোনোপ্রকার বিলাসদ্রব্য ব্যবহার বা খাদ্য ও জীবনযাত্রায় কোনোপ্রকার বৈচিত্র্য আনা অসম্ভব ব্যাপার। এদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক না কেন, উন্নতির জন্য উচ্চাশা তাদের পক্ষে তো স্বাভাবিক।

ক্রমেই বেশি সংখ্যায় মানুষ বুঝতে পারছেন, তাদের দারিদ্র্য অপ্রয়োজনীয়; অবশ্যম্ভাবীও নয়। আর এ-বোধ তাদের উন্নতির লক্ষ্যে উৎসাহিত করেছে। উন্নত পশ্চিমী ও কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও যোগাযোগের দাক্ষিণ্যে যে সহজ ও নিয়মিত গভীর স্তরে যোগাযোগ ঘটেছে, তার ফলে এ-বোধ আরও শক্তিশালী হয়েছে। অনুন্নত দেশের মানুষজন বুঝেছেন, উন্নত দেশে সত্যি কি কি পাওয়া যায়। এবং সমাজের উঁচু তলার অনেকেই এমন কি ব্যয়সঙ্কুলান না হবার ঝুঁকি নিয়েই ধনীদেশের আদব-কায়দা ও অভ্যাস নকল করার চেষ্টা করে থাকে। বিদেশী পরিভ্রমণকারীরা যে-সব অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, সে-সব অঞ্চলে এমন ঘটনা তো আকছারই ঘটছে।

উন্নয়নের জন্য জনগণের এই যে প্রবল ইচ্ছা, তার আর-একটি কারণ রয়েছে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের পর তারা সন্তস্বাধীনদেশরূপে বেরিয়ে এসেছে। যেসব দেশ জাতীয় আন্দোলনের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন, জাতীয় আন্দোলনে তাঁরা এতই মগ্ন ছিলেন যে উন্নয়নের দিকে নজর দেবার মতো তাঁদের অবকাশ মেলেনি। ঐসব আন্দোলনের সদস্যরা মনেও করতেন যে ঔপনিবেশিক শাসন অন্তত অংশত হলেও দেশের জনগণের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। স্বাধীনতা অর্জন এবং ঔপনিবেশিক অবস্থার অবসানের পর, জনগণ তাদের অবস্থা

এবার ভালো হবে বলে আশান্বিত। নতুন সরকারগুলির পক্ষে এখনই এমন কর্মসূচী প্রয়োজন—যে-কর্মসূচী আর্থনীতিক উন্নয়নের কর্মসূচী।

সবশেষে, পশ্চিমী ও কমিউনিস্ট—দু-মার্গের উন্নতদেশের সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিচালনা সংগঠন, অনেকখানিই এখন পরস্পরের প্রতিযোগী। প্রতিটি ব্যবস্থার প্রচারকেরা তাঁদের ব্যবস্থাই প্রকৃষ্টতর বলে সুপারিশ করছেন। আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দরিদ্র দেশে আর্থনীতিক উন্নয়নের সংগ্রামে উৎসাহ যোগায়। দরিদ্র দেশগুলি কোনো একটি ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে না পড়ে, দু-ব্যবস্থা থেকেই শিক্ষা নিতে আগ্রহী।

দরিদ্র দেশগুলির সম্পদশালী হয়ে ওঠাটাই আজ দুনিয়ার কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার একদিকে ক্রমবর্ধমান সম্পদ অন্যদিকে অপরিসীম দারিদ্র্য কখনোই সুস্থির অবস্থার সৃজন ঘটায় না। একদিন না একদিন এই বৈপরীত্য বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে বাধ্য। তারও চেয়ে বড় কথা, যতদিন যাবে দরিদ্র দেশগুলির অবস্থা অবশ্যম্ভাবীরূপে আরও কঠিন হয়ে পড়বে, যদি না সাধারণ সম্পদবৃদ্ধির তারা অংশ পায়। দরিদ্র দেশগুলির জনসাধারণের সুখী বা ক্রুদ্ধ হওয়া সমাজের ধনী ও দরিদ্র গোষ্ঠীর আপেক্ষিক বৈপরীত্যের উপর নির্ভরশীল। সব শেষে, ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে ব্যবধান যত বাড়বে, ততই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাবও বদলে যাবে, দরিদ্র দেশগুলির ক্রোধ একসময় ধনী দেশগুলির উপর দাবির চাপ বাড়িয়ে তুলবে। ইতিহাসে বহু প্রমাণ আছে- যদি কোনো সরকার অভ্যন্তরীণ সমস্যার নিরাকরণ না আনতে পারে, তা হলে অন্য দেশের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রতি জনগণের দৃষ্টি ফিরিয়ে ধরে।

উনিশ শতক এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে উন্নত দেশে যে সামাজিক সমস্যা দেখা গিয়েছিল, তারই সঙ্গে আজকের ধনী-দরিদ্র দেশের বৈষম্য তুলনা করা যায়। এ-কথা সত্য। এ-সমস্যা বিশ্বের সমস্যা। উন্নত দেশগুলিতে বস্তুগত কল্যাণের ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈপরীত্য আগের চেয়ে কম চোখে পড়ার মতো হয়েছে, ফলে রাজনীতিক স্থিতিও এসেছে। ভবিষ্যতের দুনিয়া জুড়ে যদি রাজনৈতিক শান্তি আনতেই হয়—যা আমা সম্ভবও—সেজন্য সম্পদ ও দারিদ্র্যের মধ্যে আজকের দিনের বৈষম্য দূর করতে হবে। এ-সমস্যাকে সামাজিক সমস্যার সঙ্গে আরো অনেকখানি প্রতিতুলনা করা যায়। সম্পদশালী দেশের সম্পদের অসম বণ্টনের শিকারেরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলেই সামাজিক সমস্যার কিছুটা সমাধান আনতে পেরেছিলেন। দরিদ্র দেশের জনগণ ঠিক তেমনি ভাবে একত্রে মিলে না লড়াই করলে, এ-বৈষম্যের নিরাকরণ ঘটবে না।

[Jan Tinbergen-এর Development Planning, London, 1967 সংস্করণ থেকে অনূদিত। অনুবাদক : ইকবাল ইমাম]

শিল্প ও বিপ্লব

অরুণ সেন

জন বর্জরের 'পিকাসোর সাফল্য ও ব্যর্থতা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমরা প্রায় সকলেই। বর্জর সাহেবের আলোচনার কাঠামোটি খুবই প্রথাবদ্ধ, অর্থাৎ পিকাসোর আলোচনার ধাপে ধাপে তিনি স্পেনের ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি কিংবা শিল্পগত ঐতিহ্য ইত্যাদি বিস্তৃত ও সরলভাবে উপস্থিত করেন এবং এ সমস্ত কিছুকেই প্রায় অনিবার্য করে তোলেন উদ্দেশ্যর স্পষ্টতায়। অথচ তিনিই শেষপর্যন্ত এমন আবহাওয়াতেই অনায়াসে পিকাসো সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত ও তীক্ষ্ণ মতামত জানাতে পারেন আমাদের উপকারার্থে। তাই অল্প কয়েক মাস আগে জন বর্জরের আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়া মাত্র আমাদের আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠেছিল। বিশেষত বিষয় যখন 'শিল্প ও বিপ্লব' কিংবা কোনো অতি-আধুনিক রুশ ভাস্কর প্রসঙ্গে সোভিয়েত শিল্পীর ভূমিকা।

বর্জর সাহেবের কলম এখানেও অনায়াস এবং মনোগ্রাহী। গল্প দিয়ে শুরু করলেও তাঁর আলোচনারীতি এখনও সুসংবদ্ধ, বক্তব্যের তাগিদে ও একাগ্রতায় যে-কোনো-প্রকার বিশৃঙ্খলার বিরোধী। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের নানা ব্যাপারে মুস্কিলে পড়তে হয়—কারণ মতামতের একপ্রান্তের ভ্রান্তিমুক্তির উত্তেজনায় তিনি অপর প্রান্তের ভ্রান্তিকে বরণ করে নেন, এরকম সন্দেহ হয়। ভাবালু মনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার লীলা ঘটে বোধহয় এভাবেই। অবশ্য বর্জর সাহেবের মন নিশ্চয়ই ভাবালু নয়, তাঁর চিন্তায় জটিলতা বাদ পড়ে না অত সহজে, তাই সোভিয়েত বা ক্রুশ্চভ-প্রসঙ্গে তাঁর কাছ থেকে নানান ঠোক্কর একটু বেমানান লাগে। অর্থাৎ রচনার প্রথমাংশে যখন তিনি শিল্পে রাজনৈতিক নির্দেশনামা কিংবা ফরমায়েসী সরকারী শিল্পবক্তব্যের বিরোধিতা করেন, তখন তাঁর বুদ্ধি যতটা মুক্ত এবং অমোঘ মনে হয়, শেষাংশে যখন তারই ঝোঁকে তিনি অন্য প্রান্তে পৌঁছে শিল্পীর স্বৈরাচার কিংবা শিল্পের চমকপ্রদ স্বকীয়তাকে সমর্থন করে প্রায় তত্ত্ব খাড়া করতে চান, তখন বেশ অস্বস্তিকর লাগে।

কেননা আর্নস্ট নিজভেস্‌ত নি-র সৃষ্টি ক্ষমতাবান নিশ্চয়ই, কিন্তু সোভিয়েতের

পটভূমিতে প্রবলতার এই রূপটি যেন আকস্মিক, একটু কৃত্রিম ও উদ্ভট লাগে— যে অজস্র ভাস্কর্য-কর্মের ছবি লেখক ছাপিয়েছেন তা দেখে ঐ কথাই তো মনে হয় (এই মন্তব্যের সীমা ক্ষমার্হ, কারণ বর্জর সাহেবও ভূমিকায় লিখেছেন, তিনিও শিল্পীর কাজের ফটোগ্রাফ দেখেই এই গ্রন্থ রচনায় উদ্যত হয়েছেন)। লেখকের চোখে যে তা ধরা পড়ে নি, তার কারণটাও হয়তো বোঝা যায়। নিজভেস্ত্‌নি-র রোমাঞ্চকর নিঃসঙ্গ জীবনের মহিমা বর্ণনার উৎসাহ তিনি চেপে রাখতে পারেন নি। অথচ শিল্পীর স্নায়ু ও নান্দনিক মন যে বেজায় অস্বচ্ছন্দ, তা তো অনেকটা তাঁর জীবনগত কারণেই স্বাভাবিক। তাই লেখকের উৎসাহ শিল্পীকে যেভাবে বীর এবং শহীদ বানিয়ে তোলার প্রবণতায় প্রচ্ছন্ন, তা থেকেই বোধহয় শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে কিছু তত্ত্বারোপ ঘটে। অথচ বর্জর সাহেব সমাজ-শিল্প-বিষয়-রীতি ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান বোঝেন মার্কসবাদীর সমগ্রতাবোধেই, তাই জোর করে যেন নিজেকেই খাপ খাওয়াতে চান নিজভেস্ত্‌নি-র বিশৃঙ্খলাতেও।

জন বর্জরের পদস্খলন যে ঠিক ঘটে নি, তা বোঝা যায় যেখানে তিনি রুশ শিল্পের পটভূমি বর্ণনা করেন এবং স্তালিন আমলের শিল্প-বিষয়ক অন্ধতার ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর মতে, রাশিয়ায় আঠারো শতকের পূর্ব পর্যন্ত ভাস্কর্যের প্রায় কোনো ঐতিহ্যই নেই—গির্জার আসবাবপত্রের খোদাই কিংবা লোকশিল্পের কিছু নমুনা ছাড়া। রুশ শিল্পের এই ঐতিহ্য সম্পর্কে মূল যে কটি কথা বলা যায়, তা হচ্ছে ১. এ সময় পর্যন্ত প্রায় সব শিল্পই রীতিতে বাইজান্টীয়—ধর্মকেন্দ্রিক, অপার্থিব এবং বহির্মুখী। ২. এই অপার্থিবতার প্রতি ঝোঁক থেকেই রুশ চরিত্রে রয়ে গেল ব্যক্তিস্বার্থের অতীত 'আশাবাদ', রূপতৃপ্তির বদলে সত্যানুসন্ধান কিংবা নিছক শিল্পপ্রসাদের বদলে দ্রষ্টার ভূমিকা। ৩. পিটার দি গ্রেটের আমলে রাশিয়ায় আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু ফরাসী আকাদেমির সঙ্গে রুশ আকাদেমির পার্থক্য এখানেই যে, ফরাসী আকাদেমির পাশে সব সময়েই থাকে একদল বিদ্রোহী শিল্পী, আর ফরাসীদের তো আছেই বাস্তববাদের ঐতিহ্য। কিন্তু রুশ আকাদেমির এসব ঐতিহ্য ছিল না বলে তার আধিপত্য হলো একচ্ছত্র এবং ক্ষতিকর। অর্থাৎ আকাদেমির যেটা মূল কথা, তত্ত্বের সঙ্গে সৃষ্টিক্রিয়ার বিচ্ছেদ, তৈরি বক্তব্যের চাপ—তা রাশিয়ায় নিঃশর্তভাবে মানা চলল দীর্ঘকাল ধরে। কারণ সেখানকার শিল্পরসিকসমাজও তো ঐতিহ্যহীন এবং কৃত্রিমভাবে গঠিত। ৪. তাই ১৮৬৩ সালে প্রথম যখন এর বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' দেখা গেল,

পরিহাসের বিষয়, সেই 'ভ্রাম্যমান দল'ও (দি ওয়াণ্ডারার্স) বিষয়ের দিক থেকে যতখানি বিপ্লবী; রীতির দিক থেকে ততখানিই সাবেকি—অর্থাৎ আকাদেমির প্রভাব ছিল এত বিপুল। ৫. ১৮৯১ সালের পর রুশ ধনতন্ত্র যখন একটু পাকল এবং ইওরোপের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল, তখন শিল্পের জগতেও যেন একটা নতুন হাওয়া বইল। সেজান, দেগা, ভান গখ, রুশো, গোগ্যাঁ, মাতিস ও পিকাসোর ছবি এসে গেল নানা সংগ্রাহকের বাড়িতে। ৬. তার ফলেই বোধহয় এবং আরো নানা আপতিক কারণে ১৯১৭ থেকে ১৯২৩ সাল, অর্থাৎ বিপ্লবের ঠিক অব্যবহিত পরেই, রুশ শিল্পের একটা সুসময় গেল। রুশ বিপ্লবের প্রেরণার ভূমিকা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু বর্জারের এই বিবরণীতে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, রুশ মনে আকাদেমি-বিরোধী স্বাধীনতার ঐতিহ্য প্রবল নয় এবং নিশ্চল অতীত থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ভীষণ গতি তাদের মতকে মধ্যপন্থাবিরোধী ও চরমবাদী করে তোলে। তাই ১৯৩২ সাল থেকে সব খোলা হাওয়া বন্ধ করে সম্ভব হলো নির্বিবাদে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র যান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিভ্রান্তিকর জয়যাত্রা।

জন বর্জরের এই ব্যাখ্যায় নিশ্চয়ই নানা গোলমাল আছে, তাঁর স্বাধীনতার ধারণাটাও পশ্চিমী-ঘেঁষা—কিছুটা ইতিহাসগত অবিচারও ঘটেছে, কারণ প্রথমাবস্থায় তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কোনো কোনো সূত্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা কিংবা অনিবার্যতাকে ঠেকানো সম্ভব ছিল না। তবে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র ভ্রান্তিবিলাসকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন সংগতভাবেই। স্বভাববাদ ও বাস্তববাদের অদ্বৈতবিচারের ভ্রান্তি তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সংজ্ঞা-নির্ণয়ে, কেননা স্বভাববাদ যে পলকা একপেশে এবং তার পাশে বাস্তবতা সমগ্রতার সন্ধানী—সে-কথা যেমন তিনি বলতে ভোলেন নি, তেমনি আত্মসর্বস্বতা বা নীতিবাগীশ প্রচার যে এই সংজ্ঞাভ্রান্তি থেকেই আসে তাও তিনি জানেন। অথচ স্তালিন-আমলে লেনিনের যে-প্রবন্ধকে নির্ভর করা হলো, 'পার্টি-সংগঠন ও পার্টি-সাহিত্য', তা যে আসলে শিল্পসাহিত্য-সম্পর্কে উদ্দিষ্ট নয়, তা ক্রুপস্কায়ার অপ্রকাশিত পত্র ব্যতিরেকেই বোঝা যেত। কিন্তু দীর্ঘকাল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনেক কৃতিত্ব সত্ত্বেও শিল্পসাহিত্যে অতি-বামপন্থা মাঝে মাঝেই বিপদ সৃষ্টি করেছে। তার অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে থাকলে শিল্পের স্বাধিকার-সম্পর্কে বিপরীত দক্ষিণা-বিলাস এসে পড়া হয়তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক, কিন্তু সংগত নয়। কারণ শিল্পের সমাজতত্ত্ব তো বিস্মরণের যোগ্য নয়, বরং

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওপরতলার অনেক নিয়মকানুন, রীতি বা ধ্বনির অনেক স্বাধীন নড়াচড়া, তা নিয়ে মতভেদ বা মতবৈচিত্র্যের স্বীকৃতি —এ-সব নিশ্চয়ই থাকবে, তার রহস্ত আরো আলোচিত হবে—'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র যান্ত্রিক প্রয়োগ তা বৃথাই ভোলাতে চেয়েছিল। বৃথাই, কারণ কর্তারা ভাবতেন বটে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' জনগণের, কিন্তু আসলে লোকশিল্পের ঐতিহ্য তো তার বিরোধিতাই করত। তাই বাঁধ যখন ভাঙল, তখন বোঝা গেল কোন অবরুদ্ধ ইচ্ছার তাড়নায় তাঁরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী আচরণকে উদ্ভট হলেও বাহবা জানাল। প্রতিক্রিয়ার এই অপ্রকৃতিস্থতাই বোধহয় কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে সোভিয়েত জনগণের একাংশের ব্যবহারে, নিজভেস্ত্‌নি-র মতো শিল্পীর অশান্ত রচনায় কিংবা জন বর্জরের মতো সুধী সমালোচকের ভারসাম্যলোপে, যার ঝোঁকে তিনি যেন বারবার সোভিয়েত-বিষয়ে অপদস্থ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে ফেলেন।

অর্থাৎ নিজভেস্ত্‌নি-র ভাস্কর্যের ছবিতে এই প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটাই খুব উগ্র। তাঁর পেছনে মিকেলাঞ্জেলো বা রদ্যাঁ কিংবা অন্যান্য ইওরোপীয় শিল্পীদের প্রভাব অনুসন্ধানে লেখক খুব পরিশ্রম করেছেন। এঁদের মতো নিজভেস্ত্‌নি-র রচনাতেও রয়েছে তীব্রতা ও নাটকীয় দ্বন্দ্ব। কিন্তু এসব প্রভাবকে আত্মসাৎ করে তিনি যখন থেকে স্বকীয়তার পথে গেলেন, তখন রূপগত বিপর্যয় বা বিকৃতি আরো ঘটল। ইওরোপের দৃষ্টান্তে এই বিকৃতির রূপ আমাদের কিছু কিছু চেনা। ইওরোপের ইতিহাসের পারম্পর্যে ও বুর্জোয়া অবক্ষয়ের পটভূমিতে এই 'বিকৃতি' বাস্তব, তার সমস্যাও বাস্তব, কিন্তু আমাদের বিড়ম্বিত ভারতবর্ষে যখন তার প্রভাব এসে পড়ে তখন তা যেমন হয় হতবুদ্ধিজনক, তেমনি ইওরোপের অনেক সন্নিকট হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ার বর্জর-কথিত ঐতিহ্যেও ইওরোপীয় দৃষ্টান্তের এই ঋজু কিংবা বক্র চাপ ব্যক্তিগতভাবে অকপট হলেও তা কাজে লাগে না।

এই তুলনার লোভ বর্জর সাহেবেরও আছে বলেই তিনি নিজভেস্ত্‌নি-র যে জীবন বর্ণনা করেন, তাতে মোহসঞ্চারের অভিসন্ধি আছে বলে সন্দেহ হয়। তাঁর যুদ্ধ-জীবন, নিহত-ভ্রমে-পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনা, তাঁর রোমাঞ্চকর স্টুডিও, তাঁর নিঃসঙ্গতা, তাঁর বীটনিক-বলে-অভিযুক্ত পোষাক, তাঁর চতুর ক্ষিপ্র কথাবার্তা —এ সমস্তই নিশ্চয়ই নিজভেস্ত্‌নি-র ভাস্কর্য আলোচনায় অবিস্মরণীয়, কিন্তু জন বর্জর নানান ফটোগ্রাফের সহযোগে তাঁকে যে-রকম 'হিরো' বানাবার চেষ্টা করেছেন, তাতে ইওরোপের সমকালীন নানা ঘটনার চিত্রই ভেসে ওঠে। যদিও

একথা সত্যি যে, এখনও সোভিয়েত শিল্পীসঙ্ঘের সব আচরণকে যেমন তখনি বোঝা যায় না, শিল্পীর সঙ্গে সঙ্ঘের সম্পর্কের নানান নতুন সমস্তাই বরং ওঠে নিজভেস্ত্‌নি-র দৃষ্টান্তে—তবু সোভিয়েতের শক্তিমান ও প্রশংসনীয় সহনশীলতার প্রমাণই মেলে শিল্পীর স্বাধীন চালচলন থেকে, যতই কেন বেসরকারী সূত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হোক তাঁকে কিংবা নির্বাচক-কমিটির অনুমোদন সত্ত্বেও খারিজ করুক শিল্পীসঙ্ঘ বা আকাদেমি তাঁর ভাস্কর্যকর্মকে। এমনকি নিজভেস্ত্‌নি ও ক্রুশ্চেভের মোলাকাতের নাটকীয় ও দীর্ঘ বর্ণনাতেও ক্রুশ্চভ ভালোই বেরিয়ে আসেন, বর্জরের নানা ইঙ্গিতময় শব্দ সত্ত্বেও। দীর্ঘ এক ঘণ্টার তীব্র কথোপকথনের পর ক্রুশ্চভ বলেন, "তোমার মতো লোককে তো আমি পছন্দই করি। তবে তোমার ভেতর দেবতাও আছে, শয়তানও আছে। যদি দেবতা জেতে, তবে আমরা একসাথে চলতে পারব। আর যদি শয়তান জেতে, তবে তোমাকে আমরা ধ্বংস করব।" সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন, অনেক সমস্তা এসে পড়বে। কিন্তু জন বর্জরও এরপর বলতে ভোলেন নি নিজভেস্ত্‌নি-র যথাযোগ্য বিচার হয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধের সব অভিযোগই পরিশেষে প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

আর্নস্ট নিজভেস্ত্‌নি-র যে সার বৈশিষ্ট্যের কথা জন বর্জর বলতে চান, তা হচ্ছে তাঁর সহনশীলতা—সক্রিয় ও বিপ্লবী সহনশীলতা। এই বিষয়কেই তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুনর্বিন্যাসের দ্বারা, বর্জর সাহেবের ভাষায় interiorization-এর সাহায্যে। "What I have termed Neizvestny's Interiorization of the body need not necessarily mean disclosing the interior of the body as such : it can equally well mean extraction from the body." এবং কিছু পরেই "His simplifications and distortions, unlike those of Michaelangelo, have little to do with the body's visible infra-and superstructure ; equally they have nothing to do with the pathetic attitudinizing of Expressionism or with the pursuit of pure form which hopes to arrive at certain formal archetypes which can apply to all structures and events ; instead they grow out of an awareness of the biological unity of all the parts of the body, the invisible and the visible, the muscular and the electrical, the vital and

the mortal.* সন্দেহ নেই, বর্জরের কথামতো, জীবনের প্রতি গভীর মমতা থেকেই এটা এসেছে এবং মৃত্যুর চেতনা সে-কারণেই বারবার হানা দেয় তাঁর কল্পনায় এবং সন্দেহ নেই, এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুগে ভিয়েতনামের দৃষ্টান্তে সহনশীলতাই বীরত্বের একটা বড় অভিব্যক্তি। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রূপগত বিকৃতির ঝোঁক আসতে পারে প্রতিক্রিয়ার স্বাধীন একদেশদর্শিতায়, খণ্ড দৃষ্টির চোরাপথে। নিজভেস্‌ত্‌নি-র ড্রইং ও ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শনেই অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই অসংলগ্ন উত্তেজনাও চোখে পড়ে। জন বর্জর বলেছেন, নিজভেস্‌ত্‌নি-র কাজের একটা মূল বিষয়ই হচ্ছে যৌনতা—যৌনশক্তির স্বাভাবিক অনির্বাণ রূপ। কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে গিয়েও তিনি যেন অব্যবস্থচিত্ততাকেই প্রশ্রয় দেন—সমগ্রতার ধ্যানের বদলে এ-ধরনের বিচ্যুতির সাধনার অহরহ লোভে হাতছানিতেই তিনি সাড়া দেন।

অথচ নিজভেস্‌ত্‌নি-র ক্ষমতার ও চারিত্রের প্রমাণ অনেক কাজেই পাওয়া যায়। কিন্তু আকাদেমির সঙ্গে তাঁর উদ্ধত বিবাদ যেন অন্য কোনো উপসর্গেরও প্রমাণ। আর জন বর্জর যা-ই বলুন, বুর্জোয়া দেশের আকাদেমির সঙ্গে সমাজ-তান্ত্রিক দেশের আকাদেমির তফাৎ আছেই, সাময়িক ভ্রান্তি বা বিচ্যুতির প্রমাণ সত্ত্বেও।

* Art and Revolution. Ernst Neizvestny and the Role of the Artist in the U. S. S. R.—John Berger. Penguin Books Ltd. 1969. 12/-Sh.

এই বিতর্কমূলক নিবন্ধটি সম্পর্কে আমরা পাঠকদের মতামত আহ্বান করছি। —সম্পাদক

লেখকদের শ্রেণীবিচার

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শুভাশুভ লক্ষণের এক মিশ্র লীলা প্রত্যক্ষ করছি। সমাজসচেতনতার দ্বারা মণ্ডিত শিল্পচর্চা ও জ্ঞান-বিদ্যার অনুশীলন যদি সক্রিয় বুদ্ধিজীবিতার একটি প্রধান ধর্ম হয়ে থাকে তো মানতেই হবে যে আজকের বুদ্ধিজীবী লেখকেরা শিল্পীরা কবিরা তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্যে যথেষ্ট জাগ্রত চৈতন্যের প্রমাণ বহন করছেন। নতুন লেখকদের কবিতায় গল্পে সে কী প্রতিভার ধার; মননশীলদের প্রবন্ধে-নিবন্ধে তথ্যভূয়িষ্ঠতার সঙ্গে সে কী নতুন চিন্তার দ্যুতি; বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীদের শিল্পকৃতির ভিতর সৃষ্টিশীল মনের সে কী প্রাণবন্ত অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন-নতুন আঙ্গিকের সংযোজন। কিন্তু বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সংস্কৃতি কর্মীদের এই উৎসাহব্যঞ্জক প্রাণশক্তি তাঁদের স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যতই সুফলের কারণ হোক না কেন, মনে হয় সমাজ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক মেলামেশার ক্ষেত্রে, তাঁদের ভূমিকা আরও উন্নত আরও সচেতন হবার অপেক্ষা রাখে।

কেন এ-কথা বলছি তা একটু বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলির কিছু কিছু অভিজ্ঞতা এই লেখকের আছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারা যায়, আলোচ্য প্রতিটি গোষ্ঠীই যেন তাঁদের নিজ নিজ বিশ্বাস রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে এক-একটি আলাদা বিচরণের জগৎ গড়ে তুলেছেন। এই জগৎগুলি জল-অচল প্রকোষ্ঠের মতো একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র। তাদের এক ক্ষেত্রে মিলিত হবার কোনো সাধারণ ভূমি নেই। গোষ্ঠী-গুলির পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের রেওয়াজ অনুপস্থিত। রেওয়াজ অনুপস্থিত তার কারণ, ভাব-বিনিময়ের এমন কোনো সাধারণ সূত্র চোখে পড়ে না যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে। শুধু যে তাদের মধ্যে কোনোরূপ আদান-প্রদান নেই তা ই নয়, তাদের পরিভাষাও যেন আলাদা। তাঁদের সাহিত্যের বর্ণিতব্য বিষয়, পরিবেশ, চিত্র-চরিত্র সব কিছুর মধ্যে যোজনব্যাপী ব্যবধান। অন্যপক্ষে, প্রতিটি গোষ্ঠীর চিন্তা ও কল্পনা

কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওইরূপ আবর্তনের ফলে তাদের চিন্তাভঙ্গী ভাষাভঙ্গী হয়ে যাচ্ছে আলাদা, এমনকি শব্দব্যবহারের ছাঁচও স্বতন্ত্র চেহারা লাভ করছে—কোনো গোষ্ঠীর বিষয়বস্তুর আর ভাষার সঙ্গেই অন্য কোনো গোষ্ঠীর বিষয়বস্তুর আর ভাষার মিল নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন,' 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন,' 'রবিবাসর,' 'পূর্ণিমা সম্মেলনী', 'কবি পরিষদ', 'উজ্জয়িনী সাহিত্যসভা' প্রভৃতি সংস্থার মানসিকতার সঙ্গে বামপন্থী চিন্তাদর্শ-পরিচালিত সাহিত্যিক সংস্থাসমূহের (যেমন 'সংস্কৃতি-পরিষদ', 'পরিচয়' মাসিকপত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সাহিত্যিক সম্প্রদায়; 'সাহিত্যপত্র', 'এক্ষণ', 'মানবমন', 'মূল্যায়ন', 'সপ্তাহ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট লেখকগোষ্ঠী) মানসিকতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথম সারির সংস্থাগুলির পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিকোণের যথেষ্ট তফাৎ থাকলেও এই একটা লক্ষণীয় মিল দেখতে পাওয়া যায় যে, এদের দৃষ্টিভঙ্গী গতানুগতিক, ঐতিহ্যাশ্রয়ী, রাজনীতিবিমুখ, সাহিত্যের প্রচলিত মূল্যবোধগুলিতে আস্থাশীল এবং স্থিতাবস্থার সংরক্ষণকামী। অধিকন্তু, খ্যাতিমান বর্ষীয়ান জনপ্রিয় লেখকদের এরা নিজ নিজ দলে অভিভাবকরূপে ভেড়াবার জন্য সতত পরস্পরের সঙ্গে অলিখিত প্রতিযোগিতায় নিরত। এইসব সংস্থার সদস্যগণ প্রগতিশীল ভাবধারা সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামান না, বরং অন্তরে অন্তরে এই ভাবধারা সম্বন্ধে বিলক্ষণ বিরূপতা পোষণ করেন। এঁরা প্রায়ই সংকীর্ণ জাতীয়তার পূজারী, তবে এঁদের এই একটা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যে, এঁদের অনেকেরই সাহিত্যপ্রেম নিখাদ এবং যে-সাহিত্যের এঁরা পোষকতা করেন সে-সাহিত্য দেশের মৃত্তিকার সঙ্গে সংযুক্ত। নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের ব্যথা-বেদনা এঁদের সাহিত্যে রূপায়িত হয় না বটে, তবে এঁদের সাহিত্যের আবহ, চিত্র-চরিত্র ইত্যাদি ষোল-আনা স্বদেশী। জাত্যাভিমানপুষ্ট দেশপ্রেমের যত ত্রুটি-বিচ্যুতিই থাকুক না কেন, তার এই একটা সদ্‌গুণ আছে যে তা মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মমত্বের মনোভাব জাগ্রত করে। জাতীয়তার সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের যোগ অচ্ছেদ্য।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় কবি-সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যে সকল লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সম্পর্কযুক্ত রয়েছেন, তাঁরা প্রগতিশীল ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ নতুন কালের চিন্তা-চেতনাকে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে রূপ দিতে সচেষ্ট, নতুন আঙ্গিক আর ভাষাশৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতত নিযুক্ত, শোষিত ও অবহেলিত শ্রেণীর

মানুষদের অভাব-অভিযোগ স্বপ্ন কামনার রূপায়ণে আন্তরিক যত্নপর, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সক্রিয় শরিক। এ-সবই অতিশয় প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দেখা যায় সুস্পষ্ট লাভের পিঠে কিছু ক্ষতিও তাঁদের মেনে নিতে হয়েছে। নতুন কালের অগ্রসর ভাবধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে এঁরা যেন কতক পরিমাণে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে, সাহিত্যের ধারাক্রমাগত উত্তরাধিকারের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছেন। এঁদের ভাষাভঙ্গী, শব্দব্যবহার, চিন্তার ছাঁচ কিছুটা যেন উৎকেন্দ্রিক। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এঁদের যে বলিষ্ঠতা, সেই বলিষ্ঠতার অনুরূপ প্রকাশশৈলী খুঁজতে গিয়ে এঁরা সচরাচর যে ইডিয়ম ও পরিভাষা ব্যবহার করছেন তা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবহমান সংস্কার থেকে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্লিষ্ট বলে মনে হয়। তবে এঁদের সম্পর্কে বড় কথা এই যে, এঁরা গতানুগতিক মূল্যবোধ তথা অর্থহীন দেশাচারের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য নন, প্রচলিত সত্যের সারবত্তা সম্বন্ধে সর্বদা প্রশ্ন ও বিচারশীল, একাধিক পুরস্কার-ধন্য সুপ্রসিদ্ধ ও মান্য কিন্তু কার্যত কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী 'জনপ্রিয়' প্রবীণ লেখকদের সম্পর্কে মোহমুক্ত, সর্বোপরি প্রথম সারির সংস্থাগুলির মতো প্রচার-উন্মুখ নন। সাহিত্যের ট্র্যাডিশন অনুশীলনে এঁদের আপেক্ষিক উৎসাহের অভাব আমাকে বেদনা দেয়, কিন্তু এঁদের নবীনত্বপ্রীতির আমি তারিফ করি। এঁদের সংস্কারমুক্তির চেষ্টার মধ্যে যে সজীব প্রাণের ধর্ম নিহিত আছে, তাকে খাটো করে দেখা চলে না।

পূর্বোক্ত দুই ধরনের সংস্থার বাইরে তৃতীয় এক সাহিত্যিক সংস্থা আছে যাদের লেখকগণ গান্ধীবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত। এঁরা পূর্বের দুই শ্রেণী থেকেই স্বতন্ত্রভাবে চলতে চেষ্টা করেন, চলতে গিয়ে আত্মাভিমানপুষ্ট হন। এঁদের আদর্শবাদ, বর্ণিত বিষয়ের গাম্ভীর্য, চটুলতার প্রতি বিমুখতা, সমাজসেবার মনোভাব প্রভৃতি প্রশংসাযোগ্য গুণ। কিন্তু ক্রমাগত একই বিষয়ের চর্চা করতে করতে এঁদের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে এসে গেছে মুদ্রাদোষ, একঘেয়েমি ও চিন্তার গতানুগতিকত্ব। মৌলিক বিদ্রোহী চিন্তার জগৎ থেকে এঁরা সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করছেন। গান্ধীবাদের সদ্‌গুণ নিশ্চয় এঁদের রচনায় প্রতিফলিত, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গান্ধীবাদের আবরণে এঁরা কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক। প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থাকেই জীইয়ে রাখতে এঁরা চান। যদিও গান্ধীবাদ কিন্তু সে-কথা বলে না। গান্ধীবাদী চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট বৈপ্লবিক অভীপ্সা নিহিত আছে। গান্ধীবাদকে ঠিক ঠিক ভাবে

বিচার ও প্রয়োগ করলে তার ক্রান্তিকারী ভূমিকা তা থেকে উদ্ভূত হতে বাধ্য।

চতুর্থ এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁদের ঐতিহ্য, প্রগতিশীলতা, জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতা, গান্ধীবাদ-সাম্যবাদ কিছুরই বালাই নেই; যাঁদের এক কথায় বলা যেতে পারে সংবাদপত্রসেবী ও সংবাদপত্রসেবিত সাহিত্যিক। স্বাধীনতা-উত্তর বৃহৎ সংবাদপত্রের আদর্শহীনতা ও বৈশ্য মনোবৃত্তি এইসব লেখকদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করেছে বললেও চলে। এঁরা সংবাদপত্রের 'মালিক-সম্পাদক'-এর ভজনাকারী, বশংবদ আজ্ঞাবহ মাত্র; এঁদের লেখকসত্তা গৌণ। বাঙলা দৈনিকের ঢালাও পৃষ্ঠাসমূহের উদার দাক্ষিণ্যের দৌলতে সাহিত্যচর্চা করবার সুযোগপ্রাপ্ত হয়ে এঁরা সাহিত্যের নামে বাঙলা ভাষায় এমন এক ধরনের তরল 'ইয়াঙ্কিপনা'র সূত্রপাত করেছেন—যার সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের পূর্বকথিত ডান-বাম কোনো ধারারই কোনো মিল নেই। এঁরা লোভী, নগদ লোভের কারবারী, আদর্শবাদ-বিবর্জিত, দেশের ইতিহাস ও বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে অচেতন কতকগুলি 'সময় সেবক'-এর জটলা মাত্র; এঁদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো।

পঞ্চম আর-এক লেখকগোষ্ঠী আছেন, যাঁদের প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় লালিত বর্ধিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় স্বভাবতই এই মহলে সৃষ্টিশীল লেখক অপেক্ষা জ্ঞান-চর্চাকারী গবেষক আর সমালোচকের প্রাধান্যই বেশি। অধ্যাপকেরা মনোবৃত্তি ও অভ্যাস এই দুই কারণেই সমালোচনাকর্মে সমধিক স্ফূর্তি বোধ করেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক-বর্গীয়—এটা অকারণ নয়। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবীণ সমালোচক-অধ্যাপকদের সমালোচনার মৌলিকতাকে বলিহারি যাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁরা পরের মুখে ঝাল-খাওয়া সমালোচক, নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর এঁদের যথেষ্ট পরিমাণে আস্থা নেই। এ-কথার প্রমাণ স্বরূপে এখানে দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব।

যেসব জ্ঞানী-গুণী বলে কথিত মানী অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা পণ্ডিতপ্রবর আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্য সংবর্ধিত করবার জন্য সময় বেছে নিলেন কখন? না, যখন যোগেশচন্দ্র সপ্ত কি অষ্ট নবতিপর বৃদ্ধ, যখন আচার্যদেবের আর নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই, যখন তাঁকে সংবর্ধিত করা না-করা তাঁর পক্ষে প্রায় তুল্যমূল্য ব্যাপার, যখন তাঁর এক পা—ইংরেজী

বাক্যরীতি অনুসরণ করে বলি—সমাধির অভিমুখে বাড়ানো হয়ে গেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তাগণ, শেষ অবধি বাঁকুড়ায় গিয়ে যোগেশচন্দ্রকে মানপত্র প্রদান করে যতই বিলম্বিত হোক একটা মস্ত বড় কর্তব্য পালনের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন!

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হালফিল। কোন পরম লগ্নে না-জানি তারাশঙ্কর ব্যবসায়ী জৈনদের 'জ্ঞানপীঠ' সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছিলেন, তারপর আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি হিড়িক পড়ে গেছে কে কার আগে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দিয়ে তারাশঙ্করকে সংবর্ধিত করবেন। "আগে কেবা মান করিবেক দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি!" তারাশঙ্করের লেখায় যদি এতই গুণপনা ছিল বাপু, তো তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য তাঁকে আগেভাগে সম্মান জানালেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। এখন লোকের মুখ কী করে বন্ধ করা যাবে, যদি লোকে বলে যে, এ হচ্ছে তারাশঙ্করের 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভের জাদুক্রিয়ার ফল। এ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধির একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতব্বর সমালোচক-অধ্যাপকদের এর চেয়ে বিচারদৈন্য ও অধীনতা কল্পনা করা যায় না।

এই সংখ্যা 'পরিচয়'-এ একাধিক বিতর্কমূলক রচনা প্রকাশিত হল। লেখকদের কোনো কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐকমত্যের অবকাশ কম। পাঠকদের কাছে তাই আমরা সশ্রদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা আহ্বান করছি। আলোচনা দীর্ঘ হলেও ক্ষতি নেই। —সম্পাদক

হাট সোমরা ও মায়লির গল্প

আশিস্ সেনগুপ্ত

হয়তো এখানে দুবেলাই মাছের বাজার বসে। দুটো গাড়ির যাতায়াতের সময়। যদিও সপ্তাহে একবার মাত্র হাট। রবিবার। বেচাকেনার পর পুকুরের পানাজলে ধুইয়ে দেওয়া হয়। উঁচু নিচু ছড়ানো স্থানে খেলাঘরের পুকুর তৈরি হয়ে জল জমে—সবুজ পানা লেগে থাকে, বিবর্ণ হয়, গন্ধ ওঠে। কতকাল পূর্বের বাঁধানো শান থেকে চটলা উঠে গেছে—প্লাস্টার। পায়ের গোড়ালি বা হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিলে সহজেই গুঁড়ো হয়, তাই এবড়ো খেবড়ো—ধুইয়ে দিলে জল জমে, পানা লেগে থাকে, গন্ধ ছড়ায়।

সোমরা লাঠিটা ঠিক করে রেখে সশব্দে দম ছাড়ল। প্রশ্বাস গ্রহণ করে ব্যাপারটা অন্যরকম ঠেকল। জায়গাটা ধোয়ানো হয়নি। খটখটে। কিংবা সকালে একবেলা বসেছিল, বিকেলে বসেনি। তবু ধোয়ানো হয়নি—গন্ধ ব্যতিক্রম, গন্ধ পরিবর্তিত। আঁশ বড় ছোটছোট, ছড়ানো পানার মতোই জমির গায়ে লেপটে যাওয়া; আবার বড়গুলো শুকিয়ে চরচরে আলগা। সোমরা উঁচু নিচু জায়গাতে হাত বোলাল এবং কষ্টে উবু হয়ে থুথু ফেলে শুকিয়ে যাওয়া কোঁকড়ানো একটা শক্ত আঁশ তুলে নাকের কাছে ধরল। আয়েসে ঘ্রাণ টানল বুক ভরে। দম টানতে নাকের কাছে ধরল। বুক আটকে কাশি পেল। কাশির দুই দমকেই শিথিলভাবে ধরা খয়ে যাওয়া হাতের থেকে আঁশ গন্ধটা খসে পড়ল। সোমরা নিচু হয়ে কোমর থেকে মেরুদণ্ডের প্রায় সবটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে কাশতে লাগল। চোখ টসটসে জলেভরা, বুঝি বা কয়েক ফোঁটা গড়িয়েও পড়েছে। এখন ও সামলাল। থুথু ফেলল। ফেলে অন্ধকারে ঐ থুথুর দিকে তাকিয়ে রইল। সোমরার থুথুর রঙ চেনা, তবুও তাকিয়ে থাকবে। ওর এক চোখের দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করে থুথুর গায়ে গিয়ে ঠিক বিদ্ধ হয় এবং তারপর ও সমস্ত দেহ কাঁপিয়ে কুঁকড়ে ঝংকৃত করে দাঁত কড়মড় করে গালাগালি আওড়ায়। তা থেকে হয়তো শব্দ হয়, সেই শব্দে হয়তো কুকুরগুলো আকাশের দিকে মুখ তুলে ডাকে। এই ডাক কুকুরের কান্না বলে অভিহিত হয়। এই কান্নায় সোমরা তার লাঠিটিকে ওর পক্ষে সম্ভবপরতম ভাবে দৃঢ় করে এধার-ওধার চালাবে, স-কারাদি ব-কারাদি খিস্তি আওড়াবে। কিন্তু কুকুরগুলো তাতে

বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় বরং ক্রন্দন কয়েকগুণ উৎসাহিত হয়ে কীর্তন বিশেষে রূপান্তরিত হবে। এরকম ভাবে চলতে থাকা কালীনই ও লাঠি হাতে উঠে দাঁড়াবে। এই উঠে দাঁড়ানোতে অনেক সময় ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে পা টেনে টেনে চলতে শুরু করবে। কুকুরগুলো গান বা কান্না ভেঙ্গে পেছন পেছন। সোমরা ওর জড়িয়ে আসা ঠুণ্ডা প্রায় হাত দিয়ে যে চোখকে জ্ঞান হওয়া অব্দি আঁধার জেনে এসেছে—তার উপরে হাত দেবে। কেন না ও ঠিক বুঝতে পারে ঐ চোখটার কোনায় কখন কখন পিচুটি জমে, আর একটা চোখেও। মাঝে মাঝে ওর জমা ময়লা পরিষ্কার করে ফেলতে ইচ্ছে করে। হাঁটতে হাঁটতে হাটখোলার একপ্রান্তে চলে গেল। ন্যাকড়া পোঁটলা নিয়ে বসল। কুকুরগুলো প্রায় যেন অনেকটা নিয়ম বা অভ্যাসমতো লেজ নেড়ে নেড়ে ওকে বেষ্টন করে বসেছে—বাঘের মতো থাবা বুক উঁচিয়ে। সোমরা দম ফেলে ফেলে অনেকটা সময় গেলে ঠুণ্ডা হাতে আলগা করে লাঠিটা তুলে কুকুরগুলোর মাথায় গলায় পিঠে ঘসেঘসে বন্ধুত্ব জানাল, প্রীতি বজায় রাখল; অপরপক্ষ চোখ বুজে জিভ বের করে যেন বা কৃতার্থ।

সোমরা আটচালার খুঁটিতে হেলান দিয়ে পিঠ রাখল। কানের ভাঁজ থেকে আধপোড়া বিড়ি বের করে ধরাল। এই সময় যেন নূতন করে অনুভূতিটা গাঢ় হল—দেশলাইয়ের আগুনে ঠোঁট দুটির কোনো সাড় নেই। এই অনুভূতিহীন প্রাণহীনতা কিছু নূতন কালের নয়, তবুও ওরকম ভাবটা উদয় হল সোমরার মনে। নিভে যাওয়া দেশলাইয়ের কাঠিটার রঙিন জায়গাটা ধরে নিভিয়ে হাত নাকের কাছে এনে ও বুঝল ঠিক বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। তবু গন্ধটা বেশ ভালো, মিষ্টি। এবার ও হাতের দিকে তাকাল। অবশিষ্ট আঙুলগুলির অবস্থা নির্বিকার হয়ে উলটে পালটে দেখল। ফাটাফাটা চামড়া ওঠা—ঠোঁটের মতো—অন্ধকারে যতটা দেখা যায় দেখতে ইচ্ছে করে। দিনের বেলায় এমনটা হয় না। ঠোঁটের অবস্থা হাতের অবস্থা শরীরের আরও কত স্থানে ছড়িয়ে, ও জানে, বোধহয় সমস্ত রক্তেও, কিন্তু এতে সোমরার—যে সোমরার বয়স বোঝা সম্ভবের বাইরে—কিছু এসে যায় না। সোমরা জানে, বেশ ভালো করেই জানে, এই কিছু না এসে যাওয়া নিয়ে কত সুন্দর সহজ জীবন কেটে যায়। ও এরকম ভাবে শরীরে হাত বোলাতে চাইল এবং তাতে সফল হতে গিয়ে দেখল, হাত সরে না, একই জায়গাতে স্থির। এই স্থিরতা ও ভাঙতে গিয়ে দেখল ভাঙা যায় না, পাথর-কঠিন, অসম্ভব। কেননা, এই সেই জড়স্থান—যে-

স্থান গরীবের পরিচয় বহন করে, অথচ তার ক্ষেত্রে নিদারুণ করুণ ব্যতিক্রম। সমস্ত অবস্থাটার মধ্যে মিল বজায় রেখে কুকুরগুলো এধার-ওধার মৃদু গমনে হেঁটে গেছে। সোমরা জলজলে একচোখা দৃষ্টিতে তা দেখল এবং তারপর যখন একা হল তখন একটা ভাবান্তর সমস্ত দেহে—অবশ স্থানগুলিতেও—তাকে তাড়না শুরু করল। সেই তাড়নায় সোমরার দেহ শীতকালের মতো ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল, যে-চোখটা জ্ঞান হওয়া অব্দি অন্ধকার, আর-একটা সমেত তা উত্তপ্ত হয়ে স্থানচ্যুত হতে চাইল। তারপর মায়লির সেই পরিষ্কার স্বরে কথা—ঠিক তোকে কাম্বা দেব—সেই কবেকার সোমরাকে নিঃসঙ্গ একক ভয়াবহ করে দিল এবং বর্তমানে কিছু শক্তিশালী। সোমরা সকম্প অস্থির দেহে উঠে দাঁড়াল, কাঁধ ঝাঁকুনিতে লাঠি দৃঢ়। দ্রুত নিশ্বাসে মনে মনে যেন বা প্রতিজ্ঞা বাক্য আওড়াল। সেগুলি এরকম হতে পারে—এই হাটখোলার কাউকে রেহাই দেব না, কাউকে না। আমার ক্রুদ্ধ পরাজিত গলিত অবস্থা সমস্ত চরাচরে ব্যাপ্ত হোক। কিন্তু সোমরা কি চেয়েছিল, মানুষ কি চায়? ও এবার বীরবিক্রমে থুথু ছিটিয়ে ছিটিয়ে সমস্ত হাটখোলার চত্বরে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং গায়ের মরা চামড়াগুলি ছড়াতে লাগল। ও এই সময় দারুণ ভাবল শরীরের অসাড় রসময় লালচে জায়গাগুলো যদি এই স্থানে সাধ্যমতো ছড়িয়ে দিতে পারত, তাহলে ওর পরিকল্পনা শতকরা শতাংশ পূর্ণ হত—কেননা এখানে দুবেলা বাজার বসে।

সোমরা এবার চৈত্রের দ্বিপ্রহরে কলকাতার রিক্সাচালকদের মতো ক্লান্ত দম ছাড়ছে—ওর হাটখোলার বন্ধুদের মতো। কপাল ভেজা। বগল আরো, কত জায়গা ভেজা। কপাল থেকে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে অসাড় ঠোঁটে এলো। জিভে নোনতা স্বাদে ক্রোধ প্রশমিত। সোমরা ভাবল ওর চোখ দিয়ে কি জল গড়াচ্ছে? ওর সস্বেদ দেহ এবার মধ্যরাতের ফুরফুরে হাওয়ায় শীতল হতে চলেছে। থুথু ফেলা বন্ধ। চোখ জড়িয়ে আসে। ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো পোঁটলা বেঁধে একধারে শিয়র করল এবং কোঁকানোর ধ্বনি তুলে শরীর বিছাল। চোখ বুজে এলে ও চোখ বোজে না। শুয়ে লাঠিটাকে পাশ বালিসের ভূমিকা দিয়ে ও দেখল হাটখোলার বন্ধুরা হয়তো বা ওরই মতো কিছুটা এধার-ওধার ঘুরে এসে মন্থরভাবে আশেপাশে বসেছে। লেজ নাড়ছে।

শীতল কপাল থেকে হাত সরিয়ে সোমরা তা শরীরের মধ্যস্থলে রাখল। শরীরের মধ্যস্থলে—যেখানে হাত রাখলে ঠুঁটো হাতও সরে না। যেখানটা

শীতল নয়, উত্তপ্ত নয়, অভিব্যক্তিহীন পচনশীল কোষের সমাহার ; যা ওকে কিছু পূর্বে ক্রুদ্ধ করেছে চঞ্চল করেছে—তা এবার তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে নিয়ে গেল। সোমরা বুকভরে দম টেনে নিশ্বাস নিল। কাশি আটকে রাখতে পেরে সোমরা সন্তুষ্ট এই কারণে যেন সমস্ত রাত্রির গাম্ভীর্য ও নিস্তব্ধতার মধ্যে কান পেতে সে কোনো কিছু শোনার চেষ্টা করছে—ঠিক কি, তা ওর ধারণাতে যদিও নেই। এরকম অবস্থায় যদিও ওর চোখ বুজে এলো, ঘুম এলো না। প্রভু যিশু। ঈশ্বরের পুত্র। মাতা মেরি যোসেফ··· ভাবল সোমরা। চলার পথে সেই গোশালা—সোমরা যেন তন্দ্রাঘুমের মধ্যে দেখতে পেল—স্পষ্ট করে দেখতে পেল—গোশালার ভেতর কোথা থেকে আসা তীব্র আলোর বন্যার মধ্যে গাভীরা গলকম্বলে আহ্লাদ ছড়িয়ে ঘণ্টা বাঁধা গলা নাড়িয়ে টুংটাং শব্দ তুলছে আর কখন বা মিষ্টি-মধুর হাম্বারব। আর সদ্যোজাত প্রভু যিশু মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে চাঁচের পুতুলের মতো গোলাপী পা তুলে তুলে খেলা করছে। মাতা মেরি পুত্রগর্বে হাস্যোজ্জ্বল মহিমান্বিত। দূর-দূরান্ত থেকে মরুভূমি মহাসাগর পার হয়ে ঋষি পুরুষেরা এসেছেন যোসেফের পুত্র যিশুকে দর্শন করতে। সোমরা দেখল মায়লি সুস্থ ও সবল সোমরার কোলে যিশুকে সমর্পণ করছে। মায়লির বিশুষ্ক স্তন সতেজ। আহা! দুধে টইটম্বুর। শিশু যিশুর সুগন্ধি কষ বেয়ে মুধামৃত গড়িয়ে পড়ছে।

সোমরার বন্ধুরা মায়লির গন্ধে সমবেত রব তুলেছিল। তারপর ওরা একে অপরের সন্নিকটে আসতে মায়লির পা কেটে শাড়ি টেনে অর্ধদেহ সমেত লেজ নেড়ে দারুণ সম্বর্ধনা। এত সবে সোমরার ব্যতিক্রম নেই—ব্যাঘাতও ঘটল না। সমর্পিত মায়লি ঝুঁকে সোমরার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলো—নিশ্বাস অনুভব করল নাকে ঠোঁটে এবং নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে রইল সোমরার ঘুমিয়ে থাকা পরমনিশ্চিন্ত শিশুর মতো মুখখানার দিকে। মায়লির ঝুঁকে পড়া মুখ আরো নিচে নেমে এলো। এবং বহু পূর্ব-প্রতিশ্রুত ও নিয়োগ-পরিকল্পিত মায়লির অস্থির স্থূল শরীর যেন বা সোমরার স্ফুট ওষ্ঠে। ও নিজেকে নিজে অনুভব করে এবং সোমরার সমস্ত দেহময় আহা আহারে কথাটা বর্ষণ করে একটা ভিন্ন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করল। তারপর আঁচল দিয়ে সোমরার চোখের পিচুটি ও কপালের ঘাম মুছে দিল।

এখন জোরে হাওয়া দিচ্ছে। অশথ গাছের ঝড়ে পড়া পাতার প্লাবন সমস্ত হাটখোলায় বিস্তৃত হয়ে যখন কোনো কিনারে গিয়ে শান্ত, তখন বড় বড়

ফোঁটায় মাটিতে শব্দ তুলে অঝোরে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ। প্রকৃতি দেখা যায়। ইথারে বৃষ্টির রেখা। মায়লি সোমরার সমস্ত গায়ে আঁচল বিছাল এবং ওর সন্নিকটতর হল। সোমরা চোখ মেলেছে। বৃষ্টি দেখল। উঠে বসে মায়লিকে। নির্বাক নিশ্চুপ নিথর। ওরা কানে বৃষ্টির শব্দ এবং দেহে জলীয় বাতাস নিয়ে আটচালার মাঝে এসে আশ্রয় নিল এবং এই সময় মায়লি সোমরার দেহ আহা আঁকড়ে রেখেছিল। বৃষ্টির ঝাপটায় ওদের চোখে মুখে জলের ফোঁটা। মাঝখানে বসে ওরা নির্বাক হয়ে উভয় উভয়কে কোলে নিতে চাইল এবং সেভাবে বসে বসে একেবারে শিশু হয়ে সোমরা দেখল —বিদ্যুতে দেখল—সমস্ত হাটখোলায় জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। সেই স্রোতে অশথপাতা ঠোঙার কাগজ শিশুদের ভাসিয়ে দেওয়া নৌকার মতো হেলে দুলে চলেছে। কোথায়, ভাবা যায় না। এই দৃশ্যে সোমরার এমন কি অন্ধকার চোখ দিয়ে হাইড্রেণ্টের মতো জল পড়তে লাগল, বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে, বৃষ্টির জলে এবং হাওয়ায় পাতা কাঁপার মতো। সোমরার বুক বৃষ্টিধৌত প্রকৃতির মতো স্তব্ধ ও করুণ, শীতল উষ্ণ জলে ভেজা মায়লিকে স্তনদ্বয়ে অনুভব করে কেবল উচ্চারণ করল : মায়লি।

সোমরাকে মায়লি শরীরের আরও কাছে এনে ওর ঠাণ্ডা হাত নিয়ে নাভির কাছে ছোঁয়াল।

: ইখানে বটে···

সোমরা নরম পাথরের কঠিন মূর্তি।

মায়লি ওর গালে গাল রেখে আবার বলল : তোর ছেলে, তোর ছেলে বটে।

সোমরা পূর্ববৎ অচঞ্চল স্থির।

: মোর উপর আগ—সোমরা—উঃ। মোকে ভালবাসবি না··· ?

নিরুত্তর সোমরা মায়লির ভেজা বুকে মুখ রাখল আর ওর গড়িয়ে পড়া চোখের জল সোমরার ধূসর চুলে শিশিরের মতো নিঃশব্দে পড়তে লাগল।

এখন বৃষ্টি নেই। ওরাও শান্ত। কেবল মাঝে মাঝে বুক কাঁপে।

: সোমরা

: হুঁ

: দেখবি ঠিক তোর মত হবে

সোমরা নিশ্চুপ হয়ে ভাবল—না না, তার মতো নয়, তার মতো নয়। তাছাড়া ওর মতো হতেই পারে না, জানে সোমরা।

: আমি তোর কথা ভেবে ভেবে বাবুদের কাছে চাইব।

না না, তাতেও নয়, কিছুতেই না।

হঠাৎ এই মুহূর্তে হাটখোলায় দৈহিক ও মানসিক বিচরণ ওকে কাঁটাবিদ্ধ করল। ভাগ্যে বৃষ্টি সব ধুয়ে নিয়ে গেছে।

সোমরা মায়লির প্রতিশ্রুত এবং নিয়োগ-পরিকল্পিত শিশুর অবস্থানে হাত রেখে একসময় স্তব্ধ হল এবং মায়লিকে বলল: আমি ইথানকে থাকবনি বটে···।

মায়লি প্রতিবাদবাক্য আওড়াতে গিয়ে সোমরার একচোখ পরিষ্কার দেখতে পেল। তার ফলে সে স্তব্ধ, হতবাক্। সোমরা সমস্ত পৃথিবীর সত্তা নিয়ে উচ্চারণ করল: মায়লি।

মায়লি অনুরূপ উচ্চারণ করল: সোমরা।

তারপর ভোর হবার আগে ওরা চারপায়ে কিছুদূর এবং পরে দুপায়ে যে যার দিকে এগিয়ে চলল। আর তার চিহ্ন সমস্ত হাটখোলার বৃষ্টিধৌত ভূমিচত্বরে স্পষ্ট ফুটে রইল।

নিহিত গভীরে

অসীমকৃষ্ণ দত্ত

মাটির গভীরে বীজ
সেই বীজে আকাশে অশথ,
বুকের গভীরে প্রেম
সেই প্রেমে রুদ্ধ আত্মহননের পথ ;

না হলে কখনো কেউ
এত বিপন্নতা নিয়ে বাঁচে,
না হলে কি বুকের খাঁচায়
খঞ্জন পাখিটা আজো নাচে !

তাই অভিমন্যু হয়ে বাঁচা ;
স্বরচিত কাব্যের নায়ক,
বুকে পিঠে সুলাঞ্ছিত
সংকলিত শব্দের শায়ক ।

অন্য নামে এই প্রেম
ক্ষুধা তৃষ্ণা বাসনা মথিত,
অশথের স্বপ্নবীজ
জীবনের গভীরে প্রোথিত ।

সেদিন ছুটি ছিল

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

অল্প অল্প মেঘ ক'রে বৃষ্টি আসবে, আলো কমে, তাই
কাঁঠাল পাতার নিচে দোয়েল বলেছে, 'চলো যাই'—
'চলো যাই'—কবে যেন শুনেছি কোথায় বহুদূরে
বারান্দা গভীর হয়ে চুল শুকায় দূরের রোদ্দুরে,
কাজ হাতে নেই ব'লে নিরাপদ ছুটির ভিতরে
খণ্ড মেঘে আগুন পোহাই ।

এ-পাড়ায় চুপি চুপি ভিড় জমে, পর্দা ভেজে, ভিজে যায়, আর
ঠাণ্ডা লাগবে ব'লে যেন শরীরে এসেছে অন্ধকার—
অন্ধকার বই হাতে চুপ ক'রে ব'সে আছে –'যাই'—
সমস্ত শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে
তোমাকে বসাই।

চমকানো বাতাস ঘিরে মেঘের প্রান্তে জ্বলে রোদ
ঝলমল পাতার নিচে টুপটাপ টুপটাপ ঝরে
পুরনো শহরে
ছেঁড়াজুতো, ভাঙাখুলি, চাপ চাপ চৌমাথার মোড়ে
জমাট দু-কান দিয়ে গড়ানো রক্তের স্রোতে, ফুলে,
টায়ার পোড়ানো গন্ধে সন্ধ্যায় শ্মশানগুলি খুলে
হাফপ্যান্টে, ওল্টানো আঙুলে
পল্টু আছে, আর কেউ নাই…।

কিছুই সহজলভ্য নয়

প্রফুল্লকুমার দত্ত

কিছুই সহজলভ্য নয়
অনেক অনেক রক্ত ঢেলে দিয়ে ছিঁটেফোঁটা যাকিছু সঞ্চয়
তাও চুষে খাচ্ছে ভ্রমরেরা
এ-জীবন হতো যদি কাঁটাতারে ঘেরা
তাহলে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে
দেওয়া বা নেওয়ার পালাকীর্তনের ঘাম
দুঃসহ হতো না—আমি আরো ফুল ফোটাতে পারতাম
রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধবিহীন সংসারে
আমার জীবনে তবু সমস্ত কিছুই মূল্যবান
সমস্ত শাখায় রক্তঘ্রাণ
সুতরাং ফুল কিংবা নারীর হৃদয়
কিছুই সহজলভ্য নয়।

দুর্বিনীত দিন এখন এখানে

সমীর দাশগুপ্ত

দুর্বিনীত দিন এখন এখানে—
পাতার ছায়ায় প্রত্ন মুখের নিবিড়ে
ভালোবাসা সাপের দু-চোখ বহে আনে
অন্ধকার অরণ্য শরীরে।

বিশ কোটি প্রজাপতি এখন ঘুমায় না আর পাহাড়ের নাভির পাতালে
মরুভূমি পাথার আলো বাতাসের সরোবরে ফেলে
অবশিষ্ট দেয়ালের নোনা ধরা এখানে ওখানে
সূর্যসাক্ষী মানে দেখছি শুধু দুই শুঁড়ি ও মাতালে
পদ্মের পরাগে রাত্রে অনেক লম্পট পাশা খেলে।

তৃণাদপি প্রার্থনার শীতল বাগানে
আমার চাবুকে তুমি উজ্জ্বল প্রহার পাবে কিনা
এ প্রশ্ন সংবাদ, প্রিয়া, প্রতিশ্রুত ঘৃণা।

মানুষ ১৯৬৯

বিনোদ বেরা

১.

আমি ফুল পাখি তারা নদীটির চেয়ে বেশি চক্ষুষ্মান এই অভিমানে
দূরে সরে এসে ধীরে গড়েছি এ নিজস্ব নগর,
ব্যক্তিগত দেশ রাষ্ট্র রীতি নীতি নিয়ম বন্ধন
নির্মাণে সকল শক্তি—মনোযোগ নিয়োগ করেছি;
ধ্যান ও ধারণাগুলি স্বপ্ন ও বাসনাগুলি পরিশ্রুত বিবর্তিত হয়ে
নতুন আকার আর আয়তন লাভ ক'রে ভিন্ন ভাষায় কথা বলে,

বিচ্ছেদ যখন হিম দুর্নিরীক্ষ দূরত্বে পৌঁছল
তখন গেলাম ভুলে ফুলের রঙিন ভাষাগুলি
তখন গেলাম ভুলে পাখিটির তারাটির নদীটির গাঢ়
সুনিশ্চিত মনোভাব প্রকাশক সংগীত কবিতাগুলি আমি।

২.

স্বাভাবিক সবুজকে দাঁতে কাটি নখে টুকরো করি
সূচনায় শেষ করি অমল ধবল সম্ভাবনা—
যা কিছু সহজলভ্য তাও হয় দূরপরাহত
ফলে ভারসাম্য নষ্ট, টলমল, তীব্র দ্বন্দ্বমান
এক মুঠো সমতল চরাচরে নেই, ফলে ভীষণ পর্বত
মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে অনন্ত উপকরণ-বহুল জীবনে ;
অতিরিক্ত জ্ঞানগর্বে কখনো বা, কখনো অজ্ঞানে
পা পিছলে পড়ে যাই অন্ধকার খাদের পাতালে—
তুমুল তমসা ছিঁড়ে জ্বলে ওঠে ব্যক্তিগত চিতা।

এখন মনটাকে শুদ্ধ রাখাই ভালো

দিলীপ সরকার

"তোমরা যা বলো তাই বলো"
মনটাকে এখন শুদ্ধ রাখাই ভালো।
মনের মধ্যে একতাল সবুজ প্রাণের বাসনা নিয়ে
যখন তুমি তীর্থের পথে পা দিয়েছ
তখন, মনটাকে শুদ্ধ রাখাই ভালো।

এখন, অযথা কোলাহল করে শুচিতা নষ্ট করো না
কেননা, তোমার মন কলুষিত হতে পারে
তুমি ভুল করতে পারো।

ঘুমের মধ্যে

স্বপ্ন যেমন আমাদের হাত ধরে
অন্য এক স্বপ্নের ভিতরে নিয়ে যায়

তোমার ভুল

তেমনি করেই আমাকে অন্য এক ভুলের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে
এমনকি, পথভুলে আমরা সবাই অতলেও তলিয়ে যেতে পারি।

তুমি তো আর পাঁজি দেখে দেখে
সঙ্গে শুকনো বেলপাতা নিয়ে
দুগ্‌গা দুগ্‌গা ব'লে রওনা হওনি
তোমার এ-তীর্থের ধরণধারণই আলাদা।

পাঁজি-টাঁজিতে তোমার ঠিক বিশ্বাস নেই ব'লে
চোখের ভাষা প'ড়ে প'ড়ে
তুমি যাত্রার দিন ঠিক করেছ

কেননা, তুমি দেখেছ
দয়ার জন্য হাত পেতে পেতে
যারা এতদিন বসে ছিল

হাতগুলো মুঠি করে

এবার তাদের উঠে দাঁড়াবার দিন।

তাইতো তুমি হাতের নিশানকে করেছ ধ্রুবতারা
তাইতো তুমি
মনের মধ্যে একতাল সবুজ প্রাণের বাসনা নিয়ে
মাভৈঃ ডাক দিয়ে পথে নেমেছ
সুতরাং, তোমার এ-তীর্থের ধরণধারণই আলাদা
এখন মনটাকে শুদ্ধ রাখাই ভালো।

শত্রুরা অদৃশ্য

সমীর চৌধুরী

দরজাটা খুলে ঘরে পা দিয়েই আমি পাথর! চকিতে ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলুম। মাত্র কদিন বন্ধ ছিল, তার মধ্যেই সব উল্টেপাল্টে আর ভেঙেচুরে বিপর্যস্ত। আসবাবগুলোয় হাত ছোঁয়ানো যায় না—গায়ে বল্মীকের স্তূপ। উইপোকারা মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে আসবাবগুলো প্রায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। বিছানায় তুলোর রাশ; ইঁদুরে কেটেকুটে তছনচ করেছে। পাশে টেবিল, টেবিল থেকে আমার অমন শখ করে কেনা দামী ফুলদানিটা মেঝেতে আছড়ে পড়ে চৌচির। নির্ঘাৎ সেই নচ্ছার কালো বেড়ালটার কীর্তি! শেল্‌ফে বইগুলো না খুলে দেখলেও বোঝা যায় প্রতিটি পাতায় পোকার রাজত্ব, দিব্যি মৌরসীপাট্টা গেড়ে মনের সুখে কুরে কুরে খাচ্ছে! ডানদিকে আলমারিটা খুলে ধরতেই হাজার হাজার আরশোলা যে যেদিকে পারল দে ছুট। হায় হায়—দাদামশাইর আমলের অমন নক্সাকাটা দামী কাশ্মিরী শালটা ইঁদুরের হাতে পড়ে একেবারে দফারফা? চেয়ারের বেতগুলোও ফাটা। বলতে হবে না এও সেই ধড়িবাজ ইঁদুরেরই কীর্তি! ডানপাশে খাট, গদিটা তুলে ধরে সরেজমিন তদন্তে নামলুম, দেখি ছারপোকার সুসজ্জিত বাহিনী কুচকাওয়াজে মোতায়েন। কিন্তু হাত ছোঁয়াতেই সব ভোঁ ভোঁ। খাটের ফাঁকে ফাঁকে পলক না ফেলতেই উধাও। বিজলিবাতির শেডে, ঘরের আনাচে কানাচে ছেয়ে রয়েছে মাকড়সার জাল। সারা ঘরটায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে চামচিকের একটা আঁশটে গন্ধ।

ডানদিকের জানলাটার একটা পাট খোলা। বুকটা ধ্বক করে উঠল, চকিতে বাঁদিকের দেয়ালে চাইলাম।

যা ভেবেছিলাম তাই। দজ্জাল ঝড়ের দাপটে আমার মায়ের ছবিটা পড়তে পড়তেও কোনোরকমে কাৎ হয়ে ঝুলে রয়েছে। কাঁচের ওপর ধুলোর আস্তর জমে জমে ছবিটা ঝাপসা, মাকে আমার চেনাই যায় না।

শত্রুরা সবাই রয়েছে। এই ঘরের মধ্যেই। তবে আপাতত প্রায় সকলেই অদৃশ্য।

ওকে তোরা

পিনাকেশ সরকার

ওকে বেঁধে রেখেছিস খোলা রাজপথে খুব শক্ত গিঁটে
　　　　　　ল্যাম্পপোস্টগোড়ায়
ওকে লাল হাতে ধরে ফেলেছিস, মুহূর্তশিকারী, তোর
　　　　　　শ্যেনচোখে অনন্ত ভিড়ে
ওর পেছনে সামনে রোদ কড়াতাপে গলা পিচ
　　　　　　শাণিত শব্দচ্ছটা—
বেদম আঘাতে ওর ভ্রান্ত চোয়ালে
　　　　　　জমেছে ঈশ্বর পাথুরিয়া
তোরা একবারও লক্ষ্য করিস নি।

　　　　শেষে যদি
　তোদের নেতৃত্ব ভেঙে ক্ষুদ্র মশার মতন
　ঝোপঝাড় গৃহকোণ শব্দ করে
　　　　　এড়িয়ে এড়িয়ে
　　　　　　চরিত্র বদল ক'রে
　উড়ে যায় পাগল আকাশে
　　　　তবে
তোরা কোন নতুন শিকল হাতে
　　　　　　ছুটে যাবি সদরে অন্দরে?

রক্তস্নাত সীমান্ত ডিঙাই

দুলাল ঘোষ

দুফোঁটা বৃষ্টির পূব কিংবা পশ্চিমী ছাঁটে
মাঝে মধ্যেই অবস্থান বদল হয়
ভুল করে বসি—অতন্দ্র প্রহরীর বীভৎস উল্লাস
সকাল-সন্ধ্যায়
শিয়ালদা-গোয়ালন্দ এখনও ঘুরে আসি
পায়ে পায়ে রক্তস্নাত সীমান্ত ডিঙাই।
এখনও একবুক বেতস গন্ধে
আশৈশব অবসাদ ভুল করে বসি
উদাসী বাউলের পায়ে পায়ে ভাঙি অবসন্ন
সকাল-সন্ধ্যায়
অবস্থান বদল করে ঘুরে আসি
মাঝে মধ্যেই রক্তস্নাত সীমান্ত ডিঙাই।

জন্মের ঘোষণা

অমৃত প্রীতম

আতনু রোমাঞ্চে, শয্যাতলে উঠে বসলেন জননী। চাদরের আস্তীর্ণ কুঞ্চনগুলি সমান করলেন আর লজ্জায় রক্তিম তিনি রাঙা দোপাট্টায় ঢেকে নিলেন নগ্ন কাঁধ। পাশে তাঁর ঘুমন্ত পুরুষ। তাঁর দিকে অপাঙ্গে চাইলেন। ত্রস্ত হাতে বিছানার শাদা আবরণী চাপড়ে টান করে তুলতে তুলতে জননী বলছেন তাঁর স্বপ্নের কাহিনী—

মনে আছে? সেই যে মাঘ মাসে—পিছলে পড়লাম নদীতে? কী কনকনে ঠাণ্ডা দিন, অথচ নদীর জল কেমন গরম। বুদ্ধিতে কী ব্যাখ্যা ছিল তার! যখনি ছুঁয়েছি জল, এ-কী জল বদলে হলো দুধ! ভোজবাজি না ভানুমতী খেল্? আমি নাইলাম সে দুধে। তালবন্দী গ্রামের কাছাকাছি তবে সত্যি কি তেমন নদী আছে? নাকি, সবই কপোলকল্পনা, সব আমারই স্বপ্নের ঘোর? সে নদীর তরঙ্গচূড়ায় চাঁদ ভেসে এলো। আমার দু-হাতে বেঁধে অঞ্জলি সে চাঁদ তুলে নিই, পান করি আকণ্ঠ। আ, জল ধেয়ে বহে গেল আমার ধমনীশিরা হয়ে, চাঁদ প্রবেশ করলেন গর্ভে দ্রুত।

ফাল্গুন মাসের জলপাত্রে আমি রামধনুর সাতরঙ মিশিয়ে নিলাম। আমি কাউকে বলিনি, (ছিল আমারই মনের মধ্যে গুঞ্জরিত)। আমার, আমারই মধ্যে স্পন্দিত হবে সে উষ্ণ-জীবনরোমাঞ্চে, পাখি আমারই ভেতরে বাঁধল বাসা। কোন প্রার্থনায় আমি উচ্চারণ করি শব্দ? কোন ব্রত ধারণ করেছি? মা যে হতে চায়, সেকি এমনি করে ঈশ্বরের উদ্ভাস নিজের মধ্যে পায়?

অন্তঃসত্তা রমণীর প্রথম প্রথম বুকে মোচড়ায় আকাঙ্ক্ষা, আর অস্থির আনচান দেহ, হৃদপিণ্ড ঢিবঢিব। আমি এসব কাদের মধ্যে মিশাচ্ছি, মিশাই। মন্থন-দণ্ডের সামনে বসে ভাবছি, কি-করে মন্থনে দুধ মাখন ভাসিয়ে তোলে। মন্থনকুম্ভের মধ্যে হাত ডোবাই, সূর্যের সোনায় ডাল সে মাখনে জমিয়ে তুলছি। ভাবছি,

আমাদের দু-জনকে কী মেলায় এমন সাযুজ্যে ? কোন নিয়তি বাঁধল আমাদের একই সূত্র গ্রন্থনায় ? চৈত্র মাস জুড়ে আমি এমনিতর স্বপ্নঘোরে রই।

আমি আর আমার গর্ভের মাঝ বরাবর ব্যাদিত হাঁ-মুখে মহাশূন্য। পায়ে-পায়ে চলেছে আমার আত্মা। আমার বুকের মধ্যে দ্রুত হৃদস্পন্দন। বৈশাখ মাসে ফসল গোলায় উঠছে। সে কেমন গম তবে আমার গোলায় তুলব ? আমি চালুনির মধ্যে রাখি, দানা থেকে কুঁড়ো ঝরে গেলে, আমার থালায় ভরে উঠছে তারা-নক্ষত্র ঝিকমিক।

জ্যৈষ্ঠ মাস সন্ধ্যাবেলা। আলোছায়া গোধূলিতে শুনলাম আশ্চর্য ধ্বনি। সে কিসের স্বর ! দশদিগন্ত সপ্তসিন্ধু ছাপিয়ে উঠছে এক সুরের প্লাবন। সে কি মায়া—মায়ার কল্পনা ? নাকি সে আমারই ভুল ? না কী সে সৃষ্টির কাজে ঈশ্বরের অন্যমনে গুঞ্জনের সপ্তস্বর ? ধূপের সুগন্ধে ভরে গেল হাওয়া। সে কি আমারই আপন নাভিমূল থেকে উচ্ছ্বসিত সুবাস। ভীত আমি, ত্রস্ত আমি, অপার্থিব সে সুরের পিছুপিছু বনেবনে ঘুরলাম। সে সুরে অন্য অর্থ আছে নাকি ? সেই সুর, এ-স্বপ্নের কতখানি অর্থ আছে আমার জীবনে ? আছে অন্য সকলের জন্যে ? আমি যেন বাণবিদ্ধ আহত হরিণী, আমার গর্ভের পরে কান পেতে শব্দ ধরতে চাই।

এবং আষাঢ় মাসে জননী ফুলের পাপড়ি খুলে ধরা শান্ত প্রস্ফুটনে চোখ মেললেন, যেনবা ধীরে দিবসের ঊষা উন্মীলন। "আমার জীবনে নদীধারাগুলি বহে যায় সেই জলধারা সম্মোহনে। স্বপ্ন দেখলাম, এক রাজহংস হাল্কা ডানা মেলে সেই নদী থেকে উঠে উড়ে যায়। ঘুম ভাঙলে আমার গর্ভের মধ্যে শুনছি তার ডানায় সাঁই-সাঁই বিধুনন।

আমার নিকটে কাউকে দেখছিনা, মাথার উপরে কোনো গাছ নেই। তবু কে আমার কোলের উপরে রাখলো এমন নারকেল ? খোলা ভাঙলুম ; লোকজন আসছে সে কচি নারকেলের শাঁস মিষ্টিজল প্রত্যাশায়। জলপাত্রের মধ্যে ঢাললুম কিছুটা জল। মানলাম না আচার-নিয়ম। বলিনা হিং টিং ছট যাদুমন্ত্র। না, পড়িনা মন্ত্র আমি, শয়তান তাড়ানো কোনো তুকতাক, কিছুটি নয়। তবু বলে

দলে লোক জমছে আমারই দরজায়। সবাইকে আমি এক টুকরো দিচ্ছি তবু, রয়ে গেল ঢের। এ কোন জাতের নারকেল? আবোল তাবোল স্বপ্ন দেখছি। আর সে স্বপ্নের সুতো উড়ে যাচ্ছে চিরকালের বিস্তারে।

শাওন গহন ঘন! বক্ষ চেপে ধরি। নারকেল দুধের মতো এ-কি নামছে স্তন চুঁয়ে। অলৌকিক কী-এমন নতুন রহস্য নিয়ে কেবল আমারই জন্যে দাঁড়ায়ে রেখেছে রে শ্রাবণ? দিনগুলি চলে গেল অবিশ্বাস্য অলোক রহস্যে দ্রুত, যে শিশু আমার মধ্যে, বুনে দেবে কে তার আঙিয়া? সারারাত ঝুড়ির ভেতরে গুটি, আমি বুনছি রাত্রির প্রহর। সুতোগুলি জ্বলে ওঠে জ্যোতির্ময় রেখায় রেখায়।

তারপর ভাদ্র এলো। জাগর, যন্ত্রণাদিগ্ধ, আ আনন্দময়। "হে আমার অন্তর্যামী। কার জন্যে বুনছ তুমি ভালোবাসা, সুতোয়। আকাশ খুলে ধরছে তার স্বচ্ছ লূতাতন্তুপ্রম টানা, সূর্যদেহে মাকু নড়ছে সোনালী পড়েনে। এরই নাম মহাসত্য। কেমন করে সে সত্য বুনে তোলে শিশুরও আঙিয়া!" প্রণাম জানাই নিজ গর্ভকে। এবং বুঝতে পারছি আমি স্বপ্নের রহস্যময় মানে।

"এ শিশু তোমার নয়, অন্য কারো নয়। এ শিশু শাশ্বত কাল ব্যেপে যোগী, স্বেচ্ছায় এলেন তিনি এই পথে, এক পলক দাঁড়ালেন আমার গর্ভের মধ্যে পবিত্র আগুনে হাত তপ্ত করে নিতে।"

আশ্বিন এসেছে নিয়ে বিশ্বাসের পূর্ণতা আমার। এক জীবনের অর্থ চরিতার্থ করে এই আমারই ভিতরে সেই জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি জ্বলে উঠছে দাউদাউ দাউদাউ। আমার শরীর যেন অগ্নিস্পর্শে দপ্‌ জ্বলছে মশাল। ওগো কেউ! ধাই ডাকো। আমাকে করলেন ভর পুরাতনী জননী পৃথিবী।
আমিও প্রস্তুত জন্ম দিতে।

অনুবাদ: তরুণ সান্যাল

মানবতাবাদী কবি-দার্শনিক গুরু নানকের পঞ্চম জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কবিতাটি প্রকাশ করা হল। —সম্পাদক

অবশেষে লেনিন পথ দেখালেন

প্রমথ ভৌমিক

১৯২২-২৩ সালের কথা। চৌরিচৌরার হাঙ্গামার পর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছে। উকিলবাবুরা আবার কোর্টে যেতে শুরু করেছেন। অন্যেরাও প্রায় সবাই ঘরে ফিরে গিয়েছেন। কংগ্রেস-অফিসগুলো সব খাঁখাঁ করছে। শুধু আমরা দু-চারজন মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো যুবক সেগুলো পাহারা দিচ্ছি। কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। ঘরে ফিরব না সেটা একরকম ঠিকই আছে, কিন্তু এগুব কোন পথে? পথ খুঁজে পাচ্ছি না। অনেকটা দিশেহারা অবস্থা আমাদের অনেকেরই।

এর আগের কথা একটু বলা দরকার। আমরা ছিলাম বিপ্লবী অনুশীলন দলের সভ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে নেতারা সব গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় মূল দলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমরা একটা বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র গ্রুপ হিসেবেই বেড়ে উঠতে থাকি। এই সময়ে প্রায়ই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখতাম, বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার আহ্বান করছেন—"অমর ফিরে এসো," "সতীশ ফিরে এসো," "অতুল ফিরে এসো"···ইত্যাদি। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রভৃতি তখন রাজানুগ্রহে (রয়্যাল ক্লেমেন্সি) মুক্ত হয়ে আন্দামান থেকে ফিরে এসেছেন। ওঁরা তখন আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের ফিরে আসতে বলছেন। সেই থেকে ঐ আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের নাম মনে গাঁথা হয়ে রইল।

তারপর ১৯২১ সালে যখন সারা দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের বান ডাকল, আমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বা, ভেসে গেলাম বলাই ভালো। অহিংস অসহযোগের অহিংসার দিকটার প্রতি যে আমাদের বিশ্বাস ছিল, তা নয়; তবুও দেশজোড়া এতবড় স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকার কথায় মন সায় দিল না। যদিও এ-সময়ে দেখতাম বারীন্দ্রকুমার অসহযোগের বিরুদ্ধে প্রায়ই কাগজে প্রবন্ধ লিখছেন। বারীন্দ্রকুমার সম্বন্ধে আমাদের প্রচণ্ড মোহ সত্ত্বেও তাঁর এই কাজ আমাদের মোটেই ভালো লাগেনি।

তারপর হঠাৎ ফেঁপে ফুলে ওঠা অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটা পড়ল। গান্ধীজী গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে বললেন। আমাদের মনে তা

কোনো সাড়াই জাগাতে পারল না। আমরা তবুও কিছুকাল কিসের যেন প্রত্যাশায় বসে বসে কংগ্রেস-অফিস পাহারা দিতে লাগলাম।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন এক কংগ্রেস-অফিসে সেই আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের একজন—সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা। আমার কাছে তিনি ছিলেন এক রহস্যময় পুরুষ। কিছুদিন তাঁর পিছনে ঘুরলাম। একদিন তাঁর কাছে খোলাখুলি প্রশ্ন করে বসলাম—আপনাদের যুগান্তর আর অনুশীলনে এতো ঝগড়া কেন? আপনাদের দু-দলেরই তো লক্ষ্য এক, কর্মপন্থাও মোটামুটি এক—তবুও কেন আপনারা মিলতে পারেন না। কোনো সদুত্তর পেলাম না। বললেন, ও তোমরা বুঝবে না। অনেক কারণ আছে। ওদের (মানে অনুশীলনকে—সতীশদা ছিলেন যুগান্তরের একজন নেতা) বিশ্বাস করা যায় না। আমার নেশা কেটে গেল। ওঁর পিছনে ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা তুলনা মনে আসছে। না বলে পারছি না—পাঠকেরা ক্ষমা করবেন। আজই (২৫।৯।৬৯) সংবাদপত্রে দেখলাম, প্রমোদ দাশগুপ্ত বলছেন, সি. পি. আই-এর সঙ্গে আলোচনায় লাভ নেই, ওরা হামেশাই মিথ্যেকথা বলে, ওরা ডিসঅনেস্ট ইত্যাদি। আমার সতীশদার কথা মনে পড়ল। সেই একই সংকীর্ণ মনোভাব, সেই একই দলাদলির বিষাক্ত পঙ্ককুণ্ডের বুদ্বুদ নয় কি!

সে যাই হোক, পুরানো কথায় ফিরে আসা যাক। আমরা তখন বিভ্রান্ত, পথহারা—কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। হাতড়ে বেড়াচ্ছি। এমন সময়ে হাতে পড়ল—এম. এন. রায়ের পুস্তিকা—'পলিটিক্যাল লেটারস' 'আফটার মাথ অব নন-কো-অপারেশন' প্রভৃতি কয়েকটা বই। গোগ্রাসে গিলে ফেললাম। কতটা বুঝলাম ঠিক মনে নেই, তবে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলাম। ইচ্ছে হলো আরো জানবার। গোপন সূত্র থেকে দু-এক কপি 'দি ভ্যানগার্ড' এবং 'দি ম্যাসেস' পত্রিকা পেলাম। পড়ে যে খুব কিছু বুঝলাম, তা বলতে পারি না। শুধু মনে আছে সেই প্রথম জানলাম—কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল বলে একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংঘ আছে এবং তাঁরা ভারতবর্ষেও একটা বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে চায়।

আমাদের মানসিক গঠনটা ছিল অনেকটা রোম্যান্টিক ধরনের। গোপন ও রহস্যজনক সবকিছুর উপর ছিল একটা সহজাত আকর্ষণ। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে খোঁজখবর শুরু করলাম। আমাদের থেকে যাঁরা এ-সম্বন্ধে

বেশি জানেন বলে মনে করতাম, এমন দু-একজনের সঙ্গে আলোচনায় ব্যাপারটা আরো ঘোরাল এবং জটিল হয়ে গেল। সহজ ব্যাপারকে ভয়ঙ্কর জটিল করে তোলায় এঁদের বেশ স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। সোসিও-ইকনমিকো-পলিটিকো—ইত্যাদি জটিল তত্ত্বের ও শব্দের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে এঁরা সব কিছু গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে দিলেন। ধুত্তোর বলে এঁদের পিছনে ঘোরা ছেড়ে দিলাম।

আমার কাছে এবং আমার মতো সে-যুগের বিপ্লবীদের আরো অনেকের কাছে তখন প্রশ্ন ছিল মাত্র একটা। ভারতবর্ষ কি করে স্বাধীন হবে? কোন পথে এবং কি উপায়ে? সমাজ যে শ্রেণীবিভক্ত আর শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারাই ইতিহাস গড়ে উঠেছে এবং নির্ণীত হচ্ছে—এসব তত্ত্ব গ্রহণ করতে আমাদের কোনো অসুবিধাই হতো না। কিন্তু এই শ্রেণীসংগ্রামের রাস্তায় কি করে দেশ স্বাধীন করা যাবে—তার কোনো পরিষ্কার হদিশই তাঁরা আমাদের দিতে পারেননি।

রুশ দেশে যে ঠিক কি হয়েছে, তার কোনো পরিষ্কার ধারণা আমাদের ১৯২৫-২৬ সাল পর্যন্ত ছিল না। শুধু শুনেছিলাম সেখানে জারতন্ত্র উচ্ছেদ করে বিপ্লব হয়েছে এবং সে-বিপ্লবের নেতা লেনিন ও ট্রটস্কি। স্টালিনের নাম তখনো এদেশে তেমন প্রচারিত হয়নি। ইংরেজের সেন্সরশিপের কঠোর ব্যবস্থা ভেদ করে রুশ বিপ্লবের আসল কাহিনী এখানে প্রচারিত হতে পারেনি। সোভিয়েতের চারদিক ঘিরে আয়রন কার্টেনের কথা না শুনেছেন এমন লোক ইংলণ্ড আমেরিকা বা ভারতে খুব কমই আছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সেন্সরব্যবস্থা যে কত শক্ত, তা এদেশের দিকে তাকালে বেশ বোঝা যেত। অন্যদিকে আবার অপপ্রচারেরও অন্ত ছিল না। এদেশের কাগজে-পত্রে বলশেভিকদের এক-প্রকার নররাক্ষস হিসেবে চিত্রিত করা হতো। ওরা ধর্ম মানে না, ওদের কাছে নারীর সতীত্বের কোনো মর্যাদা নেই। মসজিদ, গির্জা সব ওরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন প্রচারও শুনেছি যে বলশেভিকরা নাকি মানুষের মাংসও খায়।

অপপ্রচার যে কতদূর পৌঁছেছিল, তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়। তখন ১৯৪৪ বা ৪৫ সাল। কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম উপলক্ষে এক গ্রামে গিয়েছি। যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি, সে বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করে। বাড়ির দিদিমাও তাঁর নাতি-নাতনীদের সঙ্গে পার্টির সমর্থক। ঐ গ্রামে তখন গাঁয়ের গরীবদের জন্য একটা রিলিফ সেন্টার খোলা হয়েছে। সেখান থেকে রান্নাকরা খাবার পরিবেশন করা হতো। দিদিমা

এইসব কাজের তদারক করতেন। দিদিমা হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেসা করলেন, আচ্ছা! রুশ দেশের সেই বলশেভিকরা কোথায় গেল—সেই যারা মানুষ ধরে খেত, তাদের কথা আর শুনি না কেন? সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচার যে কতদূর পৌঁছে গিয়েছিল—এই বৃদ্ধাই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উনি তাঁর যৌবনকালে বাঙলা খবরের কাগজ থেকে সংবাদটা সংগ্রহ করেছিলেন। 'বলশেভিক ষড়যন্ত্র' 'নিহিলিস্ট রহস্য' প্রভৃতি রোমাঞ্চকর গল্পের বইয়ের খুব প্রচার ছিল বিশের দশকের প্রথমার্ধে। কি অপপ্রচারই যে তখন প্রচলিত ছিল—তা আজকের কলিযুগের তরুণদের ধারণার অতীত!

আমি যদিও খুব অনিসন্ধিৎসু পাঠক ছিলাম, তবুও ১৯২৪-২৫ সাল পর্যন্ত রুশ বিপ্লব বা কমিউনিস্ট মতবাদের একটা মোটামুটি ধারণাও সংগ্রহ করতে পারিনি। যদিও রুশ বিপ্লব হয়ে গেছে ১৯১৭ সালে, তবুও হিমালয় ডিঙিয়ে তার হাওয়া ভারতে খুব সামান্যই প্রবেশ করেছে। রুশিয়ার নিহিলিস্টদের সম্বন্ধেই আমাদের আগ্রহ ছিল বেশি। শুনেছিলাম তারা খুব ভালো বোমা বানায় এবং তাদের কাছ থেকে ঐ বোমা বানানোটা শেখাতেই আমাদের ঝোঁক ছিল সর্বাধিক। শুনেছিলাম—প্রথম যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে হেমচন্দ্র কানুনগো ওদের কাছ থেকে বোমা শেখার জন্য প্যারিসে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে সেন্সরের বেড়া ডিঙিয়ে দু-চারখানা বই আমাদের হাতে এসে পড়ে। ১৯২২ সালে প্রথম পাই—ট্রটস্কির লেখা—'ইন ডিফেন্স অব টেররিজম'। পড়ে কিছুই বুঝলাম না। এইটুকুই শুধু জানলাম কাউটস্কী নামক এক ভদ্রলোক বলশেভিকদের 'টেররিস্ট' বা সন্ত্রাসবাদী বলে গালি দিয়েছেন, তারই উত্তর দিচ্ছেন ট্রটস্কি সশস্ত্র অভিযান সমর্থন করে। এর পর পোস্টগেট-এর 'রেভোলিউশনারী বায়োগ্রাফিজ' এবং 'নিউ রাশিয়া' নামে একটা পুস্তিকা পেলাম। 'রেভোলিউশনারী বায়োগ্রাফিজ'-এ 'লুই ব্লাঙ্ক' নামক একজন বিপ্লবীর চরিত্র ছিল। তাঁর প্রতি বেশ আকৃষ্ট হলাম। কিন্তু 'নিউ রাশিয়া'তে 'ওয়ার্কাস পেজান্টস অ্যাণ্ড সোলজার্স ডেপুটিজ' বলে কাদের কথা বলা হয়েছে ঠিক বুঝলাম না। আমরা গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ হয়েছিলাম। কল-কারখানার সঙ্গে খুব একটা পরিচয় ছিল না এবং মজুরদেরই যে ওয়ার্কার বলে তা তখনো জানতাম না। এমনি ছিল আমাদের জ্ঞানের দৈন্য।

তবুও অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলাম। এইটুকু বুঝেছিলাম, কমিউনিজম নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণীর মুক্তি

চায়, চায় তাদের উপর শোষণ ও পীড়নের অবসান ঘটাতে। আরো জেনেছিলাম, কমিউনিজম সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর শত্রু, এবং বিপ্লবী রুশিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষে। এই খবরটুকুই কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এই সময়ে আরো কতকগুলে ঘটনা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার একটু করে খবর নজরে পড়ল। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার খবরও কানে এলো। কলকাতায় লেবার-স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'লাঙ্গল' সাপ্তাহিকের আবির্ভাব আমাদের নজর এড়ায়নি। পরে যখন পেজাণ্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হওয়ার খবর শুনলাম, তখন বুঝলাম এর সঙ্গে কমিউনিজমের যোগাযোগ আছে। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এই পার্টির নামই পরে ওয়াকার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টি হয়। এই পরিবর্তনের রহস্য তখন বুঝতে পারিনি।

১৯২৫-২৬ সালে কলকাতায় হঠাৎ মস্কো প্রত্যাগত কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বোধহয় প্রথম দেখা হলো ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। সে প্রায় একটা আবিষ্কার। বিডন স্ট্রীটের এক বাড়িতে স্বামী অভেদানন্দের জন্মতিথিতে এক ভোজসভায় বসে খাচ্ছিলাম। হঠাৎ স্বামিজী ঘরে ঢুকে বললেন, "কিহে ভূপেন, ১৬ বছর বিদেশে কাটিয়ে এখন দিশী খানা কেমন লাগছে ?" তাকিয়ে দেখলাম আমার ঠিক পিছনেই বসে ডঃ দত্ত। আগেই তাঁর সম্বন্ধে মোটামুটি সব জানতাম। তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়' তখন কোনো-এক মাসিক পত্রে ধারাবাহিক বেরুচ্ছে। সাগ্রহে তা পড়তাম। তিনি যে কবে দেশে ফিরেছেন, তা ঠিক জানতাম না। কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে ডঃ দত্তের সঙ্গে পরিচিত হলাম। সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করতাম। তাঁর কাছ থেকেই প্রথম সোস্যালিজম ও মার্কসবাদের একটা মোটামুটি ধারণা পেলাম। ডঃ দত্তের কাছে আমার আধ্যাত্মিক মানসিক ঋণ অপরিশোধ্য। ডঃ দত্তের সংস্পর্শে এসে আমার এবং তৎকালের আরো অনেক তরুণ বিপ্লবীর মানসিক ও ভাবাদর্শগত পরিবর্তন ঘটেছে।

এরই কাছাকাছি সময়ে দেখা হলো শিবনাথ ব্যানার্জি এবং গোপেনদা অর্থাৎ গোপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে। গোপেনদা এর আগে ছিলেন বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সভ্য। গোপেনদা এবং ধরণী গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন বাঙলা দেশের

বিপ্লবী দল থেকে সর্বপ্রথম কমিউনিজমের দিকে চলে আসেন। অনুশীলনের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে গোপেনদা গোপনে জাহাজীর ছদ্মবেশে মস্কো যান। সেখানে 'ইউনিভার্সিটি অব দি টয়লার্স অব দি ইস্ট'-এ শিক্ষা গ্রহণ করে সেই সবে দেশে ফিরেছেন। গোপেনদার অমায়িক ব্যবহারে তাঁর অনুরাগী না হয়ে পারা যায় না। তাঁরই মাধ্যমে আমার ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ওই ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টির এক বৈঠকে পরে নলিনী গুপ্তকে দেখি। এর অল্প পরেই তিনি আবার গোপনে মস্কো চলে যান। ঠিক এরই পরে আইনসঙ্গত পাসপোর্ট নিয়ে মস্কো রওনা হন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তখন কমিউনিস্ট ছিলেন।

শিবনাথ ব্যানার্জি অবশ্য কমিউনিস্ট ছিলেন না এবং সেকথা তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন। ঠিক কি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কমিউনিস্টদের মতবিরোধ তা তিনি বললেও তখন ভালো করে বুঝিনি। শিবনাথ ব্যানার্জিও মস্কোর 'ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি'তে পড়ে এসেছিলেন।

আবেগের দিক থেকে কমিউনিজম গ্রহণ করলেও ঠিক যাকে কমিউনিস্ট হওয়া বলে তা তখনো হতে পারিনি। যে বিপ্লবী চক্রের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ছিল, তা তখনো ছাড়তে পারিনি। ছাড়তে পারিনি শুধু নয়, তার সংগঠন নিয়েই প্রধানত মেতে ছিলাম। গোপন বিপ্লবী চক্রের মোহ ত্যাগ করা কত কঠিন তা ভুক্তভোগী যাঁরা তাঁরা অনেকেই হয়তো অনুভব করে থাকবেন।

সে যুগের বিপ্লবীরা অধিকাংশই ছিলেন আবেগপ্রধান মানুষ। ইংরেজ তাড়িয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে দেশ স্বাধীন করতে হবে, এর বেশি আর কিছু তাঁরা অনেকেই ভাবেননি। বিপ্লবটা কেমন করে হবে, কাদের নিয়ে হবে, অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে, বিপ্লব করতে পারলে গবর্নমেণ্টই বা কাদের নিয়ে হবে, কি হবে তার রূপ, এত কথা আমরা অনেকেই ভাবিনি। শুধু এই কথাই শিখেছিলাম, দেশের জন্য দুঃখবরণ করতে হবে, দরকার হলে ফাঁসিকাঠে চড়তে হবে—এই অনুভূতিতেই বুঁদ হয়ে থাকতাম। কমিউনিস্ট মতবাদের সংস্পর্শে এসে তখন একটু একটু করে বাস্তব চেতনার জাগরণ হচ্ছে বটে, কিন্তু মনের কুয়াশা তখনো কাটেনি। তখনো অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ানো শেষ হয়নি। কমিউনিস্ট মতবাদের সুস্পষ্ট আলো মনের অন্ধকার তখনো ঘোচাতে পারেনি। তার আরো একটা কারণ ছিল। সে-যুগের মার্কামারা কমিউনিস্টদের উন্নাসিক ভাব, আমাদের তাঁদের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। তাঁরা সব সময়ই পেটিবুর্জোয়া বলে আমাদের

দূরে সরিয়ে রাখতেন। অথচ তাঁরাও যে সকলেই বিশুদ্ধ প্রলেটেরিয়েট বংশোদ্ভব দেবশিশু ছিলেন এমন নয়। তাঁদের এই সংকীর্ণতা এবং পেটিবুর্জোয়া সম্বন্ধে একটা ছোঁক ছোঁক করা ছুঁৎমার্গ তাঁদের নিজেদেরও একটা ক্ষুদ্র চক্রে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল।

এমনি করে যেন একটা নেশার ঘোরে চলতে চলতে ১৯২৭ সাল এসে গেল। কেমন করে ঠিক মনে নেই, লিলুয়ার রেল কারখানার বিরাট ধর্মঘট-সংগ্রামের সংস্পর্শে এলাম। সেখানেই দূর থেকে ফিলিপ স্প্রাট ও বেন ব্রাডলিকে দেখলাম। শুনলাম এঁরা কমিউনিস্ট। কিন্তু ওঁদের ধারে কাছে পৌঁছতে পারিনি। সেই উন্নাসিক চক্রটি সর্বদাই ওঁদের ঘিরে থাকত।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার পার্ক সার্কাস মাঠে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। সেখানে বিরাট শ্রমিক শোভাযাত্রা এসে জমায়েত হয়। কংগ্রেস নেতারা তাঁদের কংগ্রেস প্যাণ্ডালে ঢুকতে দেবেন না। তাই নিয়ে সংঘর্ষ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জহরলালের চেষ্টায় ওঁদের ঢোকবার অনুমতি মেলে। এ-ঘটনা মনের উপর বেশ একটা দাগ কাটে। এই সময়ে কলকাতার এলবার্ট হলে নিখিল ভারত শ্রমিক-কৃষক দলের সম্মেলন হচ্ছে। তাতেও যোগ দিলাম প্রবল আগ্রহ নিয়ে। বেশ বুঝতে পারছিলাম বাঙলা দেশে একটা কমিউনিস্ট দল গড়ে উঠছে। তবুও তাতে সব বাধা কাটিয়ে, আগের যুগের সব মোহ ত্যাগ করে, ঝাঁপিয়ে পড়তে পারিনি। ইতঃস্ততটা তখনো কাটেনি।

একটা কারণও ছিল। এই সময়ে বাঙলা দেশে অনুশীলন-যুগান্তর প্রভৃতি সব বিপ্লবী দলগুলি মিলে সুভাষবাবুকে নেতা করে একটা সংযুক্ত বিপ্লবী দল খাড়া করার চেষ্টা চলছিল। তাঁদের তালে তালে কিছুদিন কাটল। আগেই উল্লেখ করেছি—আমাদের একটা আপশোষ ছিল এটাই যে এঁরা কেন মিলতে পারেন-নি। সেই মিলনের চেষ্টা থেকে তাই আর সজোরে নিজেকে পৃথক করে রাখতে পারিনি। বিশেষ করে পুরাতন বন্ধুদের সকলেরই ঝোঁক ছিল এইদিকে, তা কাটতে দেরি হলো।

এতক্ষণ ধরে নিজের কথাই সাতকাহন বলা হলো। আত্মকথন এবার শেষ করা যাক।

১৯৩০ সালে রাজশাহিতে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে গেছি। সেখানে সেবার যুব সম্মেলন, 'ইয়ং কমরেডস লীগ সম্মেলন' নামে কমিউনিস্টদেরও একটা সম্মেলন হচ্ছে। সব কটিতে প্রতিনিধি ছিলাম। এমন সময় খবর এলো

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারে বিপ্লবীদের আক্রমণ হয়েছে। চারদিকে ধরপাকড় হচ্ছে। ওখানেই কেউ কেউ গ্রেপ্তার হলেন। আমরা কয়েকজন গা-ঢাকা দিলাম। রাজশাহি থেকে পুলিশের চোখ এড়িয়ে চলে এলাম কলকাতায়। কয়েক মাসের মধ্যেই ধরা পড়ে ডেটিনিউ হয়ে গিয়ে ঢুকলাম জেলে।

তখন আর কোনো মোহ নেই। বিপ্লবের পথ যে ওটা নয়, কয়েকজন সশস্ত্র মধ্যবিত্ত যুবকের অভিযান অথবা সন্ত্রাসবাদ—ঐসব পথে যে দেশ স্বাধীন করা যাবে না, তা তখন বুঝেছি। কংগ্রেসের তখন আইন-অমান্য আন্দোলন চলছে। সে-পথেও যে দেশ স্বাধীন হবে এ-বিশ্বাসও করতে পারছিলাম না। জেলে ঢুকেই সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিলাম কমিউনিজম কি—তা জানবার জন্য। অবশেষে লেনিন পথ দেখালেন। কঠিন পরিশ্রম করে উপলব্ধি করলাম মার্কসবাদ-লেনিনবাদই বিপ্লবের একমাত্র পথ। ভারতবর্ষের সত্যকার স্বাধীনতা যে লেনিন-প্রদর্শিত পথেই আনতে হবে, সে-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ বা সংশয় রইল না। সব পুরাতন মোহ, সব সংস্কার ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টি গড়তে হবে—এই সংকল্প মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল।

…এবার কোদালটাকেই কবর দিন, প্রেসিডেন্ট নিকসন—

অমলেন্দু চক্রবর্তী

"আরে, এতো এখন সবাই জানে মশাই, ঘরের গিন্নিরাও জানে, ওআল স্ট্রীটের উকিলরাও জানে, কলেজের কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীরাও জানে, রাজনীতির পাণ্ডা থেকে সামরিক বিভাগের হোমরা-চোমরারাও জানে, কংগ্রেসের ঝানু লোকেরা আর ব্যবসায়ীরা সবাই জানে, আমার তো মনে হয়, এমন কি প্রেসিডেন্ট নিকসন নিজেও জানেন—আমেরিকা এখন শান্তি চায়।"

এ কার কণ্ঠস্বর, প্রেসিডেন্ট নিকসন? আপনারই মুখের ভাষায়, আপনারই জন্মভূমির মাটিতে দাঁড়িয়ে, আপনারই সহ-নাগরিক এক নারীর কণ্ঠস্বর। কয়েকদিন আগেকার, ৩১শে অক্টোবরের, 'টাইম' পত্রিকা খুলে দেখুন, জনমতের চিঠির পাতায় প্রথম চিঠি, লস-এঞ্জেলস থেকে লিখেছেন অ্যানে ওয়েইস।

তবু, তবু আপনাদের নোংরা হাত এখনও ধুয়ে নিচ্ছেন না কেন রাষ্ট্রপতি নিকসন? এত বিশাল আর ধনাঢ্য দেশ আপনাদের, এত শক্তির দম্ভ, এত দাপট, তবু এক-ফোঁটা ছোট্ট একটা দেশের উপর এত আপনাদের আক্রোশ? এত এত বছর ধরে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছেন, বুঝতেই পারছেন, হটতে হটতে একেবারে দেয়ালে পিঠ সিঁধিয়ে এখন কোনোমতে মান বাঁচিয়ে পালানোর পথ খুঁজতে হচ্ছে, আপনাদের ক্যাবট লজ, ম্যাকসওয়েল টেলর…কতো রাষ্ট্রদূত সাইগনে এলেন-গেলেন, কতো বাঘা-বাঘা লড়াকু ম্যাকনামারা, ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড খাবি খেয়ে ফিরে এলেন, জনসন-নিকসন সমস্ত রাষ্ট্রপতিরা হোয়াইট হাউসের আসন বদল করে মরলেন। অথচ আপনাদের ইচ্ছায় ঘটনার কিছুমাত্র অদল-বদল হলো না। মার খেয়ে-খেয়ে ক্লান্ত হয়ে, হতাশ হয়ে, পৃথিবীর ইতিহাসে সব রকম নোংরা বর্বর নিষ্ঠুরতম সব কিছুই তো করলেন, অথচ মজ্জায় মজ্জায় বুঝতে পারছেন, কী সব্বোনেশে খাদে পা দিয়ে ফেলেছেন আপনারা। আসলে বেঁটে-খাটো, রোগা-পটকা, লিকলিকে, চাষা-ভুষো সরল মানুষগুলি ভিতরে ভিতরে এক-একটা বাঘের বাচ্চা। রজ্জুতে সর্পভ্রম মারাত্মক নয় প্রেসিডেন্ট নিকসন, সর্পে রজ্জুভ্রম ঘটেছে আপনাদের। কিন্তু আপনাদের ভুলের দায় কেন দেবে অ্যানে ওয়েইস-এর ভাইরা, অথবা তাঁর সন্তানেরা। এখনও হয়তো সময় আছে, বুকে হাত রাখুন, রাষ্ট্রের প্রথম নাগরিক হিসেবে নিজের বুকে সমগ্র আমেরিকার

স্পন্দন অনুভব করতে চেষ্টা করুন, উনিশ কোটিরও বেশি মানুষ—নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, সাদা-কালো—সমগ্র আমেরিকাবাসীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিমাপে নিঃশ্বাস নিন। নিজেকে ফাঁকি দেবেন না প্রেসিডেণ্ট, মিথ্যা-প্রচারে সত্যকে ঢাকবেন না। ভিয়েতনামের মাটিতে আজ আপনার ইচ্ছার সঙ্গে আমেরিকাবাসীর অনিচ্ছার লড়াই। স্বদেশবাসীর ধিক্কার কুড়িয়ে এ আপনি কোন দিগ্বিজয়ে চলেছেন ? লস এঞ্জেলস-এর অ্যানে ওয়েইস বলছেন,—সবাই জানে, এমন কি, নাকি আপনিও জানেন, আমেরিকা শান্তি চায়। তবে যুদ্ধ কেন প্রেসিডেণ্ট ? যুদ্ধ এবার আপনার সঙ্গে আপনার স্বদেশবাসীর, জহ্লাদ আমেরিকার সঙ্গে বিবেকবান আমেরিকার, জনসন-নিকসন এর আমেরিকার সঙ্গে হুইটম্যান-এর আমেরিকার। হয়তো এখনও সময় আছে, নিজেকে খুঁজুন স্বদেশের ইতিহাসে। দর্পণে তাকান। শিউরে উঠবেন না প্রেসিডেণ্ট, ভয় পাবেন না, দর্পণে ক্যালিবানের মুখ। ডানসিনেন দুর্গে তো কখনও নিজেকে এত অসহায় ভাবেন নি ম্যাকবেথ। হোয়াইট হাউস কী তার চেয়েও অরক্ষিত, আপনি কী তার চেয়েও নিঃসঙ্গ ? হয়তো এখনও সময় আছে, স্বদেশবাসীর জন্য কবর খুঁড়বেন না ভিনদেশের মাটিতে, বরং কবর খোঁড়ার কোদালটাকেই এবার কবর দিন প্রেসিডেণ্ট নিকসন।

স্বদেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য পরিণামকে একাই রোধ করবেন, আপনি কী এতই শক্তিমান ? ভিয়েতনাম আপনার নিশীথ রাতের দুঃস্বপ্ন, শুধু আপনার নয়, সমগ্র আমেরিকার। শক্তিদম্ভে স্বীকার করতে আপনার লজ্জা আর অপমান। কিন্তু আপনার দেশের মানুষের কাছে এই দেউলে অহঙ্কারের আর কোনো মূল্য নেই প্রেসিডেণ্ট। তারা যুদ্ধে যুদ্ধে ক্লান্ত, করভারে জর্জর, হতাশা আর নৈরাশ্যে পুরো জাতটাই নেতিয়ে পড়েছে। তাদের রক্তভৃষ্ণা নেই, অনেক সন্তানকে তারা হারিয়েছে ইতিমধ্যে, এবার জীবিত আর আহত সন্তানদের ফিরে পেতে চায়, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চায়। আপনাদের প্রচারবাণীর চোখা-চোখা শব্দগুলির সব অর্থ হারিয়ে গেছে। এ অর্থহীন অন্যায় যুদ্ধে অংশ নিয়ে আর জাতীয় লজ্জা, জাতীয় পাপের মাত্রা বাড়াবে না তারা। তারা এখন শান্তিতে বিশ্রাম আর নিদ্রা চায়। যে-যুদ্ধে আপনারা হেরে গেছেন, সেই যুদ্ধের জন্য মুরগির বাচ্চার মতো তাজা তাজা জওয়ান ছেলেগুলিকে মৃত্যুর আগুনে ছুঁড়ে মারছেন কেন। ভিয়েতনাম—আমেরিকার মানুষের কাছে কবরের বিভীষিকা আর সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে স্বাধীনতার মশাল। এ-কথা

আপনি আর আপনার পেণ্টাগন বুঝতে চান না, কিন্তু বিশ্বাস করে আপনার দেশের মানুষ। ২৪শে অক্টোবরের 'টাইম' পত্রিকার পাতা খুলুন, লক্ষ্য করুন, ডায়ার থেকে চার্লস এম. ফ্রিল্যাণ্ড কি লিখছেন সম্পাদক মশাইকে— "···চু লাই, দানাং অথবা বিয়েন হোয়া, অথবা এখন আর তেমন-বিদঘুটে-নামের-নয় এমন কোনো জায়গায় কমিউনিস্টদের বিজয় ঘোষিত হয় নি। হো-চি-মিন যেখানে যে-ভাবে এই বিজয় ঘোষিত হবে বলে বলেছিলেন, যথারীতি সেখানেই তা ঘটেছে—আমেরিকার জনগণের হৃদয়ে এবং মনে—"দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার লড়াই করে যাবার মতো মনোবলের দৃঢ়তা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের নেই। ওরা যখন যুদ্ধ করে-করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আমরা তখনও এখানে যেমন আছি তেমনই থাকব।" পত্রলেখক চার্লস এম ফ্রিল্যাণ্ড বেশ জোরের সঙ্গেই বলছেন—"হ্যাঁ, প্রতিবাদ-মিছিলে যোগ দিয়েছিলাম। যাঁরা অর্থহীনভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি তাঁদের স্মরণে প্রতিবাদ করছি। আমার এই প্রতিবাদ তাঁদের নামে, যাঁরা সর্বমানবের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে বিশ্বাসী ; তাঁদের নামে, যাঁরা বিশ্বাস করেন—সর্বমানবের মুক্তি না ঘটলে কোনো মানুষই মুক্ত নন।"

আমেরিকাবাসী চার্লস এম ফ্রিল্যাণ্ড আমাদের বন্ধু প্রেসিডেণ্ট নিকসন। শুধু একজন নন, আমেরিকায় আজ লক্ষ লক্ষ ফ্রিম্যান ভিয়েতনামের আপনজন। এশিয়ায় কশাইখানা তৈরি করছেন আপনি এবং আপনাদের হিংস্র লালসা মেটাতে সেখানে বলির পাঁঠা হতে প্রস্তুত নয় আমেরিকার শ্রমিক-কৃষক, সাদা-কালো সাধারণ মানুষ। আমেরিকাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙছেন আপনারা। আর আপনাদের রক্তচক্ষু ভ্রূকুটি, পেণ্টাগনি দাপটকে অগ্রাহ্য করে আমেরিকার বিবেক আজ জাগছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে,শান্তির স্বপক্ষে আজ তাদের দৃপ্ত অভিযান। গত ১৫ই অক্টোবর এবং ১৫ ই নভেম্বর ১৯৬৯ ওয়াশিংটনের রাজপথে গণবিক্ষোভের সেই বিশাল জনস্রোত, সেই ঐতিহাসিক উত্তাল শোভাযাত্রা, বিশ্ব-জনমতের সঙ্গে একীভূত হয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা আর ধিক্কার আর প্রতিবাদ জানাতে ছুটে এসেছিল সারা আমেরিকার সর্বস্তরের মানুষ—শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী-শিক্ষক-ছাত্র-ঘরের বৌ-শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-ডাক্তার-অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ, কচি মুখের কিশোর-কিশোরী, পুরনো যুদ্ধবিশারদ, ব্যবসায়ী, সাদা-কালো, উত্তরের মানুষ, দক্ষিণের মানুষ। আপনাদের নোংরা যুদ্ধের প্রতিবাদ জানাতে সারা আমেরিকা সেদিন একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল প্রেসিডেণ্ট নিকসন। ভিয়েতনাম আমেরিকা হয়ে উঠে আসছে আপনাদের ঘরের আঙিনায়, বার্গামের অরণ্য

উঠে আসছে ডানসিনেন দুর্গে। হোয়াইট হাউসে আপনার ঘুম ছিল না জানি, পেন্টাগনে তখন বৃথাই বুট ঠুকে লাফাচ্ছিল আপনার অনুচরেরা। মানুষ, সমবেত মানুষের শক্তিই ইতিহাসে সর্বশক্তিমান, মাননীয় রাষ্ট্রপতি।

১৫-১৬ই অক্টোবর, ১৫ই নভেম্বর ১৯৬৯, ভিয়েতনাম-যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকা-বাসীর এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের দিন—মোরেটোরিয়াম ডে, আমেরিকার ইতিহাসে এক স্মরণীয় তারিখ। সংখ্যার দিক থেকে হয়তো খুব বিরাট কিছু নয়, মাত্র দশ লক্ষ আমেরিকান নাগরিক এই প্রতিবাদ মিছিলে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন—সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগের অর্ধেক। কিন্তু সংবাদপত্রে, টেলিভিশানে যতই খাটো করে দেখুন প্রেসিডেন্ট নিকসন, গণবিক্ষোভে এই তো হয়। মিছিলের প্রতিটি পদাতিক অন্তত এক সহস্র দেশবাসীর প্রতিনিধি। নিজের কাছে নিজেকে ফাঁকি দেবেন না। আপনি তো জানেন, হ্যাঁ, সেই পনেরই অক্টোবর সাইগনে নিজের প্রাসাদে বসে নগুয়েন ভ্যান থিউ যখন শলা-পরামর্শে ব্যস্ত, রাষ্ট্রদূত এল্‌স্‌ওঅর্থ বাঙ্কার যখন মধ্যাহ্নভোজে বসেছেন, তখনই বেশ কিছু সংখ্যক রিলিফ-কর্মী মার্কিনী-সৈন্য নিঃশব্দে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে মোরেটোরিয়াম দিবসকে স্মরণ করছে। সেদিনই চু-লাই থেকে যে মার্কিনী-সৈন্যদের একটি প্লেটুনকে লড়াই করতে পাঠানো হলো, মুখোমুখি লড়াইতে নাকি দু-জন গেরিলাকে তারা হত্যাও করল, কিন্তু সেই প্লেটুনের আর্ধেক সৈন্যের বাহুতে জড়ানো ছিল মোরেটোরিয়াম-ডের স্মারক প্রতীক কালো আর্মব্যাণ্ড—যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর প্রতিবাদ, অন্যায়ভাবে হত্যা করার, নিহত হবার পাপ আর যন্ত্রণা।

প্যারিস-শান্তি-আলোচনায় আমেরিকার প্রতিনিধি-দলের নেতা হেনরি ক্যাবট লজ যখন প্যারিসের রাষ্ট্রদূত-ভবনে নিজের চেম্বারে বসে আরেকটি অনর্থক বৈঠকে নতুন দর-কষাকষির প্যাঁচ কষছেন, ঠিক তখনই বোস্টন শহরে রাষ্ট্রদূতের পুত্র, হার্ভার্ড-বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক জর্জ ক্যাবট লজ দেড়শ ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধবিরোধী মোরেটোরিয়াম-ডের এক মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এরপরও কী এই দিনটির তাৎপর্যকে তুচ্ছ করে দেখতে বলেন প্রেসিডেন্ট নিকসন? গোটা দেশ জুড়ে পুরো জাতটাই যে মোচড় দিয়ে উঠেছে ভিয়েতনাম-যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সরকারী প্রচারযন্ত্র, টেলিভিশান, রেডিও, তাঁবেদার সংবাদপত্র—কী দিয়ে আপনি এত বড়ো ঘটনাকে লুকোবেন? প্রচার চলছে—আমেরিকার জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশের কাণ্ড-কারখানা এ-সব, সংখ্যাগরিষ্ঠ

আমেরিকাবাসী নাগরিক নাকি আপনাদের পক্ষে, উপ-রাষ্ট্রপতি স্পায়রো এগনিউ যে-উচ্চকিত কণ্ঠস্বরকে effete corps of impudent snobs বলে ঠাট্টা করছেন। পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে এমন ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনগুলি এই মোরেটোরিয়ামকে সমর্থন করেছে। ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক এবং আরও বড়ো বড়ো শহরগুলিতে বিভিন্ন সভায় ভিয়েতনাম-যুদ্ধের নৃশংসতার বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে যাঁরা ভাষণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রায় সাড়ে সতের লক্ষ সদস্য বিশিষ্ট টিমস্টার্স ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হ্যারল্ড গিবনস, প্রখ্যাত নিগ্রো-নেতা রালফ অ্যাবারনেমি, শ্রীমতী মার্টিন লুথার কিং, নিউ ইয়র্কের সেনেটর চার্লস গুডেল, মিনেসোটার সেনেটার ইউজিন ম্যাকার্থি, দক্ষিণ-ড্যাকোটার সেনেটার জর্জ ম্যাকগভর্ন, ফিলিপ বার্টন এবং জেমস সিউয়ার-এর মতো কংগ্রেস সদস্য, ওয়েন মোরস আর আর্নেস্ট গ্রুয়েনিং-এর মতো প্রাক্তন সেনেটার,জীববিস্তায় নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী জর্জ ওয়াল্ড,বিখ্যাত শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ ডঃ বেঞ্জামিন স্পোক এবং জোসেফ হেলার আর নরমান মেইলার-এর মতো প্রতিষ্ঠিত লেখক, পল নিউম্যান, অ্যালভিন আর্কিন-এর মতো অভিনেতা, শার্লে ম্যাকলেইন-এর মতো অভিনেত্রী। এ ছাড়াও এ-আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছেন নৌবাহিনীর প্রাক্তন কমাণ্ডার ডেভিড স্যুপ, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গ্যালব্রেথ, জাপানের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এডুইন রেসর, নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জন লিণ্ডসে। এরপরও কী বলতে হবে এ-আন্দোলন 'সংখ্যালঘুর কাতর কণ্ঠস্বর'? অথবা কতোগুলি 'ছেলে-ছোকরার হৈ-চৈ'? না, আপনারা শান্তি-শোভাযাত্রীদের প্রস্তুতিতেই দিশেহারা হয়ে উঠে-ছিলেন প্রেসিডেণ্ট নিকসন। আপনারা জানতেন, কী ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে ওয়াশিংটন শহরে, এর গুরুত্ব এর প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়ে উঠবে চারদিকে। আপনারা ভয় পেয়েছিলেন। নইলে ঘটনার আগেই রাজধানীকে এমন করে একটা সৈন্য-শিবিরে সাজিয়ে তুললেন কেন? 'দাঙ্গা-থামানোতে' শিক্ষাপ্রাপ্ত ৯০০০ সৈন্যকে দ্রুত ওয়াশিংটনে পাঠানোর ব্যাবস্থা হলো, সেখানে আগে থেকেই যে কয়েক হাজার সৈন্য খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের এবং রাজধানীর আরও ২০০০ পুলিশকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্রের সাজ-সরঞ্জামসহ নৌ-বাহিনীর সৈন্যদের ক্যাপিটল-ভবনে মোতায়েন করা হলো, ডিপার্টমেণ্ট অব জাস্টিস-এর হেড-কোয়ার্টার্স-এর করিডরে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আরও ৩০০ সৈন্যকে।

ভিয়েতনামের মাটিতে তো দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট নিকসন, এখন স্বদেশের মাটিতে নিরস্ত্র শান্তি-শোভাযাত্রাকে মোকাবিলা করতে এত যুদ্ধের আয়োজন, এত সৈন্য, এত গুলি-বারুদ? হ্যাঁ, এই নিরস্ত্র শান্তি-মিছিলই আপনাদের উপর আজ প্রচণ্ডতম আক্রমণ। এতকাল দেশের যৌবনকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছেন ভিয়েতনামের আগুনে, তারা লাখে লাখে মরেছে। আজ তাদের প্রতিবাদ-মিছিল আপনার সদর-দরজায়, মুখোমুখি দাঁড়াবার নৈতিক সাহস আপনাদের নেই। তাই আত্মরক্ষার জন্য এত সৈন্যের সমাবেশ। পরের দেশে শত্রু খুঁজতে গিয়ে নিজের ঘরের মানুষকেই শত্রু করে তুলেছেন। পথে পথে মোকাবিলার জন্য নিজের তাঁবেদার কয়েক-শ মানুষের মিছিল সাজিয়ে দিয়েছেন। লাখো লাখো নর-নারীর যুদ্ধবিরোধী মিছিলের বিপরীতে আপনার পক্ষে কয়েক-শ ঠিকেদার। আমেরিকার শহরে শহরে পথে পথে তারা পরস্পরে লড়ছে, মরছে, মারছে। আপনার পুলিশ মিলিটারি নীরব দর্শক। আমেরিকার বিরুদ্ধে আমেরিকা লড়ছে, আমেরিকাই আজ আমেরিকাকে মারছে, ভাঙছে। নিজেদের স্বার্থে জাতটাকে টুকরো টুকরো করছেন আপনারা। এবং সেজন্যই মোরেটোরিয়ামের শোভাযাত্রায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় কৃষ্ণাঙ্গ-আমেরিকাবাসীর অংশগ্রহণের সংখ্যা নগণ্য। ঠিক কথাই বলেছিলেন ওয়াশিংটনের এক নিগ্রো ভদ্রলোক—"ওরা সাদা চামড়া কুলীন মানুষগুলো খেয়োখেয়ি করে মরছে, ওতে আমরা যাব কেন?" যদিও শ্রীমতী মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে ৪৫০০০ নর-নারীর এক বিশাল যুদ্ধবিরোধী প্রদীপ-হাতে মিছিল আপনার হোয়াইট হাউসে অভিযান চালিয়েছিল, শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে ওরা অনেক বেশি যুদ্ধবিরোধী, তথাপি বিভিন্ন শহরে মোরেটোরিয়ামে এদের সংখ্যা কম। ওরা তো গিনিপিগের মতো চারদিক থেকে মার খাচ্ছে আপনাদের হাতে। ভিয়েতনামের যুদ্ধে ওরাই মরছে বেশি, বর্ণবিদ্বেষের ঘৃণায় ওরাই মার খাচ্ছে যুগ যুগ ধরে. তবে আবার নতুন করে রাস্তায় রাস্তায় আপনাদের তৈরি-ফাঁদে মরতে যাবে কেন? পৃথিবীকে টুকরো টুকরো করে ভাঙতে গিয়ে নিজেরাই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, নিজের দেশকে ভাঙছেন।

আসলে এই বিচ্ছিন্নতাবোধই আপনাদের ভিতর থেকে কুরে কুরে মারছে। আপনারা জানেন, ভিয়েতনাম নিয়ে আপনারা যা করছেন, তার সবই বিশ্বের জাগ্রত বিবেকের বিরুদ্ধে, এমন কি, স্বদেশের মাটিতেই আপনাদের পিছনে কোনো জনসমর্থন নেই। তাই বৃথা আক্রোশে আপনাদের এই রণমত্ততা।

যে-সময়ে আপনারা ভিয়েতনামের যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন, আমেরিকার মানুষ কি এখনও সে-অবস্থাতেই পড়ে আছে? টেলিভিশানে-রেডিওতে-সংবাদপত্রে-চলচ্চিত্রে—যাবতীয় প্রচারযন্ত্রে—কমিউনিস্ট-জুজুর ভয় দেখিয়ে, ভণ্ড দেশপ্রেম বা শভিনিজমের ডুগডুগি বাজিয়ে, যে ওঝার মন্ত্র পড়েছেন আপনারা; দেশের মানুষ কী আজও সে-সব কথায় ভুলছে? আপনাদের সব ফাঁকিই আজ ধরা পড়ে গেছে, মানুষ আজ অভিজ্ঞতায় বুঝেছে সর্বনাশের-পথ আর বাঁচার-পথের ফারাকটা। গত কয়েক বছরে জনমত কী দ্রুত আপনাদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে। 'টাইম-লুই হ্যারিস পোল'-এর জনমত-সংগ্রহসমীক্ষার নিরিখেই বিচার করুন। 'এশিয়াতে কমিউনিস্ট-আক্রমণ রোধ করতে যুদ্ধ কী অপরিহার্য?'—এই প্রশ্নের উত্তরে ১৯৬৭ সালে শতকরা ৮৩ জন বলেছিলেন—'হ্যাঁ', আর শতকরা মাত্র ৪ জনের উত্তর ছিল—'না'। কিন্তু ১৯৬৯ সালে সেই একই প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৫৫ জন বলছেন—'হ্যাঁ' এবং শতকরা ৩০ জন বলছেন—'না'। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আছে বলে বৃথাই আত্মপ্রসাদ খুঁজছেন প্রেসিডেন্ট, মাত্র দু-বছরে আপনার সমর্থক সংখ্যা ৮৩ থেকে কমে হয়েছে ৫৫, আর আপনার বিপক্ষে গেছে ৪ থেকে বেড়ে ৩০ জন। আজ জনমত রকেটের বেগে আপনাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। যারা সাধনা দিয়ে চাঁদ ছুঁয়েছে, তারা কবরে যেতে রাজি নয়। জনমত-সমীক্ষায় আজ কি দেখা যাচ্ছে? **'প্রেসিডেন্টের পক্ষে একতরফা যুদ্ধবিরতির আদেশ কি সঙ্গত হবে?'**—এ-প্রশ্নের উত্তরে জনমত-সমীক্ষা কি বর্ণনা দিচ্ছে?

	জনসাধারণ			সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, ধর্ম, ব্যবহারজীবী স্তরের নেতৃবৃন্দ		
	পক্ষে	বিপক্ষে	নিশ্চিত নই	পক্ষে	বিপক্ষে	নিশ্চিত
	%	%	%	%	%	%
সমগ্র জাতি	৪৪	৪৪	১২	৪৪	৪৫	১১
৩০ অনূর্ধ্ব	৪৫	৪৬	৯	৪৫	৪৫	১০
৩০—৪৯	৪৩	৪৮	৯	৪৫	৪৫	১০
৫০ ঊর্ধ্ব	৪৮	৩৭	১৫	৪৩	৪৫	১২

	জনসাধারণ			সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, ব্যবহারজীবী স্তরের নেতৃবৃন্দ		
	পক্ষে	বিপক্ষে	নিশ্চিত নই	পক্ষে	বিপক্ষে	নিশ্চিত নই
	%	%	%	%	%	%
পুরুষ	৪৪	৪৮	৮	×	×	×
নারী	৪৫	৩৯	১৬	×	×	×
কৃষ্ণাঙ্গ	৫৬	২৯	১৫	×	×	×
শ্বেতাঙ্গ	৪৩	৪৫	১২	×	×	×
রিপাব্লিকান	৪২	৪৭	১১	×	×	×
ডেমোক্র্যাট	৪৬	৪৩	১১	×	×	×
ভেটারেন	৪০	৫৩	৭	৩৮	৫২	১০

(সংক্ষেপিত)

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে কোন মানদণ্ডে একে তুড়ি মেরে দেবেন প্রেসিডেণ্ট ? অন্তত সর্বক্ষেত্রেই তো প্রায় আধাআধি ভাগ। সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবিই বা কতটুকু খাটে ? বরং আপনাদেরই পত্র-পত্রিকার মতে (টাইম, ৩১ অক্টোবর ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ১২) জনমতের শতকরা ৮০ ভাগ এবং নেতৃমণ্ডলীর অভিমতের শতকরা ৮১ ভাগই এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বীতস্পৃহ, ক্লান্ত। এই সমীক্ষার নিয়ামক হ্যারিস সাহেব বলছেন--The basic rational and justification for the Vietnamese war are rapidly fading from the consciousness of the people.

তবু, তবু এই যুদ্ধ কেন চলে প্রেসিডেণ্ট নিকসন ?

রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের ঠিক আগেই এক সাক্ষাৎকারে আপনি নিজেই কি বলেছিলেন, স্মরণ করুন—My feeling is that the American people eagerly anticipate that the new Administration will find a way to end the war in Vietnam on an honourable basis

and that we will be able to achieve this—or at least establish a sure prospect of it—without undue delay.

তথাপি এরপরও তো হাজার হাজার যুবককে ভিয়েতনামে প্রাণ দিতে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট। এরপরও তো সায়গনে নগুয়েন ভ্যান থিউর পুতুলনাচ থামে না, প্যারিসে শান্তির নামে প্যাঁচের খেলা চলে, ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলে, চলতেই থাকে। অনেক কষ্টে লুকিয়ে রাখলেও আপনাদের থলে থেকে পচা দুর্গন্ধটা বেরিয়ে পড়ে, সারা দুনিয়ার মানুষ ঘৃণায় ধিক্কারে নাকে রুমাল চাপা দেয়, মানুষের সভ্যতার সবচেয়ে কলঙ্কময়, বর্বরোচিত নৃশংসতা—মাই লাই, সং মাই। সদ্যোজাত শিশুর রক্ত, প্রসূতি মায়ের রক্ত, অসহায় বুড়ির রক্ত, নিরপরাধ অসামরিক নারী-পুরুষের রক্ত দিয়ে রাঙানো হয়েছে আমেরিকার কারখানায় প্রস্তুত বেয়নেটগুলি। পৃথিবীর কাছে আমেরিকার বিবেক আজ ভূলুণ্ঠিত। সেসব কারখানার শ্রমিকদের হাত আজ অনুশোচনায় জ্বলছে, আমেরিকার লাখো লাখো মানুষ আজ লজ্জা আর পাপ আর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। পনেরই অক্টোবরের মোরেটোরিয়াম মিছিলের মানুষগুলি তাই কৈফিয়ৎ দাবি করেছে, তারা শান্তি চায়।

All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand—মাদাম দিয়েম-এর ভাগ্য পতনের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে প্রেসিডেন্ট। এবার নোঙরা হাতগুলি ধুয়ে ফেলুন। গভীর রাতের স্তব্ধতায় হোয়াইট হাউসের কোনো জানালার ধারে একান্তে এসে দাঁড়ান, আকাশের অগণিত নক্ষত্রগুলি দেখুন; আকাশের এই নক্ষত্রগুলির দিকে তাকিয়ে আপনার মনে পড়ে না পৃথিবীর শিশুদের মুখ, সুন্দরী সব রমণীর মুখ, চাঁদের আলোয় প্রশান্ত মহাসাগরের নিস্তরঙ্গ জলে কী অপার শান্তি, এই জ্যোৎস্নায় সোনা জ্বলে পৃথিবীর মাঠে মাঠে। Glamis hath murdered sleep, therefore Coewdor shall sleep no more, Macbeth shall sleep no more.

আপনি ঘুমোতে পারছেন না জানি, ঘুম আসবে না কোনো দিন। তবে কেন স্বদেশবাসীর জন্য কবর খুঁড়ছেন বিদেশের মাটিতে? বরং কবর খোঁড়ার কোদালটাকেই এবার কবর দিন প্রেসিডেন্ট। এই স্বদেশের মাটিতেই, স্বদেশবাসীর মধ্যেই আপনার ম্যাকড়াফ্‌।

মা-জননী

বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

পদ্ম, মাটি কেমন ?

বালি মাটি।

মাটির গন্ধ কেমন ?

একমুঠো মাটি শুঁকল পদ্ম। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ কোনো গন্ধ পাওয়ার জন্য ঘনঘন শ্বাস নিল। অথচ পরিচিত কোনো গন্ধ পেল না। বলল, গন্ধ নেই।

ধান্যের গন্ধ ?

নেই।

রবিশস্যের গন্ধ ?

নেই।

সোঁদা গন্ধ ?

নেই।

আগে ছিল। কানন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এখন নেই। আশপাশ থেকে মাটি খুঁটেখুঁটে পদ্ম মুখে তুলতে থাকল। দাঁত কিরকির, গলা দিয়ে সড়সড় মাটি নামছে। কতদিন পেটে ফসল পড়েনি। মাটি-অন্নে পেট ভরছে।

এখন সবে সকাল। শিশু-সূর্য এবং নির্মল বাতাসে ভোর ভোর ভাব। বটবৃক্ষের শীর্ষে হলুদ আলো ছড়ানো। ভাগীরথীর ঘোলা জলে চিকন আলো। বিভিন্ন পাখির স্বরে দিবস আড়মোড়া ভাঙছে। বাতাসে বাল্যের গন্ধ। ভোরের এক নিজস্ব গন্ধ আছে—সবকিছু পরিচ্ছন্নের সুগন্ধ।

পাশে পারঘাট। বাঁশের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নিচে নেমেছে। জলের কিনারায় খেয়ানৌকা বাঁধা। মাঝি এখনো আসে নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাননের ভালো লাগছিল। এই সকাল, পরিচ্ছন্ন আকাশ এবং শীতল বায়ু—রাতের অন্ধকার এবং চাপা ভয় থেকে কাননের মন ক্রমশ মুক্ত হচ্ছে। পদ্মর জন্য বড় মায়া। বাবা কাল রাতেও ঘরে ফেরে নি। অনেকদিন হলো ফিরছে না। নিরন্নের কাল বড় দীর্ঘ। অন্নের প্রত্যাশায়

কানন কাল দুপুরে স্টেশনে গিয়েছিল। ওখানে বাবা কাজ করে, তাড়ি খায়, ওকে দেখলে তেড়ে মারতে আসে। বদরাগী বাপ হুলো বেড়ালের মতন। সেদিন রাত্রে পদ্ম এবং ওর হাড় চুরচুর হতো। মা-জননী থাকতে অনেকদিন মাংস না-খাওয়ার জন্য বাবাকে আক্ষেপ করতে দেখেছে। কচি পাঁঠার নরম মাংস, পাঁজরের কচকচে হাড়, সুগন্ধ মেটে—বাবার জিভ দিয়ে জল ঝরে। উবু হয়ে বসে দু-হাতে পেট চেপে 'কি করি-কি করি' ভাব। এখন মা-জননী নেই, কচি পাঁঠার মাংস দুষ্প্রাপ্য, অতএব পদ্ম এবং কাননের হাড়গোড় টনটন করছে। শরীরের এখানে-ওখানে কালশিটে। সেই কারণে হুলো বেড়ালের জন্য, বদরাগী বাবার জন্য, ভয় গলা কামড়ে ঝুলে আছে।

পদ্ম চোখ বুজে জাবর কাটার মতন গালের ভিতর মাটি নাড়ছিল। আঠাল লালা মেখে এগাল-ওগাল কাদা-কাদা। কাল সারারাত আমসি-পেটের জ্বালায় কষ্ট পেয়েছে। কানন বোনের জন্য কিছু করতে পারে নি। বলল, পদ্ম, মাটির স্বাদ কেমন ?

জিভ দিয়ে মাটি নাড়তে নাড়তে পদ্ম চোখ মেলল, বিস্বাদ।

সবেমাত্র হারান ময়রা দোকান ঘরের ঝাঁপ তুলেছে। কাচের বাক্সের ভিতর বাসি খাবার সাজানো। ভাঙা কাচ—কাগজ আর আঠা দিয়ে জোড় দেওয়া। রাস্তায় একটা কুকুর লেজ চাটছে। নিতাই গলা-কাটা টিনে করে একরাশ ময়লা নিয়ে এসে রাস্তার পাশে উবুড় করল। তারপর টিনের তলায় চাঁটি মেরে ফটফট শব্দ করতে করতে দূরে—গাছের নিচে—কানন এবং পদ্মকে দেখল। কুকুরটা নিতাইয়ের পায়ে পায়ে এসে পা-মুখ দিয়ে খাদ্য খুঁজছে। হারানের হাতে ঝাঁটা—বাতাসে ধুলোর ঘূর্ণি।

দোকান ঘরের ভিতরে এবং বাইরে বিন্দু বিন্দু জল ছেটাল হারান। জলে ধুলো ভিজবে, বাতাসে উড়বে না। এ-সময় পরিচিত কাকেরা দোকানের সামনে ভিড় করে। হারান মিষ্টি ছড়িয়ে ওদের খাওয়ায়। কাকেদের তৃপ্তি খরিদ্দার ডেকে আনে, কথাটা পাঁচু ময়রা বলত। তখন হারানের এই দোকান হয় নি। সে পাঁচু ময়রার হাতের কাজ করত। কাচের পাল্লা সরিয়ে দুটো গজা নিয়ে হারান হাতের মুঠোয় চাপ দিয়ে ভাঙল, ভেঙে টুকরো টুকরো করল। সময়ে কাকেরা কাছাকাছি পা ফেলেছে। দূরে কাননদের দেখে, পাঁচু ময়রার কালো দাঁতের ফাঁক দিয়ে যেমন হাঁটু-ভাঙা শব্দ গড়ায় তেমনি, মুখভঙ্গি করল হারান। ধনঞ্জয়ের ছেলেমেয়ে দুটো ভোর না হতেই এসেছে। নিতাইকে সব সময় চোখে

চোখে রাখতে হয়। হারান লক্ষ্য করেছে, ওদের ওপর নিতাই-এর দুর্বলতা আছে। স্কুলে নিতাই কাননের সহপাঠী ছিল। ওদের জন্য নিতাই হাতটান শুরু করতে পারে। "আকালে মমত্ব কথা বলে না, স্বামী-গরবিনী লক্ষ্মী ঠাকরুনের বিধবা হতে বুক কাঁপে"; পাঁচু ময়রার সব কথার অর্থ হারান জানে না; অথচ আবৃত্তি করতে ভালো লাগে। হারান টুকরো টুকরো গজা মাটিতে ছড়াল।

শুধু মাটি পদ্মর যেন কেমন লাগছিল। গলা দিয়ে নামে না। নন্দর মেয়ে চম্পা—সেই চম্পার অন্নপ্রাশনে ঘাসের শাক-চচ্চড়ি রেঁধেছিল নন্দ—পদ্মর মুখে এখনো স্বাদ আছে। গতমাসে শহর থেকে নন্দর বাবা চম্পাকে নিয়ে আসে, সঙ্গে একরাশ হাঁড়ি কলসি কড়াই উনুন ইত্যাদি—নন্দর সংসার। তখন থেকে নন্দ পাকা গিন্নীর মতন রান্না করে। মা হয়ে দেখতে দেখতে নন্দ পদ্মর থেকে অনেক বড় হয়ে গেল। নন্দর কাছ থেকে কিছু জানবার জন্য সময়ে সময়ে পদ্ম বড় অস্থির হয়।

দুহাতে ঘাসের চাঙড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে পদ্ম বলল, দাদা, দু-একটা দুর্বা খাব? শাক-চচ্চড়ি?

কানন উত্তর দিল না। কাকেদের দেখছিল, হারান এবং নিতাইকে দেখছিল। সদরঘাট ক্রমশ সরব হচ্ছে। সকালের পরিচ্ছন্নতা কর্পূরের মতন হাওয়ায় উড়ছে। ওদিকে পানুকাকা পানবিড়ি দোকানের ঝাঁপ তুলল। দু-একটা সাইকেল-রিক্সার মন্থর গতি। ময়লা গায় মেখে কুকুরটা লেজ চাটছে। কাকেরা একে একে শূন্যে ভাসছে। নিতাই উনুনে কয়লা সাজিয়ে আগুন দিল। হারান জিলিপি ভাজবার জন্য আটা ফেনাচ্ছে। আটা দিয়ে জিলিপি ভালো হয় না—কালচে রঙ। সেদিন হারানের প্রখর দৃষ্টি চুরি করে নিতাই কাননকে একটা জিলিপি দিয়েছিল। কানন জিলিপির পরিচিত স্বাদ পায় নি।

দাঁতে একদলা মাটি ভাঙতে ভাঙতে পদ্ম বলল, দাদা, মাটির জন্ম কিসে?

মাটিতে।

পদ্ম একগুচ্ছ ঘাস মুখে দিল, ধান্যের?

মাটিতে।

ক-মুহূর্ত চিন্তা করল পদ্ম। চোখের মণি ঘুরিয়ে কৌতুকে শিশু-সরল হাসল, বল তো বৃষ্টির মা কে?

মেঘ।

ছি-ছি। পদ্মর দু-হাতের মুদ্রায় দোলা দেওয়ার ভঙ্গি, এদিক-ওদিক দোলনা দোলে। দোদুল দোদুল কোলের খোকন। খোকন খোকন সোনামণি। দাদা, আমাকে একটা খোকন দিবি? নন্দর আছে। খোকনকে কোলে নিয়ে দোল দেবো। ঠিক এমনি করে,—পদ্ম শরীর দোলায়,—দোল দোল, আমার খোকন দোলে। খোকন খোকন সোনামণি। দাদা, আমি মা হব।

কাঁনন হাসল। ছেলেমানুষ বোন। পদ্ম আমার মায়ের মতন—টানা চোখ, টিকল নাক, পাতলা ঠোঁট, গায়ের রঙটি পর্যন্ত। পদ্ম কাছে থাকলে মা-জননী অনেক কাছাকাছি।

পদ্ম গিন্নীর মতন হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলল, আমি কিন্তু খোকনের বাবা চাই না। সাত ঝামেলা। বদরাগী বাবা বড় দুষ্টু। মাকে গালাগাল দেয়, মারে। মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। ওহো, আমার বড় কষ্ট হয়।

দুখিনী মার কথা ভেবে কানন কষ্ট পাচ্ছিল। প্রায় রাত্রেই বাবার লাথি খেয়ে মা ককিয়ে উঠত। মাকে কখনো সুখী মনে হয় নি। অতৃপ্তি এবং বিষাদের প্রতিমূর্তি মা। অধিকন্তু, অনাহারের দীর্ঘ দিনগুলো ছিল—যে-কারণে মা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। মা চলে যাওয়ার পর কানন বোনকে আগলে আগলে রাখছে। একটা মাত্র বোন—মায়ের মতন। এখনো ভালো করে চন্দ্র-সূর্য দেখে নি। সূর্যিমামা দেয় আলো, চন্দ্র দেয় স্নেহ ; অথচ আলোয় পেট ভরে না, স্নেহের স্বাদে ক্ষুধা মরে না। ধান্য দেয় না কেউ, দেশে ধান্যের বড় হাহাকার।

দাদা, ধান্যের মা কে ?

ধরিত্রী।

ধরিত্রীর মা কে ?

মা-জননী।

ধরিত্রীর মা মা-জননী, আমার মা মা-জননী। পদ্মর কান্না-কান্না ভাব, মা-জননীরা যেন আর ফিরবে না।

মার জন্য কাল সারারাত পদ্ম কেঁদেছে। ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল। বোনকে বুকে নিয়ে কাননের ঘুম হয় নি। উপরন্তু, বাবার জন্য ভয়। হুট্ করে কখন এসে মাতাল বাপ কি করে তার ঠিক নেই। হয়তো বাতাবি লেবু নিয়ে খেলার ছলে লাথালাথি খেলবে, যেমন মাঝরাতে মা ঘরের এককোণ-ওকোণ গড়াগড়ি যেত। সেই মা আর ফিরবে না, ফিরতে পারে না—কাননের

পদ্ম ভেঙে পড়বে। পদ্ম আশায় আশায় দিন গুনছে। কানন বোনকে বুকে নিল, আমরা মা-জননীর কাছে যাব। মা-জননীকে ফিরিয়ে আনব।

ইতিমধ্যে ঘাটের খেয়ানৌকায় মাঝি এসেছে। এপার-ওপার লোক যাতায়াত। পারানি তিন পয়সা। মাঝি পয়সা দেখে, এক দুই তিন··· একটাকা। আহ্, মনুষ্যজাত কপালগুণে গরু-বাছুর নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পারঘাটে নৌকা ভিড়াও। লগি ডুবিয়ে এক বাঁও দুই বাঁও জল। হাতের কড়ি সময়ে গড়ায়।

পদ্মর কষ্ট হচ্ছিল। অন্ননালীতে মাটি আটকেছে, বুকের ভিতর অস্বস্তি। গলা শুকিয়ে কাঠ। চোখে খরতাপ—গ্রাম-বাঙলার বকের-পা মাঠের প্রতিচ্ছবি। গলায় বুকে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পদ্ম মাটি নামাতে চেষ্টা করতে লাগল।

কানন বোনকে দেখল, জল খাবি? গঙ্গাজল? ভগীরথের পুণ্যে গঙ্গা ধন্য।

ভাগীরথীর উঁচু পাড়। জোয়ারের জল সরে গিয়ে এখন থলথলে কাদা। মাঝি জলে লগি ডুবিয়ে নৌকা ঠেলছে। মানুষের ভিড়ে নৌকা বেসামাল। এ-সময় হন্তদন্ত কতকজন পারঘাটে এসে ডাকতে থাকল, মাঝি হে মাঝি, নৌকা ফেরাও। পারাপার করো হে মাঝি।

অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে দ্রুত ওপরে উঠল কানন। পদ্ম তখনো গলায় বুকে হাত বুলাচ্ছে। শ্বাস বন্ধ হওয়া ভাব। কানন পদ্মর মুখে জল দিল। বলল, পুণ্যের জল নে, মাটি ভিজবে।

বিন্দুশঃ জলে মাটি ভিজল। ভেজা মাটি কাদা কাদা। অন্ননালী দিয়ে নরম মাটি নামলে পদ্ম স্বস্তি পেল। আঃ! দাদা থাকলে কোনো কষ্ট নেই। মায়ের অভাবে দাদা আছে। কিন্তু, পদ্ম ভাবল, মার কথা ভোলা যায় না। সময়ে সময়ে মা-জননীর জন্য মন উতলা হয়। রাত্রে মার কোল পাওয়ার জন্য মন কাঁদে। মা আর কতদিন ভুলে থাকবে! পদ্ম ঘুমঘুম চোখে দেখেছিল, এক মাথা সিঁদুর সিঁদুর চুল, পায়ে আলতার আলপনা এঁকে মা চলে গেল। সেই যে গেল, আর ফিরল না। আর কতকাল অপেক্ষা করা যায়। বলল, দাদা, মা-জননীকে ফিরিয়ে আনতে যাব না? মা-জননী না থাকলে দুঃখের কাল।

স্টেশনের নিকটে এসে কানন সতর্ক হলো। সঙ্গে বোন পদ্ম আছে। এখানে বাবা থাকতে পারে। কিছু দূরে রেলগাড়ি যাতায়াতের সময় বাবা লোহার গেট নামিয়ে অপরাপর গাড়ি, মানুষজন থামায়। কাল বাবার তাড়ায়

কানন লাইনের ওপর আছড়ে পড়েছিল। হাত-পা ছড়ে গিয়ে রক্তাক্ত। উপরন্তু, চুলের মুঠি ধরে শিরদাঁড়ার ওপর বাবার বজ্রমুষ্টি। কাননের অন্নাভাবে দুর্বল শরীর, ডাক দিয়ে কাঁদার মতন অবস্থা। উত্তপ্ত লাইনের ওপর চকচকে ঘন রোদ্দুর যেন গাঢ় অন্ধকার। চোখের সামনে কালো-জোনাকির চক্কর। কানন নিশ্বাস বন্ধ করে বাবার পা দুটো হাতের নাগালে পাওয়ার চেষ্টা করছিল। শেষে অদম্য প্রতিহিংসাস্পৃহায় পা ধরে এক হেঁচকা টান মেরে কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল। দুহাতে খোয়া-পাথর তুলে ভূ-পতিত বাবাকে লক্ষ্য করে কানন তখন ক্ষিপ্ত, বাবা আছো—বাবা থাকো, কাছে এসো না।...আজ আবার সেরকম কিছু ঘটুক কাননের ইচ্ছা নয়। কেননা, পদ্ম তেমন ছুটতে পারে না। বোন আমার চিররুগ্ন, কচি হাড় মাটিতে গুঁড়িয়ে যাবে।

পদ্মর হাত ধরে কানন লোকের ভিড়ে গা ঢেকে চলল। সঙ্গে টিকিট কিনবার পয়সা নেই। ফাঁকি দিয়ে যেতে হবে। কানন কখনো কোথাও যায় নি। দূরস্থ প্রান্তগুলো কেমন জানা নেই। অথচ অন্য কোথাও চলে যাওয়া প্রয়োজন। অন্য কোথাও না-গেলে পদ্ম বাঁচবে না। সেখানে নিতাইয়ের মতন কোনো কাজ করবে। কাননের স্কুলের কিছু বিদ্যা আছে। কোনো না কোনো অন্নকূটের সন্ধানে থাকবে। বোন পদ্ম কাছে কাছে বড় হবে।

একটা আড়াল দেখে কানন বোনকে নিয়ে বসল। রোদ্দুরে এতটা পথ হেঁটে এসে পদ্ম হাঁপাচ্ছিল। পদ্ম কখনো এদিকে আসে নি। রুপোর পাতের মতন রেললাইন দেখছে। দুহাতে বোনের মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে কানন দূরে রেলগাড়ির ধোঁয়া দেখল।

কৌতূহলে পদ্ম উঠে দাঁড়াল। বাবারে বাবা, বুক কাঁপে; যেন এক বিরাট অজগরের ফোঁস ফোঁস শব্দ। বলল, দাদা, ঝিকঝিক রেলগাড়ি?

কানন হাসল। তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে রেলগাড়ি থামলে বোনের হাত ধরে সামনের কামরায় উঠে জানলার ধার খুঁজে নিল।

মার কাছে যাওয়ার আনন্দে পদ্মর মুখ উজ্জ্বল হলো। কানের পাশে ঝকঝক শব্দ বাতাস কাটছে। হঠাৎ হঠাৎ গাছেরা পিছনে ছুটছে। টেলিগ্রাফ তারে পাখিরা দুলছে। ঝুলন্ত কয়েকটা বাবুই পাখির খড়কুটো দিয়ে তৈরি বাসা দেখে পদ্ম হাততালি দিয়ে গলা ছেড়ে 'পু-উ-উ-উ ঝিকঝিক' গাইতে থাকল।

গেটের সামনে কানন মাথা উঁচু করে এক ঝলক বাতাসের মতন বাবাকে শেষবার দেখল। কয়েকটা গরুর গাড়ি, কিছু লোক—গেটের পাশে দাঁড়িয়ে

বাবা সবুজ পতাকা নাড়াচ্ছে। বাবার উস্কখুস্ক চুল, আধ-খোলা চোখ, বাবাকে রিক্ত এবং নিঃস্ব মনে হলো। কানন ভাবল, সবুজ পতাকা যেন বাবার কাছ থেকে পাওয়া ছাড়পত্র। বাবা ওদের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এবার ওরা অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে।

ঘনবসতি শেষে রেলগাড়ি মাঠে নামলে বিস্তৃত বকের-পা মাঠ চক্রাকারে ঘুরতে থাকল। মাঠের গভীরে সূর্যতাপ যেখানে ঝলমল, সেখানে চাষীদের খোড়োঘর, বাবলার বন এবং একসার ষাঁড়া তালগাছ।

কামরার মধ্যে ফেরিওয়ালাদের চিৎকার, যেন ছোটখাট এক হাট বসেছে। ঝালমুড়ি, বাদাম, শশা—ওদিকে এক ভিক্ষুকের ভাঙা স্বর। এক ফেরিওয়ালা মেঝের ওপর কলের উড়োজাহাজ রাখল। পদ্ম ওদের আকাশে উড়তে দেখেছে। মেঘের গা ঘেঁষে যেন রাজহাঁস হয়ে উড়ে যায়। বিকট শব্দে কানে তালা লাগার মতন। মা বলত, প্রতিদিন ওরা চাঁদ মামার বাড়ি যায়। সেখান থেকে চাঁদের গা কুরে কিছু রঙ নিয়ে আসে। সেই রঙ দিয়ে মায়েরা ভালো খোকাখুকুদের কপালের টিপ দেয়। কতদিন পদ্মর কপালে চাঁদ মামার টিপ দিয়েছে, আর সেই টিপ থাকলে পদ্মর চোখে ঘুম নামত। ···উড়োজাহাজ ছাড়াও হাঁস, মুরগী, পাখি এবং কিছু পুতুল আছে। পেট টিপলে হাঁসগুলো প্যাক প্যাক ডাকে। একটা পুতুল, পদ্মর যেন মনে হলো—কি মজা কি মজা—বড় দস্যি খোকন, একরত্তি ছেলে ছাখো কি রকম চোখ পিটপিট করছে। পদ্ম নড়েচড়ে বসল—ওই খোকনের মা হতে ইচ্ছা করে। সকলকে ডেকে ডেকে দেখাবে। বিকেলে ভালো জামা পরিয়ে কপালে কাজলের টিপ দিয়ে গালভরা চুমু দেবে। ঘুমাতে না চাইলে চাঁদ মামার রঙ আনবে, 'আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা, খোকার ছুচোখে আমার ঘুম দিয়ে যা।' বলল, দাদা, আমাকে ওই খোকন দিবি ?

কানন মনের অতলে দুঃখের দানা তুলছিল। সরল বোন কিছু বোঝে না। বলল, আগে মা-জননীর কাছে যাই, তারপর।

সেখানে পৌঁছে দিবি ? পদ্ম যেন কিছু ভাবল। ফেরিওয়ালার হাতে হাসিখুশি খোকন। গভীর কালো চোখ—পাতা ফেলে ফেলে পদ্মর হৃদয়ের কাছাকাছি হাত রেখেছে। কী দুষ্টু ছেলে বাবা ! হাঁসেরা প্যাক প্যাক ডাকছে, উড়োজাহাজ গোল পথে ঘুরছে। পদ্ম নিচু স্বরে বলল, দাদা, খোকনকে একবার কোলে নেব ? একবার মাত্র ?

তখনো সেই অন্ধ ভিক্ষুক গান গাইছিল। মরা মায়ের মতন ভাবলেশহীন

চোখ, মুখে বসন্তের চিহ্ন। অন্ধ রেলগাড়ির শব্দের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে গাইছে—"ও আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি……"। গানের সুর ক্রমে ক্রমে কাননকে আচ্ছন্ন করছিল। কানন যেন আশ্বিনের মাঠ, বাতাসে কচি কচি ধানশিস দুলছে। এসুরে আবার আমনের ধান থোর নেবে। ঘন দুধের মতন রসে ধান ফুলছে। …পাশে দুখিনী বোন খোকনকে কোলে না-পাওয়ার জন্য কাঁদছে। কাননের দুচোখে ধবল জ্যোৎস্না। বুকের ভিতর তরল সুর টলমল করছে। কানন বোনকে বুকে নিয়ে গাইতে থাকল, "কাননে পদ্ম থাকে, কুসুমে থাকে রেণু" ; নিরন্নের কাল জননী এত দীর্ঘ কেন ?

রেলগাড়ির গতি ক্রমশ শ্লথ হচ্ছিল। মাঠে মাঠে উত্তপ্ত বাতাস, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ঝলসে যায়। একরাশ কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রেলগাড়ি স্থির হলো। কানন মুখ বের করে দেখছিল। দূরের সিগনালে পথ বন্ধ। পরের স্টেশন অস্পষ্ট। কিছু লোক নামল। কালো ধোঁয়া লাইনের পাশে পাশে ছায়া ফেলে উড়ছে।

এ-সময়ে এক টিকিটবাবুকে পাশের কামরা থেকে নামতে দেখে কানন জীবন্ত শম্বের মতন মুখ লুকাল। যদি এই কামরায় ওঠে, তখন ? টিকিট না-নিয়ে রেলগাড়িতে ওঠা অন্যায়। সঙ্গে টিকিট নেই, অনেক কিছু ঘটতে পারে। কাননের লজ্জা এবং ভয় করছিল। ধরা পড়লে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। দারিদ্র্যের কথা বলতে লজ্জা করে। তাহলে বাবার কথা বলতে হয়, মা-জননীর কথা বলতে হয়, বলতে হয় নিরন্নের দিনগুলো স্মরণ করে। কানন তির্যক দৃষ্টিতে দেখল, টিকিটবাবু জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, যেন এই কামরায় উঠবেন।

আয়, এখানে নামব। বোনের হাত ধরল কানন।

ধূ ধূ মাঠে মা-জননী কোথায় ? পদ্ম অবাক হয়ে বলল, মা-জননীর কাছে যাব না ?

যাব, অন্য পথে। বোনকে নিয়ে কানন তাড়াতাড়ি উল্টো দিকে লাফিয়ে নামল।

লাইনের ধারে ধারে বিবর্ণ কয়েকটা বেড়া কলমি। অল্প দূরে এক খেজুর গাছের পাতলা ছায়া। পদ্ম সেই ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে রেলগাড়িকে আবার চলে যেতে দেখল। পদ্মর কষ্ট হচ্ছিল। দাদার মতি স্থির নেই। দাদা কি করে বোঝা ভার। হয়তো মা-জননীর কাছে আর যাওয়া হবে না। এই রেলগাড়িতে গেলে যেন মা-জননীর কাছে যাওয়া যেত।

সামনে পিছনে রোদ্দুরে ঝলসানো যোজনব্যাপী মাঠ। কোনো সাড় নেই, সবুজ গাছ নেই, সব মাটি বালি-বালি। এখানে ওখানে শিয়ালকাঁটা এবং বাবলার চারা মাথা তুলছে। আকাশের গায় মেঘের চাদর নেই, মাঠে মেঘের ছায়া নেই,—রেলগাড়ি ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। কানন প্রার্থনা করল, রেলগাড়ি যেন সব স্টেশনে ওদের খবর পৌঁছে দেয়। যেন মা-জননীর দুঃখের গান গেয়ে পথ চলে—আকাল হয়েছে মাকাল···আকাল হয়েছে··· আকাল হয়েছে···

মাঠ ভেঙে পথ চলতে পদ্মর কষ্ট হচ্ছিল। এবড়ো খেবড়ো শক্ত জমি। পূর্বের আলপথ ভেঙে গেছে। পায়ে পায়ে ব্যথা। হাঁটতে হাঁটতে পদ্ম সাদা বকেদের খুঁজছিল। রোদ্দুরে বকেদের ডানা সোনা-রঙ। এত বক ছিল, অথচ এখন সব বেপাত্তা। পদ্ম হাতের নখ দেখল। নখে বকেদের গায়ের রঙ ছিল,—এখন দেখতে পেল না। সব রঙ জলে গেছে। আশ্চর্য হয়ে বলল, দাদা, বকেদের দেখছি না!

কানন দুঃখের সঙ্গে বলল, সব বিল খানাখন্দের জল শুকিয়ে গেলে বকেরা আকাশে উড়েছে। বকেরা সূর্যের কাছে গেছে। যাওয়ার পথে শত শত বক শূন্যে পা দাপিয়ে সব মাঠ লক্ষ করে কাটা পা ফেলে ফেলে চলে গেছে। এখন সব মাঠ বকের-পা, ফাটাফুটিতে চিত্তির বিত্তির। বকেরা যেন আর কখনো ফিরবে না।

পদ্ম নিশ্চুপ হাঁটছিল। বৃষ্টির মা, আমার মা,—মা-জননীরা যেন আর ফিরবে না। গলার ভিতর দুঃখ শুকিয়ে হাঁপ ধরেছে। পদ্মর হাঁটা-পথ এলোমেলো। চোখের সামনে ছোট্ট খোকনের হাসি-হাসি মুখ। সোনামণিরা বড্ড ভাবায়। দোদুল দোদুল কোলের খোকন, খোকন খোকন সোনামণি। বলল, এখন দুএকটা বীজ-ধান্য পাই না?

কানন আশ্চর্য হয়ে ধূ ধূ মাঠ দেখল। চড়ুই নেই, ঘুঘু নেই,—বীজ-ধান্য কোথায়! ধনধান্যের মা বসুন্ধরা, তোমার ধান্য কোথায়? বলল, কি করবি?

খাব। নৈঃশব্দ্যের ভিতর, উষ্ণ রোদ্দুরের ভিতর, গ্রাম-বাঙলার বকের-পা মাঠ ভাঙতে ভাঙতে উৎসাহে পদ্ম হাসল, পেটে মাটি আছে, ভগীরথের পুণ্য আছে, বীজ-ধান্য ফসল ফলাবে। শালিধান্য গো শালিধান্য, হৈমন্তি আমার মেয়ে,—আমি মা ধরিত্রী।

আমার দেখা লেনিন

মার্টিন অ্যানডারসন নেকসো

উনিশশো বাইশ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে ক্রেমলিনে লেনিনকে একবার মাত্র দেখেছিলাম। তাঁর সারাজীবনের সাধনার সাফল্য, সেই অক্টোবর বিপ্লবের সুমহান তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা তখনও অসম্ভব ছিল। তবে যা ঘটলো, তাতে পুরনো দুনিয়া কেঁপে উঠেছিল বটে, কিন্তু আজকের দিনের মতো বিপ্লবের নামে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠার মতো নয়। পুরনো দুনিয়া মনে করছিল, অক্টোবর বিপ্লব আসলে এক ধরণের বিরাট পরীক্ষাকর্ম: পুঁজিবাদী উৎপাদনে কিছু অসুবিধা ঘটানো আর মুনাফা ছেঁটে দেওয়ার ব্যাপার মাত্র। বিপ্লবকে গলা টিপে যদি সূচনাতেই খুন করা যেতো খুবই ভালো হতো; তবে আপন নিয়মেই তা ধসে পড়তে বাধ্য। বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যেই তখন প্রতিযোগিতায় ব্যতিব্যস্ত, সর্বহারার নতুন রাষ্ট্র তাদের লীলাখেলায় কিছুটা অবশ্য নাক গলিয়েছে। কিন্তু পুরনো দুনিয়ার মৃত্যুঘণ্টা তাদের কানে তখনও বাজছিল না। এমন কি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের হোমরাচোমরারাও বুঝতে পারছিলেন না যে তাঁদেরও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে লেনিনের সারাজীবনের সাধনা; সেই অক্টোবর বিপ্লব প্রতিটি ব্যাপারকেই জড়িয়ে ফেলেছে। মানুষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ই আজ আর লেনিন ও বিপ্লবের সঙ্গে নিসম্পর্কিত নয়। আজকের দুনিয়া জীবন ও মৃত্যুর এই দ্বৈরথে মোচড় খাচ্ছে; আর সেই সংঘর্ষের সূচিমুখেই ভবিষ্যতের অভ্যুদয়। কিন্তু সেদিন লেনিন ছাড়া আর কার চোখে এমন করে ভবিষ্যৎ ধরা পড়েছিল? জার্মান আর স্ক্যান্দিনেভিয়ার মজুর, নিগ্রো, মিশরের 'ফেলাহন', ভারতের 'কুলি'—সারা দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে আগত সেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা আমরা সবাই নতুন দুনিয়া গড়া ও লেনিনের লক্ষ্য বিষয়ে বিশ্বাসী ছিলাম। তিনিই নিশ্চিতভাবে জানতেন যে বিজয় সুনিশ্চিত। পন্থাও তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল।

সেই প্রতিনিধি সম্মেলনে নানা ধরনের বহু ব্যক্তির মধ্যে কুশাগ্রবুদ্ধি মানুষের অভাব ছিল না। কিন্তু লেনিনকে আলাদা করে চোখে পড়ছিল আবার ঐ কারণেই।

সাধারণ মানুষজন বড়ো বড়ো চিন্তাবিদ্‌দের চালচলন বিষয়ে যেমন ধারণা রাখেন, তার ঠিক একেবারে উল্টো ব্যাপার তাঁর সমস্ত আচরণের সেই সরলতায় ধরা পড়ছিল। তাঁর বক্তৃতায় তা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এমন কি যখন মানবজাতির বৃহত্তম সমস্যা এবং বর্তমানের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের অবধারিত ও সুনিশ্চিত ভাবে বিকাশ লাভের কথা বলছিলেন, তখনও তাঁর চিন্তা স্বচ্ছ ও সরলভাবে নির্বাধ বইছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন একটি জীবনে সব মানুষের জীবনই বেঁচেছেন। তিনি দুনিয়ার প্রতিটি দেশের অবস্থাই জানতেন। জানতেন দরিদ্রের অবস্থা আর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কায়দায় শোষণের কথা। জানতেন কেমন ভাবে এসব কায়দা বর্তমান কাল পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে। এও একধরণের বিজ্ঞান, তবে তা বিশিষ্ট এবং ভিন্ন ধরণের বিজ্ঞান। কেতাবি বুকনির কোন গন্ধ আসছিল না তাঁর ভাষণে। জীবনের স্পন্দন তাঁর বক্তৃতায় নন্দিত হচ্ছিল। শিল্প শ্রমিক আর 'কুলি', সেলাই কারখানার মেয়েশ্রমিক আর চৌমাথা ঝাঁট দেওয়া ঝাড়ুদারের ভাগ্যের উপর আলোর ঝলক এসে পড়ছিল। মানব-জাতির ইতিহাস, মানুষের সংস্কৃতি লেনিনের বক্তৃতায় আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

"মানুষের মতো মানুষ!" নরওয়েজিয় এক মজুর আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠলেন, "একেবারে আমাদেরি মতন, কেবল আমাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী তিনি।"

সেই নরওয়েজিয় কমরেডটি আগের দিনই লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। লেনিনকে তিনি নরওয়ের খবরাখবর বলেওছিলেন।

"কিন্তু তিনি আমাদের চেয়ে ঢের বেশি নরওয়ের খবর জানেন। ডেনমার্কের বিষয়েও। মুখের সামনে ঝোলানো মাংসখণ্ডটি ধরার জন্য টানটান শরীর—গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া জিপসিদের কুকুরের উপমায় ডেনমার্কের চাষীদের কথা তাঁর মনে পড়ে। একইরকম ভাবে আপনার দেশের চাষী, চাষীবৌ আর তাদের কাচ্চাবাচ্চারা পুঁজিপতিদের জন্য টানটান হয়ে আপ্রাণ কাজ করে চলেছে। তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে, তারা হলো ক্ষুদে জমিদার—লেনিনের ভাষায় 'ছোট মাপের ভূস্বামী'।

লেনিনের অবয়ব, তাঁর সারল্য, সব কিছুই দেখিয়ে দিচ্ছিল যে তিনি হলেন নতুন যুগের মানুষ। অতি সাধারণ মানুষও তাঁর সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারবে,

শতাব্দীতে একবার, সম্ভবত হাজার বছরে বারেক এমন এক অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব হয়। আর এই অসাধারণ মানুষটি তাঁর হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বলেছিলেন, "নিজের কথা কিছু বলুন, আপনার নিজের জীবনের কথা।"

অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে যিনি ছিলেন অনেক বেশি তীক্ষ্ণধী, সেই লেনিন মন দিয়ে অনামা সাধারণ মানুষের গলার স্বর আর হৃদস্পন্দন কান পেতে শুনতেন। তাদের কাছে তিনি শিক্ষা নিতেন, সেই অতি অবজ্ঞাত মানুষগুলি ও তাদের সমস্যার তিনি উত্তরণ ঘটাতেন, বুঝিয়ে দিতেন সেই সাধারণ মানুষজন আর তাদেরই কাজ এই জীবনকে ধারণ করে আছে। এ যেন শতাব্দীভোর একঘেয়ে পৌনঃপৌনিক জীবনধারার পুরস্কারস্বরূপ। সাধারণ মানুষ তাদের চোখের সামনে এমন একজনকে দেখছে, যিনি তাদের সব কিছুই নথাগ্রে রেখেছেন।

আর সে জন্যই শ্রমিকের হৃদয়ে বিশেষ আসনে লেনিনের স্থান। হাজার কালির দাগ বা নিন্দা তাঁকে কালিমালিপ্ত করতে পারবে না। লেনিনের নাম শুনলে সবার পিছে সবার নীচে যে মানুষ তারও চোখ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে জ্বল জ্বল করে ওঠে।

অনুবাদ : শুভব্রত রায়

ডেনমার্কের বিখ্যাত লেখক ও কমিউনিস্ট মার্টিন অ্যান্ডারসন নেকসো (১৮৬৯—১৯৫৪) উনিশশো বাইশ সালের শরৎকালে মস্কোতে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন বীরত্বের সঙ্গে। শেষ জীবনে নেকসো গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের অধিবাসী ছিলেন। লেনিন এবং নেকসোর শতবার্ষিকী উপলক্ষে লেনিনের বিষয়ে নেকসোর রচনাটি প্রকাশ করা হলো। —সম্পাদক

একেন্দ্রনাথ ঘোষ ও বাঙলা সাহিত্য

দেবজ্যোতি দাশ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞান-চর্চার আন্দোলন ধীরে ধীরে এদেশে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যে অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীর হাতে বিজ্ঞান সাধনার সামর্থ্য ও সুযোগ ধরা দিল, তাঁদের অনেকে নবলব্ধ জ্ঞানকে জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজকে অবশ্যকর্তব্য বলে গ্রহণ করলেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজন অনুভূত হল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক ধারাগুলি মুখ্যত পাশ্চাত্যের গবেষকদের সাধনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রচলিত সংজ্ঞা ও অভিধাগুলি প্রায়ই কেবল প্রতীচ্যের ভাষাতেই গঠিত হয়েছিল; দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় এসব অভিধার উপযুক্ত ভাষান্তরসাধন অবশ্যকরণীয় হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বিজ্ঞান-সাহিত্যের এই আন্দোলনে একেন্দ্রনাথ ঘোষ অন্যতম উদ্যোগী কর্মী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সাহিত্যের জগতে তাঁর মুখ্য প্রয়াসগুলি সুসম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, ফলে সাহিত্য ও জনশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে তিনি অনেক পরিমাণেই বঞ্চিত হন।

একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষকে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ-ভাবেই নিজের প্রতিভা, কর্মশক্তি ও নিষ্ঠার ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল; তাঁর অবদানের সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর নিজেরই প্রাপ্য। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষ; চিত্তের সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশে এবং জ্ঞানের অনুশীলনে মনস্বিতার পরিচয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সামান্যোত্তর বিদ্যাপথযাত্রীদের পরিশীলিত সহচারী।

একেন্দ্রনাথের সঠিক জন্মতারিখ জানা যায় না, তবে 'প্রকৃতি' নামে দ্বি-মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত শোকসংবাদসূচক প্রবন্ধে তাঁর মৃত্যু ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর তারিখে এবং বয়স ৫২ বৎসর হয়েছিল

বলে উল্লেখ পাওয়া যায়(১); তার থেকে হিসাব করে তাঁর সম্ভাব্য জন্ম-বৎসর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ (১২৮৯ বঙ্গাব্দ) হতে পারে বলে মনে হয়। কলকাতার কেশব অ্যাকাডেমি থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র হিসাবে তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন এবং তুলনাত্মক ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ও পশুবিজ্ঞানে স্বর্ণপদক লাভ করে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এম. বি. পরীক্ষায় সফল হন। কর্মজীবনে প্রথম কিছুকাল একেন্দ্রনাথ মেডিক্যাল কলেজে সহকারী চিকিৎসক ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ কলেজের নবপ্রতিষ্ঠিত প্রাণিবিদ্যা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে প্রাণিবিদ্যার উচ্চতর শিক্ষায় তাঁর আগ্রহ জন্মায় এবং ঐ বিষয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অন্যদিকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম. ডি. পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে একেন্দ্রনাথ মেডিক্যাল কলেজে জীববিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন; এ পদে তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয়। ১৯১৭ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বেলগাছিয়ায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনার বেসরকারী উদ্যোগে একেন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কলেজটির প্রতিষ্ঠা থেকেই তিনি সেখানেও প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনা করতে থাকেন। প্রাণিবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ওরিয়েন্টাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগেও অধ্যাপনার ভার দেওয়া হয়। কলকাতার জুঅলজিক্যাল গার্ডেন-এর কার্যনির্বাহক সমিতির তিনি অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন (১ক)। প্রাণি-

১. প্রকৃতি, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা

১ক: প্রকৃতি, ১৩৪১, ৪র্থ সংখ্যা

বিদ্যায় তাঁর গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে ইংল্যাণ্ডের জুঅলজিক্যাল সোসাইটি তাঁকে 'ফেলো' নির্বাচিত করেন (১খ)।

প্রাণিবিদ্যা ব্যতীত উদ্ভিদবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, ভেষজবিদ্যা, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ছিল। সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্যে তাঁর ব্যক্তিগত পুস্তকসংগ্রহ অসাধারণ ছিল; তার মধ্যে বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের সংগ্রহ ছিল সবিশেষ উল্লেখের যোগ্য। পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করে তাদের পাঠোদ্ধার, কালনির্ণয় ইত্যাদি কাজও তিনি অল্পাধিক করেছিলেন। প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থে বিবৃত নানা ভেষজের বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন সম্বন্ধে তিনি বহু বিচার-বিশ্লেষণ করেন। পুরাণ ও বেদের উক্তি থেকে প্রাণীর নাম সংগ্রহ করে তার সঠিক পরিচয় নির্ধারণ, বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখিত নানা বিষয়ের সূচী প্রণয়ন, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রয়োগ সম্বন্ধে তথ্য সংকলন, হিন্দু জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক বিদ্যার সম্ভাব্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ইত্যাদি বহুতর জ্ঞানানুশীলনে তাঁর উদ্যম ও অবদান অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারে।

মেডিক্যাল কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময়েই একেন্দ্রনাথ উদ্ভিদবিদ্যার বিদেশী শব্দগুলির পরিভাষা সংকলন করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উৎসাহে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হন। ক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিভিন্ন সময়ে একেন্দ্রনাথ পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য (১৩২৮-৩৪, ১৩৩৭-৩৯), বিজ্ঞান শাখার আহ্বায়ক (১৩৩৩), সহ-সম্পাদক (১৩৩৫-৩৬) এবং বিজ্ঞান শাখার সভাপতির (১৩৩৯) পদে বৃত হন। সহ-সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত. থাকার সময়ে, বিশেষত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের কার্যালয় পরিচালনার সকল ভারই তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল(২)। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে পরিষদ বিভিন্ন বিজ্ঞান-বিষয়ে বিদেশী শব্দের হিন্দী ও বাঙলা পরিভাষা সংকলনের সংকল্প করেন এবং একেন্দ্রের ওপর জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার

১খ. অমিয়কুমার মজুমদার, 'একেন্দ্রনাথ ঘোষ,' ভারতকোষ, ২য় খণ্ড, ১৩৭৩

২. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষট্‌ত্রিংশ সাংবাৎসরিক কার্য্য বিবরণ, পৃ-৯

পরিভাষা প্রণয়নের ভার অর্পণ করা হয়(৩)। অচিরেই তাঁর প্রণীত কোষবিজ্ঞানের পরিভাষা (১০০ শব্দ) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়(৪)। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনের জন্য ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে গঠিত উদ্ভিদতত্ত্ব-সমিতি, পদার্থতত্ত্ব-গণিত-জ্যোতিষ সমিতি এবং প্রাণিতত্ত্ব-সমিতিরও একেন্দ্রনাথ অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন(৫) ; অবশ্য পরিষৎ-পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত গণিতের পরিভাষা ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শেষোক্ত পরিকল্পনাটি অসম্পূর্ণই থেকে যায়(৬)। প্রত্নবিদ্যা ও ইতিহাসের আলোচনায় উৎসাহী একেন্দ্রনাথ নিজের সংগৃহীত কিছু প্রস্তরমূর্তি ও প্রাচীন মুদ্রা পরিষদে দান করেন (১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ম মাসিক অধিবেশন)।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁর লিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির তালিকা দেওয়া হল :

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার সংখ্যা
উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা	১৭শ বর্ষ ২য় সংখ্যা
নিদানোক্ত কতকগুলি আয়ুর্বেদীয় শব্দের পরিভাষা	১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
উদ্ভিদে গৌণকোষ-বিদারণ-(Karyokinesis) শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	২১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা : (১) কোষবিজ্ঞান (Cytology)	৩১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা
আমাদিগের অয়নাংশ	৩১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ	৩৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

৩. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তবিংশ সাংবাৎসরিক কার্য্য বিবরণ, পৃ-১১

৪. 'প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা : (১) কোষবিজ্ঞান (cytology)', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

৫. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চত্রিংশ সাংবাৎসরিক কার্য্যবিবরণ : পরিশিষ্ট, পৃ-৩৪

৬. 'গণিতের পরিভাষা', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪২শ বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যা

ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায়	৩৩শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার	৩৫শ বর্ষ ২য় সংখ্যা
কঙ্কেলি পুষ্প প্রবন্ধের আলোচনা	৩৫শ বর্ষ ২য় সংখ্যা
ঋগ্বেদের অশ্বদেবতা	৩৬শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

পরিষদের বিভিন্ন মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনে তাঁর লিখিত যে সব প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল তার মধ্যে আছে :

প্রবন্ধের নাম	প্রবন্ধ পাঠের তারিখ
উদ্ভিদে গৌণকোষবিদারণ-শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	১৩২১,১৪ চৈত্র
প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা :	
(১) কোষবিজ্ঞান	১৩৩০, ৬ আশ্বিন
আমাদিগের অয়নাংশ	১৩৩০,১৩ আশ্বিন
বঙ্গীয় মৎস্যের তালিকা	১৩৩১, ৬ পৌষ
বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার	১৩৩৫,৩১ ভাদ্র
বনওয়ারিলাল চৌধুরী	১৩৩৭,১৯ চৈত্র

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, একেন্দ্রনাথেরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিষদের ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২১ ফাল্গুন তারিখের অধিবেশনে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 'মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১৬-১৭ চৈত্র তারিখে হাওড়া জেলার মাজু গ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৮শ অধিবেশনে (মূল সভাপতি—দীনেশচন্দ্র সেন) একেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানশাখার সভাপতিপদে বৃত হন। সভাপতির অভিভাষণে(৭) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নানা জাতের প্রাণীর উল্লেখ ও বর্ণনা, ইংরেজ শাসনকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাণিবিদ্যাচর্চা ও প্রাণিবর্ণনার সূচনা, জীববিজ্ঞানী

৭. বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন : অষ্টাদশ অধিবেশন : মাজু-হাওড়া : কার্য্যবিবরণী, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

লিনিয়াসের রচনায় প্রাসঙ্গিক ভারতীয় প্রাণীর উদাহরণ, হ্যামিলটন-বুকানন, রাসেল, ফ্রেয়ার, ডে ইত্যাদি বিদেশী বিজ্ঞানীর গ্রন্থে বিভিন্ন ভারতীয় প্রাণীর দেশীয় নামের যথাসম্ভব উল্লেখ, বহু খণ্ডে প্রকাশিত 'ফনা অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ভারত উপমহাদেশের প্রাণিকুলের বিশদ ও বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের 'রেকর্ডস অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম' নামে প্রকাশনে নেলসন অ্যানাণ্ডেল প্রমুখ গবেষকদের লিখিত এদেশীয় নানা প্রাণীর সমীক্ষা, সুন্দরলাল হোরা দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায় সত্যচরণ লাহা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাণিবিজ্ঞানীর গবেষণা ও গ্রন্থরচনা ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে একেন্দ্রনাথ ভারতে প্রাণিবিদ্যার বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস বিবৃত করেন। তাঁর অভিভাষণে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্য নানাপ্রকার প্রাণীর উল্লেখ করা হয় এবং বিশদ আলোচনার জন্য বিভিন্ন আকর গ্রন্থেরও নাম দেওয়া হয়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা দেশের প্রাণিকুল সম্বন্ধে তথ্যের অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একেন্দ্রনাথ এদেশের প্রাণিবিদ্‌দের এবিষয়ের চর্চায় অগ্রণী হতে আহ্বান করেন। সভাপতির অভিভাষণ ছাড়া একেন্দ্রনাথ ঐ সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখায় 'ঋগ্বেদের অশ্বদেবতা' নামে একটি প্রবন্ধও পাঠ করেন (১৩৩৫, ১৭ চৈত্র); প্রবন্ধটি পরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়(৮)। এই প্রবন্ধে ঋগ্বেদে উল্লেখিত দধিক্রা, তার্ক্ষ্য, পৈদ্ব ও এতশ, এই ৪টি অশ্বদেবতার ভৌতিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে বর্ণিত বেগবান পক্ষধর অশ্বরূপী দধিক্রাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সূর্য, অগ্নি বা পার্থিব ঘোড়া বলে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু একেন্দ্র প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা এ সকল মত খণ্ডন করে দধিক্রাকে অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রতিবেশী 'পেগাসিয়াস' নামে তারকাপুঞ্জ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন; যুদ্ধজয়ী বলবান অশ্বরূপে বর্ণিত তার্ক্ষ্যকে সায়ন তৃক্ষের পুত্র, ম্যাকডোনেল অশ্বরূপী সূর্য এবং ফফ্‌ তৃক্ষির ঘোড়া বলে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু একেন্দ্রের মতে তার্ক্ষ্য পার্থিব অশ্বমাত্র; ঋগ্বেদে পেদুর অশ্ব বলে বর্ণিত দীপ্তিমান, শত্রুঘাতী, সেচনসমর্থ পৈদ্বকে পাশ্চাত্যমতে সূর্যের

৮. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৬শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

অশ্ব মনে করা হয়েছে, কিন্তু সেচনশক্তি ও দীপ্তির উল্লেখ থেকে একেন্দ্রনাথ তাকে 'পেগাসিয়াস' তারকাপুঞ্জ বলেই সনাক্ত করেছেন ; দ্রুতগামী এতশ ও সূর্যের যুদ্ধে ইন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বর্ণনা পাওয়া যায় এবং ম্যাকডোনেল এতশকে সূর্যের অশ্ব বলে মনে করেছেন, কিন্তু একেন্দ্রের বিচারে—

"এতশ কাল্পনিক মধ্য-সূর্য্য (mean sun) এবং আমাদের সূর্য্য প্রত্যক্ষ সূর্য্য (true or apparent sun)।···এক বৎসরে মধ্যসূর্য্য এবং প্রত্যক্ষ-সূর্য্য চারিবার একত্র মিলিত হন।···মধ্য ও প্রত্যক্ষসূর্য্যের মিলনকে 'এতশ এবং সূর্য্যের যুদ্ধ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মিলন উত্তর অয়নান্তের সন্নিকটে সংঘটিত হইত বলিয়া এতশ ও সূর্য্যের যুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তার কথার অবতারণা হইল।"

প্রবন্ধটিতে বৈদিক সাহিত্য ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে একেন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞান সুপরিস্ফুট। ম্যাকডোনেল আদি প্রথিতযশা বেদবিদের মতবাদের বিরোধিতা ও খণ্ডন তাঁর নিখুঁত শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তির পরিচায়ক। এতশ ও সূর্যের যুদ্ধসংক্রান্ত কাহিনী ইতঃপূর্বে বহু পণ্ডিতকেই বিভ্রান্ত করেছিল ; ঐ বিষয়ে একেন্দ্রের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সমস্যা সমাধানের নূতন পথ প্রদর্শন করল।

বিভিন্ন সমকালীন পত্রিকায় একেন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছিলেন ; এর কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার নাম ও সংখ্যা
প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা	প্রকৃতি ; ১৩৩১, ১ম সংখ্যা-১৩৩৫, ১ম সংখ্যা
সূক্ষ্ম-গঠনাবলম্বনে উদ্ভিদের পরিচয়	প্রকৃতি ; ১৩৩১, ১ম সংখ্যা-১৩৩২, ৪র্থ সংখ্যা
বাঙলার মৎস্যপরিচয় (বাঙলার মৎস্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়)	প্রকৃতি ; ১৩৩২, ২য় সংখ্যা-১৩৩৬, ২য় সংখ্যা
কয়েকটি মৎস্যের সম্বন্ধে নিবেদন	প্রকৃতি ; ১৩৩৪, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
কাঁকড়ার চিৎ সাঁতার	প্রকৃতি ; ১৩৩৫, ২য় সংখ্যা

সুশ্রুত সংহিতা ও অষ্টাঙ্গ সংগ্রহে কথিত সর্পপরিচয়	প্রকৃতি ; ১৩৩৬, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
সুশ্রুতবর্ণিত জলৌকার বৈজ্ঞানিক নামনির্ণয়	প্রকৃতি ; ১৩৩৬, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
বাঙলার সাধারণ সর্পসমূহের বৈজ্ঞানিক নাম	প্রকৃতি ; ১৩৩৭, ২য় সংখ্যা
সুশ্রুত সংহিতায় কথিত কয়েকপ্রকার প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম	প্রকৃতি ; ১৩৩৮, ২য় সংখ্যা
কতকগুলি পতঙ্গের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক নাম	প্রকৃতি ; ১৩৩৮, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জীববিদ্যার পরিভাষা	প্রকৃতি ; ১৩৩৮, ৫ম সংখ্যা
বাঙলার মৎস্যগুলির বৈজ্ঞানিক নাম	প্রকৃতি ; ১৩৩৯, ১ম সংখ্যা-৪র্থ সংখ্যা
চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় কথিত কয়েকটি পশুর পরিচয়	প্রকৃতি ; ১৩৩৯, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা
বৈদিক সাহিত্যে উদ্ভিদের কথা	প্রকৃতি ; ১৩৪০, ১ম-৩য় সংখ্যা
জীববিজ্ঞান	পথ ; ১৩৩৮, আষাঢ়
বাঙলার প্রাণিসঙ্ঘ	সুবর্ণবণিক সমাচার, ১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ

মূলত প্রাণিবিজ্ঞানী হলেও বৈদিক সাহিত্য ও জ্যোতিষশাস্ত্রে একেন্দ্রনাথের অধিকারের পরিচয় তাঁর লিখিত 'ঋগ্বেদের অশ্বদেবতা,' 'বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার,' 'বৈদিক সাহিত্যে উদ্ভিদের কথা' এবং 'আমাদিগের অয়নাংশ' প্রবন্ধে সুপ্রমাণিত। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি উপরে আলোচিত হয়েছে। 'বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার' প্রবন্ধটিতে(৯) বেদ ও পুরাণে আলোচিত শিশুমার বা শুশুকের আকৃতির এক নক্ষত্রমণ্ডলীর সংস্থান সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে তৈত্তিরীয় আরণ্যক, বিষ্ণু পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ,

৯. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৫শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

বায়ুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের নানা উল্লেখ থেকে বিশাল শিশুমার নক্ষত্রপুঞ্জের পুচ্ছে ধ্রুবতারা, উদরে আকাশগঙ্গা, পায়ে আর্দ্রা ও অশ্লেষা, কটিদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতির অবস্থান এবং সমগ্র উত্তরখগোলে তার বিস্তৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত শিশুমারের অঙ্গসংস্থানের তালিকা সন্নিবেশ করে প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে ভাগবত ও পুরাণে শিশুমারের অধিকাংশ অঙ্গের স্থানে তারকার এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবতার নাম উল্লেখিত হয়েছে ; ঐ দেবতাদের নক্ষত্র হিসাবে সনাক্তকরণের চেষ্টাও প্রবন্ধটিতে করা হয়েছে। কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত—শিশুমারই লঘু সপ্তর্ষি (আর্সা মাইনর) নক্ষত্রমণ্ডল এবং ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত—শিশুমার ও ভাস্করাচার্যের বর্ণিত ধ্রুবমৎস্য একই নক্ষত্রপুঞ্জ, এই উভয় মতই আলোচনা ও বিচারের দ্বারা একেন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন এবং শিশুমারের সঠিক আকৃতি ও সংস্থান নির্দেশের অসম্ভাব্যতা বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে লঘু সপ্তর্ষির অপর নাম শিশুমার ; কিন্তু পৌরাণিক শিশুমার ও লঘু সপ্তর্ষি যে ভিন্ন সে বিষয়ে একেন্দ্রনাথের বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রবন্ধটিতে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি, সে সকল গ্রন্থের বক্তব্যের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এবং আধুনিক জ্যোতিষের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস প্রাচীন সাহিত্য ও জ্যোতিষে একেন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে 'আমাদিগের অয়নাংশ' প্রবন্ধটিরও(১০) উল্লেখ করতে হয়। সেই প্রবন্ধে সূর্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত প্রভৃতি হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থ থেকে উদাহরণ ও অনুবাদসহ উদ্ধৃতির সাহায্যে হিন্দুদের অয়নাংশ এবং তার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সাহায্যে অয়নাংশের মূলতত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করা হয়েছে এবং পাশ্চাত্য মতানুযায়ী বিশুদ্ধভাবে অয়নাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক এই আলোচনাটি প্রাচীন হিন্দু মতের নির্ভুলতার সমর্থক। 'বৈদিক সাহিত্যে উদ্ভিদের কথা' প্রবন্ধে(১১) কিন্তু আলোচ্য বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঋগ্বেদ,

১০. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

১১. প্রকৃতি, ১৩৪০, ১ম-৩য় সংখ্যা

অথর্ববেদ, শুক্ল যজুর্বেদ, বাজসনেয়ি সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থে ব্যবহৃত বৃক্ষ, বনস্পতি, বানস্পত্য, বীরুধ, ওষধি, সস প্রভৃতি শব্দের সঠিক অর্থ নিয়ে প্রবন্ধটিতে বিচার করা হয়েছে, এসব বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদের স্তুতি, বর্ণনা, ব্যবহার ও উপকারিতার উল্লেখ সম্বন্ধে এবং স্কন্ধ, শাখা, পত্র, তূল ইত্যাদি বৃক্ষাংশের বিবরণ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রবন্ধটিতে বৈদিক সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ১৩০টি উদ্ভিদের এক বর্ণানুক্রমিক তালিকা দিয়ে নানা আকর গ্রন্থের বর্ণনার সাহায্যে তাদের সনাক্তকরণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সম্ভবমত বৈজ্ঞানিক নামও উল্লেখ করা হয়েছে ; তালিকাভুক্ত উদ্ভিদগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটির নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া হল : অংশু, অনু, অর্ক, অশ্বগন্ধা, আম্র, উডুম্বর, কর্কন্ধ, কুল্মাষ, গোধূম, নগ্রোধ, পীলু, মঞ্জিষ্ঠা, শফক, শ্যামক, স্রেকপর্ণ ও হরিদ্রু। বেদ ও বিজ্ঞানের সুসমন্বয়ে এ ধরনের আলোচনা বাঙলা ভাষায় বিরল। লেখকের মননের বৃত্তে দুই বিসমধর্মী বিদ্যার অনায়াস সামীপ্য এবং পরস্পর সম্পূরণ প্রজ্ঞার গভীরতা ও চিন্তার স্বচ্ছতার পরিচায়ক।

বৈদিক সাহিত্যে তাঁর অধিকারের নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে তিনি বৈদিক সাহিত্য থেকে একটি সূচী (ইনডেকস) প্রণয়ন করেছিলেন ; এ কথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত শোকসভায় (১৩৪১, ৫ ফাল্গুন) নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ব্যক্ত করেছিলেন। এ ছাড়া বেদের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সংকলন ও প্রকাশের কাজেও একেন্দ্রনাথ ব্রতী হয়েছিলেন ; এ সম্বন্ধে 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রকাশিত শোকসংবাদসূচক প্রবন্ধে(১২) লেখা হয়েছে :

"সম্প্রতি বেদ সহজলভ্য ও সহজপাঠ্য করিবার উদ্দেশ্যে তিনি উহার একটি সরল এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করিতেছিলেন ;...কার্যটি তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।"

বিদেশের বিজ্ঞানকে স্বদেশের সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করার আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন বলেই একেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবনের সূচনা থেকেই বিজ্ঞানের পরিভাষা রচনা ও সংকলনে উৎসাহী হন।

---

১২. প্রকৃতি, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা

ধানোক্ত কতকগুলি আয়ুর্বেদীয় শব্দের পরিভাষা' প্রবন্ধে(১৩) তিনি ৩৭৪টি ুর্বেদীয় শব্দের ইংরেজী পরিভাষার তালিকা প্রকাশ করেন ; তার মধ্যে কটি পূর্বে প্রকাশিত অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। তাঁর এই ষ্টার ফলে একদিকে আয়ুর্বেদে উল্লেখিত রোগ বা উপসর্গগুলি আধুনিক ৎসাবিদ্যায় বর্ণিত পীড়া ও লক্ষণের সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ বৃদ্ধি পায়, দিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞানকে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে রণ্যে সমর্পণ করার পথ সুগম হয়। তাঁর প্রদত্ত পারিভাষিক শব্দগুলির কটি উদাহরণ এবং ঐ শব্দগুলিরই গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত ভাষা(১৪) এই প্রবন্ধে একটি তালিকায় দেওয়া হল। উল্লেখযোগ্য যে ৫০ বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলিত পরিভাষায় একেন্দ্র-থর তালিকার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ শব্দেরই সন্ধান পাওয়া যায় না(১৫)।

আয়ুর্বেদীয় শব্দের পরিভাষা

ীয় শব্দ	একেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত পরিভাষা [১৩]	গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত পরিভাষা [১৪]
মেহ	Glycosuria	× ×
লুপ্ত	Alopecia	Baldness
প্রতিনাহ	Otitis media	Liquified wax of ear runing through nasal cavity
বিসর্প	Cellulitis	× ×
াদর	Peritonitis	A kind of disease of the stomach or abdomen
পতানক	Tonic spasm	Rigid spasm ; epilepsy with convulsion

১৩. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা. ১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
১৪. 'আয়ুর্বেদীয় পরিভাষা,' প্রকৃতি, ১৩৩৩, ২য় সংখ্যা-১৩৩৭, ৩য় সংখ্যা
১৫. 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা,' কলকাতা. ১৯৫০ খ্রী

নকুলান্ধ	Astigmatism	Variagated sight ; multicoloured visio in day-time
পাদহর্ষ	Peripheral neuritis	Numbness with tin ling pain in foot
পাণ্ডু	Mild jaundice	Anemia ; pale, yel wish white (পাণ্ডুরো
পোথকী	Trachoma	× ×
প্রতিশ্যায়	Nasal catarrh	Catarrh
প্লীহোদর	Enlarged spleen, leukemia	Enlarged spleen
বহিরায়াম	Opisthotonus	Opisthotonus
ভ্রমরোগ	Vertigo	Giddiness (ভ্রম)
মূত্রাঘাত	Retention of urine	Retention of urine
শর্করার্বুদ	Carcinoma	The name of min disease ; a cystic tumour in which gravel like concre tions form
শৌসির	Gingivitis	× ×
শ্বিত্র	Leucoderma	Leucoderma
সিকতামেহ	Phosphaturia	× ×
স্বরঘ্ন	Acute laryngitis	× ×

বহু প্রচলিত বিদেশী শব্দের স্থানে নবগঠিত বাঙলা শব্দ ব্যবহারে বিজ্ঞ সাহিত্যের লেখকদের অনিচ্ছা সম্বন্ধে একেন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন ; জীববিদ্যায় গণ, বর্গ প্রভৃতির বহু ব্যবহৃত বিদেশী নামগুলি প্রত্যাহার ক তিনি ছিলেন বিরোধী। কিন্তু জীবদেহের অঙ্গ, কোষের ভিতরে বীক্ষণিক বস্তু, জৈবক্রিয়া প্রভৃতির সংজ্ঞাবাচক বিদেশী শব্দের এবং শ্রে

ইত্যাদির অপেক্ষাকৃত বিরলপ্রচার বিদেশী নামের পরিবর্তে বাঙলা
ায় নূতন পরিভাষা প্রণয়ন ও প্রচলনের যৌক্তিকতা তিনি অনুভব
তন। তাঁর 'প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা' প্রবন্ধ(১৬) থেকে
্য নিম্নলিখিত ছত্রগুলি পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁর এই মূলনীতির পরিচয়
:

আন্তর্জাতি (subspecies), জাতি (species), অন্তর্গণ (sub-
us), গণ (genus), অন্তর্বংশ (subfamily), বংশ (family)
কোন কোন স্থলে অন্তর্বর্গ (suborder) ও বর্গ (order) এই শব্দ-
নামের কেবল ভাষান্তর করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে (অর্থাৎ
বা সংস্কৃত ভাষায় গঠিত নূতন নামকরণ দ্বারা) পরিভাষা গঠন আমার
ক্তিযুক্ত নহে ; তাহার প্রধান কারণ এই যে গণের নাম এত প্রচলিত
পড়িয়াছে যে তাহার স্থলে আর কোনও নূতন শব্দ ব্যবহার করা যায়
বং গণের নামে প্রত্যয়ান্ত দ্বারা অন্যান্য শব্দগুলি গঠিত হওয়ায় তাদের
রও পরিবর্তন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এইরূপ করিলে লেখকগণের এত
ধা হইবে, যে তাঁহারা এই সকল শব্দ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন।
াষ্ট বৈজ্ঞানিক নামগুলি, অর্থাৎ গোষ্ঠী (tribe), শ্রেণী (class),
শ্রেণী (subclass), দেশ (phylum)···প্রভৃতিবাচক সংজ্ঞার বাংলা
াঠিত হইলে ভাষারও পুষ্টি হইবে এবং তাহা কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে।
গণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির নামের বাংলায় পরিভাষা হওয়াও বিশেষ
ক।"

বিষয়ে তাঁর মতের যথার্থতা অবশ্যই অংশত স্বীকার করতে হয়, কিন্তু
তিনি গণের বহুপ্রচলিত বিদেশী নামগুলির নূতন পরিভাষা রচনায়
ধী সেই যুক্তিই কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কোনও কোনও গোষ্ঠী, শ্রেণী
দির বহুপ্রচলিত বিদেশী নামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত ;"
াপ বহুপ্রচলিত nucleus (নিউক্লিয়াস) বা nucleolus (নিউ-
) শব্দের স্থলে একেন্দ্রনাথের দেওয়া পরিভাষা 'কোষসার' বা
' ব্যবহার তাঁর নিজেরই প্রদত্ত যুক্তি প্রয়োগে অসঙ্গত বলে মনে হয়।

১৬, প্রকৃতি, ১৩৩১ ১ম সংখ্যা

তাছাড়া একেন্দ্রনাথের কৃত বহু পরিভাষাই অপেক্ষাকৃত স্বল্পপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে গঠিত এবং পাঠক সাধারণের কাছে মূল বিদেশী শব্দের তুলনায় কম দুর্বোধ্য নয়। এ ধরনের দুরূহ তৎসম শব্দবহুল পরিভাষ ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ভাষার সাবলীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত পরিভাষা মূল শব্দটির দ্বার সূচিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গুণ বা বস্তুর সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণারও সৃষ্টি করতে পারে; দৃষ্টান্তস্বরূপ colloid (কলয়েড)-এর পরিভাষা 'ঘনতরল', endoplasm (এনডোপ্লাজম)-এর পরিভাষা 'মধ্যখণ্ড' এবং Pseudo-podium (সিউডোপোডিয়াম)-এর পরিভাষা 'উপপাদ', এই তিনটি উল্লেখ করা যায়। পক্ষান্তরে একেন্দ্রনাথের সপক্ষে একথা বলা যায় যে, পাশ্চাত্যেও বৈজ্ঞানিক শব্দের সংগঠন করা হয়েছে প্রধানত প্রাচীন লাতিন ভাষার উপর নির্ভর করে এবং এদেশেও ঐ সকল শব্দের পরিভাষা সং থেকে গঠন করা অনেক ক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল। একেন্দ্রনাথ পরিভাষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এবং বিচার বিশ্লেষণ করে বিশেষ কোনও লেখেন নি, বরং পরিভাষা চয়ন বা রচনা করে তার তালিকা তাঁর শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল। তিনি উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা ও প্রাণিবিদ্যার বহু শত শব্দের পরিভাষা সংকলন করেছেন; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলিত পরিভাষার তুলনায় তাঁর কাজের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাঁর 'উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা' প্রবন্ধে(১৭) প্রায় ১২৫০টি, 'প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা' প্রবন্ধে (১৮) প্রায় ২১০০টি এবং 'প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা: (১) কোষবিজ্ঞান (cytology)' প্রবন্ধে(১৯) প্রায় ১০০টি পারিভাষিক শব্দের তালিকা ছিল। এগুলি থেকে অল্প কয়েকটি উদাহরণ বর্তমান প্রবন্ধে তিনটি তালিকায় দেওয়া হয়েছে; এ থেকেই একেন্দ্রনাথের অবদানের গুরুত্ব এবং গভীরতা বোঝা যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তাঁর 'জীববিদ্যার পরিভাষা' প্রবন্ধটিতে কিন্তু প্রকৃত

১৭. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

১৮. প্রকৃতি, ১৩৩১ ১ম সংখ্যা-১৩৩৫ ১ম সংখ্যা

১৯. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

পরিভাষার পরিবর্তে নানা প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম সম্বন্ধে আলোচনাই স্থান পেয়েছে(২০)।

উদ্ভিদবিদ্যার পরিভাষা

বিদেশী শব্দ	একেন্দ্রনাথের প্রদত্ত পরিভাষা [২১]	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা [২২]
Bryophyta	শৈলোয়োদ্ভিদ	ব্রাইওফাইটা
Calyptra	কুটিটোপর	ক্যালিপট্রা
Carpel	কিঞ্জল্ক	গর্ভপত্র
Cystolith	বৃন্তকশিলা	সিস্টোলিথ
Diffusion	ব্যাপ্তি	ব্যাপন
Tusiform	তকু´বৎ	মূলকাকার
Gametophyte	জম্পেত্যুদ্ভিদ	লিঙ্গধর উদ্ভিদ
Gynaecium	স্ত্রীস্তবক	স্ত্রীস্তবক
Nymphaeaceae	উৎপলাদি	পদ্ম-গোত্র
Phloem	বল্কক	ফ্লোয়েম
Prickle	বল্কিক	গাত্রকণ্টক
Pteridophyta	পর্ণাঙ্গোদ্ভিদ	× ×
Stratified	স্তরযুক্ত	× ×
Tracheid	তকু´কোষ	ট্র্যাকীড
Turgidity	রসস্ফীতি	রসস্ফীতি
Umbelliferae	ধন্যাকাদি	ধন্যাক গোত্র, আম্বেলিফেরী
Whorled	স্তবকীকৃত	আবর্ত
Xanthophyll	পর্ণপীত	জ্যান্থোফিল
Xerophilous	মরুজাত	× ×
Yeast plant	মদ্যকাণ্	ঈস্ট

২০. প্রকৃতি, ১৩৩৮, ৫ম সংখ্যা

২১. 'উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

২২. 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', কলিকাতা, ১৯৬০ খ্রী

প্রাণিবিদ্যার পরিভাষা

বিদেশী শব্দ	একেন্দ্রনাথের প্রদত্ত পরিভাষা[২৩]	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা[২৪]
Barb	অনুকণ্টক	× ×
Bra' chial···	শ্বাসাঙ্গ···	ব্রাংকি···
Cnidocil	স্পর্শদণ্ড	× ×
Coceidia	গুটিকাদেহী	× ×
Contractile vacuole	সঙ্কোচ-বিলক	× ×
Ctenophora	কঙ্কতদেহী, কঙ্কতধারী	× ×
Ectoderm	বাহ্যত্বক	এক্টোডার্ম
Flagellafa	অনুপ্রতোদী	× ×
Invagination	অন্তর্বাহন	× ×
Larva	স্বজীবিভ্রূণ, বিষমশিশু	লার্ভা, শূক
Myoepithelial cell	সঙ্কোচত্বচ্‌কোষ	× ×
Polyp	পুরুভুজ	× ×
Pavement epithelium	চিপিট কৌষিকাবরণ (কৌষিকত্বক)	× ×
Pseudopodium	উপপাদ	ক্ষণপাদ
Radiolaria	অন্তর্চ্ছাদকাঙ্গী	× ×
Rhizopoda	ব্রধ্নপদী	× ×
Sporozoa	রেণুদেহী	× ×
Statocyst	স্থিতিজ্ঞেন্দ্রিয়, স্থিতিজ্ঞস্থলী	স্থিতীন্দ্রিয়
Tentacle	শোষণশুণ্ড, শুণ্ড, বাহু	কর্ষিকা

২৩. 'প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা' প্রকৃতি ১৩৩১, ১ম-সংখ্যা ১৩৩৫, ১ম সংখ্যা।

২৪, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', কলিকাতা, ১৯৬০ খ্রী

কোষবিজ্ঞানের পরিভাষা

বিদেশী শব্দ	একেন্দ্রনাথের প্রদত্ত পরিভাষা [২৫]	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা [২৪]
Acrosome	মুকুট	× ×
Aster	অংশুখণ্ড, অংশুমণ্ডল	× ×
Central spindle fibres	মধ্য তুরীতন্তু	× ×
Centriole	আকর্ষণ কেন্দ্র	সেন্ট্রিওল
Centrosome	আকর্ষণ গোলক	সেনট্রোসোম
Meiosis	সংখ্যার্দ্ধীভবন	× ×
Metaphase	তন্তুভেদাবস্থা	× ×
Mitosis	জটিল কোষভেদ, জটিল কোষভাজন	× ×
Oogonia	আদ্যডিম্বকোষ	× ×
Parthenogenesis	অসঙ্গমোৎপত্তি	অপুংজনি
Prophase	তন্তুগঠনাবস্থা	× ×
Spermatogonium	আদ্যজননশুক্রকোষ	× ×

একেন্দ্রনাথের লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'উদ্ভিদে গৌণকোষ বিদারণ (karyokinesis) শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (২৬) এবং 'ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায়' (২৭) প্রবন্ধ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরীক্ষাগারে ব্যবহার্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সরল ও বিশদ বিবরণই উভয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। প্রথম প্রবন্ধে গৌণকোষবিদারণ নামে কোষ বিভাজনের সময় উদ্ভিদকোষের নিউক্লিয়াসে ধারাবাহিক পরিবর্তন পরীক্ষা ও প্রদর্শনের উপযুক্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নিজের পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর নির্ভর করে একেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ঐ কাজের পক্ষে উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগ, বিশেষত পিঁয়াজ কন্দের মূলাগ্রভাগ কিংবা বরবটি বা ছোলার বর্ধিষ্ণু মূলাণু ব্যবহার করাই শ্রেয় এবং এদেশে ঐ উদ্দেশ্যে উদ্ভিদাংশ সংগ্রহের প্রকৃষ্ট সময় রাত ৩-৩॥টা। প্রবন্ধটিতে উদ্ভিদাংশ সংগ্রহ, রাসায়নিক দ্রবে তার সংরক্ষণ, পরিশ্রুত কোহলের সাহায্যে

২৫. 'প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা : (১) কোষবিজ্ঞান (cytology),' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

২৬. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা।

২৭. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৩শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

তার নিরুদন (ডিহাইড্রেশন), মোমখণ্ডের মধ্যে তার সন্নিবেশ, কর্তনযন্ত্রের সাহায্যে তার পাতলা পাতের মতো খণ্ড প্রস্তুত করা এবং এহরলিখের হিমাটক্সিলিন নামে রঞ্জকদ্রব্যের সাহায্যে তাকে রঙ করার পদ্ধতি সবিস্তারে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায়' প্রবন্ধে একেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর টাটকা মৃতদেহ অল্পক্ষণ জলে সিদ্ধ করার পর স্থূল মাংস ও যন্ত্রাদি কেটে ফেলে এবং শেষে পিঁপড়ের সাহায্যে অবশিষ্ট মাংস অপসারণ করে কঙ্কাল পরিষ্কার করার এক নূতন ও সহজ পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাণিবিদ্যার পরীক্ষাগার ও সংরক্ষণশালায় নিত্যব্যবহার্য প্রক্রিয়া হিসাবে তাঁর প্রস্তাবিত পদ্ধতিটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রবন্ধ দুটিতে যেভাবে বাঙলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যান দেওয়া হয়েছে, তা শুধু সে সময়ে কেন, এখনও যথেষ্ট বিরল। একেন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধে হয়তো তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর আরও প্রাঞ্জল, হয়তো তাঁর বক্তব্যের সারগর্ভতা আরও পরিস্ফুট; কিন্তু উপরি-উক্ত প্রবন্ধদুটিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগাত্মক পদ্ধতির যে সুচারু বর্ণনা পাওয়া যায়, বিদেশী ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের তুলনায় তার গুরুত্ব কোনও দিক দিয়েই ন্যূন নয় এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞানপ্রচারের এই অধ্যায়ে একেন্দ্রনাথের প্রয়াস নিঃসন্দেহে উত্তরসূরীদের পক্ষে আদর্শস্বরূপ। পরীক্ষানিরীক্ষা ও প্রকৃতিপাঠের ফলে যেসব তথ্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হতো, বাঙলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা তাঁর রীতিভুক্ত ছিল: উপরি-উক্ত প্রবন্ধ দুটিতে এবং 'কাঁকড়ার চিৎসাঁতার' প্রবন্ধে(২৮) বিশেষ বিশেষ তথ্যের উল্লেখ এই রীতিরই উদাহরণ।

বিজ্ঞানসাহিত্যিক হিসাবে একেন্দ্রনাথ প্রধানত প্রাণিজগতের শ্রেণী-বিভাগ, বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর বিবরণ ও বৈজ্ঞানিক নাম, প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখিত প্রাণীদের পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'বাংলার মৎস্যপরিচয়'(২৯), 'রোমন্থীদিগের শ্রেণীবিভাগ'(৩০), 'সুশ্রুত-

২৮. প্রকৃতি, ১৩৪৫, ২য় সংখ্যা

২৯. প্রকৃতি, ১৩৩২, ২য় সংখ্যা—১৩৩৬, ২য় সংখ্যা

৩০. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সংহিতা ও অষ্টাঙ্গসংগ্রহে কথিত দর্পপরিচয়' (৩১), 'কতকগুলি পতঙ্গের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক নাম'(৩২), 'সুশ্রুতবর্ণিত, জলৌকার বৈজ্ঞানিক নামনির্ণয়'(৩৩) ইত্যাদি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। এছাড়া উদ্ভিদবিস্তার প্রবন্ধ হিসাবে 'সূক্ষ্ম-গঠনাবলম্বনে উদ্ভিদের পরিচয়' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধটিরও উল্লেখ করতে হয় (৩৪)। কয়েকটি প্রবন্ধ বহু আলোকচিত্র ও রেখাচিত্রের দ্বারা সুচিত্রিত হওয়ায় বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য হয়েছে। কিন্তু অনেক স্থলেই একেন্দ্রনাথের আলোচনাপ্রবন্ধগুলির ভাষা তৎসম শব্দবহুল, লিখনশৈলী সমাসবদ্ধ শব্দের ভারে অপেক্ষাকৃত ভারাক্রান্ত ও শ্লথগতি এবং সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে রচিত নূতন পরিভাষার বহু ব্যবহারে বিষয়ের সহজবোধ্যতা বিপদগ্রস্ত। তাঁর রচনার উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃতি দেওয়া হলো—

"রোম অতি বিরল ; তবে অনেকগুলি রোম একত্রে সংলগ্ন হইয়া দুইটী সুদীর্ঘ পট্ট উৎপাদিত করে ; এই পট্ট দুইটী মুখবিবরের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া ঐ বলয়াকার খাতে বর্তমান থাকে ; একটী বহির্দ্দিকে এবং কন্যটী (অন্যটী ?) অন্তর্দ্দিকে অবস্থিত। সচরাচর কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকিলেও ইহারা সময়ে সময়ে ঐ দণ্ডাকার বৃন্ত হইতে ভিন্ন হইয়া সন্তরণ করতঃ অন্য স্থানে গমন করে এবং তথায় আবার কোন পদার্থে সংলগ্ন হয়। ঐ সন্তরণাবস্থায় ইহাদের গাত্রে বৃত্তাকারে অনেকগুলি পট্টিকা দেখা দেয়। বৃহৎকোষসার দীর্ঘাকার, সূক্ষ্ম পট্টের (ফিতার) ন্যায়। অসঙ্গমজ দেহবিভাগ দেহের দৈর্ঘ্যের সমসূত্রে সাধিত হয়।"(৩৫)

যে সব বহুল প্রচলিত বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের নূতন পরিভাষা রচনা ও ব্যবহার একেন্দ্রনাথের মতবিরুদ্ধ ছিল, বাঙলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধে ব্যবহারের সময় সেগুলির প্রতিবর্ণীকরণ বা ভাষান্তর (ট্রান্স্লিটারেশন) প্রয়োজন ; একেন্দ্রনাথের মত ছিল, লাতিন ভাষা থেকে উদ্ভূত এই শব্দ-

৩১. প্রকৃতি, ১৩৩৬, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

৩২. প্রকৃতি, ১৩৩৮, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

৩৩. প্রকৃতি, ১৩৩৬, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

৩৪. প্রকৃতি, ১৩৩১, ১ম সংখ্যা—১৩৩২, ৪র্থ সংখ্যা

৩৫. রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

গুলির প্রতিবর্ণীকরণের সময় এমন বাঙলা বানান ব্যবহার করা উচিত যাতে তাদের উচ্চারণ ল্যাতিন ভাষায় মূল শব্দের উচ্চারণের মতো হয়। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন—

"...এই সকল শব্দ ল্যাটিন ভাষামত গঠিত হওয়ায়, সেইগুলি বাঙলা ভাষায় লিখিতে হইলে তাহাদের উচ্চারণ ইংরাজি ভাষামত না হইয়া ল্যাটিন ভাষাসম্মত হওয়া উচিত।"(৩৬)

তাঁর এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। এর প্রায় ৩০ বছর পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'ভারতকোষ' নামে কোষ-গ্রন্থের সংকলয়িতারাও এই নীতিই গ্রহণ করেছিলেন বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের বিষয়ে। কিন্তু একেন্দ্রনাথ স্বয়ং অনেক স্থলে এই নীতি পালন করেন নি, যেমন 'রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ' প্রবন্ধে Holotricha, Peritricha, Opalinidae প্রভৃতি শব্দের বাঙলা প্রতিবর্ণীকরণের সময়ে তিনি ইংরেজী উচ্চারণানুগ 'হলোট্রাইকা,' 'পেরিট্রাইকা,' 'ওপালাইনিডি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন, অথচ লাতিন উচ্চারণ বজায় রাখতে গেলে হোলোত্রিখা, পেরিত্রিখা, ওপালিনিদী প্রভৃতি লেখা উচিত ছিল।

সংস্কৃত শব্দ ও পরিভাষার বাহুল্য সত্ত্বেও একেন্দ্রনাথের রচনার দুটি বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য; সে দুটি হলো বৈজ্ঞানিক আলোচনায় নির্ভুল উচ্ছ্বাস-বর্জিত বর্ণনা এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সঠিক তথ্য পরিবেশনের প্রচেষ্টা। তাঁর রচনা থেকে গৃহীত নিচের উদ্ধৃতিটি বিজ্ঞানধর্মী বর্ণনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ—

"বর্ণ—পৃষ্ঠদেশ ধূসর আভাযুক্ত সবুজ। প্রথম সাতটা সারির শল্কগুলির মধ্যদেশ কাল হওয়ায় সাতটি অনুলম্ব রেখা গঠিত হয়; নিম্নস্থ রেখাটি পুচ্ছ পর্য্যন্ত পৌঁছে না। উদর ঈষৎ শাদা এবং তাদের সুবর্ণের আভা থাকে। স্কন্ধে একটা ঈষৎ নীলবর্ণের দাগ থাকে, কখন কখন থাকেও না। অস্থিময় স্বাসকুপচ্ছদের (শ্বাসকুপচ্ছদের?) সম্মুখের অংশ উজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণ। পৃষ্ঠ পক্ষ সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ; পশ্চাৎ প্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ। বাহুপক্ষ, পাদপক্ষ, উদরপক্ষ এবং পুচ্ছপক্ষ লঘু হরিদ্রাবর্ণ; পুচ্ছপক্ষের প্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ।"(৩৭)

সত্যকার বিজ্ঞানসাহিত্য সম্বন্ধে এদেশের সাধারণ জনের অনীহা

৩৬. 'প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা,' প্রকৃতি, ১৩৩১ ১ম সংখ্যা
৩৭. 'বাংলার মৎস্যপরিচয়,' প্রকৃতি, ১৩৩৫, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

একেন্দ্রনাথের পরিচিতির স্বল্পতার কারণ। নানা সাময়িকপত্রে ছড়ানো তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্র সংকলন করে প্রকাশের কাজ এ-পর্যন্ত অবহেলিত হয়ে রয়েছে।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পরিকল্পিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে কোষগ্রন্থের প্রকাশনের সঙ্গে একেন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ঐ গ্রন্থে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রসঙ্গের তথ্যনির্বাচন, সম্পাদনা ইত্যাদি কাজে সাহায্যের জন্য একেন্দ্রনাথকে আহ্বান জানানো হয়: এ-সম্পর্কে 'বঙ্গীয় মহাকোষ' ১ম খণ্ডে প্রকাশিত 'নিবেদন'-এ প্রকাশক সতীশচন্দ্র শীল লিখেছেন—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, ৺ডক্টর একেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য······প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদগণ উপস্থিত থাকিয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ভার অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।"

দুর্ভাগ্যবশত 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যাটি প্রকাশের পূর্বেই একেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়, ফলে ঐ গ্রন্থের সংকলনে তাঁর অবদান সার্থক রূপলাভে বঞ্চিত হয়।

একেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত শোকসভায় সভাপতি যদুনাথ সরকার, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতি সুধীজন বৈদ্যকশাস্ত্র, হিন্দু বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বৈদিক সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর কর্মজীবনের কোনও কোনও অজ্ঞাতপূর্ব অধ্যায় সম্বন্ধে কেবল সেই আলোচনা থেকেই অবগত হওয়া যায়।

বিজ্ঞানী একেন্দ্রনাথ জীববিদ্যার নানা শাখায় যেসব মৌলিক গবেষণা করেছিলেন, তার আলোচনা বা উল্লেখ বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ভুক্ত নয়। তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র ৩৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; এর মধ্যেই লোকচিত্তে তাঁর পরিচয় একান্ত সীমিত হয়ে এসেছে! অথচ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানশিক্ষার যে দাবি আজ সোচ্চার, অর্ধশতাব্দী আগে তার ভিত্তিস্থাপনের কাজে একেন্দ্রনাথ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অন্যতম সুযোগ্য উত্তরসাধক —সাহিত্যের জগতে বিজ্ঞানের বিরলসঙ্গ প্রতিভূ।

ভিয়েতনাম

বিভাস চক্রবর্তী

১৯৬৭ সালের মার্চ মাস। দক্ষিণ ভিয়েতনামের উত্তরে কুয়াং-ত্রি প্রদেশের কোনো একটি গ্রামে একটি কৃষক পরিবারের কুটির। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় দেখা যাচ্ছে এক বৃদ্ধা কৃষকরমণী গৃহকর্মে ব্যস্ত। ঘরে আরেকটি কিশোরী বালিকা, নাম—ত্রাং।

বৃদ্ধা। কীরে, বৃষ্টিটা একটু ধরেছে না ?

ত্রাং। হ্যাঁ, থেমেছে। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ভীষণ।

বৃদ্ধা। বাব্বাঃ, কী বিশ্রী। সেই দুপুর থেকে চলেছে তো চলেইছে—একদণ্ড বিরাম নেই।

ত্রাং। আর যা অন্ধকার! রাস্তাটার ওপারে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

বৃদ্ধা। সে অবশ্য ভালোই।

ত্রাং। আলোটা জানলার কাছে ধরব ?

বৃদ্ধা। না না। অত তাড়াহুড়োর কী আছে ? কোনো আওয়াজ শুনতে পেয়েছিস ? [ত্রাং 'না'-সূচক মাথা নাড়ে] তবে ?

ত্রাং। না, মানে আলোটা দেখলে বুঝতে পারবে এ-ধারটা ঠিক আছে।

বৃদ্ধা। তোমার বুদ্ধি নিয়ে চললেই হয়েছে আরকী। দুদিনেই লড়াই ফতে। আওয়াজ শুনতে পেলে তবেই আলো দেখাবি। এক চুল এদিক ওদিকে হলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

ত্রাং। ও আওয়াজ করেছে—ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমরা হয়তো ঠিক শুনতে পাইনি।

বৃদ্ধা। নে বাপু, হয়েছে। ধীরে সুস্থে এখানে এসে বোস তো। অত অস্থির হলে চলে ? দেশ জুড়ে অতবড় লড়াই চলেছে। সবাইকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে তো। ওপর থেকে যা হুকুম আসবে

অক্ষরে অক্ষরে তা তামিল করতে হবে। [একটু থেমে] দিন্‌-এর জন্যে মন কেমন করছে, না রে ?

ত্রাং। আমার ভয় করছে।

বৃদ্ধা। এই দেখ, ভিয়েতনামের মেয়ে—এই সময় কান্নাকাটি করছে। লোকজন শুনলে সব বলবে কী! ভয়ের কিছু নেই, দিন্‌ ঠিক এসে যাবে।

ত্রাং। রাস্তায় যদি হঠাৎ—[বাইরে একটা শব্দ শোনা যায়] ওকি ?

বৃদ্ধা। ও কিছু না। হাওয়ায় গাছের ডালটা চালে এসে ঠেকেছে।··· সত্যি আজকের দিনটাও এমন যাচ্ছে। এই ঝড়বৃষ্টিতে ওরা যে কোথায় আছে, কী করছে, কে জানে।···দুপুর থেকে তো জানলায় বসে আছিস, কাকে কাকে যেতে আসতে দেখলি ?

ত্রাং। চারটের পর থেকে আর কাউকে দেখিনি। তার আগে একটা শুঁটকো আর একটা লালমুখো জীপগাড়ি করে গান গাইতে গাইতে শহরের দিকে গেল।

বৃদ্ধা। আর আমাদের নেড়ীকুত্তাগুলো ?

ত্রাং। না, ওদের কাউকে দেখিনি।

বৃদ্ধা। ছেলেটা ভালোয় ভালোয় ঘর নিতে পারলে হয়। সেই গত হপ্তায় এসে খাবার দাবার নিয়ে গেসল। পাঁচদিন পাঁচরাত্তির হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে কী করে যে কাটছে কে জানে! এদিকে নেড়ী-কুত্তাগুলো যে রকম পেছনে লেগেছে—সহজে কী আর ছেড়ে দেবে। ঠিক তক্কে তক্কে রয়েছে।

[ইতিমধ্যে জানালা পেরিয়ে দোরগোড়ায় এসে একটি লোক দাঁড়িয়েছে। বয়সে প্রবীণ। ত্রাং জানলা দিয়েই তাঁকে দেখতে পেয়েছে]

ত্রাং। মাসী—

বৃদ্ধা। কে ?···কাকে চাই আপনার ?

লোক। আমি বেন-হাই নদীর মাঝি।

বৃদ্ধা। আমি কু-দে নদীর জেলেনী।

লোক। ইউনিট ৪৫১ নর্থ।···আমাকে চিনতে পারছেন না মাদাম ? আমি—

বৃদ্ধা। ও-হোঃ! কমরেড ত্রাক! আমাকে ক্ষমা করবেন। নাঃ, একটা চশমা নিতেই হলো দেখছি। বসুন বসুন।

ত্রাক। আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি। দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে যাবার আগে আপনার হাতে তৈরি খাবারও যেমন মুখে লেগে আছে, তেমনি চোখে লেগে আছে আপনার সেই মুখ।

বৃদ্ধা। সেইতো শেষ দেখা। তারপর শুধু ওর মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে আপনার একটা চিঠি পেয়েছিলুম। যাক, কীরকম আছেন বলুন।

ত্রাক। পশ্চিম গিরিমৌলিতে ঘুরি হৃদয় আমার চঞ্চল,
দক্ষিণাকাশে তাকিয়ে স্বপ্নে দেখি পুরাতন মিতাদের।

বৃদ্ধা। ওখানকার অবস্থা কীরকম? আমার ভাবতেও কান্না পায় কমরেড, হ্যানয়ে আর হাইফঙে শয়তানরা মুষলধারে বোমা ফেলে চলেছে। যে সুন্দর সোনার দেশ চাচা হো চি মিন গড়ে তুলছিলেন, ওরা সেটা ছারখার করে দিচ্ছে।

ত্রাক। ওটাই যে ওদের সভ্যতা কমরেড—সব কিছুকে ভেঙে তছনছ করে ফেলা। কিন্তু কান্না পেলে তো চলবে না কমরেড,

পৃথিবীতে আলোকিত কিছু কাজ আছে,
কোনো ক্রমে হারব না সংখ্যালঘু বিমানের কাছে।
হৃদয়ে হৃদয় ছুঁয়ে থাকি
আমাদের সামগ্রিক খেলাধূলা বাকি।

বৃদ্ধা। সত্যি, আপনাকে দেখে পুরনো দিনের সব কথা মনে পড়ছে। আপনার কবিতা, আপনার বন্ধুর গান। দিয়েন বিয়েন ফু-র কয়েকদিন আগে আপনারা দুজন এলেন। সেই সময় একদিনের জন্যে চাচা হো চি মিনও আমাদের গাঁয়ে এসে উঠেছিলেন। আমাকে কাঁদতে দেখে চাচার চোখেও জল এসে গিয়েছিল। বলেছিলেন, মা, তুমি হাসিমুখে ওকে ছেড়ে না দিলে ওর সাধ্য কী ও একপাও এগোয়।—আমাকে হাসতেই হয়েছিল। মনে আছে আপনার?

ত্রাক। সব মনে আছে।

বৃদ্ধা। আপনি এখন আর কবিতা লেখেন না?

ত্রাক। না, কবিতা আর লিখি না। একটা জেনারেশন কবিতা না লিখলে ক্ষতি কি মাদাম? আজ রাতে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো এই পৃথিবীকে যদি তার বাসযোগ্য করে যেতে পারি তাহলে হয়তো অনেকদিন পরে নির্মেঘ কোনো সকালে ভোরের তারা আর শিউলি ফুলের দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ে যাবে—হয়তো গভীর ভালোবাসায় আমাকে নিয়েই সে একটা কবিতা লিখে ফেলবে। আর তাহলে কী দারুণ ব্যাপার হবে একবার ভাবুন তো মাদাম। আমার সমস্ত জীবনটাই একটা কবিতা হয়ে যাবে তাহলে। তাছাড়া চোখে-জ্বালা-ধরানো হাত-মুঠো-করে-আনা যে কবিতা প্রেসিডেন্ট লিখতে পারেন, আমি যে তা পারি না। আমি তাই লড়াই করি আর মাঝে মাঝে কবিতা পড়ি। সেও একদম অন্যরকম কবিতা—

এমন একদিন ছিল যখন আমরা
নিশ্চিন্তে গান গাইতে পারতাম,
আমাদের কবিতায় ছিল
এক রূপময় নদীর কথা
পাহাড় পর্বত আর বাতাসের কথা,
সেদিন আমাদের কবিতায় ছিল
চন্দ্রমল্লিকার ভালোবাসা আর
বরফের সাদা চুল।
কিন্তু এখন
দিনকাল অনেক পালটিয়ে গেছে,
আমাদের কবিতায় এখন
ইস্পাতের ঝনঝন আওয়াজ
মুক্তির ললিত লগ্ন।

বৃদ্ধা। সত্যি, আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি আপনি হঠাৎ এখানে এসে উপস্থিত হবেন।

ত্রাক। মুক্তি পরিষদ থেকে আমাকে চেয়ে পাঠানো হয়। প্রেসিডেন্ট বললেন, যাও ত্রাক, এবারটার মতো বেন-হাই নদীটা সাঁতরেই মেরে দাও। তবে ওপারের কমরেডদের বলতে ভুলো না যে সেদিনের

আর বেশি দেরি নেই যেদিন আমরা বেন-হাইয়ের ওপর আমাদের যেমন খুশি যতগুলো খুশি ব্রীজ তৈরি করব। তখন এপার-ওপার সব একাকার। সত্যি কমরেড, বিশ্বাস করুন, নদী পেরোবার সময় আমি স্পষ্ট বেন-হাইয়ের বিলাপ শুনতে পেলুম।

বৃদ্ধা। বেন-হাইয়ের বিলাপ আমরাও শুনতে পাই। আমাদের সবার বুকে সেটা বাজে—

এপার থেকে ওপার সে তো শুধু শতেক গজ
কে রেখেছে আড়াল করে সেতু?

ব্রাক। আপনার গলাটা আগের মতোই সুন্দর, আর আপনিও আগের মতোই ইমোশনাল। বিলাপের শেষটা শুনতে পান না?

শত্রু যদি হঠাৎ নদী ছিন্ন করেও যায়
এক সাগরেই ছুটবে ধারা মিলন মোহানায়।

বৃদ্ধা। আপনিও কম আবেগপ্রবণ নন। আপনার চোখের কোলেও জল।

ব্রাক। যাকগে, কাজের কথা বলি এবার। আমি এখানে এসে ৪৫১ নর্থ-এর ভার নিয়েছি। কিউ-র চিঠি নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে ওয়্যারলেসে খবর দেওয়া হয়নি, কারণ ওরা আমাদের মেসেজগুলো ইন্টারসেপ্ট করার চেষ্টা করছে।

বৃদ্ধা। এক মিনিট। ত্রাং, তুমি একটু বাইরে গিয়ে পাহারা দাও তো।

ব্রাক। পাহারার দরকার নেই। বাইরে আমার লোকই রয়েছে। বড় রাস্তার মোড়ে দেখলুম একটা জীপ দাঁড়িয়ে, বোধহয় প্রভুরা নজর রাখছেন এদিকটায়। তুমি বরঞ্চ মা আমার জন্যে এক কাপ চা নিয়ে এসো।

বৃদ্ধা। যা, জল তো চড়ানোই আছে।

[ত্রাং ভেতরের দিকের একটি ঘরে চলে যায়]

ব্রাক। মেয়েটি কে?

বৃদ্ধা। আমার এক বাল্যবন্ধুর মেয়ে। ওরা ছিল মাও-কোয়াং গ্রামে। গ্রামের স্কুলের ওপর আমাদের পতাকা উড়ত। এক সুন্দর সকালে—যখন ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছে, মেয়ে-পুরুষরা ক্ষেতে কাজ করছে—ইয়াঙ্কি পাইলটরা ওই পতাকা দেখতে পেয়ে ক্ষেপে উঠল। ওরা—

ত্রাক। জানি—

পঁয়তাল্লিশটি শিশু
দা-নাং
আর একটি গ্রাম
আগুনে পুড়ছে।
পঁয়তাল্লিশটি শিশু
মাঙ-কোয়াং
আর একটি গাঁয়ে ভিয়েতনামী নিশান
আগুনে পুড়ছে।
দক্ষিণের থেকে
হানাদার বোমারু
দক্ষিণের থেকে
মারীগুটি বসন্ত
দক্ষিণের থেকে, যমের
দক্ষিণ দুয়ার থেকে,—
পঁয়তাল্লিশটি ডুকরে, পুড়ছে
সাঙ-কোয়াং গেঁয়ো মানুষের
কফিন বয়ে-চলা মানুষের
মার্কিন মুলুকের শকুনের হায়েনার
হানাদার তাড়াতে
অসম্ভব, জেদী, একরোখা মানুষের—
পঁয়তাল্লিশটি দগ্ধ শৈশব, ব্রতঙ্কালু
আর জিহ্বা
লকলকে আঁচে ভয়ানক সাহস, ছাইচাপা
ধুঁইয়ে উঠছে।

বৃদ্ধা। ওই পঁয়তাল্লিশটা শিশুর সঙ্গে ওর মাও মারা যায়। মেয়েটা কোনোরকমে বেঁচে যায়। আমি ওকে নিয়ে এসেছি এখানে। বাপ আগেই গিয়েছে—ফরাসীদের হাতে।···যাক, বলুন কিউ কী খবর পাঠিয়েছেন?

ত্রাক। এই যে কিউ-র চিঠি।

বৃদ্ধা। [চিঠি পড়া শেষ করে] হুঁ···জংলী ইউনিফর্ম তো চব্বিশটা পাবেন না, কারণ ওরা আমাদের-দু-নম্বর কারখানায় চড়াও হয়ে সমস্ত ভেঙেচুরে দিয়ে গেছে। আমার হাতে এখন উনিশটা মাত্র আছে। রাইফেল একটা কম পড়বে, তাছাড়া সব ঠিক আছে।

ত্রাক। মালগুলো কোত্থেকে নিতে হবে ?

বৃদ্ধা। এখান থেকে এক মাইল দূরে খেম-সানের কাছাকাছি। চলুন আমি আমার লোক দিয়ে দিচ্ছি সঙ্গে। [চা নিয়ে ত্রাং ঘরে ঢোকে] নিন, চা-টুকু খেয়ে নিন।

ত্রাক। আপনার ছেলের খবর আমি কিউ-র কাছ থেকে পেয়েছি। ভালোই আছে—

বৃদ্ধা। নে, শুনলি তো, ভালোই আছে। ভয়েই সিঁটিয়ে আছে।

ত্রাক। তুমি কি খুব ভয় পাও নাকি ?

ত্রাং। না না। আমি ইউনিফর্ম সেলাই করি, তাছাড়া মাসীর কাছ থেকে স্টেনগান এল-এম-জি আর রাইফেল চালানো শিখেছি। গ্রেনেড ছোঁড়া আর মর্টার বাকি রয়েছে।···ও, গানও শিখেছি—মাসীর কাছে।

ত্রাক। আচ্ছা আচ্ছা। বাহাদুর মেয়ে দেখছি।···চলুন মাদাম, আর দেরি করব না। চলি ত্রাং, কেমন ?

ত্রাং। আবার আসবেন।

ত্রাক। নিশ্চয়ই।

বৃদ্ধা। [ত্রাংকে] আমি এক্ষুণি আসছি।

[ত্রাককে নিয়ে বেরিয়ে যান। ত্রাং রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর এ-বাড়ির ছেলে দিন্ সন্তর্পণে এসে ঘরে ঢোকে। হাতে একটি স্টেনগান]

দিন্। মা, মা ! [ত্রস্তপদে ত্রাং এসে ঘরে ঢোকে]

ত্রাং। আঃ, চ্যাঁচাচ্ছ কেন ? মা একটু বাইরে গেছেন।···বাব্বাঃ, একেবারে স্নান করে এসছ। কারো নজরে পড়নি তো ?

দিন্। এই, আমাকে কী ভাবো বলো তো? বলেছিলাম পাঁচদিন বাদে আসব, পাক্কা পাঁচদিনের দিন এসে হাজির। কোই রুখনেওয়ালা হ্যায়? কোই নেই। এই যে খুকুমনি, দাঁড়িয়ে ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে দেখছ কী? যাও, জামাটা নিঙড়ে একটু আগুনে শুকোতে দাও। আর, খাদ্যদ্রব্য কী আছে ছাড়ো দেখি? বেশি সময় নেই।

ত্রাং। বাব্বাঃ, একেবারে ঘোড়ায় জীন চাপিয়ে এসেছে।

দিন। তা তোমার মতো ঘরে বসে থাকলে কী আর দেশ থেকে ইয়াঙ্কিদের তাড়ানো যাবে?

ত্রাং। আহা, আমি বুঝি ঘরে বসে থাকি? আমি ইউনিফর্ম সেলাই করি—

দিন্। স্টেনগান, এল-এম-জি আর রাইফেল চালানো শিখেছি, গ্রেনেড ছোঁড়া আর মর্টার বাকি রয়েছে। এ তো আগের বারই শুনেছি, নতুন কিছু বলো।

ত্রাং। আরেকটা নতুন জিনিস শিখেছি—গান।

দিন্। কী গান? স্টেন হয়েছে, মেশিন হয়েছে, এবার আবার কী? ব্রেন?

ত্রাং। ধ্যাৎ, শুধু গান—যা গলা দিয়ে গায়।

দিন্। ও-হোঃ, সেই গান! তা গান গেয়েই কি ইয়াঙ্কিদের দেশ থেকে তাড়াবে নাকি?

ত্রাং। মাসী বলেছে—গান, লেখাপড়া, ক্ষেতের কাজ···এসবও সঙ্গে সঙ্গে শিখতে হয়।

দিন্। অবশ্য তোমার যা গলা, এমন গলায় গান শুনলে ইয়াঙ্কিরা বাপ বাপ বলে দেশ ছেড়ে পালাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, মুখ গোমড়া করতে হবে না। তোমার গলা দারুণ মিষ্টি, সত্যি খুব মিষ্টি।··· এবার এ-কদিন কীরকম কেটেছে তার রিপোর্ট দাও দিকি।

ত্রাং। এ-কদিন ধান তুলেছি, কারখানায় কাজ করেছি—পরশু রাত্রে না একদল মিলিটারি হঠাৎ আমাদের দু-নম্বর কারখানা আক্রমণ করে। ওখানে তখন তিনজন মাত্র কাজ করছিল। ওরা আধ ঘণ্টা ধরে

লড়ে। তারপর সবাই মারা যায়। কারখানাটা একেবারে শেষ করে দিয়ে গেছে। অন্যগুলোর খবর অবশ্য এখনো পায়নি।

দিন্ উঁ, ওখানে গোলাগুলি কিছু ছিল আমাদের ?

ত্রাং। মাসী বলল বেশি নাকি ছিল না। তবে অনেক ইউনিফর্ম ছিল। সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছে।

দিন। হুঁ!

ত্রাং। কালকে মাসী না আমাকে পাশের গাঁয়ে পাঠিয়েছিল নাটক দেখতে। কী দারুণ একটা নাটক দেখলুম। কী নাম যেন—ঐযে দাদাকে মেরে ছোটভাই রাজা হয়ে গেল—খুব নামকরা নাটক।

দিন্। হ্যামলেট ?

ত্রাং। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যামলেট। আমি তো একেবারে সামনের সারিতে গিয়ে বসেছি। নাটক শুরু হবার আগে একজন মোটা মতন লোক বক্তৃতা দিলেন: আপনাদের চাঁদের আলোতেই নাটক দেখতে হবে। ইলেকট্রিক বা হ্যাজাকের আলোর ব্যবস্থা করা হয়নি, কারণ এতে ইয়াঙ্কিরা প্লেন থেকে দেখতে পাবে আর তাহলেই ব্যাটারা বোমা না-ফেলে ছাড়বে না। আর একটা কথা, আপনারা নাটক দেখতে, দেখতে হাততালি দেবেন না, দিলে কিন্তু ওদের মর্টার বা কামানের নিশানা করতে সুবিধে করে দেবেন। আর যদি বিমান আক্রমণ বা গোলাগুলি ছোঁড়া শুরু হয়, আপনারা দয়া করে পাশে ট্রেঞ্চ আছে সেখানে নিঃশব্দে গিয়ে আশ্রয় নেবেন। তারপর তো নাটক শুরু হলো। একেবারে শেষের দিকে ঐ হ্যামলেট—ঠিক না তোমার মতো রোগা চেহারা ছেলেটার—

দিন্। অ্যাই, আমি রোগা ?

ত্রাং। নয়তো কি ?

দিন্। রোগা হলে কী হবে ? এ-পর্যন্ত কটা ইয়াঙ্কি মেরেছি জানো ? তা, গোটা সতেরো তো হবেই। এইতো আজই—

ত্রাং। যাকগে, মোটা—খুউব মোটা তুমি। যা বলছিলাম, যখন ওই হ্যামলেট ওর কাকাকে মেরে ফেলবে—আমি না হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠেছি। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও হাততালি দিয়ে উঠেছে।

মাত্র একমিনিট, তারপরই শুরু হলো গোলাগুলি। আমরা সবাই নিঃশব্দে ট্রেঞ্চে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে রইলুম। আমার ঠিক পাশেই না হ্যামলেট বসে ছিল। আমার গালে একটা টোকা মেরে বলে কি, অ্যাই খুকু, তুমিই না হাততালি দিয়েছিলে! আমি না ভয়ে একটা কথাও বলিনি।

দিন্। গালে টোকা মেরেছে ?

ত্রাং। হ্যাঁ! ঠিক না তোমার মতো দেখতে। তারপর বুঝলে, আধঘণ্টা পর গোলাগুলি থামলে আমরা আবার উঠে এলুম। আমি তো ভয়ে অস্থির, বোধহয় সবাই খুব গালমন্দ দেবে, শাস্তি দেবে। প্রথমের সেই মোটা লোকটা উঠে বলে কি, আজ নাটক এখানেই শেষ। কাল আবার এখানে একই সময়ে এই নাটকটাই অভিনয় হবে। আপনারা যারা আজ অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হননি, কালকে আবার আসবেন। আমাকে না কেউ কিস্সু বলল না।

দিন্। না বলুক, গালে টোকা তো মেরেছে।

ত্রাং। কী হিংসুটে রে বাবা!

দিন্। ঐ হ্যামলেট নাটকটা যার লেখা, তার লেখা আরেকটা নাটক আছে—ওথেলো। আমি সেটা দেখেছি। তাতে কী আছে জানো ? ধরো আমি ওথেলো—ভীষণ বীর যোদ্ধা, আর তুমি আমার বউ ডেসডিমোনা। তোমার গালে ঐ হ্যামলেট মানে ইয়াগো টোকা মেরেছে, আমি ভীষণ রেগে গেছি। আমি এইভাবে স্টেনটা ধরে তোমার দিকে এগোচ্ছি, আরে আরে বিশ্বাসঘাতিনী, তোমাকে আজ হত্যা করব, তারপর গভীরভাবে ভালোবাসব।

[দুজনে হেসে ওঠে। বৃদ্ধা রমণী দরজায় এসে দাঁড়ান]

বৃদ্ধা। দিন্—

দিন্। মা— [দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ]

বৃদ্ধা। আরে পাগলাব্যাটা, ওকে খামোকা ভয় দেখাচ্ছিস কেন ?

ত্রাং। দেখ না মাসী!

বৃদ্ধা। কতক্ষণ এসেছিস ? খাবার-দাবার কিছু খেয়েছিস ?

দিন্। না না। [ত্রাংকে] এই, যাও যাও শিগগির নিয়ে এসো। দেরি হয়ে গেলে কিউ আবার খেপে ফায়ার হয়ে যাবেন।

বৃদ্ধা। হ্যাঁ, একটু আগে কমরেড ত্রাক এসেছিলেন। ওঁর কাছ থেকে সব খবর শুনলুম। তা, তোরা কোথায় আছিস এখন?

দিন্। কু-দে নদীর খাঁড়িতে। কিউও আমাদের সঙ্গেই আছেন। তবে আজ রাত্রেই উনি কুয়াং-ত্রির দিকে রওয়ানা হবেন।

বৃদ্ধা। শ্‌-শ্‌-শ্‌—[ত্রাংকে] তুই এখনো দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা, দিন্-এর জন্যে খাবারটা নিয়ে আয়। আর আলমারির ভেতর থেকে বড় টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে আসিস। কই যা—

[ত্রাং রান্নাঘরে চলে যায়]

দিন্। কী ব্যাপার মা? ও নিশ্চয়ই কাউকে বলে ফেলবে না। ব্যাপারটার গুরুত্ব কি ও বোঝে না?

বৃদ্ধা। ছেলেমানুষ তো। তাছাড়া সেরকম অবস্থায় তো কোনোদিন পড়েনি। ওই লালমুখো ইয়াঙ্কী বাঁদরগুলো যে ধরনের অত্যাচার করে শুনেছি, তাতে বহু পাকা পাকা লোকই হয়তো ভেঙে পড়বে।

দিন্। হুঁ, তা অবশ্য ঠিকই। যাকগে, তোমাকে যা বলছিলুম। [মাকে বসিয়ে সামনে একটা ছোট নক্‌সা খুলে দেখায়] নদীটার ওপরে নাম-ও ব্রীজটা আছে। আমি অল-ক্লিয়ার সিগন্যাল নিয়ে ফিরে গেলেই ওরা ব্রীজটা উড়িয়ে দেবে। আমি বেরিয়ে গেলেই তুমি হেড কোয়ার্টার্সে খবরটা পাঠাবে। ইতিমধ্যে এদিক থেকে কিউ, আশাউ থেকে মুক্তিবাহিনীর চার নম্বর ব্যাটেলিয়ন, আর তোমার থুয়া থিয়েন থেকে গেরিলা বাহিনী কুয়াংত্রির দিকে এগিয়ে যাবে। খেম সানের কাছাকাছি আমরা কমরেড ত্রাকের সঙ্গে মিলব। অর্থাৎ আজ রাতের মধ্যেই কুয়াং-ত্রির পতন অনিবার্য।

[দিন্ যখন কথা বলছে তার মধ্যে একবার ত্রাং এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ায়, খানিকক্ষণ কথা শুনে আবার ভেতরে চলে যায়]

বৃদ্ধা। এত সব কথা কিন্তু ত্রাংকে বলিসনি বাপু।···আচ্ছা কুয়াং-ত্রির জেলে আমাদের কতজন বন্দী রয়েছে?

দিন্। আমাদের হিসেব অনুযায়ী ত্রিশ পঞ্চাশ।

বৃদ্ধা। ত্রাং এতো দেরি করছে?…তোর তো তাহলে এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে?

দিন্। হুঁ। মা, এক্ষুণি। [মা রান্নাঘরের দিকে যান। সঙ্গে সঙ্গে ত্রাং ঘরে ঢোকে] এইযে. প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সহ শ্রীমতী ত্রাং দেবীর প্রবেশ।

ত্রাং। আহা, এতো ইয়ের মধ্যেও খালি ইয়ার্কি।

দিন্। খালি ইয়ার্কি নয়। এত ইয়ের মধ্যে হঠাৎ ঝপ্ করে এসে বিয়েটাও সেরে যাব। সব সময় রেডি থেকো কমরেড।

ত্রাং। এই. মাসীমা শুনতে পাবেন না!…এই, খুব কষ্ট হয়েছে আসতে?

দিন। না, তেমন কিছু নয়। জলকাদা সাপখোপ লালমুখো বাঁদর আর নেড়ীকুত্তাগুলোর হাত এড়িয়ে চলে এসেছিলুম প্রায় দু-তিন মাইল—

ত্রাং। কেউ দেখেনি?

দিন্। দেখেছে বলে তো মনে হয় না। অবশ্য আমি যদি দেখতুম যে কেউ দেখেছে তাহলে সেই দেখাই তার বা আমার শেষ দেখা হতো। যাগগে, তোমাকে যা বলছিলুম—দু-তিন মাইল চলে আসার পর জঙ্গল থেকে দেখতে পেলুম দংহার মাঠে ইয়াঙ্কি সোলজাররা প্যারেড করছে—এইপ্ আই এইপ্! মহামুস্কিলে পড়লুম। মাঠটা পেরিয়ে তো আসবে হবে। এদিকে হাতে বেশি সময়ও নেই। তখন কী করলুম জানো? মাঠের পাশে পাশে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে এগোতে লাগলুম। হঠাৎ—

ত্রাং। হঠাৎ কী?

দিন্। একটা অ্যামেরিকান সেন্টির গায়ে গোঁৎ করে এক গুঁতো। ব্যাটা ওর স্টেনটা একটা গাছের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়ে—মানে ইয়ে করছিল আরকি। তখন কি আর ভেবেছে এমন সময় ভিয়েতনামের বীর যোদ্ধা শ্রীমান দিন্ এসে তার সামনে দাঁড়াবে।

ত্রাং। আহা, বীর না ছাই! তারপর কী হলো?

দিন্। তারপর আবার কী? ওর ঝোলা থেকে টুকিটাকি কয়েকটা জিনিসপত্র নিয়ে·চলে এলুম।

ত্রাং। কী করে ?

দিন্। কী করে ? আচ্ছা, তুমি উত্তরটা ভাবতে থাকো। আমি ততক্ষণ এগুলোর একটা সদ্‌গতি করি।

ত্রাং। ঘুমন্ত লোকের ঝোলা থেকে লোকে লুকিয়ে নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু ও তো বলছিলে—

দিন্। আই বাপ। দারুণ বুদ্ধি তো! আরে, ঘুমিয়েই তো পড়েছিল, আর এখনো ঘুমিয়েই আছে—একেবারে চিৎপটাং হয়ে।

[পকেট থেকে ছুরি বের করে। সেটা এবার বিঁধিয়ে দেয় খাবারের টেবিলে]

ত্রাং। উঃ মাগো!

[মা এসে ঘরে ঢোকেন]

বৃদ্ধা। ত্রাং, যা। দিন্-এর জন্যে যে পিঠেগুলো রেখেছিলুম, নিয়ে আয়। যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর উমাগো উমাগো করে কী হবে! যা— [ত্রাং. রান্নাঘরে চলে যায়। মা দিন্‌কে খাইয়ে দিচ্ছেন] সত্যি, মেয়েটার জন্যে কষ্ট হয়। জীবনে সুখের মুখ দেখল না। বাবা মারা গেল ফরাসীদের হাতে, মা গেল ইয়াঙ্কিদের বোমায়। মনে মনে তোকে তো স্বামীর মতো ভক্তি-ভালোবাসা করে. আর আমিও ওকে আমার ছোট্ট বৌমা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারি না। সারাদিন দুজনে বসে বসে তোর ভালোমন্দর কথাই ভাবি বাবা।

দিন্। এসব কী বলছ মা ? দেশের কথা ভাবো না ?

বৃদ্ধা। তুই কি দেশ ছাড়া বাবা ? তোদের মতো ছেলেমেয়ে নিয়েই তো দেশ। ভাবি, দেশের কথাই তো ভাবি। কিন্তু নাড়ির টান বড় টান—

দিন্। আচ্ছা মা, তোমার ছেলে যদি মারাই যায়, তোমার তো গর্ব হওয়া উচিত যে আমি লড়াই করে মরেছি। কিন্তু ওই অ্যামেরিকান সোলজারটার কথা ভাবো তো। কতই বা বয়েস ? আমার বয়েসীই হবে। বাড়িতে হয়তো ঠিক তোমারই মতো একজন মা আছেন। কোথাও কিছু নেই, কিছু বদলোকের বদখেয়ালে হুট করে তাকে চলে আসতে হলো সাত সমুদ্দুর ডিঙিয়ে এই

ভিয়েতনামের জঙ্গলে। ওর মার সান্ত্বনা কোথায় বলতে পারো? আমরা যখন মারছি বা মরছি—আমরা জানি কেন মারছি, কেন মরছি। কিন্তু ওরা সেটা জানে না, ওদের মায়েরাও সেটা জানে না মা—

[বাইরে ভারী পায়ের আওয়াজ]

দিন্। সব্বনাশ! শিগগির, রান্নাঘরের মাচায়।

[দিন্ দৌড়ে রান্নাঘরে চলে যায়। কিন্তু ছুরিটা নিতে ভুলে যায়। দিন্-এর আসনে মা বসে পড়ে ওর খাবারগুলো খেতে শুরু করে দেন। লণ্ঠনের আলো যতটা পারেন কমিয়ে দেন। অল্পক্ষণ পরেই দক্ষিণ ভিয়েতনাম বশংবদ সরকারের সামরিক বিভাগের একজন কম্যাণ্ডার, একজন ক্যাপ্টেন ও একটি হেলমেট পরিহিত সেণ্ট্রি দ্রুত এসে প্রবেশ করে। সেণ্ট্রি বৃদ্ধার দিকে স্টেন উঁচিয়ে ধরে। ক্যাপ্টেন টর্চের আলোয় ঘরের চারপাশ নিরীক্ষণ করে]

ক্যাপ্টেন। স্যার, যা ভেবেছি। পাখি পালিয়েছে।

কম্যাণ্ডার। হুঁ, খুব বেশিদূর গিয়েছে বলে তো মনে হয় না। যাও যাও, অন্য ঘরগুলো ভালো করে সার্চ করে দ্যাখো। অত সহজে পালাবে কোথায়?

[ক্যাপ্টেন ও সেণ্ট্রি রান্নাঘরের দিকে চলে যায়]

বৃদ্ধা। আমি একা বুড়োমানুষ। আপনারা ভুল করছেন। আমিই খাবার খাচ্ছিলুম।

কম্যাণ্ডার। আচ্ছা, তা এটা বুঝি আপনার দাঁত খোঁটার জন্যে রেখেছেন? [দিন্-এর ছুরিটা হাতে তুলে নেয়] দেখুন, আমাদের অতটা বোকা ভাববেন না। বুদ্ধিশুদ্ধি একটু আধটু আছে, তা নইলে কি আর—[ভেতরে ধস্তাধস্তির শব্দ ও ত্রাং-এর চীৎকার] ওই বোধহয় পাওয়া গেছে।

[ক্যাপ্টেন ও সেণ্ট্রি ত্রাংকে টেনে নিয়ে ঢোকে]

ক্যাপ্টেন। এই যে স্যার।

কম্যাণ্ডার। এ যে দেখছি একটা কচি খুকী!

বৃদ্ধা। আমার দূর সম্পর্কের বোনঝি। রান্নাঘরে গিয়েছিল আমার জন্যে খাবার আনতে।

কম্যাণ্ডার। যাও যাও, ভালো করে ছ্যাখো। নাটের গুরু নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছেন। [ক্যাপ্টেন ও সেণ্ট্রি আবার ভেতরের দিকে যায়] তারপর! আপনি তো একজন দারুণ মহিয়সী মহিলা দেখছি। নিজে মহারাণীর মতো বসে বসে ভালোটা মন্দটা সাঁটাচ্ছেন, আর এই কচি মেয়েটাকে খাটিয়ে মারছেন? বোনঝিকে একেবারে ঝি বানিয়ে রেখেছেন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

[ভেতরে আবার প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি ঘুঁষোঘুঁষির আওয়াজ। একটু পরেই স্টেনগান ও রিভলবারের মুখে দিন্‌কে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে ক্যাপ্টেন ও সেণ্ট্রি ঢোকে। দিন্‌-এর হাত পেছন দিকে বাঁধা]

ক্যাপ্টেন। স্যার, পেয়েছি। রান্নাঘরের মাচার ওপর লুকিয়েছিল।

কম্যাণ্ডার। আ-হাঃ! বলিনি, মহাপ্রভু নিকটেই আছেন? তাহলে বুড়িমা, এটি কি আপনার দূর সম্পর্কের বোনপো নাকি? এর ভূমিকা বোধহয় পাচকের? তা পাচককে হঠাৎ মাচায় তুলে রাখতে গেলেন কেন? মাচায় তুলে কি কাউকে বাঁচানো যায়! সে যাই হোক, রণশাস্ত্রে আছে দূত নাকি অবধ্য, কিন্তু পাচকের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো আইন আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং উনি যদি গড়গড় করে আমার সমস্ত প্রশ্নগুলোর জবাব না দেন, আমি বাধ্য ওঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে।...[দিন্‌কে] দ্যাখো হে ছোকরা, তোমার বিরুদ্ধে আমি অভিযোগগুলি বলে যাচ্ছি। [ক্যাপ্টেন পকেট থেকে বের করে একটা কাগজ কম্যাণ্ডারের হাতে দেয়। তাই দেখে কম্যাণ্ডার পড়তে থাকে] তুমি দেশের আইন ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে আমাদের স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শত্রু কতিপয় ভিয়েতকঙকে আশ্রয় দিয়েছিলে এবং এখনো তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছ। উপরন্তু, আমাদের শত্রুরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের ঘৃণ্য কমিউনিস্ট সৈন্যদের যোগসাজসে তুমি নানাবিধ রাষ্ট্রবিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত আছ। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের আইন

অনুযায়ী তোমার মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য। [কাগজটা ক্যাপ্টেনকে ফেরত দেয়]...এ-ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে? [দিন্ কোনো উত্তর দেয় না] কী, তুমি তাহলে সমস্ত মেনে নিচ্ছ? [দিন্ নিরুত্তর] কেন খামোকা বীরত্ব দেখাচ্ছ বাপু! হ্যানয় রেডিওর সমস্ত খবর আমরা পেয়েছি। সুতরাং বুঝতেই পারছ, তোমার অবস্থা এখন টাইট। আমার কাছে খোলসা করে সব বলো, সেটাই তোমার পক্ষে মঙ্গল। [দিন্ তবু কথা বলে না] দ্যাখো বাপু, আমি খুব স্পষ্টই বলছি—আজ রাত্রে আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। সবাই মন দিয়ে শুনুন, আমি আবার বলছি: আজ রাতে আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করব না, অবশ্য যদি আমি সঠিক খবরগুলো পাই। [কেউ কোনো কথা বলে না] হুঁ, ক্যাপ্টেন!

ক্যাপ্টেন। ইয়েস্-সা!

কম্যাণ্ডার। তুমি তো আবার জিওগ্রাফির ছাত্র ছিলে না? এই ছুরিটা দিয়ে ছোকরার পিঠে একটা ভিয়েতনামের ম্যাপ আঁকো তো। দেখি শুয়ারটা মুখ খোলে কি না।

[ক্যাপ্টেন কম্যাণ্ডারের হাত থেকে ছুরিটা নেয়। দিন্-এর জামাটা পিঠের দিকে এক টানে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর ছুরির ফলাটা পিঠের ওপর আঁকাবাঁকাভাবে চালাতে থাকে। দিন্-এর পিঠ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। তবু সবাই চুপ। হঠাৎ কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেনকে থামিয়ে দেয়]

কম্যাণ্ডার। হেই! স্টপ ইট, স্টপ ইট। [দিন্‌কে] নাউ, স্পিক আউট, প্লীজ স্পিক আউট, স্পিক আউট আই সে! [দিন্-এর মুখে ঘুঁষি মারে]

দিন্। মুখ আমাকে শেষটায় খুলতেই হলো। আপনি একা-একা এতক্ষণ বকে যাচ্ছেন দেখে কষ্ট হচ্ছে। শুনুন তবে—আপনি চেহারা বা

ভাষায় ভিয়েতনামী হলেও যে মার্কিন দস্যুর ঔরসে আপনার জন্ম, সেই স্বয়ং জনসন সাহেবও আমাকে দিয়ে একটা কথা বলাতে পারবে না।

কম্যাণ্ডার। আচ্ছা, আচ্ছা! ছোকরার হিম্মৎ আছে! আমি যদি তোমার মতো বিপ্লবী হতুম, তাহলেও অতটা হঠকারী হতুম কিনা সন্দেহ। আমার অ্যাদ্দিনের অভিজ্ঞতা বলে, কেবলমাত্র মূর্খ এবং মৃতদেরই কখনো মনের পরিবর্তন ঘটে না।

দিন্। তাহলে শুনুন দক্ষিণ ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক সরকারের নেড়ীকুত্তা অফিসার, আপনার শিক্ষা সম্পূর্ণ ছিল না।

কম্যাণ্ডার। হতে পারে, হতে পারে। কিন্তু তুমি কোনটা পছন্দ করো? মূর্খ হয়ে মুখ বন্ধ করে থাকবে, না মৃত হয়ে? [দিন্ নিরুত্তর। মার দিকে তাকায়] কী হলো, এবার বোধহয় একটু ভয় পেয়েছ, না? তাহলে শোনো, আমি একজন ভদ্রলোক। আমি সরকারের নামে, ঈশ্বরের নামে কথা দিচ্ছি—তোমার কোনো ভয় নেই।

দিন্। ভয়? তোদের? থুঃ— [কম্যাণ্ডারের মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়]

কম্যাণ্ডার। ইউ বাস্টার্ড, সন অফ এ বীচ! [প্রথমে কম্যাণ্ডার ও পরে ক্যাপ্টেন দিন্‌কে প্রচণ্ড ঘুঁষির আঘাতে মাটিতে ফেলে দেয়] সেণ্ট্রি, এটাকে বাইরে নিয়ে গাছটার সঙ্গে বেঁধে রাখো তো। ওর ব্যবস্থা পরে হচ্ছে।

[দিন্‌কে নিয়ে সেণ্টি. ও ক্যাপ্টেন বেরিয়ে যায়। বাইরে দরজা দিয়ে যে গাছটা দেখা যাচ্ছিল, সেই গাছটার সঙ্গে বেঁধে রাখে। সেণ্টি স্টেন নিয়ে বাইরে পাহারা দিতে থাকে, ক্যাপ্টেন ফিরে আসে]

বুঝলে ক্যাপ্টেন, এরা বিপ্লবীও বটে, গাধাও বটে। বিপ্লবের আরেক নাম কি গোঁয়াতুর্মি? এরা অ্যামেরিকানদের দেশ থেকে তাড়াতে চায়। আরে বাবা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আর রাশি রাশি গম একমাত্র ওরাই তো দিতে পারে। ওরা চলে গেলে দেশটার কী হাল হবে একবার ভেবে দেখেছে গোঁয়ারগুলো? আমার তো এরই মধ্যে

এমন বদ-অভ্যেস হয়েছে যে চ্যুইংগাম ছাড়া মেজাজই পাই না। বিপ্লব! তুমি যদি ওদের কাছ থেকে সামান্য খবর বের করার চেষ্টা করো, ওরা নিজেদের কেউকেটা ভেবে বসে থাকবে—এক-একটা খুদে লেনিন মাও সে-তুঙ বা হো চি মিন। আমাদের একটু সাহায্য করলে যে ওদের আখেরে কত সুবিধে হবে, সেটা একবার তলিয়ে দেখবে না। শহীদ হবার আনন্দেই সবাই ডগমগ।...[বৃদ্ধাকে] দেখুন বুড়িমা, আপনি যে একটা প্রচণ্ড গ্যাড়াকলে পড়েছেন—সেটা আপনিও বুঝতে পারছেন, আমিও বুঝতে পারছি। একদিকে আপনার ছেলের জান আর অন্যদিকে বিপ্লব দেশপ্রেম এইসব বড় বড় ফাঁপা ফাঁপা ধোঁয়াটে ধারণা। মা হিসেবে কিন্তু আপনার কাছে দুটোই সমান ব্যাপার। একদল আপনার ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, আর-একদল তদারকি করে সুষ্ঠুভাবে সেই মৃত্যুটা ঘটাচ্ছে মাত্র। আপনার এরকম একটা বিপদের সময়ে আপনার বাপ-মরা ছেলেটার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কিন্তু কেউই এগিয়ে আসবে না। না এরা, না ওরা। কিন্তু আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, তবে আমি কথা দিচ্ছি—

বৃদ্ধা। আমি কোনো দক্ষিণ ভিয়েতনামী অফিসারকে বিশ্বাস করি না।

কম্যাণ্ডার। ভুল করছেন। আমি কিন্তু আর পাঁচটা দক্ষিণ ভিয়েতনামী অফিসারের মতো নই। আপনি বোধহয় জানেন না যে বাড়ি বাড়ি ঢুকে খানাতল্লাশির ব্যাপারে অ্যামেরিকান অফিসাররা ভীষণ উৎসাহী। আর ওরা এসব ব্যাপারে একটু কম কথার মানুষ, কাজই করে বেশি। কথা বের করে নেবার জন্যে ওরা আপনাকে বুড়িমা বলে না ডেকে ওল্ড বীচ বা বুড়ি কুত্তী বলে সম্বোধন করত। অনুনয়-বিনয় না করে আপনার স্তনের বোঁটায় ব্যাটারি চার্জ করত। কিম্বা সেরকম মর্জি হলে হয়তো আপনার স্তন দুটো দেহ থেকে বিচ্ছিন্নই করে ফেলত। আর আপনাকে হয়তো রেহাই দিত, কিন্তু আপনারই চোখের সামনে আপনার দূর সম্পর্কের বোনঝিটির ওপর পাশবিক অত্যাচার করত।

বৃদ্ধা। চুপ করুন।

কম্যাণ্ডার। শুধুমাত্র সেই কারণে কোনো অ্যামেরিকান অফিসারকে আমি আসতে দিইনি। আমি নিজে ছুটে এসেছি। কারণ আমি ভিয়েতনামকে, ভিয়েতনামীকে ভালোবাসি। আমার কথা শুনুন। আমাকে আপনার একজন শুভানুধ্যায়ী ভেবে বলুন তো আপনার ছেলে কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে, ওর সঙ্গে কারা কারা আছে এবং ওদের প্ল্যানটাই বা কী? প্লীজ—[বৃদ্ধা নির্বাক] বলবে না, দেখেছ ক্যাপ্টেন, এও মুখ খুলবে না। এরকম মা কখনো দেখেছ? এই মহিলা ঐ ছেলেটিকে তাঁর গর্ভে ধরেছেন, প্রসব করেছেন, কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। আর আজ যখন ছেলেটা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সেই মা বিপ্লবী সেজে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন। বাঃ বাঃ বাঃ, চমৎকার মা! ঐ ছেলে---প্রথম কথা বলে মা ডেকে, এই মহিলাকে। অন্ধকার আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকেছে বা বাজের প্রচণ্ড আওয়াজ এই ঘরটাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, তখন ঐ ছেলে বিছানায় মাকে জড়িয়ে ধরে সাহস পেয়েছে। এই মা এতদিন ছেলেকে বুকে করে আগলে রেখে এত বড়টি করে তুলেছেন —গ্রীষ্মের তাপ বর্ষার জল শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কেন, হোয়াই! কী লাভ হলো? সেই মাকেই তো আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হলো তার একমাত্র ছেলের বীভৎস মৃত্যুদৃশ্য।

বৃদ্ধা। হ্যাঁ, আমার একমাত্র ছেলে—ও কোনো অন্যায় করেনি, অপরাধ করেনি।

কম্যাণ্ডার। করেনি বুঝি? ক্যাপ্টেন, আমি বড় ক্লান্ত। অপরাধের তালিকাটা তুমি একবার পড়ে শোনাও তো।

ক্যাপ্টেন। [কাগজ পড়ে] আপনার ছেলে দেশের আইন ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে আমাদের স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শত্রু কতিপয় ভিয়েতকঙকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং এখনো তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। উপরন্তু, আমাদের শত্রুরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের ঘৃণ্য কমিউনিস্ট সৈন্যদের যোগসাজসে আপনার ছেলে নানাবিধ রাষ্ট্র-

বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত আছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের আইন অনুযায়ী আপনার ছেলের মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য।

কম্যাণ্ডার। ও-কে, ও-কে, দ্যাট'ল ডু। বুড়িমা, আপনার ছেলে আরেকটা জঘন্য অপরাধে অপরাধী। সেটা হলো ওর অজ্ঞানতা, মূর্খতা। ও জানে না পৃথিবার কোনদিকে চাঁদ আর কোনদিকে খাদ।

বৃদ্ধা। তুমি যতই বাবা চ্যাঁচাও লাফাও ঝাঁপাও, আমার কাছ থেকে একটা কথাও বের করতে পারবে না, আমার ছেলের কাছ থেকেও না।

ক্যাপ্টেন। সেক্ষেত্রে উনি যদি আপনার ছেলেকে কেটে টুকরো টুকরো করে এই গাঁয়ের চারধারে ঝুলিয়ে রেখে দেন খুব অন্যায় হবেকি?

বৃদ্ধা। ওই কাজটা করার জন্যেই তো মানুষের দেশে কুকুরের জন্ম নিয়েছ বাবা। তোমাদের মতো কুকুরদের তো আমরা চিনি। তোমরা সামান্য এক প্যাকেট চ্যুইংগামের জন্যে তোমাদের বৌদের ইয়াঙ্কি বাঁদরদের বিছানায় ছেড়ে দিয়ে আসতে পারো! তাদের গর্ভে ইয়াঙ্কিদের ঔরসে তোমাদের যেসব সন্তান জন্ম নেবে, তাদের গায়ে মার্কিনী গন্ধটা আরেকটু বেশিই থাকবে, ষোল আনা নেড়ীকুত্তা তারা হবে না।

কম্যাণ্ডার। চুপ কর হারামজাদী মাগী, বুড়ি ডাইনী কোথাকার। তোকে আমি জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।···ওই ছোকরার আগেই আমাদের এখানে আসা উচিত ছিল। পাশের ঘর থেকে লুকিয়ে সব শোনা যেত।

ক্যাপ্টেন। সত্যি, আমার তো একবারও মাথায় আসেনি কথাটা।

কম্যাণ্ডার। মাথা আছে যে আসবে?

ক্যাপ্টেন। কিন্তু স্যার, কাজটা বোধহয় ঠিক হতো না।

কম্যাণ্ডার। কেন?

ক্যাপ্টেন। প্রথমত, ভিজে মাটির ওপর পায়ের দাগ দেখে বোঝা যেত আমরা এবাড়িতে এসে উঠেছি। দ্বিতীয়ত, এই বুড়ি নিশ্চই বলে দিত যে আমরা ভেতরে লুকিয়ে আছি।

কম্যাণ্ডার। বলে দিত না যখন জানত যেকোনো সময় মাথার খুলি ফেটে ঘিলু বেরিয়ে আসতে পারে।

বৃদ্ধা। তোমাদের সঙ্গে আমাদের ওইটুকুই তো তফাৎ। আমাদের মাথায় ঘিলু থাকে, আর তোমাদের থাকে মার্কিন গরুর গোবর।

কম্যাণ্ডার। ক্যাপ্টেন, এই হারামজাদীকে আমার সামনে থেকে দূর করবে কিনা! যতসব অপদার্থ।

বৃদ্ধা। যতই বাবা গাল পাড়ো, তুমি কোনো খবরই পাচ্ছ না—এ-বিষয়ে নিশ্চিত থেকো।

কম্যাণ্ডার। আই সে, গেট হার আউট।

[ক্যাপ্টেন বৃদ্ধাকে টেনে নিয়ে বাইরে তাঁর ছেলের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরে ফিরে আসে]

ক্যাপ্টেন। যাই বলুন না কেন স্যার, কয়েকটা কথা কিন্তু বুড়ি ঠিকই বলেছে।

কম্যাণ্ডার। যেমন?

ক্যাপ্টেন। এখবর তো আর কারো অজানা নয় যে সাইগন সরকারের মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে কেরাণী পর্যন্ত অনেকে তাঁদের আমেরিকান প্রভুদের নানা ধরনের উপঢৌকনই দিয়ে থাকেন। আর সেই উপঢৌকনের তালিকায় প্রথম স্থান পাবে বোধহয় নারীদেহ। ওদের কাছে জিনিসটার চাহিদাও বেশি। বিদেশ বিভুঁই, সঙ্গীহীন জীবন।

কম্যাণ্ডার। ক্যাপ্টেন, আমি বুঝতে পারছি তুমি একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করছ। হ্যাঁ, একথা সবাই জানে যে আমার স্ত্রী জেনারেল ওয়েস-মোরল্যাণ্ডের শয্যাসঙ্গিনী, কিন্তু এও জেনে রেখো যে শুধু সেইজন্যেই আমি একটা গোটা ডিভিশনের কম্যাণ্ডার আর তুমি একটা সামান্য ক্যাপ্টেন মাত্র, ফুঃ! অথচ তোমার সার্ভিস রেকর্ড বোধহয় আমার থেকে ভালোই ছিল। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি এতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। ক্ষমতার লোভে কিছু লোক যদি গোটা দেশটাকেই একটা বিদেশী সরকারের হাতে তুলে দিতে পারে, তাহলে আমিই বা প্রমোশনের লোভে আমার স্ত্রীকে জেনারেলের বিছানায় পাঠাব না কেন? হোয়াই নট? যুক্তি দেবে যে কমিউনিজমকে ঠেকাবার জন্যেই অ্যামেরিকার সাহায্য নিচ্ছেন আমাদের সাইগন

সরকার। তাহলে আমিও বলি, ভ্যান ময়কে ঠেকানোর জন্যেই আমি আমার সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়েছি। আমি জানতুম যে আমার স্ত্রী ভ্যান ময়ের প্রেমে পড়েছে। আর পড়বে নাইবা কেন? ভ্যান ময় আমার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্বান বুদ্ধিমান সৎ এবং সুন্দর।

ক্যাপ্টেন। কিন্তু স্যার—

কম্যাণ্ডার। কোনো কিন্তু-টিন্তু নয়। এ-লাইনে যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে এগুলো তোমাকেও মেনে চলতে হবে। আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি তুমি আমার কথার ওপর কথা বলেছ, আমি যা ভেবেছি তার চেয়ে বেশি ভেবে বসে আছ, আমার কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ। নেহাৎ অতীতে তুমি আমার বন্ধু ছিলে, তা না হলে তোমার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎটা একটু খারাপই হতো।

ক্যাপ্টেন। সবই বুঝতে পারি স্যার। কিন্তু আপনার কতগুলো ব্যাপার আমি ঠিক সমর্থন করতে পারি না।

কম্যাণ্ডার। তোমার তো সমর্থন করার কথা নয়। আমি অর্ডার দেবো, তুমি শুধু সেটা পালন করবে। ব্যস, তোমার দায়িত্ব শেষ। ধরো, আমি যদি এই কচি মেয়েটার ওপর বলাৎকার করতে বলি তোমাকে।

ক্যাপ্টেন। স্যার, আপনি অত্যন্ত কুৎসিৎ ঠাট্টা করছেন।

কম্যাণ্ডার। অবশ্য এক্ষেত্রে আইনের দোহাই পেড়ে তুমি বলতে পারো যে কোনো লিখিত আইনে বলাৎকারের আদেশ দেবার অধিকার আমার নেই। আর তুমি যদি একটা বুদ্ধু গোঁয়ার না হও তাহলে আমার আদেশকেই আইন বলে মেনে নিতে। যাক ছেড়ে দাও। আমার দ্বিতীয় আদেশ, বাইরে ওই ছোকরাকে এক্ষুনি খতম করে এসো।

ক্যাপ্টেন। সত্যি, আপনার ক্ষমতা অসীম।

কম্যাণ্ডার। কোথায়? অসীম ক্ষমতাই যদি থাকত, তাহলে আমাকে এভাবে হেরে যেতে হয় একটা চাষা আর তার বিধবা মায়ের কাছে। তোমার কাছে আমার প্রতিটি কথার অনেক দাম, কিন্তু ওদের কাছে? এক কাণাকড়িও নয়। সাইগন থেকে আসার সময় আমার ধারণা ছিল আমাদের ক্ষমতা বুঝি সত্যিই অসীম। কারণ, আমাদের পেছনে রয়েছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র অ্যামেরিকা। কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ের

একটা চাষার স্বপ্নের পেছনে, এক বুড়ি বিধবার এই সাহসের পেছনে, কী আছে দেখতে ইচ্ছে করে। সেটা যদি কমিউনিজম হয়, তাহলে কমিউনিজম একটা দারুণ ব্যাপার—মাই হ্যাটস অফ টু ইট. মাই হ্যাটস অফ টু ইট। ঐ ছোকরা কিছুক্ষণ আগে বলছিল না, আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ ছিল না। সত্যিই তাই। এদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে অ্যামেরিকানরা কেন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় বুঝতে পারছি।

ক্যাপ্টেন। ক্ষমতা আপনার ঠিকই আছে। ওদের মুখ খোলাতে না পারেন, চিরকালের জন্যে বন্ধ তো করতে পারেন।

কম্যাণ্ডার। ঠাট্টা করছ? কাটিং জোক্স? অঁ্যা? কিন্তু তলায় পড়েও আমাকে জিততেই হবে। সো, গো অ্যাণ্ড হ্যাং হিম—

[ত্রাং বুঝতে পারে দিন্-এর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে, তাই আর্তনাদ করে ওঠে]

কী? কিছু বলবে খুকুমণি?

ত্রাং। [ভয়ার্ত] ওকে কি আপনারা মেরে ফেলবেন?

কম্যাণ্ডার। সেইরকমই তো ইচ্ছে।

ত্রাং। [কান্নায় ভেঙে পড়ে] আমি বলতে পারি।

কম্যাণ্ডার। কী বলতে পারো?

ত্রাং। আমি বলতে পারি—

কম্যাণ্ডার। কী বলতে পারো?

ত্রাং। আপনারা যা জানতে চাইছেন—

[বৃদ্ধা কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন। বাইরে থেকে ছুটে ভেতরে আসেন। ক্যাপ্টেন হাত দিয়ে তাঁকে আটকায়]

বৃদ্ধা। [চীৎকার করে] ত্রাং!

ত্রাং। কথা দিন ওকে আপনারা ফাঁসি দেবেন না।

কম্যাণ্ডার। ফাঁসি? কক্ষনো নয়।

ত্রাং। ওকে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

কম্যাণ্ডার। আমি বলছি ও তোমাদেরই থাকবে, এখানেই থাকবে। এবার বলো—

ত্রাং। তাহলে শুনুন, জঙ্গলে নাম-ও ব্রীজটার কাছাকাছি ওর সঙ্গীরা লুকিয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের একদল কুয়াং-ত্রির দিকে রওয়ানা হবে। বাকিরা—

কম্যাণ্ডার। বাকিরা—?

ত্রাং। বাকি ব্রীজটা ধ্বংস করবে।

কম্যাণ্ডার। ও যীশু! তোমার করুণা সত্যি অপার। ক্যাপ্টেন, আমাদের ক্ষমতা সত্যিই অসীম, ক্যাপ্টেন সত্যিই অসীম। ক্যাপ্টেন, আমি কথা দিয়েছি ওর ফাঁসি হবে না—সো ডোণ্ট হ্যাং হিম, জাস্ট শুট হিম টু ডেথ।

[ক্যাপ্টেন দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যায়। কম্যাণ্ডার শিস্ দিতে দিতে একটা অ্যামেরিকান সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বাইরে যায়। ঘরে বৃদ্ধা রমণী ও ত্রাং। বৃদ্ধা ঘরের একটা লুকনো জায়গা থেকে একটা গ্রেনেড বের করলেন। বাইরে দেখা যাচ্ছে দিন্‌কে ঘিরে ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে। সেণ্ট্রি গুলি করার আদেশের অপেক্ষায়। ক্যাপ্টেনের কম্যাণ্ড শোনা যায়: রেডি ফর অপারেশন—ওয়ান—টু—। বৃদ্ধা মুখে করে ডিটোনেটারটা সরিয়ে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দেন বাইরে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বাইরের চারজনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঘরের বেড়ায় আগুন ধরে যায়। বৃদ্ধা ও ত্রাং বাইরের দিকে তাকিয়ে 'দিন্' বলে আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই বৃদ্ধা নিজেকে সামলে নেন। ঘরের মেঝের নিচে থেকে লুকনো ট্রান্সমিটারটা বের করেন। কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে তিনি দূরে দুরান্তরে বার্তা পাঠান: হ্যালো, হ্যালো, লাল পতাকা কথা বলছি—। ত্রাং উঠে এসে মাসীর পাশে দাঁড়ায়। দুজনের মুখে আগুনের রক্তিম আভা।

যবনিকা নেমে আসে

১ নাটকটি ১৯৬৭ সালে রচিত। কাহিনীগত কাঠামো নেওয়া

হয়েছে একটি বিদেশী একাঙ্ক থেকে। যাঁদের কবিতা বা কবিতার অংশবিশেষ এ-নাটকে ব্যবহৃত, নাট্যকার তাঁদের কাছে এই সুযোগে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করছেন। তাঁরা হলেন : শঙ্খ ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তাছাড়াও স্বয়ং হো চি মিন-এর কাব্যাংশও (অনুবাদ : বিষ্ণু দে ও কমলেশ সেন) এতে ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকটি অভিনয়ের জন্যে নাট্যকারের অনুমতি প্রয়োজনীয় নয়।

পুস্তক-পরিচয়

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন—একটি কাব্য। ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি: সিদ্ধেশ্বর সেন কৃত অনুবাদ। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬ বিধান সরণী। তিন টাকা

চল্লিশ দশকের শেষপাদে আমরা যখন ছাত্র তখন যে কজন কবির নাম আমরা কথায় কথায় উল্লেখ করতাম, ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি তাঁদের অন্যতম। তখনো, অবশ্যই, আমরা অনেকেই তাঁর কবিতা পড়িনি, শুধু নাম শুনেছি। শুনেছি তিনি মহান অক্টোবর বিপ্লবের চারণ এবং সেই বিপ্লব-সূচনার তীব্র আকাশস্পর্শী উল্লাস থেকে বিপ্লবোত্তর সাংগঠনিক স্থৈর্য তাঁর কাব্যের দর্পণে প্রতিফলিত। শুধু এইটুকুতেই তিনি আমাদের মন কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারপর আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হার্বার্ট মার্শাল এবং তাঁর শ্রী ফ্রেডা ব্রিলিয়ান্ট কৃত একটি অনুবাদ হাতে আসে। ঐ মাঝারি আকারের গ্রন্থে মার্শাল মায়াকভস্কির সাহিত্য-জীবনের একটি রূপরেখা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আমার সঙ্গে মায়াকভস্কির পরিচয় মূলত ঐ গ্রন্থের মাধ্যমেই। আর সত্যি কথা বলতে কি, ঐ অনুবাদ-কাব্য আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল—যে কারণে একদা আমিও আমার মতো করে চেষ্টা করেছিলাম মায়াকভস্কির কিছু কিছু কবিতা অনুবাদ করতে।

হার্বার্ট মার্শালের সেই কালো মলাটের Mayakovsky and his poetry বইখানি আজ আর আমার কাছে নেই, বাজারেও বোধকরি পাওয়া যায় না। পনেরো বছরেরও বেশি সময় আগে ঐ বইখানি আমার নিত্যসঙ্গী ছিল। বারবার পড়েছি, মায়াকভস্কির এক-একটা শব্দ নিয়ে অনেক সময় ধরে ভেবেছি, ঠিক প্রতিশব্দ খোঁজবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেছি—সময়ের ব্যবধানেও সে-দিনগুলির কথা ভোলবার নয়! এই কিছুদিন আগে বইয়ের দোকানে ঘুরতে ঘুরতে মস্কোর Progress Publishers প্রকাশিত মায়াকভস্কির 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন' কাব্যখানি দেখে, নিতান্ত আবেগের

বশেই কিনে নিয়ে আসি। মায়াকভস্কির এই কাব্যটির আংশিক অনুবাদ আমি এর আগে মার্শালের বইতে পড়েছিলাম বলেই সমগ্র বইটি পড়ার ইচ্ছে ছিল। এই গ্রন্থটি পড়তে গিয়েই খুব স্বাভাবিক ভাবে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে। ঠিক এই সময়েই উক্ত কাব্যখানির শ্রী সিদ্ধেশ্বর সেন কৃত একটি বাঙলা অনুবাদও হাতে এল। অতএব এই প্রসঙ্গে মোটামুটিভাবে মায়াকভস্কির কবিতা এবং তার অনুবাদ সম্পর্কে আমার ভাবনা তুলে ধরবার সুযোগ পাব বলেই এই আলোচনার সূত্রপাত।

মায়াকভস্কির কবিতা কেন আমাকে এমন প্রবলভাবে টেনেছিল, এ-প্রশ্ন আজ যদি নিজেকেই করি, তবে উত্তর দেওয়া বোধহয় সহজ হবে না। কেননা কাব্য-উপভোগ অনেকটাই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার যা ভালো লাগবে, আরেকজনের তা ভালো নাও লাগতে পারে এবং অনেক কমিউনিস্ট লেখককেও আমি বলতে শুনেছি, মায়াকভস্কি কবিতা বলতে যা বোঝায় তা কখনো লেখেন নি। আমি মায়াকভস্কির কবিতা পড়বার আগে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনাই শুনেছি, আমাদের কাছে পুজো পাওয়ার মতো একটা মাত্র গুণই তাঁর ছিল, সে হচ্ছে তাঁর কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি অনুরক্তি। তবু মায়াকভস্কির কবিতা আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু কেন? যদি উত্তর দিতেই হয়, তবে বলব মায়াকভস্কির সব কবিতাতেই আমি একটা মানুষের উচ্চ স্পর্শ পেতাম, যে স্পর্ধিত অভিমানী দর্পিত আবার শিশুর মতো সরল। মানুষটা তার কবিতার প্রতিটি বাক্যের চূড়ায় যেন হৃদয়টি এমনভাবে মেলে দিত, যাতে তার পাশে বসা যায়, তার দুঃখে দুঃখিত হওয়া যায়, আনন্দে হওয়া চলে আনন্দিত। Cloud in Trousers-এ ব্যর্থ প্রেমের বেদনার প্রকাশে তিনি যেভাবে তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়কে পতাকার মতো আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তাতে তাঁর যে আন্তরিকতা; আবার দেশে ফেরার আনন্দে জাহাজের কেবিনে শুয়ে যখন তাঁর মনে হয়েছে যে তিনি সোভিয়েত কারখানা সুখশান্তি উৎপাদন করছেন—তখনো তাঁর সেই আন্তরিকতা। এই আন্তরিকতাই মায়াকভস্কির কাব্যের সবচেয়ে বড় গুণ। তিনি ভালোবাসাতেও আন্তরিক, আবার ঘৃণাতেও আন্তরিক।

মায়াকভস্কির আরেকটা দিক যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, তা তাঁর

বাক্‌নির্মিতি। মায়াকভস্কির এই শব্দচয়ণ আর বাক্‌নির্মিতি নিয়ে সমালোচক মহলে তীব্র মতভেদ আছে। কেউ কেউ তো বলেই বসেছেন "he delibarately lowered and vulgarised the poetic vocabulary". প্রশ্নটি অবশ্যই জটিল—কাব্যশরীর গঠনে শব্দের প্রয়োজন যত, তেমনি তাতে রক্ত মাংস এবং প্রাণ সংযোজনেও তার দরকার ঠিক ততটাই। ঠিক কোন শব্দের পরে কোন শব্দ বসালে কাব্যের বিদ্যুতবিকাশ ঘটে—তার রহস্য একমাত্র কবিরই জানা। মায়াকভস্কি এই শব্দব্যবহার কতটা সার্থকভাবে করতে পেরেছিলেন, তার বিচার আমরা করার অধিকারী নই, কেননা মূল রুশ ভাষা আমাদের অজ্ঞাত। মার্শাল বলেছেন, মায়াকভস্কি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথ্যভাষাকে এমনভাবে কাব্যে ব্যবহার করেছেন যাতে তাঁর কবিতা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে এক নূতন প্রাণস্পন্দনে। রুশ বিপ্লব যেভাবে শতাব্দী-সঞ্চিত শোষণের অবসান ঘটিয়ে অত্যাচারিত শ্রমজীবী মানুষের সামনে এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, তেমনি সে-বিপ্লবের ফলেই জেগে উঠেছে, পুরনো সব ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেই, এক নূতন ঐতিহ্য, নূতন মূল্যবোধ। পুরনো কালের সৌন্দর্যবোধ এই নূতনযুগের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে অক্ষম ছিল। মায়াকভস্কি তাঁর শব্দচয়নে, প্রতীক নির্বাচনে, এই নূতন যুগের প্রাণস্পন্দনকে ধরবার চেষ্টাই শুধু করেননি, তাকে সার্থকভাবে প্রকাশও করেছেন। তাই বিপ্লবের তরঙ্গ অভিঘাতে আত্মকেন্দ্রিকতার খোলস ছেড়ে তিনি যখন বেরিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর কাছে মনে হয়েছে, বিপ্লবপূর্ব যুগে রচিত Cloud in Trousers আর সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার পর রচিত Very Good মূলত একই মানসিকতার সৃষ্টি—যদিও উভয়ের ভিত্তিভূমি একেবারে আলাদা। Cloud in Trousers-এ তিনি তরুণী মারিয়া আলেকজান্দ্রভা-র প্রেমে আত্মহারা, আর Very Good কবিতায় তিনি নবীনা রুশিয়ার প্রেমে বিহ্বল। মানসিকতার এই পরিবর্তন সহজে হয়নি, নানা উত্থান-পতন, নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে কয়লার গুণগত পরিবর্তন ঘটে হীরায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তন অবশ্যই দৃষ্টিকোণের। আত্মকেন্দ্রিকতার খোলসের ভেতরে আটকা থেকে মায়াকভস্কি যে বিপ্লবকে তাঁর একার বিপ্লব বলে অহংকৃত হয়েছিলেন, সেই বিপ্লবই তাঁকে বেঁধে নিয়ে সংযুক্ত করে দিল

সবার সঙ্গে। আর এই পরিবর্তনের ফলে তাঁর শব্দনির্বাচন প্রতীক-ব্যবহার এমনভাবে বদলে গেল ; এমন সহজভাবে, বলা চলে এমন অকাব্যিক ভাবে, তিনি এই বিরাট বিপুল পরিবর্তনের কথা বলতে শুরু করলেন—যা প্রাচীনপন্থীদের চিন্তাধারার উপরে প্রচণ্ড আঘাত হিসেবে দেখা দিল। যা ছিল প্রবন্ধের বিষয়, মায়াকভস্কি তাকেই রূপ দিলেন কবিতায়। এ-ই মায়াকভস্কির নয়া সৌন্দর্যবাদ। বিপ্লব যে-শোষিতশ্রেণীকে রাজতক্তে বসাল, মায়াকভস্কি সেই শ্রেণীর ভাষাকেই টেনে তুললেন সাহিত্যের দরবারে। তিনিই এই নূতন রাজতক্তের প্রথম সভাকবি।

মায়াকভস্কির আরেকটি বিশেষ দিক তাঁর ছন্দ—একে তাঁর প্রথমতম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করলেও ভুল হয় না। মায়াকভস্কি ফরাসী চারণ-কবিদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে জনসভায় কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। আবৃত্তির সুবিধার জন্যই তিনি তাঁর কবিতার পংক্তিকে এমনভাবে ভেঙেছেন, যাতে পাঠককে কোনো অসুবিধায় পড়তে না হয়। আবৃত্তির সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে মায়াকভস্কি যে ছন্দ বিভাগ করেছিলেন, তাকেই সাধারণভাবে বলা হয় Speech rythm বা কথ্যছন্দ। আপাত দৃষ্টিতে পড়তে গেলে মনে হবে ছন্দপতন ঘটছে—যেমনটা ঘটে গানকে কবিতার মতো পড়তে গেলে। কিন্তু আবৃত্তি-সুর এসে লাগলেই এক অভিনব ছন্দস্পন্দনে বেগবান হয়ে ওঠে মায়াকভস্কির কবিতা। এ-সত্ত্বেও মার্শাল বলেছেন মায়াকভস্কির ছন্দের মূল নির্ভরতা Iambic-এর উপর। এরই মাত্রাকে বাড়িয়ে-কমিয়ে তিনি তাঁর নিজের উপযোগী ছন্দ তৈরি করে নিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন অনুবাদে মায়াকভস্কির কবিতার এ-বৈশিষ্ট্য কতটা আনা সম্ভব বা আদৌ আনা সম্ভব কিনা। কেউ কেউ বলেন, কবিতার অনুবাদ হয় না, হয় ঐ কবিতার ভাব নিয়ে নূতন কবিতা সৃষ্টি। কবিতা সুনির্বাচিত শব্দ এবং প্রতীকের সমবায়ে এমন এক জটিল প্রকাশপদ্ধতি যাতে কবির ব্যক্তিস্বরূপ স্বতঃই জড়িয়ে যায়। শব্দ আর প্রতীকের খোলস ভেঙে কবির বক্তব্যটুকুর অনুবাদ কঠিন কাজ নয়, কঠিন কবির ব্যক্তিত্বকে অনুবাদ করা। অনেকে বলেন এটা সম্ভব নয়, অনেকে বলেন তাও সম্ভব। আমি নিজে মনে করি কবিতা অনুবাদ করা যায়। অনুবাদ কাজটাই অনেকটা অভিনয়ের মতো। রাজা না হয়েও রাজা সাজা। যদি দর্শক তথা

পাঠকের মনে অনূদিত (অভিনীত) ব্যক্তির স্বরূপ সম্পর্কে একটা মোহের সৃষ্টি হয়, তবেই অভিনয় তথা অনুবাদ সার্থক।

আমি মায়াকভস্কির কবিতার তিনটি অনুবাদ পড়েছি। দুটি ইংরেজী এবং একটি বাঙলা। সিদ্ধেশ্বর আরো-একটি ইংরেজী অনুবাদের কথা বলেছেন, দুর্ভাগ্যবশত সেটি আমার চোখে পড়েনি। এই তিনটির মধ্যে দুটি মূল রুশ থেকে আর একটি ইংরেজী থেকে পূর্বোক্ত দুটি ইংরেজী অনুবাদ মিলিয়ে। ইংরেজী অনুবাদ দুটি কেমন হয়েছে, অর্থাৎ মূল রুশ ভাষার তা কতটা অনুসারী বা মায়াকভস্কির ব্যক্তিস্বরূপ তাঁরা কেমন ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন—তা আমার পক্ষে বলা শক্ত, কেননা আমিও সিদ্ধেশ্বরের মতোই মূল রুশ ভাষা জানি না। তবে কবিতার অনুরাগী হিসেবে, মার্শাল এবং অন্যান্য সোভিয়েত সাহিত্য-সমালোচনা পড়ে, মায়াকভস্কি এবং তাঁর কবিতা সম্পর্কে যে-ধারণা হয়েছে —তাতে আমার বিবেচনা মতো মনে হয়েছে, হার্বাট মার্শাল এবং ক্রেডা ব্রিলিয়াণ্টের অনুবাদই অনেক বেশি সার্থক। সে ক্ষেত্রে রোটেনবার্গ মনে হয় যথাযথ হতে গিয়ে মায়াকভস্কির ব্যক্তিস্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হননি।

মায়াকভস্কির অন্যান্য কবিতা বাদ দিয়ে তাঁর 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন' নামক কাব্যগ্রন্থখানি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। মায়াকভস্কি কাব্য-খানি রচনা করেন ১৯২৪ সালে, লেনিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। এই গ্রন্থ-খানি সম্পর্কে মায়াকভস্কির নিজের মনেও যথেষ্ট সংশয় ছিল, পরে নানা জনসভায় পাঠ করে এবং কাব্যখানি সম্পর্কে জনসাধারণের কৌতূহল লক্ষ্য করে তাঁর সংশয় দূরীভূত হয়। তিনি বুঝতে পারলেন, এর প্রয়োজন ছিল।

কি এই প্রয়োজন? লেনিন-এর নানা চরিতকথা ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। তবু মায়াকভস্কি কেন এই কাব্যখানি রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন? তিনি বলেছেন:

Write !—
Votes my heart
Commisioned by
the mandate
of duty.

[Dorian Rottenberg]

ছন্দ বানাও—

হৃদয় আমার

ভোট দিল নিঃশেষ,

লেখ কবি—

যাঁকে হুকুমনামা

কর্তব্যের দাবি ॥

[সিদ্ধেশ্বর সেন]

mandate of duty বা "কর্তব্যের দাবি" [mandate কোন রুশ শব্দের প্রতিশব্দ জানি না, তবে ইংরেজীতে মার্শালও mandateই করেছেন। ইংরেজী অনুযায়ী সিদ্ধেশ্বর যদি "দাবি" না করে "নির্দেশ" করতেন, তবে আরো সুষ্ঠ হত] মায়াকভস্কি অনুভব করেছেন। তিনি লেনিনকে শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই দেখেননি। তাঁর দৃষ্টিতে লেনিন ইতিহাসের অমোঘ আবির্ভাব।

For,

Far back,

Two hundred years or so

the earliest beginnings

of Lenin go.

[Rottenberg]

একদা এক

অতীত যুগে, আগে—

দু'-শতকও পার—

জেনেছিল লোকে প্রথম

সেই সে কবে—

লেনিন বিশ্বে জাগে ॥

[সিদ্ধেশ্বর সেন]

'লেনিন' কাব্যে মায়াকভস্কি পর্বে পর্বে লেনিনের এই ঐতিহাসিক আবির্ভাবকে উন্মোচিত করেছেন, দেখিয়েছেন কিভাবে তিনি যুগসঞ্চিত মানবিক বেদনাকে অমৃততীর্থের দিকে পরিচালিত করেছেন। লেনিনের

জীবন ও মৃত্যু তাই মায়াকভস্কির কাছে কোনো মানুষ বা জাতীয় নেতার জীবন ও মৃত্যুমাত্র নয়। লেনিন তাঁর কাছে বিপ্লবের প্রাণপুরুষ। তাই মানবিক বিয়োগবেদনার প্রথম অভিঘাত উত্তীর্ণ হয়েই যখনই তাঁর চোখ পড়ছে লেনিনের আবির্ভাবের দীর্ঘ পতন-অভ্যুদয়-ভরা ইতিহাসের দিকে, তখনই মনে হয়েছে লেনিন মৃত্যুহীন :

Lenin,
alive as ever,
cries :
workers,
prepare
for the last assault !
Slaves,
unbend your knees and spines !
Proletarian army,
rise in force !
Long live
the Revolution
with speedy victory
The greatest
and justest
of all the wars
ever fought
in history !
[Rottenberg]

ফের সামনে এসে,
দেখ
দাঁড়ান লেনিন :
শ্রমিক,
সজ্জিত হও,
হান শেষের আঘাত !

দাস,
শক্ত কর
শিরদাঁড়া ফের !
সর্বহারা বাহিনী
ওঠো সবলে-সাহসে !'
বিপ্লব
অমর—
বিনয় নিয়ে আসে
এই মহত্তম,
বৃহত্তম
যুদ্ধ ন্যায়ের
কখনো
হয়নি লড়া
আগে ইতিহাসে !!
[সিদ্ধেশ্বর সেন]

মার্শাল মনে করেন পৃথিবীতে যে-কয়েকখানি মহৎ কাব্য রচিত হয়েছে, মায়াকভস্কির লেনিন তার অন্যতম। মার্শাল নিজেও এই কাব্যখানি, অর্থাৎ খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে লেনিন সম্পর্কে মায়াকভস্কির ধারণা বোঝাতে যতটুকু দরকার ততটুকু, অনুবাদ করেছিলেন। মার্শালের ঐ অনুবাদ আমি পূর্বেই পড়েছি। বর্তমানে মস্কো থেকে প্রকাশিত রোটেনবার্গের অনুবাদও বেশ খুঁটিয়ে পড়লাম। এইখানেই বেশ অসুবিধায় পড়েছি—নিজের অবস্থা সেই বনফুলের পাঠকের মৃত্যুর মতো। লেনিনের মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হওয়ার পরে যে উত্তাল বেদনাকে মার্শাল তাঁর অনুবাদেও অন্তত প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, রোটেনবার্গে সেই তীব্রতা কোথায়! মার্শালের বইখানি আজ হাতের কাছে না থাকায়, দুটি বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ; তবু একথা নিশ্চিত বলতে পারি—ছন্দ ও শব্দব্যবহারে মার্শাল যত সচেতন ছিলেন, মায়াকভস্কির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রোটেনবার্গ ততটা অবশ্যই নন।

প্রখ্যাত কবি শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন এই মহৎ গ্রন্থখানি লেনিন শতবার্ষিকীর সূচনা বছরে অনুবাদ করে অবশ্যই একটি গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। তবে

অনুবাদের জন্য তিনি রোটেনবার্গের উপর বেশি নির্ভর না করে যদি মার্শালের উপরে নির্ভর করতেন, তবে অনুবাদ আরো সুষ্ঠ হতে পারত। রোটেনবার্গ মায়াকভস্কির পদের অন্ত্যমিল বজায় রেখেছেন সত্যি, কিন্তু ছন্দস্পন্দ কাব্যদেহে সঞ্চারিত করতে পারেননি। সিদ্ধেশ্বরও রোটেনবার্গের মতোই মোটামুটি ভাবে অন্ত্যমিল রেখেছেন, কিন্তু ছন্দস্পন্দ বজায় রাখেননি, কবি হিসেবে যা তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ছিল! এছাড়া যে স্পষ্টতা ও ঋজুতা মায়াকভস্কির বৈশিষ্ট্য, সেই স্পষ্টতাও তাঁর অনুবাদে সর্বত্র লক্ষিত নয়। শব্দ-ব্যবহারেও তাঁর আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল।

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

রুশ বিপ্লবের মহান সৈনিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রখ্যাত জননায়ক, ক্লিমেণ্ট ভরোশিলভ-এর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

প্রখ্যাত কবিয়াল লম্বোদর চক্রবর্তী আর নেই। কবিগানের আসরে তাঁর অভাব দীর্ঘদিন অনুভূত হবে। রাজ্যের জনপ্রিয় সরকার এই প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় কবিয়ালের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ এবং সংরক্ষণে উদ্যোগী হলে লোকশিল্পের এক অবহেলিত ধারার প্রতি কিছুটা কর্তব্য-পালন করা হবে। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

অগ্নিযুগের সৈনিক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান অনেককেই বিচলিত করবে। অথচ সুদীর্ঘকাল তিনি প্রচণ্ড অভাব-অনটনের মধ্যে এক বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেছেন। এই সময়ে তাঁর কয়েকটি বই বেরিয়েছে। লেখকের মতো বইগুলিও বিতর্কমূলক। 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর একটি গ্রন্থ কিছুদিন আগেই সমালোচিত হয়েছে। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত মত সব সময় মেনে নিতে না পারলেও তাঁর চারিত্র সম্পর্কে সকলেই সশ্রদ্ধ ছিলেন। আমরা আজীবন সংগ্রামী এই বিচিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

—সম্পাদক

তোমার নাম আমার নাম…

নিখিল ভারত শান্তি সংসদ ও আফ্রোএশীয় সংহতি সমিতির আমন্ত্রণে সম্প্রতি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের এক শক্তিশালী প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে এসেছেন। দলটি কলকাতায়ও কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে ইন্দোচীনের ফরাসী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কলকাতা শহরের দুই ছাত্র বৃটিশ টমির বন্দুকের সামনে বুক পেতে সিনেট ভবনের সিঁড়ি রাঙিয়েছিল। সিনেট ভবন আর নেই। কিন্তু ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার রক্তরাখিবন্ধন আজও অটুট আছে।

তাই ১৯৬৭ সালে বাঙলাদেশে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাঙলার সংগ্রামী মানুষ রক্তের আবির পাঠিয়েছিল।

[illegible] এই [illegible] অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধিদলের হাতে আবার তারা তুলে দিল রক্তের শুকনো প্লাজমা। দিল ওষুধ, অর্থ, 'ভিয়েতনাম' কবিতার সঙ্কলন ও 'কালান্তর' পত্রিকা। সেইসঙ্গে দিল আরও এক আশ্চর্য উপহার।

মার্কিন ঘাতক ম্যাকনামারাকে কলকাতায় ঢুকতে না-দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় ছাত্ররা গত বছর যখন বিক্ষোভ সভা করছিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাজ্যপাল ধর্মবীরের পুলিশ যে-কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়ে মেরেছিল, আমাদের ছাত্ররা 'মেড ইন ইউ-এস-এ' ছাপ মারা সেই একটি শেল প্রতিনিধি দলকে উপহার দিলেন।

প্রতিনিধিদল বিভিন্ন সভায় জানালেন—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁদের যে-সাফল্য, ভারতবর্ষের মানুষের জন্য তাঁরা সেই সাফল্যই উপহার হিসেবে বহন করে এনেছেন।

যে-টুপি মাথায় পরে মুক্তিযোদ্ধারা লড়ে, সেই টুপি তাঁরা উপহার দিয়েছেন। উপহার দিয়েছেন ভূপাতিত মার্কিন বিমানের ইস্পাতে তৈরি ফুলদানি, কাগজকাটা ছুরি আর আঙটি। উপহার দিয়েছেন জাতীয় মুক্তি-ফ্রণ্টের গানের রেকর্ড, মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন নিয়ে তোলা ১৮ মিলিমিটারের

ফিল্ম, বই। আর, সব থেকে বড় উপহার তো বাঙলাদেশের মাটিতে তাঁদের শারীরিক উপস্থিতি!

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দানে কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তরকে বাধ্য করা এবং ভিয়েতনাম থেকে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের আশু আর নিঃশর্ত অপসারণের দাবিকে জোরদার করার মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদের এই উপহারের যোগ্য করে তুলতে পারি। আমরা আশা করি বাঙলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক সমাজ ভিয়েতনামের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধভাবে পথে নামবেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাদশা খান ও আমাদের বিবেক

ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গণ-আন্দোলনের পর্যায়ে সীমান্ত গান্ধীর নাম আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসীর মুখে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো। মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা খান আবদুল গফফর খান, সেই সীমান্ত গান্ধী বাদশা খান, সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছেন। গান্ধী শতবর্ষ উৎসব কমিটির আমন্ত্রণে এই প্রবীণ যোদ্ধা ভারতে পদার্পণ করে সারা ভারত জুড়ে ঘূর্ণিঝড়ের বেগে ভ্রমণ করছেন, বক্তৃতা করছেন, নতুন করে তাঁর চেনা-জানা ভারতের মানুষের অতিপ্রিয় স্বজনমুখ দর্শন করছেন। ভারত-বিভাগ-পূর্ব কংগ্রেস-লীগ-সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে ভারত-বিভাগের আলোচনায় তাঁকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই বৃদ্ধ সংগ্রামীকে নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হলো। সেই আলাপ-আলোচনায় অন্যান্য বহু মূল্যবান মূল্যবোধ ও পাখতুনদের রাজনৈতিক স্বার্থের বিনিময়ে সওদা হলো বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা। পাকিস্তানে বছরের পর বছর চলল তাঁর দীর্ঘ কারাবাস। ভারত-উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানুষ তখন লড়ছিলেন পাখতুনিস্তানের দাবিতে। বাদশা খান সেই সংগ্রামীদের কাছে ছিল জ্বলন্ত সংগ্রামের আরেক নাম। দুর্ধর্ষ পাখতুনদের বাদশা খান খোদাই খিদমতগার (ঈশ্বরের সেবক দল)-এর আহ্বানে অহিংস গণ-সংগ্রামে সামিল করেছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে ব্রতী সেই লালকোর্তা বাহিনীর স্মৃতি এখনও সারা ভারতের

সংগ্রামী মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। পাকিস্তানের জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে, খান আবদুল গফ্ফর খান আফগানিস্থানে এলেন। সেই আফগানিস্থান থেকেই তিনি এসেছেন ভারতে। কোন ভারতে? ভারত-যাত্রার প্রাক্কালে বাদশা খান এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন: "ঠিক কথা, ভারত সওদাগর বনে গেছে। তারা আমাদের নিয়ে সওদা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ভারতের জনগণকে দেখতে যাচ্ছি।"

তিনি এসেছেন, যখন আমেদাবাদে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার ক্ষত জলন্ত, দগদগে—মোরারজী দেশাইদের মতো ব্যক্তিদের লোকদেখানো অনশনে বা গুজরাট সরকারের হাজার বক্তৃতায় যে-কলঙ্ক মুছবার নয়। বরং দেখছি, গুজরাটের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার জন্য গুজরাট সরকারের অকর্মণ্যতা ও পরোক্ষে মদত দেবার জঘন্য কাজকে জনগণের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে যখন গুজরাটের কমিউনিস্টরা আন্দোলনে নামছেন, তখন তাঁদের প্রথম সারির নেতাদের বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পালাম বিমান বন্দরে তিনি বিমান থেকে নামলেন। হাতে তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের সামান্য পুঁটলি, প্রধানমন্ত্রী তাঁর হাত থেকে নিতে চাইলেন সেটি। সরল, নম্র, বিনীত, স্বাবলম্বী অথচ তেজস্বী সেই বৃদ্ধ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর থেকে তিনি দিল্লী, আমেদাবাদ, কাশ্মীর, বারানসী, পাটনা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম—ঝড়ের মতো ঘুরছেন। পালাম বন্দরে নেমেই তিনি বলেছিলেন, "তোমরা গান্ধীজীকে ভুলে গেছ। আমার কথা যে শুনবে, তেমন আশা কী করে করি?" ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর অন্যতম প্রধান অবদান সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতা ও গণ-আন্দোলন। ভারত যে ধর্ম-বর্ণ-নিরপেক্ষ এক বহুজাতিক রাষ্ট্র, এ-রাষ্ট্রভাবনা গান্ধীজীর ছিল। তাই আমেদাবাদে সংখ্যালঘুপীড়ন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষাক্ত আক্রমণে মুহ্যমান বৃদ্ধ ভারতবাসীকে গান্ধীজীর কথা স্মরণ করতে বললেন। আমেদাবাদে তিনি আক্রান্ত মুসলিমদের বললেন, "পাকিস্তানের চেয়ে ভারতে রাজনৈতিক অধিকার অনেক বেশি। মুসলিমদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সাম্প্রদায়িক দল গঠনের মধ্যে নয়। এ-ভুলের মাশুল তোমাদের-আমাদের সবাইকেই দিতে হয়েছে। ভারতের সাধারণ মানুষের সঙ্গেই তোমাদের ভবিষ্যৎ জড়িত। তাদেরই সঙ্গে মিলেমিশে, তাদের সংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়ে,

তোমাদের ভাগ্য রচনা করতে হবে। এ-ছাড়া অন্য কোনো পথ আর নেই।" আমেদাবাদের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের তিনি একটি সভায় বললেন, "মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার বেড়াজাল অতিক্রম করে আধুনিক কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তোমাদের চলতে হবে। মুসলিম সমাজকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে। আরো অন্য দশটা দেশের দিকে তাকাও।" কলকাতার নাগরিকদের এক সভায় তিনি বললেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পৌষ মাস আসে বিত্তশালীদের, আর সর্বনাশ হয় গরীবদের। এ-সত্য ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাদশা খান আরও বলেন, "পশ্চিম বাঙলায় এসে তিনি হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে যে আন্তরিক সম্প্রীতি দেখেছেন, সারা ভারতে এমনটি আর কোথাও দেখেন নি" (যুগান্তর, ১২ই নভেম্বর ১৯৬৯)। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দায়িত্ব যে কত বেশি, তাও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো ঘটনায় পূর্ব-পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপরে প্রতিক্রিয়া হবে। এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতই শক্ত করবে। ভারত-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াইকে তা দুর্বল করে দেবে। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এক মহতী সম্বর্ধনা সভায় তিনি অনবদ্য সহজ সরল ও আন্তরিক আবেগে বললেন, "বাইশ বছর পর এই দেশে এসে দেখছি গরীব আরও গরীব হয়েছে, ধনী হয়েছে আরও ধনী···শহরে কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়লেও দেখছি গ্রাম তেমনি বিষাদ-বেদনায় ভারাক্রান্ত রয়ে গেছে।" তিনি বললেন, "গান্ধীজী, নেতাজী প্রমুখের সঙ্গে আমরা আজাদীর জন্য লড়েছি, কিন্তু বাইশ বছর ধরে ভারতে চলেছে হুকুমত (প্রভুত্ব)।" কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের তিনি গ্রামের দিকে চোখ ফেরাতে বলেছেন। বলেছেন গ্রামে যেতে, গ্রামের দ্রুত পরিবর্তন প্রয়োজন। যদিও কোন পথে গ্রামের দারিদ্র্য দূর হবে তা তিনি বলেননি, কিন্তু বলেছেন —অবিলম্বে দারিদ্র্য দূর করতেই হবে। ধনীর রচিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফাঁদে পা দেওয়ার অর্থ এই উপমহাদেশের জনসাধারণের আত্মহত্যা। বলেছেন, নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। হুকুমতের মোহে যাঁরা জনগণকে প্রতারণা করেছেন, সেই নেতৃবৃন্দকে তিনি তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন।

বাদশা খানের এই ভারতভ্রমণ আমাদের বিবেককে নতুন করে নাড়া দিয়েছে। ক্ষমতার প্রতি যিনি একান্ত নির্লোভ, যিনি কায়মনোবাক্যে সর্বত্যাগী, সেই জনগণের বন্ধু স্বাধীনতার অক্লান্ত সেনাপতি খান আবদুল গফফর খান আমাদের নমস্য। আজকের অনেক তরুণ হয়তো বাদশা খানের মতো সর্বত্যাগী বিপ্লবী আরো বহু নায়ককে মনেও করতে পারে না। আমরাও বলতে চাই, কেবল তখৎ-তাউস্ সর্বস্ব হুকুমত আমরা ঘৃণা করি। আমরা মনে করি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজাদীর জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। ধনীরা আরও ধনী হয়েছে, এই একচেটিয়া ব্যবসায় যে-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে—তাকে চূর্ণ করতে হবে। গ্রামের অশিক্ষা, অন্ধকার, দারিদ্র্য ও শোষণের জন্য দায়ী সামন্ততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে হবে। একচেটিয়া মূলধন, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের দুর্বোধ্যতাবাদ, ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতার ক্লেদ এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাইবে, চাইবে মানুষের সংগ্রামী বিবেককে কলুষ-কালিমায় কলঙ্কিত করতে। আমাদের সজাগ থাকতে হবে। বাদশা খানের বক্তব্য থেকে এই শিক্ষাই আমাদের নিতে হবে। বাদশা খান দীর্ঘজীবী হোন।

শান্তিময় রায়

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার

নোবেল পুরস্কারের এতদিনকার ইতিহাসে এই বছর এই প্রথম দুজন অর্থনীতিবিজ্ঞানীকে পুরস্কৃত করা হলো। আমরা এতে খুশি হয়েছি। অবশ্য এ-পুরস্কারের টাকা দিয়েছেন সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। সাহিত্যের বিচারে বিশ্বের অনেক মহারথী এ-পুরস্কার পাননি। যদি লেভ্ তলস্তই, ম্যাকসিম গর্কি প্রভৃতির নাম ঐ পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় থাকত—তাহলে পুরস্কারটিই ধন্য হতে পারত। সে কথা থাক। তবে, দীর্ঘদিন পরে হলেও নোবেল কমিটির মনে যে বোধ জন্মেছে—সমাজবিজ্ঞানীদেরও পুরস্কৃত করা উচিত, তাতেই আমরা আপাতত খুশি। অবশ্য ভুলতে পারছি না আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪), কুট উইকসেল (১৮৫১-১৯২৬), যোসেফ শুমপেটার, জন মেনার্ড কেইনস (১৮৮৩-১৯৪৬), ওয়াসিলি লিয়নটিয়েফ বা অস্কার লাঙ্গে—এঁরা কেউই নোবেল পুরস্কার পাননি।

এবার অর্থনীতি-বিজ্ঞানীদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রাগনার ফ্রিশ্ ও জান টিনবারজেন। প্রথম জন নরওয়েজিয়ান, দ্বিতীয় জন ওলন্দাজ। দুজনেই কলকাতায় এসেছেন, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিট্যুটের অতিথি হয়েছেন।

রাগনার ফ্রিশ্ (১৮৯৫-)-এর নাম গণিত-ভিত্তিক আর্থনীতিক তত্ত্বের ছাত্রদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। স্কান্দিনেভীয়. বিশেষভাবে সুইডিশ আর্থনীতিক চিন্তাধারার তিনি একজন বিশিষ্ট অংশীদার। ক্নুট উইকসেল, বার্টিল ওহলিন, লিনডহল. বেন্ট হানসেন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁরও নাম সগৌরবে উচ্চারিত হয়। সুইডিস আর্থনীতিক চিন্তাধারার একটি স্বকীয় দিক আছে। গত শতকের সত্তরের দশক থেকে, ইউরোপে বুর্জোয়া অর্থনীতিতাত্ত্বিকরা পূর্ণ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব নিয়ে খুব মেতে উঠেছিলেন। ক্যালকুলাসের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পদ্ধতির সাহায্যে তাঁরা পূর্ণ প্রতিযোগিতার তাৎপর্যে উৎপাদনের উপকরণগুলির কাম্য ব্যবহার হিসাব করতে চাইতেন। তাঁরা মনে করছিলেন, প্রান্তিকতার (marginal) তত্ত্ব ব্যবহার করে তাঁরা প্রমাণ করেছেন, প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিগত-মালিকানাবিধৃত উৎপাদন দেশের সর্বোত্তম কল্যাণ এনে দিতে পারে। বলা বাহুল্য, তখনও ছিল পুঁজিবাদের 'শান্তিপূর্ণ প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী বিকাশের যুগ'। মার্কস যে মূলধনের মালিকানার সম্ভাব্য এককেন্দ্রিকতা এবং অতিউৎপাদনের সঙ্কটের মধ্য দিয়ে মাঝেমধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্ব-বৈপরীত্যের আপাত-নিরসন ইত্যাদির কথা বলেছিলেন, বুর্জোয়া ভাবাদর্শের পরিপোষকেরা সেসব কথা ভাবতেই ইচ্ছুক ছিলেন না। ইতিমধ্যে সুইডেনের প্রতিভাধর অর্থনীতিবিদ্ ক্নুট উইকসেল ঐ তত্ত্বের গোড়া ধরেই কুড়োল চালালেন। বললেন, জনগণের মধ্যে আয় বণ্টনগত কল্যাণকর অবস্থা ব্যতিরেকে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় আর্থনীতিক কল্যাণ উৎপাদনের তত্ত্ব একধরনের সোনার পাথরবাটি মাত্র। বললেন, "যদি সব শর্তগুলি মূলত অসম হয়ে থাকে, কারো যদি আগে থেকেই হাতে ভালো তাস এসে গিয়ে থাকে, অথচ আর-আর সবার হাতে খারাপ তাস, তবে স্বাধীন প্রতিযোগিতার অর্থ দাঁড়াবে প্রথম দলের প্রতিটি খেলায় জয় এবং দ্বিতীয় দলের কেবল ঐ খেলার মাশুলই গুনে যাওয়া।" অবশ্য, ক্নুট উইকসেল

উৎপাদনযন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা বদলে সামাজিক মালিকানা চাইতেন—এমন কথা বলা যাবে না। তাঁর মতে, দুর্বলদের প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দিতে রাষ্ট্র বাধাবিপত্তি অপসারণ করবে, আর প্রতিযোগিতার খেলা অব্যাহত রাখতে উত্তরাধিকার করের পরিমাণ বিপুল করে তুলতে হবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় ভূমিকা—পরবর্তীকালে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের তাৎপর্যে সুইডিশ ধরনের 'কল্যাণ রাষ্ট্র'র সৃজন ঘটিয়েছে। আর এই রাষ্ট্রীয় ভূমিকা অর্থনীতির তত্ত্বে নতুন ধরনের বুর্জোয়া চিন্তারও বিকাশ ঘটিয়েছে। রাষ্ট্রের উদ্যোগে আধাপরিকল্পনা এবং বাজার পরিচালনা পরবর্তীকালে সুইডেনে রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় নীতিতেও রূপান্তর এনেছে। সুইডিশ অর্থনীতিবিদগণ রাষ্ট্রের ভূমিকাকে এক বিশেষ তাৎপর্য দেবার প্রয়োজনে ঈপ্সিত ভোগ, ফলপ্রসূ ভোগ; ঈপ্সিত লগ্নি ও সঞ্চয় এবং ফলপ্রসূ লগ্নি ও সঞ্চয়ের তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। সেই তাৎপর্যে বার্টিল ওহলিন, বেণ্ট হানসেন প্রমুখ তাত্ত্বিক দেশবিদেশে মূলধনের গমনাগমন, মুদ্রাস্ফীতি, বাণিজ্যচক্রের নানা-তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। রাগনার ফ্রিশ্ এই ধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ রথী। মোট জাতীয় আয় বলতে যে মোট ভোগ ব্যয়, মোট লগ্নি, বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি, সরকারী ব্যয় ও লগ্নির যোগফলকে বোঝায়—সেই সমষ্টিমূলক আর্থনীতিক তত্ত্ব গণিতের সহায়তায় ফ্রিশ্ আলোচনার্ উদ্যোগ নেন। তিনিই সর্বপ্রথম দেশের সমষ্টিমূলক আর্থনীতিক তত্ত্বকে 'ম্যাক্রো-ইকনমিক্স' নামে অভিহিত করেন। অর্থনীতির তত্ত্ব, গণিত ও সংখ্যাতত্ত্বের সমন্বয়ে নতুন যে অর্থমিতিশাস্ত্র গড়ে ওঠে, ফ্রিশ্ তারও অন্যতম জনক। তিনি এ-শাস্ত্রকে জীববিদ্যা, গণিত ও সংখ্যাবিজ্ঞানের সমন্বয়ে রচিত বায়োমেট্রিকস-এর সঙ্গে তুলনীয় ইকনোমেট্রিকস নাম দেন। এ-শতাব্দীর ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সঙ্কটের পর থেকে এই ইকনোমেট্রিকস তত্ত্বের খুবই বিকাশ ঘটে। লিয়নটিয়েফ, কুপমানস কেনটারোভিচ এবং আরও অনেকে এই তত্ত্বের বিশেষ বিকাশ ঘটান। এরপর ইনপুট-আউটপুট, লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রভৃতি আধুনিক অর্থশাস্ত্রের অবশ্যপাঠ্য বিষয়গুলির বিপুলভাবে বিকাশ ঘটে। তত্ত্বগত অর্থনীতি-চিন্তাতেও রাগনার ফ্রিশ্-এর নানা অবদান আছে। বিশেষভাবে মুদ্রার

প্রান্তিক উপযোগ, স্থিতিশীল ও গতিশীল আলোচনা পদ্ধতি, এলাসটিসিটি ক্যালকুলাস, উপাদানের গাণিতিক সম্পর্ক শাস্ত্রে কৃৎকৌশলগত সীমাবদ্ধতার প্রয়োগনীতি, বহু-উৎপাদকের প্রতিযোগিতার পলিপোলি, সমপরিমাণ উৎপাদনের তত্ত্ব (isoquants), ম্যাক্রো-ডাইনামিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাগনার ফ্রিশ্‌ পশ্চিমী জগতের তাবৎ শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সম্মান পেয়েছেন। নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯৩১ সাল থেকে অধ্যাপনা করছেন। বিশ্বখ্যাত অর্থমিতি পত্রিকা 'ইকনোমেট্রিকা'র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পত্রিকাটির মূল সম্পাদনাও করেছেন (১৯৩৩-৫৫)। জাতিসংঘের প্রথম আর্থনীতিক ও কর্মসংস্থান কমিশনের প্রথম অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছেন। বহুবিধ কাজের মধ্যে মানবিক অধিকারের আকাদামির তিনি উপদেশক সদস্যও বটেন।

জান টিনবারজেন-এর দেশ হল্যাণ্ড। জন্ম ১২ই এপ্রিল, ১৯০৩। তাঁর প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি পদার্থবিদ্যায়—তিনি লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ইন ফিজিক্স। অধ্যাপক টিনবারজেন সামাজিক ও আর্থনীতিক শাস্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। উলন্দাজী, ইংরেজি, জার্মান, ডেনিস, ফরাসী নানা ভাষায় তাঁর বহু বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদের মধ্য দিয়ে টিনবারজেনের নানা রচনাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির ছাত্রদের কাছে পৌঁছেছে। টিনবারজেনের আর্থনীতিক চিন্তাকে বড় পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) বাণিজ্যচক্রের তত্ত্ব ও নীতি; (খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অর্থনীতি; (গ) দীর্ঘকালীন আর্থনীতিক বিকাশের তত্ত্ব; (ঘ) জাতীয় আয়ের বণ্টন; (ঙ) আর্থনীতিক ব্যবস্থাসমূহ।

বাণিজ্যচক্র বিষয়ে পশ্চিমী দেশগুলির অর্থনীতিবিজ্ঞানীদের মাথাব্যথা বড় কম নয়। '১৯৩৬ সালের জন্য আর্থনীতিক নীতি' নামে তাঁর প্রবন্ধটি বাণিজ্যচক্রের প্রথম আর্থমিতিক বা ইকনোমেট্রিক মডেল বলা চলে। এ-প্রবন্ধটি ১৯৩৮ সালে লীগ অব নেশনস-এ বাণিজ্যচক্রের গবেষণা-বিশেষজ্ঞ (১৯৩৬-১৯৩৮) হিসাবে তাঁর প্রকাশিত বিখ্যাত 'Statistical Testing of Business Cycle Theories I, II'-এর পূর্বসূরী বলা চলে। উল্লিখিত প্রবন্ধটির অন্যতম বিশিষ্টতা হলো, এই রচনাটিতে কেইনসীয় কর্মসংস্থান ও মূলধনলগ্নি তত্ত্বের অনেকখানি পূর্বইঙ্গিত পাওয়া যায়।

টিনবারজেন তাঁর কর্মজীবনের একান্ত সূত্রপাত থেকেই বিশেষভাবে সমাজমনস্কতার প্রমাণ দিয়েছেন। আয় বন্টনের অসমতা তাঁকে বিশেষভাবে চিন্তিত রেখেছে। এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আয় বন্টনের বৈষম্য যে সামাজিক নানা দুর্গতি ও অশান্তির কারণ, এই বোধকে তিনি ধরতাই বুলির জগত থেকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তাৎপর্যে মর্যাদা দিয়েছেন। বিভিন্ন আর্থনীতিক ব্যবস্থা আলোচনা করে টিনবারজেন একটি কাম্য আর্থনীতিক ব্যবস্থার রূপরেখা দিয়েছেন। অবশ্যই এই কাম্য অর্থনীতি সমাজতন্ত্র নয়। তাঁর মতে এই কাম্য অর্থনীতি বিষয়ে দুটি সাধারণ ঘোষণা রাখা যেতে পারে। প্রথমত, এই 'কাম্য আর্থনীতিক রাজ্য' (Optimum economic regime) বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন হতে বাধ্য, এমনকি যদি একটিই সামাজিক কল্যাণগত দৃষ্টিভঙ্গিও (Unique social welfare function) থাকে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ ঘোষণাটি হলো—কাম্য আর্থনীতিক রাজ্য একেবারে এস্পার-ওস্পার ধরনের একটা কিছু হবে না। এ-ব্যবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই থাকবে না, (১) সম্পূর্ণ সরকারী বা সম্পূর্ণ বেসরকারী বিভাগের অনুপস্থিতি, (২) উৎপাদন, প্রশাসন বা বিনিময়ে সম্পূর্ণ কেন্দ্রিকতা বা সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রিকতা, (৩) সম্পূর্ণ সমান আয়, (৪) সম্পূর্ণ একপেশে কর প্রথা, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা যেতে পারে, একদিকে নির্দিষ্ট সামাজিক কল্যাণগত দিক—যা অনেকখানি বুর্জোয়া সামাজিক ব্যবস্থাকে ভাবাদর্শে টিকিয়ে রাখা, অন্যদিকে বিভিন্ন ঝোঁকের মিশ্র অর্থনীতি এবং তদনুরূপ প্রশাসন। এক কথায়, টিনবারজেন এক বিশেষ কাঠামোর রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের তত্ত্ব দিয়েছেন।

বহু পুরস্কারভূষিত ও বহু সম্মানে সম্মানিত টিনবারজেন পশ্চিমী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সামাজিক কল্যাণ সম্পাদনের ক্ষেত্রে আর্থনীতিকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণের বিষয়ে একজন মনস্ক অগ্রচারী। তাঁর নিম্নলিখিত বইগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : Business cycles in the USA 1919-39 (1939), On the Theory of Economic Policy (1952), Economic Policy : Principles and Designs (1956), Selected Papers (1959), Shaping the World Economy (1962), Development Planning (1967).

অনিল মুখোপাধ্যায়

তরুণ সান্যাল